# সাগরে-মহাসাগরে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শিউলিফুলের মত শুভ্র জ্যোৎস্না। দক্ষিণ-মেরুর বিষণ্ণ বরফে ওর ছায়া থমকে আছে। বায়ুতরঙ্গে কেমন একটা শিষ-দেওয়া শঙ্খচিলের নিথর আওয়াজ। আওয়াজটা ভাঙা ঢেউয়ের মাথায় কেমন আছড়ে-পিছড়ে পড়ছে।

জাহাজটাকে কেন্দ্র করে নীল-কাচ জলের ছোট-ছোট ঢেউগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে চাইছে জ্যোৎস্নার ছায়া ছায়া রূপটাকে।

দুটো ছায়া সংলগ্ন। ডেক থেকে দুটো ছায়া তেরছা হয়ে পড়েছে সমুদ্রবুকে। জাহাজটা চলার সঙ্গে সঙ্গে ছায়াদুটোও ভাঙা ভাঙা ঢেউয়ের মাথায় ভেসে চলেছে।

– খুব ভাল লাগছে রূপটা, তাই না?

উত্তর এল না। একটা খণ্ড কাক-কালো ছায়া চাঁদটাকে তখন ঢেকে দিয়েছে। নিস্পন্দ অন্ধকার। রেডিয়ম-ডায়াল ঘড়িটার বুকে শুধু ঘূর্ণ্যমান সেকেণ্ডের টিক টিক শব্দ। দুটো চোখ স্থির -ঝলেছে সারাটাক্ষণ ডায়ালটার উপর।

—মেরুর বরফগুলো হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। কি বলিস?

ব্রীজে তখন ঘণ্টির আওয়াজ। ওয়াচের বেল বাজল ব্রীজে। টিক টিক করে মিনিটের কাঁটাটা ঘাটের ঘরে মিলিয়ে যায় নি। কাঁটা ঘুরিয়ে ঠিক করে নিতে নিতে গেল তিন মিনিট স্লো।

-কি করছিস তুই ঝুঁকে ঝুঁকে?—দুটো কথার একটারও জবাব নেই!

—ঘড়িটা স্লো। মিলিয়ে নিলাম।

—পাগলা ঘড়ির সঙ্গে তুই পাগল হয়ে গেছিস প্রত্যেকটা ওয়াচেই তোকে কি মেলাতে হয়?

মোবারক হাসল—করে নিই- যদি ভুল করি।

--ভুল করি, ভুল করি' ভুল করলে তোর কোরান শরীফ অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

মোবারক এবারও হাসল আচ্ছা শেখর, সি-রোটগুলো তো একই থাকে?

– প্রায় তাই।

ঘড়িটা হাত থেকে খুলে নিল। কানের উপর রেখে পরখ করে দেখল একটানা টিক টিক শব্দটার কোথাও মুহূর্তে যতি রেখা পড়ল কি-না।

—মানুষের রোগ অনেক হয় শুনেছি কিন্তু ঘড়ি-রোগ তো শুনি নি!

—ঘড়ি-রোগ! আমার ঘড়ি-রোগ হয়েছে বলছিস? বল্। যা মুখে আসে তাই বল্। —আরো কিছু প্রকাশ করা মোবারকের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কি ভেবে সে চুপ করে থাকল।

--হয়েছে বাবা থাক। ঘড়ি-রোগের কথা বললেই তোর রাগ হয়। আর বলব না। আমি কি একা বলি? জাহাজের সবাই বলছে মোবারকের ঘড়ি-রোগ হয়েছে।

—সবাই বলবে বলে তুইও বলবি?

—এই চার দিন ধরে যা অবস্থা দেখছি, তাতে আমিও না-বলে আর থাকতে পারছি না।

মোবারক আলীর চেতনায় ছোট্ট একটা ঝড় বয়ে গেল। ঘড়ি-সম্বন্ধে কত কথা প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে—কত বলার আছে শেখরকে, কিন্তু বলতে পারল কই! বলার শক্তিটা যেন হারিয়ে ফেলেছে।

প্রতিবাদ জানান হল না মোবারকের। ঘড়ির দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস

ফেলল শুধু। নির্বাক নিস্পন্দ ঘড়িটার বুকে আবার চাইতেও ভয় করছে। কারণ সবাই বলছে ওর ঘড়ি-রোগ হয়েছে।

হঠাৎ এক ঝলক ছোট ভাঙা-ঢেউয়ের মাথা-থেকে-ওঠা নরম ঠান্ডা হাওয়া দুজনের মুখেই মিষ্টি স্পর্শ বুলিয়ে গেল। শেখর দাঁড়িয়ে আছে। আয়ত চোখ বিস্তীর্ণ সাগরজলের উপর। মোবারক আলীর জোয়ান চাটগাঁই চেহারাটার দীর্ঘ ছায়া আলতোভাবে সাগরজলে তেমনি বিলম্বিত। কিছুক্ষণ নির্বাক উভয়ে। কিন্তু নিস্পন্দ নয়। শুধু মেশিনের ঝম্ ঝম্ শব্দ ওদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতর দিয়ে উঠছে নামছে।

শেখর আরো কাছাকাছি হয়ে এল। ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। হাত রাখলো মোবারকের কাঁধে—রাগ করেছিস?

মোবারকের হাতদুটো ওভারকোটের পকেটে। জোয়ান চাটগাঁই চেহারাটা নিথর। খোদাই-করা প্রস্তর মূর্তিটার ঠোঁটে শুধু শিশিরবিন্দুর মত একবিন্দু বিনীত পান্ডুব হাসি।

চার দিন আগে কিন্তু মোবারক ছিল অত্যন্ত খুশী। হাসি ছিল ওর সম্পদ। চার দিন আগে ওর মাউথ-অর্গানটা হাজারো জানালার কপাট খুলে দিয়েছিল। শঙ্খচূড় সাপের খেলা দেখাতে গিয়ে সাউথ-ওয়াফের কাঠের কারখানার বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসে, সাদা মানুষের ঠাঁই ধরাতে পারে নি। শংখচূড় সাপের খেলা, মাউথ-অর্গানের বুকে ভারতীয় অপরূপ সুর তাই একটি সমুদ্র-মানুষকে মেলবোর্নের সাদা মানুষের মনে চিরদিনের জন্যই খোদাই করে দিয়ে এসেছে। আর ঘড়িটা হাতে বাঁধার সংগে সংগে সেই মানুষটা কি-না এতটা বিবর্ণ আর ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

মোবারকের পাখির পালকের মত মিষ্টি ঠোঁটদুটো নড়ে উঠলো—শেখর—আমার ঘড়ি-রোগ হয়েছে যারা বিশ্বাস করে করুক, কিন্তু তুই করিস না।

শেখর উত্তর করল না। মোবারক আলীর বলিষ্ঠ হাতদুটো নিজের হাতে টেনে নিয়ে বলল—চল শুয়ে পড়ি গে। ভোর তিনটেয় আবার 'টাণ্টু' হবে।

দুজনই ডেক পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে ফোকশালে নামল। ফোকশালে ঢুকে শেখরই বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে দিল মোবারক আলীর। মোবারকের দৃষ্টি তখন শংখচূড় সাপের ঝাঁপিতে। চামড়ার ঝাঁপিটা বাংকের একপাশে পড়ে আছে। ওরই দ্বিতীয় ভাজে মেঘবর্ণের শংখমুখী সাপ।

—নে শুয়ে পড়।—শেখর নিজের বিছানাটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল। জামা ছেড়ে মোবারক শুয়ে পড়লে, সে আলো নিভিয়ে দিল।

অধিক রাত্রে কিসের আওয়াজে শেখর জেগে দেখল পাশের বিছানা খালি। দেয়ালে টাঙানো রেডিয়ম-ডায়ালের ঘড়িটাও নেই। মোবারক ফোকশালে নেই! মনটা তাই ওর আঁতকে উঠল।

জাহাজটা তখন আছড়ে পড়ছে নোনা ঢেউয়ের মাথায়। বাইরে আকাশচেরা ঝড়। আলী কোথায় এ ঝড়ের রাতে? বাথরুমে! কিন্তু ঘড়িটা?

বাথরুম খোঁজা হল—নেই। মেসরুম শূন্য। শুধু ক'টা জলের টব আগুনে ফুটছে!

শেখর ডেকপথে এসে থামল। ডেকপথ অন্ধকার। দেওয়ানীর ঝাপটায় অনাবৃত ডেক একেবারে অস্পষ্ট। সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে হিবিং লাইনটা কোনরকমে ধরে ফেলল। হিবিং লাইন ধরে চারিদিকে চেয়ে দেখল কোন মানুষের ছায়া দেখা যাচ্ছে

কি-না। কিন্তু কোথা থেকেও এতটুকু আওয়াজ ভেসে আসছে না। মাস্টের আলোটা শুধু ওদিকে টিম্‌টিম করে জ্বলছে। সেই সময় কতকটা হিম ঠান্ডা ঢেউয়ের জল এসে সমস্ত শরীরটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল শেখরের। ভ্রূক্ষেপ নেই তবু তার। সে খুঁজছে।

মাঝে মাঝে প্রপেলারটা জল থেকে ওপরে উঠে যাচ্ছে। আর সেই সময় জাহাজের আর্ত চিৎকার। এই বুঝি স্টিয়ারিংটা অচল হয়ে গেল। এই বুঝি আর একটা ঝড় দুমড়ে দিল সমস্ত জাহাজটাকে। তবু এই আকাশচেরা ঝড়ের ভিতর দিয়েই তন্ন তন্ন করে সে অনুসন্ধান করল। শেষে কোনরকমে সিঁড়ির দুটো রড ধরে ... ডেকে উঠেই দেখল তিন নম্বর বোটের বাডারের পাশে মোবারক দাঁড়িয়ে ... ঢেউয়ের মাথায় দেওয়ালা দেখছে। রেডিয়াম ডায়াল ঘড়িটা ঝুলছে হাতে।

... ঘণ্টা পড়ল—রাত বারোটা।

শেখর ডাকল সেই সময় মোবারক নেমে আয়। ফোকশালে চল।

ভোরের আকাশ জুড়ে মেঘের আবরণ এতটুকু নেই। শুধু দক্ষিণ মেরুর দিকে কই ... রঙের খণ্ড মেঘ দিগন্ত ঘিরে ... ঘুমে অচেতন। মনে হয় মুঠি মুঠি ইন্দ্র ... কে যেন ... মেয়ের শাড়ির নীলাঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়ে চুপি চুপি সরে গেছে

শেখর এঞ্জিন-রুম থেকে বেরিয়ে এসে ডেকের উপর দাড়াল। সে নূতন জাহাজী। এখন ... পারেনি ... মরে যায় নি। তাই সে ডেক-পথে ... থামল। ... চোখ তুলে সমুদ্র আর আকাশের ... ভিতর ডুবে থাকতে চাইল কিন্তু কানে এসে মাউথ অর্গানের মিষ্টি সুর ... সে ডেক পথ ... আফটার পিকে উঠে এসে দেখল মোবারক নেচে নেচে ... ভিতর বাঁশী বাজাচ্ছে। ... জাহাজী দাঁড়িয়ে আছে ওকে ঘিরে।

... দিন চার রাতের ... মোবারক ফিরে পেয়েছে ওর পুরোনো সম্পদ। হাসি আর আনন্দ। বাঁশীর ... অবাক বিস্ময়ে থ হয়ে থাকা শেখর আর ... এগিয়ে ভাবল সিডনী থেকে জাহাজ ছাড়ার পর চার রাত চার দিন ও এতো ... ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল কেন? তারপর কাল রাত বারোটার সময় ... তিন নম্বর বোটের বাডারের পাশে দাঁড়িয়েই বা ... দেখছিল?

... তখন উঠছে নামছে। মিষ্টি সুর। অদ্ভুত বাজায় মোবারক। মরা ডেক আর এঞ্জিনের ভিতরে গোটা সফর ধরে সে যেন আজও জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

শেখর মেসরুমের ভিতর ঢুকতে মোবারক বলল—একটা নূতন সুর দিলাম। নিউ প্লাইমাউথের পথে পথে এই সুরেই বাঁশী বাজাব।

—থাক হয়েছে। কখন তো এঞ্জিন-রুম থেকে এসে স্নান করে বসে আছিস। এখনও খানাটা নিতে পারলি না? কেবল আমার আশায় বসে থাকিস। কখন আমি আসব কখন আমি ভাত নেব। বাঁশী রেখে গ্লাসদুটো আর থালা নিয়ে আয় নীচ থেকে। ততক্ষণে আমি হাত পা ধুয়ে আসছি। আর শোন্, আমার লকারে কাঁচা লঙ্কা আর টমেটো আছে। ওগুলো নিয়ে একসঙ্গে সব মেখে নে তো।

মোবারক বাঁশীটা জামার আস্তিনে মুছে নীচে চলে গেল।

দশ-তের নটের গতি যদি জাহাজের হয় তবে সিডনী থেকে নিউ-প্লাইমাউথের পথ সাত দিনের। কাজেই জাহাজ বন্দরে পৌঁছতে আরো তিন দিন প্রায় বাকী। আরো ছটা ওয়াচ মোবারককে প্রহরা দিতে হবে। সে প্রহরা দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকেই

ওকে বাঁশীতে সুর দিতে হয়। অভ্যাস রাখতে হয়। কারণ জাহাজ বাঁধার সংগে সংগে তো সে তার চার্লি চ্যাপলিন কায়দায় পোশাক পরে নেমে পড়বে বন্দর-পথে। যেমনটা সে প্রতি বন্দরেই করে আসছে। তারপর সেই বরফ-গলা বন্দর-পথের উপর দিয়ে ধীর ছন্দোবন্ধ বাঁশীর তালের সংগে পা মিলিয়ে উচ্ছল পাখির মত লাফিয়ে চলবে। পথের পাশে কাঠের রং-বেরঙের ঘরগুলির জানালা খুলে যাবে। দ্রোণফুলের মত সাদা মুখগুলি জানালার পাশে উঁকি দিয়ে দেখবে একজন ভারতীয় নাবিক বিচিত্র কায়দায় কাঠের বাড়িগুলোকে বাঁশীর সুরে ডুবিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

দক্ষিণ আর উত্তর দ্বীপের মাঝামাঝি অঞ্চলে নিউ-প্লাইমাউথ।

পাহাড়ী বন্দর। এগমণ্ট পর্বতের কোলে ধাপে ধাপে পাহাড়-সিঁড়ির ছায়ায় নিউ-প্লাইমাউথ বন্দর গড়ে উঠেছে। সিডনী থেকে দক্ষিণ-পূবে জাহাজ চালিয়ে জাহাজ বাঁধা হয়েছে সেই বন্দরে।

জাহাজ-ঘাটার সামনের পথটা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের বুক চিরে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে উপরে উঠে গেছে। অদৃশ্য হয়ে গেছে কাঠের রং-বেরঙের অলিন্দে। দূরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শেষ পাহাড়ের সোনালী বরফচূড়া। শীতের দেশে সোনাগলা রোদে মনে হল এগমণ্ট পর্বতে কে যেন আগুন ধরিয়েছে। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে তাই দেখল মোবারক। ঝলসে উঠল ওর আয়ত চোখদুটো। শেখর এসে ডাকতেই মোবারকের হুঁশ হল—ফোকশাল হতে বেরিয়েছিস্ তো সেই কখন, কিন্তু এখনও কিনারায় নামলি না যে?

মোবারক লেদার-ব্যাগের প্রথম ভাঁজ থেকে বার করল বাঁশীটা (যার দ্বিতীয় ভাঁজে সাপটা তখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে)। ঠোঁটের ভাঁজে গুঁজে দিল বাঁশীটা। শেষে হ্যাণ্ডশেক করল শেখরের সংগে। একসময় শেখর বলল—আই উইশ ইউ গুড লাক্

মোবারকের কিন্তু ঠোঁট নাড়ল না। শুধু চোখদুটো যেন একটু হাসল। সেই চোখদুটোই যেন হেসে জবাব দিয়েছে—তোমার শুভেচ্ছা আমার জীবনে অক্ষয় হোক

গ্যাংওয়ে ধরে জেটিতে নেমে এল মোবারক। তারপর পথে। কালো পিচঢালা পথ। হিম-ঠাণ্ডা বরফগলা পথ—ক্রেন মেসিনের গা ঘেঁষে পাহাড়-সিঁড়ির বুকে 'দ'-এর মত উঠে গেছে। সেই পথ ধরে হাঁটছে সে। হাতে লেদার-ব্যাগ। ঠোঁটের ফাঁকে মাউথ-অর্গান। সুরে সুরে নিজের মনে নিজেই যেন সে ডুবে আছে। কখনও পাহাড় অলিন্দ ঘেঁষে, কখনও ট্রাম-লাইন ধরে বরাবর চড়াই-উৎরাইয়ে ওঠানামা করতে করতে চলেছে ভারতীয় নাবিকটি।

নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরে মোবারক এই প্রথম এল।

মোবারকের বাঁশীর সুরে ডুবে-থাকা মন কখনও দেখল কখনও দেখল না জানালাপথের উপর উপুড় হয়ে পড়ে-থাকা সাদা মেয়েমানুষের দ্রোণফুলের মত মুখগুলি। পাহাড়ের উপর থেকে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখছে ওকে।

ফিজ্‌রয়ে এসে থামল মোবারক। মুখ থেকে বাঁশীটা নামিয়ে আনল। ফুলে ফুলে যেন ছেয়ে আছে ফিজ্‌রয়ের প্রতিটি ঘর, প্রতিটি মানুষ। সমস্ত শহরই যেন বিচিত্র ফুলের উৎসবে মেতে আছে। ফিজ্‌রয়ের ফুলের উৎসবে দাঁড়িয়ে ভাবল একবার—মেথডিস্ট চার্চের পাশ দিয়ে পিকাকোরা পার্কটা ঘুরে এলে হত। কিন্তু রাত যে বেশি হয়ে যাবে। তাছাড়া জাহাজটা অনেক দিন এ বন্দরে থাকবে। আর-এক বিকেলে ঘুরে এলেই হবে।

ফিজ্‌রয় হতে ট্রামে চড়েই বন্দরের দিকে ফিরল মোবারক। একবগীর ট্রামে চড়ে

এক কোণে বসে বাঁশীটা ক'বার বাজাল। আরোহীরা কান পেতে শুনল। নতুন একটা সুর। বিদেশী সুর। খুব শ্রুতিমধুর ঠেকছে। মেয়েরা যোয়ান দীর্ঘ চাটগাঁই চেহারাটা দেখে ফিস্‌ফিসিয়ে তাই বলল—ইণ্ডিয়ান, এ ম্যান অব্ মিস্টিক ল্যাণ্ড।

ট্রাম বন্দরে এসে থামতেই মোবারক নেমে পড়ল। সামনেই সি-মেন্‌স্ মিশন। পিয়ানোর সুর ভেসে আসছে। শহরের বুকে জাহাজীদের এই এক আড্ডাখানা। দিনের পর দিন সমুদ্রের মরা ঢেউ গুণে এখানে এসে সব জাহাজীই একটু গান-বাজনায় ডুবে থাকতে চায়। আগামী সমুদ্রযাত্রার জন্য মনটাকে এখান থেকে একটু চাঙগা করে নেয়।

মোবারক দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই দেখল একটা সাহেব বিলিয়ার্ড টেবিলের উপর ঝুঁকে আছে। পাশে আরো দুজন সাহেব দাঁড়িয়ে আছে। সেও একবার থামল টেবিলটার কাছে এসে। কিন্তু পৃথিবীটা ক'বার প্রদক্ষিণ করার পরও এ খেলাটাকে সমঝে উঠতে পারে নি। তাই যেখানে নাচ-গান হচ্ছে, যে হলটার ভিতর থেকে পিয়ানোর সুর ভেসে আসছে, সেদিকেই সে এগিয়ে গেল।

বিভিন্ন দেশের জাহাজীতে হলটা ভরে আছে। মঞ্চের উপর ক'জন মেয়ে সাদা পোশাক পরে পা তুলে নাচছে। নাচ দেখে মনে হয় এক পায়ের উপর ভর করে আর-একটা পা আকাশের দিকে কতদূর তুলে দেওয়া যায় তারই যেন প্রতিযোগিতা হচ্ছে। প্রথম প্রথম মোবারকের চোখে এ সব খুব খারাপ লাগত। কিন্তু সফরে সফরে এ[illegible] দেখে, আজকাল এ পা-তোলার প্রতিযোগিতাকে নাচ বলে, নৃত্য-শিল্প বলে ভাবতে পারছে। শেষে একটা চেয়ার টেনে বসতেই দেখল পাশের চেয়ারে শেখর। হাঁটুর ভাঁজের ওপর টুপি।

ফিস্‌ফিস্ করে ডাকল—শেখর।

ফিসফিস করে উত্তর এল—আমি তো ভাবলাম তুই সোজা জাহাজে চলে যাবি।

—কতক্ষণ হল নাচ আরম্ভ হয়েছে?

—তা অনেকক্ষণ। এদের সিস্টেম কিন্তু আলাদা। অন্যান্য বন্দরে সি-ম্যান মিশনে দেখে এসেছি ওদের ভিন্ন লোক থাকে গান-বাজনার জন্য। কিন্তু এখানে জাহাজীদের মধ্যে যদি কেউ কোন আর্ট সম্বন্ধে অভিজ্ঞ থাকেন, তাঁকে ডাকা হয়। তোর নাম আমি এবার প্রস্তাব করব।

মঞ্চের উপর তখন সেই পা-তোলা মেয়েটির নাচ প্রায়-শেষ। কোল্ড ড্রিংকের ঘরটা পার হয়ে কাকে কি যেন বলে এল শেখর।

মঞ্চের উপর যারা নাচছিল তাদের নাচ শেষ। শেষে তারা নুয়ে নুয়ে কেমন পিছিয়ে পিছিয়ে দু-পা ভাঁজ করে বিলিতী কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে পর্দার আড়ালে হারিয়ে গেল।

মোবারক শেখরের কলার টেনে বলল—আমি কিন্তু অমন ভাবে ঠ্যাং ভাঁজ করতে পারব না।

—তুই তোর মত করবি।

সেই সময় কালো পোশাক-পরা একজন ভদ্রলোক এলেন মঞ্চে। এসে তিনি মাইকের সামনে মুখ রেখে বললেন—এবারের প্রোগ্রাম লিলিরু—ভায়োলিন, তারপর সৈয়দ মোবারক আলীর মাউথ-অর্গান।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতে লিলি এসে ঢুকল। মোবারক উঠে গিয়ে পর্দার পাশে দাঁড়াল। ভায়োলিন বাজাচ্ছে লিলি। কাঁধের উপর রেখে বাজাচ্ছে। খুব মিষ্টি হাত।

গায়ে সাটিনের ব্লাউজ—ফারের কোট উইংসের পাশে রেখে গেছে, মোবারক কোটের লাগোয়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফারের কোট থেকে উৎকট বিলিতী এসেন্সের গন্ধ উঠছে। মোবারক একটু সরে দাঁড়াল।

লিলির চোখ কালো, চুল কালো। সেই চোখ চুল দেখতে দেখতে কখন লিলি হাত নামিয়ে নিয়েছে বেহালা থেকে মোবারক খেয়াল করে উঠতে পারে নি। মেয়েটি বেরিয়ে আসতেই খেয়াল হল এবার ওকে মঞ্চের ভিতর ঢুকতে হবে। কিন্তু ঢুকতে যেতেই সামনের উঁচু কাঠটা ওর পায়ের সঙ্গে ধাক্কা খেল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল লিলির ভায়োলিনের উপর। একটা তার ছিঁড়ে গেছে। আর হাতটা একটু কেটে গেছে মোবারকের। রুমাল দিয়ে হাতের রক্তটা মুছে অপরাধীর মত বলল—আপনার ভায়োলিনের তারটা ছিঁড়ে গেল।

লিলি অত্যন্ত সহজভাবে বলল—আপনার হাতটা খুব কেটে গেছে, তাই না? দেখি তো হাতটা।

—না, তেমন কিছু হয় নি।—এতটুকু কাটায় কিছু আসে যায় না মোবারকের।

একটা তার ছিঁড়লে লিলি আর-একটা তার জড়িয়ে নেয়।

—আপনি যান। সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

মঞ্চের ভিতর ঢুকতে যাবে, আবার ডাকল লিলি—দাঁড়ান, হাতটা বেঁধে দি।—উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের রুমালটা জড়িয়ে দিল মোবারকের হাতে। সেই সময় দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে সি-ম্যানের কর্তৃপক্ষ কয়েকজন ছুটে এসেছিলেন।

মঞ্চে ঢোকার আগে আরেক বার চাইল মোবারক লিলির দিকে—সারা মুখে ছড়িয়ে আছে শিশিরভেজা গোলাপের রং, বাদশা-বেগম চেহারা। ভ্রূ-লতা বড় সরু আর তীক্ষ্ন।

মোবারক যখন হাসে, তখন ওর ঠোঁট হাসে না। চোখ হাসে। মোবারক হাসল। লিলিও হাসল।

তারপর মঞ্চের উপর মোবারকের মাউথ-অর্গান বাজানো এক সময়ে শেষ হল। মোবারক বেরিয়ে আসবে। জনতার হাততালি থেমে গেল। কিছু মুখ চেয়ার থেকে উঠে বলল—আবার হোক।

মোবারক ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—অনেক দিন থাকব এ বন্দরে।—তারপর মিঠে সেলাম ঠুকল সকলের উদ্দেশ্যে। উইংসের পাশ কাটিয়ে বাইরে আসতেই লিলি বলল—বেশ হয়েছে। সুন্দর বাজিয়েছেন তো। ভারতীয় সুর এত মিষ্টি এই প্রথম জানলাম।—একটু থেমে আবার বলল—কালও নিশ্চয়ই মিশানে আসছেন?

—খুব সম্ভব।

—কখন?

—সেটা ঠিক বলতে পারলাম না।

লিলি আর মোবারক একসঙ্গেই মঞ্চের বাইরে চলে এল। পিয়ানো আর বিগ-ড্রামের আসর পার হয়ে শেখরের পাশে দাঁড়াল। খুব আস্তে পরিচয় করিয়ে দিল শেখরকে লিলির সঙ্গে। শেখর দাঁড়াল। হ্যাণ্ডশেক করল। কিছু বলতে হবে এবং কি বলা যায় এই ভাবতে গিয়েই অনুভব করল ওর মুখে এসে সমস্ত রক্তটা যেন চাপ দিতে চাইছে। মোবারক বুঝতে পেরে বলল,—আমার বন্ধুটি অত্যন্ত লাজুক। তাছাড়া নূতন জাহাজী।

শেখরের মুখ কেমন আরো রক্ত-লাল হয়ে উঠতে থাকলে মোবারক আবার

বলল—জাহাজে চল। বেশ রাত হয়েছে।

লিলি নিজের কালো চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে বলল—এত তাড়াতাড়ি

শেখর অনেক চেষ্টা করে উত্তর দিল—খুব ভোরে আমাদের উঠতে হয়।

প্রথম দিন সকাল সকালই ফিরল জাহাজে। লিলি এসেছিল দরজা পর্য এসেছিল বিদায় দিতে।

সি-মেনস্ মিশন থেকে কালো পথ নেমে গেছে জেটিতে। সেই পথ ধরেই নেমে আসছে। কার্নিভাল আর ক'টা স্টেশনারী দোকান পার হয়ে ওরা এসে থা ক্রেন-মেসিনের নীচে। মোবারকের চিন্তাধারাটা ক্রেন-মেসিনের নীচে থামতেই বে চমক খেল। লিলির বিদায়বেলাকার গুডনাইট কথাটাতে কেমন একটা ছোট্ট স ভাব ছিল। কিন্তু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে গ্যাংওয়েতে ঢুকতেই সেই মুখের সংগে স সারি আরো ক'টা মুখ মনের পর্দায় ভেসে উঠল। আজকার লিলির মতই চো ওদের। তফাৎ শুধু চোখে আর চুলে। চোখ নীল, চুল সোনালী।

বুনো সাইরিসের স্প্যানিশ মেয়েটির কথা মনে হলে তার লজ্জা লাগে। সে বল আমি কবি, কবিতা লিখি। নিজামা পার্কে বসে সে গল্প করত, দেশের রাজনী সম্বন্ধে আলোচনা করে মোবারকের পান্ডিত্য জানতে চেয়েছিল। ভারতীয় রাজনী জানার শখও ছিল তার অত্যন্ত তীব্র। সে বলত, মোবারক থেকে যাও, তো আমি সব দেব। মোবারক সে মেয়েটিকে সত্যি বার বার অনুকম্পা করেছে। অসহায় মেয়ে সে। নিজামা পার্কে বসে ওকে বার বার দেখে তাই মনে হয়েছি ফেরিদা, করিয়েন্থুজে বার বার সে এক কথা বলত—সব হবে, সব পাবে, থেকে যা

মোবারকের মনে হয়েছে সে সময় জৈনবের দীর্ঘ-এলায়িত চুলকে—মনে হয়ে ওর নাকের নথ—বাঁশপাতার মত ফুর ফুর করে কাঁপছে। আম্মাজানের কথা ত সে শুনতে পেত—মোবারক ঘুমোস নি! তোর বাপজীর কথা যে এখনও শেষ না রে—।

সে বলত--আম্মা আর-একদিন, আজ থাক। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

মনে পড়েছে মেলবোর্ন থেকে জিলঙের পথ। ক্যাডিলাক ছুটেছে প্রাণপ উইলিয়ামের স্ত্রী গাড়ি চালাতে চালাতে একটি ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় গাড়ি থ কষে দিল। স্থানটি নির্জন। দূরে একদল ক্যাঙ্গারু লাফিয়ে দূর হতে দূরান্ত পালিয়ে যাচ্ছে। সেই ঘনসন্নিবেশিত ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় চন্দ্রালোকিত নিঃ মাঠে বলেছিল বউটি- এ-দিকে আসবে মোবারক?

দূরে গম-ক্ষেতগুলির প্রতি আংগুল তুলে বলেছিল--আজ যদি জিলঙ্গ আ না পৌঁছাই?

উইলিয়াম নিশ্চয়ই তা হলে চিন্তা করবে।

—মোটেই না। বলব তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল। ওর জন্যে তুমি এবার কতগ ভারতীয় টিকিট সংগ্রহ করে এনেছ-?

—অনেক।

—দেখালে না তো?

—বাড়ী পৌঁছে দেখাব।

—গাড়ি আর আমি চালাতে পারব না মোবারক। গত সফরেও চালিয়ে গেছি এবারও চালিয়ে যাচ্ছি। আমার কি অত দায় পড়েছে?

—উইলিয়ামকে পাঠালেই পারতে তাহলে।

—তুমি বুঝি জানো না সে অত্যন্ত স্বার্থপর।
—কথাটা বলা যাবে ওকে।
—না, খবরদার। ওকে কিন্তু কিছু বলবে না।
—উইলিয়াম নিশ্চয়ই আমার জন্য এবার অনেক টিকিট জমিয়ে রেখেছে।
—জানি না।

উইলিয়ামের স্ত্রী ওর শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আগামী মাস থেকে ক্যাঙ্গারুরা বাচ্চা দিতে শুরু করবে। এ মাঠে অনেকবার খরগোস শিকার করতে এসেছি আমরা। তাই আমি জানি ক্যাঙ্গারু বাচ্চা দেয় কখন।

উইলিয়ামের স্ত্রীর ঠোঁটদুটো আর চোখদুটোতে উদগ্র কামনা জাগছে। শঙ্খচূড় সাপটার কথা মনে হয়েছিল তার সে সময়। সে দু-পা সরে দাঁড়িয়ে ক্যাডিলাকের ভিতর ঢুকে বলল—এস। উইলিয়াম সত্যি খুব স্বার্থপর।

মোবারক বাংকের উপরে পড়ে আরো কিছু ভাবছিল—কিন্তু শেখর এসে ডাকছে সময়—ওঠ্ ওঠ্ খাবি চ। খানা তোর লকারে তুলে রেখেছি। তোর খানা নিয়ে ভাণ্ডারী সারেংকে নালিশ জানিয়েছে।

সে শুনেও শুনল না যেন। অন্য কথা টেনে নিয়ে বললে—লিলিবুকে কেমন লাগে শেখর?

—সে কথা পরে বলব। এখন যা-হয় দুটো খেয়ে নে। ঠাণ্ডা ভাতগুলো খাবি করে তাই ভাবছি।

—খাব, খেয়ে নেব ঠিক। কিন্তু লিলি বড় ভাল মেয়ে। অন্য বন্দরের মেয়েদের থেকে অনেক তফাৎ। আম্মাজানের মত সে আমায় আজ যত্ন করলে। কাটা হাত কত সুন্দর করে বেঁধে দিয়ে বলেছে—জল যেন হাতে না লাগে।

—দু দণ্ডেই লিলিবুর সঙ্গে তাহলে প্রেম হয়ে গেছে বলতে চাস।

—না প্রেম আমার হয় নি। আমার প্রেম দুটো জিনিসের সঙ্গে—এক সাপটা, দ্বিতীয় মাউথ-অর্গান। প্রেম আমার হতে পারে না আর।

শেখর ঠোঁটে বিদ্রূপ টেনে প্রশ্ন করলে—আর হাত-ঘড়িটা?

মোবারক লাফ দিয়ে বাংকের উপর বসে পড়ল। ভূত দেখার মত ভয় পেয়ে সে যেন কাঁপছে। গলা ওর কথা বলতে কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, বিবর্ণ আর শুকনো হয়ে গেছে ঠোঁটদুটো। তবু সে অত্যন্ত নিচুগলায় শেখরকে বললে—আল্লার কসম শেখর, এ কথা তুই আর তুলিস না।

নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরের প্রথম ভোর। মোবারক আর শেখরের প্রথম সকাল।

কুয়াশাচ্ছন্ন ডেক। উইন্‌চ্ ড্রাইভাররা ভোর রাত থেকে ফল্কায় কাজ করছে। ক্রেনের নীচে ট্রাকগুলোতে বোঝাই হচ্ছে ফসফেট।

ট্রাক একটা-দুটো নয়, অনেকগুলো। ভিতরে দু-একজন সাহেব বসে আছে। নিষ্কর্মা মানুষের মত বসে সিগারেট টানছে। ওরা অপেক্ষা করছে ট্রাকগুলো কতক্ষণে বোঝাই হবে।

পাঁচটা ক্রেন একসঙ্গে পাঁচটা ফল্কায় কাজে ব্যস্ত। ক্রেন-ড্রাইভাররা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখছে সূর্য উঠবে কি উঠবে না—সঙ্গে লক্ষ্য রাখছে ডেকের উপর কিনারার সাহেব কখন হাড়িয়া হাঁফিজের নির্দেশ দিচ্ছে। নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পা-টা লিভারের উপর টিপে গিয়ার তুলে দেয়। তারপর দু-পাঁচ হন্দর মাল

ক্রেনটা তুলে নিয়ে মোটরের উপর ঢেলে ফল্কায় আবার ফিরে আসে। ক্রেন-ড্রাইভার তখন হাতটানা দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসেন। এক মুহূর্তের বিশ্রাম।

ক্রেন পার হয়ে আর-একটুকরো সমুদ্র। এখানে জেটি ব্রিজের মত সমুদ্রে উপর কতকটা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। দু-চারটা বয়া ভাসছে জলে। রাতে সেই বয়ায় হলুদ আলো কখনও জ্বলে কখনও নেবে। এই একটুকরো সমুদ্রে বেলাভূমি পাহাড় থেকে একেবারে খাড়া নেমে আসে নি। বেলাভূমি ক্রমশ ঢালু বলে এখানেই সপ্তাহে দুদিন কার্নিভ্যাল বসে। অন্যান্য দিন বিকালে সমুদ্রস্নান করতে শহর হতে নেমে আসে মেয়ে-পুরুষরা।

এঞ্জিন-সারেং-এর চলনে ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। আফটার-পিকে উঠে একবার গ্যালীতে উঁকি দিচ্ছে আবার ছোট ট্যান্ডেলকে ডেকে বলছে—যাওরে মিয়া কামে যাও ঘণ্টি পড়ব এখন।

সেই শব্দে শেখর আর মোবারক কেবিন থেকে উপরে উঠে এল। দাঁড়াল এসে দুটো বীটের সামনে—যেখানে লোহার মোটা তারগুলো প্যাঁচ খেয়ে রয়েছে। ডেক ট্যান্ডেল কয়েকজন ডেক-জাহাজী নিয়ে ফানেলের ডগায় গিয়ে উঠেছে। ফানেলে রং হচ্ছে। হলুদ রং। ডেক-সারেং বয় কেবিনের সামনে বাটলারের সঙ্গে ফিস ফিস করে নিভৃতে কিছু যেন শলা-পরামর্শ করছে। কিছু বিক্রীর ব্যবস্থা—কিছু পয়সা-সংগ্রহে ব্যবস্থা। ডেক-ভাণ্ডারী পাঁচ নম্বর ফল্কা পার হয়ে সারেং-এর পাশে চুপচাপ দাঁড়াল। কারণ ক্রুদের রেশন বাঁচিয়ে তারও কিছু মশলা, চাল ডাল জমেছে—বেচে সেও কিছু পয়সা সংগ্রহ করতে চায়।

জাহাজ বন্দরে এলে ওয়াচ ভেঙে দেওয়া হয়। তখন এঞ্জিন-রুমে নাবিকের সকলেই সাতটা-পাঁচটা কাজ করে। মোবারক আর শেখর তাই আজ একসঙ্গে এঞ্জিন-রুমে নামার জন্য নীল রঙের ওয়ার্কিং ড্রেস পরে অপেক্ষা করছে এঞ্জিন-রুমে বড় ট্যান্ডেলর জন্য। বড় ট্যান্ডেল আসে নি বলে, ওরা উঁকি দিয়ে দেখছে বন্দরের জল কতটা গভীর।

লুৎফল এবং আরো ক'জন নাবিক সারেং-এর কাছে ছুটি নিয়ে কিনারায় গেছে অনেকে নিজেদের জন্য কিছু সেলমন কি হেরীং মাছ আনার জন্য পয়সা দিয়েছে সেই সময় শেখরও বলেছে—আমাদের জন্য যেন কিছু আনা হয়। কিছু হেরীং আর টমেটো।

এই নীরস লোহার ডেকে একঘেয়ে খানার পর দুটো টমেটোর চাটনী হেরীং-এর ঝোল অমৃতের মত খায় নাবিকেরা। তাই জাহাজ বন্দরে এলে প্রথম ভোরেই সারেং দু-একজনকে কিনারায় পাঠিয়ে দেয় বাজার করতে। বলে দেয় কিছু শাক যেন নিয়ে আসে। শাকের পয়সা দিতে হয় না - অনেক বন্দর আছে যেখানে সমুদ্র-তীরে বিভিন্ন রকমের শাক আগাছার মত বাড়তে থাকে। সেই শাক ভারতীয় নাবিকেরা যতদিন থাকে তত দিন ডেক বোঝাই করে। এমন কি শেষ পর্যন্ত বাড়তি শাকগুলো বরফ-ঘরে বাটলারকে জমা দিয়ে দেয়।

গতরাতে ঘড়িটা নিয়ে মোবারক আর শেখরের ভিতর যে মন-কষাকষি হয়েছিল, নিউজিল্যান্ডের প্রথম ভোরের হাল্কা আমেজে সব যেন ফুৎকারে উবে গেছে। মোবারক আবার উচ্ছ্বল হয়ে উঠেছে, শেখর চঞ্চল হয়েছে এঞ্জিন-রুমে নামার জন্যে। এঞ্জিন-রুমে ফিল্টার খুলতে হবে আজ। তিন নম্বর ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে হাতাহাতি সাহায্য করতে হবে একটু। শেখর ইঞ্জিনিয়ারের হেলপার হিসেবে কাজ করতে খুব ভালবাসে।

া যত ভয় বয়লারগুলোকে। বয়লারে কয়লা ঠেলে দেওয়ার কথা মনে হলে ভয়ে
া শরীরে কাঁটা দেয়।

সাড়ে বারোটায় খানার টিফিনে দুজনেই এঞ্জিন-রুম থেকে পাশাপাশি উঠে
েছিল ডেকে। ডেকের সামনে ফল্কা। ফল্কা দুটো পার হয়ে জাহাজের গলুই।
লুইয়ের বুকে এক ঝাঁক চিড়িয়া খুঁটে খুঁটে কিছু খাচ্ছে।

মোবারক আর শেখর ষ্টারবোর্ড-সাইড ধরে গলুইতে উঠে এল। খানা নিল-
-থালায়, খানা খেল। খানার টেবিলে একবার লিলিরুর কথা উঠেছিল—যেন রাজ-
সের পালখে-মোড়া মেয়েটা। ঘন অন্ধকারের মত চোখ আর চুল। নাক ওর কচি
লিমপাতার মত নরম আর সরু। ঠোঁটদুটো যতটা হালকা, ততটা ভিজে ভিজে।
চু-লাল রং সেই ঠোঁটের। চিবুকে রয়েছে বর্ষার প্রজাপতির ক্ষীণ ডানার ভাঁজ।
াড়ের উপর এক গুচ্ছ বব্-করা চুল। শুধু বব্-করা এক ঘাড় চুলটা মোবারকের
পছন্দ। সে চুল কেন জৈনব খাতুনের মত এলায়িত আর দীর্ঘ হল না—সেজন্য
রীং-এর মাথাটা চিবোবার সময় ক'বার আপশোস করেছে মোবারক।

মোবারক বলেছে—লিলি চুলটা আরো বড় করে রাখতে পারল না?

শেখর এঁটো-কাঁটা সব থালায় তুলে সামান্য হেসে বলল—মিশনে যখন দেখা হবে
খন বলবি, চুলগুলো বড় করে রাখতে পারলে না গো মেয়ে?

মোবারক শেখরকে চোখ টিপে বলল—চুপ কর হতভাগা।—অর্থাৎ বড় ট্যাণ্ডেল
খন মেস-রুমে ঢুকছে খানা খেতে। বগলে একটা মাদুর। খানা খেয়ে থালার
পর কুলকুচা করে একেবারে পাঁচ ওক্তের নামাজ পড়ে নীচে নামবে। এমনটাই
বভাব ওর।

নিবার, আজ সাড়ে বারোটায় ছুটি। সুতরাং এই মাত্র কাজ থেকে খালাস হল
শখর আর মোবারক। ক্ষিদে অত্যন্ত বেশী পাওয়ায় স্নান না সেরেই খেয়ে নিয়েছে।
তারপর হাতে কাজ আছে অনেক। সে কাজগুলো শেষ না করে স্নান করলে—
কাজগুলো আজও পড়ে থাকবে। কাল রবিবার—ছুটির দিন। ছুটির দিনেও হাতে
একগাদা কাজ থাকুক মোবারকের পছন্দ নয়।

ক্রেনের হাড়িয়া-হাঁফিজে ফসফেটের ধুলো সমস্ত বন্দর জুড়ে কুয়াসার সংগে
মশে সাদা হয়ে উড়ছে। সেই ধুলোর ভিতর শেখর আর মোবারক কাজ করেছে।
ফিল্টারের কাজ শেষ হলে দুজনেই তিন নম্বর ইঞ্জিনিয়ারের সংগে উইনচে দু-ঘণ্টার
জন্য হরদম খেটেছে। এশ্ছাণ্টিক ষ্ট্রেপার খুলতে যে কালী শেখরের গায়ে লেগেছিল
মোবারক গরম জল আর সাবান দিয়ে সেই কালী রগড়ে তুলে দিচ্ছে এখন। চার টব
গরম জলে স্নান করেছে ওরা।

তার আগে মোবারক ওয়ার্কিং ড্রেসগুলো কেচেছে। শেখরের ওয়ার্কিং ড্রেসও
ধুয়ে দিয়েছে। শেখরের জামা কাপড়ও মোবারকই ধুয়ে রাখে। আর হরদম বিড় বিড়
করে বকে। বলে—জাহাজে মরতে এলি কেন? সফর শেষ করে যদি একবার
কলকাতায় ফিরতে পারি তবে মাসীমাকে বলে দেব—জাহাজে যেন তোকে আর না
পাঠায়। আমি না থাকলে তুই যে মরে যেতিস।

শেখর হেসে বলল—পিঠের কালীটা সব উঠল তো।

তারপর বাথরুম থেকে উঁকি দিয়ে বলল—মোবারক এদিকে চেয়ে দেখ না!

মোবারক উঁকি দিয়ে বলল—কি!

—দেখছিস না ক্রেনের নীচে দুটো মেয়ে সমুদ্রে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে।

—দেখলাম তো।

—আমি ওদের সঙ্গে এখন গিয়ে মাছ ধরব। একটা ছিপ ওদের থেকে চে' নেব। তুই যাবি না? তুই মাছ ধরবি না?

—না।

—তবে সারাটা দুপুর ফোকশালে বসে কি করবি?

—কিছুই করব না।

—ঠিক আছে মাছ যদি ওঠে তোমায় আমি দিচ্ছি না, একা ধরব, একা রাঁধব একা খাব।

—খাবি, বেশ করবি। আমায় কি ভয় দেখাচ্ছিস।

শেখর স্নান সেরে বলল—জামাকাপড়গুলো উনুনের পাশে টাঙিয়ে রাখিস, না তো শুকাবে না।

জামাকাপড়গুলো শেখরের।

শেখর সত্যি একসময় গ্যাংওয়ে ধরে নীচে নেমে মাছ ধরতে চলে গেল। এবং একটা ছিপ চাইতেই পাশের মেয়েটি সানন্দে ছিপ বাড়িয়ে বললে—ইউ নো হাউ টু ফিশ?

শেখর স্বীকার করতে মেয়েটি বললে—গ্র্যাণ্ড।—তারপর দুটো মেয়ের মাঝখানে নির্বিকারভাবে বসে মাছ ধরার জন্য ছিপের সুতোটা সে গভীর জলে ছুঁড়ে ফেলল আর সন্তর্পণে দুবার দুটো মুখের প্রতি চেয়ে গভীরভাবে যেন আত্মনিয়োগ করল মাছ ধবার প্রতি। সে যেন যথার্থই মাছ ধরতে এসেছে।

সাজগোজ করে মোবারক ডেক অতিক্রম করে যখন গ্যাংওয়ে দিয়ে জেটিতে নামছে কিনারায় বের হবার জন্য, তখন প্রায় তিনটে বাজে। লায়ন রকের ওপারে সমুদ্র-সন্ধ্যায় সূর্য ডুবছে তখন। বিকেলের আকাশটা একরাশ ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় ভরে গেছে। আকাশ, নিউ-প্লাইমাউথ বন্দর মোবারকের মতই যেন সাজগোজ করা। সে পথ ধরে হাঁটার সময় শেখর যেখানে মাছ ধরছে সেদিকে নজর দিল। কয়েকদম পা চালিয়ে শেখরের পাশে ঝুঁকে দেখল বেশ ক'টা জ্যান্ত মাছ লাফাচ্ছে। মেয়ে দুটো ছিপ ফেলে তখনও বসে রয়েছে। কিন্তু মোবারককে দেখে ওরা যেন আশ্চর্য হল।

শেখর বললে—অত চোখ দিয়ে দেখলে কি হবে, মাছের ঝোল রেঁধে তোমায় আমি দিচ্ছি না, একা ধরেছি একা খাব।

মোবারক কোন জবাব দিল না, শুধু বললে—লিলিবুর সঙ্গে মিশনে দেখা হলে বলবি আজ আমার যাওয়া হচ্ছে না, আজ যাচ্ছি পিকাকোর পার্কে।

মোবারকের পোশাকটা বেশ ঢলঢলে। কালো ক্যাপ মাথায়। গলার টাইটা ডবল ক্রসিংএ বাঁধা, অনেকখানি নীচে ঝুলে পড়েছে। হাতে ব্যাগটা ঝুলছে।

শেখর বঁড়শিটা ওদের ফেরত দিয়ে বলল—সাপটা নিয়ে বেরচ্ছিস কেন? এত ঠাণ্ডায় ওটা কিছুতেই নড়বে না।

—নড়বে না—নড়বে না! তাতে হয়েছে কি। আমি তো ওটা নাচানোর জন্য নিয়ে বের হই নি। হাতে রয়েছে—থাক।

—সে অবশ্যি সত্যি—হাতে রয়েছে থাক।

—সব কিছুতেই তুই আমার সঙ্গে লাগিস কেন বলত শেখর?

—ভাল লাগে বলে, আমার কথা এমন করে আর কেউ তো হজম করে না তাই।
—তুই কিন্তু বলবি লিলিকে।
—বলব।
পথ ধরে হাঁটছে মোবারক। লায়ন রক অতিক্রম করে জোর হাওয়া ছুটছে বলে ওভার কোটের প্রান্ত বাতাসে উড়ছে—টুপিটা পর্যন্ত। টুপিটাকে টেনে টুনে সে ভাল করে মাথার ভিতরে ঠেলে দিল। সে যখন হাঁটে তখন কেমন উন্মনা হয়ে যায়। দেশের কথা নিশ্চয়ই মনে হয়। নাবিক হয়েও সে সমুদ্রকে ভালবাসতে পারে নি।
বন্দর পার হলে দু-দুটো মদের দোকান পাশাপাশি। বন্দরের কাজ-করা সাহেব মানুষগুলো সেখানে লাইন দিয়ে মদ টানছে। যাঁরা সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসেছেন তাঁরা হাঁটছেন বেলাভূমিতে। কার্নিভ্যাল আজ বসবে না।
বিকালে ফ্লাস্ক-ভর্তি কফি নিয়ে এক দঙ্গল মেয়ে-বৌ এসে সমুদ্রে স্নান করে গেছে—মোবারক ডেকের উপর দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিল। এখন যাঁরা এসেছেন বেড়াতে —সান্ধ্যভ্রমণ ওঁদের বিলাস।
মোবারক আবার হাঁটছে।
মদের দোকান পার হলে ডান দিকে সি-ম্যানস মিশন। মিশনের দরজা ঠেলে দু-একজন নাবিক তখন থেকেই ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে। দু-একটা লাল নীল আলো তখন থেকেই জেবলে দেওয়া হয়েছে অন্ধকারকে ঠেলে দেওয়ার জন্যে।
সামনের চত্বর পার হয়ে ট্রাম লাইনের শেষ গতিরেখা। তার পশ্চিমে পাহাড় বনভূমি এবং সমুদ্র। সমুদ্র সেখানে প্রবল প্রাণবন্ত। পাহাড়টা সেখানে সোজা ওপরের দিকে উঠে গেছে—অত্যন্ত খাড়া। উঁচু মাথায় আলোঘর—সমুদ্রের উপর এখন থেকেই আলো ফেলতে শুরু করেছে।
মোবারকের একবার ইচ্ছা হল খাড়া পাহাড়টায় উঠতে। কিন্তু প্রবলভাবে মোড় দেওয়া বলে পাহাড়টার পথ কোন দিক দিয়ে কোথায় গিয়ে মিশেছে সে হদিশ এখান থেকে সংগ্রহ করা মুশকিল।
ট্রাম লাইনটা গেছে পশ্চিম হতে পুবে। বন্দরের মানুষগুলোই একমাত্র এখান থেকে ট্রামে ওঠে। পবে দু ফার্লং পথ একান্ত জনহীন। এর ভিতর কোন স্টপেজ নেই। শুধু ঢেউখেলান পাহাড়—চড়াই আর উৎরাই। নিউ-প্লাইমাউথ শহরটা পাহাড়ের কোলে ধাপে ধাপে গ্যালারির মত গড়ে উঠেছে। প্রতিটি ঘর থেকে সমুদ্রের ঢেউ আর জাহাজ স্পষ্ট। জাহাজ থেকে ফানেলের ধোঁয়া ঘর বাড়ি হয়ে এগ্‌মন্ট পাহাড়ের দিকে ছোটে এবং নিঃশেষে পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দেয় একসময়।
মোবারক এসে থামল এক ধূসর সংকীর্ণ উপত্যকায়। সে ট্রাম লাইন অতিক্রম করে দুটো পাহাড়ের ফাঁকে এসে গেল। এখানে পথ সাপের মত এঁকেবেঁকে গেছে। সে বাঁশিটা বের করে এই সংকীর্ণ উপত্যকায় পা দুটো বিছিয়ে বসল। শুকনো কাঠের উপরে বসে সামনের এক-আকাশ তারা আর শহরের প্রতি দৃষ্টি ছড়িয়ে নিভৃতে বাঁশিটা বাজাল। তারপর আবার পথ ধরে হেঁটে গেল সামনে। ইলেকট্রিকের তার মাঠের উপর দিয়ে ছায়া ফেলে ফেলে ক্রমশঃ বুঝি ওয়াইঙ্গানার দিকে চলে গেছে। সেই ছায়ায় ট্রাক্টর দিয়ে মাটিতে চাষ করছে চাষীরা। চাষীর মেয়ে-বৌ মাটি থেকে নুয়ে নুয়ে কিছু সংগ্রহ করছে। মোবারক সেখানেও হাঁটছে বাঁশি বাজিয়ে। চাষী আর ওর মেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়াল। একটি অভূতপূর্ব বিদেশী সুরে তন্ময় হয়ে শিস দিল মেয়েটি। এবং মোবারক যখন সামনের আপেল-বাগানটায় পিকাকোরা

পার্কের পথ ধরার জন্য ঢুকে গেল, মেয়েটি তখন কাঁধে তার বেলচে ফেলে এব
ইংরাজী গান ভারতীয় সংগীতের অনুকরণ করে গাইবার চেষ্টা করল।

মোবারক শুনেও যেন শুনল না। সে শোনে না। সে এমন তো কত বন্দ
দেখে এল।

পিকাকোরা পার্কে যেতে হলে দুটো পথে যাওয়া যায়। এক শহর ধরে—ফি
রয়ের বুক মাড়িয়ে। আর-এক, এই চড়াই-উৎরাই, গমক্ষেত, আপেল-বাগান এ
প্রেস-বেটেরিয়ান চার্চটা যে পাহাড়-ছাদে আছে, সেই পাহাড়-ছাদ অতিক্রম করে।

এখন সেই পথ ধরেছে মোবারক। সে নুয়ে নুয়ে বাঁশি বাজিয়ে উঠছে পাহা
ছাদে।

পাহাড়-ছাদে ওঠার পথ ত্রিশ ডিগ্রী সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের মত।
দিকে ঢালু জমি। জমিতে মসৃণ সবুজ ঘাস। সারি সারি কোরী-পাইনের বনভূমি
অনেক নীচে ঢালু জমির কোলে কোরী-পাইনের গাছগুলো সেপাইসান্ত্রীর মত সম
নগরীকে পাহারা দিচ্ছে যেন। উপরে উঠতে হলে ওদের বলে কয়ে উঠতে হবে সে
বুঝি নিয়ম।

যেহেতু বরফ ঝরে গেছে সেইহেতু কোরী-পাইনের পাতাঝরা শাখায় শাখায় নতু
কিশলয় খেয়ালখুশি মত বর্শার ফলকরেখায় প্রকাশ পাচ্ছে। পথ ধরে হেঁটে গে
অদ্ভুত এক সবুজ গন্ধ—সবুজ ঘাসের এইসব দৃশ্য মোবারককে বাঁশির ভিতর পুনরা
উন্মনা করে দিল। সে পাহাড-ছাদে উঠছে বাঁশিতে ভারতীয় হাল্কা সংগীতের সু
দিতে দিতে। নির্জন সেই কোরী-পাইনের বনভূমি ভারতীয় নাবিকের পায়ে পা
ছন্দ মিলিয়ে বুঝি শিস দিচ্ছে!

মোবারক অবাক হল এবং নীরব হয়ে দাঁড়াল পথের উপর। অনেকক্ষণ কা
পেতে সে অনুভব করতে পারল পিছনে ফেলে-আসা গমক্ষেতের সেই মেয়েটি শি
দিচ্ছে। ঠিক ওর বাঁশির সুরের সঙ্গে এক লয়ে। পথটা ইংরেজী 'S' অক্ষরের ম
পাক খেয়েছে বলে মোড়ে এসে সেই শিস পুনরায় কানে এল। এবং পেছন ঘুরতে
দেখল অনেক নীচে সমুদ্র—নীল-লাল মিশনের আলো—জাহাজ, জাহাজের ফরোয়া
পিক। পাহাড়ের আর-এক ধাপে মোটরগুলো খুব জোরে ছুটছে। ওরা নিশ্চয়
সেণ্ট ম্যারাইনে যাচ্ছে। মোবারকের তীব্র আপসোস শেখরকে সঙ্গে নিয়ে আসে নি
বলে। সে এল একা। শেখরটা কেমন যেন। একেবারেই ঘরমুখো। কেবল বই
এর উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। বড়-জোর সি-ম্যানস্ মিশন পর্যন্ত আসবে
তার অধিক নয়। তার অধিক যদিও পা বাড়ায় সে দিনে। দিনমানে তার জাহাজে
ফেরা চাই নতুবা সে মোবারকের সঙ্গে ঝগড়া করে।

মোবারক আবার ফেল্ট-ক্যাপ আর ওভার কোট টেনে-টুনে পাহাড়-ছাদের দিকে
পা বাড়ালে—শুনল, কে যেন চীৎকার করে ডাকছে ওর নাম ধরে। ডাকছে—মো-
বা—র—ক। একবার নয়, দুবার নয়, অনেকবার ডাক উঠতেই সে অবাক হয়ে
চারিদিকে চাইল ঘুরে ঘুরে। অথচ কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু মনে হচ্ছে
গলাটা কোনো মেয়ের।

সন্তর্পণে ভাল করে নজর দিয়ে ও যখন কিছু দেখতে পেল না তখন সে ভয়ে ভয়ে
যেন উত্তর করলে—কে! কে আমায় ডাকছেন?—তার সেই কথার প্রতিধ্বনি
পাহাড়-ছাদে উঠে খান খান হয়ে উপত্যকার বুকে ভেঙ্গে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে এক
ঝাঁক মেয়ে পাহাড়-ছাদের কোরী-পাইনের অন্তরাল হতে বের হয়ে খিল্ খিল্ করে

—সে উঠল। সেই একঝাঁক মেয়ের ভিতর হতে বের হয়ে এল লিলি। পাহাড়-ছাদ তে সে নেমে আসছে—ঠোঁটের ভাঁজে ওর ইংরেজী গানের এক কলি—'উই' আর ইন – সেইম্ বোট'। সে গান গেয়ে গেয়ে নীচে নেমে আসছে।

মোবারক লিলিকে দেখে যতটা অবাক না হয়েছে, তার চেয়ে দ্বিগুণ বিস্ময়ে ভার নেছে এই একঝাঁক মেয়ের হাসির বহর আর উঁকি-ঝুঁকি দেখে। ওরা তখনও খিল্ খল্ বল্ করে হাসছে, মোবারকের মনে হল লিলি নিশ্চয়ই এই এক-দঙ্গল মেয়ে নিয়ে শেরন্য পথে ওকে অনুসরণ করেছে। নিশ্চয়ই ওর সৌন্দর্যবোধকে ব্যঙ্গ করার জন্য রা অমনভাবে ওকে চমকে দিয়ে ওর গতিপথে রুখে দাঁড়িয়েছে।

লিলি নীচে নেমে তখন পথের ওপর ওর হাত ধরে বলল—এস।

সেই পাক-খাওয়া সবুজ পাহাড় পথে ওর হাত ধরে টানতে টানতে লিলি মোবারককে পাহাড়-ছাদে নিয়ে তুলল। কিন্তু আশ্চর্য হল এবারও মোবারক এই পাহাড়-ছাদে একটি দীর্ঘ কাঠের সবুজ হোস্টেল-ঘর যে আছে এবং এখানে একদঙ্গল মেয়ে সামনের প্রেস-বেটেরিয়ান মিশন স্কুলে যে শিক্ষা গ্রহণ করে, নীচে থেকে একেবারেই তা বোঝা যায় নি! এমন কি বোট-ডেক থেকে বাইনাকুলার দিয়ে পর্যন্ত একবার খুঁজে খুঁজে দেখা হয় নি।

লিলি নিজের ঘরে মোবারককে নিয়ে ঢুকল। ঘরগুলি আকারে ছোট বলে মোবারক দরজা দিয়ে ঢুকতে অত্যন্ত নুয়ে ঢুকেছে। পাহাড়-ছাদের একদঙ্গল মাউরী মেয়ে হেসেছে নিঃশব্দে ওর অবস্থা দেখে। মোবারক ঘরে ঢুকে দেয়ালে দেয়ালে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। লিলি বলল—আমি এইমাত্র মিশনে যাব ভেবেছিলাম। আজ আমার প্রোগ্রাম ছিল সাড়ে-আটটায়। কিন্তু হঠাৎ নীচে আমাদের প্রেস-বেটেরিয়ান মিশন হোস্টেলের জানলা থেকে তোমার বাঁশির সুর শুনতে পেলাম। কোরী-পাইনের ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম—তুমি ক্রমশঃ পাহাড়পথ ধরে উপরে উঠে আসছ। তোমাকে অবাক করে দেওয়ার জন্য সকলে একসঙ্গে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিলাম আর দেখছি তুমি তখন মাউথ অর্গানটা বাজাতে বাজাতে উপরে উঠে আসছ।

তারপর লিলি সব মেয়েদের প্রতি হাত তুলে বলল—এরা সবাই আমার সিস্টার। এখানে আমরা সকলে সিস্টার হওয়ার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করছি। এই বিদ্যালয়—Sisters' Training School. এখানকার পাঠ শেষ করে সবাই একদিন সাউথ আর নর্থ আয়র্ল্যান্ড-এর ছোট ছোট শহরে, গ্রামে চলে যাব মানুষের সেবার জন্য।—হঠাৎ লিলির কি মনে পড়তেই বললে—তোমার হাতটা, দেখি তোমার হাত। নিশ্চয়ই ধর নি।—কিন্তু হাতের উপর কোন dressing না দেখে সে অবাক হয়ে বলল—একি হাতটা খালি! নোংরা-লেগে বিষাক্ত হবে যে!—বসে হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে খুঁটে খুঁটে পরীক্ষা করে দেখল এবং কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল—না না অমন করে চলো না মোবারক। আমাদের এখানে যখন প্রথম পাঠ গ্রহণ করি, তখন এ কথাই বলা হয়—আমরা প্রত্যেকে প্রথম যেন নিজেদের চিনতে শিখি, নিজেদের ভালবাসতে শিখি। নিজের শরীর সুস্থ না থাকলে অপরকে কি করে সেবা করব বলো, তুমি তোমার শরীরের প্রতি অবহেলা করো না, তুমি নাবিক—বিদেশ-ভুঁইএে তোমার বাস।

শেষ পর্যন্ত লিলি আবার বললে—ছিঃ ছিঃ এতক্ষণ মোবারককে দাঁড় করিয়ে রাখলাম, এস—বোস। কফি খাবে। লিজেন, যা তো কিচেন থেকে ফ্লাস্কটা নিয়ে আয়।

মোবারক বললে চেয়ারটায় বসে—এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে না তো?

—দিচ্ছি দিচ্ছি। এলে যখন একটু বস। পরিচয় আর কি করবে? পরিচয় তো এদের তোমায় দিয়েই দিয়েছি। আমরা এখানে সবাই সিস্টার। আর তোমার পরিচয়! সে খবর তারা কালই জেনেছে।—বলে সে সাদা ভেলভেটে আবৃত একটি তাকের প্রতি চাইল। অর্থাৎ ওর অন্তরালে ভায়োলিনটা চুপ করে যেন উঁকি দিয়ে মোবারককে দেখছে। বললে—ভায়োলিনের তারটা জড়িয়ে নেওয়া হয়েছে।

মোবারক বলল—হাতটাও আমার সেরে গেছে।

লিলি সেই সময়ে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে প্রায় প্রত্যেককে একটা একটা দিয়ে নিজেও একটা ধরাল। মোবারক এক ধমক ধোঁয়া টেনে বলল—তোমাদের এ কাঠের ঘরগুলো সত্যি সুন্দর। আমার খুব ভাল লাগে।—কিন্তু আমার যে এখন উঠতে হয়—একটু পিকাকোরা পার্কে যাব ভাবছি।

—সে যাবে, আমিও না-হয় সঙ্গে যাব।

—তোমার সাড়ে-আটটায় আবার প্রোগ্রাম যে।

—সাড়ে-আটটা বাজতে এখনও বেশ দেরি।

ঘরের ভিতর দুটো লোহার খাট। খাটে সাদা তকতকে চাদরের নিভাঁজ আস্তর। ছিমছাম ঘরেব চেহারা, ঘরের সবুজ দেয়ালে সারি সারি ফটো। বিষপানে সক্রেটিসেব মৃত্যু দেখান হয়েছে—পরের ছবিটা যিশুর কবর হতে পুনরাবির্ভাবের।

মোবারক শেষে ইলেকট্রিক হিটারের পাশে টিপয়টার দিকে তাকাল। টিপয়ের উপর নীল ভেলভেটের ঢাকনা। উপরে তার কাচ-ঘেরা আলোঘর—বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিকতম উৎকৃষ্ট বাতি। এবং পাশেই, দেয়ালে ঝুলছে একটি বড় লাল ক্যালেণ্ডার। ক্যালেণ্ডারটার গতকালের তারিখের উপর একটি লাল ক্রুশের দাগ। মোবারক সেটা দেখল খুব হিসেব করে যেন—বড্ড সূক্ষ্ম হিসেবে দেখল।

কফি এল এক কাপ—কফি লিজেনই পরিবেশন করল মোবারককে। লিলি তার কোমরের সাদা এপ্রনটা খুলে রেখে বলল—পিকাকোরা পার্কের পথ এদিক দিয়ে সহজ সে তোমায় কে বলেছে?

—জাহাজের একজন উইনচ-ড্রাইভার।

প্রত্যেকেই ছোট ছোট কাপে কফি পান করছে আর শুনছে মোবারকের কথা। দেখছে মোবারকের অস্বাভাবিক দীর্ঘ দেহ, ওর গায়ের রং, ওর দেহের অপূর্ব বাঙালী চেহারার ঢং।

লিলি হিটারটা নিভিয়ে দিয়ে বলল—তোমার দেশের লোকদের সঙ্গে আমাদের মাউরীদের চেহারায় বেশ একটা মিল আছে। শুধু শরীরের দিক থেকে আমরা তোমাদের চাইতে একটু খাটো।

মোবারক হঠাৎ হেসে বলল—আর তোমাকে যদি শাড়ি পরিয়ে দেওয়া যেত তবে বাঙালী ঘরের লক্ষ্মীমেয়ের মত দেখাত।

একসঙ্গে সেই একঝাঁক মেয়ে ওর দিকে ঝুঁকে বলল—তোমাদের দেশের মেয়েরা শাড়ি পরে তাই না মোবারক?—শাড়ি পরলে দেখতে কেমন লাগে?—শেষ প্রশ্নটা করল লিজেন।

মোবারক কফিটুকু শেষ করে লিজেনের হাতে কাপ দিয়ে বলল—বাঙালীর মত লাগে, ভারতীয়ের মত মনে হয়। তারপর সে সক্রেটিসের ছবিটার প্রতি আর-একবার চেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে পা বাড়াতে চাইল সামনের চত্বরটার প্রতি। কিন্তু

লিলি বাধা দিয়ে বললে—দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমিও যাব। পিকাকোরা পার্ক ঘুরে সব দেখিয়ে শুনিয়ে তারপর না-হয় এক সঙ্গেই সি-ম্যানস মিশনে যাওয়া যাবে। কোন আপত্তি থাকবে না আশা করি।

মোবারক বারান্দায় নেমে লিলির জন্য অপেক্ষা করল। বলল—নিশ্চয়ই না। আপত্তি থাকার মত কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, বিশেষত যতক্ষণ তোমার দেশে আছি।

একসময়ে পাহাড়-ছাদ থেকে নেমে এল লিলি আর মোবারক। লিলির পোষাকে নিখুঁত পরিপাট্য—নীল ডোরা-কাটা স্কার্ট, রক্তলাল ফুল ছাপের ব্লাউজ, কাঁধে ঝুলান ফারের ঘি-রঙের কোট—মাথায় ধূসর পালকের টুপি, জুতোর হীলদুটো ওর নিতম্বকে খাড়া করে রেখেছে।

এই পাহাড় আর সামনের একটি সংকীর্ণ উপত্যকা পার হলেই পিকাকোরা পার্ক। পার্কের নামডাক প্রচুর। নিউজিল্যান্ডে কোন বিদেশী গেলে প্রথমেই কোন দর্শনীয় বস্তু হিসাবে পিকাকোরা পার্কের নাম উল্লেখ করা হয়। মোবারক সেই পার্ক দেখতে যাচ্ছে।

পথে লিলি মোটামুটি একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা পিকাকোরার উপর করে ফেলেছিল। ওরা কোথায় বসে একটু বিশ্রাম করবে, কোন্ গাছটা দু হাজার বছরের—ঝিলের উপর কটা স্কীপ, স্কীপগুলো ভাড়া করে বেড়াবে কি বেড়াবে না, নৌকা-বিলাসে কত খরচ তারি মোটামুটি একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে করতে একসময় উপত্যকাটা পার হয়ে এল।

লিলি বলেছে—এমন পার্ক হয়তো তুমি কোথাও দেখতে পাবে না।

মোবারক উত্তর না-করে শুধু হেঁটে হেঁটে গেছে।

পিকাকোরায় ঢুকে তার মনে হল—তার চিটাগাং দেশের পার্বত্য অঞ্চলের অযত্নে বর্ধিত অবিন্যস্ত বন। কোথাও তার সংকীর্ণ পথ আছে। কোথাও পথের নিশানা নেই। বিরাট বিরাট কোরী-পাইনের তলায় হাজারো আগাছা, আগাছার বুকে নীল হলুদ ফুল, ফুলের গন্ধে নেশাগ্রস্ত হয়ে যেন মেয়েটা মোবারকের হাত ধরে চলেছে। সেই বনভূমিতে দশ গজ অন্তর বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে বিংশ শতাব্দীকে সজাগ করে রেখেছে।

আগাছার মাথা ভেঙে মোবারক আর লিলিরু পথ করে চলেছে। জোড়ায় জোড়ায় অমন কত মানুষ রাতের নিভৃতে বন্য প্রেমে মশগুল। ওরা বিচিত্র রকমের আলাপ করছে বন্য ছায়ার অলিতে-গলিতে। মোবারক আর লিলি ওদের প্রতি চোখ না তুলে সেই ছোট্ট ঝিলটার সামনে এসে দাঁড়াল। ঝিলের উত্তর তীর ধরে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে জলে। ছোট ছোট স্কীপ কিনারায় বাঁধা। উত্তর তীরেই রয়েছে রেষ্টরুম। বারান্দায় রয়েছে গোল টেবিল। ওখানে কজন সাহেব-মেম বসে গল্পগুজব করছেন আর বোতলের মদ গলায় ঢালছেন। নীচে বৃত্তের মত গোল করা শৌখিন বাগান। বাগানে মৌসুমী ফুলের চাষের জন্য মাটিগুলোকে ভুর ভুরে করে রাখা হয়েছে।

মোবারক আর লিলি বসল সিঁড়ির রকে, স্কীপের উপর একটা পা রেখে।

লিলি ছোট স্কীপটার গলুইয়ে পা নাচিয়ে বলল—চল না মোবারক স্কীপে সামনের পাহাড়টায় ঘুরে আসি। বেশ আনন্দ পাবে।

মোবারক বললে—আজ না আর-একদিন।—শেষে বললে—এই তোমার পিকাকোরা

পার্ক।

—কেন তোমার ভাল লাগে নি!

—সে কথা বলেছি?

—তবে?

—রাতে ঘোরার পক্ষে এ নেহাৎ মন্দ জায়গা নয়।

—এর অর্থ?

—অর্থ সহজ। কোন জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই। আমার দেশে এমন জঙ্গলে রাতের বেলায় ঘুরতে হলে খুব বিপদ হতে পারে।

—তোমার দেশ বিচিত্র।

লিলি ঝিলের পাড় ধরে যাবার সময় বললে—আমার যেতে ইচ্ছে নেই। কিন্তু এখন না গেলে সাড়ে-আটটার প্রোগ্রাম ধরতে পারব না। তুমিও চলো সঙ্গে।

—পার্কটা আর-একটু ঘুরে দেখব ভাবছিলাম।

—আজ চল।—কাল দেখবে। আমিও আসবো তোমার সঙ্গে।

কি ভেবে মোবারক বলল- বেশ তাই চল। নয় তো আবার কোথায় জঙ্গলে হারিয়ে যাব তারপর আর হয়তো খুঁজেই পাবে না।

লিলি হাসল। মোবারকও হাসল। পিকাকোরা পার্কের শেষ মাথায় এসে মোবারক পুনরায় বাঁশিটা বের করল প্যান্টের পকেট থেকে। এখান থেকে শহর আরম্ভ।

লিলি মোবারকের ডান হাতটা নিজের নরম হাতের ভাঁজে এনে বললে—ফিজরয়ের ট্রাম ধরব, সময় কম লাগবে আমাদের।

মোবারক দ্রুত হাঁটতে লিলি বলল—একটু আস্তে চলো, তোমার সঙ্গে হেঁটে যে পারছি না।

—এসো। আস্তেই হাঁটছি। ওখানটায় কি হবে? অনেক লোকজন কাজ করছে একসঙ্গে।—একটি মাঠের দিকে নির্দেশ করে মোবারক প্রশ্ন করলে লিলিকে।

—কুইন এলিজাবেথ কমনওয়েল্‌থ টুরে এখানটায় আসছেন।

—কবে?

—তা প্রায় ধরো আরো একমাস।

—এত আগে থেকে!

—অনেক খরচপত্তর হবে। গোটা শহরটাকে ইন্দ্রপুরী করে তুলবে; তাই এত আগে থেকে প্রস্তুতি। শহরের কোন খুঁত যেন অতিথির চোখে ধরা না পড়ে।

—কুইনকে হয়তো দেখার সৌভাগ্য আমার হবে না।

—কেন, কেন?

—তার আগেই হয়তো জাহাজ ছেড়ে দেবে।

—তার আগেই দেবে!—কথা বলতে যেয়ে লিলির গলাটা হঠাৎ খুব ভারি হয়ে উঠল। চলতে চলতে আবার সে বললে—আচ্ছা মোবারক এই যে দুদিনের পরিচয় আমাদের সঙ্গে তোমাদের হয়, তোমরা যখন চলে যাও তখন কষ্ট হয় না?

এমন একটা প্রশ্ন লিলির, যার সহজ এবং সত্য উত্তর 'হয় না'। তবু মোবারক অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলল—হয় এবং সহ্যও করতে হয় তা। তার জন্যই আমরা জাহাজী, আমরা নাবিক। পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে আমাদের এমন ঘটে। তার জন্য তোমাকে দেখার সঙ্গে কত মেয়ের মুখ যে মনে পড়ে। উইলিয়ামের স্ত্রীকে মনে

পড়ে, এডিস-ডি-কেলী, ডিয়েনা সকলকে এমনি বন্দরে বন্দরে রেখে এসেছি—জাহাজ ছাড়ার সময় অন্য নাবিকের কেমন হয় বলতে পারি না, আমার কিন্তু খুব কষ্ট হয়েছে তাদের জন্য। তাদের দেখেছি বন্দরে দাঁড়িয়ে জাহাজ ছাড়ার সময় হাতের রুমাল উড়িয়ে দিতে। আমাকে অভিনন্দন জানাত দুটো হাত নেড়ে। বলত—আবার যখন আসবে আমাকে চিঠি দিয়ে আসবে কিন্তু। তোমার জন্য আমি জাহাজ ঘাটায় অপেক্ষা করব। এমন অনেক বন্দর আছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বার যেখানে হয়তো ...্যর আর যাওয়াই হবে না।—কথা শেষ করে মোবারক মাউথ-অর্গান বাজাল। নিজের দুঃখ ঢেকে রাখার জন্য ছুটে নেমে গেল। লিলিকে ছুটে ছুটেই প্রায় আসতে হয়েছিল সেই সময়।

ট্রামে উঠে জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে লিলি। ট্রামের যাত্রীরা মোবারককে তখন দেখছে। দৃষ্টিতে বিস্ময়। ওকে খুঁটে খুঁটে নিরীক্ষণ করছে। এমন কি দু-একজন উঠে ওর কাছে এসে বসল। শুধাল, নাম? দেশ? কি করা হয়?

মোবারক মোটামুটি তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চুপ করে গেল একেবারে। লিলি মাঝে মাঝে বাইরে আঙুল দেখিয়ে বলছে ওকে—এটার নাম এই, পথের নাম এই, এখানে পোষ্টাপিস আছে, দূরের ওই যে বাড়িটা দেখছ ওটা কলেজ। এটা মিউজিয়াম। একদিন তোমায় সব দেখিয়ে নিয়ে যাব।।

মোবারক কখনও শুনছে কখনও শোনে নি। কখনও বাঁশি বাজানর শখ জন্মেছিল ওর। কিন্তু এই একদল যাত্রীর সামনে সে কেমন লজ্জিত, কুণ্ঠিত এবং সংকুচিত। তাই সে লিলির পাশে আরো ঘেঁষে বসল। লিলি যেন সমস্ত বিপদে তার সহায়।

মোবারক ট্রামের জানালায় মুখ রেখেছে। ট্রামের গতির সংগে ফিজরয় আর লিলির জগৎকে অতিক্রম করে সে বিচরণ করছে তার নিজের জগতে—সেখানে রয়েছে তার বাপজী, আম্মাজান, নানা জসীমউদ্দিন সারেং, জৈনব খাতুন। পৃথিবীর ভাল কিছু দেখলেই মনে হয়, ওর শামীনগর, শামীনগড়ের মাঠ—তার সড়ক, কাঠের পুল, কর্ণফুলীর বাঁওড়। বন্দরের অপরাধ-প্রবণ জীবনটা দেখলেও মনে হয় বাপজী আম্মাজান—। অথচ শামীনগড়ের জগৎ স্মরণের সংগে সংগে মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। চোখদুটো ক্লান্ত—অসহায় এবং নালিশ জানাবার একান্ত আগ্রহ জন্মে। কিন্তু কাউকে বলতে পারল না বলে, কাউকে তার বিগত জীবনের ইতিহাসটা প্রকাশ করা হয়ে উঠে নি বলে বিষকুম্ভের মত সে জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছে নিজের আত্ম-যন্ত্রণায়। এই যন্ত্রণা ঠেলে থাকার জন্যে সে ভালবেসেছে তার বাঁশিটাকে আর শংখচূড় সাপটাকে। যখন মনের ভিতর সমস্ত পৃথিবীকে বেইমান বলে মনে হয় তখনই ব্যাগ থেকে সাপটাকে টেনে বার করে এবং ডেকের উপর কিংবা বন্দরের পথে সাপ নাচিয়ে নিজের আত্ম-যন্ত্রণাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে। অথচ শেখর তা বুঝল না।

ফিজরয় অতিক্রম করে ট্রামটা ডান দিকে একটি বাঁক ঘুরল। তারপর সামনের দিকে অর্থাৎ সি-ম্যানস মিশনের প্রতি। নীচে বেলাভূমি। কার্নিভালের খালি দোকান-পাট এবং উপরের দু-চারটা অসংলগ্ন কাঠের ঘর, ঘরের জানালায় বিদেশিনীর মুখ, মেঝের উপর দু-একটি ফুটফুটে ছেলের দৌরাত্ম্য। শিশুদের দেখলে মোবারক হাসে—নিজের জগতে ফিরে আসার পথ খুঁজে পায়? সে প্রশ্ন করল তাই লিলিকে—তোমাদের বাড়ি কি নর্থ আয়ারল্যাণ্ডে?

—একথা কেন মোবারক?

—হোস্টেলে থাক বলে বলছি।

—ফিজরয়ে আমার বাড়ি। সেখানে মা আছেন।

—বাবা ?

—নেই, আমার শিশু বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মোবারক কথা শুনেই খুঁটে খুঁটে লিলিকে দেখল। উত্তরটা ওর কাছে বেখাপ্পা ঠেকছে—মা আছেন বাবা নেই !—শিশু বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ক্রমশ ওর নাকটা এবার কুষ্ঠব্যাধির রুগীর মত দু-দুবার ফুলে উঠে আবার সংকুচিত হল। মোবারক বলল—তিনি আবার বিয়ে করেছেন নিশ্চয়ই।

—না, বিয়ে তিনি আর করেন নি। করবেন না। আমার মাকে দেখলে তুমি সে কথা বিশ্বাস করতে পারবে।

—সেখানে তোমার ছোট ভাই কিংবা অন্য কেউ আছে ?

—একমাত্র আমিই তাঁদের সন্তান। তুমি যাবে আমাদের বাড়িতে ? চল না কাল। তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে পরলে মা খুব খুশি হবেন।

মোবারক চুপ করে থাকল। আম্মাজানকে মনে পড়ছে। শামীনগড়ের সড়ক পার হয়ে টিন কাঠের ঘর, আম্মাজানের আয়ত চোখ আর নাকের সরু নথটা বাঁশ-পাতার মত কেঁপে কেঁপে কিসের ইসারা দিচ্ছে যেন।

মোবারকের একরাশ-লোমে আবৃত্ত হাতের কব্জিতে লিলি নিজের নরম আঙুল-গুলি স্পর্শ করে করে বলছে তখন—যাবে তো কাল ? চল না মা খুব খুশী হবেন।

মোবারক তেমনি মুখ রেখেছে জানালায়। সিম্যানস মিশনের প্রতি গাড়িটা কত বেগে যে ছুটেছে তাই যেন মুখ বাড়িয়ে দেখছে। শীতের কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার ভিতরেও ওর কপাল ঘামছে।

লিলি বলল—তোমায় আমি নিয়ে যাব কাল।

—না না নিয়ে যেতে হবে না। মোবারক চীৎকার করতে যেয়েও কেমন নিজেকে দৃঢ়ভাবে সংযত করে নিল এবং লিলির মুখ থেকে চোখ নামিয়ে ট্রামের সমস্ত মেয়ে পুরুষের প্রতি দৃষ্টি দিতেই দেখল সবাই হাঁ করে চেয়ে আছে—ওর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী আর দৃঢ় বলিষ্ঠ মুখের বিকৃত রূপের কোন সুপ্ত আত্মচিন্তার কথা ওরা সন্তর্পণে শুনছে।

এমন সময় লিলি কথার মোড় ফিরিয়ে বলল,—মোবারক আমার দেশ তোমার কেমন লাগে ?

—ভাল। বেশ লাগে।

ইতিমধ্যে ট্রাম ছোট ছোট দুটো চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করেছে। বন্দর-পথ এসে মিশেছে চড়াই-উৎরায়ে। সঙ্গমস্থলে প্রকান্ড গেট। ছাদে তার একটি ক্রাউন—কাগজ আর ইলেকট্রিক ভাল্বে তৈরী। ক্রাউনের দু পাশে দুটো প্রকান্ড পিচবোর্ডের সিংহ থাবা উঁচিয়ে জাহাজগুলোকে যেন দেখছে। কুইন এলিজাবেথ আসছেন, প্রথমে তিনি এই সদর দরজা দিয়ে বন্দর পথে শহরে ঢুকবেন। তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজনে এই সব করা হয়েছে।

লিলি সিংহ দুটো দেখে প্রশ্ন করলো—মোবারক তোমার দেশে সিংহ পাওয়া যায়। তুমি সিংহ দেখেছ ?

—দেখেছি।

—বাঘ ?

—চিটাগাংগে অনেক বাঘ। সুন্দরবন থেকে—রয়েল বেঙ্গল টাইগারের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ?—দয়া করে তারাও এসে মাঝে মাঝে আমাদের অঞ্চলে করুণা করেন। সুতরাং বাঘ থেকে গ্রামকে রক্ষা করার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই প্রায় বাঘ শিকার করতে যেতে হত।

—তারপর?

তারপর মোবারক তার নিজের জীবনের এক আশ্চর্য বাঘশিকারের কাহিনী লিলিকে বললে, ট্রামের মেয়ে-পুরুষেরা পর্যন্ত--শুধু আশ্চর্য হল না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে দেখে নিজেদের মধ্যে কিছু যেন বললে।

লিলি সে সময় প্রশ্ন করলে—সত্যি বলছ?

—মোবারক মিথ্যা বলে না, বলে কোট খুলে ফেলল এক টানে, প্যান্টের ভিতর থেকে জামাটা টেনে তুলে দেখাল পিঠের ক্ষত স্থানটি। সঙ্গে সঙ্গে ট্রামের মেয়ে-পুরুষেরা সব এসে ঝুঁকে পড়েছে ওর পিঠের উপর। দেখছে বিস্ময়-ভরা দুটো চোখ মোবারকের পিঠে এক আঁজলা মাংস নেই।

লিলি তাড়াতাড়ি ওর জামা টেনে পিঠটা ঢেকে দিল। বললে—তুমি আশ্চর্য মোবারক। তোমাকে তার জন্য পিঠ খুলে নজির দিতে বলি নি।

মোবারক সেই শুনে কেমন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। আবার তাকে অত্যন্ত অসহায় মনে হচ্ছে।

লিলি হেসে বললে—হয়েছে থাক, অমন করে আর চেয়ে থাকতে হবে না। কিন্তু দেখবে নামার সময়, হুঁশিয়ার হয়ে নামবে· মাথা যেন ছাদে না ঠেকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা ঘটবার ঘটল। মোবারককে নামবার আগে অত্যন্ত অন্য-মনস্ক মনে হয়েছে। এবং সতর্ক হয়ে বেঞ্চ থেকে না উঠার জন্য ওর মাথাটা ধাক্কা খেয়েছে রডে। রডের জয়েণ্ট ছুটে গেল। মোবারক চেয়েছে ফ্যাল ফ্যাল করে ওপরে। ওর নরম মন লজ্জিত হল। ওর-বেহুঁসের জন্য এমন হয়েছে। তাই বললে কনডাক্টারের প্রতি—আমি এর খেসারত দিচ্ছি—দয়া করে আপনি নিন। আমার অপরাধ হয়েছে।

লিলি দু হাতে ওর মাথাটা কাছে টেনে বলল—দেখি—দেখি, আগেই বলেছি এমনটা হবে—আমার কথা তো তখন খেয়াল করলে না।

—না না তেমন কিছু হয় নি। তুমি আমায় বিশ্বাস কর।--কনডাক্টারের প্রতি আবার চেয়ে বলল—আমার খেসারতটা? পাউণ্ড তিনেক দিলে নিশ্চয়ই চলবে।

কনডাক্টার হেসে উঠল। বললে—ধন্যবাদ। পাউণ্ড তিনেক দিয়ে ডাক্তার দেখান হোক। মাথায় আপনার নিশ্চয়ই চোট লেগেছে। অপরাধ কোম্পানীর—রডটা আরো উপরে ঝুলান উচিত।

—আমার কিন্তু তেমন কিছু হয় নি। বলে সে কনডাক্টারের প্রতি পিঠের আঘাত দেখানর মত মাথা দেখাবার প্রচেষ্টা করতে গেলে, লিলি তার হাত টেনে বলল—এস নামবে। আমরা এসে গেছি মিশনে।

মোবারক সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সময় শুনল কথাটা। লিলি কথাটা শুনে মোবারকের প্রতি আকৃষ্ট হল আরো তীব্রভাবে। ট্রামের মেয়ে-পুরুষরা বলছে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়—ইণ্ডিয়ান, এ ম্যান অফ্ মিস্টিক ল্যাণ্ড।

মোবারক ফিরছে জাহাজে। একা। শেখর আজ সি-ম্যানস মিশনে যায় নি, নিশ্চয়ই

এখন সে বাংকে শুয়ে বই পড়ছে ফিরিঙ্গীদের। বিদেশ-বন্দরে নেমেই ওর ফিরিঙ্গীদের বই কেনার বাতিক। সফরের অর্ধেক পয়সা বই কেনার পেছনে খরচ করছে। বড় মালোম থেকে জাহাজের সব অফিসারগুষ্টি ওর থেকে বই চেয়ে নেয় পড়ে। আবার ফিরিয়ে দেয়।

মোবারক কাঠের সিঁড়ি ধরে ডেকে উঠছে। গ্যাংওয়েতে ঝিমোচ্ছে কোয়ার্টার মাস্টার। একগাল দাড়ি আর ভুরুর ভিতর চোখদুটো ওর জুতোর শব্দে সজাগ হল একটু নড়ে চড়ে বসল। আল্লা আল্লা করে মুখের কাছে তুড়ি দিল হাতে।

মোবারক বললে—চাচার ঘুম পাচ্ছে।

—হাঁরে বাজান, বুড়া যানে আর সহ্য হয় না।

জাহাজ নিশ্চুপ। ফল্কায় ফল্কায় ইতস্তত আলো জ্বলছে। ফল্কার উপর কাঠ বিছান। তারপরে ত্রিপল বিছান। কিনারায় লোহার পাত, খিল-আঁটা। আগামী দশ দিনের মত জাহাজের মাল-খালাস বন্ধ। ক্রিস-মাস-ডে। তাই কোন শ্রমিকই কাজ করছে না বন্দরে। বন্দরে ক্রেনগুলো জাহাজে ছায়া ফেলে ভূতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফল্কার সমান্তরাল করে ফুট দুই উপরে ডেরীকগুলো পাতা। উইনচ মেশিনের উপর দিয়ে দুটো ছায়া গেছে বয় কেবিন পর্যন্ত। সে দুটো ডেরিকের ছায়া।

মোবারক দাঁড়াল ডেকে। বন্দর-জুড়ে হাল্কা কুয়াসার রং দেখল। ব্রিজে দু উইংসে কোন আলো জ্বলছে না। ইঞ্জিন রুম থেকে ব্যালেস্ট পাম্পের খট্ খট্ বিকৃত শব্দ কানে বাজছে শুধু।

সে ডেক পার হল। গ্যালী অতিক্রম করে বাঁ দিকে ঢুকে সিঁড়ি ধরে নীচে নাবল। স্টাবোর্ড আর পোর্ট সাইডের ভিতর কোন কেবিনেই যেন কোন শব্দ উঠছে না।

সিঁড়ির শেষ ধাপের পোর্ট সাইডের আলো নেভান। পথ অন্ধকার। কেবিনে ঢুকতে সন্তর্পণে পা ফেলছে মোবারক।

শেষ কেবিন থেকে একটি আশ্চর্য সুর তিন নম্বর কেবিনে ভেসে এল। নিশ্চয়ই এত রাত্রে কেউ কোরান পড়ছে বাংকে। যেমন শেখর বই পড়ছে বুকে কম্বল টেনে দিয়ে।

সিঁড়ি দিয়ে আরো দু-একটি পায়ের শব্দ কানে এল মোবারকের। সে কেবিনের দরজা খুলে আলো জ্বেলে দিতেই চোখ ঝলসে উঠল ওর। ডেক জাহাজী বড় ট্যান্ডেল একটি মাউরী মেয়েকে ধরে এনেছে রাতযাপনের জন্য।

ডেক বড় ট্যান্ডেল সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে কেমন অলস পা ফেলে। সে মদ টেনেছে প্রচুর। মেয়েটাকে জড়িয়ে সে তার কেবিনে ঢুকে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে স্তিমিত গোঙানি মোবারকের কানে ভেসে আসছে। সে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখল শেখরের মুখের উপর বই। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। দুটো হাতই হিমে শীতল। কম্বলটা টেনে দিল বুক থেকে গলা পর্যন্ত। মুখ থেকে বইটা তুলে বাংকের ফাঁক দিয়ে পড়ে থাকা দুটো হাত তুলে এনে কম্বলের নীচে রাখল। তারপর লকার খুলে প্রতিদিনের মত খানা বের করে বাংকের উপরে বসল। কাচের গ্লাসের এক গ্লাস জল দরকার। নুন শেখর নীচে লকারের এক কোণায় রেখে দিয়েছে। সে থালায় দেখল দুটো মাছ ভাজা রয়েছে। একেবারে সমান ভাগ। চারটা স্যালমনের দুটো ওর জন্য ভেজেছে।

পরিমিত হাসি মোবারকের ঠোঁটে। ভাত খেতে খেতে শেখরের প্রতি চোখ তুলে দেখছে—দুটো চোখে ওর গভীর ঘুম। এমন ঘুম মোবারকেরও এককালে ছিল। শামীনগড়ে ছোট্ট এক উঠোনে যখন রাঙা মোরগ ডেকে উঠত—এক ঝাঁক শালিখ ঠোঁট শুঁকে কিচ্ কিচ্ করত কামরাঙ্গা গাছে—যখন আম্মাজান ভোরের আহ্বান শুনতেন গাঁয়ের মসজিদে তখনই তিনি ডাকতেন—মোবারক ওঠ। মবু আমার ওঠরে। ভোর যে হল।—যখন রোদ কামরাঙ্গা গাছের ছায়া উঠোনে ফেলত তখনও ডাকতেন তিনি—মবু বাপ তুই আমার এখনও ঘুম থেকে উঠলি না! বেলা যে অনেক হল, ওঠ, উঠে পড়তে বোস। তোর বাপজী সফর থেকে ফিরে যখন শোনবেন তুই পড়িস না—তখন যে তিনি দুঃখ পাবেন।

শেখরের মুখ অত্যন্ত নিষ্পাপ ঠেকে। তবু ইদানীং সে বলে—মোবারক আর পারছি না। কতকাল হল যেন দেশ ছেড়ে এসেছি। অঠারো মাস সফরে বিরক্ত হয়ে গেছি। কি হবে—কবে যাব কিছুই তোরা বলতে পারছিস না।

সে কি বলবে! সে কি জানে জাহাজের পরবর্তী সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে! ক্যাপ্টেন নিজেও হয়তো বলতে পারবে না। সে খবর শুধু দিতে পারে কোম্পানীর এজেন্ট অফিস। কিন্তু অফিসে আজও লোক গেছে, অথচ কোন খবর নেই।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলেও মোবারক বসে থাকে। ঘুমের জন্য বসে থাকে। শরীরটা বসে বসে ক্লান্ত না হলে ওর ঘুম আসে না। অনেব সমস্যা এই জাহাজীর। লিলি নিশ্চয়ই এতক্ষণে তার পাহাড়-ছাদে স্কুল হোস্টেলে ফিরে গেছে। শেখরের মতই হয়তো এক ঘরের মেয়ে লিজেন পেতে রেখেছে বিছানা। সাদা ধবধবে বিছানায় লিলিরা এখন শুয়ে পড়বে।

দেশের মেয়ে জৈনব খাতুন বলেছে এককালে নে না। নিয়ে দেখ না হাতে, বাপজী কেমন চীজ ধরে এনেছে কর্ণফুলীর বাওড়ের ভাঙ্গন থেকে। ভয় নেই, ভয় কিরে! বিষদাঁত ওর ভেঙ্গে দিয়েছি। তোর হাতে বনজ বাঁধা। ডর কিসের তবে।

—ডর নেই বলছিস?—অন্ধকারে জৈনব খাতুনের মাথার উপর মুখ রেখে বলেছে। ওর চুলের সোঁদা গন্ধ মোবারকের নাকে কত বছর পরে এখনও যেন ঝাঁঝ দেয়। মেয়েটা হাত বাড়িয়ে বলত অন্ধকারে—নে ধর। তোর আর আমার সাদীর রাতে ওকে মাঝখানে পাশ বালিশের মত শুইয়ে দেব। ছোবল দেবে তোরে আর আমারে। ছোবল নয়, চুমো খাবে।

মোবারকরা সাতপুরুষ নাবিক।

জৈনব খাতুনরা সাতপুরুষ বেদে। ওরা ঘর-বেদে। ওর বাপজী ওঝা। সাপের মন্ত্র পড়ে—বিষদাঁত উপড়ে দেয় সাপের। সাপে-কাটা মড়ার বিষ নামায় মা মনসার উপর খিস্তি করে। খিস্তি করা ওদের স্বভাব। সে স্বভাব জৈনব খাতুনকেও পেয়ে বসেছিল।

দুটো বাড়ি। একটি হরীতকী গাছ বাড়ি দুটোর সীমানা। সে গাছের ছায়ায় দুজনে একত্র হত রাত্রে। কত কথা হত দুজনে। সাদীর পর ওরা কে কাকে প্রথম বুকে টানবে সেই নিয়ে কথা হত। এ ব্যাপারে মোবারকের লজ্জা ছিল—কিন্তু জৈনব খাতুন কেমন নির্লজ্জ আর স্বাভাবিক। জৈনব জেনেছে ছোট বয়স থেকে সাদী ওর মোবারকের সঙ্গে হবে। আম্মাজান বলতেন—তোর বাপজীরও এই ইচ্ছা ছিল।

এক টুকরো গভীর অন্ধকার। হরীতকীর ছায়া পার হলে অন্ধকার ধূসর। সে অন্ধকারে পথ চেনা যায়। সামনা সামনি এলে লোক চেনা যায়—পথে কিছু পড়ে

থাকলেও অনায়াসে সমঝে নিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু গভীর অন্ধকারে জৈনবের দেহ ছিল ছায়াশূন্য। শুধু ওর ফিস্ ফিস্ কথাগুলো মোবারকের কানে আসত। শামীনগড়ের গ্রাম তখন ঘুমিয়ে থাকত। শুধু কর্ণফুলির বাঁওড়ে মাঝে মাঝে ঘণ্টা পড়ত মিশনারীদের চার্চে। ঘণ্টার শব্দ হত ঢং ঢং। মোবারক বলত তখন—রাত অনেক হল।

জৈনব খাতুন বলেছে—ভারি একটা রাত রে আমার। এখন রাত না জাগতে পারলে সাদীর পর রাত জাগবি কী করে। তখন যে তোরে ঘুমুতে দিচ্ছি না রে মবু। তুই যে আমার দিলের সব দুনিয়া জুড়ে পড়ে আছিস।

তারপর দুজন ফিরত দুই বিপরীত মুখো ঘরে। মোবারক পায়ে পায়ে হেঁটে আসত। দরজা খুলে সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে আম্মাজানের পাশে শুয়ে ভাবত—জৈনব ঘরে ফিরেছে, এখন হয়তো শুয়ে পড়েছে নিজের লাল কাঁথার বিছানায়। নিশ্চয়ই সে ঘুম যাচ্ছে খুব। সে এককাল ছিল বটে। ঘুমে ক্লান্ত। বিছানা ছাড়তে দুঃখ। আম্মাজান কেবল ডেকে ডেকে সারা হতেন—ওরে মবু ওঠ, কত আর ঘুমুবি।

তেমন ঘুম আর চোখদুটো এখন ঘুমোয় না, গভীর ঘুম চোখ থেকে নাবিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরে দাঁড়িয়েছে। কোন হাল্কা আওয়াজ পেলেই অবচেতন মন যেন বলে, না আর ঘুম নয়। মাঝে মাঝে মোবারকের ভয় হয়, ঘুম যদি রাতের অন্ধকারে চির দিনের জন্য বিদায় চায়? তখন? তখন কি হবে! নিশ্চয় শেখর তিরস্কার করবে—বলবে: সে তো বুঝবে না সব। মোবারক মাটির গন্ধ ছেড়ে কেন জাহাজী হল, জাহাজী জীবনে কি করে তীব্র অনুশোচনায় এবং সূক্ষ্ম জীবনবোধের দংশনে সে জ্বলছে—শেখর একটু ভেবে যদি কোনদিন কোন প্রশ্ন করে একবার বলত—মাঝে মাঝে তুই সহসা হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে কি ভাবিস বলত?—তা সে বলে নি, ওর স্বরে শাসন নতুবা করুণা। দরদ কিংবা আন্তরিকতা দিয়ে সে কোনদিন প্রশ্ন করতে পারল না মোবারককে।

অন্ধকারের এক কোণে লেদার ব্যাগে শঙ্খচূড়। ব্যাগের দ্বিতীয় ভাঁজে বার ফিটের লম্বা সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে হিস্ হিস্ করছে, সর্পভুক সাপ খানা খেতে চায়—গোমাংস দিনের পর দিন খেয়ে ওর অরুচি ধরেছে।

মোবারক বাংক থেকে উঠে দু টুকরো গোমাংস ব্যাগের ভিতর ঠেলে দিল। তারপর ব্যাগের মুখ বন্ধ করে বাংকে বসতেই মনে হল প্রথম যেদিন রাতে ওকে সাপটা দেখিয়ে জৈনব খাতুন হরীতকীর ছায়ায় দাঁড়িয়ে বলেছিল—দেখেছিস শঙ্খচূড়ের বাচ্চাটা কেমন হলুদ রং।

মোবারক বলেছে—তোর গায়ের মত।

—পেটের দিকটা দেখেছিস কেমন সাদা?

—অর্থাৎ আমার মত রং ওর। —মোবারক নুয়ে অন্ধকারে সাপের উপর সন্তর্পণে হাত চালিয়ে বলত, বাচ্চা বলে—দেখবি এটা নিশ্চয়ই পোষ মানবে।

—পোষ মানবে ঠিক তোর মত, তুই যেমন আমার পোষ মেনেছিস। তারপর হঠাৎ আবার মোবারকের হাত টেনে বলত জৈনব—তুই এটা নিবি—বাচ্চা আছে, যখন। তুই তো বাপজীকে একটা সাপের জন্য কত বলেছিস! কিন্তু দেয় নি। ভয়ে দেয় নি কোনদিন বিষ-দাঁত উঠে আবার কামড়ে দেবে সেই ভয়ে। আমি তোকে পোষ মানিয়েছি, তুই এটাকে পোষ মানা—দেখি তোর কত মুরদ।

মোবারক হরীতকী গাছের অন্ধকারে ফিস্ ফিস্ করে বলেছে—তোর বাপজী

রাগ করবে না তো?

—না রে—না। বলব ঝাঁপি খুলে সাপটা কোথায় যে গেল!

—কিন্তু আম্মাকে না বললে যে চলে না।—ততোধিক সংকুচিত হয়ে জবাব দিয়েছে মোবারক।

—তাহলে আম্মাকে বল, বুঝলি! কাল রাতে না হয় আবার আসব এই অন্ধকারে। বলবি কিন্তু—বুঝলি! তুই বাপজীকে রোজ রোজ সাপের জন্য জ্বালাতন করে থাস—একটা সাপ পোষার শখ তোর, তাই এটা দিচ্ছি। মনে রাখিস স্রেফ কথা বলে দিচ্ছি—এ সাপটা আমার—বাপজীর কাছ থেকে আজ এটা চেয়ে নিয়েছি। আমার শখের জিনিষ তোরে দিলাম, আমার মত একে ভালবাসবি কিন্তু।

বাংকে মোবারক তখন কম্বল টেনে শুয়ে পড়েছে। মাথার উপরে বাতির বাল্বে পাক খাচ্ছে উড়ন্ত তিন-চারটে পোকা। যেমন এই জাহাজটা আবর্তন করছে পৃথিবীকে। ওরা পোর্ট-হোল দিয়ে উড়ে এসেছে ভিতরে। ওদের মৃত্যু আসন্ন।

শংখচূড়ের রং বদলালো অদ্ভুতভাবে। প্রথমে ছিল ওর হলদে রং। দিন যাওয়ার সঙ্গে ওটা বাদামী রঙে বদলে গেল। এখন এর কালো রং। শীতের বিষে সাপটা বুঝি জর্জরিত। মাঝে মাঝে সে এখনও রং পাল্টায়। শীতের বন্দরে একরকম, নিরক্ষরেখীয় অঞ্চলে খয়েরী আবার আফ্রিকার কেপটাউন বন্দরে একেবারেই যেন সাদা হয়ে গেল। এই পরিবর্তন দেখে জাহাজীরা অবাক হয়েছে—কিন্তু মোবারক হয় নি। ছ'সাত সফর ধরে সাপের রং পাল্টান দেখে তার অরুচি ধরেছে এখন।

তারপর মোবারক পাশ ফিরে শুয়ে কম্বল টেনে দিল মুখে। স্টারবোর্ড সাইডের কেবিন থেকে সেটার-রুমের বাঁক ঘুরে ভেসে আসছে এখনও একটি স্তিমিত গোঙানি। হয় মেয়েটা গোঙাচ্ছে, নয় তো ডেক-বড়-ট্যাণ্ডেল। দুজনেই মদে মাতাল এবং স্থবির। যখন মেজাজ ফিরবে তখন সে নিশ্চয়ই চীৎকার করতে শুরু করবে তার মেয়েটা ফাঁক বুঝে বাথরুমে যাবার নাম করে ডেক অতিক্রম করে জেটিতে নেমে পড়বে।

মোবারক আবার পাশ ফিরে শুল। কম্বলটা এবার মাথা পর্যন্ত ঢেকে নিয়েছে। কোন শব্দ যেন কানে না আসে। তারপর হাতের কনুইয়ের ভাঁজ চোখের উপর রেখে সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিন্তা থেকে মুক্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাইল বালিশে মুখ চেপে। ঘুম আসছে না—কাল রবিবার। কার্নিভাল জমবে সমুদ্রের বেলাভূমিতে। এইচ. জি. বুচারের মদের দোকানে লিলি অপেক্ষা করবে তার জন্যে—সে যেন খুব তাড়াতাড়ি কাল বের হয়।

জৈনব খাতুনও দু বাড়ীর সীমানায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করেছিল কাল আসবি তো! কি রে মবু আসবি কি-না বল?

—রোজ এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি হয়?

—কেন, তোকে দেখি।

—দিনের বেলায় তো কত দেখিস!

—সে দেখা আর এ দেখা। তুই কিছু বুঝিস না রে! চুপি চুপি চুরি করে দেখতে তোকে ভাল লাগে। দিনের বেলায় দেখলে মনে হয় তুই বড্ড ভাল মানুষ। ফকির দরবেশের মত মনে হয়। তুই আসবি কিন্তু, কেমন, আসবি তো?

মোবারক অন্ধকারে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়েছে।

অন্ধকার বলে দেখতে পায় নি। জৈনব প্রশ্ন করত তাই আবার—কিছু বললি

না যে!

—আসব রে, আসব।—জৈনবের মুখের কাছে মুখ নিয়ে উত্তর করত তখন মোবারক।

রবিবারের সকালে জাহাজে সব নাবিকেরই কিছু-না-কিছু কাজ থাকে। ফোকশাল সাফাই তাদের ভিতর অন্যতম। সে সময় বাংকের বিছানা গুটিয়ে আফটার-পিকে তুলতে হয়। বালতি বালতি জল আনতে হয় নীচে, জল ঢালতে হয়। সাবান-জল দিয়ে বাল্‌কেডের বিভিন্ন এলোমেলো কালির দাগ, নোংরা মুছে দেওয়ার কাজ নাবিকদের। মেঝেটা ভাল করে ধুয়ে তারপর রং করতে হয় তখন। বিছানা রোদে দেওয়ার কাজটাও নাবিকদের ডিউটির মধ্যে ধরা হয়।

ভোরে মোবারক সেই কাজের জন্য এক টব জল নিয়ে নীচে এসেছে। শেখর এনেছে এক বালতি সাবান-জল। নিজেদের কেবিনটা ভাল করে পরিষ্কার করছে তারা। মাঝে মাঝে সারেং উঁকি দিয়ে দেখছে কতটা হল। আর বলছে জলদি কর রে মিঞা! বাড়ীওলার আসার সময় হইয়া গেল।

ব্রিজ থেকে ঠিক দশটায় ক্যাপ্টেন নীচে নামবে। পিছনে থাকবেন বড় মালোম, তারপর বাটলার। বয় কেবিন সাফাই সেরে এদিকে আসবেন অর্থাৎ জাহাজের গলুইয়ের দিকে।

জাহাজের গলুইয়ের স্টারবোর্ড-সাইডে ডেক জাহাজীরা এক সারিতে দাঁড়িয়েছে ঠিক দশটা বাজতে পনের মিনিট আগে। পোর্ট-সাইডে ইঞ্জিন রুমে নাবিকেরা অপেক্ষা করছে সাফাইয়ের জন্য। ইঞ্জিন সারেং-এর আগের মত ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। একবার গ্যালীতে, একবার মেসরুমে, তারপর বাথরুমে, কেবিনে কেবিনে উঁকি দিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও এঁটো, কোথাও নোংরা কি একদলা বুড়ো জাহাজীর কফ্, পোড়া সিগারেটের টুকরো বাংকের কিনারায় কিংবা কোন অন্ধকারে আড়াল দিচ্ছে কি-না ঘুরে ঘুরে তাও দেখছেন। ক্যাপ্টেন নীচে নেমে কোন ত্রুটি দেখেন তো নিশ্চয়ই বলবেন -ছ্যারেং ক্লিন মাংতা।-এই তিনটি মাত্র শব্দ ক্যাপ্টেনের। সারেং সেই তিনটি মাত্র শব্দেই হাত কচলাতে কচলাতে বলবে—ইয়েস স্যার। অল ক্লীন ডু।

বুড়ো ক্যাপ্টেন গলুইয়ে উঠে এলে সারেং হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলবে- এক-সারিতে দাড়াও রে মিঞার দল।

ক্যাপ্টেনকে কেউ গুডমর্নিং দিল। কেউ সেলাম জানাল।

ক্যাপ্টেন গ্যালীতে ঢুকে হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দেখলেন ভাত, গোস্তের ঝোল, আলুভাজা। কতকটা ঝোল মুখে দিয়ে অনুভব করতে চাইলেন ঝোলের কেমন স্বাদ উঠেছে। নাবিকদের প্রতি চেয়ে বললেন—রান্না খাবাপ হচ্ছে কি তোমাদের?

সারেং বলল— নো সাব।

ক্যাপ্টেন খেঁকিয়ে উঠলেন—তোমায় আমি জিজ্ঞেস করছি না সারেং।

সারেং চুপসে গেল। মোবারক বললে—ভাণ্ডারীর রান্না ভাল।

ক্যাপ্টেন নীচে নামার আগে ইঞ্জিন-ক্রুদের বাথরুমটা দেখে নিলেন। ইঞ্জিনরুম-টোপাজ্ সঙ্গে ঢুকেছে এবং সব খুলে দেখাল— কোথাও সে পরিষ্কার করতে ত্রুটি রাখে নি।

তারপর বড় মালোম, বাটলার, ক্যাপ্টেন নীচে বন্দরের প্রতি রবিবারের মত

আজও টর্চ মেরে মেরে দেখলেন কেবিনগুলো। পিছনে রয়েছে ইঞ্জিন-রুম সারেং—শঙ্কিত দৃষ্টি চোখে। কখন ক্যাপ্টেন কি বলে বসেন। কোথায় ত্রুটি দেখিয়ে বলে বসেন—লেজী বাগার। একদম সুস্থিওয়ালা আছে।

মোবারক আর শেখর একটু দূরে সরে রেলিংয়ের উপর ভর করে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন মই বেয়ে গলুইয়ের ছাদে উঠছেন। ক্রুদের ফ্রেস-ওয়াটার ট্যাংকে আলো ফেলে দেখলেন ভিতরে ময়লা জমল কি জমল না। তারপর নীচে নামার সময় শেখরকে একা পেয়ে ক্যাপ্টেন কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন—এনি গার্ল ইন্ দি পোর্ট স্যাখোর?

শেখর সেই সময় মুচকি হেসে মোবারকের দিকে সামান্য তাকিয়েছে। বলেছে—নো স্যার।

—ব্যাড্ ব্যাড্। নো গার্ল ইন্ দি পোর্ট মিন্স ইউ আর নট এ সেইলর।

শেখর এবারও মুচকি হাসল।

মোবারক হাসছে না। সে উঁকি দিয়ে দূরে এইচ. পি. বুচারের মদের দোকানের বারান্দায় লিলি এসেছে কি-না দেখছে। লিলি এলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই হাত নাড়বে। অথবা পালকের টুপি উড়িয়ে ইসারা করে বলবে—এস।

দুপুরবেলায় পোষাক পরে উপরে উঠে এল মোবারক। বন্দরের কোলাহল-মুখরিত জাহাজগুলো একেবারে নিশ্চুপ। রবিবার। তার ওপর ক্রিস-মাস-ডে। সুতরাং একটি জনপ্রাণী কোন জাহাজডকে কাজ করছে না। শুধু একটা মাত্র জাহাজ বন্দর থেকে ধীরে ধীরে সমুদ্রে নামছে। অনেকক্ষণ টানাটানি করেছে দুটো টাগ-বোট। টাগ-বোটের মাঝিরা জাহাজটাকে সমুদ্রে ঠেলে দিয়ে ঘাটে এসে রুমাল উড়িয়ে বিদায় নিল। সুতরাং গোটা বন্দরটা নিস্তব্ধ।

অথচ বন্দর সীমানায় লোহার রডের বেড়া অতিক্রম করে সমুদ্রের ঠোঁট-ছোঁওয়া বালির চটানে শহরের পাহাড়-সিঁড়ি থেকে ধাপে ধাপে লোক নেমে আসছে। ওরা জমছে সব কার্নিভালে। কার্নিভালের খালি দোকানগুলো ভরে উঠেছে। মেয়ে দোকানীরা তাদের পারিপাট্য এবং ঝকঝকে পোষাকের ভিতর কেবল হেসে গড়িয়ে পড়ছে - আজ থেকে ক্রিস-মাস-ডে আরম্ভ।

আকাশে তখন বেশ সোনালী রোদ। নির্মেঘ আকাশ। দিগন্তে শুধু একটি কুয়াশার ছায়া ঝুলছে! এগমণ্ট-হিলের বরফ সোনালী রোদে তখন নাইছে। জেটির কিনারে কেউ আজ মাছ ধরছে না। ক্রেনের নীচে তাই কোন কোলাহল উঠছে না। শুধু দু-একজন নাবিক এখনও জাহাজ থেকে নেমে যায় নি বলে পোর্ট-হোল দিয়ে দু-একটি আওয়াজ গড়িয়ে পড়ছে বন্দরে।

মোবারক ডেকে এসে আর-একবার উঁকি দিল। শেখরটা আজ ওর সংগে বের হল না। নীচে কি একটা ইংরেজী পত্রিকায় সে ডুবে রয়েছে। হয়তো যখন বিকেল নামবে বন্দরে তখনই সে তার ইজিচেয়ারটা নিয়ে আসবে ডেকে এবং সেখানে বসেই হাজার মানুষের ভিড় দেখবে। এবং যেদিন শেখর পথে নামবে সেদিন সে পরিপূর্ণ উজ্জ্বল—রাস্তায় মেয়েদের ডেকে বলবে—হ্যালো মাই ডার্লিং ;—মোবারক বিরক্ত হয়, শাসন করে এবং সেজনাই বুঝি শেখর অন্তত আর কিছুদিনের জন্য জাহাজ থেকে নামে না। শেখর আজও কার্নিভালে যাবার জন্য জাহাজ থেকে নামল না।

কোয়ার্টার-মাস্টার যেখানে বসে জাল বুনছে সেখানে দাঁড়িয়ে দেখল এইচ. জি. বুচারের মদের দোকানের বারান্দায় লিলি ওর জাহাজের দিকে চোখ রেখে

মোবারকের জন্য অপেক্ষা করছে। মোবারককে দেখে সত্যি লিলি ওর পালকের টুপি বাতাসে উড়িয়ে দিল। হাত নেড়ে নেড়ে ওকে ডাকছে।

মোবারক কাঠের সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামল। হাতের লেদার-ব্যাগটা ওর অলক্ষ্যে অত্যন্ত বেশী ঝুলছে। ব্যাগের প্রথম ভাঁজে কালকের কেনা দু-তিনটি আপেল গড়াগড়ি খাচ্ছে ভিতরে। মোবারক মাউথ-অর্গান বাজিয়ে বাজিয়ে যাচ্ছে সারা পথে ওর ছায়া যেন নেচে নেচে চলেছে। লোহার বেড়া যেখানে, বন্দর সীমান যেখানে শেষ, সেখানে ক্যার্নিভালের কতক ছেলে-ছোকরা রডের ফাঁকে মুখ রেখে ভারতীয় নাবিকটিকে পরম কৌতূহলে দেখছে। কেউ কেউ বলছে—হ্যালো ইন্ডিয়ান য়ু্য নো ম্যাজিক?

মোবারক মাথা দুলিয়ে বলছে—নো।

মোবারক যত এইচ. জি. বুচারেব মদের দোকানের সামনে এগিয়ে যাচ্ছে তত ছেলে-ছোকরা আর ছোট ছোট মেয়েগুলো শুধু বন্দরের লোহার বেড়াটা ব্যবধান রেখে ওর পেছন পেছন ছুটেছে। মোবারক সেজন্য বিন্দুমাত্র বিরক্ত হয় নি বরং মাঝে মাঝে বাতাসে তার হাত উঁচিয়ে দিয়ে বলেছে—কাম অন মাই বয়জ।

মোবারকের স্বাভাবিক নিস্পৃহ দৃষ্টিকে এক সময়ে সেই পিছু-নেওয়া দলটি যেন সহ্য করতে পারল না। তারা আবার কার্নিভালে নেমে গেল। মোবারক হেসে দূর থেকে আবার ডাকল—এস-। তোমরা চলে যাচ্ছ কেন? আমি তোমাদের বাঁশি বাজিয়ে শোনাব।

বন্দর-গেট পার হলেই এইচ. জি. বুচারের মদের দোকান। দোকানের ভিতরে কাউন্টারে সারি দিয়ে কজন মেয়ে পুরুষ। হাতে কাচের গ্লাস নিয়ে অপেক্ষা করছে—মদ খাওয়ার জন্য। লিলি মোবারককে দেখে নীচে নেমে এল। সামনের একটি জাহাজের চিমনি এবং ব্রিজের ফাঁক দিয়ে একফালি রোদে ওর মুখ উজ্জ্বল। মোবারক সামনে দু কদম পা বাড়াতেই ওর ছায়াটা সোনালী রোদের তেজটা ঢেকে দিল। লিলি মোবারকের হাত টেনে বললে- এখনি কার্নিভালে ঢুকবে, না পিকাডেলি পার্কটি ঘুরে ফিরে দেখে পরে যাবে?

মোবারক কোন উত্তর করল না।

এইচ. জি. বুচারের মদের দোকান অতিক্রম করলে একটা ছোট্ট স্টেশনারী দোকান দোকানে টালির বারান্দা। কাঠের ঘর। লাল রং ঘরের। বারান্দার খুঁটিতে ছোট্ট ছেলের হাত ধরে একজন ভদ্রমহিলা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মোবারককে দেখছে মেয়েটির শ্যাম্পু-করা চুল উড়ছে ফুরফুরে হাওয়ায়। ছেলেটি তার মায়ের কাছে মুখ নিয়ে বলছে দ্যাট জায়েন্ট! ইজিপ্ট মাদার? প্লেজ মাউথ-অর্গান গুড্।

মোবারক স্পষ্ট শুনেছে সেই কথা। সে হেসেছে। তারপর দু কদম বারান্দার দিকে পা বাড়িয়ে বলল—নো মাই বয়—আই য়্যাম্ নট এ জায়েন্ট। আই য়্যাম এ ম্যান—ইন্ডিয়ান। ডোন্ট ফিয়ার মি।—বলে দু হাত বাড়িয়ে ওকে কোলে তুলে মুখোমুখি বলল—য়্যাম আই জায়েন্ট? আই য়্যাম অ্যান ইন্ডিয়ান—গুড ম্যান। সি-ই সি-ম্যান। মিন্স্ সেইলর। সেইলর অফ অ্যান ইংলিশ শিপ। ইউ লাইক শিপ্?

সেই ছোট্ট সাত-আট বছরের ছেলেটি এতটুকু সঙ্কুচিত না হয়ে বলল—ইয়েস্ আই ডু।

লিলি হাসল। ভদ্রমহিলা হাসছেন। ভদ্রমহিলা লিলিকে ডেকে বললেন—ন্যানী এই বিদেশীকে ফিজরয়ের পোস্টাফিসের কাছে প্রথম দেখেছে সেদিন। আমায় বললে

—মা এস, এস না। গেলাম ওর কথা মত। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে এ'কেই দেখেছি সেদিন। বাঁশি বাজিয়ে মেথডিস্ট চার্চের দিকে হে'টে চলেছেন। আমি বুঝেছিলাম তিনি এই ছোট্ট সহরে আগন্তুক। ন্যনী, তার বাবা যখন কাজ থেকে ফিরে এল তখন দু হাত বড় করে ভয়ে বিস্ময়ে বললে—এ জায়ান্ট। আমি হেসে বলেছি—না উনি একজন বিদেশী এবং নিশ্চয়ই উনি নাবিক হবেন।

মোবারক তাদের কথা মোটেই লক্ষ্য করছে না। বলছে—তুমি যাবে আমার জাহাজে? কাল এস না। ঐ তো দেখা যাচ্ছে আমার জাহাজ। হলুদ রঙের চিমনি, উপরে কালো বর্ডার-দেওয়া দাগ! ওই জাহাজটা এই ভাল মানুষটির। তুমি জাহাজে গেলে দেখতে পাবে আমি দৈত্য নই। আমি মানুষ—আমি ভারতীয়।

তারপর একজোড়া উচ্ছল-জীবন কপোত-কপোতীর মত হাতে হাত ধরে পাহাড়-সিঁড়িতে উঠে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। ন্যনী আর ন্যনীর মা চেয়ে থেকেছে যতক্ষণ না ওদের দুটো রং-বেরঙের দেহ পাহাড় ছায়ায় হারিয়ে যাচ্ছে। তারপর ন্যনীর হাত ধরে ভারতবর্ষের একটি ছোট্ট ঘরের জীবনধারার রঙিন কাল্পনিক চিন্তা করতে করতে কার্নিভালের ভিড়ের ভিতর মিশে গেল ওর মা। বাতাসের দিকে চেয়ে দেখছে ওর মা সিগারেটের ধোঁয়াটা বড্ড বেশী পাক খাচ্ছে।

বুকে অশান্ত জ্বালা লিলির। অষ্টাদশী যৌবনের জ্বালা। মোবারকের নিষ্পৃহ ভাব এবং উদার মনোবৃত্তির নীরব কীট দংশন ওকে অশান্ত করে তুলেছে। ওর চোখ জ্বলছে--দেহের প্রতি রোমকূপে আবর্তিত হচ্ছে রক্তের ঘোর-পাক। ত্রিশটি রাতের কোরীপাইনের ব্যর্থতার অন্ধকার ওর বুকে আশাহত বধূর মত বোবা কান্নার ঢেউ তুলছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাই লাল ক্যালেণ্ডারের মুখোমুখি। একটি স্তিমিত আলো জ্বলছে ঘরে। পাশের খাটে লিজেন কালো কম্বলের তলায় ঘুমুচ্ছে। সমস্ত প্রেসবিটেরিয়ান স্কুল হোস্টেলটা ঘুমে শিলীভূত। সে প্রতি রাতের মত আজও বিলাসভ্রমণ থেকে ফিরে একটি দাগ কেটে দিল। লাল ক্যালেণ্ডারে সাদা রঙের তুলি তুলে খুব ধীরে ধীরে টুয়েণ্টি এইটথ্ তারিখটা মুছে দিয়ে ভাবল—মোবারক নিশ্চয়ই এখন জাহাজে ফিরেছে।

ঘরে আলো—বাইরে অন্ধকার। সবুজ টেনিস লন ধূম-ধূসরিত যেন। কুশায়া ঝরছে আকাশ থেকে। টেনিস লনের সীমান্তে প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ। চার্চের আলো কুয়াশার স্তর ভেঙে লিলির ঘরে পে'ছিতে পারছে না। পাশের জানালা খোলা। কনকনে ছুঁচের মত ঠাণ্ডা হাওয়া দরজার পর্দা উড়িয়ে ঘরে ঢুকছে। লাল স্কার্ট উড়ছে লিলির। তবু স্থিরনিবদ্ধ-দৃষ্টি তারিখটার প্রতি। গাড়ীর চাকার মত বিগত তারিখগুলো পাহাড়-সিঁড়ি ভেঙে সমুদ্রের দিকে কেবল ছুটছে যেন দ্রুত। ওর হাত কাঁপছে।

ভেলভেটের পর্দাটা কাঁপছে দরজায়। ক্যালেণ্ডারের দু-তিনটে পাতা উড়ছে ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে যেন পাশের খাটে লিজেন পাশ ফিরে শুল। লিলির দেহ কাঁপছে তখন উদগ্র কামনার আর্তিতে।

রেস্টরুমের সান-ডায়েল ক্লকের ছায়াশূন্য কাঁটা বুকের ভিতর ঠুকে ঠুকে কেমন টিক টিক করে গভীর দাগ কেটে চলেছে কেবল। ওর অবিন্যস্ত স্যাম্পু-করা চুলগুলি ঠাণ্ডা বাতাসের তাড়নায় নারকেল পাতার মত মুখের উপর ঝরে পড়ছে। সে ক্লান্ত।

ওর চোখে জল কি জ্বালা ঠিক ধরা যাচ্ছে না।

পাশের চেয়ারটা টেনে বসল লিলি। ক্লান্ত হাতদুটো বিছিয়ে দিল টেবিলে। তারপর হাতদুটোর ভাঁজে মুখ রেখে টেবিলের উপর পড়ে থাকল। তখনও কন্‌কনে সমুদ্রহাওয়া ঘরের পর্দা উড়িয়ে লিজেনের কম্বলের ভিতর ঢুকছে ছুঁচের ফলার মত। লিলি নড়ছে না। লিজেন পাশ ফিরে আবার শুল। বাতাসের তীব্র তাড়নায় সে ধীরে ধীরে ঘুম থেকে জাগছে।

লিলি চেয়ার থেকে উঠে এল এক সময়ে অশান্ত বুকের জ্বালা কিছুতেই নিবছে না। তাই সে পায়চারী করছে মেঝের উপর। মাঝে মাঝে জানালার উপর ঝুঁকে পাহাড়-ছাদ থেকে দেখার চেষ্টা করছে বন্দর। বন্দরের বিদেশী জাহাজ। মোবারকের শিপ। মোবারক বুঝি কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে উঠছে জাহাজে। ওর অস্পষ্ট ছায়া লিলির জানালায় স্পষ্ট। প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের পাহাড়-ছাদে অন্তত লিলির চোখদুটো সেই কথাই বলে।

বন্দর অতিক্রম করে লিলির দৃষ্টি আর চলছে না। আদিগন্ত সমুদ্রে নীল অন্ধকার। সমুদ্রের বুকে জাহাজটা নোঙর করা। জাহাজের আলো সমুদ্রের নীল অন্ধকারে আকাশ তারার মত নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে। জাহাজটা বুঝি দুলছে শীতের ঠাণ্ডায়। দুলছে কি কাঁপছে লিলির চোখ ঠাহর করতে পারল না। তারপর ওর দৃষ্টি সমুদ্র থেকে বন্দরে—ক্রমশ পাহাড় সিঁড়ি ডিঙিয়ে ছাদে, ছাদ থেকে ঘরে, শেষ পর্যন্ত ভেলভেটের পর্দায় ঢাকা শোকেসের বুকে। ভায়োলিনটা সেখানে রয়েছে। লিলির সব জ্বালা থমকে দাঁড়াল যেন সেখানে। তাই নীরবে ভায়োলিনটা বের করে আবার এসে জানালার উপর ভর করে দাঁড়াল। নীরব রাত আর এক-আকাশ তারাকে সাক্ষী রেখে সে বার বার বাজাল—মোবারক আমার, সে আমার—সে আমার।—লিলি ভায়োলিনের উপর পড়ে আবার কাঁদলে যেন টুই আর ইন দি সেম্ বোট।

ভায়োলিনের উপর লিলির করুণ কান্না শুনে লিজেন জেগে বিস্মিত হয়ে বললে—কি করছিস্ তুই ব্লিউ? দরজা-জানালা খোলা রেখে এভাবে দাঁড়িয়ে বন্দরের কি দেখছিস! ইস্ বিছানা-পত্তর বাতাসে কি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, দেখ তো? আর এত রাতে কেউ বেহালা বাজায়, না, বাজাতে আছে!

লিজেন খাট থেকে নেমে এল। অবিন্যস্ত চুলগুলি দুহাতে চেপে পর্দা সরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর জানলার পাশে লিলির হাত টেনে বলল—কি হয়েছে তোর। এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

লিলি উত্তর করল না। কিছু যেন সে ভাবছে।

লিজেন পাশের জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে বললে—মোবারকের জাহাজ আজ বুঝি ছেড়ে দিয়েছে?

—না—লিলি খাটের দিকে আসতে আসতে উত্তর করল।

লিজেন দু-চার বার নাকটা জোরে জোরে টেনে বলল—তুই মদ খেয়েছিস ব্লিউ?

—খেয়েছি।

—তুই না সিস্টার?

—মানি না।

—ব্লিউ!

—মানি না, মানি না—আমি কিছু মানি না।

—এমন করছিস কেন?

লিলি কি ভেবে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেল আবার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুনল বাইরের ওকগাছগুলোর পাতা থেকে শিশির ঝরছে। শিশিরের শব্দ স্কাইলাইটের কাচে রিন্ রিন্ শব্দে বাজছে। লিজেনের দিকে চেয়ে ও বলল—খুব ঠাণ্ডা পড়েছে আজ।

রাত ক্রমশ গড়িয়ে চলেছে। চার্চের ঘড়িতে শব্দ উঠছে—টিক্ টিক্। অন্যান্য ঘরগুলোর কাচের ছায়ায় কোন আলো জ্বলছে না। নিস্তব্ধ পাহাড়-ছাদে শুধু লিলি আর লিজেন জেগে রয়েছে।

লিজেন বলল—রাত অনেক হয়েছে, শুয়ে পড়।

লিলি ফারের কোট খুলে ছুঁড়ে দিল আলনায়। ব্লাউজটা টান মেরে খুলে ফেলল। স্কার্টের বোতাম খুলে স্লিপিং গাউনটা তুলে নিল বিছানার একপ্রান্ত থেকে। তারপর নিজের নগ্ন সৌন্দর্যে সে কেমন অভিভূত! দেহের প্রতি অঙ্গে কেমন তীব্র শিহরণ অনুভব করল। হৃদয় তার অবাক। চোখদুটো প্রতিদিন তার বিস্ময় মেনেছে-একজন সাধারণ মানুষ রাতের পর রাত কোরী-পাইনের অন্ধকারকে কেমন ব্যর্থ করে তুলতে পারে। গম-ক্ষেতগুলো পার হয়ে যে পাহাড়-ছাদ রয়েছে, যে রেস্টরুম রয়েছে -যে সান্‌ডায়েল ক্লক আলোর ছায়ায় ঘণ্টা বাজাচ্ছে, সেই নির্জন এক টুকরো পৃথিবীতেও মোবারক কেমন ভারি ভালমানুষ! সে বলেছে কেবল তার জাহাজের কথা, জাহাজী জীবনের দুঃখবেদনা—একঘেয়ে জীবনপ্রবাহ, ফে ক্যাপ্টেন, শেখর, শেখরের দেশ, তার শামীনগড়। এইসব বলে মোবারক মাঝে মাঝে চুপ করে যেত।

তখন সান্‌-ডায়েল ক্লকের একটুকরো পৃথিবীতে শিশির ঝরত। কোরীপাইনের কচি কিশলয়ে শির্ শির্ শব্দ উঠত। ওক গাছগুলো নীরবে উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধের নরনারীর জীবন ও যৌবনের পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসের সামান্য মুহূর্তের বুঝি কামনা করত। কিন্তু মোবারক তখন উঠেছে। বাঁশি ব্যাগ থেকে বের করেছে হঠাৎ লিলিকে আশ্চর্য করে দিয়ে বলেছে—আমি গেলাম, তুমি ঘরে যাও। কাল সন্ধ্যার আবার সি-ম্যানস্ মিশনে। ওক গাছগুলো তখন যেন সোজা হয়ে দাঁড়াত। স্তব্ধ রাতের বুকে একটি মুহূর্তের জন্য কান পাতা নিষ্ফল হল। মোবারক নেমেছে তখন পাহাড়-সিঁড়ি ভেঙে, বাঁশিতে সুর দিয়ে দিয়ে বন্দরের দিকে চলে যাচ্ছে। লিলি ফিরছে তার প্রেসবিটেরিয়াম স্কুল হোস্টেলে। শরীর কাঁপছে তার। তবু চীনার গাছের নীচে নিঃশব্দে আরও একটি মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে—মোবারকের বাঁশি শুনছে।

আরও কত রাত রয়েছে—কত রাত থাকল। সমুদ্রে সূর্যাস্তের রক্ত লগ্নে ওরা দুজন গেছে সেণ্ট মেরাইনে। সমুদ্রতীরে সেখানে পাহাড়ের শিকড় সিঁড়ির মত সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসছে সেখানে তারা দুজনে দাঁড়াত দু হাত ধরে, হাতদুটো দুলত—স্কার্ট আর ওভার কোট উড়ত দুরন্ত বাতাসে। শ্যাম্পু করা চুল ফুর ফুর করত লিলির। দুজনে দুটো সিগারেট টেনে আকাশের দিকে চেয়ে থাকত। তখন সমুদ্রের নীল তরঙ্গ দুরন্ত শিশুর মত চুপি চুপি হাত বাড়িয়ে, পা ছুঁই ছুঁই করত তাদের।

হঠাৎ মোবারক বলেছে—আমি চলি জাহাজে, তুমি ঘরে যাও, কাল সন্ধ্যায় আবার মিশনে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

লিলির আপশোস—তার পরিপুষ্ট গমের মত সৌন্দর্যকে মোবারক তীব্রভাবে

অবহেলা এবং বিদ্রূপ করে চলেছে। রাতের পর রাত সেণ্ট মেরাইন হতে লায়ন রকের বুকে পর্যন্ত ওদের বিচরণ। কিন্তু মোবারক সব কথা বলে, সব পথ বিচরণ করে, সব রূপ দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ার সময় যখন ওক গাছের ছায়ায় বসত তখনই দেখেছে ভারতীয় নাবিকটির চোখে জ্বালা। সে-সময় লিলি ওর বলিষ্ঠ হাত টেনে এনে নিজের নরম হাতের উপর চাপ দিয়েছে। মোবারক চুপ করে থাকত তখন। কথা বলত না। কণ্ঠে ও তখন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। কিন্তু তখন আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চাইত লিলি, মোবারককে বলতে শোনা গেছে তখন—চলি। কাল আবার—

লিলি উত্তেজনায় তখন কেবল কেঁপেছে। কোন কথা বলতে পারে নি।

মোবারকের মনে হয়েছে জৈনবের কথা—নাবিক হও কিন্তু চরিত্র মন্দ করতে পারবা না।...

লিলি বললে লিজেনকে তখন—মানুষটা অদ্ভুত লিজেন।—তারপর কম্বলের ভিতর ঢোকার আগে আর-একবার অনুরোধ করলে—লিজেন আমি যে মদ খেয়েছি তুই কিন্তু কাউকে বলিস না। বলবি না তো? কি রে বল না তুই আবার বলে দিবি কি না। মোবারক পর্যন্ত আমায় কেমন ঘৃণা করল আজ। বললে—তুমি না সিস্টার! সিস্টারদের তো মদ খেতে নেই জানি।

আরও কিছু বলেছে?

—না এ সম্বন্ধে তেমন আর কিছু বলে নি।

লিজেন এক সময় মাথার উপরকার আলোটা নিভিয়ে দিল। বললে—এ সহর ভারতীয় নাবিকটিকে ভুলতে পারবে না। কাল দেখলাম ফিজরয়-এর বাজারে মাউথ-অর্গান কেনার ধুম লেগেছে। অনেকে আবার মোবারকের মত অনুকরণ করে পা ফেলে ফেলে চলে।

লিলি কম্বলের তলায় মুখ নিয়ে হাসল। বললে শুধু ভুলতে পারবে না, নয় রে। ভোলা ওকে চলবে না। নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরে অক্ষয় অমর হয়ে থাকল সে।

—বিশেষ করে লিলির জীবনে।

—না শুধু লিলির জীবনেই নয়, প্রতিটি নিউ-প্লাইমাউথ মানুষের জীবনে ও যে অক্ষয় অমর হয়ে থাকল।

—সে কেন হবে?

—হবে না, হচ্ছে।

—এসব কি বলছিস তুই!

—আমি ঠিক বলছি।

—তুই ঠিক বলছিস?

—ঠিক।

—সে কেমন করে হবে?

—হবে—যেমন করে হয়। তুই শুধু কাল সকলকে বলে দিবি খবরটা। আমি স্কুলে যাচ্ছি না। তুই-ই আমার হয়ে বলবি, মোবারক ম্যাজিক দেখাবে।

লিজেন লাফ দিয়ে উঠে বসল বিছানায়। আলোটা পুনরায় জ্বেলে দিল এবং ছুটে এসে লিলিকে কম্বলসহ জড়িয়ে ধরে বললে—ঠিক বলছিস!

কম্বলের ভিতর চুপি চুপি বলল লিলি—ঠিক বলছি।

লিজেন আনন্দে নেচে নেচে গাইল সেই খাটের উপর—ইফ আই উড্ বি দাই

ডার্লিং—। কম্বলের ভিতর থেকে তখন লিলি জোরে হাসছে। সে বলছে আবার—মোবারক সাপের নাচ দেখাবে। সাপের ম্যাজিক।

—মোবারক বুঝি বললে।

—না রে না। সে বলবে কেন? যে যে আমায় সত্যি আজ সান-ডায়াল ক্লকে সাপের নাচ দেখাল?

—ধ্যাৎ! আমি তোর কথা ছাই বুঝতে পারছি না, স্পষ্ট করে বল, সব খুলে বল। কি মজা হবে না একটা! ওফ! ভাবতে গেলে শরীর আমার এখনই যে শিউরে উঠছে রে। সাপটা তোর চোখের সামনে নাচল? তোকে মোবারক বুঝি বললে সে ম্যাজিক জানে, সাপটা দেখতে কেমন রে।

—কালো।

—ছবিতে যেমন দেখতে।

—ঠিক সে রকম বলতে পারিস।

—তোর ভয় করল না?

–ভয়! লিলি মুহূর্তের জন্য চুপ করল। নিজেকে প্রশ্ন করল, ভয়? তা ভয় করেছে—একটু করেছে। না, মিথ্যে কথা। ভয় একটু করে নি, ভয়ে সে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে সে অন্ধকার রাতের বুকে ভূমিকম্পের মত থর্ থর্ করে কাঁপছিল। মোবারক তখন চেয়েছে, চোখে বিদ্রূপ—চোখে তার জ্বালা। থরো থরো মেঘের মত সেও অভিমানে কেঁপে কেঁপে উঠেছে। পাহাড়-ছাদে দুটো উন্মত্ত যৌবনকে রেস্টরুমের আলোয় সান-ডায়াল ক্লকের উপর নেচে ব্যঙ্গ করছে যেন তখন শংখচূড়টা।

এমন ঘটত না-যদি লিলি বেখাপ্পা প্রশ্ন করে মোবারককে উত্তেজিত করে না তলত সংশয় আর সন্দেহকে কেন্দ্র করে লিলি নেশার তাড়নায় মোবারককে কাছে টানবার প্রচেষ্টা করেছিল, রাতে স্কুল হোস্টেলে ফিরে আসার আগে বিক্ষিপ্ত ঘটনাটা ঘটল। সামনের উপত্যকার ঠিক শেষ প্রান্তের পাহাড়-ছাদে। যেখানে রেস্টরুম রয়েছে—যেখানে সান-ডায়েল ক্লক রয়েছে। যেখানটা নির্জন—যেখানে কোরী-পাইনের শাখায় এখনও কিশলয় বেরুচ্ছে। আর কাছে সমুদ্রের বাতিঘরের বাতি-ওয়ালার হাসিটা হাঁচিটা যেখান থেকে স্পষ্ট শোনা যায়—সেই পাহাড়ে। সেখানে সে প্রশ্ন করেছে—মোবারক তোমার দেশ বিরাট। দেশ বিচিত্র--সে দেশের মানুষ বিচিত্র! তাদের জীবনধারা বিভিন্ন। পোষাক-আচার, রীতিনীতি সব বিভিন্ন। সুতরাং তাদের সম্বন্ধে কৌতূহলবশত কোন প্রশ্ন করলে রাগ করবে না তো?

মোবারক ক্লকের ডায়ালটার উপর আধ-শোয়া অবস্থাতেই বলেছে–না। রাগ আমি করব না, বিভিন্ন বন্দরে কত বিদেশীনীর কাছে কত বিচিত্র প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আমার দেশ সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল মেটাতে। কিন্তু আমি রাগ করি নি।

—তোমার দেশে অনেক সাধুসন্ন্যাসী আছেন। ফকির দরবেশ আওলিয়া আছেন--তাই না মোবারক?

—আছেন।

—গল্পের বইয়ে সেই সাধুসন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প পড়েছি।

—সেগুলো তো গল্পই।

ক্লকের ডায়ালে দুজনেই বসে আছে। দু-দশ কদম দূরে রেস্টরুমের একটি সংকীর্ণ আলো ওদের দুজনের ফাঁক দিয়ে আরও নীচে নেমে গেছে। শীত একটু বেশী পড়েছে বলে কেউ এ পাহাড়-ছাদে বেড়াতে আসে নি। একমাত্র লিলি আর মোবারক বসে বসে গল্প করছে। অন্য পাহাড় প্রান্তে লাইট হাউসের বাতিওয়ালা মাঝে মাঝে ঠাণ্ডায় কাশছেন বুঝি। সেই শব্দ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসছে পাহাড়-ছাদে।

মোবারক চুপ করে ছিল।

লিলি সানডায়েল ক্লকে বসেছে। পা দুটো তুলে। লাল স্কার্টটা হাঁটুর নীচে নামানোর জন্য টানছে। লাল নখ পালিশের নরম রবারের মত আঙুলগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে সেই স্কার্টের গা। হাত ইচ্ছে করেই যেন আর একটু ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। চোখ দুটো টান টান করে চাইছে মোবারকের দিকে। আরক্তিম ঠোঁট দুটোয় আবার অহেতুক কথা। যেন—ফকির, দরবেশ, সাধুসন্ন্যাসী মন্ত্র পড়ে ইচ্ছা করলে হাওয়ায় হিমালয়ে মিলিয়ে যেতে পারেন ঠিক? যোগী বলে, এক ধরণের সম্প্রদায় আছেন তাঁরা বরফে বসে নাকি ধ্যান ধারণা করেন—ঠিক?

সেগুলো গল্পে জেনেছ সুতরাং সেগুলো গল্পের মতই থাক। তোমার আর কিছু প্রশ্ন আছে? এবার আমি উঠবো। রাত অনেক হয়েছে।

কি প্রশ্ন করলে মোবারক?

লিলি তুমি অসুস্থ।

অসুস্থ! মদ খেয়েছি বলে?

—লিলি, তুমি না সিস্টার? সিস্টারদের তো মদ খেতে নেই জানি।

—আমি সত্যি অসুস্থ নই মোবারক। দৃঢ় গলায় বললে লিলি। —তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

—বলো, উত্তর দিচ্ছি।

—সেই সাধুসন্ন্যাসীরা হাতের মাটী ফুঁ দিয়ে সোনা করে দেন শুনেছি। তাঁরা ভোজবাজি জানেন।

—মিথ্যে কথা।

তুমি মিথ্যে বলছ মোবারক।

—লিলি।

—কি করবো বলো। তোমার দেশের নাবিকেরাই এ-কথা বলে গেছে। সমস্ত দেশটা নাকি যাদুকরের দেশ।

মোবারক কড়া চোখে এবার লিলির দিকে চোখ তুলে চাইল। তারপর ভিতরের গুমরে মরা ব্যাধিটা নাড়া দিয়ে উঠতে থাকলে, চীনার গাছের পাতাগুলো যে মুখো হয়ে দুলছে সেদিকে নজর ফিরিয়ে দিয়ে বললে—এবার ওঠা যাক।

—তুমি তো আমার উত্তর দিলে না।

—মিথ্যে যে বলে তার কোন জবাবেরই দাম নেই লিলি।

—তুমি রাগ করলে মোবারক?

—রাগ আমি করি নি।

—তোমার দেশের মেয়েরা শাড়ী পরে। তুমি বিয়ে করেছ মোবারক? জ্যান্ত সাপ দেখেছ? সাপ!

—দেখেছি। তুমি দেখবে?—মোবারক নিজের ব্যাগটা আরো কাছে টেনে নিল।

লিলি হেসেই যেন কূল পেল না। এবং সে হাসতে হাসতে সত্যি এক সময়ে ডায়ালের উপর গড়িয়ে পড়ল। বললে—মোবারক তোমার কথায় হাসব কি কাঁদবো বুঝতে পারছি না।

ব্যাগটা কোলের কাছে টেনে অত্যন্ত সহজ ভাবে বললে মোবারক—তুমি হেসো না। দেখতে চাও—দেখিয়ে দিচ্ছি। শীত এখনও যায় নি বলে সাপটা বের করি নি।

—দোহাই মোবারক অমন কথা তুমি আর বলো না। তুমি দেখছি তোমার সাধু সন্ন্যাসীদের মত আমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ভেল্কি খেলবে। এ যে শীতের দেশ এখানে সাপ পাবে কোথায়?

—অত কথায় কাজ কি। দেখতে চাও তো দেখিয়ে দিচ্ছি।

—ওসব বুজরুকীতে আমার বিশ্বাস নেই। তুমি দয়া করে থাম মোবারক।

মোবারক তার ব্যক্তিত্বে খোঁচা খেয়ে যেন মারমুখো হয়ে উঠল, লিলি তখনও ওকে বিদ্রূপ করে হাসছে। সে হাসির আওয়াজ চড়াই-উৎরাইয়ের ভাঁজে ভাজে আঘাত খেতে খেতে ছুটেছে বন্দরের দিকে। বন্দর হতে সমুদ্রে। যে জাহাজটাকে আলো দিচ্ছে এখন লাইট হাউসটা সেখানে গিয়ে বুঝি ঝুপ করে থেমে গেল। লিলি উঠে বসল—তারপর মোবারক—

মোবারক নিঃশব্দ -নিশ্চুপ। ওর ভিতরটা আঘাত খেয়ে শংখচূড়টার মতই ফুলে ফুলে উঠছে। ব্যংগ বিদ্রূপ বেইমানীতে ওর জর্জরিত মন কেঁদে উঠল যেন বলতে বলতে—মোবারক মিথ্যা বলে না। এই তোমার চোখের সামনে পড়ে রয়েছে শংখচূড়টা।

কালো মোটা দড়ির মত সত্যিই কিছু একটা পড়ে রয়েছে ডায়েলের উপর। একটু নড়ে নড়ে ডায়ালের বুক বেয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে সময় মোবারক অবাক হয়ে দেখল লিলি ওরই কাছে ছুটে এসে ওর বুকে আছাড় খেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। কোন আওয়াজ নেই, কেবল শ্বাস ফেলছে জোরে। ভয় পেয়ে সমুদ্রের ছোট ছোট তরংগের মত হিল্ হিল্ করে কাঁপছে। মুখ তুলছে না বুক থেকে। বিবর্ণ, ভয়ে চোখ বুজে আছে।

মোবারক মাউথ অর্গানটা দিয়ে ছোট ছোট দুটো শব্দ করতেই ডায়ালটার উপর, শংখচূড়টা ব্যাগের ভিতর গিয়ে ঢুকলো। সে তখন তার কোলের উপর পড়ে থাকা মেয়ের চুলের ভিতর সন্তর্পণে আংগুল চালিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে অপরাধীর মত বললে—সাপটা চলে গেছে লিলি। তুমি এমন ভয় পাবে জানলে শংখচূড়টাকে তোমায় আমি দেখাতাম না। আমার সত্যি খুব ত্রুটি হয়েছে।

লিলি তখনও পড়ে রয়েছে এবং পড়ে থাকল।

আবার বললে মোবারক—ওঠ রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে। বেশী দেরী করে ফিরলে ভাতগুলো আর খাওয়া যাবে না।

লিলি তখন উঠল। কিন্তু বিবর্ণ ভয়টা তখনও কাটে নি, তবু অস্পষ্ট করে বললে— তুমি ম্যাজিশিয়ান।

মোবারক কথা আর বাড়াল না। বিদেশের এই নির্জন পাহাড়-ছাদে লিলির দেহের দিকে চেয়ে তার করুণা হল। সে বললে—চল, তোমাকে হোস্টেলে রেখে আসি।

লিলি নীরবে পাহাড়-ছাদ থেকে নেমে-যাওয়া পথ ধরে মোবারককে অনুসরণ

করলে শুধু। আর মোবারকের দৃঢ় পদক্ষেপের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় করে নিল—এ শীতের দেশ। এখানে কোন জীববর্জন্তুই এককালে ছিল না। ঔপনিবেশিকরা নিজেদের প্রয়োজনে ছাগল-ভেড়া গরু-ঘোড়া আমদানী করেছিল মাত্র। তারপর মোবারক তো নাবিক অথচ সে তার নিজের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং সংক্ষিপ্ত কথার আর চোখের জ্বালায় আমার চিন্তাধারাকে নিশ্চয়ই বশীভূত করে নিয়েছিল—যার ফলে ডায়ালের উপর ভীষণ এবং ভয়ংকর দীর্ঘ সাপকে পড়ে থাকতে দেখেছিল। লিলি তাই গোটা পথ ধরে কোন কথা বলে নি এবং সমস্ত দেহে একটি পরাজয়ের গ্লানি মেখে স্কুল হোস্টেলে ঢুকেছে। কেবল মোবারক যখন তাকে রেখে নীচে বন্দরের দিকে পা বাড়িয়েছিল তখনই কোন রকমে বাতাসে পাণ্ডুর হাতটা ঢেউ খেলিয়ে বলেছিল গুড-নাইট মোবারক!...

মোবারক পাহাড়-ছাদ থেকে নামতে নামতে উত্তর করেছে—গুড-নাইট।

লিজেন আবার প্রশ্ন করল—কি রে তোর ভয় করল না?

—হ্যাঁ ভয় করেছিল। ভয়ে আমি মোবারককে জড়িয়ে ধরেছিলাম।

লিজেন সে কথা শুনে মুচকে হাসল—তারপর?

—তারপর চোখ বুজে রয়েছি।

—তারপর?

—তারপর কিচ্ছু না। যখন সে বলল—ওঠ, সাপটা চলে গেছে তখন চেয়ে দেখি সেই ভয়ংকর বস্তুটি একেবারে অদৃশ্য—বলে লিলি লিজেনকে আবার কেমন ভয়ে ভয়ে জড়িয়ে ধরল। বললে—দৃশ্যটা মনে হলে আমার এখনও ভয় করে লিজেন। তুই আমার সঙ্গে শুয়ে থাক।

—তাহলে আর কিছুই হল না।

—আঃ ফাজিল! এমন করলে তোর সঙ্গে কথা বলব না বলছি।

—থাক হয়েছে, আর বলব না। কিন্তু মোবারক কালকে ম্যাজিক দেখাবে তো!

—দেখাবে না বলছিস? নিশ্চয়ই দেখাবে। আমি অনুরোধ করলে সে নিশ্চয়ই দেখাবে। সি-ম্যানস মিশনের প্রোগ্রাম কালকে সম্পূর্ণই বদলে দেব। তোর কেবল কাজ থাকল তুই স্কুলের সকলকে বলে দিবি সি-ম্যানস্ মিশনের চত্বরে মোবারক ম্যাজিক দেখাবে—সাপের নাচ।

—কিন্তু কাল কুইন আসছেন ডুনেডিন থেকে।

—কুইন! আসুক।

—লোক তেমন তবে জমবে কি?

—জমবে না! কি যে বলিস তুই। এই ছোট শহরে কোন রকমে যদি এই আশ্চর্য খবরটা ছড়িয়ে পড়ে তাহলে গোটা শহর ভেঙ্গে লোক নামতে শুরু করবে বন্দরে। এ দেশের লোক সাপের নাচ কোন কালে দেখেছে, না আর দেখবে?—কুইন এলিজাবেথকে কি দেখবার রে—তিনি তো মেয়ে! আমার মত মেয়েমানুষ।

বাকী রাতের জন্য বুঝি তবে আর ঘুম আসছে না। কম্বলের নীচে লিজেনকে জড়িয়ে মুখোমুখী দুজন শুয়ে রয়েছে। বিক্ষিপ্ত চিন্তা পাক খাচ্ছে ভিতরে। সেই চিন্তা পাক খাচ্ছে সমুদ্রমানুষটিকে কেন্দ্র করে। চিন্তায় তার রয়েছে মোবারকের জাহাজ, মোবারকের কেবিন, তার বাংক। দৃঢ় বলিষ্ঠ দৃষ্টি—উন্নত নাক—হাল্কা ঠোঁট—আয়ত চোখ মোবারকের। লিলি ভাবতে ভাবতে নিজের বালিশটা আরো জোরে চেপে ধরল। কানদুটো থেকে তখন ওর গরম হল্কা বের হচ্ছে। লিজেন নাক ডাকাচ্ছে

কম্বলের তলায়। তেমনি করে কুয়াশা এখনও আকাশ থেকে ঝরছে মনে হল। স্কাই-লাইটের শব্দ তেমন করেই এখন রিন রিন সংগীতের শব্দে শিহরণ জাগাচ্ছে ওর দেহমনে। তাই সে তার নিজের পাণ্ডুর হাল্‌কা বরফ হাতদুটো দু পায়ের ফাঁকে আরো জোরে চেপে ধরল। মোবারক নিশ্চয়ই তার বাংকে এখন ঘুমুচ্ছে। মানুষটার গভীর ঘুম হয়তো।

লিলির যথার্থই আর ঘুম আসছে না। একবার ইচ্ছে হল লিজেনকে ডেকে তোলে। মেয়েটার বড্ড ঘুম। এত ঘুম ভাল নয়।

রাত ভোর হতে তেমন আর নিশ্চয়ই দেরি নেই। লিজেনকে সকাল সকাল ডেকে তুলতে হবে। বাতিওয়ালার ঘরে ম্যাঞ্জিসের মোরগগুলো ডাকছে। তৃতীয় প্রহরের ডাক হবে হয়তো। ঘরে একটা ঘড়ি থাকলে ভাল হত। ইচ্ছে করলেই ঘড়ি একটা সে কিনে পরতে পারে। কিন্তু কেমন খেয়াল জীবনের, মনটা ঘড়ির প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করতে যেন পারল না। লিজেনটা তো মস্ত কৃপণ। তাই সেও ঘড়ি পরল না। অথচ আজ কেবল বার বার ঘড়ি দেখার প্রয়োজন হচ্ছে। ঘড়ি থাকলে দেখত রাত আর কতটা আছে। ভোর হতে আর কতক্ষণ, সাজগোজ করে সি-ম্যানস্‌ মিশনে পেঁছিতে কত দেরি, বন্দরের জাহাজটা আর ক' কদমের পথ—জানার বড্ড আকাঙ্ক্ষা জাগছে।

লিলি কম্বল ছেড়ে উঠল। ঘুম এল না বলে সে এসে দাঁড়াল দরজার পাশে। তারপর সন্তর্পণে দরজা খুলে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। লিজেন যেন টের না পায় সেজন্য পা টিপে টিপে বারান্দার রেলিংয়ে ভর করে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। উঁকি দিয়ে চার্চের ঘড়িতে ক'টা বাজল দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু একটি কুয়াশার মসলিন এখনও পাহাড়-ছাদটাকে অস্পষ্ট করে রেখেছে বলে সেই শীতের ঠাণ্ডায় লিলি সবুজ টেনিস-লনের শিশির ভেঙে চার্চটার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু এমন সময় চার্চে শব্দ উঠছে ঢং ঢং ঢং। তিনটা বাজল।

রাত যে এত দীর্ঘ লিলি জীবনে এই প্রথম বুঝল। রাত আর কাটতে চায় না। রাত আর যেতে চায় না। শীতের এই দীর্ঘ রাতে বারান্দায় তাই সে পায়চারি করছে। মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকে জানালাটা একটু ফাঁক করে দেখছ বন্দর। নীচে কুয়াশার এতটুকু চিহ্ন নেই, একটা দাগ পর্যন্ত আঁকে নি। মোবারকের জাহাজের ব্রীজে কোন মানুষের ছায়া পায়চারি করছে ইতস্তত যেন। লিলি চোখদুটো ভাল করে রগড়ে আবার এক ঝলক অপলক দৃষ্টিতে ভাল করে দেখে বুঝল সেটা মানুষের ছায়া নয়। মাস্টের আলো বাতাসে দুলে একটি প্রকম্পিত শূন্য-ছায়ার সৃষ্টি করেছে ব্রীজে। লিলি নিজের অপরিণত দৃষ্টির জন্য ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। মনটা সম্পূর্ণ ওর মোবারক-ময় হয়ে উঠেছে। যখন শীতের একঝাঁক পাখী উপত্যকার সীমানা ভেঙে অন্য পাহাড়ে উড়ে গেল, যখন একজন শ্রমিক মেয়ে-বৌকে ঠেলে এক কৌটো টিফিন বগল দাবা করে বন্দরের দিকে ছুটছে হাড়িয়া-হাফিজের জন্য, সি-ম্যানস্‌ মিশনের দরজা যখন বন্ধ, ফিজরয়ে আর চার্চ স্ট্রীটের দোকানীরা আপেলগুলো যখন রুমালে মুছে সেলফে ত্রিভুজের মত অথবা স্কাই-স্ক্রেপারের মত সাজাচ্ছে—একটি নূতন বিয়ে-হওয়া বৌ যখন তার পাহাড়সিঁড়ির ঘর থেকে সমুদ্রের বুকে ঠেলে-ওঠা সূর্যটাকে সবুজ মন নিয়ে দেখছে, তখন লিলি আর লিজেনের ঘরে স্কুল হোস্টেলের মেয়েরা রীতিমত একটা হাট বসিয়ে দিয়েছে। প্রশ্নের রকমফের রয়েছে ওদের। চোখ বড় করে, কখনও ছোট করে, কখনও বা সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে ম্যাজিকের রহস্য জানার

জন্য ভিড় করছে মেয়েগুলো। খবর শুনে কেউ নেচে নেচে ঘরে ঢুকল, কেউ শিষ দিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকল। লিলি টুথপেস্ট মুখে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কথা বলছে—দাঁড়া, দাঁড়া বলছি। লিজেন বিছানাগুলোর উপর উটপাখীর ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়তে বলছে—আমাদের গিলে ফেলবি নাকি তোরা।

লিলি স্নান করেছে একসময় গরম জলে, লিজেনকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে হোস্টেল সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের কাছে—সে আজ স্কুলে থাকতে পারবে না। তার আজ কাজ রয়েছে বন্দরে। বন্দরের সি-ম্যানস্‌ মিশনে। তারপর আলমারি খুলল, লিজেনকে ডেকে বলল—কোন্‌ স্কার্ট টা পরলে মানাবে ভাল। কোন ব্লাউজটা আজকের আবহাওয়ার সংগে ঠিক মত খাপ খাবে? সেই শুনে লিজেন বারান্দায় এল। সবুজ টেনিস্‌-লনের শিশির-ভেজা ঘাসের উপর শীতের এক টুকরো পাতলা রোদের রং দেখল। পাহাড়-সিঁড়ি দেখল -সমুদ্রের রং দেখল। শেষে ঘরে ঢুকে বললে—সবুজ স্কার্ট পরে, সাদা সার্টিনের ব্লাউজটা গায়ে দে। মেজাজের সংগে আবহাওয়া খাপ খাবে।

তাই হল। তাই পরল লিলি। সবুজ স্কার্ট পরল, সাদা সার্টিনের জামা গায় দিল। ধুসর রঙের একটা কোট রাখল হাতের কনুইয়ে যদি কুয়াশা নামে, যদি কনকনে ঠাণ্ডা ওঠে সমুদ্র থেকে। চুলের উপর আরেকবার ব্রাশ চালাল। দুটো অত্যন্ত হাল্কা ফুলমোজা পায়ের পাতে পরন্ত ঠেলে দিয়ে এসে দাঁড়াল বড় আয়নাটার সামনে। তারপর প্রসাধনে বসল। ঠিক জানলাটার রং দেখে ঠোঁটের উপর তুলি দিয়ে রক্ত-আঁক দিল সরু করে। ভ্রূতে পেন্সিল টেনে আরো দীর্ঘ করে দিল ঈগল পাখীর ডানার মত রেখাদুটোকে। শেষে ভ্রূদুটো প্রশস্ত করে শরীফ মেজাজে হাসল। হাসি দেখে লিজেন বললে- তুই রাজরাণী।

লিলি লিজেনের গালে চুমো খেয়ে বললে—তবে তুই আমার বাঁদি।—বলে আলনার কাছে গেল। আলনায় তিন-চারটা ভ্যানিটি ব্যাগ। এবারও জানালার রং দেখে একটা তুলে নিল পছন্দ মত কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে বারান্দায় বের হয়ে জুতো টেনে জুতো পরলে। পরে দুরন্ত দুটো হাত উড়ন্ত বুলবুলের মত বাতাসের নাচিয়ে নাচিয়ে স্কুল হোস্টেলের সকল মেয়েদের অভিবাদন করে পাহাড়-ছাদ থেকে নেমে গেল।

পাহাড়ের পথ শংখমুখী। ঘুরে ঘুরে পাহাড় থেকে উপত্যকায় নেমেছে। গম-ক্ষেতে ঢুকেছে, আপেল-বাগানের অলিগলি ধরে কবরখানার পাঁচলের বাঁ দিকের পথ অতিক্রম করে এসে থেমেছে ট্রাম-স্টপেজে। শেষ শেডের তলায় দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। ট্রাম এলে উঠবে, সি-ম্যানস্‌ মিশনে নামবে।

মিশন পৌছতে বেশ বেলা হল লিলির। মিশনের সামনের গোটা চত্বরটায় রোদ। হাল্কা রোদ—পাতলা রোদ। সে রোদের তেজ নেই, তোয়াজ আছে। সে মিষ্টি মিষ্টি রোদ গায়ে লাগলে মন নরম হয়, শীত যেন উষ্ণ হয়। সে রোদ গায়ে মেখে লিলি মিশনের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

যেই ঘরে ঢোকা সেই দশটা প্রশ্ন। এমন অবহেলায়, এমন অসময়ে! তারপর খুলে বলতে মরিশ বললে বলছ কি লিলি! লিটন কনুই কোমরে রেখে বললে—এ যে রীতিমত আজগুবি কথা হল। বিশ্বেস হচ্ছে না—কেমন করে হবে?

লিলি ততো বলছে, আমি দেখেছি সে মন্ত্র পড়ে কোত্থেকে একটা কালো সাপ এনে ডায়ালের উপর ফেলল। তারপর আবার দেখেছি ডায়ালের বুক বেয়ে সেই সাপটা অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। একটু রং চড়িয়েছে কথাটা বলার সময়। লিটন

আবার মিশনের সেক্রেটারীকে বলার সময় রং-চড়ানো পর্দায় আর একটি স্থূল প্রলেপ দিয়েছে, ক্রমশ সে চড়ানো রং বন্দর থেকে ক্রেনগুলোর পায়ে পায়ে কাঠের ঘরের অলিন্দ ধরে দোকানে দোকানে বিস্তৃতভাবে বিস্তারিত হল। ঘরে যে-ই ফিরেছে বন্দর থেকে সে-ই কুইন এলিজাবেথের সমারোহপূর্ণ জাহাজটার সঙ্গে খবর দিয়েছে বন্দরে সন্ধ্যায় ম্যাজিক হবে—সাপের নাচ। মোবারক নাচাবে সাপ, মন্ত্র পড়ে সাপটাকে ভারতবর্ষ থেকে এনে সকলের চোখের সামনে নাচাবে। মোবারক—ইণ্ডিয়ান—এ ম্যান অফ্ মিষ্টিক ল্যাণ্ড।

তারপর লিলি গেছে মোবারকের জাহাজে। একটি ডেনিস, দুটো আমেরিকান জাহাজ পার হলে সে জাহাজ। মাল খালাস হতে কিছু বাকী বলে কাঠের সিঁড়িটা প্রায় খাড়া হয়ে গ্যাংওয়েতে উঠে গেছে, তাই সে দু দিকের দুটো দড়ি ধরে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে গ্যাংওয়ে বেয়ে উঠল। সামনে গোল টেবিলে কোয়ার্টার মাস্টার, মাছ ধরার জাল বুনছে। চিত্ত তার একাগ্র। তবু লিলির দেহগন্ধে চোখ তুলে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে কেমন ঢোক গিলল। দু-একটি জরুরী প্রশ্ন করা দরকার, এ যে জাহাজ, এখানে যে যাব খুশী মত উঠতে নামতে যে পারে না সে কথা না জানিয়ে ওর জমকালো পোষাকের প্রতি শুধু সেলাম ঠুকল একটি। এবং লিলি যখন বললে, মোবারক কোন্ কেবিনে থাকে, সে তার কাছেই এসেছে তখন সুখানী সাহেবের চিত্ত কৃতজ্ঞতায় আরো গদ গদ হয়ে উঠল। জাল বোনা ফেলে কুর্নিশের কায়দায় বললে—আসুন' আমি আপনার বান্দা।

লিলি ডেকে ছোট ছোট পা ফেলে চলেছে আর দৃষ্টি রেখেছে চারিদিকে। সে দৃষ্টি কৌতূহলের। উইন্‌চ ড্রাইভাররা কি করে মেশিন চালাচ্ছে, ক্রেন ড্রাইভার কেমন করে নীচে নুয়ে দেখছে সব, দু নম্বর মালোম ফল্‌কায় ফল্‌কায় কি সব কথা বলে যাচ্ছে, ওর দৃষ্টিতে সব ধরা পড়ল। তারপর সে এল পিছিলে, যেখানে গ্যালী, বাথরুম, মেসরুম। দু-চারজন জাহাজী মেসরুমে মাদুর বিছিয়ে তখন মুখে ভাত ঠেলছে। দু-একজন একটু যায়গা করে নামাজ পড়ে নিচ্ছে। লিলি মেসরুমে উঁকি দিয়ে তাও দেখে নিল। সুখানী তখন বলছে—ওদিকে নয়, এদিকে আসুন। এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হবে। সেখানেই মোবারকের কেবিন। আপনি আসুন।

লিলি নীচে নামল, নেমে আওয়াজ পেল ফোঁকসালে ফোঁকসালে জাহাজীর। মোবারকের স্তিমিত আওয়াজও ওর কানে এসে ধাক্কা খেল। মোবারক অন্যান্য জাহাজীর তুলনায় যেন খুব আস্তে কথা বলছে।

শেষে এ-কেবিন সে-কেবিন দেখে লিলি ঢুকল মোবারকের কেবিনে। ঢুকে প্রথমে শেখরের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে মোবারকের দিকে এগিয়ে গেল।

মোবারক তখন বললে—গুড্ মর্নিং। লিলি তোমার শরীর ভাল তো?

—নিশ্চয়ই। তাই তোমার জাহাজে এসেছি।

—সে তো আমার সৌভাগ্য।

—আমি তোমার সৌভাগ্যকে টেনে নিয়ে আসতে রাজী নই। আমার সৌভাগ্যকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।

—তবে বোস।

—বিপরীত হলে বুঝি বসতে দিতে না?

শেখর হেসে বলল—আমি কিন্তু দিতাম।

শেখর বালিশের নীচে থেকে সিগারেট বার করে লিলিকে দিয়ে বলল—নাও

ধরাও। তাড়াতাড়ি কর। এখনি আবার ঘণ্টা পড়বে ইঞ্জিন-রুমে। এলে তো খুব সময় মত। এখনি তো আমাদের কাজে বের হয়ে যেতে হবে।

—হবে তো হবে।—মোবারকের দিকে চেয়ে বললে—তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—কথা আছে, কথা বলব। আগে বসো। তোমাকে বসতেই বা দিই কোথায়? বাংকের উপর পা দুলিয়ে রেলিংয়ে বসতে তোমার হয়তো খুব অসুবিধা হবে।

—অসুবিধা হলেও তো আর না বসে পারছি না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলব?—বলে শেখরের বাংকে বাল্কেডের উপর হেলান দিয়ে বসে পড়ল এবং নিশ্চিন্তে সিগারেট টেনে দম নিল যেন দুবার।

এমন সময় ইঞ্জিন-রুমে ঘণ্টার শব্দ উঠেছে। উইন্ডস্ হোলের ফাঁক থেকে চীৎকার করছে ইঞ্জিন-রুম বড় ট্যান্ডেল—যোয়ান লোক টান্টু কামে যাও।

শেখর বললে তাহলে উঠি।

মোবারক বললে—সারেংকে বলবি শেখর, ইঞ্জিন-রুমে নামতে আমার একটু দেরী হবে। লিলির কথা বলবি।

শেখর চলে যাওয়ার সময় লিলি বললে—তুমি বুঝি জাহাজ ছেড়ে কোথাও যাও না।

—কেন? যাই তো। মাঝে মাঝেই মিশনে যাই। তোমাকে দেখি, মোবারককে দেখি। তারপর জাহাজে আবার ফিরে আসি।

মোবারক বললে—ও যাবে কি বাইরে? ওর সে এক গাদা বই রয়েছে জাহাজে। সেগুলো ফেলে ওর কোথাও যেতে ইচ্ছা হয় না।—তারপর শেখর চলে গেলে মোবারক ওর লকার খুলে বইয়ের স্তূপ লিলিকে দেখিয়ে বলল গোটা সফর ধরে এরই ভিতর শেখর ডুবে রয়েছে। লেখা-পড়া জানা ছেলে কেন যে জাহাজে মরতে এল বুঝি না ছাই

লিলি বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে টের পেল আঙুলের দু ফাঁকের সিগারেটটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। সে পকেট থেকে তাই আর-একটা সিগারেট বের করে মোবারককে একটা দিল। তারপর পোড়া সিগারেট থেকে আগুন ধরিয়ে হুস্ হুস্ করে জোরে টানল ক'বার। শেখরের বাংকে বসে উন্মনা হয়ে ভীষণ কিছু যেন চিন্তা করছে লিলি।

মোবারক তার বাংকে বসে প্রশ্ন করলে—তারপর, কি বলছিলে?

—বলব, বলার জন্যই তোমাকে এমন অসময়ে বিরক্ত করছি। তুমি নিশ্চয়ই রাগ কর নি মোবারক?

রাগ করার কথাটা এত বেশী বলা হচ্ছে সে শেষ পর্যন্ত রাগ না-করে পারবো না দেখছি?

—তবে যে আমার বলা হবে না।

মোবারক হেসে ফেলল বলতে বলতে—বলো বলো, রাগ আমি করব না।

লিলি আধ-পোড়া সিগারেটটা হিলের তলায় ঘষে পোর্ট-হোল দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর আরক্তিম ঠোঁটে একটি হাল্কা হাসির পাপড়ি মেলে বললে—মিশনের প্রোগ্রাম আজ বদল করে দিলাম। তোমার আজ মাউথঅর্গান বাজানো হবে না।

—সে তো ভাল কথা। দু জনে বেশ তবে সানকুকের ডায়ালের উপর বসে গল্প করা যাবে। বাতিওয়ালার হাঁচিটা কাশিটা শুনে ফিস্ ফিস্ করে বলবে—আস্তে মোবারক।

লিলি সব কথা বাদ দিয়ে ফোঁকসালের উষ্ণতা মেখে বললে—তুমি ইন্ডিয়ান মোবারক!

—সে কথা ভাবতে তোমার আপত্তি আছে কি?

—না, তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি আজ অন্ততঃ আমার সম্মান রক্ষার্থে একটি বিষয়ে আপত্তি করবে না।

মোবারক কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললে—আমার সাধ্যের আওতায় থাকলে আপত্তি থাকার তো কিছু কথা নয়।

—তেমন কথাই বলব। তুমি ইন্ডিয়ান তাই তোমার পক্ষে সম্ভব। কাল তুমি আমায় ডায়ালের উপর সাপ, সাপের-নাচ দেখিয়েছিলে!

মোবারক এবারও হেসে উঠল।—সে কথা তুমি এখনও ভুলতে পার নি। সে তেমন কিছু না। কথাটা ভুলে যাও। অমন ভয় পাবে জানলে নিশ্চয়ই সাপটা দেখাতাম না। বিশ্বাস কর, আমি মিথ্যা বলছি না। তা ছাড়া তোমার তো ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক।

লিলিকে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ দেখালো। অথচ অম্লান ওর চোখের দৃষ্টি। তেমনই হাল্কা হাসি ওর ঠোঁটে। চোখের নীল তারাগুলো জ্বল জ্বল করছে। সে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। মোবারকের বলিষ্ঠ দুটো হাত ওর নিজের নরম দুটো হাতে অঞ্জলির মত গ্রহণ করে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল বলো তুমি আমার কথা রাখবে?

মোবারক লিলিকে কাছে টেনে আরো কাছে বসল। ফোকসালগুলো নিস্তব্ধ। কোথাও থেকে কোন শব্দ ভেসে আসছে না। শুধু ছাদের উপর পিছনের গ্যালিতে ভাণ্ডারীর কাঠের ছোনি নাড়ার শব্দ ঠক্ ঠক্ করে নীচে নেমে আসছে। সে গত রাতের সান ডায়াল ক্লকের ত্রুটির জন্য আজ সর্বতোভাবে লিলির অনুরোধকে অনুগ্রহের মত যেন ঠেলতে পারছে না। তাই মুখোমুখী হয়ে বলল—বলো, বিন্দু-মাত্র সম্ভব হলে তোমার অনুরোধ নিশ্চয়ই রাখব।

—তুমি ইন্ডিয়ান, তোমার পক্ষে সব সম্ভব। মিশন চত্বরে আজ শহর ভেঙে লোক জমবে। খবরটা আমিই সকলকে দিয়েছি। তোমাকে না জানিয়ে মিস্টার লিউডকে বলে প্রোগ্রাম করেছি ভিন্ন। ভিন্ন মঞ্চ হবে চত্বরে। সেখানে তোমার প্রোগ্রাম। তুমি সাপের-নাচ দেখাবে সেই মঞ্চে।

গত রাতে লিলি ডায়ালের উপর বিদ্রূপ করে যতটা উচ্চকিত হয়ে হেসেছিল, মোবারক হাসছে তার দ্বিগুণ চড়ায় সে হেসে হেসে বাংকের উপর গড়িয়ে পড়ল এই বলে—ব্লিউ তার জন্য তোমার এত ম্রিয়মাণ হয়ে অনুরোধ, এমন ভাংগা গলায় দু হাত হাতে তুলে এত বিনীত হয়ে বলা? তারপর বাংকের উপর সে সোজা হয়ে বলল—কথা আমি তোমার নিশ্চয়ই রাখব। শীত না থাকলে তুমি না বললেও আমি পথে ঘাটে এমনি নাচাতাম, যেমন করে অন্য সব বন্দরে নাচিয়েছি।

লিলি এবার সহজ হয়ে বসল বাংকে। ওর উচ্চকিত হাসির জন্য ওর কতক ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী একেবারেই বুঝতে পারে নি সে। শুধু এই বুঝল মোবারক তাকে কথা দিয়েছে, সে সাপ নাচাবে। ভারতবষ থেকে সাপটাকে সে মন্ত্র পড়ে ধরে নিয়ে আসবে বোধ হয়!

লিলি এবার বাংক থেকে উঠে দাঁড়াল, বললে—তবে চলি। সন্ধ্যা সাতটায় প্রোগ্রাম। আমি মোটর নিয়ে আসব, তুমি ছটায় ঠিক হয়ে থাকবে।

লিলি মোবারকের বুকের কাছে এসে মুখ তুলে হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়াল। সে নুয়ে হাত ধরলে লিলির, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল ওদের দুটো মুখ। কিন্তু সাহস হল না মেয়েটির। ওর নরম দেহ মাধবীলতার মত কেঁপে উঠলেও সে আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে ওর আরক্তিম ঠোঁটদুটোয় কিছু উষ্ণ চাপ পেতে পারল না, শুধু মুখোমুখী হয়ে বলল ফিস ফিস করে—মাই ডার্লিং, মাই ম্যাজিসিয়ান।

মোবারক আর্তনাদ করে যেন উঠল—বিলিভ আমি যাদুকর নই।

লিলি ততক্ষণে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছে।

মোবারক দরজার বাইরে এসেছে যেন আর্তনাদ করতে করতেই—লিলি আমি যাদুকর নই। সাপটা আমার ভেল্কি নয়, সে জীবন্ত, আমার পোষমানা জীব।

লিলি ডেক ধরে 'দ'-এর মত পা ফেলে প্রায় ছুটে যাওয়ার মত যেন হাঁটছে। ডান হাত বাতাসে নেড়ে বলছে—যাদুকর যারা তারা তো এমনি করেই বলে মোবারক।

—বিশ্বাস না হয় নীচে আমার ফোকসালে এস দেখিয়ে দিচ্ছি।—কথাটি বলে কিছুক্ষণ পিছিলের স্টেনসান ধরে হাঁফিয়ে নিল বুঝি মোবারক।

লিলি সিঁড়ি দিয়ে তেমনি নামছে মোবারকের প্রতি দৃপ্ত দৃষ্টি তুলে। ওর যাদুকর মোবারক। আশ্চর্য এক দেশের মাটির গন্ধ ওর দেহে। চোখদুটোয় কেমন এক মায়ায় ভরা ডাক। জেটিতে নেমে হাত নেড়ে বললে না না মোবারক, তোমার সে ম্যাজিক, তোমার সে সাপের-নাচ একা ফোকসালে দাঁড়িয়ে দেখলে আমি ঠিক থাকতে পারব না। তুমি সে অনুরোধ আমায় আর করো না।

মোবারক স্টেনসান জড়িয়ে এতটা উত্তেজিত হয়েছে যে সে আর কোন কথা পর্যন্ত বলতে পারল না। সে শুধু চেয়ে রয়েছে লিলির দিকে। তার দেহছায়া সোনালী রোদে পাহাড়-সিঁড়ির ধাপে-ধাপে উঠে যাচ্ছে। পাকে পাকে যে পথ গেছে সেই পথে কেমন করে হারিয়ে যাচ্ছে তাই দেখছে দাঁড়িয়ে।

ভাণ্ডারী গ্যালী থেকে উঁকি দিয়ে বলেছে যখন এই মিঞা মাইয়াডা কি কইল রে ব?

মোবারক কোনরকমে যেন বললে ভাণ্ডারীকে—কিছু না।

লিলি যতটা হাল্কা হয়ে পাখীর ডানার মত উড়ে উড়ে পাহাড় সিঁড়িতে হারিয়ে গেল মোবারক ততো প্রস্তরের মত ভারী হয়ে সেই পিছিলের উপর থেকে পাঁচ নম্বর, চার নম্বর ফল্কা অতিক্রম করে না-চলি না-চলির মত ইঞ্জিন-রুমে গিয়ে নামল। ওর বুকে আবার জ্বালা ধরেছে। লিলি এতক্ষণ বাংকে বসে কথা বলে নি তো—বিদ্রূপ করেছে। মোবারকের পোষমানা জীবটিকে সে ভেল্কি বলেই জেনেছে

নিজের মনেই বিড় বিড় করতে করতে এক সময় মোবারক টানেলের ভিতরও ঢুকে গেল। সে শেখরকে খুঁজছে। শেখরের কাছে তার নালিস। শেখরকে বলবে মেয়েটা এতক্ষণ কথা বলে গেল না তো বিদ্রূপ করে গেল। সেই কথার পুনরাবৃত্তি তাই ওর ঠোঁটদুটোয় কেবল পাক খাচ্ছে।

শেখরকে মোবারক টানেলের তলায় খুঁজে পেল না। টানেলের ভিতরও না। প্রপেলার-শ্যাফ্ট পর্যন্ত সে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে কিন্তু পায় নি। টানেলের বাইরে এসে এভাপরেটারের তামার পাইপগুলোতে যারা স্ক্রেপ করছে তাদের ভিতরও সে নেই। তারপর জেনারেল পাম্পের নীচে এবং পাশে, স্টোকহলে—কিন্তু কোথাও নেই। সারেংকে জিজ্ঞেস করতে সারেং বললে—বাঙ্গালী বাবু চার নম্বর সাবের সঙ্গে এক নম্বর উইনচে কাজ করছে। সেই শুনে মোবারক ছুটল হ্যারিকেন ডেকে। শেখরকে

বলতেই হবে—ব্রিউ এতক্ষণ ওর কেবিনে বসে শঙ্খচূড়টাকে ভেল্কি বলে বিদ্রূপ করে গেল। মেয়েটাকে সমুচিত জবাব দিতে হবে।

মোবারক স্টোকহোলের সিঁড়ি ধরে উপরে উঠল। চিমনীটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে শ্বাস নিল জোরে। পা দুটো ক্রমশ যেন প্রস্তরীভূত হয়ে উঠছে। উত্তেজনা এবং মনের আকুপাক্ শেখরকে না বলা পর্যন্ত খালাস হবে না। সে তাই বোট-ডেক থেকে নেমে তিন নম্বর ফল্কা অতিক্রম করে এক নম্বর উইনচের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

শেখর কাজ করছে। চার নম্বর সাব উইনচের ভিতরে ঢুকে স্ট্রেপার খুলছে। দুটো পা শুধু বাইরে বের হয়ে আছে ওর। হাতুড়ি, বাটালি, স্প্যানার যখন যা কিছুর দরকার সরবরাহ করছে শেখর। ঢিলে স্ট্রেপারগুলোর ফাইল করে দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

মোবারক শেখরের পাশে দাঁড়িয়ে বললে—ব্রিউ আমার সাপটাকে অস্বীকার করল।

—করেছে তো বেশ করেছে তাতে তোর কি এল গেল?

—তুই এটা কেমন কথা বলছিস শেখর!

—আমি ঠিক বলছি।

—না, তুই ঠিক বলিস নি। আমি জ্যান্ত সাপটা কালকে দেখালাম আর সে বলছে কি না যাদু করে আমি সাপ দেখিয়েছি। আমার পোষমানা জীবটি অস্বীকার করে বলবে ম্যাজিক, আর মুখ বুজে তা হজম করব?

—একান্তই যদি অস্বীকার করে তো সাপটাকে ওর গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে পরখ করতে বলবি সত্য কি মিথ্যা।

মোবারক এতক্ষণে যেন আশ্বস্ত হল, এতক্ষণে যেন পথ পেল, একগলা উত্তেজনা থেকে খালাস পেল। কিন্তু কথা সে ঠিক রাখবে। মঞ্চের উপর সাপের নাচ সে যথার্থই দেখাবে। সেই দেখে যদি ওরা ওকে যাদুকর ভাবে তো বয়ে গেল। সে শুধু লিলিকে প্রমাণ দেবে—সাপটা তার ঘরের মানুষ। জৈনব খাতুনের অতি আদর করে দেওয়া। বিগত প্রেমের এক জীবন্ত ফসিল।

পাহাড়-সিঁড়ির ধাপে ধাপে লিলি কিন্তু তখনও 'দ'-এর মত পা ফেলে কেমন উচ্ছল হয়ে হাঁটছে। বুকে তার অফুরন্ত প্রেম, অফুরন্ত আনন্দ, অফুরন্ত কানাকানির কথা। মোবারককে নিউ-প্লাইমাউথের ঘরে ঘরে ভালবাসায় বেঁধে রেখেছে। তারা একান্ত বিস্ময়ে কাচের শার্সি তুলে অপেক্ষা করেছে প্রতি বিকেলে—মোবারক বাঁশি বাজিয়ে যাবে। যাবে পাহাড়-ছাদে, যাবে ব্রিউর স্কুল-হোস্টেলে। ব্রিউকে দেখে কত মেয়ে তাই হিংসে করছে। লিজেনও বুঝি!

লিলি চড়াই ভেঙে উৎরাই ভেঙে হাঁটছে। অসহিষ্ণু মন নীল আকাশ দেখছে। চার্চ স্ট্রীট, নিউ স্ট্রীট, গীর্জার পুকুর অতিক্রম করে সে নেমেছে ফিজরয়ে। একটা কাফেতে ঢুকে ঢক ঢক করে গলায় ঢালল কিছু—বখশিস দিল বয়টাকে, খুশী মত পয়সা খরচ করল। যাকে পেল, পরিচিত অ-পরিচিত তাকেই ম্যাজিকের খবর দিয়ে ফুরফুরে চুল উড়িয়ে বাঁদিকের পথ ধরে সমুদ্রের দিকে নেমে গেল। সব আজ তার ভাল লাগছে। সুন্দর মনে হচ্ছে এই পৃথিবীকে। পাহাড়গুলোকে দেখে মনে হল তারা আজ অত্যন্ত খুশী। সোনালী রোদকে মনে হল খিল খিল করে হাসছে। সমুদ্রের নীল তরঙ্গে দেখল নিভাঁজ ঢেউ তারপর একটা দমকা হাওয়ায় নিজের রুমালটা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বললে—মোবারক মাই ডার্লিং, মাই ম্যাজিসিয়ন।

লিলি আবার বালিয়াড়ি থেকে উঠে গেল। পাহাড়-সিঁড়ি বেয়ে শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নিজের ঘরে গেলে হয়। মাকে খবর দিলে হত! কিন্তু লিলির কেমন সংকোচ হল। মা নিশ্চয়ই খবরটা পেয়েছেন। সে তাই পিকাকোরা পার্কের পথ ধরে রাণী এলিজাবেথকে যে চত্বরে প্রথম অভ্যর্থনা জানানো হবে সেখানে গিয়ে ঢুকল। বিরাট মঞ্চ করা হয়েছে, হাজার অতিথির জন্য চেয়ার দেওয়া হয়েছে। তারপর দামী কার্পেট বিছানো, চত্বরে ঢোকার প্রথম দরজায় দুজন অশ্বারোহী পুরুষ। ঝকঝকে তলোয়ার হাতে। রুপালি রঙের কটিবন্ধ। তারা লায়ন রকের দিকে মুখ করে আছে।

সে হাঁটল শহরের বিভিন্ন পথ ধরে। পথগুলো সুসজ্জিত। কাঠের ঘরগুলো বিভিন্ন ফুলেব সমারোহে নৃত্যচঞ্চল মেয়ের মত মুখরিত হয়ে উঠেছে। পথের দু পাশে কাঠের রেলিং দেওয়া। গ্রাম থেকে লোকের ভিড় সেই রেলিং লাগোয়া হয়ে অপেক্ষা করছে কখন রাণী এই পথ ধরে যাবেন। এলিজাবেথের গাড়ীতে তারা ফুল ছিটিয়ে দেবে। ঘরের বারান্দাগুলোতে মানুষের ভিড়। তারা বন্দরের দিকে দৃষ্টি রেখে উন্মুখ হয়ে আছে।

লিলি নিজের মনেই হাসল—মানুষগুলো পাগল।

শেষে যখন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার একটুকরো কুয়াশার মায়া মেখে নিউ-প্লাই-মাউথের মসৃণ চুমো খেল, যখন কুইন এলিজাবেথের শোভাযাত্রা শত অশ্বারোহীর ঠক ঠক আওয়াজের ভিতর মিলিয়ে গেল, যখন সেই ভগ্ন জনতা শহর ভেঙে বন্দরে ছুটেছে সেই সময় লিলি লিটনের মোটর হাঁকিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় এসে হাঁকল—সুখানী, মোবারককে খবর দাও ভাই লিটি এসেছে মোটর নিয়ে।

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রার মত লিলির শরীর উইংসের আলোতে ঝক্ ঝক্ করছে। ওর সবুজ স্কার্টে আলোর বন্যা নেমেছে যেন। মোবারক ডেক অতিক্রম করে আসছে তখন। শেখর ওকে অনুসরণ করছে। দুজন বাঙালী একজন মাউরী মেয়েকে অলক্ষ্যে উঁকি দিয়ে দেখল, পাঁচ নম্বর সাবের কেবিনের ফাঁক থেকে—মেয়েটা উঠে আসছে।

মোবারকের গায়ে দামী নেভী ব্লু সার্জ। হাতে লেদার ব্যাগ। মাথায় নীল ফেল্ট ক্যাপ। আমেরিকান কায়দায় টাইটা ঝুলিয়েছে নাভি পর্যন্ত। ডান হাতটা পকেটে। সে সিঁড়ি দিয়ে নামল কেমন ক্লান্ত পা ফেলে। নীচে নামলে লিটন দরজা খুলে দিল। লিলি হ্যান্ডশেক করল দুজনের সঙ্গে কিন্তু কোন কথা হল না। মোবারক নীরব। মোটরটা যখন বন্দর-পথ ভেঙে এইচ. পি বুচারেব মদের দোকান পিছনে ফেলে মিশনের চত্বরে ঢোকার চেষ্টা করল সেই সময় লিলি বললে—দেখছ শেখর, দেখেছ মোবারক, শহর ভেঙে জনতা এসে কেমন ভিড় করেছে!

মোবারক উত্তর করল না—শুধু শেখর 'হুঁ' বলে কিছু প্রতিধ্বনি করল মাত্র।

মোবারকের দীঘ দেহটা চত্বরে নামতেই জনতা দু ভাগ হয়ে পথ করে দিল। লিলির হাত ধরে সে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছন্ন দৃষ্টি তার বিরাট জনতাকে পার হয়ে সেই পাহাড়-ছাদে। যেখানে রেস্ট-রুম রয়েছে। যেখানে সান ডায়েল ক্লক রয়েছে। সে দেখল ভিড় থেমে আছে বাতিঘরের পাহাড়-ছাদের নীচের ধাপ পর্যন্ত। পাহাড়-সিঁড়ির হাঁটু ভাঙা 'দ'-এর স্তরে স্তরে গ্যালারি। সব মানুষ উন্মুখ প্রত্যাশায় বসে আছে। নীরব, নিস্তব্ধ, এতটুকু আওয়াজ নেই কোথাও। শুধু এক পশলা হিমের গুড়ো রিণ রিণ শব্দে ক্রমশ নীচে নেমে আসছে।

মোবারক গিয়ে মঞ্চে উঠল। লেদার ব্যাগটা উইংসের ছায়ায় রেখেছে। তারপর উইংসের তলায় হাত বাড়িয়ে সাপটাকে টেনে টেনে বের করল। বিস্ময়ে 'থ' হয়ে থাকা হাজারো মানুষের চোখের উপর বারো ফিটের শঙ্খচূড়টাকে দুলিয়ে দুলিয়ে নাচাল। দু ঠোঁটে তার মাউথঅর্গান বাজছে এবং সে দুলে দুলে ভয়ংকর সাপের মুখোমুখী হল। জনতার উন্মুখ দৃষ্টি তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অনেকে এই ভয়ংকর দৃশ্যকে সহ্য করতে না পেরে চোখ ঢাকল।

তারপর মোবারক নেমেছে মঞ্চ থেকে। সাপটা গড়িয়ে গড়িয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। হাজারো মানুষের কণ্ঠ উচ্চকিত। তারা অদ্ভুতভাবে টুপি উড়িয়ে মোবারককে অভিবাদন জানাল। অনেকে ভিড় ঠেলে এসে তার দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহটাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। লিলি এল, সেক্রেটারী এল কিন্তু কারো সংগে সে কথা বলল না। শুধু একসময় উইংসের আড়াল থেকে ব্যাগটা নিয়ে লিলির হাত চেপে ধরল। বললে—চল পাহাড়-ছাদের সান ডায়াল ক্লকে।

সেই সান ডায়াল ক্লক আর রেস্ট-রুম, সেই পাহাড়-ছাদ। বিগত অনেকগুলো রাতের কবোষ্ণ নিশ্বাস যেখানে লিলির সিক্ত ঠোঁটগুলোয় কামনার আর্তি লতিয়ে লতিয়ে আবার হিমশীতল হয়েছে।

লিলি এল, মোবারক এল। নিঃশব্দ উভয়ে ডান হাতের কঠিন চাপে মাঝে মাঝে লিলির নরম হাতটা আর্তনাদ করছে। তবু সে কিছু বলছে না– কাঁদছে না। হাতের কঠিন চাপে শুধু মাঝে মাঝে মোবারকের উপর ঢলে পড়তে চাইছে।

পাহাড়-ছাদে সান ডায়াল ক্লকের উপর ত্রিভূজের মত কাঠটাকে ব্যবধান রেখে দুজন বসল। তারপর ব্যাগ থেকে টেনে টেনে মোবারক শঙ্খচূড়টা বের করছে। শীত তীব্র বলে কিছুতেই ভিতরের গরম ছেড়ে হিমশীতল ঠাণ্ডায় আসতে চাইছে না সে। তবু অনেক টেনে সাপটা লিলির সামনে বের করতেই অর্ধমৃতের মত চোখ বুজে দুটো হাত মোবারকের প্রতি তুলে লিলি শুকনো কণ্ঠে শুধু বললে মোবারক!

—দেখই না বলে সাপটাকে আরো কাছে টেনে নিল মোবারক। ভারতবর্ষ থেকে এটাকে মন্ত্র পড়ে নিয়ে আসি নি, দয়া করে আমার ব্যাগের ভিতরই শঙ্খচূড়টা থাকে। এটা আমার পোষমানা জীব।

ডায়ালের উপর ভয়ে লিলি উঠে বসেছে। লিলির শ্যাম্পু-করা ফুর ফুর চুল-গুলি উড়ছে।

মোবারক ক্লান্ত, লজ্জিত এবং সংকুচিত। মাথা নীচু করে তাই সে অনেকক্ষণ বসে থাকল।

লিলি বললে ওর হাত টেনে। তোমার আজ জাহাজে ফিরতে হবে না, আজ চল ফিজরয়ে মায়ের কাছে।

মোবারক উত্তর করতে পারল না, মন্ত্রমুগ্ধের মত সে শুধু ডায়াল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

অন্য কোন আওয়াজ নেই। পাহাড়-ছাদ, কোরী-পাইনের বনভূমি অন্ধকারে ঘুমিয়ে রয়েছে। একমাত্র উপত্যকার গ্যালারীর মত চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বন্দর থেকে মোটরগুলো মাল নিয়ে শহর ছাড়িয়ে অন্য পাহাড় প্রান্তে ছুটছে। তারা দুজন পাহাড়-ছাদ থেকে নেমে এল সেই সময়।

নীচে কবর-ভূমি। কবরের পাঁচিল। পাঁচিল ঘেঁষে পথ, পথ গিয়ে থেমেছে ট্রাম স্টপেজে।

লিলি এসে একবার কবর-ভূমির দরজায় থামল। পিছনে মোবারক। মোবারক কথা বলছে না। সে কেমন আনমনা হয়ে পাহাড়-সিঁড়ি ভেঙে হাঁটছে।

লিলি বললে—মোবারক তুমি আমার বাবার কথা শুনেছিলে।

মোবারক বললে—তিনি তো মারা গেছেন।

—তাঁর সমাধি আছে এই কবর-ভূমিতে। চল না দেখবে।

লিলি চাইছে মোবারক পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। ওর আনমনা মন লিলির চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত হোক।

সদর দরজার পরে লাল কাঠের ঘর। দারোয়ান বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে ওল্ড টেস্টামেণ্ট থেকে একটি ক্ষুদ্র অংশ বার বার একই সুর করে পড়ছে।

বারান্দার সামনে কালো সরীসৃপের মত অমসৃণ পথ। লিলি আর মোবারক সেই পথে আরো দুটো গ্যাসপোস্ট অতিক্রম করে গেল।

প্রতি কবরের বুকে নিভন্ত মোমের আলো। প্রিয়জনেরা সন্ধ্যায় আলো জেবলে দিয়ে গেছে। অনেক রাত পর্যন্ত জবলে আর জবলতে পারছে না।

লিলি আর মোবারক এসে থামল ক্ষুদ্র একটি আপেল গাছের ছায়ায়। জাফরানী রঙের আলো গ্যাসপোস্ট হতে ঝরে পড়েছে, নিভন্ত মোমের আলো নিবু নিবু হয়ে কবরের ক্রসের উপর জবলছে। লিলি বসল হাঁটু গেড়ে এবং মোবারক সেই মত অনুসরণ করে কবরের প্রতি আর-একটু ঝুঁকে বসল।

লিলি বললে তখন—মা সন্ধ্যায় রোজ এখানে আলো জেবলে দিয়ে যান।

কিন্তু নিভন্ত আলো এবং বিবর্ণ গেরুয়া রঙের আলোর ছায়ায় কবরের উপর অক্ষরগুলো হয়েছে অত্যন্ত অস্পষ্ট। সে জন্য মোবারক আরও একটু ঝুঁকে অত্যন্ত কাছাকাছি হয়ে দেখার চেষ্টা করল লেখা দুটো কিসের। আলোর পড়ো পড়ো শিখা নিঃশেষ হয়ে গেল বলে, নিভন্ত আলো একেবারে নিভে গেল বলে দেয়াশলাইর আলো জ্বালল মোবারক। জাফরানী আলোয় হঠাৎ নীল-নীল চোখে দেখল সে হরফের লেখাগুলো নীল হয়ে উঠেছে। নীল রেখায় মূর্ত হয়েছে পাতার ফাঁকে চুইয়ে-পড়া জাফরানী রঙের নীচে দুটো কথা, ক্রসের উপর—প্রথমে ইংরেজীতে, হেনাফোর্ড এবং আরো কি ; পরে বাংলা হরফে...

লিলি ডায়ালের উপর চোখ বুজে দু চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। মোবারকের হাত থেকে ছাড়া সাপটা তখন ডায়াল থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে ধূপছায়া এক পাহাড় অন্ধকারে লিলির পা জড়িয়ে কোমর অতিক্রম করে যেন বুকের ভিতরের উষ্ণতা খুঁজছে। ব্লাউজের অন্তরালে মাথাটা ঢুকিয়ে বুকের চারিপাশে প্যাঁচ কসবে বুঝি!

লিলি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ডায়ালের উপর ঢলে পড়ার সময় মোবারক ওকে দু হাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নিল। ব্লাউজের অন্তরাল থেকে সাপের মাথাটা খুঁজে টেনে টেনে বের করল। হাতের উপর প্যাঁচ খেলিয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললে—শাঁখচুড়টা আমার হাতে। ভয় নেই, চোখ খুলে চেয়ে দেখ। ও অন্যায় করে না। প্রতিদিন দেখলে তুমিও ওকে ভালবেসে ফেলতে।

লিলি মোবারকের বাঁ হাতের উপর সমস্ত শরীরের অবলম্বন রেখে কোন রকমে একবার অর্ধ-নিমীলিত হয়ে চাইল হাতে প্যাঁচ-খাওয়া সাপটার দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে চোখ বুজে ফেলল। শেষে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল—আর পারছি না মোবারক।...তারপর বললে—আমি বিশ্বাস করি।

সাপটা চলে গেল মোবারকের নির্দেশে, ডায়ালের বুক বেয়ে বেয়ে ব্যাগের ভিতর ঢুকে চুপ করে বসে থাকল। একবারের জন্যও সে আজ ফোঁস করে বললে না—এসব কি হচ্ছে।

মোবারক বললে—শঙ্খচূড়টা চলে গেছে ব্রিউ!

লিলি এবার সোজাসুজি তাকাল। দু হাতে হঠাৎ মোবারককে সাপটার মত পেঁচিয়ে ধরল। ডালিম পাতার মত সরু নাকটা আর রক্তিম ঠোঁটদুটো বুকের উপর ঘষে ঘষে বললে—মাই ডার্লিং, আই লাভ য়্যু।

তারপর লিলি থেকে থেকে বার বার বলছে এক কথা—বুকের উপর নাক-মুখ ঘসে বলছে শুধু, মো—বা—র—ক।—তার মনের প্রকাশ, সমস্ত কামনার উষ্ণতা, তীব্র নিবিড়তার ঘনিষ্ঠতা, একটি কথার ভিতরই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। আকাশ-ঝরা তারার মত সে কথা ওর মনে রেখাঙ্কিত করে দিল ব্রিউর কান্না-ভরা হৃদয়ের ছবি। মন তাই তার ঝর্ণার গলে-পড়া হীরকচূর্ণের মত গলে গলে পড়ল। সেইজন্যই বুঝি আবার ডাকল—ব্রি-উ।

লিলি বুকের উপর পড়ে থেকেই উত্তর করলে—মো—বা—র—ক।

শঙ্খচূড় চলে গেছে। সুতরাং চল কোরী-পাইনের তলায় গিয়ে বসি।

লিলি নিথর। দুটো হাত সেই আগের মত জড়ানো, এবং কোন জবাব উঠল না ওর কণ্ঠে। সে নির্জন রাতের মত নীরব হয়ে গেছে। কামনাবহ্নি পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে রক্তপ্রবাহ হতে।

মোবারক অনুভব করছে ওর শরীর ক'বার কেমন করে যেন রোমাঞ্চিত হল। হরীতকী গাছের ছায়ার নীচের অন্ধকারটার মত এ অন্ধকারটাও হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টানছে। গামীনগড়ের বাল্যপ্রেম এখানটায় আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

মোবারক ওর কাছ থেকে দু-কদম সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সে ওর সঙ্গে যেন সম্পূর্ণ জট পাকিয়ে আছে, ওর যেন এতটুকু ক্ষমতা নেই এ জট ছাড়িয়ে মুক্ত হবার।

পাশেই ক্লকের সিমেণ্ট-করা ডায়াল। কোন অদৃশ্য শক্তি ওদের দুজনকে সে দিকে যেন শুধু টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর দুটো তারা আকাশ থেকে খসে পড়ল সেই ডায়ালে। ডায়ালের বুকে ওরা এগিয়ে গেল। এবং ক-ফোটা শিশিরবিন্দু গড়িয়ে এসে থমকে দাঁড়াল পৃথিবীর কোলে। নির্গমপথে সবুজ সেই রং জন্মের ইসারা দিল।

তারপর—?

তারপর আবার নীরব সব। মোবারক ক্লান্ত দেহটা নিয়ে কোন রকমে উঠে দাঁড়াল।

সে সময় প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের ঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দ শোনা গেল। কোরী-পাইনের অন্ধকার ভেঙ্গে সে-শব্দ মোবারকের কানে এসে ধাক্কা খেল। সে শব্দে মোবারক উৎকর্ণ হল। দু হাত উপরে তুলে পাগলের মত ডেকে উঠল তারপর—খোদা হাফেজ!

অনেকক্ষণ পর শেখর পা বাড়াল ডেক থেকে মেস-রুমের দিকে। এতক্ষণ এই ভোরের আলোয় শেখর পাহাড়-সিঁড়ির দিকে চোখ রেখে প্রতীক্ষায় ছিল মোবারকের। গত রাতে সে জাহাজে ফেরে নি।

মেস-রুমে ঢুকে টিনের থালায় ওর খাবার নিয়ে নিল মোবারকের খাবারটা গত

রাতের মতই সাজিয়ে লকারে রেখে দিয়ে এসেছে। যখনই আসুক, দু মুঠো অন্তত কিছু মুখে দিতে পারবে।

কিন্তু মেস-রুমে খেতে বসতেই ইঞ্জিন সারেং এসে দরজার উপর ভর করে ডাকল—শেখর, তোকে বাড়িওয়ালা ডাকছে। বড় মালোম, বড় মিস্ত্রী ওঁরাও ব্রীজে আছেন।

—আমায় কাপ্তেন ডাকছেন?

—হুঁ। ডাকছেন। মোবারক কাল জাহাজে আসে নি। আজ কাজে যায় নি, আমি তাই রিপোর্ট দিয়েছি।

—কাল আসে নি, আজ আসত। আঠারো মাস সফরে কাল রাতেই শুধু আসে নি। আর তার জন্যই আপনি রিপোর্ট দিয়ে দিলেন?

—আমি বাপু ওসব বুঝি নে! যা ভাল বুঝেছি, তাই করেছি। আমার সংগে তুমি এস।

শেখর হাত মুখ ধুয়ে মেস-রুম থেকে বেরিয়ে এল এবং প্রথম বারের মত থামল এসে অ্যাকামোডেশন ল্যাডারের গুঁড়িতে। সারেং আগে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। ব্রীজে গিয়ে খবর দিল, শেখর নীচে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ পর সারেং ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকল—ওপরে উঠে আয়।

শেখর কোনরকমে লাফিয়ে উঠল। মই বেয়ে ক্যাপ্টেনের কেবিন ঘুরে উঠে গেল ব্রীজে। ভিতরে ঢুকে দেখল চিফ্-ইঞ্জিনিয়ার স্টিয়ারিং-হুইলের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। কম্পাসটার সোজাসুজি বার্নিশকরা মেহগনি কাঠের রেলিংয়ের ওপর ভর করে বসে আছেন চিফ্-অফিসার আর ক্যাপ্টেন।

শেখর ঢুকতেই চিফ্-ইঞ্জিনিয়ার প্রশ্ন করলেন—মোবারক কোথায় গেছে শেখর? তুমি বলতে পার?

—পারি। সন্ধ্যায় সে সি-ম্যানস মিশনে গেছে।

—তারপরের খবরটা জানতে চাই।

—তারপরের খবর আপনি ঠিক যা জানেন আমিও তাই জানি স্যার।

—কিন্তু সারেং যে বলল মোবারকের সব খবর তুমি রাখ।

—রাখি। কিন্তু কতটা রাখি সারেং সাব তা জানতেন না।

—শেখর!—চিফ্-ইঞ্জিনিয়ার ধমক দিয়ে উঠলেন।—সব খুলে না বললে লগ-বুকে স্যার তোমার নাম তুলে নেবেন।

—যা আমি জানি না স্যার, জানবার কথা নয়, সে নিয়ে যদি সারেং সাহেবের কথার উপর ভর করে লগ-বুকে আমার নাম তোলেন তবে ক্ষতি আমার হবে ঠিক, কিন্তু মোবারকের অনুসন্ধান পাওয়া যাবে না।

মোবারকের নামে ওয়ারেণ্ট দিচ্ছি। শুনেছি সে অ্যাগমণ্ট-হিলের দিকে একটি মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে।

শেখর চুপ করে থাকল।

—হাতে আমাদের এতটুকু সময় নেই। কারণ জাহাজ আজ-কালই ছেড়ে দেবে, নয় তো অপেক্ষা করা যেত।—চিফ্-ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে শেষে বললেন—তাহলে যেতে পারে স্যার?

হুম্ করে একটি শব্দ ঘোঁৎ করে ক্যাপ্টেনের নাক মুখ দুই জুড়ে বেরিয়ে এল। ক্যাপ্টেন সম্মতি জানিয়েছেন।

শেখর ব্রীজ থেকে তখন নেমে এল ডেকের উপর। মাউন্ট অ্যাগমণ্ট আর লায়ন রকের বুক জুড়ে ওর বিবর্ণ দৃষ্টি। বড্ড অসহায় ও আজ। অন্তর থেকে খুব সহজ-ভাবে উঠে এল কথাগুলি—জাহাজ সেল করবে। ওয়ারেণ্ট যাচ্ছে মোবারকের নামে। হয়তো সে না ফিরলে শেখরের অস্তিত্ব জাহাজে দুঃসহ হয়ে উঠবে। অনুভব করল আজ তার জীবনটা কেমন কেন্দ্রবিমুখ হয়ে উঠেছে। আঠার মাস সফরে দরিয়ার বুকে ওদের দু জনের ভিতর এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সমাজ আর গৃহজীবনে সে সম্পর্ক গড়ে ওঠা ভার। তাই মোবারক আর শেখর দুই ভিন্ন জাতির দু-ধারা সমুদ্রের একঘেয়ে জীবনে এক রক্ত হয়ে গেল। সেই ধারা যদি দু-ধারা হয় তবে শেখর ঝরা পাহাড়ী কুরচীর মত শীর্ণ গ্লানিমায় ঢাকা পড়বে।

ভাবতে ভাবতে চোখদুটো ঝাপসা হয়ে ওঠায় শেখর ফোকশালের দিকে পা বাড়াল।

সারেং নীচে এসেছিল শেখরকে খুঁজতে, সে যেন নীচে কাজ করতে যায়। চার নম্বর সাবকে সাহায্য করতে হবে। কণ্ডেন্সার খোলা হয়েছে, পানি মারতে হবে পাইপে। সে শুনেও শুনল না। সারাটা দুপুর বসে বসে মোবারকের দুর্যোগপূর্ণ জীবনের কথা সে চিন্তা করল। সঙ্গে সঙ্গে বাকী সফরের নিঃসঙ্গ জাহাজী জীবনের কথা ভেবে যেন মুষড়ে পড়ল।

বিকেলবেলায় শেখর একবার মাত্র উঠে এসেছিল ডেকে। মোবারকের ওয়ারেণ্টের মতই যেন বিকেলটা পাণ্ডুর হয়ে আছে। সব চুপ হয়ে আছে। জাহাজীরাও। শুধু কারপেণ্টার আর দু নম্বর ডেকে অ্যাপ্রেণ্টিস ফল্কার ওপর ক ভাজ ত্রিপল ঢাকা দিয়ে নীচে লোহার পাতের ওপর কীল আঁটছে। ডেকে আর কেউ নেই। ডেকপথ, এলিওয়ে-পথ সব শূন্য। শুধু পোর্ট সাইডের গ্যাংওয়েতে কোয়ার্টার মাস্টার কনকনে হাওয়ার ভিতর বসে বসে কাঁপছে।

ক্রেন মেশিনের নীচে জেটির ওপর সবুজ মোটর। সে মোটরে সারেং বড় মালোম ওয়ারেণ্ট দিতে যাচ্ছেন। শেখর দাঁড়িয়ে থাকল। বড় মালোম কেবিন থেকে বেরিয়ে এলে একবার অনুরোধ করবে। শুধু এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে বলবে। কারণ ওর মন বলছে আজ যখনই হোক মোবারক ফিরবে। পোর্ট-সাইডের এলিওয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। বুকের ভিতর কেমন যেন ধুকধুক একটা বিচিত্র শব্দ উঠছে। কেমন এক বিচিত্র রকমের জড়তায় সে পাথরের মত স্থির হয়ে আছে।

পাথরের মত স্থির হয়ে আছে ওর শরীর মন সব। কারণ এলিওয়ে ধরে চিফ্-অফিসার বের হয়ে আসছেন। আসছেন ওর দিকে। এসেই এমন দুটো রক্তচোখ নিয়ে ওর পাশ কাটিয়ে গেলেন যে সে কিছুতেই অনুরোধ করে বলতে পারল না, শুধু একটা দিনের জন্য অপেক্ষা করে দেখুন মোবারক আসে কি-না।

চিফ্-অফিসার গ্যাংওয়ে ধরে নেমে গেলেন। পরে জাহাজ থেকে জেটিতে নামল সারেং সাব। ওঁরা মোটরে উঠে পাহাড়-সিঁড়ির পথে এজেণ্ট অফিসের দিকে চলে যেতেই দেখল সেই পথ ধরে বন্দরের দিকে আর-একটি নীল মোটর উল্কার মত ছুটে আসছে। এসেই খ্যাচ করে ব্রেক কষল সিঁড়ির সামনে। দরজা খুলে ছবির মত বেরিয়ে এল অষ্টাদশী লিলি।

উচ্ছ্বল হয়ে উঠল শেখর। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর বিবর্ণ মুখ। চিৎকার করে উঠল—লিলি, ভগবান মঙ্গলময়। মোবারক কোথায়?

চিৎকার করতে করতে শেখর ছুটে গিয়েছে কাঠের সিঁড়িটা পর্যন্ত। সিঁড়ি

থেকে লিলিকে নামিয়ে আনতে আনতে বলল—মোবারক যে আসে নি। সে কোথায়?

—ফিজ্‌রয়ে আমাদের বাড়িতে।

—মোবারকের সর্বনাশ হয়ে গেছে। ওয়ারেণ্ট দিয়েছে কোম্পানি।

—ওয়ারেণ্ট! ওয়ারেণ্ট যাচ্ছে। ঠোঁটের ভাঁজে কবার কথাগুলি শুধু উচ্চারিত হল। তারপর চিন্তা করল মুহূর্তের জন্য এবং চোখ তুলে চাইল শেখরের দিকে!—ভয় নেই। ওয়ারেণ্ট দিয়ে ওরা কিছু করতে পারবে না। কারণ মোবারককে আমি বিয়ে করছি।- শেষে কোটের আস্তিন টেনে ঘড়িটা একবার দেখে বলল—চল তোমার কেবিনে। কথা আছে।

লোহার ডেকের উপর জুতোর হিলের খট খট শব্দ করে পা বাড়াল লিলি। চলেছে সে পিছিলের দিকে। তামাটে রঙের হাল্কা মোজায় জড়ান পা দুটোর চলার ঢঙে কেমন যেন আড়ষ্ট প্রভাব। মনে হয় পাদুটো এক্ষুনি যেন হাঁটুর মাঝামাঝি ভেঙে পড়বে। কোন রকমে এবু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল পিছিলে। মুহূর্তের জন্য থামল ক্রু-গ্যালীর সামনে। পিছন ফিরে ডাকল—শেখর! লিলির কণ্ঠস্বরটা ভাঙা কাঁসার শব্দের মত শোনাল। শেখর এতটুকু প্রত্যুত্তর করতে পারল না। সমস্তটা ডেকপথ অতিক্রম করতে করতে সে ভাবছিল বাকি সফরের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা। মোবারক আর ফিরছে না। লিলি তাকে বিয়ে করবে। এছাড়া ওর আরও কথা আছে। ফোকশালে গিয়ে সে কথা হবে। কি কথা! কেমন কথা! সে কথার ভিতরে শেখরের জাহাজছাড়াবার কথা নেই তো!

সেই সময়ে অনেকগুলি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি পিছিলের ডেকে পায়চারি করছিল। শেখরের দিকে চেয়ে সে দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তাদের প্রশ্ন করা হয়ে ওঠে নি—শেখর আর লিলির মুখের দিকে চেয়ে পথ ছেড়ে দিয়েছে। ফিসফিসিয়ে নিজেদের মধ্যেই যথাসম্ভব অনুমানের জবাবগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে।

লিলি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল। ভিতরে ঢুকল ফোকশালের। শেখরও ঢুকল এবং ঢুকেই বলল- বোস।

লিলি বসল না। দাঁড়িয়ে থেকেই স্কার্টের পকেট হতে বের করে নিল সিগারেটের প্যাকেটটা। দু চোখের ভুরু উঁচিয়ে শেষে হাত বাড়াল শেখরের দিকে—তোমার লকারের চাবিটা!

লিলির চোখ আর মুখ দেখে কেমন বিস্মিত হয়ে উঠল শেখর। হয়তো ভুল করেই শেখরের চাবিটা চাইছে। দরকার মোবারকের চাবির ওর লকারের। বিয়ে-থা হলে কাজেই মোবারকের সব কিছুর ওয়ারিশ লিলি। সারেংকে ডেকে আনলে হয়, চাবিটা সারেং-এর কাছেই আছে। গাদা মেরে সব কিছুই সামনের লকারটার ভিতর রাখা গেছে।

সারেংকে ডেকে আনছি। মোবারকের চাবিটা ওর কাছেই আছে। তুমি বসো। চাবিটা এনে দিচ্ছি।

—আমি তোমার চাবি চাইছি। মোবারকের চাবি দিয়ে আমার কি হবে? ওটা আমাকে দিয়ে বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে এস। ততক্ষণে আমি এ দিকের সব ঠিক করে রাখছি। একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে।

সব কথার অর্থ ঠিক বুঝে উঠতে পারল না শেখর। তবু নির্বিকারভাবে বালিশের নীচ থেকে চাবিটা বের করে দিল লিলিকে। এদিক ওদিক খুঁজে সাবানের বাক্সটা বের করে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

ইতিমধ্যে ক জন জাহাজী এসে উঁকি মেরে গেছে শেখরের ফোকশালে। সারেংও একবার এসেছিল দেখতে। ট্যান্ডেল, ডংকীম্যান সবাই দেখে গেছে লিলি শেখরের লকার থেকে কি সব টেনে টেনে বের করছে। ওসব দেখে ফোঁসফোঁস করে উঠেছিল তিন নম্বর ডংকীম্যান—মাগীটা আবার এসেছে শেখরবাবুর মাথা খেতে। আজকে হয়তো শেখরবাবুকে নিয়েই ভাগবে। তাই ওসব সাবধান করতে হবে, সারেংকে বুঝিয়ে বলতে হবে নচ্ছার মেয়েটার সম্বন্ধে। এমন অনেক কিছু ভেবেই যখন উপরের দিকে উঠতে যাবে সে সময় দেখল শেখরবাবু বাথরুম হতে বেরিয়ে আসছেন। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল তিন নম্বর ওয়াচের ডংকীম্যান। কিছু বলতে গিয়েও শেখরবাবুকে বলতে পারল না। এবার আরো বেশি দূরে সরে দাঁড়াল—শেখরবাবুর মুখটা আজ খুব বেশি থমথমে। চিঠি-লিখে-দেওয়া বাবু—দেশের খবর যে দুটো-একটা আজও পায় সে এই বাবুর মেহেরবানিতেই। এ বাবু কি আর সেই মোবারকের মত। সাদা মেয়ের ভেল্কীতে পড়বেন ইনি?

শেখর ভিতরে ঢুকে দেখল লিলি চকোলেট রং-এর স্যুট আর ইটালিআন আর্টি-ফিসিয়াল সিল্কের শার্ট ভাঁজ করে রেখেছে ওরই পাশে। চকচক করছে বাঙ্কের নীচে জুতোজোড়া পর্যন্ত। শেখরকে দেখে বলল—বাইরে অপেক্ষা করছি—জামা-কাপড় ছেড়ে নাও। যেতে হবে মোবারককে দেখতে।

ওরা দুজন এক সময় উঠে এল। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। উপরের ঘন সাদা কুয়াশার ছায়াটা চিমনির ধোঁয়ায় কেমন ধূসর হয়ে উঠেছে। লায়ন রক্ হতে মাউণ্ট অ্যাগমণ্টের মাথায় মাথায় সেই আবরণ। ধূসর কুয়াশায় আবৃত ডেক-পথে এসে শেখরের চোখদুটোও কেমন ধূসর হয়ে উঠতে থাকল। একটা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হতে থাকল লিলিকে কেন্দ্র করে।—মোবারককে দেখতে যেতে হবে। লিলি ওকে নিতে এসেছে তাই? মনের ভিতরেই গুমরে মরতে থাকল শেখর। মোবারক কেমন আছে? কি হয়েছে ওর? কোন প্রশ্নেরই সহজ উত্তর সে খুঁজে বের করতে পারল না। কি যেন একটা অস্বস্তি সব কিছুকে কেন্দ্র করে। হয়তো মোবারককে দেখবার উন্মুখ আগ্রহ তাকে সহজ হতে দেয় নি। সেজন্য আর একটাও প্রশ্ন সে লিলিকে করতে পারল না।

তারা দুজন এসে থামল গ্যাংওয়েতে। কোয়ার্টার-মাস্টারই বাঁধা দিয়ে দিল। শেখর আর-একবারের জন্য বিস্মিত হল। গ্যাংওয়ের বুকে দাঁড়িয়ে কোয়ার্টার-মাস্টার হাত মুখ দাড়ি নেড়ে শেখরকে বলেছে—যেতে দেওয়া হবে না। জাহাজ কাল ছাড়ছে। ক্যাপ্টেন কাউকে বাইরে যেতে দিচ্ছেন না।

লিলি কিন্তু কিছুই ঠাহর করতে পারল না দুজন একদেশী মানুষের জাতভাষা থেকে। শুধু শেখরের দিকে প্রত্যাশার দৃষ্টি নিয়ে সে তাকিয়ে আছে—সে অনুবাদ করে নিশ্চয়ই বলবে দুজনের মধ্যে এতক্ষণ কি কথা হল।

আর শেখর যখন অনুবাদ করে শোনাল লিলিকে তখন সত্যি যেন ওর হাঁটুর ভাঁজদুটো ভেঙে এল। যাতে কাঠের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে জেটির জলে ডুবে না যায় সেজন্য যেন দাড়টা শক্ত করে ধরল। শেখরকে অনেক কথা বলবার ছিল। মোবারকের অর্ধ-চৈতন্য অবস্থায় মাতৃভাষায় চিৎকারের অর্থ সে কিছুই বোঝে না। আজ লিলির জীবনে শেখরকে খুবই প্রয়োজন। কিন্তু কই, সে যেতে পারল না, কোম্পানি তার পথ রোধ করে বসে আছে—সে পথ থেকে টেনে নিয়ে যাবার কতটুকু শক্তি লিলির? মোবারকের ভালমন্দের ভার ওর উপর বর্তে আছে—কিন্তু শেখরের? কাজেই এক অপার্থিব ভাবলেশহীন দৃষ্টির বিনিময় হল শুধু শেখর আর লিলির

মধ্যে। শেষে প্রায় টলতে টলতে দু হাতে দু দিকের দড়ি শক্ত করে ধরে লিলি নেমে গেল জেটিতে—পার্ক-করা মোটরে উঠে পাহাড়ের ঢেউয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। শেখর তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে রেলিং ধরে পাহাড়ী ঢেউয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে—ঢেউয়ের ভাঁজে ভাঁজে নীল-লাল আলোর রেশ কুয়াশার জাল ভেদ করে ওর দৃষ্টিকে নিষ্প্রভ করে তুলছে। মৃত্যুর মত সে দৃষ্টি স্থির। তবু তার ভিতর উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুটো জীবন, মোবারক আর লিলি। কিন্তু মোবারক আর ফিরল না।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিদায় নেবে জাহাজ। সুখানী এসেছিল ডেকে। স্টোর-রুম হতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিদায়ের চিহ্নিত কালো বর্ডারের ফ্ল্যাগটা হাতে করে নিয়ে এসেছিল। এখন ওটাই উড়ছে মাস্টে।

ডেকের ওপর পায়চারি করছে শেখর। দৃষ্টি ওর পাহাড়ী ঢেউয়ের ভাঁজে সংকীর্ণ উপত্যকার রং-বেরঙের কাঠের বাড়িগুলোর ছায়ায়। এমনি এক কাঠের ঘরের নরম ছায়ায় মোবারক আর লিলির দুটো চখা-চখীর আকাশ-নীড়। মোবারক অসুস্থ। লিলি ওর ভালমন্দের ভার নিয়েছে।—শেখরকে দেখতে চেয়েছিল ও।—লিলির জীবনে শেখরের প্রয়োজন খুব বেশি।

ইঞ্জিন-সারেং সেই পথেই এল। সেই পথেই নেমে গেল ইঞ্জিন-রুমে। ইঞ্জিন-রুমে ঢোকার [illegible] সজারুর মত খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফের ফাঁক দিয়ে আড়চোখে দেখে গেল শেখরকে। একটা সরু কটাক্ষপাত প্রবাহিত হয়ে গেল শেখরের দেহকে বৃত্ত করে। নীচে নেমে গেলে ও। বয়লারে আগুন দেবে, স্টীম তুলতে হবে দু শ ত্রিশ। স্টীম গেজের কালো কাঁটাটা লাল দাগে উঠে থর থর করে কাঁপবে।

সাড়ে বারোটায় চর্বি-ভাজা রুটি খেল সবাই। আধখানা করে রুটি খেয়ে আধ বদনা করে জল ঢালল গলাতে। সারেং ডাকল—মাস্টার। ক্রু-গ্যালীর সামনে ট্যাণ্ডেল থেকে কোলবয় সব দাঁড়াল সার বেঁধে। নূতন করে ওয়াচ ভাগ হল। এক নম্বর ওয়াচে মোবারক যেখানে বয়লার টানছিল শেখরকে সেই বয়লারে ঠেলে দেওয়া হল। শেখর মাস্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল সব। বুকের ভেতরে কে যেন ছুরির ফলা দিয়ে আঁচড় টানছে একটা একটা করে। ধুকধুক করছে বুকের একটা ক্ষতস্থান। দু নম্বর বয়লার, কোম্পানির শয়তান পুষে-রাখা কসবী—বা[illegible]র প্রতি ওর খুব বেশি টান। কসবীটাকে সায়েস্তা করতে পারে মোবারক, ছোট ট্যাণ্ডেল আর সিলেটি আগওয়ালা গণি।

চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শেখর। প্রতিবাদ জানাল না। প্রতিবাদ জানিয়ে কোন লাভ নেই। সে জানে মোবারক আজ জাহাজে থাকলে দু নম্বর বয়লারে ওকে ঠেলে দেওয়া দূরে থাক, কেউ একথা তুলতে পর্যন্ত সাহস করত না—মোবারককে জাহাজীরা সমীহ করে চলত। শেখর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু ভাবল, মোবারক তুই চলে গেলি! গেলি তো আমায় নিয়ে গেলি না কেন? দেশেও যে আর ফেরা হল না আমার দেখছি। কি করে হবে? আমি নূতন আগওয়ালা—দু নম্বর বয়লারের স্টীম দু শ ত্রিশে তুলে রাখা—সে কি আমার কাজ?

ডেক-সারেং আর ডেক-বড়-ট্যাণ্ডেল দু[illegible]কের দু পিকে চলে গেছে—সঙ্গে গেছে দু ভাগ হযে ডেক-জাহাজীরা।—হাফীজ হবে লোহার মোটা তার, হাসিল টেনে তোলা হবে, ওয়ার পিন ড্রাম গড় গড় করে উঠবে—সেই সঙ্গে প্যাঁচ খেয়ে উঠবে ম্যানিলা হ্যাম্পের মোটা মোটা হাসিল।

কিনারায় ক জন সোরম্যান ছুটোছুটি করছে। দু পিকের দু মালোমের নির্দেশ-মত হাসিল খুলে দেওয়ার ভার ওদের উপর। সমস্ত জাহাজ আর জেটি জুড়ে কর্মচাঞ্চল্য। বাঙ্ক লাইন কোম্পানির জাহাজ সিউলবাঙ্ক সিডনীতে রওয়ানা হচ্ছে। আবার কবে আসে কি আসবে না কেউ তা বলতে পারবে না।

এক সময় পাইলট উঠে এল কাঠের সিঁড়ি বেয়ে। ব্রীজে উঠে দেখল দূরে ফরোয়ার্ড পিকের নীচে, পিছনে আফটার পিকের তলায় দুটো টাগ-বোট জাহাজকে টানছে।

শেখর আগওয়ালার পোশাক পরে মাথায় নীল টুপি টেনে বের হয়ে এল ফোকশাল থেকে। বোট ডেকে এসে স্কাইলাইটের পাশে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল। শেখর শেষবারের মত দেখে নিল পাহাড়ী শহরটাকে—সি-ম্যানস্ মিশনকে আর ফিজ্‌রয়ের বুকে ঘর বাঁধবার স্বপ্নময় দুটো জীবনকে। চোখদুটো কেন জানি ছলছলিয়ে উঠল। তবু খুব সন্তর্পণে পা বাড়াতে হল—নীচে নামতে হবে। নীচে নামবার লোহার জালিটার উপর দাঁড়াতেই ভোঁ ভোঁ করে চিৎকার করে উঠল হুইসেলটা. দিকে দিকে খবর পাঠাল, বিদায় নিচ্ছে সিউলবাঙ্ক—নূতন দেশ, নূতন জমির জন্য।

শেখর নীচে নেমেই দু নম্বর বয়লারের এক নম্বর ওয়াচের আগওয়ালা গণির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওর জুড়িদার। আরো যারা নেমে এল তারাও নম্বর মিলিয়ে বয়লারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যাবার সময় সবাই এক চোখ দেখে গেল—শেখর পাথরের মত দাঁড়িয়ে শুধু ভুতুড়ে স্টীম গেজটা দেখছে।

এক সময়ে গণির দিকে চেয়ে বলল শেখর—র‍্যাগ শ্লাইস শাবল?

—ঐ নীচে। চুলো তিনটা প্রথমেই টেনে নিস—জাম হয়ে আছে।

—জাহাজ ছাড়বে ক'টায়?

—তোদের 'পরী'তেই।

—তুই চুলো টানিস নি?

—টেনেছি—কিন্তু চুলো অস্ট্রেলিআন কোল খাচ্ছে। শুয়রের বাচ্ছা বড় মিস্ত্রী পকেট বাঙ্কার খুলে দিয়ে গেছে। ক্রস-বাঙ্কার বন্ধ। অস্ট্রেলিআন কোল শেষ না হলে আর ক্রস-বাঙ্কার খুলছে না।

প্রথম ওয়াচ শেষ হতে এখন দশ মিনিট বাকী। মাথায় সাদা টুপি-আঁটা বড় ট্যাণ্ডেল এক নম্বর পরীদের ডেকে বলল—যাওরে ব তোমরা। গোসল টোসল করগা। একটু পানী আমার লাইগা রাইখা দ্যান যে।

গণি সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলে শেখর এসে দাঁড়াল বয়লারের সামনে। চেয়ে দেখল স্টীম নামছে! দু শ ত্রিশ থেকে দু শ দশে নেমে এসেছে। আরো নামবে। তাড়াতাড়ি বয়লারের পোর্ট সাইডের দরজাটা খুলে কয়েক শাবল কয়লা হাঁকড়ালো। তবু স্টীম এক পয়েণ্ট বাড়ছে না, দু নম্বর বয়লার আর অস্ট্রেলিয়ান কোল মিলে যেন ওকে ব্যঙ্গ করছে! এমন সময়ে চিৎকার উঠল পাশ থেকে, বড় ট্যাণ্ডেল হাঁকছে, স্টীম নামছে, কয়লা হাঁকড়াও, র‍্যাগ মারো, শ্লাইশ দাগো। সঙ্গে সঙ্গে ডাক উঠল—আল্লা আল্লা! শোঁ শোঁ করে উঠল বয়লারের স্টীমকক্‌গুলি। একসঙ্গে ছয় বয়লারের ছয় র‍্যাগ উঠল, ঠন্ ঠন্ করে বাড়ি পড়ল নীচে—লোহার প্লেটে। শ্লাইশ হাঁকড়ালো একসঙ্গে—ভিতরের জ্বলন্ত আগুন থেকে ঝাং-ধরা পোড়া কয়লা চড় চড় করে ফেটে উঠল। র‍্যাগ মেরে টেনে আনলো ছাই, পোড়া কয়লা। পাশ থেকে জ্বলন্ত পোড়া কয়লার উপর বালতি বালতি নোনা জল ছিটকে পড়ল। সমস্ত স্টোকহোলটা অন্ধকার

হয়ে উঠেছে। শেখর চোখ মেলে চাইতে পারছে না—চোখ বুজেই টানছে। দূর থেকে আবার চিৎকার করছে বড় ট্যাণ্ডেল, স্টীম নামছে। একসঙ্গে দুটো শাবল সন্ সন্ করে উঠল। ঝন্ ঝন্ করে বাড়ি পড়ল লোহার প্লেটে—কয়লা হাঁকড়ালো শাবলের পর শাবল। ছয় বয়লারের পোর্ট সাইডের ছয় চুলো নিমেষে ভরে উঠল। এয়ার-ভাল্‌ব্‌টা টেনে দিতেই কালো কয়লা লাল হয়ে উঠল।

শেখর হুম্ হুম্ করে কয়লা মারছে দু নম্বর বয়লারের তিন নম্বর চুলোতে। বার বার করে ত্রিশ সের ওজনের শ্লাইস টানতে গিয়ে মোচড় দিয়ে উঠছিল হাতের নরম পেশীগুলো। অন্য আগওয়ালাদের পোড়া কয়লা টানা শেষ। ছাই হাফিজ হয়ে গেছে। স্টীম ওদের দু শ ত্রিশে। তাই উইণ্ডস্‌হোলের নীচে বসে একটু বিশ্রাম নিতে পারল। কিন্তু শেখরের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উইণ্ডসহোলের নীচে বসে মুহূর্তের জন্য হাওয়া খেতে পারল না। ঘাম আর ছাইয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে মুখ। পোড়া কয়লায় ঢেকে গেছে চোখ। মুহূর্তের জন্য থেমে রগড়ে নিল একবার চোখদুটো, কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দেখল স্টীম গেজটা—দু শ ত্রিশে তবু উঠল কই?

ডংকীম্যান একবার এসেছিল ইঞ্জিন-রুম থেকে।—তিন নম্বর মিস্ত্রী দু নম্বর বয়লারের স্টীম চাইছে আরো।

ডংকীম্যান এসে থেমেছিল ইঞ্জিন-রুম পেরিয়ে স্টোকহোলের প্রথম দরজায়। পকেট বাঙ্কারের কোণায় দাঁড়িয়ে বলে গিয়েছিল কথাটা। শেখরের কাছে যেতে ওর সাহস হয় নি। বলা তো যায় না! হয়তো স্টীম তুলতে গিয়ে গনগনে লোহার র‍্যাগটা শেখর ডংকীম্যানের মাথায় মেরে পরখ করে দেখতে পারে, দ্বিতীয়বার সে র‍্যাগ দিয়ে টন টন আগুনে কয়লার মাথা ভাঙতে পারে কি-না। এমন হানাহানি কত বার কত জাহাজে হল। স্টীম না উঠলে কয়লার জাহাজে, চিৎকার করবে তো ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিন-রুম হতে করো, স্টীমের জন্যে স্টোকহোলে ঢুকেছ কি মরেছ। প্রথমেই পোড়া লাল লোহার ত্রিশ-সেরী শ্লাইসটা ভিতর হতে টেনে বের করে নিয়ে আসবে—বল্লমের মত করে হাঁকড়াবে ইঞ্জিনিয়ারের বুকে, শেষে টেনে এনে মানুষটা সহ শ্লাইসটা ঢুকিয়ে দেবে চুলোর ভিতর! র‍্যাগ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উল্টে পাল্টে দুটো টান। একেবারে সাফ। গনগনে চুলোটা সাদা মানুষের তেল খেয়ে স্টীম দেবে দু শ ত্রিশ। তাই যখন এমনি হানাহানি চলে স্টীম নিয়ে—ফায়ারম্যান স্টীম দিতে পারছে না, ইঞ্জিনিয়ার স্টীম চাইছে, তখন ডংকীম্যান কিংবা তেলওয়ালাকেই আসতে হয় দূতের কার্য করতে। দহরম-মহরম যা হবার ওদের ওপর দিয়েই হোক। কারণ এ সময়ে ফায়ারম্যানদের স্টীম তোলার ব্যাপারে দু-একজন ইঞ্জিনিয়ারকে পুড়িয়ে দিলে নাকি দাঁড় কিংবা হাজতের ব্যবস্থা হয় না। ডংকীম্যান তাই পকেট বাঙ্কার পর্যন্তই এসেছিল। শেখরের হাতে লাল লোহার গনগনে র‍্যাগটা দেখে আর এক পাও ভিতরে আসতে সাহস করে নি।

ট্যাণ্ডেল দু হাত ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠল আবার।—দুই নম্বর বয়লার আউর স্টীম মাংতা।

ট্যাংক-টপের ওপর লোহার প্লেটে মাত্র র‍্যাগটা রেখেছে শেখর, সে-সময় দেখল চিৎকার করতে করতে এদিকে এগিয়ে আসছে ট্যাণ্ডেল,—আউর স্টীম মাংতা। আল্লার নাম কর রে ব। মার জোরে র‍্যাগ্, কয়লা দাগাও রে ব।

শ্লাইস্ র‍্যাগ শাবল আর টন্ টন্ কয়লার আগুন জোঁকের মত চুষে খাচ্ছে যেন শেখরের বুকের রক্ত। তবু টান মেরে খুলল এয়ার ভাল্‌ব্‌টা। লোহার হাতল ধরে

দরজা খুলে শাবল শাবল কয়লা হাঁকড়াতে থাকল। তিন চুলোয় কয়লা খাচ্ছে রমারম্। ভরে উঠেছে ফায়ার ব্রীজটা পর্যন্ত। শেষে আবার টেনে দিল এয়ার-ভাল্ব্। জোরে বেরিয়ে এল আগুনের হল্কা। ঝলসে উঠল মুখ, দেহের রক্তটা একেবারেই সব ঘাম হয়ে বেরিয়ে গেল বুঝি, কাঠ হয়ে গেল ভিতরটা।

খট্ খট্ শেষে বন্ধ করে দিল তিন চুলোয় তিন দরজা। মুহূর্তের জন্য ভর করে দাঁড়াল শাবলের বাঁটের উপর। কিছুক্ষণের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে আয়ত্তের মধ্যে এনে চাইল স্টীম গেজের দিকে। দু শ পঁচিশে গিয়ে কালো কাঁটাটা কাঁপছে। দু শ ত্রিশে তবুও উঠল না। চারিদিকে চেয়ে দেখল তখন উইন্ডসহোলের নীচ থেকে বেরিয়ে আসছে মনু, ইদাহী, লুৎফল। মুহূর্তের বিশ্রামে ওরা চাঙ্গা হয়ে উঠল। ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আবার হাত চালাতে হবে।

সমস্ত সফরের অভিশাপ হয়ে দু নম্বর বয়লার আজ শেখরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে যেন। মোবারক আলী সারা সফর তাকে সুখ দিয়ে নিজে এখন সুখের ঘর তৈরি করে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে রেখে গেছে। প্রায়শ্চিত্ত সে করবে।

রাত আট থেকে বারো—পুরো চাব ঘণ্টা, শ্লাইশ, র‍্যাগ, শাবল আব কয়লার ভিতর ডুবে থাকল শেখর। তার ভিতর ডুবে রইল ওর দেহ মন সব। কয়লা হাঁক-ড়ানো বাদে পৃথক কোন অস্তিত্ব আছে শেখরের, মুহূর্তের জন্য আজ সে কথা ভাবতে পারল না। তাই জলের পট থেকে বার বার জল খেয়ে ঢাক করে তুলল পেটটাকে। কয়লা আর শাবলের ঠুন ঠুন আওবাজের ফাঁকে হাঁক আসছে ফায়ার-ম্যানদের কাছ থেকে—পানী খেয়ে-খেয়ে বাঙালী বাবুটা যে ঢাক হয়ে মরবে গো!

ইদাহী র‍্যাগ মেরে দাঁড়াল শেখরেব সামনে। মাথার ফেজ টুপিটা শেখরেব মুখের ওপর ঝেড়ে বলল—ফালতু থেকে বাবুব শরীর আরো বাবু হয়ে গেছে। তারপব তো আবার হল পীর দরবেশের যোগাযোগ। আর পড়লি তো পড একেবারে দু নম্বর বয়লারে।—শেষে হি হি করে হেসে সবাইকে যেন জানিয়ে দিল ইদাহী হাসছে।

পরিপূর্ণ অনুভূতিশূন্য শেখরের হৃদয় আজ ব্লাস্ট ফার্নেসের মত ঝল্সে উঠল না ইদাহীর কথায়। মোবারক আজ জাহাজে থাকলে হয়তো ইদাহীর রসিকতার ফল ঘটত বিপরীত। হয়তো হাতের শাবলটা নিসপিস করে উঠত ইদাহীর মাথাটাকে চৌচির করে দেবার জন্য। পরিবর্তন হয়েছে জাহাজের—মোবারক নেই। পরিবর্তন হয়েছে ওর মনের, সে আজ অনুভূতিশূন্য। কিন্তু এই অনুভূতিশূন্য হৃদয়েও কি করে যেন গরম-সীসে-গলা তরঙ্গের মত একটা ক্ষুব্ধ আক্রোশ মোবারককে কেন্দ্র করে প্রবাহিত হতে থাকল। ইদাহী ঠিক বলেছে। ওর রসিকতা সম্পূর্ণ সার্থক আট থেকে বারোটার ওয়াচে। 'ফালতু থেকে বাবুর শরীর আরো বাবু হয়ে গেছে।' মোবারক যদি প্রথম থেকেই শেখরের প্রতি করুণা না করত, তাহলে হয়তো এই আঠার মাস সফরে ওরও নরম পেশী শক্ত হয়ে উঠত। দু নম্বর বয়লার আর ইদাহী মিলে কঠিন রসিকতা করতে অন্ততঃ সাহস করত না আজ।

এক সময় 'পরী' শেষ করে লোহার রডে-তৈরি হাঁটুভাঙা সিঁড়িটার মুখে এসে দাঁড়াল শেখর। সবাই ওর পাশ কাটিয়ে তর তর করে উঠে গেল উপরে। কিন্তু ওর ভয় করছে। লোহার সিঁড়িটাও যদি ব্যঙ্গ করে! যদি পরিহাসচ্ছলে ছিটকে ফেলে দেয় ওর থেকে। তাহলে তো শেষ। নীচে পড়ে দুমড়ে যাবে। কয়লার সঙ্গে মিশে যাবে ওর হাড়-পাঁজর রক্তমাংস। ছুটে আসবে 'বাড়িওয়ালা', বড় মিস্ত্রী, আরো সবাই। ঝ্যাক ঝ্যাক শব্দ করে চলা প্রপেলারটা কিন্তু থামবে না। তিন নম্বর ওয়াচের

লোকেরা তখন ছিটকে-পড়া শেখরের রক্তমাংসের কণাগুলো কয়লার সঙ্গে—'আহা লোকটা বড় ভাল ছিল গো', বলে মিশিয়ে নেবে। খট খট করে শব্দ হবে বয়লারের দরজা খোলার। হুম হুম করে হাঁকড়াবে হাড়-পাঁজর রক্তমাংস—দু নম্বর বয়লারে। হয়তো তখন কসবীটা স্টীম দেবে দু শ ত্রিশ। আর জাহাজ থেকে শুধু একটা নাম বাদ পড়বে। কোম্পানীর আর ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন নেই।

আকাশে সেই ছায়া ছায়া অন্ধকার। একটা বলিষ্ঠ ছায়া সেই অন্ধকারে এগিয়ে এসে দুটো বলিষ্ঠ হাত শেখরের দিকে বাড়িয়ে দিল। রজনীর সেই দ্বিতীয় প্রহরে শেখরের অনুভূতিশূন্য দেহটা তেমনি পড়ে আছে ফানেলের উপর। মৃত্যুর মত স্থির দৃষ্টি ফিজবয়ের বুকে মোবারককে খুঁজছে। অনুভূতিশূন্য দেহটাকে দুটো হাত এসে জড়িয়ে নিল। বলল—শেখর চল, পরী সেই কখন ভেঙেছে।

শেখরের মড়ার মত স্থির দৃষ্টিটা আবার ফিরে এল জাহাজে, ছড়িয়ে পড়লো ছায়াটাকে ঘিরে। সন্ত্রস্ত প্রশ্ন এল সঙ্গে সঙ্গে—কে?

—আমি আলী।

—আলী! মোবারক!

অনুভূতিশূন্য দেহটা ঝাঁপিয়ে পড়ল বলিষ্ঠ ছায়ার বুকে।—দেখ দেখ—বলে ক্লান্ত দুটো হাত মোবারকের দু গাল লেপ্টে দিল।—দেখ দেখ, রক্তমাংসের কেমন তাজা গন্ধ।—অসহায় অপরাধীর মত শেষে কেঁদে নালিশ জানাল, আমাকে দু নম্বর বয়লারে সারেং ঠেলে দিয়েছে।

সেই আকাশের ছায়া ছায়া অন্ধকারে দুটো ছায়া একাত্ম তখন। দুটো অসহায় উত্তর-গোলার্ধের মানুষ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে পাশাপাশি সংলগ্ন তখন। কোন প্রশ্ন নেই, কোন উত্তর নেই। সব প্রশ্ন, সব উত্তর দু জনের হারিয়ে গেছে। বোবা হয়ে গেছে যেন।

তারপর এক সময়ে ওরা দুজনই নেমে এল নীচে, টুইন ডেকে। নিঃশব্দে। মোবারককে অবলম্বন করে শেখর এসে দাঁড়াল আফটার পিকে। মোবারক গ্যালিতে ঢুকে এক টব গরম জল বের করে আনল—বাথরুমে স্নানের সমস্ত ব্যবস্থা করল শেখরের। মোবারকই স্নান করিয়ে দিল। মাংস-বের-করা হাতদুটো ব্যাণ্ডেজ করে দিল। শেখর চুপচাপ বসে থাকল। জড় পদার্থের মত স্থির হয়ে থাকল। সব প্রশ্ন, সব উত্তর কেমন জট পাকিয়ে গেছে ওর। মোবারকের দিকে চেয়ে একটা প্রশ্ন পর্যন্ত করতে পারল না। একটা কথা বলতে পারল না।

মোবারক আর লিলির সম্পর্ক তবে ভেঙে গেছে! কেন ভাঙল, কি করে ভাঙল, কোথায় ভাঙল, সব প্রশ্ন গলায় এসে কেন জানি চুপ হয়ে আছে।

শেখর কোন রকমে আবার ক্লান্ত চোখে দেখল মোবারককে। সমস্ত শরীর যেন মরে ভূত হয়ে ফিরেছে জাহাজে। কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখ, কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে চোখ, কেমন এক নিভৃত পরাজয়ের প্রলেপ ওর জীবনকে কেন্দ্র করে। শেষে শেখরের চোখদুটো থামল একান্ত স্থির হয়ে। মোবারকের বাঁ হাতের কব্জিতে—ঘড়িটা ঝুলছে। যেন একটা অক্টোপাশ নিরীহ তিমিমাছের মুখে ঝুলে আছে।

ঝড় উঠল!

সমুদ্র ঝিমুচ্ছে।

ঝড় এল মনে—মোবারকের।

মোবারক দাঁড়িয়ে আছে জোনাকি রাতের ছায়া ছায়া আলোতে, বোট-ডেকে। লাইফ-বোটের রাডারের পাশে ঠিক সেই আগের মত জ্বলছে ওর চোখ—ধক ধক করে জ্বলে উঠছে। জলছে বুকের ভিতর ফুসফুস পর্যন্ত। লিলি হয়তো তখন পিকা-কোরা পার্কের পশ্চিমের পাহাড়ে। পাহাড়-ছাদে কোরী-পাইনের তলায় চোখ রেখেছে বন্দরে। মোবারকের জাহাজ যেখানে ছিল, সে জেটিতে। হয়তো ওর দু চোখ বেয়ে জল ঝরছে।

মোবারকের চোখেও জল এল।

লিলি কিছুই জানল না কেন সে চলে এল। কিছুই বুঝল না, কেন সে দক্ষিণ-গোলার্ধের সবুজ দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে ছুটল উত্তর-গোলার্ধে। অজ্ঞাত থাকল এ খবর লিলির কাছে। কিন্তু তার মা? শেখর প্রশ্ন করে সহজ কোন জবাব পেল না। স্থির করতে পারল না, তিনি জানলেন কি জানলেন না। শুধু শব্দ করছে ঘড়িটা—টিক্, টিক্, টিক্—সেই মোবারকের বাপের আমল থেকে।

মায়ের কথা মনে হল প্রথম। মায়েব মুখ, আম্মাজানের অশ্রুভরা চোখ, শামীন-গড়ের আপন মাটির গন্ধে যেন লেপ্টে রয়েছে। জৈনব বিবি হয়তো স্বামীর বুকে শুয়ে এখন স্বপ্ন দেখছে মোবারকের। হয়তো সেই স্বপ্নে আছে লিলি আর মোবারকের দেহ সান-ডায়াল ক্লকের ওপর। মোবারকের ওপর যে আস্থা ছিল জৈনবের, সব হয়তো কাচের মত ভেঙে গেছে। দেন-মোহরের সময় মকে যেমন ও খুঁজে পাচ্ছিল না শামীনগড়ের মাটিতে, পৃথিবী তখন যেমন চুপ হয়ে গিয়েছিল ওর কাছে, সেই মত পৃথিবী আজও চুপ হয়ে রয়েছে সমুদ্রের লোনা-লাগা মরা ঢেউয়ের মাথায়।

দুবু দুবু শব্দ কোথা থেকে সব ভেসে আসছে। বোধ হয় নীল লোনা জল থেকে এল সে শব্দ। সে আওয়াজে মুখ তুলে সে চাইল দূরে। ইস্পাতের ফলার মত ছুটে আসছে ফ্লাইং-ফিশের ঝাঁক। লোনা জলের বুক চিরে আসছে তারা। হয়তো অতিকায় একটা ডলফিন সাগরের অন্ধকার নিবাস থেকে ছুটে আসছে, আক্রমণ করেছে নিরীহ ফ্লাইং-ফিশের দলকে। সন্ত্রস্ত হয়ে তাই তারা উড়তে চেয়েছে আকাশে।

ঝাঁকটা এদিকেই ছুটে আসছে।

এসে ঝপ ঝপ করে পড়ল সমুদ্রে—জাহাজের কিনারায় শুধু একটা মাছ লাফিয়ে পড়ল ওর পায়ের কাছে। আস্তে আস্তে মোবারক তুলে নিল মাছটা। ব্রীজের উইংসের আলোতে দেখল তেমন জখম হয় নি উড়ন্ত নিরীহ সামুদ্রিক জীবটি। অন্য দিন হলে ধরেই মোবারক মাছটার পাখা দুটো ছিঁড়ে দিত। ক্রুগ্যালীর সামনে গিয়ে হেঁকে বলতো—ভাণ্ডারী চাচা, এটা দুভাগ করে আমাকে আর শেখরকে ভেজে দেবে।

মোবারক খুব নরম হাতে তুলে ধরল জীবটিকে। চক্ চক্ করে উঠছে ওর শরীর ইস্পাত-ফলকের মত। সমস্তটা শরীর জুড়ে দুটো পাখা প্রায় লেজ পর্যন্ত চলে গেছে। মাঝে মাঝে জীবটা নিজের মুখ খুলে ধরছিল, যেমন করে রুই-কাতলা পচা পুকুরের জল টানে। এই উৎকট লোনা জলে এমন নিরীহ শৌখীন জীবটাই বা বাচে কি করে! নিজেই প্রশ্ন করল নিজেকে মোবারক। বাঁচে, যেমন করে বেঁচে আছে লিলি কোরী পাইনের তলায়, যেমন করে বেঁচে আছে জৈনব বিবি ওর স্বামীর বুকে, যেমন করে বেঁচে আছে আম্মাজান ওর। আর ভাবতে পারল না মোবারক। চোখ দুটো ঘোলা হয়ে উঠল। সব কিছু যেন সবুজ হয়ে আসছে। ছ'বছর আগের এক

কাহিনী, সে কাহিনীর সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ডুবে যাওয়া কাহিনীর পরিচয় আছে। মোবারকের সাত পুরুষের নাবিক বংশ যেখানে এসে থামতে চেয়েছিল, যে শেষ পুরুষকে চেয়েছিল শামীনগড়ের মাটিতে প্রতিষ্ঠা করতে, আপন মাটির গন্ধের সঙ্গে চেয়েছিল যে শেষ পুরুষকে জমির সঙ্গে জীবনকে মানিয়ে নিতে, সেই মানিয়ে নেওয়ার পরমক্ষণেই ভূতের মত ঘড়িটা এসে তাদের নাবিক বংশে আশ্রয় নিয়েছিল। সমুদ্র আবার তাই তাদের টেনেছে। উত্তর পুরুষ মোবারক তাই পূর্ব-পুরুষের ধারাটাকেই অক্ষুণ্ণ রাখল।

মোবারক ছেড়ে দিল উড়ন্ত সামুদ্রিক জীবটাকে। কুগ্যালীর দিকে ছুটে গিয়ে আজ আর বলল না, ভাণ্ডারী চাচা, ভেজে দিও আমাকে আর শেখরকে। মনের ভিতর আজ যে সব বিশৃঙ্খলা চলছে, যে বিশৃঙ্খলার ইতিহাস নিয়ে ওর জীবন-চরিত রচিত, সেই চিন্তাধারাই আজ সমান করে দিল একটা মানুষকে আর মাছকে। ডলফিনের কাছে এই নিরীহ জীবটি যেমন অসহায়, তেমন অসহায় মোবারক, পৃথিবীর কাছে, সমুদ্রের কাছে, কোরী পাইনের তলায় আর সান-ডায়াল ক্লকের ওপর। মোবারক অনুতপ্ত, দুর্নিবার অনুতাপের জ্বালায় ডেকের কাঠে কাঠে খুঁজছে শান্তির আশ্রয়। সান-ডায়াল ক্লকের উপর রক্তমাংসের দেহটার জন্য যে বিচিত্র কাহিনী ওর জীবনের সঙ্গে যোগ হল, যে গুণাহ্ দুটো জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল, তার থেকে মুক্তি কোথায় ?

হাতের ঘড়িটা বিগত দিনের ঘটনার সঙ্গে যোগ দিয়ে আজও যেন হাসছে।

হাসছে। সব যেন হাসছে। কেমন এক অপার্থিব চিৎকার সমুদ্র-বুকের। বুঝি হাসছে অগভীর জলে হাঙ্গরের ঝাঁক। অগভীর জলের হাসি, তাই চিৎকার হয়ে আসছে মোবারকের কানে।

মোবারক চুপ। কাহিনী শুনছে আম্মাজানের মুখ থেকে। বিচিত্র অনুভূতি বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারি নি। নিভৃত নীল সমুদ্র, নীল আকাশের দশমী চাঁদ নিবিড় হয়ে আছে ওর মুখের উপর। শামীনগড়ের মাটিতে তখন তার আম্মাজান শীতে উনুনের প্রজ্বলিত কাঠের আগুনের পাশে বসে কাহিনী বলছেন।

টিন-কাঠের ঘর। সিমেণ্ট বাঁধানো ভিটে। উনুনে আগুন জ্বলছে। আম্মাজান কাহিনী বলতে বলতে চুপ হয়ে যান। শীতে প্রজ্বলিত কাঠের আগুনে মায়ের মুখ রক্তাভ হয়ে ওঠে।

মোবারক উনুনের পাশে বসে আছে। পা দুটো উনুনের দিকে বাড়ান। আগুনে দুটো মুখ রক্তাভ হয়ে উঠতে থাকলে আম্মাজান তখন আবার বলতে থাকেন।

মোবারকের বয়স তখন দশ।

আম্মাজান পূর্ণ-যৌবনা। ডাকলেন—আলী।

মোবারক শুধু মুহূর্তের জন্য আর একটু সংলগ্ন হয়ে বসতে চাইল আম্মাজানের পায়ের কাছে। আম্মাজান আবার ডাকলেন—আলী। বললেন, তোর বাপজী সফর করে বাড়িতে এলে, বারণ করবি আর সফরে যেতে। তুই বড় হয়েছিস। কথা বলতে পারিস।

চকচক করে উঠল আম্মাজানের নাকের বেসক, বেসর, নাক-ফুল সব। গলার বিছাহারটা কত কাল থেকে যেন মলিন হয়ে আছে। দিনের পর দিন শুধু ওর প্রত্যাশা, আলীর বাপজীর সফর কবে শেষ হবে। কবে ফিরবে শামীনগড়। কবে বুকের ওপর বিছিয়ে থাকা বিছেহারটায় দুটো হাত চেপে বসবে, বলবে—তুই পথ-

চেয়ে ছিলি বিবি! সমস্ত সফর তাই পাগলের মত কাটল।—সবুজ শাড়ির কাঁথাটা দুটো মুখের ওপর বিছিয়ে দিয়ে এক রাতে নিভৃতে বলেছিল মোবারকের তখন জন্ম হয় নি—বিবি তোর মিষ্টি মুখ শুধু আমায় টানে। দরিয়ার বুকে শুধু তোর মুখ দেখি। পাঁচ ওক্ত নামাজে তোর মিষ্টি মুখটাই শুধু চোখের ওপর ভাসতে থাকে।

কেমন কবি কবি হয়ে কথা বলে আলীর বাপজী। আরো বলত, মুখ ঠোঁটের সংলগ্ন হয়ে বলত—বিবি।—ঠুন্ ঠুন্ করে খুন্তিটা বাজল কড়াইয়ে। মোবারক মায়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—বাপজী কবে আসবেন আম্মাজান?

—মাস দুইতো হল তিনি সফরে গেছেন। শুধু চিঠি আসে, কিন্তু তাতে লেখা থাকে না তো তিনি কবে ফিরছেন। তুই এলে এবার বলবি—তোমায় আমি যেতে দেব না বাপজী! তুই বলিস, অন্তত তোর আম্মাজানের জন্য বলিস।

শীতের চাদরটা গা থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল মোবারকের। হাতের খুন্তিটা কড়াইয়ে রাখল আম্মাজান। হাত বাড়িয়ে তুলে দিল চাদরটা। তারপর তুলে আনল মোবারককে কোলে। শামীনগড়ের নিস্তব্ধ রাতে নিবিড় হয়ে বসে রইল মা আর ছেলে উনুনের পাশে।

জন্ম হয়েছিল মোবারকের—শামীনগড়ের মাটিতে। বাপজীর ভীত সন্ত্রস্ত মন প্রশ্ন করেছিল ওঁর বাপজীকে, বাচ্চাটার জন্ম শামীনগড়ে না হয়ে অন্যত্র হলে হয় না?

মোবারকের নানা জসীমউদ্দীন সারেং বৃদ্ধ, অথর্ব। বলি-রেখায় মুখ শতেক ভাঁজে কুঞ্চিত। বারান্দায় বসে সারাদিন খুট খুট করেন আর গড়গড়ায় তামাক টানেন। প্রশ্ন শুনে তিনি চোখ দুটো লাল করে বলেছিলেন—বেটার কথা শোন। তারপর চুপ! আবার প্রশ্ন করলে আর দুটো কথা বলবেন, মোবারকের বাপজী তা জানতেন—তামাম দুনিয়া দেখলাম, শামীনগড়ের মাটি সেরা মাটি।

শামীনগড়ের মাটি সেরা মাটি মোবারকের নানা-সাহেবের কাছে। এ মাটিতে জন্মালেই নাবিক হতে হবে। এ মাটি বনেদী।

এ গ্রামের শিশুদের স্বপ্ন উত্তর-মেরু, দক্ষিণ-মেরু, উত্তর-গোলার্ধ, দক্ষিণ-গোলার্ধ—লণ্ডন, নিউইয়র্ক, পানামা, সুয়েজ। ওরা গল্প শোনে সফর শেষ করে আসা নাবিকদের কাছে বন্য দ্বীপপুঞ্জের, সাগরপারের দেশের—ইঞ্জিন আর ডেকের।

বাপজী তাই চেয়েছিলেন মোবারকের জন্ম অন্যত্র হোক। শামীনগড়ের মাটিতে অভিশপ্ত নাবিক জীবনের বিষ মাখানো আছে। এখানকার আকাশে-বাতাসে সর্বত্র নাবিকের ডাক। এ মাটিতে জন্মালেই নাবিক হয়ে জন্মাতে হয়। সমুদ্র তাদের টানে।

পুরুষানুক্রমে নাবিক বংশের ধারাকে চেয়েছিলেন বাপজী বদলাতে। এ বংশে যে নূতন মানুষটি আসছে সে যদি পুরুষ হয়ে শামীনগড়ের মাটিতে জন্মায়, তবে সে নাবিক হবেই। বাপজী তা চান না। মোবারক সাধারণ মানুষ হয়ে জন্মাক। অন্যত্র তার জন্ম হোক। যে হাজারো গুণাহ তার জীবনে দিন দিন যোগ হচ্ছে—মোবারক নাবিক হলে সে গুণাহের সম্মুখীন ওকেও হতে হবে। অন্যত্র জন্ম হলে সহজ সাধারণ পরিবেশে মোবারক গড়ে উঠবে সহজ সাধারণ মানুষের মত। হাজার গোণাগার অন্তত তাকে হতে হবে না।

খুক খুক করে কাসতে কাসতে ডেকেছিল বাপজীকে ওর নানা, এই বেটা মুরগী-চোরের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিস কি? বাচ্চা তোর এখানেই হবে। খোদাকে

ডাক, বাচ্চাটা যেন ছেলে হয়ে জন্মায়। আর জন্মালেই যেন নাবিক হয়ে জন্মায়।

বৃদ্ধ অথর্ব অসহায় মানুষটার কাছে বাপজী দাঁড়িয়ে রইল স্থবির হয়ে। এক প্রশ্ন করতে এসে অনেক প্রশ্নের উত্তর শুনতে হল সেদিন বাপজীকে।

—সেই কবে! কোন এক আমলে!

খুক খুক করে কাসেন আর বলেন।

—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল তখন।

নানা-সাহেবের নানার বাপজীর ইতিহাস। তখনও কলের জাহাজ হয় নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি চলে কাঠের জাহাজে।

কাঠ চেরাই হতো কলকাতা বন্দরে, চিটাগাং বন্দরে। জাহাজ তৈরি করত দেশী মিস্ত্রীরা।

শামীনগড়ের নৌকো চলতো কর্ণফুলির বাঁওড়ে। লোনা জল ডিঙিয়ে নাও যেত সুন্দরবনে। কাঠ চেরাই করত কাঠ বয়ে আনত। জাহাজ তৈরী হত সে কাঠে। মোবারকের নানা-সাহেব জসীমউদ্দিন সারেং-এর অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিল সেই নাওয়ের মাঝি।

জসীমউদ্দিন সারেং কাসতেই থাকেন। কিছুক্ষণ বাদে দম নিয়ে বললেন, তার-পর ঠিক জানেন না কি করে বৃদ্ধ প্রপিতামহ কর্ণফুলির নাওয়ের মাঝি থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক জাহাজের ডেক-সাফাইয়ের কাজ থেকে পাল-খাটানোর কাজ পেয়েছিলেন।

ও কালটা প্রায় অস্পষ্ট। বৃদ্ধের ঘোলাটে চোখ ঠিক নজর করতে পারল না—বৃদ্ধ আর অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের আমলটাকে। তবে বৃদ্ধের চোখে স্পষ্ট এখনও প্রপিতামহের আমল। অবশ্য সবই শোনা কাহিনী। যেমন করে গল্প বলতেন শীতের কাঠের আগুনে আম্মাজান—বংশের, নাবিক বংশের ইতিহাস মোবারককে। তামক দিতে, পান দিতে এসে এমন অনেক কাহিনী শুনতে হল আম্মাজানকে সারেং জসীমউদ্দিনের কাছ থেকে।

বলছেন জসীমউদ্দিন সারেং। স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখনও বাপজী। পানটা তামাকটা দিতে এসে আম্মাজানও শুনল।

জসীমউদ্দিন সারেং-এর প্রপিতামহ সফর দিয়ে ফিরেই সব মোল্লা-মৌলবীদের ডাকতেন। সিন্নি দিতেন। কোরান শরীফ পাঠ হত। সকলকে বলতেন—গুণাহ অনেক জমা না হলে দরিয়ার পানি কাউকে টানে না। আর হয় কি, সেই গুণাহ বন্দরে ঠেকে ঠেকে হাজার গুণ বাড়ে।

খুব জোর দু মাস! তারপর অস্পষ্ট হয়ে উঠতো ওর চোখ। অস্বস্তি ফুটে উঠতো সারাটা মুখে। সমুদ্র যাকে একবার টেনেছে তাকে আর ফেরানো যায় না। ফেরানো যায় না বলেই পুরুষানুক্রমিক জাহাজী গতি অক্ষুণ্ণ থাকল।

জসিমউদ্দিন সারেং-এর পিতামহের আমল।

নূতন কলের জাহাজ হয়েছে বিলেতে। পালের জাহাজের দিন চুকল।

কলের জাহাজ হল বিলেতে। সমুদ্রতীরের ছোট বন্দর ক্যামবেল টাউন থেকে স্কচ সাহেব গেলেন ইস্ট ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্ট অফিসে। তিনি বাণিজ্য করতেন আমদানি-রপ্তানির। শা-যোয়ান মরদ। প্রথম থেকেই ঘুঘু ব্যবসায়ী।

ম্যাকেঞ্জী সাহেব তখন ভারতবর্ষে—গাজীপুরে। রীতিমত তামাক টানেন গড়-

গড়ায়, দেশী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাংলায় জমা-খরচ রাখতে পর্যন্ত শিখে গেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া মার্চেন্ট অফিস থেকে জানতে পারলেন তাঁর গ্রামের ম্যাকিনন ভারতবর্ষে আসতে চাইছে ব্যবসায়ের খাতিরে। তাকে তিনি নিয়ে এলেন। অংশীদারী ব্যবসায়ী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলতে থাকলো।

ম্যাকিনন সাহেব কাজ নিলেন কাশীপুরে। চিনির কলের ম্যানেজার।

জসীমউদ্দিন সারেং-এর পিতামহের আমলেই এ দেশে এসেছিলেন ম্যাকিনন সাহেব। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক জাহাজের সফর শেষ করে মাত্র কলকাতায় নেমেছেন পিতামহ। গঙ্গার উপকূলে দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লোকটা সে আমলের লাইটারের মাঝি। লোকটা হেঁকে বলল—অ্যারা ব সাজাদ সারেং-এর ব্যাডা, দ্যাশে ফিরবা কি করতে? নূতন সাব্ আইল, নতুন জাহাজ কিনল, পূব দেশে রওয়ানো হইল বইলা রে ব। আর একডা সফর দিয়া দ্যাও। ট্যাঁয়া অনেক মিলব রে ব।

গঙ্গার উপকূলে সাজাদ সারেং-এর বেটা দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। তবে কি কলের জাহাজ এল এ দেশে? তিনিও হেঁকে বলেছিলেন—অ মিঞা এদিকভায় হোন ত, সফরে রইলাম পোরা দুইডা বছর, দ্যাশের খবর কি আর রাখি কি কও? কলের জাহাজ আইল রে ব এ দ্যাশে?

—কথাডা কি জান-আউনের কথা আছে। তবে অহন পর্যন্ত আইয়ে না। তুমি ত, রে ব্যাডা বিলাত গ্যাছিলা। কলের জাহাজ কেমনডা দ্যাখচ?

—মিঞা ভাই এ কথা আর কইও না। নিজের চক্ষে না পরখ করলে অ কথ বোঝানের নারে ব। তামাম দুনিয়া তুইরা য্যান কলের জাহাজডা। ইঞ্জিনডার যেমন তরিবৎ, ত্যামন কেরামতি। খোদার আলোম সাহেব গো মাথায় এ বুদ্ধিডা খ্যালল ক্যান কইরা। চলনের সময় রে ব কেবল ঝক্কর ঝক্কর আওয়াজ করে।--বলে হু হু করে হেসে উঠল জসীমউদ্দীন সারেং-এর নানা-সাহেব।

দুজনই শেষে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে গঙ্গার উপকূলে। আকাশ-পাতাল ভাবল। রাজার দেশ, রাজার মত বুদ্ধি। দুনিয়া জুড়ে ওদের বাদশাহী, দুনিয়া জুড়ে ওদের প্রতিপত্তি, সে প্রতিপত্তি রাখতে হলে এমন কলের জাহাজ না হলেই বা চলে কি করে? জসীমউদ্দিন সারেং-এর নানা-সাহেব, সাজাদ সারেং-এর বেটা নূতন স্বপ্ন দেখল গঙ্গার উপকূলে দাঁড়িয়ে। কলের জাহাজ আসবে এ দেশে। সেই জাহাজের সে জাহাজী হবে, ঝক্কর ঝক্কর শব্দ হবে কেরামতি ইঞ্জিনটার। কান পেতে সে শুনবে। দেশে গিয়ে দুটো শক্ত হাত সবার সামনে তুলে ধরে বলবে—সাহেবদের কলের ইঞ্জিন আমি এ দুহাতে ঠেলে চালাই।

কোম্পানির জাহাজ ছাড়তে অনেক দেরি। গাজীপুরের ম্যাকেঞ্জী সাহেব যাচ্ছেন দক্ষিণ দেশে। সে দেশে যাবার জন্য তিনি কলের জাহাজ কিনবেন। প্রথম থেকে পরিচয় থাকলে ম্যাকেঞ্জী সাহেব নিশ্চয়ই কলের জাহাজ ঠেলার ভার তাকে দেবেন।

ম্যাকিনন, ম্যাকেঞ্জী অ্যান্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠার আমল। সন ১৮৪৭। পূর্ব ভারতের আভ্যন্তরীণ বিস্তৃত জলপথে তখন কোন বাণিজ্য-জাহাজ চলত না। ম্যাকেঞ্জী সাহেব বিচক্ষণ লোক, বিস্তৃত জলপথকে তিনিই প্রথম বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যবহারে আনলেন। কিছু পালের জাহাজ কিনলেন। সে জাহাজ চলতে থাকলো পূর্ব ভারতের জলপথ জুড়ে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে তিনি তাদের বিশেষ সহায়তা পেলেন।

সেই জাহাজেই কিছুদিন কাজ করেছিল এই হারাম জসীমউদ্দিন সারেং-এর নানা

—সাজাদ সারেং-এর বেটা। গড়গড়ায় তামাক টানতে গিয়ে আবার তিনি ক'বার খক্ খক্ করে কাসলেন।

১৮৫৩ সালে এ দেশে কলের জাহাজ এল। ম্যাকেঞ্জী সাহেব কিনে আনলেন সে জাহাজ। নূতন জাহাজ—নূতন নাম, 'অরোরা'। সাজাদ সারেং-এর বেটা সে জাহাজে কাজ পেল। কয়লাওয়ালার কাজ। বাংকার থেকে ঠেলে ঠেলে কয়লা নিয়ে আসত গাড়ি করে! সাহেব ফায়ারম্যানদের পায়ের কাছে ম্যাডিসীন-কার উল্টে দিয়ে বলত—ল্যাও সাহেব, বায়লটে ঢোকাও।

দক্ষিণ দেশে (অস্ট্রেলিয়া) তখন লোক আসতে শুরু করেছে। সে দেশের মাটিতে কেবল সোনা ছড়িয়ে আছে—লোক বলে। জাহাজ যাচ্ছে পশ্চিম দেশ থেকে, সংগে লোক যাচ্ছে। তারা আর ফিরবে না। ঘর বাড়ি তৈরি করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নেবে। তাল তাল সোনা বিদেশে পাঠিয়ে ওরা নাকি ফেঁপে উঠছে।

নূতন দেশ। নূতন জমি। কি হয়, কি না-হয় তখনও পরখ করা হয় নি। খেতে হবে, শুতে হবে, পরতে হবে। দরকার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের।—পশ্চিম হতে আসে। যাতায়াত খরচ ওদের বেশী, দাম বেশী দিয়ে তাই কিনতে হয়। ম্যাকেঞ্জী সাহেব বিচক্ষণ লোক, তিনি এবার মোকা পেলেন। 'অরোরা' জাহাজে খাবার থেকে আরম্ভ করে সাবান পর্যন্ত নিয়ে রওয়ানা হলেন দক্ষিণ দেশের দিকে। ম্যাকিনন সাহেবকে বলে গেলেন ফেরার পথে জাহাজ বোঝাই তাল-তাল সোনা নিয়ে ফিরবেন

এদিকে নানী আমার ঘরে বসে দিন গুণছেন, কবে ওঁর খসম ফিরবে। পাঁচ বছর হয়েছে কর্ণফুলির বাঁওড়ে বদনা হাতে বাক্স মাথায় চলে গেছে খসম। চিঠি-পত্তরের রেওয়াজ নেই সেকালে তাই চিঠি পায় নি। বিদেশ থেকে লোক ঘরে এলে তার মুখে কিছু খবর আসে। সেই খবরে নানী জানলেন কলের জাহাজে কাজ পেয়েছেন নানা। নানীর মুখ ভারি খুশী হয়ে উঠেছিল সেদিন, সে খবরে।

আর এক রাত। নানীর চোখে ঘুম নেই। কর্ণফুলির বাঁওড়ে লগার খট্ খট্ শব্দ কানে আসছে। চোখ বুজে পড়ে আছে নানী। ঠিক তখন দরজার খট্ খট্ শব্দ পেলেন। নানীর বয়েস কম। যোয়ান বিবি। বাপজী আমার কম বয়সের। রক্ত ওর তাই ছলাৎ করে উঠল। নানা-সাহেব হয়তো ফিরছেন সফর শেষ করে। কর্ণফুলি বাঁওড়ে লগার যে খট্ খট্ শব্দ পেলেন, সেই নাও করেই হয়তো ফিরছেন। ঝড়ের বেগে উঠে দাঁড়ালেন। রেড়ীর তেলের প্রদীপটাতে আগুন ধরিয়ে দরজা খুলতেই দেখলেন প্রতিবেশী—কলকাতা লাইটারের মাঝি। তিনিই খবরটা দিয়েছিলেন। কেপহোর্ণের আইল ধাক্কা খেয়ে জাহাজ ডুবেছে। সলিল সমাধি হয়েছে 'অরোরা'র (১৮৫৬, পনেরো মে)। রবার্ট ম্যাকেঞ্জী ডুবেছে। সাজাদ সারেং-এর বেটা ডুবী হয়েছে।

সে আমল আর এ আমল অনেক তফাত। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস নিলেন জসীম-উদ্দিন সারেং। ডুবল ডুবলই! আর কোন খোঁজ খবর নেওয়া হল না। নানীর আবার নিকা হল।

শামীনগড়ের মাটিতে তখন নাবিকের ঢল উঠেছে। গাঁয়ের যোয়ানরা খবর পেল কলকাতায় কলের জাহাজ হরেক-রকমের। ম্যাকিনন সাহেব আনিয়েছেন। ম্যাকেঞ্জী সাহেব ডুবেছে, 'অরোরা' ডুবেছে, তাল তাল সোনা ডুবেছে—ম্যাকিনন সাহেব কেয়ার করে না। উঠতে গেলে পড়তে হয়। এ তো দুনিয়াদারীর কথা। এক জাহাজ

ডুবেছে, দু জাহাজ কিনলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাক হাঁকলেন। জাহাজ যাওয়া-আসা করবে বর্মা মুল্লুককে—মেল জাহাজ!

কর্ণফুলির বাঁওড়ের বুক চিরে চাটগাঁয়ের ভাঙন পেরিয়ে শামীনগড়ের যোয়ানরা ছুটল নাও করে কলের জাহাজে কাজ করতে, বাপজীও তাদের সঙ্গে ছুটলেন। এ হারামের তখন জন্ম হয়েছে।

—তুই মুরগীচোরের বাচ্চা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি শুনছিস? ইমান তোর সায় দেয় না? ইজ্জত তোর নেই? জাহাজ ডুবীতে নানাজী মরলেন, হারামের বাচ্চা তোর বাপজীর কি জাহাজডুবি হয়েছে? জসীমউদ্দিন সারেং কি মরল? তবে? আমার বাপজী তো কেয়ারই করলেন না। নানাজী মরল, বাপজী ছুটলেন। ম্যাকিনন সাহেব তখন জাহাজের কোম্পানি খুলেছে—বি. আই. কোম্পানি। বাপজী গিয়ে বলল, সাজাদ সারেং-এর বেটা, বাপজীর বাপ আরোরা'র কয়লাওয়ালা ছিল। সাহেব পুরানো খাতা খুললেন, কি দেখলেন· তারপর বললেন—ঠিক আছে, তোমার নাম কোম্পানির ঘরে লিখা হইল। আর তুই বেটা বেইমানের পুত, তোর বাপজী মরল না, তুই মরলি না জাহাজডুবিতে, আর বলছিস কিনা তোর বিবির বাচ্চাটার জন্ম ভিনগাঁয়ে হোক! মর মর! ভাগ বেটা আমার কাছ থেকে। আমার বাপজীতো শেষকালটাতে এডেনের এদিকটাতে পানি ডাকাতের হাতে জান খোয়াল। কৈ সে জন্য তো জসীমউদ্দিন সারেং ঘরে বসে থাকল না, বিবির আঁচল ধরে তো প্যান্ প্যান্ করল না?

বিগত দিনের খবরগুলি ক্লান্ত হয়ে ঝিমোচ্ছে মোবারকের মগজের বিভিন্ন অলি-গলিতে। আর একটু সে সরে দাঁড়াল। লাইফ-বোটের রাডারটা ওর দিকে যেন তেরছা চেয়ে আছে। দুপা পিছিয়ে ভর করল এনামেল-রং-করা রেলিং-এর রডটাতে। উইংসের আলো তেমনি নির্জীব, নিস্তেজ– নীল সমুদ্র-সোনালী রঙের ছায়া ফেলে যাচ্ছে। যেমন উনুনের কাঠের আগুনটা খুব সোনালী হয়ে উঠলে আম্মাজান আর একটু দূরে সরে বসতেন, দেওয়ালের ওপর ঠেস দিয়ে বসে বলতেন—তাই আলী তোর জন্ম হল শামীনগড়ে। তারপর তিন বৎসর তোর বাপজীর সাক্ষাৎ নেই। সফরে গেছেন, তাই তোকে নিয়েই পড়ে থাকতে হল। তোকে নিয়েই আমার সময় কাটে। শেষে একদিন তিনি ফেরেন সফর থেকে। কর্ণফুলির বাঁওড় থেকে হেঁটে আসেন। মাথায় পেটি, হাতে চক্‌চকে পেতলের বদনা। সফর দিয়ে এসেছেন, কত জিনিস আনলেন তোর আর আমার জন্য। তিনি এসেও মোল্লা-মৌলবীদের ডাকতেন। দাওয়াত দিতেন দরবেশ ফকিরদের গরীব গরবাদের। খয়রাত করতেন মসজিদে মাদ্রাসাতে। হদিস নিতেন তাদের কাছ থেকে। ডেকের কাঠে কাঠে গুণাহ। হারামজাতেরা হারাম খেয়ে মানুষ। না-পাক লোকদের সঙ্গে মিশে থাকতে হয়। তাই বলেন সফরে আর ফিরছেন না। সাত পুরুষের জমি আছে, ভিটে আছে মোবারক আছে, আর বিবি আছে। সুখের সংসার, বন্দরের কসবীদের হাতে আর নাকাল হতে হবে না। বিদেশ ভুঁইয়ে থাকলে, নোনা পানির ঢেউ গুণলে ওদের কাছে না গিয়েও থাকা যায় না। তাই গুণাহ্ হাজার গুণে বাড়ে।

ভাগ্যিস্ তোর নানাজী সে সময়ে বেঁচে নেই। প্রায় দুটো মাস। শেষে এক সময় কেমন যেন মনমরা হয়ে যেতেন বাপজী। বারান্দায় এসে চুপচাপ কেবল বসে থাকতেন দেখতেন শামীনগড়ের মাথার ওপরের আকাশকে, মেঘকে। এরাও সেখানে

যাবে যে দেশ থেকে বাপজী সফর দিয়ে এলেন। তখন কিছু কটা পিংলা চোখ ভাসতে থাকে আকাশের গায়ে। তারা হয়তো এখন অন্য জাহাজীর অপেক্ষায় আছে। অর্কিড আর পাইনের নীচে অপেক্ষা করছে চুপি চুপি।

আকাশের গায়ে ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে বাপজীর চোখদুটো আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। কানের ওপর তখন আওয়াজ উঠছে গত সফরের সতেরো-কুড়ি রুপোর কাঁচা টাকার। কিন্তু ভুল ভাঙলো বিবি এসে সামনে দাঁড়াতেই। বিবির হাতের চুড়ি বাজছে ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজে।

আম্মাজান সে সময়ে খুব সহজ হয়ে দাঁড়াতে পারতেন বাপজীর সামনে। কারণ সব সফর শেষে বাপজীর এমন আড়ষ্ট চোখ। দেখে দেখে আম্মাজানের অভ্যাস হয়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি চিনতে পারলেন এ দুটো চোখে কিসের প্রত্যাশা। কেন বাপজীর চোখে এত অবসাদ। আম্মাজান আরো কাছে গিয়ে বলতেন, আপনাকে আজ খুব খারাপ দেখাচ্ছে।

বাপজী কোন রকমে চোখদুটো তুলে ধরতেন আম্মাজানের মুখের দিকে। শেষে জবাব দিতেন, বিবি তুই কিছু মনে করিস না, আমি সফরে যাব! বিবি, দুনিয়াটা এখানে আজকাল আমার খুব ছোট ঠেকছে। এ তো আজও বোঝলাম না কেন এমন হল। বিদেশে গেলে দেশ আমায় টানে, দেশে এলে বিদেশ টানে। সারেং বলেন, জাহাজের টাংকীর পানি যে একবার খেল, নোনা জলের ঢেউ যে একবার দেখল, ঘর তাকে কিছুতেই বাঁধতে পারে না, দরিয়া ওকে টানবেই। তাই সফরে আবার যাচ্ছি, আলীকে তুই দেখিস। খবরদার সফরের কথা কিন্তু ওকে শোনাবি না! জাহাজের গল্প কিন্তু ওকে বলবি না। তবে কিন্তু আমার মত ওকেও জাহাজী হতে হবে—হাজার গোণাগার হতে হবে।

পুরো চার মাস বাদেই বাপজী ফিরলেন সফর করে। খুব কম সফর, এমন কম সফর বাপজীর জীবনে প্রথম।

মোবারকের শরীর যেমন আজ নোনাতে খেয়েছে, রুগ্ন অসহায় যেমন সে আজ—বাপজী এসেছিলেন সেদিন ঠিক এই চেহারা নিয়ে। হাতের ওপর ঘড়িটা সাপের মত প্যাঁচ খেয়ে আছে। আম্মাজান ঘড়িটা দেখে ভূত দেখার মত ভয় পেয়েছিলেন। ঘড়িটার ভিতর কেমন একটা অস্বস্তিকর টিক্ টিক্।

আম্মাজান হাতের ওপর ঝুঁকে দেখলেন-কলটার ভিতর কি কোন জীন পাখী হয়ে আছে? কিচ্ কিচ্ শব্দ করছে একটানা! ওটা বুঝি কাঁচের ওপর ধাক্কা খেয়ে টিক্ টিক্ কানের পর্দায় ভাসছে। মোবারক আলীও সে দিন ঝুঁকে দেখছিল ঘড়িটা। বাপের আমল থেকে যেটা আজও বেজে চলেছে। শুধু মাঝে মাঝে ওয়াচের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই হয়।

বাপজী বসেছিলেন তক্তপোশে—রুগ্ন, অসহায় চোখ। খুব নিচু গলায় বলেছিলেন বিবি আমার বিছানা দে।

'অজু করবেন না? নমাজ পড়বেন না?'

'না, বিছানা দে।'

আম্মাজান তক্তপোশের ওপর বিছিয়ে দিলেন নীল শাড়ির কাঁথাটা। মোরগের পালক দিয়ে তৈরি বালিশটা রাখলেন শিয়রে। গায়ের কোট খুলে ঝুলিয়ে রাখলেন দড়িতে। শেষে একটা ভিজা গামছা দিয়ে পা মুছে দিয়ে শুইয়ে দিলেন। বললেন, ইবলিশটাকে খুলে ফেলুন। শামু ওঝাকে ডাকছি, শরীরটা আপনার খুব খারাপ হয়ে

গেল।

বাপজী শুধু বললেন, না।

তিনি চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন তক্তপোশে। দেখছিলেন টিনের চালের দিকে। অপলক কিছু দেখছিলেন যেন।

আম্মাজান এক সময়ে ডেকেও সাড়া পেলেন না, বুঝি ঘুমিয়ে গেছেন। শেষে বাধ্য হয়ে আম্মাজান হাতের প্যাঁচ-খাওয়া ইবলিশটাকে খুলতে গেলেন। কিন্তু কি করে যে ওটা হাতে এঁটে রয়েছে তার হদিশ পেলেন না। অনেক এদিক ওদিক টেনে এতটুকু ঢিলে ঢালা করতে পারলেন না। চোখে পড়ল কাটারীটা—তক্তপোশের নীচে। হাতে নিলেন, কচ কচ করে কাটলেন ইবলিশের লেজটাকে। ইবলিশটা কিন্তু এতটুকু দমল না। অস্বস্তিকর শব্দটা তখনও চলছে। প্রায় মাঝরাতের অন্ধকারে শামীন-গড়ের কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে উঠল। কর্ণফুলির বাঁওড়ের ওপারে সমতল ভূমির বুকে নন্দনপুর গ্রাম আম-কাঁঠালের ছায়ায় ঘুমিয়ে আছে। রোমান-ক্যাথলিক চার্চের ঘড়ির ঘণ্টা বাজলো ঢং—ঢং—এগারো বার বাজলো।

ঘণ্টার আওয়াজে বাপজী ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। নীল কাঁথার বিছানার ওপর বসে কি হাতড়ালেন। হাতের দিকে চেয়ে দেখলেন ঘড়িটা নেই। ডাকলেন, বিবি! ঘড়িটা কৈ? আমার ঘড়ি!

আম্মাজানের চোখে হাল্কা ঘুমের আমেজ ছিল মাত্র, তাই সহজেই ভেঙে গেল আম্মাজানের ঘুম।—ইবলিশটা! আছে। পেটিতে রেখেছি।

—দে দে, শিগগির দে।

আম্মাজান নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। ইবলিশটা! ইবলিশটা দিয়ে কি হয়? কি হবে! মাঝরাতে তিনি এ-সব কি বলছেন! সফর থেকে এসে এমন কেন হয়ে গেলেন?

শিয়রের পাশেই কুপি। তক্তপোশের নীচে মাটির হাঁড়িতে আগুন জিয়ানো গন্ধক মেশানো পাটকাঠি, দেশী দেশলাই আছে শিয়রে। এক গোছা। এক গোছা থেকে অন্ধকারে একটা বেছে নিলেন। তক্তপোশের নীচে মাটির হাঁড়িতে গুঁজে আগুন জ্বালালেন, কুপি ধরালেন। ইবলিশটাকে বাপজীর হাতে দিয়ে শেষে যেন তিনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন আম্মাজান, কিন্তু বাপজী দাঁড়িয়ে থাকলেন দরজার ওপর। ঘড়িটা আম্মাজানের চোখের সামনে ঝুলিয়ে বললেন, ঘড়ির ফিতাটা এমন হল কি করে?

আম্মাজানের গলা কেমন ফ্যাস ফ্যাস করতে থাকল। বাপজীর চোখে অবিশ্বাস—অনুতাপের যেন শেষ নেই! তাই আম্মাজানের গলা দিয়ে দু কাঠের ভিতর তার চালনার মত ক' বার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল কিন্তু কি বললেন তা প্রকাশ পেল না। শেষে বাপজী নামলেন উঠোনে। উন্মুক্ত আকাশতলে দুহাত প্রসারিত করে চিৎকার করে যেন কেঁদে উঠলেন—খোদা হাফেজ।

ভয়ে আম্মাজান ডাকলো মোবারককে—মোবারক ওঠ, তোর বাপজী কোথায় যাচ্ছে—ডাক বাপজী করে।

মোবারক বারান্দায় এসে ডাকলো—বাপজী।

উঠোনের ওপাশের আতাবেড়ার পাশ থেকে শুধু সেই এক শব্দ খোদা হাফেজ! বিবি ভয় পাস নে—বারোটায় ঠিক ফিরবো। মবু আমার বাপজী ভালতো, শুয়ে

থাকগে। আমি এলাম বলে।—খোদা হাফেজ!

উন্মুক্ত আকাশ। নীল সমুদ্র। মাঝ রাতের অন্ধকার চিরে জাহাজটা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলছে। ফরোয়ার্ড পিকের মাস্টের আলোটা পর্যন্ত মনে হয় ঝিমিয়ে পড়ছে। হয়তো সে দিকে যে নাবিক এখন প্রহরী আছে, তার চোখে ঘুমের আঁচ।

গুঁড়ি গুঁড়ি অন্ধকারে একটা ছায়া টলতে টলতে ডেকের উপর দিয়ে আসছে। মাস্টের নীচে দাঁড়িয়ে কি যেন খুঁজল। হয়তো তিন নম্বর ওয়াচের সুখানী ব্রীজে যাচ্ছে পরী দিতে। কিন্তু সিঁড়ির উপর দিয়ে উঠতে মানুষটার যেন খুব কষ্ট। দুহাতের কনুইতে ভর করে লোকটা কোন রকমে বোট-ডেকে উঠে এল। তারপর আবার কি খুঁজল। তারপর এক এক করে অনেক ক'টা শব্দ ধাক্কা খেল ওর কানে—খোদা হাফেজ।

সেই মানুষটা জলের ট্যাংকটার সামনে এসে হেঁকে ডাকল—মোবারক!

—খোদা হাফেজ!

—মোবারক!

—কে? শেখর? এ অন্ধকারে তুই কেন এলি আবার ডেকে?

শেখর ভীষণ বিরক্ত গলায় বলল,—তোর চারটা আটটা পরী। এখন বাজে বারোটা। এ মাঝরাতে রাডারের পাশে দাঁড়িয়ে কি বকছিস অন্ধকারে—খোদা হাফেজ, খোদা হাফেজ বলে। কেন এমন করছিস? কি হয়েছে তোর?

—কিছুতো হয় নি। এমনিতেই একটু খোদার কাছে মোনাজাত করছিলাম। কিন্তু তুই অন্ধকারে এলি, সিঁড়ি বয়ে উপরে উঠলি, জাহাজটা দুলছে—যদি পড়ে যেতিস? হাতদুটো তো বুকের সঙ্গে বাঁধা।

—সে চিন্তা কি তোর আছে? থাকলে কি তুই ওপরে আসতে পারতিস?

শেখর মোবারকের আরো নিকটবর্তী হতে চাইলে মোবারক বাধা দিল,—দেওয়ানী আজকে খুব বেড়েছে, এদিকে আসিস নে। উল্টে কিন্তু নীচে পড়ে যাবি।

শেখর চার্ট-রুমের নীচে দাঁড়িয়ে জবাব দিল, এদিকটায় উঠে আয় তবে। ফোকশালে চল।

মোবারক চার্ট-রুমের এদিকটায় এসে শেখরের হাত ধরে ফোকশালের দিকে যেতে থাকল। শেখর তখন বলল, লিলিকে ছেড়ে এসে তুই খুব বেশী ভেঙে পড়ছিস।

মোবারক ভিতরে ঢুকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল শেখরকে। দুটো কম্বল ওর শরীরের ওপর ভাঁজ করে বিছিয়ে দিয়ে বলল—সব আধুনিকতার ওপরে মানুষের মনে সংস্কার বলে একটি পদার্থ আছে, যাকে আমরা অতি আধুনিকতা দিয়েও ঠেকাতে পারি না। সেই সংস্কারে বাধে এমন কোন কাজ করলেই আমাদের মনে একটা দুরন্ত অনুতাপ গুমরে ওঠে, ভেতর থেকে একটা জ্বালা অনুভব করি। কেমন সাধুভাষায় কথা বলে যেতে থাকল মোবারক।

ফোকশালের স্তিমিত আলোটা জ্বলছে। ঘরটাকে কেন্দ্র করে গুমরে গুমরে মরছে পাইপের নরম হাওয়া। শেখরের চোখে তখন ঘুমের আঁচ। বিড় বিড় করে বকছে মোবারক। যে সারাটা সফরে অত্যন্ত কম কথা বলেছে সে আজ খুব বেশী বকছে। ঘড়িটা আগের মতই ঝুলছে বাঙ্কের এক কোণে। মোবারকের চোখ দুটো সেদিকেই নিবদ্ধ।

শেখর পাশ ফিরে বলল—বিড় বিড় করে আর তোকে বকতে হবে না, এখন

ঘুমো। তিনটা না বাজতেই আবার টাণ্টু হবে।

মোবারক চুপ হয়ে গেল। কম্বলটা মুখের ওপর টেনে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। শেখর সুইচ টিপে স্তিমিত আলোটাকে অন্ধকার করে দিয়ে বলল, বেচারা।

ভোরের সমুদ্র। কুয়াশা নেই। আকাশ পরিষ্কার। ঝড় নেই—তাই দেওয়ানী চুপ। ভোরের প্রসন্ন হলুদ আলো ঠিকরে পড়ছে ডেকে ডেকে।

সেই আগের মতই সমুদ্রের বুক চিরে ঝিমিয়ে চলেছে জাহাজ। বারো-তেরো নটের, কয়লার আর ব্যাঙ্ক লাইনের পুরনো জাহাজ 'সিউল বাংক' চলেছে নিজের খুশি মত। নোনা জলের বুকে ছক্ ছক্ করে শব্দ তুলছে প্রপেলারটা।

ক্রু গ্যালীর সামনে থেকে দু নম্বর পরীওয়ালার দল চলে গেছে। ডেকের ওপর দিয়ে বেরিয়ে আসছে মোবারক—ক্লান্ত, চোখদুটো লাল। মাথার টুপিটা—র‍্যাগ-টানা ছাইয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

মোবারক আফটার পিকে উঠেই গ্যালীর ভিতর ঢুকে গেল, গরম জলের টব নামিয়ে নিল উনুনের ওপর থেকে। বাথরুমেব ভিতর রাখল টবটা। সাবান নিয়ে এল, চান করল।

'পরী' ভাঙার সঙ্গে বাথরুমে একটা গণ্ডগোল চলে। ট্যাণ্ডেল, ডংকীম্যান, গ্রীজার, ফায়ারম্যান, ট্রিমার হৈ চৈ করে স্নান করে। গরম জলে সাবানে ছাইয়ে-ঢাকা শরীর ধুয়ে নেয়, জাহাজীরা শেষে এক শানকী খানা খায়। এক ওক্ত নমাজ পড়ে, তারপর আবার কম্বলটা টেনে দিয়ে আল্লা আল্লা বলে বাংকের উপর অবসন্ন শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

মোবারক চান শেষ করে ফোকশাল থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, শেখর দু থালায় ভাত নিয়ে বসে আছে। একটা থালা টেনে নিল মোবারক। বসতে বসতে বলল, খাইয়ে দিতে হবে না, নিজেই আজ চামচ দিয়ে খেতে পারবি?

শেখর চুপ করে থাকল। শুধু আহত হাতটা দিয়ে চামচের ডগায় কোন রকমে ডেলা ডেলা ভাতগুলি উল্টে পাল্টে দেখছে।

মোবারক নুনের টিনটা এনে দু থালায় একটু একটু করে নুন রাখল। এদিক-ওদিক আর চাইল না। দ্বিতীয় বার আর কোন প্রশ্নও করল না শেখরকে। ডালের টিন থেকে দু হাতা ডাল নিয়ে সমস্তটা ভাত মেখে নিল। ক্ষুধায় ঢোক ঢোক জল আর ভাত গিলতে থাকল। কিন্তু এক সময় চোখ তুলতেই দেখল, শেখর উঠে যাচ্ছে।—খেলি না? না খেয়ে উঠে যাচ্ছিস যে? তা বললেই পারিস, না খাইযে দিলে খেতে পারব না?

—খেতে পারব না বলেই তো তোর আশায় বসে আছি।

—কিন্তু আমার যে খুব ক্ষিধে! তুই বুঝিস তো 'পরী' শেষ করে এলে কতটা কষ্ট হয়? কেমন ক্ষিদে লাগে? শরীরটা কেমন থর থর করে কাঁপতে থাকে।

শেখর কেন জানি আর একটাও কথা বলতে পারল না। চুপচাপ সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। মোবারক তেমনি আবার বলল, তুই বস, আমি হাতটা ধুয়ে আসি। তোকে খাইয়ে দিয়ে আমি খাব। আমার অত্যন্ত ক্ষিদে লাগায় ভুলেই গেছিলাম যে তোরও ক্ষিদে লাগতে পারে।

মোবারক উঠতে চাইলে শেখর বাধা দিয়ে বলল—তুই খেয়ে নে, ততক্ষণ আমি বসি। খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে আমায় খাইয়ে দিবি। আজকাল নিজের দিকটাই

খুব বেশি করে ভাবছি মোবারক। জাহাজ শুনলাম সিডনী হয়ে হোমে যাচ্ছে। হোমে গেলে নিশ্চয়ই কলম্বোতে আমাদের পে অফ্ করবে।

মোবারক আরো দু ডেলা ভাত মুখে পুরে বলল, তুই আমার চাইতে অনেক বেশি অসহায় এ জাহাজে। আর তাই নিজের দিকটা আজকাল খুব বেশি করে ভাবছিস।

—কেন, এত দিন ত এমন ভাবি নি।

—ভাবতে দিই নি বলে ভাবিস নি। কিন্তু এখন নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে তোকে দেখবার আমার সময় হয় না। আর তুই আমার উপর আজকাল কথায় কথায় রাগ করিস।

শেখর শুধু 'হুঁ' করে একটা আওয়াজ করল। তারপর চুপ করে দেখল মোবারক ভীষণ ব্যস্ত হয়ে খাচ্ছে।

মোবারক আবার বলল—দেশের জন্যে তোর মন কাঁদে? হাজার হাজার মাইল দূরে তোর মাকে আত্মীয়স্বজনকে আজকাল খুব বেশী মনে পড়ছে তাই না শেখর-? এই লম্বা সফরে নিশ্চয়ই তোর মনে হচ্চে দেশে কুলিগিরি করে খাওয়া অনেক গুণে ভাল, কারণ সেখানে সারাদিন খাটুনির পর মা-বাবা-ভাই-বোনদের সঙ্গে দু দণ্ড মিশে থাকা যায়। জীবনধারণের পক্ষে এ যে কতদূর প্রয়োজন, তুই নিশ্চয়ই আজকাল খুব বেশী অনুভব করছিস?

দেশের কথা মনে হলেই দীর্ঘ সফরটা ভীষণ খারাপ লাগে শেখরের। সমুদ্রের নোনা জলে উঁকি দিয়ে অনুভব করে এই জলটাই তার দেশের মাটির সঙ্গে মিশে আছে, অথচ সে আজ কতদূরে!

শেখর মোবারকের মুখের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। শেষে নিজে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকল। তার শংকরপুর গ্রামটা চোখের ওপর ভাসছে। মা বাবা, মায়ের কথাই, মায়ের ছবিই খুব বেশী করে উঁকি দিচ্ছে। জাহাজে উঠবার আগে মায়ের দুটো ঝাপসা চোখ বিদায়ের সময় কেমন ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। সব এক এক করে চোখের উপর ভাসছে।

শেখর চোখ খুলে বলল—তোর আম্মাজান নিশ্চয়ই কেঁদেছিলেন, না রে?

চুপ করে রইল মোবারক। ওর বুকের ভিতর তখন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পাক খেয়ে মরছে। তবু ঢক ঢক করে কাঁচের গ্লাস থেকে গলায় জল ঢেলে বলল—আম্মাজান? আম্মাজান আমার থেকেও নেই শেখর।

মোবারক চোখ নামিয়ে আনলে শেখর ওর দিকে চেয়ে অনুভব করল আম্মাজান সম্বন্ধে দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করলে উত্তর মিলবে না। আঠারো মাস সফরে এমন বিবর্ণ চোখ সে অনেকবার দেখেছে। একটা প্রশ্নের জবাব দিয়েই এমন আনমনা হয়ে গেছে বহুবার মোবারক। কিন্তু আজ এ অতি অপ্রত্যাশিত। মোবারক গত রাতের মত বিড় বিড় করে বকতে শুরু করেছে আবার। মনে মনে শেখরের অত্যন্ত করুণার উদ্রেক হল। আম্মাজানকে কেন্দ্র করে নিশ্চয়ই নিবিড় স্নেহের অন্তরালে কোন ঝড় উঠেছিল, সে ঝড়ে ওকে শামীনগড় থেকে উপড়ে এনে জাহাজের ডেকে ফেলে রেখেছে। অথচ সব বলেও আম্মাজান সম্বন্ধে মোবারক চুপ করে থাকে।

বিড় বিড় করে বকতে বকতেই বাকী থালাটা খেয়ে নিল মোবারক। হাত ধুয়ে নিল বাথরুম থেকে। শেখরকে খাইয়ে দিল। এঁটো বাসন ধুয়ে আনল। শেষে মেসরুমের লকারে কাচের গ্লাস আর থালা দুটো রেখে তরতর করে নেমে গেল ফোক-

শালে। ফোকশালে ঢুকে কম্বল দুটো মাথার ওপর টেনে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

শেখর ফোকশালে গিয়ে ঢুকল না। কারণ পরী কিংবা ডে-ম্যানের বালাই ওর নেই। হাতে ঘা বলে ক্লাজ থেকে ওর ছুটি। কেবল সাড়ে বারোটায় একবার মেজো মালোমের কাছে হাতে ওষুধ লাগাতে যেতে হয়। তারপর সারাদিন ছুটি। সারাদিন একঘেয়ে সমুদ্র দর্শন।

শেখর ডেকের ওপর পায়চারি করল অনেকক্ষণ। তারপর ব্রীজের দিকে চাইতেই দেখল তিন নম্বর মালোম নেমে আসছেন।

নেমে আসতেই শেখর প্রশ্ন করল—আমাদের জাহাজ, স্যার নিশ্চয়ই সিডনী হয়ে হোমে ফিরবে। কলম্বোতে আমাদের নিশ্চয়ই নামিয়ে দেওয়া হবে?

তিন নম্বর মালোম টুইন-ডেক পার হয়ে যাবার সময় বললেন, ঠিক নেই। মনে হয় সিডনী থেকে পুরনো লোহা নিয়ে জাহাজ জাপানে যাবে।

শেখর ডেকের ওপর পায়চারি করছিল অনেকক্ষণ শুধু এই খবরটা জানবার জন্য। আঠারো মাস সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় ওর অনুভূতি যেন মরতে বসেছে। শুধু একটা খবরের প্রত্যাশা ওর জীবনে। তার দেশ, তার বাড়ির খবর। তার ঘরে সে কবে ফিরবে? কিন্তু সে অনুভূতি আজ যেন বিবশ জরাগ্রস্ত। ঠিক মত দেশের মানুষদের ভাবতে পর্যন্ত কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে সেই অনুভূতি অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হল যুগ যুগ ধরে সমুদ্রের বুক চিরে চলেছে জাহাজ। কোন্ এক আদ্যিকালে জাহাজের সিঁড়িতে পা দিয়ে উঠেছিল আজ পর্যন্ত সে সিঁড়িতে পা দেওয়াই আছে। আম-জামের ছায়া কেবল কোন এক রাতের স্বপ্ন। ভাই বোন কোনো এক দেশের রাজকন্যা রাজকুমার। ওর পক্ষীরাজ ঘোড়া পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে কিন্তু আম, জাম, নারকেলের ছায়ায় আর একবারের জন্য হারিয়ে যেতে চাইছে না।

আজকাল শেখরের স্বভাব হয়ে গেছে সারেং কিংবা ট্যাণ্ডেলকে দেখলেই প্রশ্ন করে জানতে চায় জাহাজের পরবর্তী যাত্রা সম্বন্ধে তারা কোন খবর রাখে কি না! কিন্তু তারা হেসে সে প্রশ্নের জবাব দেয়—আরে, সফর যত বাড়বে টাকা তত বাড়বে। দেশে গেলেই তো হয়ে গেল।

শেখর ওদের বিদ্রূপ বোঝে, কটাক্ষ বোঝে। তবু বেহায়ার মত শুধু এক প্রশ্ন —জাহাজ কবে ফিরবে দেশে। কিন্তু তিন নম্বরের কথায় শেখরের চোখদুটো জ্বলে উঠল। তিন নম্বর সমস্ত খুঁটিনাটি খবর রাখে। তার খবর হক খবর। সে খবরের ভিতর জাল-জুয়াচুরি-বিদ্রূপ-কটাক্ষ-মিথ্যা-ফেরেববাজির প্রশ্ন নেই। সুতরাং জাহাজ জাপানে যাবেই। তারপর হয়তো চীনে, শেষে হয়তো একদিন সিউল ব্যাঙ্ক বে অফ্ বিসকের প্রচণ্ড ঝড়ে তীব্র দেওয়ানীর হিক্কায় ডুববে। দেশের লোক শুধু টেলিগ্রাম পাবে—ব্যাঙ্ক লাইন কোম্পানির সিউল ব্যাঙ্ক জাহাজ ঝড়ের ভিতর হারিয়ে গেছে। ব্যস্, এই পর্যন্ত। নাবিক-জীবনের পাওনা এইখানেই শেষ। এইখানেই বিরতি।

এই দীর্ঘ সফরে জাহাজটা কতবার কত ঝড়ের সম্মুখীন হল। কতবার দেখা গেছে বুড়ো ক্যাপ্টেন চার্ট-রুমের মোটা কাচের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরকে ডাকছেন। জাহাজের ঈশ্বর, দুনিয়ার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলছেন—আমার জাহাজকে বাঁচাও।

নীচে ইঞ্জিন রুমে টেলিগ্রামের অ্যাস্টার্ন অ্যাহেডের সামনে টেবিলের উপর ভর করে থাকেন সেকেণ্ড এঞ্জিনিয়ার। কান পেতে শোনেন ইঞ্জিনের কোন বেখাপ্পা

আওয়াজ উঠছে কি-না। প্রচণ্ড ঝড়ের বুকে 'আগিল' আর 'পিছিলের' দুরন্ত ওঠা-নামাতে শঙ্কিত হয়ে শুধু একটা প্রচণ্ড ভাঙনের প্রত্যাশা করেন। মৃত্যুর সঙ্গে মনে মনে বোঝাপড়া করেন। হিসাব করেন এত বড় শরীরটা হাঙরে খেয়ে ফেলতে কতক্ষণ লাগবে, অথবা সমস্ত জাহাজটা সমুদ্রের নীচে তলিয়ে গেলে দম আটকে মরতে ওদের কতক্ষণ সময় নেবে। আর বাড়ির কথা মনে হলে ছোট মেয়ে কনীর ঢলঢলে মুখ, কচি কচি হাতের সমুদ্রতীরের বিদায় সম্ভাষণ শুধু মনে পড়ে। ইঞ্জিনের গরম হাওয়ায় চোখের জলটা বের হয়ে আবার শুকিয়ে যায়। ইঞ্জিনটা বেখাপ্পা শব্দ তুলছে—সিলিন্ডারটা বুঝি উড়ে যাবে।

ফোকশালে ফোকশালে তখন চিৎকার ওঠে—আল্লা।...সারেং কোন রকমে টলতে টলতে মেসরুমে এসে ভাণ্ডারীকে ডাকে—সব ফেলে নীচে যাও, নীচে যাও ভাণ্ডারী। দেওয়ানী, দেওয়ানী খুব জোর উঠছে। পাগলী খেপে গেছে। খানা পাকাতে হবে না, নীচে গিয়ে আগে জান বাঁচাও।

সারেং-এর চিৎকারই শুধু ভাণ্ডারীর কানে পৌঁছয় কিন্তু শব্দগুলি স্পষ্ট হয় না। তবু ভাণ্ডারী নিজের জান বাঁচাবার জন্য নীচে ছোটে। কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে বাঙ্কের রড ধরে উপুড় হয়ে থাকে।

সে-সময় টানেল পথ খুলে দেওয়া হয়। ইঞ্জিন-রুম জাহাজীরা সে পথে ওঠা-নামা করে তখন। তাদের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। ঝড় যত ওঠে উঠুক—ইঞ্জিন চালু রাখতেই হবে। লাল দাগে স্টীম গেজের কালো কাঁটা থর থর করে কাঁপবেই। কাজেই ফায়ারম্যানদের টল্‌তে টল্‌তে শাবল নিয়ে কেবল কয়লার ওপর পড়ে থাকতে হয়। কারণ বয়লারের ফার্নেসে শাবল হাঁকড়াতে হবেই। কিন্তু অস্থির পা দুটোর ওপর কোন রকমেই শরীরটা ভর করে থাকতে চায় না। শুধু সামনে বা পিছনে ঝুঁকে পড়তে চায়। তবু চোখ দুটোর সহজ স্বচ্ছ অনুসন্ধানের দৃষ্টি, স্টীম গেজের বুকে—স্টীম উঠছে কি নামছে। কয়লা হাঁকড়াবে কি হাঁকড়াবে না। অস্থির পা দুটো আর চলবে কি চলবে না।

শেখর চোখের ওপর দেওয়ানী দেখল অনেকবার। ঝড়, সাইক্লোন, টাইফুন, কুয়াশায় জাহাজের বেশীর ভাগ সফর। লিমন বে, আর বে অব্ বিসকের দেওয়ানীর কথা মনে হলে আজও শরীর শিউরে ওঠে। সেই বিনিদ্র রাতের কাহিনী পরিবার-পরিজনদের বললে তারা নিশ্চয়ই আর জাহাজী হতে দেবে না।

একটা ঠক ঠক আওয়াজে শেখর ফিরে চাইল। উইণ্ড-মোসনের নীচে ফাইভার—ফিফ্‌থ্ এঞ্জিনিয়ার। নাইন-সিক্সটিফিফ্‌থ্ স্পেনার দিয়ে ঢিলে স্ট্রেপারের মুখ আঁটছে। চার 'ফল্কা' পার হয়ে পাঁচ নম্বর 'ফল্কা'র সামনে আসতেই ফাইভার ডাকলেন—শেখর !

শেখর দাঁড়াল না। সোজা চলে এল পিছিলে—গ্যালীর সামনে ইচ্ছা করেই ও দাঁড়ায় নি। কারণ ফিফ্‌থ্ ইঞ্জিনিয়ার, চিফ সেকেণ্ডের ফাইভার : বাঙালী ক্রিশ্চিয়ান এবং জাহাজের অফিসার র‍্যাঙ্কে বলে বাঙালী সাধারণ জাহাজীদের অত্যন্ত করুণার চোখে দেখেন। জাহাজীদের ভিতর থাকা-খাওয়ার দুঃখ নিয়ে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ উঠলে তিনি কৃত্রিম দুঃখ করে মুখ ফিরিয়ে মুখ টিপে হাসেন। মুখ টিপে হাসেন এইজন্য যে, তোমরা আর কি পেতে চাও বাপু ! অনেক পেয়েছ। কোম্পানি তোমাদের অনেক সুখ-সুবিধা দিয়েছে। দেশে থাকলে লাঙল বইতে, ধান পেতে আধ খোরাকী, রোজ পেতে পাঁচ সিকা, খেতে পেতে শুকনো মাছপোড়া আর ভাত। আর জাহাজে

এসে তিন টাকা হতে দশ টাকা পর্যন্ত রোজ ; দুবেলা গোস্ত, ভাত, চর্বি ভাজা রুটি, চা-দুধ-চিনি। আর কি চাই! অথচ তিনি অত্যন্ত বিনীত হয়ে বিদ্রোহের সময় বাঙালী জাহাজীদের মুখোমুখী বলেন—অনুচিত! কোম্পানির অনুচিত!—কেউ যদি জাহাজীদের মধ্যে বলল, দেখুন না স্যার, পাঁচ মাসের আগের গোস্ত! গোস্তে পোকা পড়েছে। নিজের চোখে দেখা। এ পেল্লাই খাটুনির পর তৃপ্তি করে দু মুঠো ভাত যদি মুখে না দিতে পারি, কত বড় কষ্টের কথা বলুন? পাঁচ নম্বর সাব উত্তর দেন—ঠিক, ঠিক! তোমরা জানাও মাস্টারকে। জানাও কোম্পানিকে। লন্ডনের ওয়েলফেয়ার অফিসারের কাছে রিপোর্ট দাও।—কিন্তু সেকেন্ড থার্ড যদি ফাইভারকে প্রশ্ন করে জানতে চায়—কি ব্যাপার? তখন ওর সুর পালটে যায়—আরে, ও বাগার-গুলো চিরদিনই বিদ্রোহ করে আসছে, বাকি দিনও করবে। ওসব কুকুরের হট-টেম্পার কোম্পানির দেখলে কি চলে?

নীচে ফোকশালে ঢুকে শেখর দেখল মোবারক ঘুমোয় নি। কম্বলের ফাঁকে পিট পিট করে চেয়ে আছে। শেখরকে দেখছে। শেখর নিজের বাঙ্কের উপর বসে বাক্সোতে হেলান দিয়ে বলল, কি রে ঘুম আসছে না? লিলি নিশ্চয়ই চোখে জেগে আছে?

শরীর থেকে দু হাতে কম্বলটা ঠেলে দিল মোবারক। উঠে বসল বাঙ্কে। তার-পর চোখদুটোর উপর বিনীত প্রলেপ ঠেলে দিয়ে বলল - সমুদ্রমানুষদের জীবনটাই ঝড় আর জলেব মধ্যে শেখর। লিলির মত মেয়েরা সে ঝড় আর জলের কাছে কতটুকু? চোখের ঘুমটাকে লিলির মত মেয়েরা কেড়ে নেয় না, কেড়ে নেয় জীবনের ক্ষুদ্র সংস্কার, ক্ষুদ্র গুণাহ্। লিলি যদি সাধারণ ওক্ আর পাইনের তলায় নিশীথের বন্দর-অভিসারিকার মত আসত, তাহলে কোন অনুশোচনাই ছিল না। কিন্তু সে এসেছে আমার জীবনের একটা বিশেষ দিক নিয়ে, সমাজের বুকে বাস করতে গেলেও যে দিকটা অত্যন্ত ক্ষতিকর, অত্যন্ত গুণাহ্গার। আর সমুদ্রের বুকে—বন্দরে বন্দরে। আর ভাবতে পারি না শেখর। দোজ্খেও বুঝি আমার স্থান হবে না। খোদা হাফেজ!

মুহূর্তের ভিতর শেখর স্তব্ধ হয়ে গেল। নির্বাক হয়ে থাকল। খোদা হাফেজ বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখল মোবারকের চোখ থেকে ঝর ঝর করে নোনা জল ঝরছে।

—আমার গুণাহ্ হাজার গুণাহ্ শেখর। বাপজীর গুণাহ্ অনেক কম। আরো কম।

শেখর বালিশ টেনে বালিশের ওপর দুটো কনুই ভর করে একটু সহজ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, আমার কিন্তু মোবারক সমুদ্রের ঝড় জলটাকেই বেশী ঠেকছে। আগওয়ালার কঠোর পরিশ্রমকে ভয় পেয়েছি। মন আমার দেশের জন্য কাঁদে। রাতে শুয়ে শুয়ে দেশের কত বিচিত্র কথা ভাবি। কত কল্পলোকের কল্পনা করি।

—ওটা বেশীদিন থাকে না। দু-চার সফর বাদে নূতন নাবিক-জীবনে সমুদ্র আর জাহাজ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসবে। তখন দেখবি আমার নাবিক-বংশের ইতিহাসের মত তোর ইতিহাসের ধীরে ধীরে একটা বিকৃত দিকের ভিত্তি স্থাপন করছে। দুনিয়ার সব দেশ ঘুরে, সব নাবিকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাই বুঝেছি। সেখানে সমুদ্রের ঝড় জল নয়, দেশের আম-জাম-নারকেল ছায়ায় স্বপ্ন নয়, পচা গোস্তের খানাপিনা নিয়ে বিদ্রোহ নয়, বিদ্রোহ নিজের জীবনের ওপর একটা ক্ষুদ্র

আপত্তি নিয়ে। যা কোন দিন ভাবিস নি অথচ নাবিক বলেই এটা অবশ্য পাওনা। যেমন আমার বাপজী কার্ডিফ বন্দরে ফ্লাওআর গার্লের সঙ্গে যে ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেবার বাপজীর বিদ্রোহ ঝড়-জলের ওপর বা খানাপিনার ওপর নয়, বিদ্রোহ নিজের জীবনের ওপর। ঘৃণা নিজের দেহটাকে ঘিরে, নিজের ব্যক্তিগত বুদ্ধিটাকে ঘিরে, 'খোদা হাফেজ' করে করে যে গুণাহের হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজেছিলেন। ঘড়িটা যে কাহিনীর সাক্ষী হয়ে মোবারকের হাতে আজও ঝুলছে।

শামীনগড়—মোবারকের জন্মভূমি।

শামীনগড়ের শড়ক—বাপজীর এগারোটা থেকে বারোটার পরিভ্রমণের পথ।

টিনকাঠের বারান্দায় আম্মাজান উন্মুখ। বাপজীর প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকেন। কখন অন্ধকারের বুকে হারিয়ে গেছে মানুষটা—এখনও ফিরছেন না। এখনও আতাবেড়ার ওপারে শামীনগড়ের পথে পায়ের শব্দ ওঠছে না। অন্ধকার উঠোনে সেইজন্য নেমে এলেন আম্মাজান।

আম্মাজানের পায়ের সংলগ্ন হয়ে হাটছে মোবারক। আতাবেড়ার পাশে এসে হঠাৎ দুজনই থামল। দুজনই আতাবেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল—ক্রমশঃ একটি শব্দ শামীনগড়ের সড়ক ধরে তেঁতুল তলার অন্ধকার পার হয়ে গ্রাম্য পথের দিকে ওঠে আসছে কি-না।

অনেকক্ষণ হল রোমান ক্যাথলিক চার্চে বারোটা বাজার শব্দ উঠেছে। কিন্তু বাপজী ফিরছেন না বলে আতাবেড়া পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন আম্মাজান। সড়কের ওপারে অশ্বত্থগাছের নীচে মসজিদ থেকে আজান ওঠছে তখন। আর সেই ছন্দোবদ্ধ জ্যোতির্ময় সুরের সঙ্গে পায়ের আওয়াজ এদিকেই এগিয়ে আসছে।

আম্মাজানের উন্মুখ মন স্বাভাবিক হয়ে এল।

মোবারক ডাকল, আম্মা।

আম্মাজান বললেন, চল ঘরে চল। তোর বাপজী ফিরছেন।

উঠোন পার হয়ে এল তারা। তারপর বারান্দায়। বারান্দায় ওঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন আম্মাজান। মোবারক ঘরের ভিতর ঢুকে তক্তপোষের উপর আলোয়ান জড়িয়ে বসে থাকল।

বাপজীও ঘরের আলো লক্ষ্য করে বারান্দায় ওঠে আসলেন। মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন আম্মাজানের। আম্মা নির্বাক। বাপজীর চোখে বিস্ময়।—তুই বিবি এখনও দাঁড়িয়ে আছিস? বলেছি তো বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরব। শুয়ে থাকলেই পারতি। খোদা হাফেজ। ভিতরে চল, হুঃ হুঃ, ভিতরে। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ব এখন।

চৌকাঠ থেকে নড়লেন না আম্মাজান। কোন আওয়াজ করলেন না তিনি। এক ফাঁকে বাপজী ঘরের ভিতর ঢুকে কুলুঙ্গী থেকে নিলেন কুঁপিটা। ডালা খুলে পেটির ভিতর সযত্নে রাখলেন ঘড়িটা। সহজ হয়ে দাঁড়ালেন এবং আবার চীৎকার করে ডাকলেন, খোদা হাফেজ! তারপর বারান্দার দিকে চেয়ে অনুরোধ করলেন, ঘরে আয় বিবি। আয় না। আমার উপর রাগ করলি তুই। রাগ করবি। রাগ করার অধিকার তোর আছে। মবুর দিকে চোখ তুলে বললেন, মবু তুই ডাক না তোর আম্মাকে। ভিতরে আসতে বল।

মবু ডাকল, আম্মা ভিতরে এস।

কিন্তু আম্মাজান যখন ভিতরে ঢুকলেন তখন বাপ আর বেটা বুঝলে তিনি এতক্ষই বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। ভেজা-ভেজা চোখদুটো তখনও তার সাক্ষী হয়ে কুপির আলোতে জ্বল জ্বল করছে। বাপজী তাঁর বলিষ্ঠ বুকে দুটো হাত জড়িয়ে রাখলেন। বললেন, বিবি তুই কাঁদলি! কিন্তু আমি যে দিনরাত ধরে মনের ভিতর কেঁদে চলেছি সে তো তুই দেখতে পেলি না!

আম্মাজান আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠলেন। বললেন, কি হয়েছে আপনার? এমন হয়ে গেছেন কেন?

—এমন হয়ে গেছি কেন? বাপজীর চোখে মুখে এক ঝলক খড়ের আগুন যেন দাউ দাউ জ্বলে উঠল। এমন না হয়ে উপায়ই বা কি ছিল। সমুদ্র-পাঁজরে জাহাজের পোর্ট-হোল দিয়ে যে বীভৎস চীৎকারটা গলে পড়ে নোনা জলে হারিয়ে গেল, যার সাক্ষী কেউ ছিল না শুধু ঘড়িটা বাদে, যে গুণাহের হাত থেকে বাঁচতে দেশে ছুটে আসতে হল, রাত এগারো থেকে বারোটা খোদা হাফেজ বলতে হল, তবু পোড়-খাওয়া জীবনটা যখন ঝিমিয়ে পড়ল না, অনুতাপ আর অনুশোচনা যখন বেড়ে চলেছে তখন এমন না হয়ে উপায়ই বা ছিল কি?

বাপজী বললেন, তোকে আমি সব বলব। দুদিন সবুর কর, সময় দে—এমন করে ভেঙে পড়িস না। এত সহজে ভেঙে পড়লে বাকী জীবনটা চলবে কি করে!

আম্মাজান তক্তপোষের কাছে এসে নীল ডুরে শাড়ীর কাঁথাটা ঝেড়ে দিলেন। হাতে কুপিটা নিয়ে বাপজীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। বাপজীও একটু সরে এলেন আম্মাজানের কাছে। মবু ঘুমিয়ে আছে ভেবে আম্মাজানের চকচকে পরিপুষ্ট মুখটা কুপির আলোতে তুলে ধরলেন—নোলক, নাকফুল, বেসর সব একসঙ্গে যেন প্রসন্ন হাসি হাসছে—হঠাৎ ওঠা ঝড়ের পরে পরিষ্কার আকাশের মত। মাসের পর মাস ধরে যে নির্বাক অসহিষ্ণু আকাঙ্ক্ষা জমে ছিল তাই যেন আজ এই সহসা মধু যামিনীতে আম্মাজানের চোখে জেগে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাপজীও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। হাত থেকে কুপিটা পড়ে গেল মাটিতে। আলো গেল নিভে। উত্তপ্ত নিশ্বাসগুলো আছাড় খেয়ে পড়ল দেয়ালে দেয়ালে। আর সেই সময় বাপজী হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন—খোদা হাফেজ।

শামীনগড়ের সড়ক কর্ণফুলির বাঁওড় পার হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে চলে গেছে। মগের মুল্লুকে কোথায় যেয়ে পথটা হারিয়ে গেছে শামীনগড়ের মানুষেরা তার খবর রাখে না। খবর রাখার প্রয়োজন হয় না। বাপজী তাই এই সড়কের হদিস রাখেন মসজিদ পার হয়ে কর্ণফুলির পুল পর্যন্ত। রাত এগারোটা থেকে বারোটা বাপজী মসজিদ পার হয়ে পুল পর্যন্ত হাঁটেন। ফেরেন আবার রাতের অন্ধকারেই। বাড়ীর মসজিদ অতিক্রম করে উঠোনে যেয়ে ঢোকেন। বিবি অপেক্ষা করে থাকে। বিবির চোখ তখন ভার হয়ে ওঠে। ঘরে ফিরে বলেন তিনি, তোকে সব বলব, সময় আসুক, তুই আমায় সময় দে।

এমনি করে প্রতিদিন রাত বারোটার পর ঘড়িটার সঙ্গে বাপজীর গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যেমনি রাত বারোটা বাজার শব্দ মোবারক গভীর আগ্রহের সঙ্গে শোনে। ঠোঁটদুটো তখন ওর শুকনো হয়ে ওঠে। চোখদুটো সঙ্কুচিত হয়ে আসে। এবং এই বারোটা বাজার আগে সে ডেকে উঠবে। পায়চারী করবে অফিসার গ্যালীর

পশ্চিমের বীট পর্যন্ত। বারোটা বাজলে আকাশের দিকে দু হাত প্রসারিত করে মবু সবার অলক্ষ্যে ডাকবে—খোদা হাফেজ। সেই শামীনগড়ের সড়কের বাপজীর মত।

মোবারক বসেছিল ফোঁকশালে—নিজের বাংকে। দু হাঁটু ভেঙে মাথাটা গুঁজে দিয়েছিল হাঁটুর ভিতর। পাশের বাংকে ঘুমিয়ে রয়েছে শেখর। কেবিনের ও পাশের পথ ধরে কেউ সন্তর্পণে উপরে ওঠে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই তেলওয়ালা হবে দু নম্বর পরীর। শেষ বারের মত ওর ওয়াচের তেল ষ্টিয়ারিং ইঞ্জিনে দিয়ে গেল। ডেকে গেল—যাদের পরবর্তী পরী দিতে হবে তাদের।

পোর্ট-হোল খোলা। কাচের ফাঁক দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া ঢুকছে। ফুরফুরে হাওয়ায় শেখরের চুল উড়ছে। শেখরের অনাড়ম্বর সরল সহজ মুখের প্রতি চেয়ে থাকল অনেকক্ষণ।

মিষ্টি মিষ্টি মুখ—দুনিয়ার সুখের খবরটাই শুধু জানা আছে চোখদুটোয়। সে চোখে সে আম্মাজানকে অনুভব করতে পারে।

সে এখনও বাংকের উপর বসে রয়েছে। ভাবছে অনেক কথা। অনেক কালের বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি।

যাদের পরীতে যাবার কথা শেষ রাতে, তারা এক এক করে ওঠে যাচ্ছে সিঁড়ি ধরে। সতর্ক রেখে সে একটু আড়াল দিয়ে বসল সকলের।

ওদের পায়ের শব্দ ক্রুগ্যালীর সামনে মিলিয়ে গেল। ইঞ্জিন-রুম থেকে ঝ্যাক্ ঝ্যাক্ শব্দ [illegible] ঘুলঘুলি গলে ফোঁকশালের ভিতর ঢুকছে।

সেই শব্দ সাপের মত বেয়ে ওর শরীরের উপর যেন ওঠে আসছে। কেমন ঝিম ঝিম করে উঠল মাথাটা। কি যেন ভাবতে ভাবতে চোখদুটো অন্ধকার হয়ে এল। আলো গেল নিভে। আম্মাজান যেন কাঁদছেন আর বলছেন, বাপজী আর ফ্লাওয়ার গার্লের কথা, ঘড়ি আর বাপজীর দোস্ত রহমৎ মিঞার কথা—

১৯৩৫ সালের অনেক টুকরো ঘটনা। যোগ দিলে অনেক হয়। বৃটিশ ইণ্ডিয়া স্টীম নেভিগেশনে বাপজী তখন ছোট ট্যাণ্ডেল্।

ক্লান্ত আর অনেক আপশোসে গুমরে-মরা মনটা চেয়ে থাকল ঘড়িটার প্রতি। উন্মনা হয়ে শামীনগড়ের মাটিতে গড়াগড়ি খেল মনটা। আম্মাজানের নালিশ শুনল। তিনি বলেছিলেন, তোর বাপজী সে রাতেই চলে গেল।

বে অফ্ বিসকের ঝড় খেয়ে এগিয়ে চলছিল জাহাজ—বাপজীর জাহাজ, বাপজী সে জাহাজে ছোট ট্যাণ্ডেল্।

বাপজী আর রহমৎ মিঞা থাকতেন এক ফোঁকশালে—পাশাপাশি বাংকে। জাহাজের তিনি ডংকীম্যান। কলকাতা বন্দরেই প্রথম পরিচয় এবং একটা সম্পর্কও কি করে যেন দুজনের ভিতর বের হয়ে পড়েছিল। তারপর দুজন সালাম আলাইকুম আর ওয়ালেকুম সালামের ভিতর প্রথম পরিচয় থেকে ভাইসাব আর মিঞাসাব পর্যন্ত উঠেছিলেন।

ঝড়ের দরিয়ায় পোর্টহোল খোলা চলে না। ঝড়ের দরিয়ায় দুম্তি রাখাটাও ভয়ানক ব্যাপার। কেউ কাউকে সামলাতে পারে না। নিজেকে নিজে সামলাও, নিজেকে নিজে বাঁচাও। তবু যখন অত্যন্ত দেওয়ানীর জন্য বাংক থেকে উঠতে পারছিলেন না রহমৎ মিঞা, লকার থেকে খাবার তুলে এনে খেতে পারছিলেন না তখন বাপজী ধরে ধরে সব সাহায্য করেছিলেন। পেট ভরে খাওয়ানোর চেষ্টা করে-

ছিলেন দোস্তকে। গোটা সফর ধরে এমনি করেই চালিয়ে এনেছেন—এমন করে দোস্তকে বিপদে-আপদে আগলে এসেছেন।

চিটাগাং আর নোয়াখালীর জাহাজীরা বে অফ্ বিসকে-কে বলে বয়া বিস্কুট। তারা আগে থেকে জানে এখানে এলে ঝড় উঠবে—দুলবে জাহাজটা অত্যধিক। দুলে দুলে টানেল পথ চলতে হবে—ডেকপথে ইঞ্জিন-রুমে যাওয়া যাবে না। সুতরাং বাপজী অনেক তরিবত করে বুঝিয়েছিলেন দোস্তকে—আপনি দেওয়ানী ওঠলে কেন যে নোনাপানী খান না বুঝি না মিঞাসাব।

কম্বল ঠেলে কোনরকমে উঠে বসেন রহমৎ। বলেন, মেজাজে না ধরলে কি করি বলেন ভাইসাব।

বয়া বিস্কুটে ঝড় উঠবে জেনেই বাপজী কিছু কমলালেবু বেশী করে কিনে চিফ্-স্টুয়ার্টের কাছে জিম্মা রেখে ছিলেন রেফ্রিজিরেটারে রাখার জন্য। তিনি কিছু কমলালেবু ইঞ্জিন-রুম থেকে উঠে আসার সময় নিয়ে এসেছিলেন।

হাল্কা শীর্ণ চেহারা রহমৎ মিঞার। কাজ করে গোটা জীবন আর গোটা সফর ধরে কেবল টাকাই জমিয়েছেন একবার তাকিয়ে দেখেন নি কেমন হালত হয়েছে শরীরের। বাপজীর করুণা দোস্তের উপর ঐ দেহ দেখে। বলেছিলেন সেজন্য, গোটা হাল্কা হবে।

তিনি কমলার কোয়া ছাড়িয়ে দিলেন দোস্তকে। শরবৎ করে দিলেন। পেট ভরে খেতে দিলেন রুটি। কতকটা নোনাপানী চেখে বললেন, খেয়ে ফেলুন, শরীরটা হাল্কা হবে।

এক সকালে দরিয়ার বুক থেকে ঝড় বিদায় নিল। স্থির হয়ে এল সমুদ্র-ঢেউ। ছোট ছোট ঢেউয়ে এখন ছোট ছোট পারপয়েজ মাছ। তারা ঢেউয়ের রুপালী পর্দায় খেলছে। সামনের ডেকে বাপজী হাঁটছিলেন। হঠাৎ দেখলেন সেখানে চার-টনী ডারীকটা ভেঙে পড়ে আছে। ঝড়ের বীভৎস গতির আঁচটা এতক্ষণে যেন আঁচ করতে পারলেন। ফোঁকশালে ফিরে এসে বললেন—আল্লার মেহেরবানী খুব মিঞা-সাব, জাহাজটা এ দফে আমাদের বেঁচে গেল।

এ দফে বেঁচে গেল বলেই কার্ডিফ বন্দরের এক সোনালী সকালে জাহাজটা এসে ভিড়ল। বাঁ দিকে পাহাড়ের উপর রয়েছে লাইট-হাউস—আলো ফেলছিল রাতে।

জাহাজটা তখন নোঙ্গর করা। বাপজী মিঞাসাব তখন জাহাজ-ডেকে। লাইট-হাউসের আলোতে বার বার দুজনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছিল।

কিন্তু এই সোনালী সকালে লাইট-হাউসের ঘরে আর আলো জ্বলছে না। রাতের উদ্দামতা ভোরের আলোয় সম্পূর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তাই লাইট-হাউসটা পাহাড়ের উপর শুধু মঠের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

যেমন বাপজী এসেছিলেন এ বন্দরে, রহমৎ মিঞাও তেমনি এ বন্দরে দু বার এসে, কার্ডিফের রাউদ্ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এবং তার পাশের অপ্রশস্ত গলি, আর বেইজ্জৎ মেয়েমানুষ সব দেখে গিয়েছিলেন। তিনি ড্রাই ডকের পাশ দিয়ে অনেক বার হেঁটেছেন, অনেকবার মুখস্থ করেছেন সেই অপ্রশস্ত পথটা। তখনকার দিনে মেয়েমানুষগুলি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করত ওদের জন্য। এদের দেশে এই নাকি রীতি। —

ভাইসাব আর মিঞাসাব দুজনে মিলে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে থাকলেন অনেক-ক্ষণ। বন্দর আর শহরের ভগ্নাংশ দেখলেন। পুরানো স্মৃতি দু-একটা দুজনেরই

মনে ভেসে উঠেছিল। কোন তেলওয়ালা রাতের অন্ধকারে জাহাজ থেকে পালাতে গিয়ে সুখানীর হাতে ধরা পড়েছিল সে খবর জমাট হাসিতেই দোস্তকে দিলেন বাপজী। রহমৎ মিঞা দেখছেন তখন নীচের বীটে হাসিল কতখানি টেনে বাধা হচ্ছে। তারপর চোখ গেল আরো দূরে—অনেক দূরে, সেই অপ্রশস্ত পথ, ড্রাই ডক, পাশের ডকে যুদ্ধ জাহাজ। কিছুটা গেলে বাঁ দিকটায় কয়লার জেটি।

জাহাজ হোমে এলে একবার ড্রাই-ডক করা হয়। একবার সরফাই করা হয়। সরফাই করে দেখা হয় জাহাজটা আর সমুদ্রের ঢেউ কত দিন ভাঙ্গতে পারবে, বয়লারটা কতকাল আর নির্দিষ্ট স্টীম দিতে পারবে। সব দেখে একসময় এ জাহাজেরও রিপোর্ট গেল কোম্পানির ঘরে—জাহাজের মেরামত অনেক। বীট, প্লেট, একযষ্ট পাইপ থেকে ট্যাংকটপের উপর স্কাম বক্সটা পর্যন্ত। অর্থাৎ জাহাজটাকে ঘাটে অনেক দিন বসতে হবে।

তখনও সকাল হয় নি ভাল করে। ইংলিশ চ্যানেল থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া সমস্ত রাত ধরে বালিয়াড়ী ভেঙ্গে আছড়ে পড়ছে বন্দরটায়। কুয়াশা কিছু নেমেছিল, কিন্তু কেমন করে আবার তারা সমুদ্রের আর-এক দিগন্তে ভেসে গেছে। কার্ডিফ ক্যাসেল থেকে যে বাসটা বন্দরে আসে সে বাসটা পর্যন্ত আসে নি। মাত্র ধোবি মেয়েটা গাধার পিঠে কাপড় তুলে নিশ্চিন্তে ইনডাস্ট্রিয়েল ড্রাই ডকের পাড় ধরে সামনের মাঠটার প্রতি এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সময়ই কাঠের সিঁড়ি ধরে জেটিতে নেমেছিলেন বাপজী রহমৎ মিঞা এবং জাহাজের অন্যান্য জাহাজীরা। মাথায় মোট-ঘাট, হাতে তাদের পেতলের বদনা। গ্রীষ্মের সকাল—শীত কম। তবু জাহাজীরা মাথায় সকলে মাফলার এঁটে নিয়েছিল। একমাত্র বাপজী এবং বাপজীর অনুরোধে রহমৎ মিঞা মাথায় কেল্টু ক্যাপ টেনে বন্দরে নেমেছিলেন।

জেটিতে নেমে তিনি প্রথমেই দোস্তের হাত ধরে বললেন, সালাম আলাইকুম মিঞাসাহেব।

ওয়ালেকুম সালাম। সরাইখানায় গিয়ে খবর-টবর নেবেন।

—নসীব খারাপ।

—নসীব জবর খারাপ। নয় তো আপনি আর আমি দু সরাইখানায় পড়ব কেন। কিন্তু কোম্পানির নির্দেশ তো আর খেলাপ করা চলবে না। কোম্পানির নির্দেশেই জাহাজীদের দুটো ভাগ হয়েছে। দুটো সরাইখানা ভাড়া হয়েছে ওদের থাকার জন্য।

মালপত্র কোম্পানির মোটরে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে গেল। বাপজী আর রহমৎ মিঞা অন্যান্য জাহাজীদের সঙ্গে ধোবি মাঠ পর্যন্ত হেঁটে এসেছিলেন। যাঁরা কার্ডিফ ক্যাসেল পার হয়ে রেলপুলটার নীচের সরাইখানায় যাবেন তাঁরা পথের মোড়টায় এসে থামলেন। এখান থেকেই বাসে উঠতে হবে তাদের। সেজন্য বাপজী বাস স্টপেজে ওঁদের সঙ্গে দাঁড়ালেন। কারণ এ দলে রয়েছে রহমৎ মিঞা। ভাবলেন, রহমৎ মিঞাকে বাসে তুলে দিয়ে তারপর তিনি ধোবি মাঠ অতিক্রম করবেন। ধোবি মাঠ অতিক্রম করেই তাঁদের সরাইখানা।

বাপজীর সঙ্গের জাহাজীরা তখন হেঁটে চলেছে সরাইখানাটার দিকে। বাপজী শুধু বাস স্ট্যাণ্ডে বন্দরের কালো সার্পিল পুলটার উপর অপেক্ষা করেছিলেন রহমৎ মিঞা যতক্ষণ না বাসে উঠলেন এবং চলে গেলেন। বিদায়বেলায় দু হাত উপরে তুলে সালাম জানিয়েছিলেন বাপজী। শেষে একান্ত আনমনে যখন বন্দরের রূপালী সকাল

অতিক্রম করছিলেন মাঠ পার হতে তখন দেখলেন বালুবেলার পথ ধরে একটি মাত্র ধোবি মেয়ে। গাধার পিঠে এক গাদা কাপড়। হেট হেট করছে—আর পিট পিট করে চাইছে মাঠের উপরে মানুষগুলোর দিকে। তাকে দেখে বাপজী ভাবছিলেন আম্মাজানকে, বেটা মবুকে, কাঞ্চনের ডালকে। কাঞ্চন গাছটায় এখন হয়তো ফুল ফুটেছে।

রাত্রি বেলায় বেটা আর বিবির কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং কখন সকাল হল তিনি যেন সেদিন টের করতে পারেন নি। বাপজী ওয়াল ক্লকটার দিকে চোখ তুলে দেখছিলেন ক'টা বাজে। রহমৎ মিঞার সরাইখানাটা এক-বার ঘুরে এলে হত। মনটা যেন দোস্তের জন্য কেমন কেমন করছে! এক ফোঁক-শালে থাকার অভ্যাসের ফল।

কি ভেবে এ সময় পাশের জানালাটায় চোখ তুলে দিলেন। কমার্শিয়াল ড্রাই-ডক পার হয়ে সাদা বর্ডারের জাহাজের কালো চিমনিটা আকাশমুখো হয়ে আছে। ইনডাস্ট্রিয়েল ড্রাই-ডকে রং সারা হচ্ছে যুদ্ধের জাহাজগুলোর। বন্দর ধরে কিছুটা দক্ষিণমুখো গেলে কয়লার জেটি—বাংকার নেওয়া হচ্ছে দুটো জাহাজে। বালুবেলা ধরে একটি মেয়ে এ দিকেই উঠে আসছে—এই পথে। ধোবি মেয়েটা বুঝি। প্রতি ভোরের পুনরাবৃত্তি।

হাতের কনুয়ে ঝুলছে ঝুড়ি। মেয়েটি আসছে এ দিকেই। এই সরাইখানাতেই। বাপজী তার ভুল বুঝতে পারলেন—কারণ মেয়েটা এতক্ষণে তার গাধা নিয়ে শহর-মুখো চলেছে। এত দেশ এতবার ঘুরেও তিনি যেন বিদেশী মানুষদের চেহারার তফাৎটা ধরতে পারেন না।

শামীনগড়ের কথা ভেবে বাপজী আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। একটি গুঞ্জন উঠেছে তখন সরাইখানার সদর দরজায়। সেখানটায় ভিড় জমিয়েছে সব নাবিকেরা। একমাত্র বাপজী দেয়ালে ঠেস দিয়ে তখনও উন্মনা। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে কিছুদিন থেকেই আবার শামীনগড়কে ভাবতে শুরু করেছেন। জাহাজের ডেক দরিয়ার নীল লোনা জল একঘেঁয়ে লাগছে। জল আর মাটির সব বৈচিত্র্য টিন কাঠের ঘরের কাছে হার মেনেছে। আবার তিনি ফিরে যেতে চান দেশে, বিবি আর মবুর বুকে মুখ লুকিয়ে বিশ্রাম নিতে চান কিছুদিন।

সদর দরজার গুঞ্জনটা ধীরে ধীরে এদিকে সরে আসছে।

বাপজী চোখ তুলে দেখলেন, নাবিকেরা সেই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে গুঞ্জন তুলেছে।

জাহাজীরা কেউ কেউ মেয়েটির ঝুড়ি থেকে ফুল তুলে নিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফুলের গুচ্ছগুলো দেখতে দেখতে অনর্থক প্রশ্ন করলে অনেকে, কিন্তু দু-শিলিং দিয়ে কেউ একগুচ্ছ কিনে নিলে না।

মেয়েটি সরাইখানায় এসেছে ফুল বিক্রি করতে। ভোরের রোদ গায়ে মেখে প্রতিদিন শহরের পাড়ায় পাড়ায় ফুল বিক্রি করতে বের হয়। আজ এসে গেছে বন্দরে, ঢুকে গেছে সরাইখানায়। নতুন মানুষের মুখ দেখে কৌতুক অনুভব করছে।

সরাইখানার দীর্ঘ মেঝের উপর দু সারিতে রাখা অনেক লোহার চিক। ফাঁক দিয়ে সরলরেখার মত একটি সংকীর্ণ পথ অন্য প্রান্তের দেয়ালে গিয়ে ঠেকেছে। পথের বাঁ পাশটা থেমেছে বাপজীর টেবিলের পায়ার ছোট গোল চাকতিগুলোতে। সেই পথ ধরে আসছে মেয়েটা। সচকিত ভাব ওর চোখে মুখে। অন্য জাহাজীরা তার পিছনে।

মেয়েটা সরাইখানায় ঢুকে পড়েছে বলে ওরা খিল খিল করে হাসছে।

হাতের ইশারায় বাপজী ফ্লাওয়ার-গার্লকে ডাকলেন। অন্যান্য জাহাজী বন্ধুর আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। মেয়েটি গরীব, ফুল বিক্রি করে সংসার চালায়। ফুলগুলি নিয়ে দেখি দেখি করে না দেখার ইচ্ছা ও না-কেনার ইচ্ছাকে আর তাদের অসভ্য ইঙ্গিতগুলিকে তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাই হাত তুলে ডাকলেন এবং কাছে এলে ঝুড়ি থেকে একগুচ্ছ ব্ল্যাক-প্রিন্স নিয়ে দাম সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন—কত ?

বাপজীর টেবিল ঘেঁসে সন্তর্পণে দাঁড়াল মেয়েটি। ব্ল্যাক-প্রিন্সের দিকে চেয়ে কিছু যেন দামের কথা চিন্তা করলে—কত দাম হতে পারে, কত দাম দিলে দুজনের কেউ ঠকবে না। তারপর বাপজীর প্রতি নরম নরম দুটো চোখ তুলে অকুণ্ঠ গলায় জবাব দিল—দু বব্।

দু বব্। এত কম! বাপজী খুশী হলেন। দুটো বব মেয়েটির হাতে তুলে দিলেন।

জাহাজীদের দিকে মুখ তুলে মেয়েটি হাত পেতে দুটো বব্ নিল এবং খুশী মুখে বাপজীকে অভিবাদন জানাল। তারপর এক অদ্ভুত নাচের ভঙ্গীতে ঘর থেকে বের হয়ে সদর দরজাটায় দাঁড়াল। ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল নীচের পথের জনতাকে। শেষে বাঁ পাশের মদের দোকানটা অতিক্রম করে একটা সরু গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই গেল সরাইখানায় প্রথম রাত যাপনের পর প্রথম সকালের খবর। বিকেলে বাপজী একবার ভাবলেন—রহমৎ মিঞার সরাইখানায় যাবেন। মিঞা সাবের দিন বিলেতের হাওয়ায় কেমন গুজরান হচ্ছে দেখে আসবেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হল না। সারেং সাব ডেকে পাঠিয়েছেন—একবার জাহাজে যেতে হবে। অন্ততঃ কয়েকটি রাতের জন্য একটি বয়লার চালু রাখতে হবে। সেজন্য বিকেলে গেলেন বাপজী জাহাজে, দুজন আগওয়ালা গেলেন সঙ্গে। ওদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে সে রাতেই তিনি ফিরেছিলেন সরাইখানায়।

পরদিন সকালে তেমনি নেচে নেচে এল মেয়েটি। ফুল বিক্রি করতে এসেছে ফুলওয়ালী। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিচ্ছে- ফুল চাই।

জাহাজীরা যে যার চাকি থেকে উঁকি মারছে জানালা দিয়ে। কেউ কেউ খড়ম পায়ে দিয়ে নীচে নেমে সদর দরজাটা পর্যন্ত গেছে। কিছু কিছু ফুল তারা হাতে তুলে নিয়ে গতকালের মত বলেছে, তোমার ফুল ভাল নয়।

বাপজী চাকি থেকে ওঠেন নি। দেয়াল ঘেঁসে বসেছিলেন, বসেই থাকলেন! জানালা দিয়ে দেখছিলেন তিনি তখন অনেক দূরের একটি দেশ। সে দেশে তাঁর বেটা আর বিবি থাকে। বন্দরের কালো পিচ ঢালা পথে যে মেয়েটি আসে এবং সদর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেয় ফুল চাই, তাকে ভাবতে গিয়েই কেমন করে তিনি যেন আম্মাজানের কাছে চলে যান। আম্মাজানের দুটো ডাগর চোখের কথা অন্যমনস্ক হয়ে ভাবেন!

মেয়েটি তখন সদর দরজা ধরে বাপজীর টেবিলের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। মুখে তার এক কথা—ফুল চাই। ফুল দেব।

বাপজী মুখ তুলে দেখলেন ফুলকন্যাকে। ফুলের সবুজ সহজ ছায়া নেমেছে ওর শরীরের আনাচে কানাচে। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ গায়ে। মাথায় তার পালকের টুপি। ভিজে ভিজে ঠোঁটদুটোয় চলকে-পড়া হাসি। তাই বিবি আর বেটাকে রেখে-

আসা মানুষটি কিছুতেই মেয়েটিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। তাই ফ্লাওয়ার-গার্ল টেবিলের পাশে সন্তর্পণে দাঁড়াইতেই তিনি পুরো একটি ক্রাউন দিয়ে রেহাই পেলেন।

ফ্লাওয়ার-গার্ল জানল, এ যোয়ান জাহাজী যেন তার নিজের মানুষ। দরদ রয়েছে তার। অন্যান্য জাহাজীর মত নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবেন না প্রতিদিন। ফুল কিনবেন, ফুল কিনে পয়সা দেবেন।

মেয়েটি আবার চলে গেছে। সদর দরজা পার হয়ে সে সদর রাস্তায় নেমেছে। প্রথম ভোরের মত আজও মদের দোকানটা বাঁ পাশে রেখে একটা সরু গলিতে গিয়ে ঢুকে পড়েছে। বাপজীর চোখদুটো তখন জানালায়। দৃষ্টি তার অন্যত্র। বন্দরের প্রতি চোখ রেখেছেন তিনি, কত দিনে জাহাজটা মেরামত হবে, কত দিনে বয়া বিস্কুটের ঢেউ ভেঙে জিব্রালটার হয়ে দেশের মাটিতে পেঁছবে। বেটা আর বিবির জন্য মনটা খুবই উন্মুখ। বিবিকে একটা খত দিতে হবে। মবুর জন্য দোয়া পাঠাতে হবে।

গোলাপটি তিনি হাতে নিলেন। নাকের কাছে নিয়ে গোলাপের গন্ধ নিলেন কি পাপড়িগুলোর ভিতর কোন কীট রয়েছে কিনা পরখ করলেন, বোঝা গেল না। তবু তিনি গোলাপটিকে ধরে রাখলেন দু আঙুলের ডগায় এবং সকলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে সমস্ত মুখটিকে পাপড়িগুলোর ভিতর ডুবিয়ে দিতে চাইলেন। নিশ্বাস নিলেন জোরে জোরে। মাসের পর মাস সমুদ্র আর বন্দর দেখে যে দেহটা ঝিমিয়ে পড়েছিল, সেই দেহে গোলাপের মিষ্টি গন্ধে একটা তীব্র শিহরণ বয়ে গেল। জোরে জোরে আরো দুটো শ্বাস টানলেন সেজন্য। এবং এক সময়ে ফুলটিকে বুকের উপর চেপে ধরে পরবর্তী সকালের জন্য অপেক্ষা করলেন।

সকাল এল তেমনি। সমুদ্রের বুক মাড়িয়ে যে মনটা শুকনো হয়ে উঠেছে, যে হৃদয়ের কান্না গুমরে মরছে গোটা দেহটার ভিতরে, সেই মন আর হৃদয় দুটো চোখের উপর ভর দিয়ে ঝুলে আছে জানালায়—একটি সকালের জন্য, একটি ছায়া-শরীরের জন্য। উন্মুখ আর একান্ত আকাঙ্ক্ষিত সে কান্না—বিবির দুটো চোখ বিবির মত একটি দেহ যার ছায়া-শরীরে, সেই বিদেশিনীর জন্য প্রতীক্ষা। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন বাপজী। বাসি গোলাপটি হাতে নিয়েছেন অন্যমনস্কভাবে। চোখের উপর তুলে ধরেছেন—দেখছেনবিবর্ণ রূপটি। জীবন আর যৌবনের বিবর্ণ গন্ধ পাচ্ছেন এখানটায় তিনি।

প্রতি ভোরেই এমন ঘটেছে। বাপজী প্রতীক্ষায় থাকতেন জানালার দুটো গরাদে মুখ রেখে, তাঁর উত্তর ত্রিশের উন্মত্ত যৌবন ফুলের সমারোহের সঙ্গে চলকে-পড়া একঝলক হাসির প্রত্যাশার হিসাব টেনেছে কত বার কত ভাবে, মেয়েটি এই বুঝি এল, এই বুঝি রাউদ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার দেয়াল ঘেষে পা বাড়াল ধোবি মাঠের উপর।

ধোবি মাঠের ঘাসে ঘাসে নীল ফুল। সেই ফুলের উপর পায়ের ছাপ রেখে আসত ফ্লাওয়ার-গার্ল। ঝুড়িটা তখন কনুইয়ে দুলত। ধোবি মাঠের উপর পা রাখার আগে দূর থেকে একবার জানালার দিকে চেয়ে আড়-চোখে অনুভব করত জাহাজী মানুষটির উন্মনা চোখে কি জেগে রয়েছে। তারপর ফুলের বোঁটায় কামড় দিয়ে না দেখি না দেখি করে একসময়ে এসে থেমে পড়ত সরাইখানার সদর দরজায়। হাঁক দিয়ে দিয়ে ঢুকত—ফুল, ফুল চাই।

এ ফুল দেওয়া-নেওয়া বাপজীর আর থামল না। ফুল কিনলেন, মিঠে হাসি

দেখলেন এবং একদিন রুজ-লিপস্টিক-মাখা ঠোঁটে কামনার চিহ্ন দেখতে পেলেন। বাপজী জাহাজী। চরিত্রটা জাহাজীর মত। পাইনের ছায়া-জঙ্গলে একবার ডুব দিতে ইচ্ছা হল। কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে প্রথম দিনের প্রথম আলাপ 'দাম কত'র পরে আর যে কোন আলাপই হয় নি। কামনার জ্বালা যতই উপছে পড়ুক—হাজার হলেও যে তিনি ভারতীয়। সুতরাং বলতে পারেন না প্রথম দর্শনেই অন্যান্য দেশের মানুষগুলোর মত—উড ইউ বি প্লিজড্......। কারণ সরম বলে একটি ছোট্ট কথা সব সময়ের জন্যই উত্যক্ত করে মারছে। তাছাড়া জাহাজী মানুষের জাহাজটা যেমন নিজের হয় না, চরিত্রটিও সে তেমন নিজের বলে দাবী করতে পারে না। বাইরের নিয়ন ঝলসানো রঙে সে আনমনা হয়ে পড়বেই—তিনি তখন বাপজীই হোন আর সাধু সন্ত, ফকির দরবেশই হউন। বাপজী সে কথা কসম খেয়ে স্বীকার করেন।

স্বীকার করতেন তিনি সেই অশুভ লগ্নটির কথা। মেয়েটি এল, ফুল রাখল টেবিলে, শেষে হন হন করে ঘর থেকে বের হয়ে সরু গলিটায় ঢুকে গেল। টেবিলের উপর রাখা দুটো শিলিং সেদিন ফুলকন্যা তুলে নেয় নি। প্রথম বিস্ময় মেনেছিলেন দেখে, পরে কি ভাবতে ভাবতে ভেবেছিলেন মেয়েটি হয়তো ভুল করেছে। কাল যখন আসবে তখন সংশোধন করে দিলেই চলবে। সেই জন্য তিনি আর বিশেষ করে অন্য কিছু ভাবলেন না। শুধু ফুলটি হাতে নিয়ে কি খবর রয়েছে ফুলের গন্ধটায় তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানতে চাইলেন। এবং একবার রহমৎ মিঞার সরাইখানায় বিকেলে গেলে কেমন হয় সে-কথা চিন্তা করে সরাইখানার বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

সদর দরজার সিঁড়িটাতে নেমে ভাবলেন, মার্কেটের দিকে যাবেন। কিছু কেনাকাটা করে ফিরবার পথে ষ্টিওনওয়ের স্টেশনারী দোকানটায় ঢুকে মবু আর আম্মাজানের জন্য কিছু জিনিস পছন্দ করবেন। প্যান্টের পকেটে তিনি হাত রাখলেন, মাথাটা নুইয়ে সংক্ষিপ্ত দুটো পা ফেললেন, এবং আবার কি মনে করে ঢুকে এদিক ওদিক চেয়ে টেবিল থেকে ফুলটি তুলে নিলেন। তারপর বাজার ফেরত রহমৎ মিঞার সরাইখানায় একবার ঢুকতে হবে। বলতে হবে দোসকে, বুঝলেন, এ ফুল রোজ একটি ফুলওয়ালী দিয়ে যায়। রূপের কথাটাও একবার চেখে চেখে বলবেন—দোস নিশ্চয়ই তোবা তোবা করে দুটো কানে হাত দেবেন। বলবে, ভাইসাব ঘরে যে আপনার বিবি রয়েছে তার কথাটা মেহেরবানি করে মনে রাখবেন।

মবুর বাপজী তখন নিশ্চয়ই হাসবে। বিবি আর ফুলকন্যা ? কোথায় কি! টেম্স্ আর কর্ণফুলি।

বাপজী প্রতীক্ষা করলেন বাসের জন্য। সামনের পথটার দিকে চেয়ে থাকলেন। কিন্তু বাঁ পাশের গলিটার দিকে মাঝে মাঝেই চোখদুটোকে টেনে আনছেন—এ পথ ধরে মেয়েটি গেছে। ওর পায়ের শব্দ এখনও যেন শুনতে পাচ্ছেন তিনি। কান পাতলেন সন্তর্পণে। তারপর বুঝতে পারলেন। একসময় ও মেয়ের পায়ের শব্দই ঘরের বাইরে সদর দরজার সিঁড়িটা পর্যন্ত তাকে বের করে এনেছে—দু কদম পা বাড়াতে সাহায্য করেছে।

মার্কেট যাবার বাসটা আসতে দেরী দেখে বাঁ পাশের গলিটায় ঢুকে পড়লেন তিনি। পথটা এখানে মোড় নিয়েছে। মদের দোকানটায় ভীড় নেই। পথ থেকে মনে হচ্ছে দোকানটা বন্ধ। পাশের ঘর থেকে দুটো ছোট মেয়ে রাস্তাটা অতিক্রম করে অন্য একটা টালির ছাদ-ঘেরা বাড়ীতে ঢুকে গেল। তিনি চোখ তুলে দেখলেন। খুব আঁকা-বাঁকা পথ। দুকদম আগের মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় না। আড়ালে

আড়ালে যেন এখানকার মানুষেরা চলে, তিনি তাই আরো এগিয়ে গেলেন।

পথটা এখানে প্রশস্ত। ততটা যেন বাঁক খায়নি। দূরের মানুষ চোখে পড়ে। কাছের মানুষ আরো কাছে আসছে। বাপজী এখানে থামলেন। কিন্তু ফুলকন্যার কোনো চিহ্ন পেলেন না। গলির বাঁকে বাঁকে সে কোথায় হারিয়ে গেছে তখন। তাকে তিনি খুঁজে পেলেন না।

পরে তিনি ফিরে এসেছিলেন সরাইখানায়। কোথাও বের হন নি বলে দুপুরটা কাটল অস্বস্তিতে। ঘুম এল না। বিছানায় পড়ে শুধু খানিক গড়াগড়ি দিলেন। মনটা ছটফট করছে। কেন এমন হয়! কিছু ফুলের বিনিময়ে রক্ত জল-করা টাকার অযথা খরচটা বিশেষ বিনিময় বলে মনে হয়েছে। কিন্তু আজকের শিলিং টেবিল থেকে তুলে না নেওয়ায় তিনি যেন বুকে ধ্বস নামার তীব্র বেদনা অনুভব করছেন। পাশ ফিরে শুলেন। জানালা দিয়ে চাইলেন আবার। এখান থেকে যুদ্ধ জাহাজ-গুলোই কেবল চোখে পড়ছে। ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়েল ড্রাই-ডকে, দুনম্বর জেটির জাহাজটায় দুজন সাহেব দুটো কামানের মুখে উঁকি দিয়ে ওর ভেতরটা যেন দেখছেন। বাপজী এবার আর একটু ঝুকে দাঁড়ালেন জানালায়। দেখলেন এবার বেলাভূমি আর কত দূর।

দূরের আকাশটা হঠাৎ মেঘে ভার হয়ে এল। কালো ছায়া নেমেছে বেলাভূমির কিনারে। যে ঝড়ো হাওয়া আসছিল কিছুদিন আবার সেটা উঠতে শুরু করেছে। একঝলক হাওয়া বেলাভূমি থেকে নেমে জানালায় ঢুকছে।

বাপজী আরও একটু এগোলেন। চোখদুটোতে ওর কেমন জ্বালা ধরেছে। মেয়েটার কথা মনে হলেই বুকে ধ্বস নামতে শুরু করে।

পাশের ফ্ল্যাটের জাহাজীরা এক এক করে চান শেষ করেছে। বাপজীকে কেমন আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতে দেখে কেউ কেউ প্রশ্ন করলে, তবিয়ত কি ভাল না মিঞার? কেমন মন-মরা মন-মরা ঠেকছে?

বাপজী কেমন শুকনো হাসি হাসলেন। চোখ টানলেন মিরু শেখের দিকে চেয়ে। লোকটা তক্তপোশে উঠেছে। পা মুছে বালিশের নীচ থেকে টেনে বের করছে কোরানশরীফটা। এক্ষুনি সে কোরানশরীফ পাঠ করতে বসে যাবে। সুর ধরে ধরে পড়বে। চোখে ঘুম আসতে চাইবে যখন দুপুরের খানা খেয়ে তখনও সে হেলে হেলে পড়বে। তারপর একসময় কখন অন্ধকারে বের হয়ে পড়বে—ফিরবে ঠিক ভোরে। গলা পর্যন্ত টেনে আসবে। রাতের অন্ধকার আর কানাগলির বেশবাসে বেসামাল হয়ে, ঘরে এসে বিশ্রী ঢেঁকুর তুলবে।

বাপজী একবার গলাটা বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু কি মনে করে কচ্ছপের মত গলাটা টেনে নিলেন আবার। একটি প্রশ্ন রয়েছে। ওকে প্রশ্ন করে জানতে হয় কিছু—কিন্তু তিনি বলতে পারলেন না। কি ভেবে শেষ পর্যন্ত চান করতে চলে গেলেন। একসঙ্গে খানা খাওয়ার কথা, পরে গেলে খানা মিলবে না।

খানা খাওয়ার পর তিনি বালিস টেনে শুয়ে পড়লেন। জাহাজের মেরামত এখনও হয় নি। ট্যাংক টপের প্লেটগুলো বদল করা হচ্ছে কারণ ছাই আর নোনা জলে প্লেটগুলো আর প্লেট নেই। প্লেটের রিবিট মারতে আরো প্রায় দশ দিন। জাহাজের মেজ সাব সে কথা বলেছেন। দশ দিন পর এ মাটি এ ঘাট ছেড়ে তাদের চলে যেতে হবে। আবার হয়তো কত কাল বাদে। হয়তো সহস্র রজনী পরে তিনি তাঁর জাহাজ এ ঘাটে বাঁধবেন। তখন হয়তো ফুলকন্যার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

কিংবা যেমন করে প্রতি সকালে হেসে একটি ফুল দিয়ে যায় সে সকালে তা আর নাও দিতে পারে।

আর মাত্র দশ দিন। কথাটাকে তিনি অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবলেন। ভাবলেন সমুদ্রের উপর প্রতি সকালের প্রতীক্ষাগুলো জাহাজের ঘুলঘুলি-ভরা জীবনের কাচগুলোতে ধাক্কা খেয়ে নিজের বাংকেই বার বার ফিরে আসবে। সমুদ্রের ঢেউগুলো কাচের জানালায় ধাক্কা মেরে হয়তো তাঁকে বার বার ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে—তবু সেই মিষ্টিমুখ আর ব্লাকপ্রিন্সের রাজত্বকে তিনি যেন ভুলতে পারবেন না।

তিনি ভুলতে পারবেন না বলেই বুঝি সে দিনের দুপুরটায় ঘুম যেতে পারলেন না। বিকেলে তিনি সময় করে গেলেন কার্ডিফ ক্যাসেলের গা-ঘেঁষা রেলওয়ে ব্রীজের নীচের সরাইখানায়। দোসকে খবরটা না দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

যখন গেলেন--কার্ডিফ ক্যাসেলের কিনারে তখন হিমেল সন্ধ্যা নেমেছে আলোর ফুলকি জ্বলছে কাচ দিয়ে ঘেরা ঘরগুলোতে। বাপজীর তখন শীত শীত করছে। কোট টেনে তিনি ক্যাসেল-ঘেঁষা ফুটপাতে নেমে পড়লেন। উঁচু পাঁচিলটার দিকে চেয়ে ক্যাসেল ডাইনে ফেলে সামনের কটন স্ট্রীটে সংক্ষিপ্ত পা চালিয়ে দিলেন।

রাজা-বাদশার এ দেশ। এ মাটিতে রাজা-বাদশার গন্ধ। কত রাজা-বাদশা এ মাটিতেও জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের রাজত্বে কতকাল ধরে সূর্যাস্ত যায় না—আঙুল গুণে গুণে হিসেব করতে চাইলেন যেন সব কিছু। সেই সুবাস রয়েছে ভোরে যে মেয়েটি আসে, হাসে, কথা বলে, ফুল দিয়ে দাম না নিয়ে চলে যায় সেই মেয়েটির শরীরে। বিবিকে যদি একথা যেসে বলতে পারে, বিবি হয়তো চোখের জল ফেলবে, বলবে, ডাইনী। তবু মনের কোন এক প্রত্যন্তে বিবি বাপজীকে করুণা করতে করতে ভাববে—রাজা-বাদশার দেশের মেয়ে তার খসমকে পিয়ার করেছে। সে কম কথা নয়, সে অনেক কথা বিবির কাছে।

বাপজী কিন্ত রেলওয়ে ব্রীজের নীচের সরাইখানায় যেয়ে মিঞাকে পেলেন না। অন্যান্য জাহাজী ভাইদের প্রশ্ন করলেন সে-জন্য। তাদের কাছেই জানতে পারলেন, মিঞাজান গেছেন লিটন স্ট্রীটের এক বাড়ীতে। এক মেমসাব এসে নিয়ে গেছে।

খবর শুনে প্রীত হলেন কি দুঃখ পেলেন কার্ডিফ ক্যাসেলের পাঁচিল-ঘেঁষা রাস্তটা মাত্র তার সাক্ষী থাকল।

দুটো চোখ আর-একটি জানালা। একটি মাঠ আর তার নীলাভ ফুল। একটি ভোর আর-একটি মেয়ের জন্য একটি মানুষের প্রতীক্ষা। এই নিয়ে কার্ডিফ বন্দরের এক কোণে প্রতিদিনের একটি সকাল বেশ জমে উঠেছে।

কোনদিন প্রথম ধূবি মেয়েটি সে তার গাধাটাকে তাড়াতে তাড়াতে চলে যেত, কোনদিন ফুলকন্যা ঝুড়িটা হাতে প্রথম ধূবি মাঠটাকে অতিক্রম করে সরাইখানার সদর দরজায় এসে হাঁক দিত। সেই সকালে প্রথম এসেছিল ফুলকন্যা এবং বাপজী ইচ্ছা করেই জানালায় মুখ না রেখে অন্য দিকে দুটো চোখ তুলে বসেছিলেন। মনে মনে তিনি রাগ করেছেন। মেয়েটির সংগে আজ মনকষা-কষি হবে। পর পর দু-সকালে ফুল রেখে দাম না নিয়ে চলে যাওয়াটাকে তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না। কিন্ত মেয়েটি পাশে এসে দাঁড়াতেই তিনি কেমন বিব্রত বোধ করতে থাকেন। হেসে যখন মেয়েটি তার স্পষ্ট সহজ ইংরেজীতে অভিবাদন করল তখন তিনি হেসে ফেললেন, তারপর কি ভেবে চুপ হয়ে যান—কিছু বলতে পারেন না—

রাতের সব কল্পনাগুলো ঠোঁটের গোড়ায় এসে থেমে থাকে।

মেয়েটি সে তার সহজ ভঙ্গিতে প্রতি সকালের মত টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। ঝুড়ি থেকে দুটো ফুলের গুচ্ছ সন্তর্পণে রেখে দিতে দিতে আবার হাসল।

তিনি আর হাসলেন না। এমন কি অন্যান্য দিনের মত লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে কিছু অপ্রকাশের ইচ্ছাও রাখলেন না। বললেন, তিন দিনে ছ শিলিং। এই নাও— বলে শিলিং কটা হাতে দিতে গেলেন।

—মেয়েটি টেবিলের উপর চোখ রেখে বলল, না থাক।

—কেন থাকবে?

—কেন থাকবে না?

বাপজী বললেন, দাম যদি নাও তবে ফুল নেব। দাম না নিলে তুমি আর ফুল দিও না।

বাপজীর বাঙালী মন, বাঙালী বুদ্ধি। তিনি আরও কিছু বলতে চেয়েছিলেন যেন, কিন্তু মেয়েটির প্রতি চোখ তুলে আর বলতে পারলেন না।

ফুলকন্যা টেবিল থেকে আর-একটু দূরে সরে বললে, বাইরে আসবেন একটু।

এই প্রথম মেয়েটির সঙ্গে বাপজীর কথাপ্রসঙ্গে কথা হল। তিনি তাব ডাকে বিমুগ্ধ হলেন। বাইরে বের হলেন গলার টাইটা টানতে টানতে।

গ্রীষ্মের ভোর হলেও শীত শীত করছে বাপজীর। বাইরে বের হয়ে কোটের বোতামগুলো টেনে দিলেন এবং পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে।

ফুলকন্যা চোখের ইশারায় বাপজীকে পথ চলতে বলে পাশাপাশি অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে গেল। ওরা তখন বন্দর পথটা অতিক্রম করে উত্তর দিকের খাড়া পাহাড়টার বেলাভূমিতে নেমে পড়েছে। এখানে এসে বাপজীই প্রথম কথা বললেন, তোমার নাম?

উত্তর এল লাল লাল দুটো ঠোঁটের ফাঁক থেকে, রেনীল।

—বাঃ! বেশ নাম তো। কতকাল হল এই ফুল বেচে খাওয়া?

—সে অনেক কাল। ছোট বয়েস থেকে। বাবা মা যখন মারা গেলেন তখন থেকে।

—এই বন্দরে আর একবার আমি এসেছিলাম। খুব অসংলগ্ন কথা বললেন বাপজী।

মেয়েটি উত্তরে বললে, কবে?

—সে অনেক কাল আগে। জাহাজে তখন আমি কোল বয়ের কাজ করি।

ওরা হাঁটছে। পা ওদের বালির ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। পা টেনে টেনে হাঁটছে তারা। বাপজী মেয়েটিকে বালির ভিতর থেকে পা টেনে তুলতে মাঝে মাঝে সাহায্য করছেন। অধিকাংশ সময় বাপজীর বলিষ্ঠ হাতটার উপর ভর করে মেয়েটি আলতো-ভাবে হেঁটে চলেছে।

খাড়া পাহাড়ের নীচে এসে ওরা দু জন বসল দুটো পা সামনের দিকে ছড়িয়ে। পাশের ঝুড়ি থেকে একটি লাল ফুল ছিঁড়ে বাপজীর কালো কোটে পরিয়ে দিয়ে মেয়েটি চেয়ে থাকল সমুদ্র যেখানে পাহাড়ের কিনারে বাঁক খেয়েছে সেদিকে।

সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে বালিয়াড়ী থেকে। বাপজী চেয়েছিলেন তখন কেমন অন্যমনস্কভাবে। চুলগুলি কপালে জড়িয়ে জড়িয়ে উড়ছে।

রেনীল বললে, তোমার নাম?

—সৈয়দ মজিবুর রহমান।

—জাহাজে তোমায় কি কাজ করতে হয়?

—ট্যাণ্ডেলের কাজ। জাহাজের ছোট ট্যাণ্ডল।

—কত কাল ধরে এ কাজ তোমায় করতে হচ্ছে?

—সে কবে থেকে মনে নেই। তবু মনে আছে বাপজী প্রথম আমায় কলকাতা বন্দরে এনে জাহাজে তুলে দিয়েছিলেন কোল-বয়ের কাজ দিয়ে, সেদিন আমি দাড়ি গোঁফ কামাতে শিখি নি।

—দেশে তোমার বিবি আছে?

—হ্যাঁ আছে। বিবি বেটা দুইই আছে।

—কষ্ট হয় না তাদের জন্য? বিবি জাহাজে আসতে বারণ করে না!

—করে।

সেই ধ্বসটা আবার নামতে শুরু করেছে বাপজীর বুকে। বিবি-বেটার কথা মনে হতেই আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। জোরে শ্বাস টানলেন। বি-বি—বে-টা! দুটো জীবন। অনেক দূরে থাকা বাপজীর আত্মার আত্মীয়। তারা জানি কেমন আছে! আল্লাতায়ালা কেমন জানি রেখেছেন!

বাপজীর অন্যমনস্ক দৃষ্টির সংগে রেনীলও দৃষ্টি মিলাল। দৃষ্টি মিলিয়ে সেও দেখছে জাহাজের চিমনীগুলোকে, লাল নীল বর্ডারের বিভিন্ন রঙের ফানেলগুলোকে পৃথিবীর কত দেশ থেকে কত জাহাজ এসেছে। কত জাহাজী এসেছে সংগে। নিঃসংগ জীবন নিয়ে এসেছে তারা। আর রেনীলকে সেই নিঃসংগ জীবনের ফাঁক ধরে বেঁচে থাকতে হচ্ছে কতকাল থেকে। ফলে বেচে তার জীবনটা যে কিছুতেই চলছে না। তাই দুমাস আগে আজকের মানুষটির মত ইয়াকুব হোসেনকেও সে এনে এখানটায় বসিয়েছিল—কথা বলেছিল, গান গেয়েছিল, সুর মিলিয়ে মিলিয়ে শিস দিয়েছিল। সে মানুষটা সিংগাপুরের, এ মানুষটি ভারতীয়। দুজনের দুটো ধারা।

এ মানুষটি চুপচাপ থাকতে ভালবাসে। আজকে এই পাহাড়ের নীচে বসে সেজন্য রেনীলের বলতে ভয় হল, একটা গান ধরো' অথবা অনুরোধ করতে সঙ্কুচিত হল, তোমার দেশের একটা গান ধরবে?

বাপজী হঠাৎ ভয়ঙ্কর মানুষের মত রেনীলের কব্জিটা টিপে ধরলেন। ডাকলেন—রেনীল...!

রেনীল চোখ তুলে তাকাল।

বাপজী কিন্তু সেই চোখের দিকে চেয়ে কিছু বলতে সাহস করলেন না। আমতা আমরা করে কেমন আড়ষ্ট হয়ে পড়লেন। সব কামনা বাসনা জ্বলে-জ্বলে নিবে গেল। অজ্ঞাতেই হাতটা নিজের কোলের উপর ঢলে পড়ল। এবং কিছুই ঘটে নি এমন ভেবে তিনি উঠে দাঁড়ালেন—চারিদিকে চেয়ে চেয়ে কতকিছু দেখলেন—ছবির মত শহরটা—ছোট বড় কল কারখানা—কয়লার ওয়াগন। তারপর একসময় জামার নীচে হাত নিয়ে অনুভব করলেন তিনি দর দর করে ঘামছেন।

রেনীল সহজভাবেই বলল, তুমি রোজ আসবে এখানটায়। বসব, কথা বলব।

বাপজী গলায় স্প্রিং-টানা পুতুলের মত দু বার ঘাড়টা কাত করে সায় দিলেন মাত্র।

বালির ধ্বস আবার ভাঙ্গতে হচ্ছে দুজনকে। বাপজীর বুকের ভিতর থেকে কথাটাকে কিছুতেই ঠেলে বের করে দিতে পারছে না—রোজ আসবে এখানটায় সকালে। বসব, কথা বলব। কি হবে এখানে এসে বলতে পারলেন না। তিনি শুধু হাঁটলেন আর হাঁটলেন।

মোবারক শুধু ডেকের উপর হেঁটেই গেল। রাত এগারোটা থেকে বারোটা সে ডেক-পথ বার বার অতিক্রম করে। জাহাজের ডেক-জাহাজীরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন সে বোট-ডেকের উপর নুয়ে থাকে—সমুদ্রের জল দেখে, জলের নীচে ফসফরাসের আবর্তনের ভিতর একটি মুখ দেখার চেষ্টা করে—সে তার আম্মাজান। ঘাড়র আবর্তনের ভিতর দেখে বাপজীকে। এখন ও শুনতে পায় সেই চীৎকার সেই ডাক—খোদা হাফেজ। বাপজী দু হাত উপরে তুলে শামীনগড়ের সড়ক ধরে হাঁটছেন। চিৎকার করছেন, খোদা হাফেজ। আম্মাজান বারান্দার উপর কান পেতে রয়েছেন।

শীতের রাত। ঘুম নেই চোখে আম্মাজানের। নীল কাঁথা জড়িয়ে বারান্দায় বসে রয়েছেন। নিবু নিবু হয়ে কুপিটা জ্বলছে। মবু মায়ের কোল ঘেষে উষ্ণ শরীরের ভিতর মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

সামনে উঠোনে অন্ধকার। পাশে দোচালা টিনের ঘরটা। বার-বাড়ীর উঠোনের পরে মসজিদ। তেঁতুল গাছটা আরো দূরে, দুটো ভূতুড়ে পেঁচা সেই কখন থেকে ডাকছে। সঙ্গে উঠোনের অন্ধকারটা হাত বাড়িয়ে টানছে যেন তাদের দুজনকে।

অনেকক্ষণ পর ফিরলেন বাপজী। ক্লান্ত। নির্বাক। সংক্ষিপ্ত পায়ে বারান্দার পৈঠা ধরে ঘরে ঢুকতে চাইলেন। তা দেখে উঠে দাঁড়ালেন আম্মাজান। মবু এল পাশে পাশে। বাপজীকে ঘরে ঠেলে দিলেন আম্মাজান। শুইয়ে দিয়ে লেপটা টেনে দিলেন। কুপিটা রাখলেন কুলুঙ্গিতে। মবুর পা-টা মুছিয়ে দিয়ে পাশে শুইয়ে দিলেন এবং শিয়রে বসে রইলেন তিনি।

বাপজী হাত টানলেন আম্মাজানের। বললেন, ঘুমোবি না তুই! কেবল রাগ আর রাগ। কতকাল আর এমন রাগ করে থাকবি বল ত।

গত রাতের কাহিনীটা যা বলতে বলতে বাপজী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তার জের টেনে বললেন আম্মাজান, শেষে কি হল?

—কি হবে? যা হবার তাই হল। খুন করলাম।

আম্মাজান সেই শুনে এতটুকু বিস্মিত হলেন না। কুলুঙ্গীতে রাখা দপ-দপ করে জ্বলা কুপিটার প্রতি চেয়ে স্বাভাবিকভাবে বললেন, কবে? কাকে? কেন?

বাপজী বালিশের নীচ থেকে হাত-ঘড়িটা নিয়ে বিবির চোখের উপর ধরলেন। বললেন, এর জন্য। এই ইবলিশটা আমায় খুন করিয়েছে।

আম্মাজান সে তার নরম ঠাণ্ডা হাতটা বাপজীর কপালে লেপ্টে দিলেন। ঘড়িটার প্রতি চেয়ে থাকলেন তীক্ষ্নভাবে। ঘড়ির ভিতরের কল কাঁটাকে নুয়ে নুয়ে দেখলেন। বাপজীর দু চোখের উপর মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বললেন,—দাও না ইবলিশটাকে ফেলে দিয়ে আসি।

বাপজী চমকে উঠলেন।—এ কি বলছিস বিবি! এর জন্য এত বড় খুন-খারাপিটা হল আর তুই বলছিস কি-না দিন ফেলে দিয়ে আসি। অমন কথা আর বলিস না, বলে তিনি পাশ ফিরে শুতে চাইলেন। এবং লেপটা দিয়ে ঢেকে দিলেন মুখটা।

আম্মাজান তখন বললেন, শোনো। লেপটা মুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে বাপজীর মুখের উপর আবার নুয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। শোনো—পুনরাবৃত্তি করলেন কথাটা। কাকে খুন করলে, কখন খুন করলে?

—এক গ্লাস পানি দিবি আমায়?

টিনের উপর শীতের কুয়াশা জমেছে। টিপ টিপ শব্দে শিশির ঘরের পাশের কালোজাম গাছটার পাতা থেকে ঝড়ছে। এমন আস্তে কথা বলছিলেন বাপজী, যে শিশিরের শব্দে আম্মাজান সে কথা শুনতে পায় নি।

—কি বললে?

—পানি। পানি দে। গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

তিনি তক্তপোশ থেকে নামলেন। গা থেকে মেঝের উপর রাখলেন নীল কাঁথাটা। তারপর আরো দ্রুত সামনে এগিয়ে গিয়ে কোণায়-রাখা মেটে কলসী থেকে জল ভরে খসমের দিকে তুলে ধরলেন—নাও।

ঢক ঢক করে এত সহজে খেয়ে ফেললেন যে আম্মাজান তক্তপোশে বসতে না বসতেই বাপজী গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরলেন আবার—আর-এক গ্লাস।

—আপনার জ্বর আসছে? শীতে যে কাঁপছেন!

—খুব কাঁপছি। না কি—কাঁপছি না তো। বিবি তোর এমন কথা কেন? পানি দিতে বলছি তুই তাই দে। পানি দে। জ্বর আসল কি শীতে কাঁপছি এসব তো তোর দেখার দরকার নেই।

বাপজী সে তার দুটো চোখকে বালিশে ঢেকে আরো একটা কথা ভাবার চেষ্টা করতে গিয়ে কেমন অসহায় ভাবলেন নিজেকে। কিন্তু এ কথা তো বিবিকে বলা যায় না! বিবিও যে ভয়ে তবে কাঁপবে। পাশে মবুটা রয়েছে—ভয় পেয়ে নিশ্চয়ই সে চীৎকার করে উঠবে। তিনি সেজন্য বালিশ থেকে মাথাটা তুলে একটু সহজ হয়ে বসার চেষ্টা করলেন। বিবির দিকে চেয়ে থাকলেন বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে।—আমি জ্বরে কি শীতে কাঁপছি না রে। বেশ আছি, ভাল আছি। আম্মাজানের হাতের পানিটা ঢক ঢক করে না খেয়ে আস্তে আস্তে খেলেন এবার। তারপর বিবিকে লেপের তলায় টেনে নিয়ে টিন-কাঠের ঘরের ঠাণ্ডা শীত থেকে উষ্ণ হতে চাইলেন। মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, রেনীলটা তোর মতই ছেলেমানুষ ছিল রে বিবি। সারাটা সকাল লাইট-হাউসের নীচে বালিয়াড়ীর বালিতে পা ঢুকিয়ে বসে থাকত। তোর কথা বলত, মবুর কথা বলত। ঘরের আপন জনের মত জাহাজীর নিঃসঙ্গ জীবনটাকে সব দিক থেকে ভরে তোলার চেষ্টা করত। কিন্তু বিবির মত করে ত তাকে পেলাম না। যেমন তোকে পেয়েছি আজকের রাতে, যেমন করে তোকে পেতে চেয়েছি।

বিবির মুখের উপর গড়িয়ে-পড়া চুলগুলি সরিয়ে দিলেন বাপজী। ভারি ভারি চোখদুটোর প্রতি মুখ নিয়ে তিনি কেমন একটি মিঠে শব্দ করলেন। বললেন, তোর মত কিন্তু রেনীল কথায় কথায় কাঁদতো না। কি করে হেসে জীবনটাকে পার করতে হয় তা জানে।

মবুটা ঘুমোতে পারছে না। ছটফট করছে এপাশ ওপাশ হচ্ছে। বাপজীর মনে হল এই প্রথম—মবুর বয়েস হয়েছে। আলাদা করে ওর জন্য কিংবা ও পাশের তক্তপোশটায় বিছানা করে দিতে বলবে বিবিকে। তিনি ডাকলেন—মবু ঘুমোলি?

কোন উত্তর এল না। চুপ চাপ হয়ে গেছে পাশের ছোট শরীরটা। আম্মাজান

আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বললেন, ওকে ডেক না। ও ঘুমিয়ে আছে। এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, তারপর কি হল? কাকে খুন করলে, কখন খুন করলে?

—কোন কোন দিন বুঝলি বিবি আমি আর রেনীল স্টিওন ওয়ে থেকে বিটন স্ট্রীট ধরে ঘুরে বেড়াতাম। রেস্তোরায় খেয়ে নিশ্চিন্তে এসে বসতাম লাইট-হাউজের গোড়ায়। গল্প হত সেখানে। তারপর আবার অনেক বেড়ানো, অনেক কথার ফুলঝুরি। ঠিক দুপুর হওয়ার আগে বলত, এবার তাহলে আসি। কাল ঠিক সকালে। কি ফুল আনব বল?

—যে ফুল চেয়েছি সে ফুলই সে সংগ্রহ করে এনেছে। আমার হয়ত ঘুম তখনো ভাঙে নি কিংবা কম্বলের তলায় তোর কথা চিন্তা করছি সে সময় সে আমার মুখের কম্বল টেনে বলেছে, বাপস্ ঘুম বটে একখানা। জাহাজী মানুষের অত ঘুমুতে নেই। কোনদিন গরম পানি আর তোয়ালে ঠিক-ঠাক করে রাখত। সরাইখানাতে দুজন একসঙ্গে চা খেয়ে তারপর বেড়াতে বের হতাম কোনদিন। আবার সেই বিটন স্ট্রীট, স্টাউন ওয়ে, কিংস এ্যাভিনু এবং কার্ডিফ ক্যাসেলের পাশের প্রশস্ত পথ ধরে এগিয়ে যেতাম। ফিরে আসতে কোনদিন দুপুর গড়িয়ে যেত। এই ছিল কাজ আর ছিল অনেক অনর্থক এবং অহেতুক কথা— তুই, আমি, মবু. আমার দেশ শামীনগড়।

রেনীলকে এক দুপুরে বললাম, মবুর জন্য কিছু কিনতে হয়। বিবির জন্যও কিছু। সেই শুনে রেনীল অত্যন্ত খুসী হল। বললে, চল না আমি পছন্দ করে কিনব। স্টিওন ওয়ের লীডস্লের দোকানে সব পাবে। যা চাও, পাবে?

আমি শুনে খুসী হলাম, সে বলে খুসী হল। এবং দুজনে সেই দুপুরেই বন্দর থেকে বাস ধরে স্টাউন ওয়ের ভিতর ঢুকে গেলাম। সামনের থিয়েটার হলটা পার হয়ে বাঁদিকের একটা বাঁক ঘুরে একসিলেটরে মাটির নীচে নেমে গেলাম। মাটির নীচে যেন আর একটা শহর। রেনীল আমার হাত ধরে প্রথমে একবার সব দোকানটা ঘুরিয়ে দেখাল। কোথায় কি পাওয়া যায়, দাম কত হতে পারে বিবির জন্য কি মানাবে ভাল, মবুর বয়েস কত—দেখতে কেমন, কি জিনিস ওর পছন্দ, সব সো-কেস দেখতে দেখতে জেনে নিল।'

তারপর কেনা কাটা। সে কিনল পছন্দ করে তোর আর আমার জন্য। আমার কাছে তোর আর মবুর গল্প শুনে শুনে ওর মুখস্থ হয়ে গেছে। সে কিনে কিনে একবার শুধু বলত—বেশ মানাবে মবুকে, বেশ মানাবে ভাল বিবিকে। আমি খুসী খুসী হয়ে বলেছি, খুব পছন্দ হবে ওদের। তোমার কথা বিবিকে বলব। সে শুনে খুব খুসী হবে।

দোকানটা খুবই বড়। আমরা একসিলেটরে নীচে নেমে গিয়েছিলাম, এবং সব দেখে ও কিনে আসতে প্রায় চারঘণ্টার মত সময় লেগেছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাস্তার আলো সব জ্বলে উঠছে। এমন সময় রেনীল দোকানে ঢোকার মুখের দরজাতে ঘড়ির সো-কেসটার সামনে থমকে দাঁড়াল। আমার প্রতি চেয়ে বললে, ঘড়ির এ রকমটা বেশ।

—ঘড়িটা ছোট। সো-কেসের এক কোণায় ভালমানুষের মত যেন চুপ করে বসে আছে এবং কতকাল থেকে দর্শকদের নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন করে খুব সন্তর্পণে সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে। গায়ে ঝুলানো দামের অংকটি অত্যন্ত বেশী। রেনীল চোখ তুলে বললে, কোম্পানীর কয়েকটা মাত্র ঘড়ি ইংলণ্ডের মাটিতে আছে। কিন্তু কেউ কিনছে না। নতুন নিয়মের মেরামত বলে সাধারণ মানুষ কিনতে ভয়

পাচ্ছে।

—তুমি কিনবে? হঠাৎ আমায় রেনীল প্রশ্ন করল।

—কার জন্য?

—কেন বিবির জন্য।

বাপজী এবার আম্মাজানকে আরো কাছে টেনে বললেন, জানিস আমি তখন হাসলাম। তুই যে ঘড়িই দেখিস নি। কিন্তু ওকে কিছুই বললাম না দরকার নেই, শুনে হয়ত শুধু হাসবে। সে তো জানে না তুই কেমন অজ পাড়াগাঁয়ে বাস করিস। সে জানলে এমন কথা নিশ্চয়ই বলত না।

—বুঝলি বিবি মন আমার একটা কথা বললে শুধু—তোমার জন্য যে এত কেনা কাটা করল আর তাকে তুমি কিছু দিলে না। কিছু অন্তত দাও। কিছু দিয়ে ওকে খুসী কর। বাদশার দেশের মেয়েকে উপহার দিতে হয় কিছু। তাই যতটা হঠাৎ সে বলেছিল, তুমি কিনবে, ততটা হঠাৎই আমি সো-কেসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে দাম দিয়ে ঘড়িটাকে কিনে নিলাম। এবং ওকে আরো অবাক করে দেওয়ার জন্য মুহূর্তে বাঁ হাতটা বুকের উপর টেনে নিয়ে ঘড়িটা কব্জিতে জড়িয়ে দিলাম। দুটো চোখ ওর খুসীতে টস টস করে উঠল। কিসের ইশারায় সে যেন আমাকে বিমুগ্ধ করে দিলে।

—বিবি তুই আমার বউ। তোর কাছে আমার গোপন রাখার কিচ্ছু নেই। গুণাহ অনেক করেছি সে গুণাহের কথা তোকে বলতে পেরে গুণাহের আফশোস থেকে রেহাই পেয়েছি তেমনি। কিন্তু আমার হাজার গুণাহ—ঘড়িটাকে কেন্দ্র করে তারপর যে খুন-খারাপীটা হয়ে গেল।

রেনীল আমায় ধরে নিয়ে গেল সেই লাইট-হাউজের গোড়ায়, পাহাড়ের নীচে। ধাপে ধাপে সিঁড়ির মত নেমে গেছে পাহাড়টা। একটা আবছা আলোর ছায়ায় আমরা বসে পড়েছিলাম। একটা সুযোগের প্রত্যাশায় আমি তখন উন্মুখ। অদ্ভুত এক প্রতীক্ষায় আছি। কি যেন সব এলোমেলোভাবে ভাবছি। হাতে ঘড়িটা ওর চক চক করছে। চক চক করছে ওর চোখ দুটো। মাঝে মাঝে আমার প্রতি মুখ বাড়িয়ে সেও প্রতীক্ষা করছে কিছুর।

—ভুল হল আমার সেখানেই। গুণাহ আমার সেজন্য। হঠাৎ আমার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললে রেনীল, ছিঃ বিবিকে যেয়ে জবাব দেবে কি! জাহাজী বলে অমন পেটুক হতে আছে।

—কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছি। আমার সব সত্ত্বা হারিয়ে গেছে তখন। আর কোন কথা না বলায় সে সব কিছু সহজ করে হাত ধরে টানল। বললে, চল স্টুডিওতে যাই। দুজনে এক সঙ্গে একটা ছবি তুলব। দেশে ফিরে বিবিকে আবার বলো না। বললে, বিবি তোমায় তালাক দেবে।

আমি কিছু বলতে পারি নি। সে কিন্তু অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে।

—বিবি তুই বুঝবি না সে রাতে আমার বুকে কি জ্বালা!

—বন্দর থেকে ছবিঘরটা পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে গেছি। কথা বলার যত দরকার সব রেনীলই বলেছিল। ওর পিছনে যখন হেঁটে যাচ্ছিলাম তখন সে বলল কি অত ভাবছো? এত ভাবলে কিন্তু খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।

—বিবিরে ভাবছিলাম ওর কথা। বিদেশিনীর চরিত্রের কথা।

এবার বাপজী নিশ্বাস নিলেন জোরে এবং পাশ ফিরতে বললেন, ছবিঘরে ছবি

তোলা হল। আমার আর রেনীলের এক সঙ্গে ছবি।

বাপজী অযথা হেসে উঠলেন জোরে এবং নিজেই বললেন, আবার রাগ করলি আমি হাসলাম বলে! এমন জোরে হাসতে নেই—অত জোরে হাসলে মবু চীৎকার দিয়ে উঠবে, তুই ভয় পাস এ সব কথা আগে স্মরণ করিয়ে দিলেই পারিস ; তবে আর এমন জোরে হাসতাম না। আস্তে—যেমন করে হাসলে তুই ভয় পাবি না, মবুর ঘুম ভাঙ্গবে না। আমি ঠিক বলি নি? তুই তো আজকাল কেবল ভাবিস আমি বুঝি পাগল হয়ে গেছি। খোদা-হাফেজের ভিতর যে দোয়া আছে সে তো টের পাস না। তুই জানিস কেবল রাগ করতে আর চোখের জল ফেলতে।

জাহাজীরা উঠে আসছে সব। বারোটার ওয়াচ শেষ হল মাত্র। বারোটা থেকে চারটা আর একটা ওয়াচ রয়েছে। পরের ওয়াচে মোবারক। চার থেকে আটের পরীদার সে।

যারা ফানেলের গুঁড়ি ধরে ওঠে আসছিল তারা দেখল মোবারককে। দেখে কিছু আজ বললে না। শুধু ভাবলে, মোবারক আলী—জাহাজের যোয়ান জাহাজীটা পাগল হয়ে গেছে। সে থাক তার ভাবে।

পিছিলে ওঠার সময় জাহাজীরা দেখলে শেখর আজও আহত হাতটা নিয়ে সিঁড়ি ধরে ওঠছে। ওঠার সময় শরীর থেকে কম্বলটা আজও আবার পড়ে গেল। আহত হাত দুটো দিয়ে কোন রকমেই যেন কম্বলটা জড়িয়ে রাখতে পারে না। তাই পাশের জাহাজী কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে দেবার সময় বললে, যেয়ে কি হবে! ওর মত ওকে থাকতে দাও। মেয়েটার জন্য ওর দিলটা ফেটে গেছে।

শেখর ভাবলে অন্য কিছু। প্রতিবারই মোবারককে ধরে সে নীচে নামিয়ে আনে। হাজার রকমের প্রশ্ন করে। বকে কখনও। নিজেই ধমক দেয়। কখনও উত্তর পায় না।—এমন অনেক কিছু হয়ে আসছে। তথাপি আজ পর্যন্ত ও জানল না প্রশান্ত মহাসাগরের এ—দিগের দরিয়াটা ওর জীবনে কোন সর্বনাশ টেনে এনেছে।

এখান থেকে "খোদা হাফেজ" শব্দটা অস্পষ্ট। ঢেউয়ের গর্জনের সঙ্গে কথাটা এমন করে মিলে গেছে যে ব্রীজে যে অফিসার প্রহরী দেন তিনি পর্যন্ত শুনতে পান না। দেখতে পান না বোট-ডেকের লাইফ বোটের রাডারের পাশে মানুষটা ঝুঁকে আছে—দূরের সমুদ্র দেখছে। রাতে ঘুম নেই মানুষটার। বোট-ডেকের উপর পায়চারী করতে করতে নিজেই কেবল কি বিড় বিড় করে বকে। আবার এমন সময় আসে যখন দেখা যায় মোবারক রীতিমত হাসে, কথা কয়, রাত এগারো থেকে চারটার কাহিনী ভুলে থাকার চেষ্টা করে।

ডেকের উপর উঠে শেখর কোনরকমে ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচবার জন্য কম্বলটা শরীরের উপর শক্ত করে ধরল। ঝড়ো হাওয়ার বিরুদ্ধে নুয়ে নুয়ে হাঁটল। আজ আবার দুলছে জাহাজটা। ঢেউগুলো পাক খাচ্ছে। মাস্টের আলোটা দুলছে বলে ওর ছায়াটা একবার বড় হয়ে আবার ছোট হয়ে যাচ্ছে।

ডেকের উপর দাঁড়িয়ে শেখর চোখ রাখলো সেই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে। ভাবল, কত বিচিত্র এই জাহাজী জীবন। একদল জাহাজী নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে—এক দল এই রাতের গভীরেও কোরানশরীফ পাঠ করছে। একদল এখুনি বাথরুমে ঢুকবে তারপর খানা খাবে টিনের থালায় করে। সামনের ডেক কেবিনে আছেন পাঁচ নম্বর সাব। পরী তার শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও পোর্টহোল ধরে চেয়ে আছেন

তিনি। বুঝি দক্ষিণ আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। নক্ষত্রের ভিতর কোন মুখের ছবি হয়ত। হয়ত ভাবছেন অনেক দূরের ঘর বাড়ির কথা।

কম্বলটা আবার শরীর থেকে পড়ে যাচ্ছিল বলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। চোখে জল তার। কেন এমন জল আসে! মোবারক বোঝে না তার কণ্ঠ হয় উঠে আসতে! আহত হাত দুটো এখনও যে নিরাময় হয়ে উঠে নি।

কোন রকমে টলতে টলতে শেখর নেমে দাঁড়াল বোট ডেকে ওঠার সিঁড়ির নীচে। নীচে দাঁড়িয়ে ডাকল—মোবারক আর পারি না রে। এবার আয়। বারোটা কখন বেজে গেছে।

মোবারক নিঃশব্দে নেমে এলে শেখর বললে, এ ভাবে আর কতদিন?

মোবারক হাসল চোখ দুটো বুজে। সংগে সংগে বাপজীর জাহাজটার কথা আবার নূতন করে মনে পড়ল—আম্মাজান যে জাহাজের গল্প অনেকবার শুনিয়েছে।

আম্মাজান বলতেন, জাহাজের মেরামত হয়ে গেছে। ইনডাস্ট্রিয়েলড্রই-ডকের ভিতর বড় বড় সিঁড়ি লাগিয়ে জাহাজের নীচে রং করে চলেছে ডক-শ্রমিকরা। প্রপেলারের নীচে দুজন মানুষ—সাদা রঙের উপর লাল রং লাগানোর জন্য বাড়িয়ে ধরেছে ব্রাসটা। সে সময় রেনীল আর বাপজী এসে দাঁড়ালেন ডকের পাড়ে। বললেন- এই আমার জাহাজ। এ জাহাজেই একদিন বিবির কাছে যেয়ে পেঁছিব।

রেনীলেব চোখ দুটো ছল ছল করছে। বাপজী পিপের দিকে চেয়ে অন মনস্ক হয়ে থাকার মত থাকলেন। পরে আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে রেনীলের—বললেন, আবার আসব, আবার দেখতে পাব তোমায়।

ঘড়িটা একটু কাত করে দেখল রেনীল। যেন সব জানালে পারে। কোন কথাই বললে না সে। যে মানুষটা রং লাগাচ্ছে তার দিকে চেয়ে থাকলে শুধু।

পরদিন সরাইখানা ছাড়তে হবে! জাহাজে মোট ঘাট নিয়ে উঠতে হবে ঠিক দশটায়। সবাইকে কিনার থেকেই সেদিনের মত খাওয়া সেরে আসতে হচ্ছে ব'লে রেনীল সকালে ওর লিটন স্ট্রীটের ছোট্ট বাসায় নিমন্ত্রণ জানালে বাপজীকে এবং সেই সকালে রেনীল সে তার ছিমছাম ঘরটিতে বাপজীকে বসিয়ে বললে, মজিবুর ঘরে ফিরছ—বিবিকে যেয়ে পাবে, মবুকে যেয়ে পাবে—কিন্তু আমার কথা।

—তোমার কথাও মনে থাকবে।

কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল রেনীল। টেবিলের উপর কিছুক্ষণ মাথা গুঁজে বসে থাকল। কোথায় যেন তার অপরাধ। কোথায় যেন তার কিসের কুণ্ঠা। কোথায় যেন কিছু প্রকাশের অনিচ্ছা।

বিদায়ের সময় রেনীল বাপজীর হাত টেনে নিয়ে হাতের আঙুলে একটি আংটি পরিয়ে দিলে। বললে, আমাকে এ ভাবেই সব দিতে হচ্ছে।

আঙুলটি চোখের উপর তুলে ধরলেন বাপজী। একটি নাম—রেনীল। একটি আংটি—মিনা করা, ঘরের নীলচে আলোয় চক্ চক্ করছে।

তারপর একই টেবিলে বসে দুজন খেল।

রেনীলের কণ্ঠে আবার সহজ স্বাভাবিক আলাপ।

বাপজী আরো কিছু শুনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রেনীল কিছুতেই ততদূর পর্যন্ত যায় নি।

বারান্দায় এসে বিদায় দেবার সময় মুখ ঘুরিয়ে নিল রেনীল।

স্পষ্ট দেখেছেন বাপজী, রেনীল তখন চোখের জল ফেলছে।

জানালার গরাদ দুটো সাক্ষী থাকল। বাপজী আর রেনীল। রেনীলের ছোট সহজ মন। দুটো গভীর চোখ তার—সব কিছু মিলে বিদায় বেলায় অত্যন্ত বিষণ্ণ করে তুলেছিল পরিবেশটিকে। বাপজী সেজন্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পা ফেলেছেন। লিটন স্ট্রীট থেকে রাউদ ইনজিনিয়ারিং কারখানা পর্যন্ত মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে এসেছেন। থামলেন এসে প্রথম কারখানার সদর দরজার পাশে। বি-আই কোম্পানীর সাদা বর্ডারের চিমনি দেখলেন।

ড্রাই-ডকে জল এসে নামছে। টাগবোট এসে টানছে জাহাজটাকে।

ছুটে গেলেন বাপজী।

ডেক থেকে জাহাজীরা দড়ির সিঁড়ি ফেলে দিলে সেই ধরে উঠলেন বাপজী।

খবর পেয়ে ছুটে এসেছে রহমৎ মিঞা। বাপজীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, এসে গেলেন! এসে গেলেন! ওঃ কি চিন্তাতেই না ফেলেছিলেন। আসুন এখন। ডেকে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। বুড়ো বাড়ীয়ালা দেখলে আবার ঝঞ্ঝাট বাড়াবে।

সিঁড়ি ধরে নীচে নামতে বারিক বলল, সেলাম-আলাই-কুম ট্যান্ডল সাহেব। তবিয়ত ঠিক আছে ত?

বাপজী হাত তুলে তুলে সকলকে অভিবাদন করলেন। নীচে নামলেন। এক সময়ে ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাংকের উপর এলিয়ে পড়লেন। কি যেন ফেলে গেলেন এই বন্দরে। কার্ডিক বন্দরের কানা গলির মোড়ে ছোট্ট ঘরটা তার একান্ত প্রিয়জনকে যেন বেঁধে রেখেছে।

দুটো পাহাড়ের ফাঁক ধরে নোনা জলের উপর নীল রং মেখে জাহাজটা সমুদ্রে পড়বে এমন সময় বাপজী এসে দাঁড়ালেন ডেকে। দূরে লাইট-হাউজ। গোড়ায় তার পাহাড় আর পাথর—'দ'-এর মত সিঁড়ি ধরে ধরে নীচে বালিয়াড়ীতে নেমেছে। ছোট সংকীর্ণ জলা জঙ্গল, পাহাড় আর পাথর, কত দুপুরে ওদের মসগুল হয়ে উঠেছে। সে আর রেনীল এসে বসত—গল্প করত, ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠত। রেলিং ধরে সব নূতন করে ভাবার চেষ্টা করলেন বাপজী।

ক্রমশ সরে যাচ্ছে পাহাড়টা। লাইট-হাউজের বালিয়াড়ীটা আড়াল পড়ে গেছে। বেট্‌ল-সিপের চিমনীগুলো চোখে পড়ছে না। দূরে সমস্ত শহরটা ক্রমশ সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে হাজার আলো বুকে নিয়ে সমুদ্র তীরে ভেসে উঠেছে।

বাপজী কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। পিছন থেকে তখন কে যেন ডাকলো, ভাই সাব!

রহমৎ মিঞার গলা—ভাই সাব নীচে আসুন, খানা খাবেন।

ওয়ারপিন ড্রামটা পিছনে ফেলে বাপজী গিয়ে উঠলেন পিছিলে। আবার কার গলা শুনলেন। বারিক মিঞা বলছে, নসীব রহমৎ মিঞার। ঘরও পেল, ঘাড়িও পেল। গ্যালি থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে রহমতের ঘাড়িটা দেখলো ট্যান্ডেল?

বাপজী উত্তর করলেন না। চোখ তুলে তাকালেন তিনি বারিকের প্রতি। বারিক এই বলে কি বলতে চায়, তিনি তার অর্থ বুঝতে চান।

রহমৎ মিঞা বারিক্‌কে বলল, দেখবে, দেখবে। ভাই সাবকে আর একান্তে পেলাম কখন।

দুজন হাত ধরাধরি করে নীচে নামলেন।

মিঞা সাবের মুখে প্রসন্ন হাসি। অনেক খবর আছে মিঞা সাবের। অনেক খবর তিনি দেবেন বাপজীকে।

দুজন পাশাপাশি বাংকে বসে প্রথম দুজন দুজনকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

হাতঘড়িটা হাতে থাকে না—থাকে বেশীরভাগ সময় বালিশের নীচে। আফশোস করল রহমৎ। সব সময় ঘড়িটা হাতে রাখতে পারে না বলে অনুতাপ তার।

শেষ পর্যন্ত বালিশের নীচ থেকে টেনে বের করল ঘড়িটা। দুটো হাতে চেপে ধরে ঘড়িটা, কেমন অসংলগ্ন ভাবে বলে গেল—ঘড়িটা বকশিশ পেয়েছি। একটি মেয়ে দিয়েছে। লিটন স্ট্রীটে সে থাকে। ফুল কিনতে গিয়ে ভাব হল। তাই দিল—খুপসুরুত। আপনিও সরাইখানায় গেলেন না একবার যে দেখাব।

—বকশিশ। দাঁতে দাঁত চাপলেন বাপজী।

বকশিশ। বাপজীর দৃষ্টিগুলো একত্রে দপ দপ করে জ্বলে উঠল। তবু তার অস্পষ্ট আওয়াজ। গলাটা শুকনো। চোখের উত্তাপ নিভে আসছে। উত্তেজনায় থরো থরো করে কাঁপছে শরীর। —রেনীল! রেনীল! গলার অস্পষ্ট আওয়াজে তিনি বিস্ময়ে চকিত হলেন।

তারপর বাপজীর উত্তর ত্রিশের উষ্ণ যৌবন ক্ষণিক স্তব্ধ থেকে চীৎকার করে উঠল, মিঞাসাব।

—ভাইসাব। উত্তর দিতে গিয়ে রহমতের মনটা খুবই সংকীর্ণ হয়ে গেল। চোখ তুলতে পারলো না। দপ দপ করে কপালের শিরা উপশিরাগুলো উঠছে নামছে। কোন রকমে ফিস ফিস শব্দ করে বললে, বকশিশ নয় ভাইসাব! বকশিশ নয়, মিথ্যা-কথা বলেছি! লিটন স্ট্রীটের এক ফুলওয়ালির বাড়ীতে রাতে ফুর্তি করতাম। ফুর্তি করে একদিন ফিরছি ফুলওয়ালী বললে, ঘড়িটা কিনবেন, বড্ড বিপদে পড়েছি! কাল, কালই ত কিনলাম। আপনার কাছে জুটাবাত বলে কোন লাভ নেই। আপনি আমার দোস ভাইসাব।

দোস। দাঁতে দাঁত আবার চাপলেন তিনি।

বাপজী আর রহমৎ মিঞা। ডেক আর সিঁড়ি পথ। ফোকসাল আর বাংক। বাংকে বসে রহমৎ মিঞা ডাকল চলেন, খানা খেয়ে নি ভাইসাব।

তিনি উত্তর করলেন না। সিঁড়ি ধরে ছুটে গেলেন ডেকে। দু হাত উপরে তুলে এক আকাশ তারাকে সাক্ষী রেখে কিছু যেন বললেন।

জাহাজের জাহাজীরা অবাক হয়ে দেখছে বাপজী কেমন পাগলের মত ইতস্তত ডেকের উপর পায়চারি করছেন।

ডেকপথ অন্ধকার। ফোকসাল অন্ধকার। থেকে থেকে স্টিয়ারিং ইনজিন গর্জন করে উঠছে। অন্ধকার পথে বাপজী ডেক থেকে সন্তর্পণে এক সময় নেমে এলেন এবং কম্বল টেনে শুয়ে পড়লেন বাংকে।

সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে আবার। বে অফ্ বিসকে—ঝড়ের সমুদ্র। জাহাজ দুলছে। লোহার পাত দিয়ে আঁটা পোর্টহোলগুলো। বাইরের তীব্র গর্জন ফোকসালে তেমন ভয়ংকর ভাবে গলে পড়তে পারছে না। এই ভয়ংকর দোলানির ভিতরও নির্বিঘ্নে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে জাহাজীরা।

রাত তখন এগারোটা। ডংকীম্যান এসে প্রহরীদের ডেকে গেছে। বাংকে বাংকে আওয়াজ তুলেছে—টান্টু। খুব আস্তে ডেকেছেন। জোরে ডাকলে অন্য প্রহরীদের ঘুম ভাঙবে।

বাপজীর বাংকের পাশে আওয়াজ উঠল। চোখ বুজে ছিলেন, আওয়াজ শুনে

চোখ মেলে তাকালেন। অন্ধকার ঘরে দেখলেন কেউ নেই। কেবল ভংকীম্যানের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সিঁড়ি ধরে সেই শব্দ ডেকের দিকে পা বাড়িয়েছে।

উঠে আলো জ্বাললেন বাপজী। মগ বাংকের নীচ থেকে টেনে বের করার সময়ে দেখলেন রহমৎ মিঞা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হাত ঘড়িটা ঝুলছে তাকের উপর। ঘুমের আগে বুঝি ভুলে গেছিল ঘড়িটা খুলে পেটিতে রাখতে হবে।

বাপজী কি ভেবে সতর্ক ভাবে চোখ বুলালেন চারিদিকে। ধীরে সংক্ষেপ দৃষ্টি। দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন খুব আস্তে। এসে দাঁড়ালেন রহমৎ মিঞায় বাংকের ধারে। আলো নিভিয়ে দিলেন পা টিপে টিপে। আস্তে তুলে আনলেন ওর হাতটা নিজের হাতের উপর। শরীরটা শীতের রাতেও ঘামছে। শিস উঠছে দুটো কান থেকে। ফুলে ফুলে উঠছে হৃৎপিণ্ডটা। হাত দুটো কাঁপছে ঘড়ির ফিতেটা খুলতে গিয়ে। তবু খুলতে হবে—কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে ঘড়ির ফিতেটা খুলতে গেলেন।

রহমৎ মিঞা হঠাৎ ধর ফর করে উঠে বসল। অন্ধকারের ভিতর চীৎকার করে উঠল, চোর চোর! ভাই সাব জাগেন। আমার হাত ঘড়িটা ধরে কে যেন টানছে। ও ভাইসাব ওঠেন।

দেশলাইয়ের কাঠির মত নরম মানুষ রহমৎ মিঞা। শক্তি সামর্থ বিহীন মানুষের গলাটা কেবল ক্যাঁক ক্যাঁক করছে। সে আওয়াজ থামিয়ে দেওয়াব জন্য তিনি এক হাতে মিঞার মুখ চেপে ধরলেন। চেপে ধরে চেষ্টা করলেন ঘড়িটা খুলতে।

সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দ পেলেন বাপজী। কোন জাহাজী যেন ঠক ঠক পা ফেলে নীচে নেমে আসছে। জরাগ্রস্ত রুগীর মত বাপজীর হাত পা কিছুতেই আর স্থির থাকছে না। গলার ফ্যাস ফ্যাস আওয়াজটা তখনও উঠছে। ভেজানো দরজার ফাঁকে গলে গলে পড়ছে। ভয়ে বাপজীর হাত দুটো অজান্তেই রহমৎ মিঞার গলার উপর চেপে বসল। ফ্যাস ফ্যাসে আওয়াজটা থামিয়ে দিতে হবে। কারণ জাহাজে সব অপরাধের ক্ষমা আছে, চুরির ক্ষমা নেই।

ঠক-ঠক আওয়াজটা ডেক-জাহাজীদের ফোকশালের দিকে চলে গেল। আর কোন আওয়াজ নেই। সব চুপ। শুধু থেকে থেকে তখনও গোঙানি উঠছে রহমৎ মিঞার গলা থেকে। বাপজী যন্ত্র চালিতের মত দাঁড়িয়ে আছে বাংকের পাশে।

এক সময়ে রহমৎ মিঞার গলা থেকে সে আওয়াজটা সম্পূর্ণ থেমে গেল।

বাপজীর হুঁশ ফিরতেই আলো জ্বাললেন। রহমৎ মিঞার নীল মুখটা বালিশের উপর কতকটা লালা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বাপজী বুঝলেন রহমৎ মিঞার মৃত্যু হয়েছে। বুঝলেন তিনি খুনী। সমস্ত সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধিগুলি এক এক করে মাথায় জেগে উঠল আবার। প্যাঁচ ঘুরিয়ে পোর্টহোলের কাচ খুললেন। বাংক থেকে তুলে আনলেন রহমৎ মিঞার নীল দেহটা। পোর্ট-হোলের কাচ খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন ব্রীজের উইংস থেকে কেউ কিছু দেখছে কিনা। তারপর পোর্টহোল গলিয়ে, রহমৎ মিঞার পাতলা দেহটা সমুদ্রের অনন্ত নোনা জলে ঠেলে ফেলে দিয়ে ডাকলে, খোদা হাফেজ!

রহমৎ মিঞার গলা টিপে মারতে, ঘড়ি খুলতে পোর্টহোল দিয়ে লোনাজলে ফেলে দিতে পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছিল, কাজেই ঠিক পৌনে বারোটায় ডেকের উপর ছুটে বেরিয়ে এলেন তিনি। টলতে টলতে উইন্‌চ্ মেসিনের কোণায় এসে উবুড় হয়ে পড়ে থাকলেন। কিন্তু ওয়াচের বারোটা বাজার সঙ্গেই তিনি যেন

তাঁর আগের স্বভাব ফিরে পেলেন। উন্মুখ আকাশ তলে দু হাত প্রসারিত করে ডাকলেন—সেই এক ডাক—খোদা হাফেজ।

শামীনগড়ের মানুষ হয়ে বাঁচবি কসম থাকল, আম্মাজানের কসম।

ইনজিন রুমের স্টোকহোলড্ তখন বিদ্রূপ করে মোবারককে। শ্লাইসটা টেনে নিতে হাতটা কাঁপছে তার। উইন্ডসহোল দিয়ে হাওয়া বইছে না। মুঠো মুঠো শ্বাস টেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে মোবারকের। বুকটা কাঁপছে! চোখ দুটো জ্বলছে।

বয়লারের ভিতর কত হাজার হাজার টন কয়লা পুরে চলেছে কত হাজার মাস ধরে। ফায়ার ব্রীজ থেকে নীচের জলুনি কিছুই কমল না।

ছাইয়ের ভিতর আগুনটা চাপা থাকে বেশী। ঘুস ঘুস জ্বলতে থাকে। পোড়া ঘায়ের মত জ্বালা হয়। মোবারকের ফুসফুসটা সেই ঘায়ের মত জ্বালা করছে।

ধুতুরা ফুলের মত উইন্ডসহোলের মুখটা। নীল নোনা জলের হাওয়া উইন্ডস-হোলের মুখটা আর বুঝি টানতে পারছে না। কয়লা মারতে কিংবা জ্বলন্ত কয়লা উলটে দিতে যখন মোবারকের বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে তখনই সে উইন্ডসহোলের বাতাস জোরে মুঠো মুঠো করে টেনে নেয় এবং ব্লাডারের মত ফুলিয়ে তোলে ফুস-ফুসটাকে। কিন্তু এই তিন রাত তিন দিনের প্রহরীগুলোতে সে আর মুঠো মুঠো বাতাস টেনে নিতে পারছে না।

বিরক্ত হয়ে শিকল ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল মোবারক। নীচ থেকে সে চাইল ত্রিশ ফুট উপরের ধুতুরা ফুলের মুখটাকে বাতাস মুখো করে দিতে।

শামীনগড়ে ধুতুরা ফুল খোপায় গুঁজে জৈনব খাতুন আসত হরিতকী গাছের নীচে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মবুর হাত ধরে বলত, পাহাড় চিরে হাওয়া আসছে এ সরু পথটায়। মবু সে তার বুকে জৈনবের মুখটা তখন টেনে ধরত। বলত সোহাগী সোহাগী কথা।

শামীনগড়ের ছবি ভাবছে আর শিকল ধরে টানছে মোবারক। ইদ্রিশ আকবরের হাতে ব্যালচে। ওরা হুস্ হুস্ করে কয়লা হাকরাচ্ছে চুলোর ভিতর। চুলোয় কয়লায় ভরে উঠলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এক সময় দুজনই দুটো শাবলের উপর ভর করে বললে, "স্টীম যে নাইমা গেল মিঞা!"

হুঁশ হল মোবারকের। চমকে উঠল সে স্টীম গেজ্টা দেখে। তর তর স্টীম কোথায় নেমে গেল! দুনম্বর বয়লার কোম্পানীর পুষে রাখা কসবি তঞ্চকতা করতে সুরু করছে আবার। সেজন্য শক্ত মুঠোয় শাবল টেনে কয়লা হাকরাতে থাকলো বয়লারের ভিতর। বিরক্ত হয়ে বল্লে "কসবী!"

কাকে উদ্দেশ্য করে? জৈনব খাতুনতো তখন হরিতকী গাছের নীচে। বয়লারের স্টীমতো তখন তর তর করে উঠছে। ইদ্রিশ আকবর দুজন দুজনের প্রতি চোখ তুলে তাকাচ্ছে। চোখ টেনে ইশারায় বলছে যেন--শুনছো, মিঞা যে সত্যি পাগল বনে গেল।

মোবারকের হাত এবং ব্যালচে ব্যথায় দুটোই যেন ককিয়ে কাঁদছে। তবু কয়লায় কালো করে তুলছে বয়লারের তিন চুলো। কবরের মত উঁচু হয়ে উঠছে ফায়ার ব্রীজের বুকটা। শেষে সেই কয়লা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে নীচের প্লেটের উপর। ভিতরে আর এতটুকু জায়গা নেই। মোবারক ওদের মত শাবল তবু টানছে। কয়লা

হাকরাচ্ছে। সেই দেখে ছুটে এসেছে আকবর। হাত ধরে বলেছে, একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে মিঞার। শেষে চুলোর দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে হাওয়ার ভালবগুলো উঁচিয়ে দিল সে।

মোবারক কেমন অবাক এবং বিস্ময় মানল আকবরের কথায়। আকবরের মত ছাপোষা লোক এ কথা বলতে সাহস করল!—উম্মাদ মোবারক। কি সব বলছে হাড় জিরজিরে লোকটা।

কেন আম্মাজানও তো বলতেন বাপজীকে, আপনি কি মবুর বাপ পাগল হয়ে গেছেন!

শামীনগড়ের সড়কটা তখন কেঁপে উঠত। খবরদার তুই অমন কথা বলবি না বিবি, বাপজী চীৎকার করে উঠতেন।

আম্মাজান সড়ক থেকে বাপজীকে ধরে ধরে উঠোন পর্যন্ত এনেছিলেন। দুজনই চুপ। মবু তখন তাদের পায়ে পায়ে হাঁটছে। রাতের অন্ধকার চিরে ফিস ফিস করে একসময় বললেন আম্মাজান, মবুর বাপ আপনি আমায় খবরদার বলতে পারেন, কিন্তু শামীনগড়ের মানুষদের ত চুপ করাতে পারলেন না।

অন্ধকারের ভিতর দীর্ঘ মজবুত দেহটা আরো দীর্ঘতর হতে চাইল। তেঁতুল গাছ এবং মসজিদের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টিটা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে বাপজী প্রশ্ন করলেন, কেন তারা কি বলে?

আম্মাজান ভয়ে ভয়ে বললেন, উঠোন থেকে ঘরে চলুন।

বল ওরা কি বলে? বাপজী এতটুকু নড়লেন না। মুখ পর্যন্ত তাই দেখে আতকে উঠছে।

না না আমি তেমন কথা বলতে পারব না।

তোকে বলতেই হবে মবুর মা। খুব দৃঢ়কণ্ঠে বাপজী এবার জবাব পেতে চাইলেন।

আম্মাজান একান্ত অসহায়। থর থর করে কাঁপছেন তিনি। তিনি বাপজীর সেই দৃঢ় এবং অনমনীয় মনোভাবকে কিছুতেই আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তাই ছুটে এসে বাপজীর বুকে মাথা ঠুকলেন ঠাস ঠাস করে। খোদার কসম মবুর বাপ আমায় আর সে কথা বলতে বলবেন না। আমায় মেরে ফেলুন গলা টিপে মেরে ফেলুন—বলে বাপজীর দুটো শক্ত হাত নিজের গলার কাছে টেনে আনলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে ঢলে পড়লেন বাপজীর শরীরের উপর।

বাপজী তখন হেসেছিলেন। উন্মাদের মত শামীনগড়ের বুক আর কর্ণফুলির জল কাঁপিয়ে হেসেছিলেন। রাতের অন্ধকারে যে পাখীগুলো নীরবে ঘুমোয় তারা পর্যন্ত ভয়ে আঁতকে উঠেছিল, পাখা ঝাপটা দিয়ে হাসির ঢেউটাকে ডানার ভিতর টেনে আবার ঘুম যেতে চেয়েছিল।

তিনি উন্মাদের মত জাহাজী ঢং-এ হেসেছিলেন। বলেছিলেন, জানি তারা কি বলে।

তারপর আম্মাজানকে কাঁধে ফেলে, মবুকে এক হাতে টেনে ঘরে নিয়ে তুললেন। আম্মাজানকে নীল কাথার নীচে শুইয়ে দিয়ে সেদিন প্রথম কসম খেলেন, হাজার গুণাহের কথা তিনি বিবিকে বলবেন।

তারপরের ঘটনাগুলো মবু সব জানে। তক্তপোশে থেকে জানে, আম্মাজানের মুখ থেকে জানে।

তারপরের কাহিনীগুলো মোবারক চোখের উপর দেখেছে।

শুনেছে অনেক কথা। তক্তপোশে শুয়ে শুয়ে শুনল—রহমৎ মিঞা, ঘাড়ি আর ফুল বেচে খেত যে মেয়েটি সে মেয়েটির গল্প।

বাপজী তার হাজার গুণাহের কথা এক মাত্র আম্মাজানকেই বললেন। সেই গুণাহগারের গল্প শুনে আম্মাজান ভোরবেলায় দেখলেন—বাপজী একেবারে অন্য মানুষ। সাধারণ মানুষ। নাবিকের মত তিনি আবার পাহাড়ের প্রতি চেয়ে রয়েছেন। চোখ দুটোয় নাবিকের ডাক উঠেছে।

ভোরবেলায় বাপজী বারান্দার কোণ থেকে প্রথম বদনাটা টেনে নিলেন সেদিন। জল ভরে চলে গেলেন মসজিদের দিকে। তেঁতুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে প্রথম গ্রামের মানুষদের সালাম জানালেন। তাঁরি তবিয়ত কার কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলেন।

গ্রামের মানুষেরা অবাক হল, কেউ নাবিকের এমনি জীবনধারা ভেবে আদাব করে চলে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকলেন বাপজী। তারপর অজু করে মসজিদ গেলেন অনেক দিন পর নামাজ পড়তে। দু হাঁটু ভেঙে নামাজ পড়ার সময় এক অদ্ভুত বুক ঠেলে ওঠা কান্নায় তিনি ঝর ঝর করে কেঁদে দিলেন। আসমানের প্রতি দুহাত তুলে দোয়া মাগলেন—খোদা, মবু আর বিবিকে শান্তিতে রাখ।

নামাজ সেরে তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ভোরের আকাশে তখন এক দল কাক পাহাড় প্রান্তে ছুটে গেল। কামরাঙা গাছটায় এক দল টিয়া দোল খাচ্ছে। নীচে উঠোনে শালিখগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে খোদার মসজিদে আপনি মরজি মিশিয়ে দিচ্ছে। সফর শেষে বাপজী পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ আজ যেন এই প্রথম পেলেন। কেমন হাল্কা হয়ে তিনি তাই ছুটে ছুটে এলেন ঘরে। তারপর নিভৃতে বিবিকে বুকে টেনে বললেন, বিবি দরিয়া যে আবার আমায় টানছে, বিবি ভিতরে নাবিকের রক্ত আবার আমায় মোচড় দিচ্ছে।

সেই পুনরাবৃত্তি। যে পুনরাবৃত্তি বাপজী সফরের পর সফর করে আসছেন। আম্মাজান সহজ ভাবে বললেন, আর কেন?

—কেন নয় তুই বল?

—বেটাকে সাদি দিন। বেটার বিবি ঘরে আনুন।

সাদি? মাথা নেড়ে বললেন বাপজী, দেব। ওর সঙ্গে জৈনবকে মানাবে ভাল। এ সফরটা ঘুরে আসি তার পরেই দেব। এক বেটার সাদি—টা, পয়সার দরকার। বেটার বিবি ঘরে আনব সে কি আমার কম আনন্দের কথা। কিন্তু টাকা চাই—অনেক টাকা। গোটা শামীনগড়ের সমাজ দাওয়াত পাবে, সেখ, সৈয়দ সব মেমান আসবে—সে কি কম কথা।

মোবারক আলি আর জৈনব খাতুন। দুটো নাম। দুটো সবুজ মন হরিতকী গাছের নীচে যে ছোট্ট খেলাঘর পেতেছিল তাদেরি কথা হচ্ছিল আম্মাজান আর বাপজীর ভিতরে। মবু সেদিন বুক ভরে শ্বাস টেনে নিয়েছিল উঠোনের উপর। বলেছিল ওর কচি মনটা, খোদা তুমি সাক্ষী থাকলে।

খোদা সেদিন সাক্ষী ছিল নিশ্চয়ই। নতুবা উঠোনের উপর মবু আর জৈনবকে দেখে আম্মাজান আর বাপজী একসঙ্গে বলে উঠলেন যেন ঘর থেকে—দেখ, দেখ বিবি কেমন মানিয়েছে দুজনকে। আম্মাজান ঠিক এমনই সুরে কথাটার পুনরাবৃত্তি করে গেছিলেন, যেন একটি মাত্র সঙ্গীত আল্লার কাছে নিবেদন করলেন।

সঙ্গীতের মতই শুনালো। মবু আর জৈনব শুনলো। লজ্জায় আর সরমে

দুজনেই কেমন নুয়ে পড়ল।

বাপজী নেমে এলেন উঠোনে।

লঘু সঙ্গীতের মত পা ফেলে বারান্দা থেকে নামলেন আম্মাজান। এবং দুজনকে দুজন কোলে নিয়ে মুখোমুখী দাঁড়ালেন।

আম্মাজান বললেন, বেটা আমার ভাল। বেটার কোন দোষ নেই।

বাপজী বললেন, আমার জৈনব ভাল। জৈনবের উপর বেটা বড় অত্যাচার করে।

মবুর দিকে চেয়ে বললেন বাপজী, মবু তুই কিন্তু তোর বিবির উপর কথা বলবি না। যদি বলিস, তবে সফর থেকে কিছু আনব না। বিবি যা বলে তাই শুনবি, তাই করবি, না শুনলে আল্লা তায়লা রাগ করবে।

আম্মাজান চোখের উপর দেখলেন যেন একটি দুরন্ত আরবী ঘোড়াকে শক্ত লাগামে টেনে ধরেছে ছোট্ট একটি মেয়ে। সে মেয়ে জৈনব খাতুন। একটি অভিশপ্ত নাবিক বংশকে রক্ষা করছে। সে জন্যই বুঝি আম্মাজান বাপজীর ক্লান্ত সুরটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেছিলেন, মবু কোনদিন জৈনবের কথার বার হবে না। তাই না বেটা।

আম্মাজান নিশ্বাস টানলেন জোরে। সেই দীর্ঘ নিশ্বাসের ভিতর কোথায় যেন নির্ভরতা রয়েছে। সে নির্ভরতা বুঝি মবুর উত্তরকালকে ঘরে বেঁধে রাখার আশ্বাস —শামীনগড়ের মাটিতে মোবারকের জীবন বন্ধনের আশ্বাস।

দুজনই খুসী হয়েছিল। আর নয়, কারণ অনেকদূর গড়িয়েছে। বাপজীর উত্তরপুরুষ চাষী হোক এই বলে উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে তিনি মোনাজাত করেছিলেন সেদিন। আম্মাজান আকাশের দিকে চেয়ে নীরব ছিলেন তখন।

দুজনই আতাবেড়ার পাশ দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে জৈনব আর মোবারককে অনেক ষাট সোহাগ করেছিলেন এবং সে কথার জের থেকেই বাপজী এক সময় বললেন, আজ রাত্রেই সব ঠিক-ঠাক করে রাখবি মবুর মা, কাল ভোরে আমি কর্ণ-ফুলির বাঁওড়ে যাব।

আম্মাজানের ক্ষণিক আনন্দ মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল।

চোখে আবার সেই বিষণ্ণতার ছায়া নেমেছে আম্মাজানের। আতাবেড়ার পাশ দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে কেমন নুয়ে নুয়ে পড়লেন বুকের একটি অব্যক্ত বেদনায়। এতকাল পরেও মবুর বাপ বেদনার তীব্র আঁচটা ধরতে পারল না।

বাপজী বিকেলে গেলেন হরীনগঞ্জের হাটে। হাট থেকে ভাল মাছ আর ভাল সওদা করে ফিরলেন। দাওয়াত করলেন জৈনবের বাপজীকে। ঘর বেদের সঙ্গে তাই সৈয়দ বংশের মোকাবেলা হল রাতে। খেতে খেতে দুজন অর্থাৎ দুই বাপজী কথায় কথায় প্রাণখুলে হাসলেন। নূতন মেমানের সঙ্গে নূতনভাবে আলাপ হল। জৈনব খাতুন এ ঘরের বিবি হয়ে আসবে মোবারকের বাপজী ঘর বেদে ওঝা বংশকে কথা দিলেন।

সকলের খাওয়া শেষ করে নিজে দুমুঠো খেয়ে টিনকাঠের ঘরটায় যখন এসে ঢুকলেন আম্মাজান নীরবে, তখন দেখলেন বাপজী কেমন অন্যমনস্ক হয়ে বসে রয়েছে। বুঝছেন, প্রতি সফরে যাওয়ার আগে বিষণ্ণতার ছায়া যেমন করে বাপজীর উপর নেমে আসত এ সফরেও তাই এসেছে। আম্মাজান এই দেখে প্রতিবার যেমন কান্নাকাটি করেন আর পেটি সাজান, এবারেও তেমন চোখের জল ফেললেন আর পেটি সাজালেন। পেটির ভিতর থেকে টেনে টেনে সব বের করতে গিয়েই দেখলেন একটা

আঙটি পেটির এক কোণায় পড়ে আছে। আঙটিটা মিনাই করা আর চকচকে। উপরে কটি আঁকা বাঁকা রেখা।

কুপির আলোয় বাপজীর চোখের উপর সন্তর্পণে আঙটিটা তুলে ধরলেন আম্মাজান।

বাপজী সহজভাবে বললেন, রেনীল আঙটিটা দিয়েছিল আমায়। তারপর হঠাৎ কি ভেবে বললেন, তুই রাখবি নাকি আঙটিটা।

—না। আম্মাজান ঘাড় কাত করে অসম্মতি জানালেন।

হাতে নিলেন আঙটিটা বাপজী! নিজের আঙুলে পরলেন। তা হলে আমারটা আম্মারি থাক। কলকাতায় গিয়ে রেনীলের নামটা পাল্টে নিজের নামটা লিখে নেব।

—আপনার হাত ঘড়িটা! আম্মাজান প্রশ্ন করলেন। দিন পেটির ভিতর রেখে দি।

ফিতা কেটে দেওয়া হাত ঘড়িটা মবুই বালিশের তলা থেকে টেনে এনে আম্মাজানের হাতে দিয়েছিল। আর মবুর মা দুজোড়া চোখকে আড়াল করে পেটিতে খোদার নাম করে নিজের আঁচলের এক কোণায় বেঁধে ফেললেন। বাপজী অন্যমনস্ক ছিলেন বলে লক্ষ্য করেন নি কিন্তু নীল কাঁথার নীচ থেকে দুটো চোখ সে সব দেখে ফেলল। আম্মাজান তার বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারলেন না।

পরদিন সকালে শামীনগড়ের মানুষেরা জড় হল উঠোনে। প্রতি সফরের মত বাপজীকে তারা বিদায় জানাল। মবু আর আম্মাজানকে বিপদে আপদে দেখাশোনার ভার নিল। তাদের দলে ছিল রসীদ চাচা। ভিন গাঁয়ের লোক। বাপজীর দূর কুটুম। সে এসেছিল মবুর বাপকে বলতে—সফর ফেরত তার জন্য যেন একটা জাহাজের চাকরি ঠিক করে আসে। গাঁয়ে গাঁয়ে গাওয়াল করে, পানসুপারী বিক্রি করে আর পেট চালানো যাচ্ছে না।

সকলকে আদাব জানালেন বাপজী। রসীদ চাচাকে বললেন, এদিকটায় গাওয়াল করতে এলে তোর চাচিকে দেখে যাস। তার তল্লাস নিস। মবুটা বড় হয়ে উঠেছে —তাকে দেখিস।

আম্মাজান আড়াবেড়ার এ পাশ থেকে সব শুনলেন। তিনি কেবল কাঁদলেন আর কাঁদলেন।

কর্ণফুলির বাঁওড় পর্যন্ত মবু গেল বাপজীর সঙ্গে। কাদুর আর পেতলের বদনাটা তার হাতে। সঙ্গে গেল গ্রামের কয়েকজন। তাদের মাথায় কারো বাপজীর পেটি, বিছানা, কেউ সঙ্গ দিয়ে চলেছে।

বাঁওড়ে নৌকো থাকে। মাঝি থাকে। লগি খুঁটির মত গোঁজা থাকে পাড়ে। খুঁটিতে নৌকার দড়ি বাঁধা। বাপজী সেই নৌকায় ওঠার আগে মবুকে আর একবার কোলে টেনে নিলেন, মুখ থেকে চিবোন পান এনে কিছুটা মবুর মুখে পুরে দিলেন। তারপর চাইলেন শামীনগড়ের দিকে দিকে। পাহাড় প্রান্তে চোখ গেল। নীচে মাঠ। সবুজ মাঠ। খেসারি কলাই গাছে নীলচে নীলচে ফুল। তারপর মবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, আম্মার কথা শুনিস মবু। দেখিস তোর ব্যবহারে তিনি যেন দুঃখ না পান। আম্মা বড় ভাল। বলতে বলতে বাপজীর গলাটা ধরে এল। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ মবুকে বুকে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। পরে কেমন অসহায় আর ক্লান্ত সুরে বললেন, মালিক গফুর! শেষে আল্লা আল্লা বলতে বলতে উঠে গেলেন নৌকায়।

নৌকাটা অনেকদূর পর্যন্ত গেল কর্ণফুলির বাঁওড় ধরে ধরে। যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণে বাপ আর বেটা দুজন দুজনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করল। এক সময়ে নৌকা বাঁওড়ের ওপাশে হারিয়ে গেল। কিন্তু নৌকার মাস্তুলটা মবুর চোখের উপর তখনও ছায়া ফেলছে।

মবু ফিরে এল ঘরে। লোকজনও ফিরে এল শামীনগড়ে।

বাড়ীতে ঢুকে ডাকল মবু, আম্মা! আম্মা!

কোথাও থেকে কোন উত্তর না পেয়ে সে ঘরে ঢুকে গেল। দেখল আম্মাজান নীলকাঁথার নীচে বালিসের ভিতর মুখ গুঁজে পড়ে আছেন। আবার সে ডাকল, আম্মা।

আম্মাজান বালিসের ভিতর মুখ রেখে আড়ষ্ট গলায় বললেন, তোর বাপজী চলে গেল মবু!

—জি আম্মা। মবু তক্তপোশে বসে আম্মার মুখের উপর মুখ রাখলে।

—তোকে কিছু বলে গেলেন?

—জি আম্মা।

—কি বলে গেলেন?

—বললেন, তুই তোর আম্মার কথা শুনবি, আম্মা বড় ভাল।

—আমার কথা তুই শুনবি!

—জি।

—তবে বল, তুই তোর বাপের মত হবি না, নাবিক হবি না।

—না, নাবিক হব না।

—শামীনগড়ের মানুষ হয়ে বাঁচবি কসম থাকল।

—তাই বাঁচব কসম খেলাম।

ডেকে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। হাত তুলে দেখালেন সকলকে।—ঐ যে পাহাড়! বিন্দু বিন্দু হয়ে আকাশ সীমানায় ভেসে উঠেছে।

ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সব জাহাজীরা দেখল দূরের প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ফেটে ওঠা একটা ঢিবি। আকাশের দিকে তার মুখ। একটা দ্বীপ। রক্তলাল বালির চূর্ণ মেশানো দ্বীপ—থরে থরে উপরের দিকে ওঠে গেছে। মাথায় তার কাঠের ক্রস বসানো। একদল সমুদ্র পাখী দ্বীপটিকে কেন্দ্র করে উড়ছে। জাহাজটাকে দেখে ওরা বুঝি বিশ বছর আগের এক দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

ক্যাপ্টেন হাত তুলে কতকগুলি সংক্ষিপ্ত কথা বললেন।

মোবারক, শেখর জাহাজের সব জাহাজীরা শুনে শিউবে উঠল।

শিউরে উঠেছিলেন সেদিন আম্মাজানও, সমস্ত শামীনগড় সে খবরে চুপ মেরে গেছে, সড়কের ঘাসগুলো পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে সন্তর্পণে সে দুর্ঘটনার খবর শুনতে শুনতে।

প্রশান্ত মহাসাগরের ওই বুক ঠেলে ওঠা ঢিবিটাতে যদি মোবারকের জীবন-ইতিহাসের পাতা উল্টানো থেমে যেত তবে আজ অন্ততঃ আকবর ইদ্রিশ জাহাজের সব জাহাজীরা ওকে পাগল বলে হাসি মস্করা করতে সাহস পেত না। ঢিবিটা এবং ঢিবির উপর ঐ কাঠের ক্রসটা আজও তার জীবনে জীবন্ত বিদ্রূপ তাই। হাজার

গনাহাগারের একটি অতীত প্রতীক চিহ্ন।

অতীত প্রতীক চিহ্ন বাপজী শামীনগড় ছেড়ে চলে গেলেন। শেষবারের মত মোবারক কর্ণফুলির বাঁওড়ে দেখেছিল নৌকার মাস্তুলের শেষ ডগাটা। তারপর... ?

তারপর কর্ণফুলি থেকে কলকাতা। কলকাতার বন্দরে কোম্পানীর জাহাজ, বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার দুদিন আগে একটি মাত্র চিঠি। তাতে জাহাজ ছাড়ার খবর। আম্মাজান আর মোবারকের দোয়া—কোন্ কোম্পানীর জাহাজ কোথায় যাওয়া হবে। প্রতি সফরে কলকাতায় গিয়ে যেমনি একটি মাত্র চিঠি দেন তেমনি চিঠি।

আম্মাজান প্রতি বারের মত সেদিন নাকের নথ দুলিয়ে হাতটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মবুকে দেখালেন। বললেন, তোর বাপজীর খত। মুন্সীজীর কাছে যা—খতে কি লেখা আছে সব শুনে আসাব।

খুসী খুসী মন আম্মাজানের। মবুর মুখে তাই বারবার চুমু খান। মুখটাকে ছোপ-ছোপ লালে-লাল করে দেন। তিনি অনেক সোহাগ করলেন মবুকে। এবং এক সময় ওকে টেনে আনলেন বুকে। আম্মাজানের উষ্ণ স্পন্দন নাবিক বংশের উত্তরপুরুষকে শোনালেন। যেন বলতে চাইলেন. শুনে রাখ মবু এই স্পন্দনে কত ব্যর্থতার গ্লানি ডুবে আছে।

মবু শেষে কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে আতাবেড়ার পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল শামীন-গড়ের শেষ গড়ে। গেল সে মুন্সীর বাড়ী। ঝোপের নীচে উঁকি দিয়ে ডাকল, বাড়ী আছেন চাচা।

—কে? ভরাগলায় উত্তর করলেন চাচা।

—আমি মবু। খত আছে বাপজীর। মেহেরবাণী করে খতটা পড়ে দেবেন?

খড়ম পায়ে মুন্সী-চাচা ঝোপের পাশে এসে দাঁড়ালে। চশমার ফাঁক দিয়ে মবুকে দেখে বললেন. কিরে কদিনে বেশ ডাগব ডোগব হয়ে উঠেছিস। বলে খতটা মবুব হাত থেকে নিয়ে নিজে একবার পড়লেন. পরে জোরে জোরে মবুকে শোনালেন।

মুন্সীজী জানেন খতটা একবার পড়ে দিলে মবু যাবে না। পড়তে হল তিন থেকে চারবার। সমস্ত খতটা সে হুবহু মুখস্থ করবে শুনে শুনে। বাড়ীতে পেঁাছে আম্মাকে মুখস্থ বলবে। বলার ভঙ্গী দেখে আম্মা বলবেন, মবু আমার মৌলভী হবে। মুন্সীজীর চাইতে বেশী পড়াওয়ালা আদমী হবে। মবুই আবার এসে সে সব কথা খত পড়াবার সময় মুন্সীজীকে বলেছে, সেই শুনে দাড়ি নেড়ে হেসেছেন তিনি।

সেখান থেকে মবু ছুটেছে জৈনবের বাড়ী। গড়ের মেঠোপথে উঁচু-নীচু ছোট-ছোট ঢিপি মাড়িয়ে সে এল প্রথম সড়কটার উপর। সড়কের দুপাশে মাদার আর পলাশ গাছ। মুখ উঁচু করে সে চাইল একবার। পলাশ আর মাদারের ডালে ডালে ফুল। আকাশ প্রান্ত ধরে দুটো লালরঙের পাড় সড়ক ধরে কর্ণফুলির বাঁওড় পযন্ত চলে গেছে। গাঙ-শালিখেরা এসেছে তখন এদিকটার পলাশ ফুলের মধু খেতে। মধু খাচ্ছে আর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ডালের শাখা-প্রশাখায়।

সড়কের উপর মবুও লাফাল অনেকক্ষণ। ঢিল ছুড়ে লাফাল। পাখা তাড়িয়ে লাফাল। তারপর মেজাজ মত গেল সে জৈনবের বাড়ী।

জৈনব উঠোনে। জৈনব খেলছে। উঠোনের উপর অনেক ঝাঁপি। ওর বাপ ঝাঁপি খুলছে। সাপ টেনে বের করছে জৈনব।

সাপগুলো ছোবল দিতে চায় জৈনবকে। সাপের অসহায় কেরামতিগুলোর দিকে চেয়ে সে হাসলো।—পারবি ছোবল দিতে! বলে হাতটা বাড়িয়ে দিল। হাসল খিল খিল করে।

মবুকে উঠোনের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জৈনব গেল ওর পাশে। হাত ধরে টানল। বললে, আয় আয়, দেখবি কত সাপ বাপজী পাহাড় থেকে ধরে এনেছে।

একটা সাপ ফোঁস করে উঠেছে মবুর মুখের সামনে।—নাম এর কাল কেউটে, এইটির নাম চন্দ্রবোড়া। চন্দন তিলকে এ পাশের ঝাঁপিতে! দুধরাজ সাপ দেখাবি? বলে জৈনব বাপজীর প্রতি চোখ তুলে তাকাল। ওটা খুলবি না। বাপজী জৈনবকে ধমকের সুরে বললেন। উঠোনের উপর জৈনব আর মবু।

জৈনব ডাকে মবুকে, ও মাতব্বর মিঞা ওটা হাতে কি?

—বাপজানের খত। কলকাতা থেকে আম্মাকে খত দিয়েছে।

—বিদেশ-ভুঁই-এ থাকলে তুমি আমায় খত দেবা না?

—জরুর দেব।

শাড়ীটা পরেছে জৈনব প্যাঁচ দিয়ে দিয়ে। বুকের উপরটা খালি। ফাগুন মাস পড়েছে। শীত এখনও যায় নি। শীতে সাপগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। এক এক করে ঝাঁপি তুলছে বাপজী ঘরের ভিতর। সন্ধ্যায় পাইকার আসবে সাপ কিনতে। তাই সাপগুলো বালতির জলে ধুয়ে সাফ সাফাই করে রেখেছে বাপ-বেটি মিলে।

হঠাৎ খেয়াল হল মবুর, আম্মাজান আতাবেড়ার পাশে বসে আছেন। চোখ দুটো বেড়ার ফাঁক দিয়ে কাঞ্চন ফুলের গাছটাকে নিশ্চয়ই দেখছেন। বাড়ীতে ঢোকার আগে প্রথম কাঞ্চন ডালের নীচে দিয়ে মাথাটা বাড়াবে মবু। আম্মা তা জানেন। তাই কাঞ্চন ফুলের নীচের ফাঁকা পথটা অনেক প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশার প্রতীক। আম্মাজান প্রত্যাশায় আছেন মবু এক্ষুনি অনেক খবর নিয়ে আসবে বাপজীর।

মবু আতাবেড়ার ওপাশটায় চোখের উপর চিঠিটা রাখল বিজ্ঞের মত। আর অজ্ঞের মত কথাগুলি আওড়ে গেল। আম্মাজান তাই দেখে হি হি করে হাসলেন। হাসিতে ফেটে পড়লেন।

কাছে এলে মবুর হাত ধরে বললেন, দুষ্টু ছেলে! তোর বাপজীর জাহাজ ছাড়তে আর মাত্র তিন দিন। এ তিন রাত আমরা ঘুমোব না কেমন?

—কেন ঘুমোব না?

—তোর বাপজীর কথা, বসে বসে ভাবব।

বেটা আর বিবি একটি সফর যাওয়া মানুষের জন্য মোনাজাত করবে।

—বেশ হবে না আম্মা?

—ভাল হবে। তোর বাপজী তবে দরিয়ার কোন ইবলিশের হাতে পড়বেন না। আল্লা ওর সব কশুর ক্ষমা করবেন। তিনি দুটো আঙুল ঠোঁটে ছুঁয়ে হাতটা মবুর চোখের উপর নাড়তে থাকলেন। মবু খপ করে একটি আঙুল ধরলে বললেন, বাপজীর তোর এবার ছ মাসের সফর। কি মজা।

দুটো আঙুলে দুটো সময় নির্দিষ্ট করে আম্মাজান প্রতি রাতে নীল কাঁথার নীচে এমন করতেন। যখন শামীনগড়ে সন্ধ্যা নেমে আসত পাহাড় অলিন্দে এই ছোট্ট গায়ে যখন আজান দিত মসজিদে মৌলভী, তখন আম্মাজান নামাজ পড়তে বসতেন মবুকে পাশে নিয়ে। দুজন মিলে আল্লার কাছে অনেক মেহেরবাণীর জন্য

দোয়া মাগতেন। তার খসম, তার পিয়ার, অনেক দূরের মানুষটির ভবিষ্যতের জন্য অনেকক্ষণ মোনাজাত করতেন।

শামীনগড়ের এই টিনকাঠের ঘরটিতে এভাবে কতদিন গেল। কত প্রহর আপন মরজিতে কালের সংগে মিলে গেল। কত জোনাকী জ্বলে আবার সড়কের ধারে নিভে গেল তবু আম্মাজানের প্রত্যাশার হাতছানি লেগেই থাকল চোখের অঞ্জনে।

রসীদ চাচা আসতেন গাওয়াল করতেন। আতাবেড়ার ওপাশ থেকে হাঁকত, ভাবি এলাম। পান সুপারী রাখবে নাকি এস। মিঞা মাথার ঝাঁকা নামাতো আর মুখের উপর গামছা ঘুরিয়ে বলত, ভাবি ভাইয়ার কোন খত এল?

আম্মাজান আতাবেড়ার এপাশে মবুর হাত ধরে বলতেন—কৈ না তো! কোন খত এল না তো। মিঞার কাছে কোন খবর আছে নাকি?

আম্মাজান কথা বলতেন মবুর কানে ফিস ফিস করে। মবু সেই কথাগুলি কবিতার মত আওড়ে রসীদ চাচাকে শোনাত। অর্থাৎ কথা হত মবু আর রসীদ চাচার ভিতর। আম্মাজানের ফিস ফিস গলায় আওয়াজ উঠত মাত্র।

দণ্ডের সংগে কত প্রহর এল। প্রহরের সংগে দিন এল। দিনের সংগে এল এবার মাস। মাস কালের সংগে মিশে গেল। খত এল এবার দক্ষিণ সমুদ্র থেকে। বাপজী গেছেন সেই এক কোন্ দেশে যেখানটায় তাল তাল সোনা নিয়ে আসার জন্য ওর পূর্ব পুরুষ গিয়েছিল কোন এক কোম্পানীর জাহাজে—কিন্তু ফিরে আসেন নি।

আম্মাজান হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন, মবু রে মবু।

মবু ডাকল, জি আম্মা। চোখে জল কেন? কাঁদছিস কেন আম্মা? তোর বাপজী এবার দক্ষিণ দরিয়ায় গেল, কি হবে।

—কি হবে? ফিরে আসবে সফর শেষে। তোর আব আমার জন্য চীজ নিয়ে আসবে অনেক।

খতে লেখা ছিল, প্রশান্ত মহাসাগরের বুক ধরে আমাদের জাহাজ নিউজিল্যাণ্ডে যাচ্ছে বিবি। মাল খালাস করে জাহাজ সিডনী যাবে। তারপর দেশে ফিরবে। আমি আবার তোকে আর মবুকে দেখতে পাব। মবু নিশ্চয়ই আমার কথা আজকাল খুব বলে। এসেই কি হবে বলতো? বলতে পারলি না। বেটার সাদী হবে। অনেক টাকা এবার কোম্পানীর ঘরে পাওনা হবে। এক বেটা। সাদি। কত লোক লস্কর! কত মেমান! কত দোলত! আর অনেক দাওয়াত। জৈনব নিশ্চয়ই আর একটু বড় হয়েছে। ওকে আমার দোয়া জানাবি। মালিক গফুর ভরসা। বলে খত শেষ করেছিলেন বাপজী।

এবার থেকে মবুর চোখের উপর আম্মাজানের আঙুল নাড়ানো আরো বেড়ে গেল। নীল কাঁথার নীচে ঢোকার আগে অনেকক্ষণ এই রকম চলত আর বাপজীর বলা অনেক কথার পুনরাবৃত্তি হত। আতাবেড়ার ওপাশটায় যাদ কারো ডাক উঠত, আম্মাজান মবুকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতেন—কোন খবর যদি মানুষেরা নিয়ে আসে। যদি খবর দেয় মবুকে, কর্ণফুলির বাঁওড়ে তার বাপের নাও কেউ দেখে এসেছে।

কৈ কেউ তো কোন খবর দিল না। যারা এল তারা সকলেই জোত জমির কথা —হালচাষের কথা, দেশের কথা বলে মবুর কাছে বিদায় নিল। আতাবেড়ার এ পাশের কোন খবরই বয়ে আনল না তারা।

কত-পুরুষ আগে নানীও এমনি অপেক্ষা করতেন বিছানায় শুয়ে। তখন এ ঘর

থেকেই বাঁওড়ে লগির শব্দ শোনা যেত। নানী কাঁথা থেকে শীতকালে মুখ বার করে রাখতেন। লগির শব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন। যদি ক্রমশ দূরে সরে যেত শব্দটা তিনি হতাশার চিহ্ন আঁকতেন মুখে। আর বুঝি এল না। ঘাটে বুঝি আর নাও বাঁধল না। শামীনগড়ের মানুষদের এখন হাঁটতে হয়। বাঁওড়ের লগির শব্দ আর এ ঘরে এসে পোঁছায় না।

আম্মাজানের পাশেই শুয়ে থাকে মবু। ওর চোখে গভীর ঘুম। কুলুঙ্গী থেকে আম্মা কুপিটা মবুর মুখের উপর ধরতেন। সেই মুখে মবুর বাপজীকে অনুভব করার চেষ্টা করতেন। হিজল পাহাড়ের বাতাস তখন নেমে আসত জানালাটার উপর। সেই বাতাসে জানালা দরজা ঠক-ঠক করে নড়ত। আম্মাজান চমকে উঠতেন। ডেকে তুলতেন তিনি তখন মবুকে। বলতেন মবু ওঠ, কে যেন বাইরে দরজা নাড়ছে।

তিনি ভাবতেন হয়তো মবুর বাপজী। হয়তো নিভৃতে এবং নীরব অন্ধকারে তিনি এসে টিনকাঠের ঘরটায় চুপি চুপি উঠেছেন বিবিকে অবাক করে দেবার জন্যে। গেল সফরের আগের সফরে তো তিনি তাই করেছিলেন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দরজাটা চুপি চুপি নেড়েছিলেন। আম্মাজান যত ডাকছেন ভয়ে ভয়ে কে! কে! তত বারান্দার ছায়াটা দেওয়াল সংলগ্ন হয়ে চুপ করে ছিল। তারপর এক সময় আম্মাজান চীৎকার করে উঠল—তিনি বলেছিলেন, বিবি আমি রে আমি! দরজা খোল।

দরজা খুললে দেখতে পেয়েছিলেন বাপজীর দুটো দুষ্টুমী ভরা চোখ। চোখে অনেক কালের বিবিকে-বেটাকে না দেখার আরজি। শেষে আম্মাজান বাপজীর সংলগ্ন হয়ে তক্তপোশটা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং দুজন একসঙ্গে মবুর মুখের উপর ঠোঁট রেখেছিলেন। বাপজীর গলায় অনেক কথার প্রকাশ তখন, কোম্পানীর আরজি আর খোদার মরজি কিছু বোঝার উপায় নেই। বলা নেই, কওয়া নেই—হঠাৎ শুনি উড়োজাহাজে আমাদের আমেরিকা থেকে কলকাতায় আসতে হবে। জাহাজ নাকি আর তাদের চলছে না।

আম্মাজান ভাবতেন ঐ সফরটাতেও যদি কিছু এমনি একটা হয়। একটা উড়োজাহাজ যদি বাপজীকে দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ভারতবর্ষে পোঁছে দেয়। অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা তাই জমা হতে থাকল তাঁর দিনের পর দিন।

কিন্তু বাপজী তো ফিরছেন না!

শামীনগড়ে এল বৈশাখ মাস। ভর দুপুরে ঘাটে আম্মাজান জল আনতে গিয়ে কেমন আনমনা হয়ে কাঞ্চন গাছের ফুলগুলির দিকে চেয়ে থাকেন আর ঘরে ফিরে মবুকে বলেন, না একটা খত, না এসে পোঁছাল। বাপজী তোর ভাবে কি বলত? জাহাজ ফিরতে দেরি হয় তো একটা খত লিখে দে দুলাইন। তা দিবি না পর্যন্ত? বাড়ীর লোকগুলির কি করে দিন কাটছে সে হিসেব পর্যন্ত রাখে না লোকটা।

হিজল পাহাড় আর মৌরী-পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে যে আকাশটা শামীনগড় থেকে দেখা যায়, সেখানে কদিন থেকেই মেঘ জমতে সুরু করেছে। মেঘে মেঘে আকাশ দিন দিন কালো হয়ে উঠছে। শামীনগড়ের মানুষেরা ভাবল এবার জল ঝড় কিছু একটা হবেই। কাল বৈশাখী পাহাড় চিরে এদিকটায় নেমে আসবেই।

আম্মাজান কি ভেবে সেদিন জানালা দিয়ে সে আকাশটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। জল ঝড়ের রাতে একা একা তাঁর বড্ড ভয়। মবুর উপর এখনও

তিনি নির্ভর করতে পারছেন না।

সেই জল ঝড়ের দিন আবার এসে গেল।

বিকেলে ঘাট থেকে জল এনে মবুকে বললেন আম্মাজান, কোথাও যাসনে। দেখেছিস আসমানটা কেমন কালো করে আসছে!

সে রাতে আম্মাজান সকাল সকাল খেয়ে মবুকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দেশলাই ঠিক করে বালিসের নীচে রাখলেন। কুলুঙ্গীতে কুপির সলতে তুলে ধরলেন উপরে। তারপর মোটা সলতেয় আগুন ধরিয়ে জল ঝড়ের রাতকে ঠেলে দিতে চাইলেন দূরে।

এমন রাতকেই আম্মাজানের ভয় ; এমন রাতে তাঁর বুক ফেটে কান্না ওঠে। অভিমানে বাপজীকে তখন গালমন্দ দেন, বেইমানী আমার সঙ্গেই করলা মিঞা! তঞ্চকতা করে আমার জীবনটাকে মাটি করে দিলা।

ভীষণ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। মেঘে মেঘে ঢেউ দিচ্ছে আকাশে। দক্ষিণ সমুদ্র যেন ফুঁসে ফুঁসে শামীনগড়ের এই ছোট্ট টিনকাঠের ঘরকে পর্যন্ত গিলতে আসছে।

এক এক করে ঘরে জানালাগুলি বন্ধ করে দিলেন তিনি। শেষ জানালাটা বন্ধ করার সময় প্রশ্ন করলেন, তোর বাপজীর জাহাজ, ঝড়ের দরিয়ায় না বন্দরে?

মবু উত্তর করে নি। সে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঝড় বাদলের রাতে ওর চোখে ঘুমটা যেন বেশী করে আঠার মত লেগে থাকে।

বাতাসের সোঁ সোঁ আওয়াজ পেয়ে শেষে জানালাটা বন্ধ করলেন। তক্তপোশে ফিরতে না ফিরতেই অনুভব করলেন ঝড়ের বেগে টিন কাঠের ঘরটা মোচড় দিয়ে উঠেছে। প্রথম দিকের জানালার একটি কবাট ঠাস করে খুলে গেল। বর্শা ফলকের মত বৃষ্টির ছাট আর ঝড় এসে ঢুকছে ঘরে। বিছানা-পত্র ভিজিয়ে ভয়াবহ করে তুলেছে ঘরটাকে। আম্মাজান ডাকলেন, খোদা! ছুটে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দেবার সময় দেখলেন মবু ভয়ে তক্তপোশের উপর বসে কাঁদছে।

জানালাটা বন্ধ করলেন। তক্তপোশের পাশে এসে দাঁড়ালেন আবার। মবুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, খোদাকে ডাক মবু। তিনি ছাড়া আমাদের আর কে আছেন।

ভীষণ শব্দ। ঝড় আর শিলাবৃষ্টি। কড় কড় করে আক শর অনেক রাক্ষুসে শব্দ আছড়ে পড়ছে শামীনগড়ের অনেক উঠোনে। দরজাটা কে যেন বাইরে থেকে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি দরজাটার দিকে চেয়ে শঙ্কিত হলেন। এক্ষুনি হয়ত ওটা উল্টে পড়বে। দরজার পাশে গিয়ে ভাবি কিছু রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা দরজাটা ভেঙ্গে পড়বে এক্ষুনি। সঙ্গে সঙ্গে টিনকাঠের শক্ত ঘরটা পাখীর মত উড়তে থাকবে আকাশে।

উঠে দাঁড়ালেন আম্মাজান। দরজার কাছে এসে মানুষের শব্দ পেলেন। বারান্দায় পড়ে কোন মানুষ যেন গোঙাচ্ছে। কিন্তু মানুষটা কে, কোন মাঠে সে ঝড় পেয়েছে, এত বাড়ী থাকতে শামীনগড়ে এখানেই বা কেন, শিলাবৃষ্টি আর ঝড়ের জন্য কিছুই ভিতরে থেকে জানতে পারলেন না। তবু অত্যন্ত ভয়ের সঙ্গে দরজার উপর কান রাখলেন তিনি।

আঁতকে উঠলেন আম্মাজান। শুধু কয়েকটি শব্দের পুনরাবৃত্তি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির মুখে।

আম্মাজান আড়ষ্ট কণ্ঠে ডাকলেন, মবু এদিকটায় আয় রে বাপ। তারপর দুজনে

দরজার উপর আবার কান রেখে সন্তর্পণে শুনলেন—বারান্দার, মানুষটি গোঙাতে গোঙাতে বলছে, দরজা খুলুন, আপনাদের টেলিগ্রাম।

দরজা খোলা হল। আম্মাজান আর মবু অন্ধকারে বারান্দার উপর হাতড়ে হাতড়ে বেড়ালেন লোকটাকে। বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেলেন দাওয়ার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে মানুষটা। ঝড় আর শিলাবৃষ্টির আঘাতে মানুষটি আর উঠতে পারছে না। ওকে ধরে তুলে আনার সময় আবার শুনলেন আম্মাজান, আপনাদের টেলিগ্রাম। দক্ষিণ সমুদ্রে জাহাজ ডুবির খবর আছে। মজিবর রহমান সে জাহাজের জাহাজী।

চোখে জল নেই আম্মার। শুধু কটি অস্পষ্ট শব্দ। সে শব্দ ঝড় জল রাতকে বিদ্রূপ করছে। তিনি দুটো হাত অবলম্বনের জন্য মবুর প্রতি বাড়ালেন—কিন্তু তার আগে গফুর মালিক এ কি করলে বলে, মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লেন। তারপর সমস্ত রাত ধরে ঝড় জলে নিঃঝুম হয়ে থাকলে ঘরটা। শামীনগড় কোন খবরই রাখল না তার।

সকাল বেলায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ের কোলে সে খবর ছড়িয়ে পড়ল। সব মানুষেরা জানল কর্ণফুলির বাঁওড়ে আর বাপজীর নৌকোর লগির শব্দ উঠবে না। শামীনগড়ের জাহাজী জীবন থেকে এক-জন জাহাজী বিদায় নিল।

সব খবর শুনে শামীনগড়ের সমাজ চুপ মেরে গেছে।

শিউরে উঠেছিলেন বার বার আম্মাজান সেদিন।

প্রশান্ত মহাসাগরের এক জাহাজ ডেকে মোবারক, শেখর, জাহাজের অন্যান্য জাহাজীরা আর এক ইতিহাস শুনে শিউরে উঠল।

ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সব জাহাজীরা তখন দেখল দূরের একটা ঢিবি। একটা দ্বীপ। রক্তলাল বালির চূর্ণ মেশানো দ্বীপ, থরে থরে আকাশের দিকে উঠে গেছে। মাথায় তার ক্রস। দ্বীপটাকে কেন্দ্র করে উড়ছে একদল সমুদ্র পাখী। জাহাজটাকে দেখে ওরা বুঝি বিশ বছর আগের এক দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

ক্যাপ্টেন হাত তুলে কতকগুলি সংক্ষিপ্ত কথা বললেন, কথাগুলো বিবর্ণ। কথা-গুলো জাহাজীদের ভয়াবহ দিনের কথা।

জাহাজীরা ডেকের উপর দাঁড়িয়েছে সম্মান দেখার মত করে। পাহাড়ের উপর কাঠের ক্রসটিকে দেখে ক্যাপ্টেন, বড় মালুম, মেঝ মালুম বুকের উপর ক্রস টানছে। বাইবেল থেকে একটি সংগীতের সুর তুললেন কণ্ঠে। আর অন্যান্য ভারতীয় জাহাজীরা তাদের ধর্মীয় মতে ক্রসটাকে শ্রদ্ধা জানাল।

মুবারক চুপ করে সকলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্যাপ্টেন বলছেন, বিশ বছর আগে কোম্পানীর জাহাজ ফিরছে নিউপ্লাই-মাউথ থেকে সিডনীতে। সিডনী থেকে জাহাজীরা যার যার দেশে ফিরবে বাড়ীতে বাড়ীতে তারা খত পাঠিয়ে দিয়েছে। চীজ কিনে জাহাজ বোঝাই করেছে বিবি বেটা মেমানদের জন্য। কিন্তু রাতের টাইফুনে কিসে কি হল। ভয়ে দিশেহারা হল সুখানী আর তিন নম্বর মালুম সমুদ্রের পর্বত প্রমাণ ঢেউ দেখে আর গর্জন শুনে। ভুলপথে জাহাজ এসে ধাক্কা খেল ঐ পাহাড়টায়। পাহাড় তখন জলের নীচে। পাহাড় মাত্র গড়ে উঠছে। আঘাত খেয়ে জাহাজের নীচটা চিরে গেল। কাজেই কোন উপায়

থাকল না জাহাজীদের বাঁচবার। লাইফ-বেল্ট পরে সবাই এসে উপরে জড় হল। লাইফ-বোট হাড়িয়া করতে গিয়ে অনেকে ছিটকে জলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভীষণ ঝড়ের জন্য কিছুতেই বোট শেষ পর্যন্ত হাড়িয়া করা গেল না। একটা বোটের হাসিল ছিঁড়ে গেল। আর একটা বোট উল্টে কোথায় ভেসে গেল কোন জাহাজী তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাখল না। বেতার সংকেতে শুধু এক খবর জাহাজ ডুবছে। রেস্কু পাঠাবার মত সময় আর আফিসের হল না।

রাত তখন বারোটা।

জাহাজ ডুবির প্রায় দশবছর বাদে কোম্পানীর ক্যাপ্টেন সুপারিনটেনডেন্ট এই পথ ধরে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখে গেলেন সেই পাহাড়টা সমুদ্রের উপর ধীরে ধীরে জাগছে। সবুজ শ্যামল প্রলেপ পড়ছে প্রবাল দ্বীপে। তিনি সেই মৃত জাহাজীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পাহাড়ের উপর বেদী গড়লেন। একটি কাঠের ক্রস প্রতিষ্ঠা করলেন। ঝড়ের দরিয়ায় নির্ঝরের বাণী আহ্বান করলেন। আজও তাই কোন জাহাজী যখন এই পথ ধরে যায় তখন এই দ্বীপটির কাছে এসে সকলে হাত তুলে প্রার্থনা করে। প্রভু, জাহাজ আর জাহাজীদের শান্তি দাও।

জাহাজীরা সকলেই মিনিটকাল মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর যে যার মত কাজে চলে গেল।

একমাত্র মোবারক ডেক ছেড়ে অন্যত্র গেল না।

শেখর নীচে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করে ডাকল, এবার চল।

মোবারক ডেক থেকে নেমে যাওয়ার সময় শেখরকে শুধু একটি প্রশ্ন করলে, সমুদ্র পাখীগুলো দ্বীপটিকে কেন্দ্র করে উড়ে উড়ে কাঁদছে কি আনন্দ করছে?

বিরক্ত হয়ে শেখর জবাব দিলে, কি করে বলব!

নাবিক হও, কিন্তু চরিত্র মন্দ করতে পারবা না। জৈনবের কসম।

কথাগুলি বড় বড় হরফে স্ক্রেপার করা বালকেডের উপর চক দিয়ে লিখল মোবারক।

'নাবিক হও কিন্তু চরিত্র মন্দ করতে পারবা না'—পড়ে পড়ে সে হাসল।

সব বেইমান। বাপজী আম্মাজান। বেইমান জৈনব খাতুন।

চোখ ঢাকল মোবারক। দুটো হাত বাড়িয়ে বাংকের কাছে এন। বললে, দেখতো শেখর হাত দুটো আমার কোনদিন বেইমানী করেছে কিনা। বেইমানীর কোন চিহ্ন আছে কিনা।

শেখর বিস্মিত হল না। জাহাজের সব জাহাজীদের মত সেও বুঝি জেনে নিয়েছে মোবারক উন্মাদ। লিলিকে ছেড়ে এসে আরো উন্মাদ হয়ে গেল। কিন্তু সে অন্যান্য জাহাজীদের মত তাকে বিদ্রুপ করে না। সে চায় মোবারক স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। সে যদি ঘুমোত।

শেখর আহত হাত দুটো নিয়েই উঠল কোনরকমে। মোবারকের হাত টেনে বললে, আয় ঘুমোবি। অমন বিড়বিড় করে আর বকিস না। স্বাভাবিক ভাবে দুটো কথা বল। ঘুমো। লিলিকে ভুলে যা, দেখবি মনটা অনেক হাল্কা হবে। আমার হাত দুটোর দিকে চা। দেখ এর কত যন্ত্রণা! দয়া হয় না তোর। তার উপর তুই যদি দিন-দিন এমন অস্বাভাবিক হয়ে উঠিস তবে জাহাজে দিন আমার কি করে কাটে বল তো?

মোবারক চুপ করে থাকল। শেখর হাত টেনে আবার বলল, বালকেডের উপর ও কথাগুলো লিখলি কেন?

জৈনবের কসমের কথা মনে পড়ল তাই লিখলাম। নাবিক হও কিন্তু চরিত্র মন্দ করতে পারবা না—জৈনব হরিতকী গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কসম দিয়েছিল। বলে কেমন পাগলের মত আবার হেসে উঠল মোবারক।

কি দেখছে মোবারক পোর্টহোল দিয়ে! শেখর বিস্মিত হল! গলা বাড়াল ঘুলঘুলিতে। সন্তর্পণে দেখল সে পাহাড়টা। আবছা একটুকরো মেঘের মত এখনও আকাশ কিনারায় ভেসে আছে। কাঠের ক্রসটা কখন আড়াল পড়েছে পাহাড়ের।

শেখর কাচটা দিয়ে প্রথম ঘুলঘুলিটা বন্ধ করে দিল। লোহার চাকতিটা দিয়ে ঢেকে দিল কাচটা। বুকের উপর একটি আহত হাত ঝুলিয়ে সে এল তারপর মোবারকের কাছে। বললে, কারো বাপ বুঝি আর জাহাজ ডুবিতে মরে না?

মোবারক চাইল শেখরের প্রতি। দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। কাচ দিয়ে ঘুলঘুলি বন্ধ করলেই কি আর বন্ধ হয়! শেখর কি ভেবেছে লোহার পাত দিয়ে মনের উৎপাতগুলিকে বন্ধ করে দেবে! ঘুম যে আসে না—গুণাহ যে হাজার গুণাহ, বাংকের পরতে পরতে যে সাপের অনেক ছোবল—শংখচূড়টা জৈনবের ভালবাসার জীবন্ত ফসিল সেগুলিও কি শেখর একটা ভংগুর কাচ দিয়ে চেপে দিতে চায়! আর বলতে চায়, ওসব কিছু না। ওসব তোর অনর্থক এবং অহেতুক মনের জট।

এই অনর্থক এবং অহেতুক মনের জটগুলি সে ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে বহুবার। কিন্তু বার বার তার অক্ষমতাই প্রকাশ পেয়েছে। চেষ্টার সংগে জটের বন্ধন বেড়েছে। অনুতাপ অনুশোচনায় বার বার জ্বলে-পুড়ে খাক হয়েছে বুকটা।

লিলির বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার পর অনুশোচনা হাজার গুণে বেড়েছে। জাহাজের সকলকে সে অবিশ্বাস করতে সুরু করেছে।

আর শেখরটা যেন কেমন। কেবল যখন তখন বলে, ঘুমো ঘুমো। কিন্তু সে ঘুমোতে পারছে কৈ। দুঃখ যে তার অনেক।

শেষ পর্যন্ত কম্বল টেনে শুয়ে পড়ল মোবারক। প্রতিদিনের মত কনুইটা রাখল চোখের উপর। বাংকের নীচে শীতে শংখচূড়টা নিশ্চয়ই লজ্জায় কুন্ডলী পাকিয়ে আছে।—লাজ আছে তবে জৈনবের। লজ্জাবতী আমার! আম্মাজানের মতই তুই বেইমান।

আম্মাজান তখন অনেক ফারাকে। জৈনব তুই খিল খিল করে হেসেছিলি হরিতকী গাছের নীচে। মনে তোর আগুন। যে আগুনটা কুদরত মিঞার কপালে শেষ কাঠালে একটা হেই করে ছেঁকা দিয়েছিল।

হঠাৎ পাশের বাংকটাকে উদ্দেশ্য করে বললে মোবারক, সাপে কাটা মড়া দেখেছিস শেখর?

পাশের বাংকটা যেন বিরক্ত হল। উত্তর করলে, না।

—সাপের ছোবল খেয়েছিস?

—না।

—মেয়ে মানুষের ছোবল?

শেখর ধমক দিল মোবারক। এসব কি হচ্ছে শুনি। এর নাম ঘুম! এ ভাবে মানুষ ঘুমোয়! কত আর জ্বালাবি বলত? অহেতুক মনের জট নিয়ে নিজে জ্বলছিস, আমাকে জ্বালাচ্ছিস। এ কি তোর উচিত হল? এত করে বলি ঘুমোতে

আর তুই কম্বলের নীচে থেকে বলছিস, মেয়ে মানুষের ছোবল আমি খেয়েছি কিনা!

এক অব্যক্ত যন্ত্রণা মোবারকের মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এক নিদারুণ উত্তাপ ওর মনের প্রকাশ করার আগ্রহকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। শেখর কেমন হৃদয়হীন। নাবিক বংশের ইতিহাস শুনতে সে কেমন বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু প্রকাশের আগ্রহটা যখন একান্ত ওকে উন্মাদ করে তোলে তখন খাপছাড়াভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে ধমক খায় শেখরের, আর বাজে বকিস না। দুটো পায়ে পড়ি এবার। ঘুমো, ঘুমো বলে—বালকেডের উপর কি কতকগুলো আঙুল দিয়ে আঁকাবাঁকা রেখা টানে। রেখাগুলো যেন আর কটা দিন আছে সফর শেষে ঘরে ফেরার হিসেব।

মোবারক বেহায়ার মত আবার বললে, এমন করে আমার বাপজীও দাগ টানতেন। হিসেব করতেন আর কতদিন বাকী কর্ণফুলির বাঁওড়ে নৌকা বাঁধার।

শেখর কোনই উত্তর করল না। মুখ ফেরাল মাত্র।

দুটো আরশোলা লকারটার নীচ থেকে বের হল এবং শঙ্খচূড়টা যে ব্যাগের ভিতর আছে তার ভিতর ঢুকে গেল।

—তাহলে তুই ঘুমোবি না প্রতিজ্ঞা করেছিস?

—ঘুম পেলে ঘুমোব। ছোবল তবে তুই মেয়ে মানুষের খাস নি? কথাটার বাঁক ঘুরাল এবার।

শেখর বিরক্ত হল এবারও। বাংকের উপর সে উঠে বসল—এমন করবি তো ফোকসাল থেকে বের হয়ে যাব বলছি।

—বের হবি? কেন? আমি উন্মাদের মত কথা বলছি! আকবর ইদ্রিশ তো আজ মুখের উপরই এ কথা বললে। দুনম্বর বয়লারটায় তখন কয়লা মারছিলাম তাই রক্ষে। ছাপোষা মানুষ, তার আবার এত সাহস।

—ওরা ঠিক বলেছে। দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল শেখর। না ঘুমিয়ে সারাদিন ধরে বিড় বিড় করলে ওরা বলবেই। ঘুমো—আগের মত চুপচাপ থাক, দেখি কার কত বুকের পাটা।

ওরা ঠিক বলেছে—মোবারক উন্মাদ। কথাগুলো কবার করে মোবারক মনে মনে আওড়াল। শেষে সে শেখরের বাংকের পাশে দাঁড়াল। বললে, তুই অসুস্থ। বেশী ওঠাবসা করিস না। শুয়ে পড়। শেখরের আহত হাতটা বুকে নিয়ে আবার বললে মোবারক, আমি উন্মাদ নই। তবে তোর যখন ঘুম আসে না তখন ডেকে যাই আমি বরং।

নুয়ে নুয়ে চৌকাঠ অতিক্রম করার চেষ্টা করল মোবারক। ডেকে ওঠে যাওয়ার জন্য স্টোর-রুমের পাশে এসে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে দেখল একবার শেখরকে। বোবা চোখ দুটো ওর এতটুকু নড়ছে না। অপলক। স্থির। সে পা বাড়াল তবু।

শেখরের সকরুণ কণ্ঠ শুনল সে আবার, উপরে যাসনে। ফিরে আয়। চারটে না বাজতেই আবার পরী। শুয়ে ঘুমো। আমার কথা রাখ। তুই ঘুমুলে আমি সত্যি খুব সুখী হব।

সুখী হবে! সুখী হওয়ার মত এমন কি সম্পর্ক আমার সঙ্গে! যারা সুখী হতে পারত তারা সুখী হয় নি। ইচ্ছে করে হয় নি। অন্য পথ ধরে তারা চলে গেল। মবুর কথা তখন তারা ভাবে নি। শামীনগড়ের সড়ক, মাটি, হরিতকী গাছ, পলাশের লাল ফুল, মৌরী পাহাড়ের লালচে ঘাস পর্যন্ত ব্যথায় বিমর্ষ হয়েছিল সেদিন। অন্ধকার রাত। সে সময় সড়ক থেকে মাঠে এসে নামছে মোবারক।

—কে! কে ডাকছে?

—সারেং ডাকছে।

—কেন এমন সময় সারেং ডাকল!

—তা আমি কি করে বলব? ইদ্রিশ কথাগুলোর জবাব দিল উদাসীন ভাবে যেন সে কোন খবর রাখে না।

মোবারককে আর নামতে হল না নীচে। সারেং তখন উঠে আসছে। সকলের সামনে সে মোবারককে অপমান করল। অন্য কোন জাহাজীকে উদ্দেশ্য করে যেন বলছে, দুনম্বর বয়লারে স্টীম ওঠে নি। কেবল শাবলের পর শাবলই হাকড়ে গেছে। না একবার শ্লাইস, না একবার র‍্যাগ! পাগলামী করতে হয় দেশে ফিরে যেন করে। পাগলামী করার জায়গা এ জাহাজ নয়। বেশী উৎপাত করলে বাড়ীওয়ালার কাছে নালিশ যাবে।

অবাক হল মোবারক। চোখগুলো টাটাল। ফ্যাল করে চেয়ে থাকতে থাকতে চীৎকার করে উঠল, সারেং সাব আমি পাগল! আপনিও আমায় পাগল বললেন। তারপর লজ্জায় আর কোন দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না। আস্তে আস্তে ডেকপথ অতিক্রম করে সে বোট-ডেকে ওঠে গেল এবং মাথাটা দু হাঁটুতে গুঁজে বসে পড়ল তিন নম্বর বোটের পাশে।

বুক বেয়ে উঠে এল এবার। জোর করে হাসিটা সে চেপে রেখেছে এতক্ষণ। বেশী জোর করতে গিয়ে চোখ থেকে জল পড়ল। জল মুছল জামার আস্তিনে। চোখ তুলে তাকাল সে দূর থেকে দূরে— ,

একটি য়্যালবাট্রস নীল আকাশ থেকে ঝুপ করে পড়ে নীল নোনা জলের গভীরে হারিয়ে গেল।

য়্যালবাট্রসের অন্য দলটা হাওয়ার উপর দুলে দুলে পাহাড়টার দিকে ছুটছে। পুরানো য়্যালবাট্রসটা তখন বসে আছে কাঠের ক্রসটার উপর। চিং-হি চিং-হি করে কাঁদছে। সে কান্নার মানে একটি মাত্র নাবিক বুঝি জানে। জাহাজে বসে সে বুঝি এখনও দেখছে– নীল অসীম আকাশ আর অনন্ত দরিয়ায় সেই কান্নার মানে ঢিবি অতিক্রম করে—দূরে, অনেক দূরে, সেই চট্টগ্রামের এক পাহাড় অলিন্দের সড়ক ধরে হাঁটছে। মাথায় তার ঝুড়ি। গাওয়াল করতে বের হয়েছে। কাঞ্চন গাছের নীচে প্রতীক্ষায় উন্মনা দুটো চোখ। সে চোখ আম্মাজানের। পান সুপুরী বিক্রি করতে ভাবির কাছে আসছেন রসীদ চাচা। কাঞ্চনের ডালে আম্মাজান প্রতীক্ষায় ঝুকে আছেন।

ঝুমুনিয়া বিল থেকে ফিরছে মবু। হাতে তার এক জোড়া বালিহাস। কল্কা পেতে ধরে এনেছে। কাঞ্চনগাছটা পর্যন্ত এসেছে অন্যমনস্ক ভাবে। জৈনবের ডাগর ডাগর দুটো চোখ, পরিমিত বিস্ময় চোখে। ভাবছে সে চোখ দুটোর কথা। ভাবছে, বালিহাসের জোড়া চোখের উপর তুলে ধরবে। বলবে, দেখ কি ধরে আনলাম। তোর বাপজীর চাইতে কম আমায় করিতকম্মা ভাবিস না। তোর বাপজী ধরে আনে সাপ, ঝুমুনিয়া বিল থেকে আমি ধরে আনি ডাহুক আর হাস। কিন্তু এবার সে থমকে দাঁড়াল। আম্মাজান এখানে একা! কাঞ্চনফুলের ডালটার উপর থুতনি! কি দেখছেন এত সড়ক ধরে!

মবু পিছন থেকে ডাকল, আম্মা তুই এখানে।

থতমত খেলেন যেন আম্মাজান। গলায় সহজ সুর আম্মাজানের। তুই কোথায়

যাস বলতো। তারপর আবার সড়ক ধরে চাইলেন, বললেন, ওটা কে আসছে রে?

—রসীদ চাচা।

—আসছে যখন ডাকবি, বলবি ভিতরে বসতে। পানসুপুরী দুইই রাখব। বলে তিনি ধীরে ধীরে আতাবেড়ার ওপাশটায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পথের উপর ছায়া ফেলে মানুষটা সড়ক ধরে তেঁতুল গাছের নীচে উঠে এল। ছায়াটা এখানে এসে ছায়ার সংগে মিশে গেল। তারপর ক্রমশ পা পা করে উঠোনের উপর যেয়ে হাঁকল, চাই পান সুপুরী। ভাবি এলাম গো। তোকে না দেখলে মনটা আমার ভেজে না। সোবান আল্লা, ওরে মবু বিলের খেতের নাড়া তোদের একটাও নেই। বাড়ীতে থাকিস নিজের জমি-জায়গাগুলোও একবার দেখেশুনে রাখতে পারিস না।

ভাবি আতাবেড়ার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে বললে, আর ওর কথা বলবেন না মিঞা। সারাদিন কোথায় থাকে, কি করে ওই জানে। চারগন্ডা পান দিন, দুগন্ডা সুপুরী। কাল চুন লাগবে খয়ের লাগবে' কাল আবার আসবেন।

কত কাল এলেন রসীদ চাচা! কত কাল তিনি আম্মাজানকে পানসুপুরী দিলেন। খয়ের চুন দিলেন।

হিজল পাহাড়ের মাথায় কতবার চাঁদ উঠল—কতবার নিভে গেল। জাফরাণী রংএর ছায়া হরিতকী গাছের নীচে কতবার নেমে কতবার হারিয়ে গেল। দুটো ছায়া কন্ঠে কন্ঠে মিলিয়ে তখন। ফিস ফিস করে অনেক কথাবার্তা। কত অহেতুক আর অনর্থক কথা কেবল বলছে আর বলছে।

এমন করে কতদিন। এমন করে কতকাল।

চাঁদ আর চাঁদনী রাত। ফুল আর ফুলের সমারোহ। ধানের শীষের মত দুটো পাখী হাওয়ার উপর জীবনের অনেক প্রাচুর্য নিয়ে দোল খেয়েছে এ ভাবে।

কিন্তু একদিন। নীরব তখন হরিতকী গাছের ছায়াটা। খিল খিল হাসিতে ওপাশের জংগলটা কেঁপে উঠল।

আর একদিন। হরিতকী গাছটা ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদ নেই সেদিন হিজল পাহাড়ে। অনেকক্ষণ হল অন্ধকার হয়েছে হিজলের জংগল। তারি ছায়া-অন্ধকারে অস্পষ্ট আলোয় দেখেছিল জৈনবের মুখ মবু। মুখের উপর কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়েছে।

ফিস ফিস কন্ঠে প্রশ্ন, তুমি কি পাগল মাতব্বর মিঞা। মিঞা তুমি এটা বোঝ না রসীদ চাচার সংগে আম্মাজানের কি সম্পর্ক। চোখের উপর দেখেও চুপ।

মবু সে তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে জৈনবের মুখ চেপে ধরেছিল সেদিন। বলেছিল, চুপ চুপ। গুণাহ হবে, অমন কথা বলিস না।

হরিতকী গাছটায় ঠেস দিয়ে তবু জৈনব বলতে ছাড়ল না, মিঞা তুমি আমার মুখ চেপে ধরতে পার। কিন্তু শামীনগড়ের মুখে মাটির চাপ দিবে কি করে!

মবুর চোখদুটো কুঞ্চিত হল। কাছে টেনে নিল জৈনবকে। একটা হাত উপরের দিকে ছুড়ে বললে, কে আছে এমন? শামীনগড়ে কার এত হিম্মত আছে? বলতে হয় সামনে দাঁড়িয়ে বলুক চুপি চুপি বলবে কেন? তারপর ধীরে ধীরে কেমন উদাসীনের মত বলল মবু, বাপজী একটা করে খুন করে খোদা হাফেজ বলেছে। আমি শামীনগড়ের হাজার মানুষ খুন করেও যেমন মবু তেমনি থাকব। আম্মাজানের মুখের উপর কুৎসিত কলংক লেপ্টে দিলে বাপজীর বেটা তা সহ্য করবে কেন!

রসীদ চাচা আর আম্মাজান। কোথায় আর কি! কলঙ্ক! কুৎসিত কলঙ্ক। ভিখারীর মত দেখতে লোকটা, একপাল কাচ্চা বাচ্চা ঘরে। বিবি খন খন করে কথা কয়। পান সুপুরীর সঙ্গে আম্মাজানের সম্পর্ক। দেহ ও মনের সঙ্গে সম্পর্ক শামীনগড়ের মাটি কসম খেয়ে বলুক।

ভীষণ গরম। এলোমেলো কতকগুলি চিন্তা। টুকরোটুকরো গরমের হাওয়া। কামরঙা গাছটা শির শির করে কাঁপছে। ঘরের ভিতরে আম্মাজান। দুটো তক্তপোশ দুপাশে। সেই তক্তপোশ থেকে রাতের এক ফাঁকে নেমে এসেছে মবু। জৈনবের ঠাণ্ডা দেহটার উত্তাপ নিচ্ছে তখন।

হরিতকী গাছটা অতিক্রম করলে দুটো কাঁঠালী চাঁপার গাছ। দক্ষিণের হাওয়া বইছে। অনেক চাঁপা ঝরছে মাটিতে। অন্য রাতে সেগুলো জৈনব তুলে আনে। মবুর দুহাতে গুজে দেয়। কিন্তু আজ কেউ নড়ে দাঁড়াল না। চুপচাপ। কোথায় যেন দুটো জীবনকে কেন্দ্র করে একটি ঝড়ের অঙ্কুর, একটি ব্যর্থতার অন্ধকার ধীরে ধীরে জন্মলাভ করছে।

জৈনব গলায় অদ্ভুত রকমের শব্দ করল একটা। গলাটা টিপে ধরলে যেমন শব্দ হয় তেমনি। খক খক করে কাসল। কাসতে কাসতে বললে, তোমার মনে কষ্ট দিলাম, কিন্তু কি কবব। শামীনগড়ের বুকে বেঁচে থাকার জন্যই এ কথা বলছি। রসীদ চাচাকে তোমার বাড়ীতে আসতে বারণ করে দিও। নইলে সাদী সম্বন্ধে বাপজী অমত করবেন।

তাই হবে জৈনব। তোর কথাই থাকবে। মন্ত্রমুগ্ধের মত কথাটাকে সায় দিল মবু। এবার জৈনবকে ছেড়ে আরো পুবেব দিকে সরে দাঁড়াল। কাঁঠালী চাপা গাছটার নীচে অন্যমনস্ক ভাবে হেঁটে গেল। বারান্দায় উঠে দরজা খুলল অত্যন্ত সন্তর্পণে। আম্মার বিছানার পাশে দাঁড়াল। কুকুরেব মত ঘ্রাণ নিল আম্মার দেহ থেকে। নিজের গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে হল এবার। এত অবিশ্বাস!

আম্মাজানের মুখে এত প্রশান্তি। এত কালের এত ব্যর্থতা শেষ পর্যন্ত এমন প্রশান্তি টেনে দিয়েছে মুখের উপর। কোন মালিন্য নেই—কোন কলঙ্ক নেই। তবু শামীনগড়ের মানুষেরা অসহায় মোবারককে, অসহায় আম্মাকে কোন এক ঘুলঘুলির জীবনে ঠেলে দিতে চায়। এত নিমকহারাম এই মাটি আর জল।

এই জল আর মাটি। কত আরাম আর বিরামের সুখস্বপ্ন এখানে। কত বিনিদ্র রাতে কত গল্প গড়ে উঠেছে। আম্মাজানের গল্প। পূর্ব-পুরুষের অনেক ইতিহাস উনুনের পাড়ে আম্মাজান মবুর সংলগ্ন হয়ে বলেছেন। দুটো জীবন অনেক ব্যর্থতার ভিতরও অনেক মসগুল ছিল।

রসীদ চাচা আর আম্মাজান। অবিশ্বাস আর কলঙ্ক। এই কথাগুলো মবু জৈনবের কাছেই নয় আরো কোথাও কোন পথচলা ইতিহাসের ইঙ্গিতে, কোন এক উপলব্ধির জগতে, যেন সে শুনতে পেয়েছে। তাই সে ফিরে গেল নিজের তক্তপোশে। বালিস টেনে মুখ গুঁজে দিল।

ভোরবেলা আম্মা প্রতিদিনের মত ডাকলেন উঠোন থেকে, ওরে মবু ওঠ। কত আর ঘুমোবি। সকাল কি তোর আর হয় না! মুন্সীপাড়ার ছেলেরা কখন মাঠে চলে গেছে। উঠে একবার মাঠে যা।

মবু সেদিন এ খাট থেকে ও খাট করে নি। খাট বদলে ঘুম যেতে চায় নি। সোজা উঠে এসে বাঁশ থেকে লুঙ্গী টেনেছে। কাপড় পাল্টে উঠোনে নেমেছে। তারপর

কামরাঙা গাছটার প্রতি দৃষ্টি তুলে অন্য কোন এক আসমানের কথা চিন্তা করেছে।

আম্মাজান পিছনে দাঁড়িয়ে হাত বুলিয়ে দিলেন মবুর পিঠে। বললেন, যা হাত মুখ ধুয়ে আয়। পান্তা খেয়ে মাঠে যা। গিয়ে দেখ লোকগুলি কাজ করছে কিনা। জমি-জিরাতগুলো তুই না দেখলে কে দেখবে বল। মবুর সামনে এলেন তিনি, কি রে চোখগুলি এমন লাল কেন? গোটারাত ধরে ঘুমুস নি বুঝি।

মবু উত্তর করলে না। কামরাঙা গাছ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে এনে আম্মাজানকে দেখল শুধু। তারপর চোখ দুটো মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দিল।

আম্মাজান আবার প্রশ্ন করলেন, তুই আজকাল এমন অন্যমনস্ক থাকিস কেন রে। তেমন করে আমার সঙ্গে কথা বলিস না। ডাকলে সাড়া দিস না—কি হয়েছে তোর? আমি কি করেছি বলতো! আমার আর কে আছে তুই ছাড়া! আম্মাজান উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে আরো বলেছিলেন, ধান উঠুক, জৈনবের সঙ্গে সাদী এ সালেই দেব।

মনের জমাট বাঁধা অন্ধকারগুলো চিরে সেই সকালে মবু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছিল। এ যে সাদী সম্বন্ধের কথা নয়। বলেছিল, কি যে বলিস আম্মা আমি কি তোর সেই বেটা। সাদির জন্য পাগল হবে তোর মবু!

তবে কি হয়েছে খুলে বল। এমন চুপচাপ থাকলে আমার বড় ভয় হয়। সফরে যাওয়ার আগে তোর বাপজীও এমন হয়ে থাকতেন। আম্মাজানের কণ্ঠে অনেক অসহায়ের জিজ্ঞাসা সেদিন।

—না না তেমন কিছু নয়। সহজ প্রশ্নটিকে আড়াল করে বললে মবু, বাপ দাদা সাতপুরুষ নাবিক ছিল। আমার খুনে তো তারি ডাক আম্মা। তাই খুন যখন মোচড় দিয়ে ওঠে তখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। কিছু ভাবিস না আম্মা। দুদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। কসম যখন খেয়েছি তখন শামীনগড়ের মানুষ হয়েই বাঁচব!

- আচ্ছা আম্মা...' কি বলতে গিয়ে মবু এবার একেবারেই থেমে গেল আর বললে না কিছু। আম্মাজান প্রতীক্ষা করলেন অনেকক্ষণ। বেটা তার বলবে কিছু। কিন্তু মবু আর মাটি থেকে চোখ সরালো না। উঠোনের উপর দুজন পরস্পরের প্রতি এক নিদারুণ অবিশ্বাসের জন্ম চিহ্ন নিয়ে নির্বাক থাকল।

আম্মাজান মবুর হাত ধরে টানলেন। এমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে সত্যি ভয় হয় মবু। তুইও কি শেষ পর্যন্ত বাপের মত হবি? যা, দুটো পান্তা খেয়ে মাঠে যা। ধানগুলো দেখেশুনে তোল। দেশের যে অবস্থা কখন অকাল আসবে সে ভয়েই মরি।

মবু গিয়েছিল মাঠে। জমি জিরাত দেখার পরিবর্তে মনের ভিতর অবিশ্বাসের চিহ্নগুলোকে বার বার অনুসন্ধান করেছিল যদি সেখানে কোথাও আম্মাজানকে অন্য মেয়ে মানুষের মত বিচার করা যায়।

কিন্তু...!

কিন্তু যে অনেক।

অনেকগুলো কিন্তুই মবুর মনের ভিতর পাক খেতে থাকল। শামীনগড়ের মানুষেরা তাই তার সঙ্গে প্রাণ খুলে আর হাসি মসকরা করতে সাহস করল না। কোথায় একটি কিন্তু ধরবে মবু সেই ভয়ে তারা, যেন তাকে এড়িয়ে চলল।

মাঠে গিয়ে অস্থির এবং অসুস্থ দুইই হয়ে উঠল মন। অসময়ে বাড়ী ফেরার জন্য মন মেজাজ বেজায় তাগাদা দিল। বাড়ী ফিরল সেজন্য। উঠোনের উপর পা দিয়ে অনুভব করল আতাবেড়াটা কথা বলছে। ও পাশটায় উচ্চকিত হাসি।

আম্মাজান আর রসীদ চাচা প্রাণ খুলে হাসছেন। অসুস্থ মনটা আরো অসুস্থ হয়ে উঠল। সে উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে হাঁকল, কে ওখানটায় কে এমন করে হাসছে!

আতাবেড়ার পাশ থেকে আম্মাজান সহজ ভাবে বললেন, তোর রসীদ চাচারে মবু। আয় আয়। এত সকাল সকাল মাঠ থেকে ফিরলি আজ।

মবু উঠোন থেকে সোজা উঠে গেল টিনকাঠের ঘরটায়। ক্লান্ত দেহ আর মন নিয়ে এলিয়ে পড়ল তক্তপোশের উপর। মনের ভিতর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না—এ কি করলাম। আম্মাজানকে এমন কুৎসিত গালমন্দ দিলাম! খোদা একি সত্যি—আম্মাজান রসীদ চাচাকে নিকাহ্ করতে চান!

ঘরের ভিতর থেকে সে স্পষ্ট শুনল। রসীদ চাচা আম্মাজানকে ফিস ফিস করে বলছেন, ভাবি বিপদে আপদে কিন্তু ডাকিস। তারপর ঝুড়ি মাথায় গ্রামান্তরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

বিপদ! কিসের বিপদ! মবুর মত এমন যোয়ান বেটা থাকতে আম্মাজানের কি বিপদ। তা হলে রসীদ চাচা কি বলতে চায়, কি ভাবতে চায়।

আম্মাজান ঘরে ঢুকল। তক্তপোশ থেকে উঠে বসল মবু। বাঁ হাতটা ভর করল তক্তপোশের এক পাশে। পা দুটো নীচের মেঝেটা যেন স্পর্শ করতে পারছে না। আরো কাছে এলে মবু হঠাৎ প্রশ্ন করল, কিসের বিপদ আম্মা?

—আমার আবার বিপদ কিসের?

—এইমাত্র রসীদ চাচা যে বলে গেলেন।

আম্মাজান আবার হাসলেন। অত্যন্ত সরল সহজ হাসি। বললেন, এমনি কথার কথা। তোর চাচা বললে, ভাবি বিপদে আপদে ডাকিস। ভাইয়া থাকলেও আজ আর আমায় এ কথা বলতে হত না। আল্লার কাজ আল্লা করেছেন। কিন্তু আল্লার এ দুচোখ থাকতে তো তোদের দেখাশোনা না করে পারি না। দশজনে দশকথা বললেই কি আর শুনব।

—দশজনের দশকথা তিনি শুনবেন না কেন?

সেই কথায় আম্মাজানের মুখ থম থম মেঘের মত ভারি হয়ে গেল। মবুর মুখের দিকে চেয়ে তিনি কি যেন অনুসন্ধান করলেন। কাঠের প্রজ্বলিত আগুনে যে মুখটা রক্তাভ হয়ে উঠত নাবিক বংশের ইতিহাস শুনতে শুনতে, এই মুখ সেই মুখ কিনা, আম্মাজানের পায়ে পায়ে যে আলি ঘুর ঘুর করত সেই মোবারক কিনা তিনি যেন তাই হাতড়ে বেড়ালেন। তারপর যেমন সংলগ্ন হয়ে দুজন দুজনকে গল্প বলতেন তেমনি সংলগ্ন হয়ে বসলেন আম্মাজান মোবারকের পাশে। অত্যন্ত নরম কণ্ঠে শোনালেন তাকে, রসীদ তোর চাচা হয়।

আর কোন কথা হল না। মবুর মন এমন উৎক্ষিপ্ত কেন, ঝড়ো বাতাসের মত মাঝে মাঝে এমন চড়াসুরে চীৎকার করছে কেন, অন্যমনস্ক হয়ে কি আকাশ পাতাল ভাবে—আম্মাজান সব কিছুরই ঢেঁড়া টানতে গিয়ে তিনি নিজেই যেন তার তলায় পড়ে পিষে যাচ্ছেন।

'রসীদ তোর চাচা হয়', এ কথার ভিতর কতটা দৃঢ়তা আছে মবু অনুভব করতে পেরে তখুনি ছুটল শামীনগড়ের পথ ধরে। আম্মাজান পাঁজদোয়ার দিয়ে ভিতর বাড়ীর উঠোনে নামার সময় দরজায় ঠেস দিয়ে ডাকলেন, ভর দুপুরে মবু যাস না, যাস না, আমার মাথা খাস! মবু ওরে তুই খাবি-দাবি না!

মবু তখন সকল শোনার বাইরে। সে শামীনগড়ের পথ ধরে-ধরে ছুটল। কোন

প্রশ্ন কিংবা কোন জবাব দিল না—সে শুধু ছুটছে। চোখ দুটো কেবল কি অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। অনেক দূরে নয়, মাঠের এক প্রান্তে একটি মেঠো পথ ধরে রসীদ তখন হন হন করে ছুটছে। মাথায় পানসুপুরীর ঝুড়িটা কাঁপছে যেন। রোদের তীব্র আঁচের ভিতর একটি সরু রেখা টেনে টেনে মবু কোন রকমে রসীদ মিঞার ঝাঁকাটা ধরে ফেলল। বলল, চাচা কোন দিন যদি শামীনগড়ের পথে দেখি তবে তোমার খুনে গোসল করব বলছি।

—মবু!

—রসীদ!

—ভাইয়া না থাকায় তুই এত বড় কথা বললি! আমি গরীব বলে তুই আমায় খুন করবি।

—গরীবের জন্য নয়, ইজ্জতের জন্য। বাপজীর বেটা যে এখনও বেঁচে আছে রসীদ।

তারপর দুজন নীরবে দুদিকে চলে গেল। যেন কিছুই হয় নি। সংসারের অনেকগুলি আবর্তনের ভিতর যেন আর একটি ঘূর্ণাবর্ত। উঠেই থেমে গেছে। যদি ওঠে আবার সেটা অন্য। সেটা নূতন করে উঠবে।

মবু মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াল অনেকক্ষণ। পাহাড়ের পীঠস্থানের পাশে সে কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে বসেছিল। তারপর সূর্যাস্তে সে যেন কোথায় কোন গ্রামে শুনতে পেল মসজিদে আজান। ডাহুকের ডাক, ঘুঘু পাখীর আর্তনাদে সে চমক খেল। এই পাহাড়ের নীচেই কখন সন্ধ্যা নেমে গেছে। ঘরে ফিরতে আজ অনেক দেরী। অনেক রাত হবে যখন সে শামীনগড়ে পৌঁছবে।

শামীনগড়ে পৌঁছে দেখল ঘরের দরজা খোলা। সন্তর্পণে আতাবেড়া অতিক্রম করে ভিতরের উঠোন ঢুকল। মিটি মিটি করে প্রদীপ জ্বলছে রান্নাঘরে। দরজার একটা পাট ভেজানো। রান্নাঘরে আম্মাজান জেগে রয়েছেন।

এক পাট দরজার উপর ভর করে উঁকি দিল মবু। ঘুম ঘুম চোখে আম্মাজান ঢুলছেন। সামনে একটা টিনের থালায় খাবার ঢাকা। হাতে লাঠি। ঘুম ঘুম চোখেও তিনি বেড়াল তাড়াচ্ছেন।

দরজা নড়ে উঠতেই আম্মাজান চোখ মেলে তাকালেন। বললেন, কে? মবু, এসেছিস মবু?

মবু অন্ধকারে চোরের মত দাঁড়িয়ে উত্তর করল, জি আম্মা!

—সারাদিন না খেয়ে না দেয়ে মাঠে-মাঠে ঘুরলি, এত রাত করে ঘরে ফিরলি? আমায় কষ্ট দিয়ে বুঝি তোর খুব ভাল লাগে।

মোবারক কোন উত্তর না করে খেতে বসল। থালাটা কাছে টেনে মুখ তুলে একবার আম্মার প্রতি তাকাল। তারপর খেতে খেতে হঠাৎ প্রশ্ন করল, কত পান সুপুরী লাগে আম্মা?

—কত আর লাগবে। তোর রসীদ চাচাকে এক কাঠা ধান দেই—রোজকার পান তিনি সেই থেকেই দিয়ে যান।

—কাল আমি হাটে যাব ভাবছি। পান সুপুরী হাট থেকেই আনব ভাবছি। চাচা তোকে সরল মানুষ পেয়ে খুব ঠকাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে তো জানে না আম্মা, আমার মত বেটা তোর ঘরে আছে। জানলে নিশ্চয়ই এতটা ঠকাবার সাহস করত না।

—কিন্তু ভোরে তোর রসীদ চাচা এলে কি বলব?

—বলবি অনেকদিন সে ঠকিয়েছে, এখন থেকে তুই আর ঠকতে নারাজ।

—এমন কথা মানুষ মানুষকে বলতে পারে? তুই বলতে পারতিস? আম্মাজান এই প্রথম মবুর কাছে অসহায় বোধ করতে থাকলেন। মবু বড় হয়ে গেছে। বাপজীর মত মোটা গলায় আজ সেও শাসন করতে শিখেছে।

মোবারকের কথাগুলোর ভিতর কোথায় যেন এক বেসুরো আওয়াজ পেলেন আম্মাজান। ভেবে ভেবে অনেকক্ষণ নীরব থাকলেন তিনি। চোখ দুটো ভারি হয়ে এল না—এমন কি বুকে কোন ব্যথা অনুভব করলেন না। তবু কেন জানি এক অসহ্য যন্ত্রণা। এবং জীবনের হাজারো ব্যর্থতার গ্লানিগুলো অপমান হয়ে আজ হৃদয়ে বাজল। তিনি আর একবারের জন্য মুখ তুলে বলতে পারলেন না, মোবারক তোর গলার সেই বেসুরো আওয়াজটা আতাবেড়ার এ পাশটায় একেবারে মিথ্যে। তিনি এসে দাঁড়ালেন জানালাটায়। যেখানটায় দুপাহাড় চিরে একটি ঝড়ের সংকেত শুনেছিলেন তিনি।

এক এক করে দুদিন গেল। রসীদ চাচা আর এলেন না। আম্মাজান সে সম্বন্ধে মোবারককে আর কোন প্রশ্নই করলেন না। এ বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক তার শিথিল হয়ে উঠেছে। বন্ধনের দৃঢ় গিঁটগুলো ফসকা গেরোর মত মনে হচ্ছে। এক্ষুনি খুলে পড়বে! যে কোন মুহূর্তে খুলে যেতে পারে।

মোবারকও কেমন আড়ালে আবডালে দিনগুলো কাটাচ্ছে। মায়ের সঙ্গে বসে গল্প আর জমাতে পারছে না। কোথায় যেন তার কুণ্ঠা। দিন-দিন কি করে যেন আম্মাজানের প্রতি এক ভয়ানক অপরাধে অপরাধী হয়ে উঠছে।

আম্মাজান তাই একদিন স্পষ্টই অনুভব করতে পারলেন শামীনগড়ে তিনি উচ্ছিষ্ট। শামীনগড়ের সমাজ তার প্রতি আরো বিরূপ হয়ে উঠেছে আর মোবারকও দিন দিন কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে। অন্যমনস্ক ভাব ওর এখনও কাটল না সে আম্মাজানের কাছে আর মুখ তুলে, কিংবা হেসে গল্প করছে না। কাজের কথা, জোত-জমির কথা বলছে না। চুপচাপ থাকে! অসময়ে খায়। কোনরকমে দিন গুজরান করছে। সে রাতে তিনি আবার জানালার ধারে দাঁড়ালেন। দুপাহাড়ের ফাকটাকে দেখলেন। আসমানে এক টুকরো কাস্তের মত চাঁদ। চাঁদে কালো কালো কলঙ্ক রেখা। জানালার দুগরাদে মুখ রেখে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন -আমি তবে খারাপ মেয়েমানুষ!

রাত গেল। ভোর হল। শামীনগড়ের জীবনে কোন ব্যতিক্রম ঘটল না। মাঠে যারা যাবে তারা সার বেঁধে চলে গেছে। গৃহাগত নাবিকেরা হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে গড়ের পথ ধরে হাটল। বিবি বধূরা ঘাট থেকে জল এনে ঘরে ফিরছে। বাসন ধুয়ে সারা ঘাট থেকে ঘরে গেল তারা শুধু বললে, মবুর মা-টা কি! লজ্জা-সরমের বালাই নেই। রসীদটা আসে আর ওর সঙ্গে যত বেঢঙে আলাপ।

মবু ঘুম থেকে উঠে চোখ রগড়াল। প্রতিদিনের মত আজও ঝুলানো বাঁশ থেকে লুঙি টানল। পরণের পোশাকটা বদলাল। উঠোনে নেমে নিমের ডালে দাঁতন করল। দেখল কামরাঙা গাছটা। গাছে ফুল এসেছে প্রচুর। তারপর কামরাঙা গাছের ফাঁক দিয়ে জাফরীকাটা আসমানের দিকে নজর দিয়ে ডাকলে, আম্মা।

কোন শব্দ নেই, জবাব নেই, আতাবেড়ার পাশ দিয়ে একটি নেড়ী কুকুর কি চাটতে চাটতে বের হয়ে গেল। উঠোন অতিক্রম করে কুকুরটা গেল পুকুরের দিকে।

মবু আবার ডাকল, আম্মা!

দুটো হুলো বেড়াল আতাবেড়ার উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ল মাটিতে। ম্যাও ম্যাঁও শব্দ তুলে ডাকল কিছুক্ষণ। তারপর ওরা গেল জৈনবদের বাড়ীর দিকে।

মোবারক অন্যমনস্ক ভাবেই এল পাঁজদোয়ারে। দাঁতন ফেলে মুখ ধোয়ার সময় ডাকল, আম্মা, আম্মা!

কোন উত্তর নেই, নেই, ঘাটে গেল বুঝি! কাঞ্চনের ডালটা ধরে আম্মা উন্মুখ হয়ে নেই তো! আতাবেড়াটা পর্যন্ত হেঁটে এসে দেখল সেখানেও তিনি নেই।

এবারে মবু ছুটে-ছুটে এল ঘাটে। চীৎকার করে ডাকল, আম্মা! আম্মা! আম্মা!

ঘাটের জল পরিষ্কার। দুটো পুঁঠি মাছ জলের নীচে চিত হয়ে ডন খাচ্ছে; নাচছে। গত রাতের মবু আর আম্মার উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। সে ছুটে ছুটে গেল আবার। আম্মা কোথায় যান না। এ বাড়ীতে আসা পর্যন্ত তিনি শামীনগড়ের কোন গড়ে একা পা বাড়ান না। জৈনবদের বাড়ীতে যাওয়ার সময় ডাকতেন মবুকে চল মবু।-- তিনি কোথায়, তিনি কোথায়!

ছুটে ছুটে মবু জৈনবদের বাড়ীতেও একবার গেল। খুব নিচু গলায় বললে, তোদের বাড়ী আম্মা, আম্মা এসেছেন?

বিস্ময়ে জৈনব বললে, কবে আসেন একা।

মোবারক হঠাৎ এবং এই প্রথম কেঁদে দিল নেঙটো ছেলের মত। বললে আম্মা বাড়ীতে নেই, ঘাটে নেই, কোথাও নেই। জৈনব আমি কি করব, কাকে বলব কোথায় খুঁজব।

জৈনবের চোখ দুটো বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠল, মবু কি বলছিস তুই। আম্মা নেই।

—না নেই। আম্মা আমার এক ডাকে সাড়া দেন। আজ কত ডাকলাম, কতবার কতভাবে-কিন্তু আম্মা তো সাড়া দিলেন না।

মবু এবার গাছে-গাছে দেখল। মাঠে-মাঠে খুঁজে বেড়াল। শামীনগড়ের প্রতি ঘাটের পাড়ে-পাড়ে আম্মাজানের পায়ের ছাপ দেখার চেষ্টা করল। ফিস ফিস করে প্রতি ঘাটকে বলল, বল তুই বেইমানী করিস নি। আম্মাকে বুকে টেনে নিস নি।

ঘাটের জলে মাছের আওয়াজ হল। আর কোন জবাব নেই।

হু হু করে উঠল মবুর মন—তিনি বুঝি কোথাও নেই, কোথাও নেই।

ঘরে ফিরে এল মবু। উঠোনের উপর একান্ত ছেলেমানুষের মত গড়িয়ে পড়ল। কাঁদল গড়াগড়ি দিয়ে। কেঁদে এক কথা প্রকাশ করল শুধু, আম্মা—আম্মা—আম্মা। শামীনগড়ের মানুষেরা সেই দেখে ফিস ফিস করতে করতে পথে নেমে গেল।

কামরাঙা গাছটায় যে সবুজ টিয়ার দল কামরাঙা খেতে এসেছিল তারা বিকেলের পড়ন্ত রোদে উড়ে-উড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। সন্ধ্যার ধূপছায়া অন্ধকার পার হয়ে গুটি-গুটি যখন এল রাত্রি, তখন মবু নিজেকে আরো একা-একা অনুভব করল —তখনই সে দাঁড়াল গিয়ে হরিতকী গাছটার ছায়ায়। জৈনবকে ডেকে বললে, আম্মাকে খুঁজতে বের হলাম।

কোথায় খুঁজবে?

—সব মেমানদের বাড়ী। রসীদ চাচার কাছে।

—আমি খবর পাব কি করে?

পাবি। খবর তোকে দেব।

মবু ছুটল গড় থেকে গড়ে। মাঠ থেকে মাঠে। পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ের ছায়ায়। গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে সে এল প্রথম রসীদ চাচার বাড়ী। চাচার ভাঙা কুড়েতে ঢুকে গিয়ে ডাকল, আম্মা এখানটায় এসেছিস? আম্মা! রসীদ চাচার ছোট ছোট ছেলেগুলো ডাক শুনে বের হয়ে এল। বললে, ভাইয়া তুই!

কেমন পাগলের মত শুধাল, তোর বাপজী কোথায় রে?

বাপজী ঘরে নেই। মাঠে গেছেন।

মাঠে গিয়ে মবু নাগাল পেল রসীদের। চীৎকার করে বলল, অ রসীদ মিঞা তোমার ঘরে আম্মা আছেন? বলো, ঠিক কথা বলো, নয়ত তোমার একদিন কি আমার একদিন।

রসীদ কাছাকাছি এসে বলল, কি বলছিস মবু! খবর কি তবে সত্যি- তোর আম্মা নিখোঁজ!

রসীদের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ মবুর চোখ দুটো মাটিতে নেমে এল। মাটির সঙ্গে মিশে গেল। ধীরে ধীরে বললে, এ কি সর্বনাশ করলাম আমি আমার!

—মবু আমি তো আর শামীনগড়ে যাই নি।

—না না চাচা—সব ভুল সব ভুল। কিন্তু তাই বলে আমার এমন সাজা! চাচা আমি কোথায় যাব? আর কোথায় খুঁজব?

—চল দেখা যাক বলে রসীদও ওর সঙ্গ নিল. তারপর অনেক দূর অনেক দূরত্বে।

অনেক খোঁজ। অনেক অনুসন্ধান।

মধুর মামার ঘর বটের-কান্দি। ঘুরতে ঘুরতে সেখানে মবু গেল। সব খুলে বলল। খবর দিল। মামা আর নানা বললেন, তোর সঙ্গে তোর আম্মা বেইমানী করেছে। মায় ঝিয়ে ঝগড়া হয়। বাপ বেটায় লাঠালাঠি হয়। তাই বলে রাতের অন্ধকারে ভেগে পড়া বেইমানী ছাড়া আর কি!

মামা বললেন, তোর ঐখানটায় কেউ নেই' কে তোকে দেখবে। এখন থেকে এখানটায় থাকবি।

মবু চুপ। কিছু বলল না। তবু কি দেখি-দেখি করে কতদিন এ দেশটায় কেটে গেল। বাড়ী তার আগলাচ্ছে জৈনব। জৈনব খাতুন।

কত আর আগলাবে। কতদিন আগলাবে। জৈনব তো উন্মুখ। কত প্রতীক্ষার রাত হয়ত হরিতকী গাছটার নীচে কাটছে। এবার তাই যেতে হয়। এবার শেষ ফয়সালা করতে হয়। শামীনগড় আজ আবার তাকে ডাকছে। জৈনব তার আকর্ষণ। শামীনগড়ে বেঁচে থাকার একমাত্র উপকরণ। আম্মাজানের কাছে মোবারকের কসম—আজ সবটাই নির্ভর করছে জৈনবের উপর।

শামীনগড়ে যখন ফিরে এল মবু তখন আর এক অন্ধকার নেমেছে মসজিদের উপর। একটা কাক সে রাতের অন্ধকারে মসজিদের উপর পড়ে চীৎকার করছে। অন্ধকারে মবুর শরীরটা-কণ্টকিত হয়ে উঠল। অনেক দূর থেকে সে হেঁটে এসেছে, শরীর ক্লান্ত। সমস্ত দিনের উপবাসে সে আর ভালভাবে পা ফেলতে পারছে না। শামীনগড়ের কোন মানুষের সঙ্গে পথে দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। একবার তাই সে জানতে পারল না দেশের খবর, ঘাটের খবর, গড়ের খবর।

কিন্তু উঠোনের উপর দিয়ে পা টিপে টিপে যখন বারান্দায় গিয়ে উঠল, দেখল

ঘরের দরজা খোলা, একদিকের পাল্লাটা খসে গেছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের সঙ্গে ঘরের অনেকগুলো আশ্চর্য রাত একসঙ্গে প্রতিধ্বনি করে উঠল। হাতড়ে হাতড়ে বেড়াল মবু। কোথাও কিছু আছে কিনা দেখল। আম্মাজানের তক্তপোশটার উপর অন্ধকারে কতক্ষণ বসে থাকল। অনুভব করল ঘরদোরগুলি বড্ড ফাঁকা। পাশের তক্তপোশটা নেই। অনেক কিছু নেই। যে যার নিজের নিজের ভেবে রাতের বেলায় সব তুলে নিয়ে গেছে। জৈনব নেমকহারাম। এত কাছাকাছি থেকেও ঘরদোরগুলি দেখে নি।

তারপর সে গেল হরিতকী গাছটার নীচে। আজকের মত এক মুঠো আহারের বন্দোবস্ত হয় কিনা সেই ভেবে ডাকল, জৈনব, ও জৈনব। একবার এসে দেখ আমি না এসেছি।

প্রথম কোন আওয়াজ এল না। পরে খুট করে একটি শব্দ হল। দরজা খোলার শব্দ। একটি ছায়া অন্ধকারকে আরো গভীর করে হরিতকী গাছটার নীচে নেমে আসছে।

খুব কাছাকাছি এল ছায়াটা। বলল, আমি জানি মবু তুই একদিন ফিরবি। তাই এতদিন ঘরে কান পেতে রেখেছি, কবে এসে তুই ডাকবি।

সহজ ভাবে জৈনব বলল, মামুর বাড়ী আম্মাকে পেলি?

মবু যেন কিছুই হয় নি এমনতর করে বলল, না কোথায় আর পেলাম। কোথায় যে আম্মা হারিয়ে গেল আজও বুঝতে পারছি না। আমি চলে যাওয়ার পর থানা পুলিশ হয়েছিল রে?

—কে কার থানা পুলিশ করে– তুমিও যেমন!

—বড় খিদে পেয়েছে, একমুঠো খাবার দিবি? যা হয় কিছু।

—দিচ্ছি - একটু দাঁড়া। বলে ঘরের দিকে ফিরতেই মবু ওর হাত ধরে ফেলল। এবং কতদিন আগে যেমন করে টানত তেমনি বুকে টেনে নিতে চাইল।

জৈনব দূরে সরে দাঁড়াল। হাত তুলে নিল। বললে, বুকে আর টানিস না। এখন আমি অন্যের বিবি। কুদরত মিঞার সঙ্গে সাদী হয়ে গেছে।

সামনের অন্ধকারটাকে কে যেন চিরে দিল, কি সংলগ্ন করে দিল ঠিক ঠাওর করা গেল না। কিন্তু মবু তখনও ঝিম মেরে আছে ভয়ে চোখ বুজে গেছে। দুহাতে কান ঢেকে ফেলেছে। তবু বলেছে, চীৎকার করে, কি বললি! কি বললি জৈনব?

পথটার উপর মবুর মাথাটা ঘুরতে থাকল। সমস্ত শামীনগড় যেন দুলছে। কাঁপছে। আগ্নেয়গিরির মত ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। জৈনবের দেহটা খাতে পড়া ঘূর্ণাবর্তের মত চোখের উপর পাক খেতে থাকল। এরা কে? এরা কোন ইতিহাস? এরা কোন ইতিহাসের বিবর্তনের কথা বলছে।

মবু শুধু বললে, একটা আলো দিবি?

—খাবি না?

—না। একটা আলো দে।

জৈনব কুপি জ্বালিয়ে ফিরে এল আবার। নীরবে কাঁঠালী চাঁপার অন্ধকারটা পার হয়ে এল উঠোনে। ঘরে ঢুকল। তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোণায় পেল কাঠের বাক্স। খুঁজে খুঁজে দেখল কি আছে কি নেই। পেল শুধু নীচে সেই পুরানো আমলের ঘড়িটা আর কিছু নেই। ঘরটা ফাঁকা। শঙ্খচূড়ের ঝাঁপিটা ফাঁকা।

জৈনবের প্রতি এবার রাগ-রাগ হয়ে বলল, শংখচূড়টাকেও বিদায় করেছিস?

—বিদায় করি নি। আছে। আমার কাছেই রয়েছে। ঝাঁপিতে থাকলে ওটা মরে ভূত হয়ে থাকত।

তারপর আর কোন কথা নেই। ওরা আবার গেছে হরিতকীর গাছটার নীচে। কুপির আলোয় জৈনব গেছে শংখচূড়টা আনতে।

সেদিন ওরা ছিল নিঃশব্দ। কাস্ম কাঁঠালী চাঁপার গাছগুলো ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। গাছের নীচে মবু চোরের মত প্রতীক্ষা করছে। এতটুকু আর ভাবতে পারছে না আম্মাজান আর জৈনব সম্বন্ধে। মনের ভিতর এক দুরন্ত ঝড়। শামীনগড়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঁচবে কি করে। ভোর হলে এ মুখ শামীনগড়ের সমাজকে আর দেখাবে কি ভাবে।

জৈনব শংখচূড়ের ঝাঁপিটা নিয়ে এলে চোরের মতই ফিস ফিস করে বললে, আমার বাড়ীতে যাবি একবার? বাপজীর পেটিটা মাথায় তুলে দিবি।

জৈনব মবুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে থাকলে। তুই যত পারিস আমায় শাস্তি দে। ঘর ছেড়ে তবু তুই যাস না। আর কিছু বলতে পারল না—মাথা নীচু করে শুধু কাঁদল জৈনব।

—শামীনগড়ের মাটির সংগে কি আর সম্পর্ক। তুই হাসতে হাসতে কুদরত মিঞার সংগে ঘর করলি, আম্মাজান হাসতে হাসতে নিখোঁজ হলেন. আমি আজ কাঁদতে কাঁদতেই না হয় নাবিক হলাম। কি বলিস, কি বলিস জৈনব! বলে জৈনবের দুহাত ধরে মবু এমন পাগলের মত ঝাঁকি দিতে থাকল—মনে হল শুধু ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মেয়েটাকে খুন করবে। কিন্তু হঠাৎ মেয়েটাকে বুকে চেপে মাথায় মুখ রেখে সে বললে, বাড়ীঘরটা আমার দেখিস। কুদরতকে বলিস, তোর বাপজীকে বলিস অন্ততঃ সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে আমার জন্যে মসজিদে তিনি যেন একবার আজান দেন।

জৈনব মুখ তুলল না।

মবু আবার বললে, আজ আর বাধা দিস না। আমায় যেতেই হবে। সাত পুরুষের ধারাটা আমায় পাগল করে দিয়েছে।

জৈনব মুখ তুলে চাইলে মোবারকের দিকে। বললে, নাবিক হলে চরিত্র মন্দ হয়।

—মন্দ হবে না।

জৈনব সে তার বুকের উষ্ণ উত্তাপগুলো জড় করে প্রকাশ করল এবার, মাতব্বর মিঞা তুমি নাবিক হও কিন্তু চরিত্র মন্দ করতে পারবা না কসম থাকল।

মোবারক শামীনগড়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে এক কসম ভেংগে আর এক কসম গেল, নাবিক হব, চরিত্র মন্দ না করে বাঁচব কসম খেলাম।

আর সানডায়েল ক্লকে পুরানো কসম ভেংগে নূতন কসম খেতে গিয়ে দেখল মোবারকের গুণাহ। হাজার গুণাহ। দেহটা না-পাক। নাবিক হব, চরিত্র মন্দ না করে বাঁচব--সে কসম আর থাকল না। বিশেষ করে বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার পর সে বুঝে আসছে, জৈনব যত স্বার্থপর, বাপজী তাব দ্বিগুণ। শেখর- বেজাত, অজাত, বে-শরীফের লোক। মোবারকের কথায় সে বিদ্রোহ করে। ওর ঘুম আসে না। আবার সেই বলে কিনা মবু ঘুমোলে তার ভাল লাগবে। ওসব কটাক্ষ। ওসব কটাক্ষ। ওসব বিদ্রূপ, চাচা আপন জান বাঁচা। আম্মাজান তাই নিখোঁজ হয়ে বাঁচলেন, বাপাজী বাঁচলেন জাহাজ ডুবি থেকে...আর শেখর! সে বাঁচল...! সে

বেইমান। সে অজাত, বেজাত, কাফের।...তোবা তোবা কি বকছি সব।...খোদা হাফেজ।

মোবারক আজকাল দেখে লিলি ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ছায়ার মত ছবির মত বোট ডেকে, ফোকসালে, স্টোকোলে—সর্বত্র যেন লিলি তার সঙ্গ নেয়।

ফোকসালে আর ফল্কায় কতবার মোবারক অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চুপি চুপি বলেছে—এ ত কোরী পাইনের গুঁড়ি নয়, পিকাকোরা পার্কও নয়, পাহাড়ের সান ডায়েল ক্লকটা এখানে নেই। এ সমুদ্র, এখানে এলে ডুবতে হবে। মরতে হবে...এমন করে এসে সব সময় সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে সত্যি বলছি ডুবে মরব।

হাত ঘড়িটার উপর একবার নজর দিল। কানের উপর রেখে দেখল। পরখ করল। আওয়াজ ঠিক উঠছে। আগের মত, ওয়াচের সংগে সময় মিলিয়ে উঠছে। লিলির ছায়াটা মন থেকে কিছুতেই সরছে না। মরছে না। বিবির মত, জৈনবের মত ঠোঁট টিপে হাসছে। বে-ইক্তারী রং তামাসা করছে। ভুলের মাশুল তুলছে। মুখ তুলে এদিক ওদিক তাকাতেই দেখল মোবারক, শেখর ক্রু-গ্যালী পার হয়ে ডেকপথে নেমে আসছে। সমস্ত শরীর কম্বলে জড়ানো। পাজামার নীচে পা দুটো খালি। সমুদ্রের ঠান্ডা হাওয়ায় অবিন্যস্ত চুল কম্বল সব উড়ছে।

মোবরক তিন নম্বর বোটের আড়ালে আড়াল করল নিজেকে। আর কেন! আবার কেন!

সামনের ডেকে ডেক-জাহাজী ইয়াকুব রং করছে। রঙের টবটা কোমরে ঝুলছে ইয়াকুবের। মাস্টের উপর ঝুলে-ঝুলে রং করতে গিয়ে কিছু রং গড়িয়ে পড়েছে নীচে। আমলদার ধমকে উঠল মাস্টের গুঁড়ি থেকে, অঃ মিঞা রং পড়ছে—সাবধানে কাম কর। সেই সময় শেখর পিছনে দাঁড়িয়ে ডাকল, নীচে চল মোবারক।

সে মুখ তুলল না। চোখ খুলে তাকাল না। মুখের উপর কতকগুলি বিকৃত রেখা শুধু কুঞ্চিত হচ্ছে। যেন বলতে চায়, আব কেন, আবার কেন। দোহাই তোদের একা একটু থাকতে দে।

শেখর আবার বলল, নীচে চল মোবারক।

এবার সে মুখ তুলে উত্তর করল, মেহেরবাণী করে এ হারামের জন্য আর তকলিফ না করলেও চলবে। মাথা গরম হয়েছে আমার, বেশ হয়েছে কাপ্টেনের কাছে নালিশ কর। ওর কাছে ধরে নিয়ে চল। যা ইচ্ছে তাই কর। কিছু বলব না। বলে, নিজের হাত দুটো শেখরের প্রতি বাড়িয়ে ধরল।

শেখর ওর হাত ধরে বলল, নীচে চল। সেখানে তোর ভালর জন্য যা করতে হয় সব করব। চল। ও--ঠ।

মোবারক কিছুতেই উঠল না।

শেখর বাধ্য হয়ে মোবারকের পাশে বসল। স্কাইলাইটের কাচ দুটো খোলা। ফাঁক দিয়ে শব্দ আসছে। ইঞ্জিনের শব্দ। ওদের ছোট ছোট কথার আওয়াজগুলো সে শব্দের ভিতর ডুবে যাচ্ছে।

- শেষ পর্যন্ত বাকী সফরটা না ঘুমিয়ে কাটাবি ঠিক করলি!

—না ঘুমিয়ে থাকতে পারলে মন্দ কি। কথাগুলো আবার মাথা গরমের মত শোনাল না তো! পাশের জীবন্ত বিদ্রূপটার প্রতি চাইল আড় চোখে।

শেখর বললো, মরে যাবি যে।

যাক মাথা গরমের কথা বলে নি! তুই কি চিরদিন বেঁচে থাকতে চাস! শেখরের

শরীরটা উত্তপ্ত ঠেকল। কপালে, বুকে হাত দিয়ে বললে মোবাবক, তোর শরীরটা গরম ঠেকছে। ঠান্ডা লাগিয়ে আবার আমাকে ভোগাবি ভাবছিস! নীচে যা। নয়ত আবার জ্বর আসবে।

—যাব। তুই যদি নীচে যাস তবে।

—নীচে যেয়ে কি হবে। ঘুম আমার আসবে না। জানিস নালিশ আমার পর্বত প্রমাণ। গুণাহ আমার হাজার গুণাহ।

ঠান্ডা কনকনে হাওয়ায় গায়ের কম্বলটা নীচে পড়ে গেল। মোবাবক কম্বলটা শেখরের শরীরে জড়িয়ে দিল। তরপর দুজনেই চুপ। দুজনই নির্বাক হয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। কিন্তু মোবারক কিছু যেন বলতে চায়। তীব্র দুঃসহ অস্বস্তিতে সে ছটফট করছে। কিছু বলার কিছু প্রকাশের প্রচন্ড আগ্রহ। হলুদ রাঙা সবুজ মুখ ওর নীল নীল হয়ে উঠছে। শেখরের কাছে ঝুঁকে চেয়েছে কিছু প্রকাশ করতে। কিন্তু পারে নি। ভাটা ভাটা দুটো চোখ নিয়ে এগিয়ে এসে আবার সরে গেছে। শেষে একবার শেখরের প্রতি অত্যন্ত বেশী ঝুকতেই সে একান্ত বিস্ময়ে প্রশ্ন করল. এমন করছিস কেন! কি হয়েছে তোর!

মোবারক এবার বিবর্ণ চীৎকারে ফেটে পড়ল, গেজগ্লাস ফাটার তীব্র আওয়াজের মত সে আওয়াজ ভয়াবহ। অবিশ্বাস্য। রূপকথার মত শোনাল—মোবারক তখন হাউ হাউ করে কাঁদছে, শেখর, লিলি আমার বোন।

দুটো সমুদ্রমানুষকে কেন্দ্র করে একটি অবিশ্বাস্য এবং অস্বস্তিকর পরিবেশ গড়ে উঠেছে। শেখর ফ্যাল ফ্যাল করে নির্বোধের মত, হা-ঘরের মানুষের মত চেয়ে আছে। কোন প্রশ্ন, কোন কথা. কোন জবাব উঠল না ওর মুখ থেকে। কেবল কেমন এক রহস্যময় জীবনের গন্ধ পেল মোবারকের দুটো চোখে! চোখ দুটোর ভিতর হাজারো গুণাহের আফশোস নোনা জলের ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে।

এমন করে চুপচাপ বসে থাকা কেমন ঠেকছে। খালি পা দুটো কম্বল দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে ভাবল. কিছু বলতে হয়, কিছু করতে হয়। বলতে হয় লিলির সম্বন্ধে। মনের ভিতর যখন সেই ভাবনাগুলো পাক খাচ্ছে তখন দেখল মোবারক নিজেই প্রকাশ করছে আবার -লিলিকে ছেড়ে আসতে হল সে জন্য। কিন্তু ওকে আমি ভালবাসি। জৈনবের মত, বিবির মত ভালবাসি। সে আমার অপরাধ, আমার গোস্তাগী। আমার মনের হারেমে হারাম খাচ্ছি। বোনের মত, রক্তের সম্পর্ক আছে বলে কিছুতেই ভাবতে পারছি না। বিবেক তাই জলে ডুবিয়ে মারতে চাইছে। বাপজী বেইমান—বাপজী হারাম, শেখর—বাপজী কাফের।

সেই অপরিচ্ছন্ন এবং অস্পষ্ট প্রকাশের ভিতর মোবারক কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে বলতে বলতে। ওর নরম উজ্জ্বল চোখ দুটোতে ঘন কুয়াশার অন্ধকার। ওর বলিষ্ঠ উজ্জ্বল মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে ওর ঠোঁট দুটো। ও যেন ওরই ভিতর মরে আছে। শুধু তার শিটানো সাদা ঠোঁট থেকে ঝরে পড়ছে কতকগুলি স্তিমিত এবং বিনীত শব্দ। মোবারক বলছে, আমার বাঁচা মরা দুইই সমান। সবাই—সব, সব আমার সংগে তঞ্চকতা করল। ঘড়ি, বাপজী, আম্মা. লিলি, জৈনব সবাই আমায় ঠকাল, কি নিয়ে বাঁচব শেখর? কাকে নিয়ে বাঁচব? কি নিয়ে মরব, কাকে নিয়ে বাঁচব? বাঁচা মরা দুইই সমান. বেঁচে থাকতে বিবেক শুধু বলবে তুমি হারাম, গুণাহগার না-পাক। মরলে খোদা আমায় ক্ষমা করবেন না। ইন্তে-কালের সময় শয়তানের পাল্লায় পড়ব। একটু থেমে মোবারক আবার বললে, জৈনবের

কসম, আম্মার কসম ভেঙ্গে যে কসম নূতন করে গড়তে গেলাম সে কসম যে হাজার গুণাহে ভরা শেখর।

কাঁদছে মোবারক।

সে সমুদ্র-জীবনের শেষ কটা পাতা উল্টাচ্ছে।

শেখর বুড়ো য়্যালবাট্রস পাখীর মৃত্যুর সময় গোণার মত জবু-থুবু হয়ে বসে আছে। নক্ষত্র গুণছে আকাশের। নক্ষত্রের রাত দেখার চেষ্টা করছে, কিন্তু নক্ষত্র বিহীন আসমান। নীল আকাশ। এখনও দিন। সূর্য এখনও পাটে বসে নি। বড্ড নরম আলো আকাশে। দিনেরা এখানে এখন সকাল সকাল বিদায় নেয়। সাগর পাখীরা সন্ধ্যায় অন্ধকার ডানায় বয়ে নেমে আসে। তবু দিন। তবু সূর্য নক্ষত্রের রাতকে জানালার পর্দা সরাতে দেয় নি। বলে নি, এবার তুমি এস, আমি যাই।

তবে শেখর আকাশের দিকে চেয়ে এত কি দেখছে!

সাগর পাখীরা জাহাজ ডেকে সন্ধ্যা নামানোর আগে বরফের দেশে উড়ে চলে গেল। আকাশের গায়ে কোন নাম, কোন নক্ষত্রের কথা বলে গেল না। কোন্ নক্ষত্র কোন্ সন্ধ্যায় সান ডায়েল ক্লকে কোন্ জন্মের ইশারা দিয়েছিল তার রেখা চিহ্ন এঁকে গেল না পর্যন্ত।

আকাশের গায়ে তবু কিছু ঘটছে। সেই পালতোলা নৌকোর জাহাজ থেকে সপ্তডিঙা মধুকরপংখী! বিজয় সিংহের লংকা জয়। সংগে চলেছে মাঝিমল্লা। দাঁড় পড়ছে ছপ ছপ। আওয়াজ উঠছে পালে বৈঠার। পচশ যোয়ানের ক্লান্ত যোয়ানকী। বাঙালী তারা, নাবিক তারা। চাটগাঁই সিলেটি সমুদ্রমানুষ তারা।

দুটো মানুষ। দুটো জাহাজী। দুই দরিয়ার নীরব বন্ধু। একজনের আকাশ আগামী দিনের অনেক সুখ স্বপ্নের রেখাচিহ্ন। একজনের আসমানে কোন চিহ্ন নেই। শুধু আফশোস আর আফশোস।

আসমান আর আকাশ পানি আর জল—সাগর আর দরিয়া—বেদনার চিহ্ন আর মুখের রেখা মিলিয়ে তবু দুই বন্ধু। এক ফোকসালের দুই জাহাজী।

ওদের মুখ আকাশ মুখো। আসমান মুখো ওদের চিন্তা।

জাহাজ তাদের দেশে ফিরছে। সিডনীতে দুদিনের হল্ট। গম বোঝাই হবে তারপর আর এক দরিয়া, আর এক উপসাগর, আর এক নদ মোহনা। নাম তার গঙ্গা। গঙ্গার উপকূলে জাহাজ বাঁধা হবে।

সে কোন্ দিন! কবে? এম. অনেক জিজ্ঞাসা এখনও অনেক জাহাজীদের মনে।

আকাশের রং তখনও বদলাচ্ছে। কত মেঘ সে তার বেদনার কথা বলে গেল। মোবারক আর শেখর দুই সমুদ্রমানুষ মেঘের রং বদলানো দেখতে দেখতে পরস্পরকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জেনে নিল।

মোবারক হঠাৎ ইতিহাসের পাতা উল্টানো থামিয়ে দিল। খরগোসের মত চোখ তুলে সে কেবল পথ খুঁজছে। বললে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে—

নক্ষত্রেরা এবার আকাশে উঠতে সুরু করছে। এক, দুই, তিন অনেক। শেখর, আর গুণতে পারছে না।

ফসফেট টানতে পারছে না আর জাহাজ না। নেরু আয়লেণ্ড, ওসেন আয়লেণ্ড, কাকাতিয়া আয়লেণ্ড—এক, দুই, তিন। অনেক অনেক। বাপজী আর তার জাহাজের জাহাজীরাও সেদিন আসমানমুখো মুখ করে ডেকের উপর বসেছিল বোধ হয়। দেশে ফেরার জন্য কোম্পানীর ঘরে হয়ত সেদিন নালিশ জানিয়েছিল।

অনেক কথা বললে মোবারক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের কথা। শামীনগড়ের কথা, বাপজী, ফ্লাওয়ার গার্ল, আম্মাজান, জৈনব,—অনেক অনেক কথা।

তবু কথা ফুরোয় না। শেষ হয় না আম্মাজানের জলছবি। আকাশ দরিয়া নক্ষত্র মিশে এখনও অনেক খবরের সামিয়ানা টানছে। সেই সামিয়ানার নীচে বসে দুই সমুদ্র মানুষ পরস্পরকে আরো গভীর ভাবে টেনে নিল।

কিছু বলে হাঁফ ছাড়ছে মোবারক। হাঁফ ছেড়ে ক্রমশ হাল্কা হচ্ছে।

ঘড়িটা তেমনি পড়ে আছে পেটিতে, মোবারক বললে। কিন্তু মেলবোর্নে জাহাজ পৌঁছলে ওর সম্বন্ধে আমার কেন জানি অহেতুক কৌতূহল জন্মাল। সাউথ-ওয়াফের বস্তি অঞ্চল থেকে ফেরার পথে বুঝতে পারলাম কৌতূহল অহেতুক নয়। ঘড়ির সঙ্গে বাপজীর জীবন জড়িয়ে আছে। আম্মাজানকে হারালাম। নাবিক হওয়ার জন্য এ ইবলিশটাই বুঝি দায়ী। ভাবলাম পোর্ট-মেলবোর্নে দিই ওকে বেচে। এতকাল ধরে যে পড়ে থাকল, তাকে কিনবেই বা কে। প্রথম সফরে চাবিটা ওর ঘুরিয়েছি। কিন্তু একেবারে বেসামাল। তোয়াক্কা কিছুতেই কাউকে করল না। কাঁটা দুটো আর ঘুরল না, পেটিতে ফেলে রাখা আর পানিতে ফেলে দেওয়া এক কথা। তবু ফেলে দিতে মন চাইল না- বাপজীর হাতের চিহ্ন।

জাহাজে খবর এল, ফসফেট নিয়ে জাহাজ যাচ্ছে নিউপ্লাই-মাউথে। ভায়া সিডনী জাহাজ যাবে। মনে হল ঘড়িটা ঠিক করে নিলে হয়। ইবলিশটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে বাপজীর জাহাজ ডুবি সমুদ্র দেখলে হয়।

সেদিন সেজন্য ঘড়িটা নিয়ে কলিন স্ট্রীটে গিয়েছি। ইউনিভার্সিটির পাশের রাস্তায় ঘড়ি মেরামতের দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়েছি। কোথাও কিছু হল না। ঘড়িটা বহু পুরানো আর ভিন্ন নিয়মের মেরামত বলে সবাই মেরামত করতে অস্বীকার করল।

তবে শেষ পর্যন্ত হল। প্রিন্সেস স্ট্রীটের দোকানী বলল, একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি। কোন ক্ষতি নেই বলে আমিও দিলাম। ঘড়িটা মেরামত হল। চার ঘণ্টা অন্তর দম দিতে হয় এই ফারাকটা থাকল শুধু।

বাপজীর চিহ্নটা হাতে বাঁধলাম। তুই চোখের উপর দেখলি সেই থেকে কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়েছি। তখন থেকে আম্মাজানকে খুব বেশী মনে পড়ল। বাপজীর অস্পষ্ট খোদা হাফেজ কানে ঠোক্কর খেতে থাকল বার বার। জাহাজটাকে মনে হল দোজখের মত। ওয়াচে ওয়াচে চাবি দেওয়া, কানের উপর রেখে শব্দ শোনা, সময় ঠিক রাখা অভ্যাসে দাঁড়াল। তার উপর অন্যান্য জাহাজীদের বিদ্রূপ কটাক্ষে ভেখেগ পড়লাম। তবু প্রতিজ্ঞা আমার—বাপজীর চিহ্নটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে জাহাজ-ডুবি দরিয়া দেখবই। দেওয়ানীর রাতে ঘড়ির সঙ্গে সময় মিলিয়ে রাত বারোটার সময় ঝুঁকে থাকলাম তিন নম্বর জেটের পাশে রেলিংয়ের উপর। ঝড়ের সমুদ্রকে দেখলাম -বে অফ বিস্কে, লিমন বে আর বে অফ বেংগলের মত ঝড়ের সমুদ্র। তুই কিন্তু শেখর এক সময় উপরে এসে আমায় নীচে ফোকশালে নিয়ে গেলি।

কথা বলতে পারছে না মোবারক। গলাটা শুকিয়ে উঠছে। তবু কোনরকমে যতটুকু পারছে বলছে।

তুই শোন, তুই শোন শেখর। সব শুনে যদি মোবারকের উপর দয়া হয় তবে অন্তত শেখর, ভগবানের কাছে একবার এ হারামের জন্য প্রার্থনা করিস। বলিস, ঈশ্বর ওকে ক্ষমা কর।

এ রক্তমাংসের দেহ, সান ডায়েল ক্লক আর লিলিকে ঘিরে ঘড়িটার বুকে চুপ করে পড়ে থাকা রহমৎ মিঞার কঙ্কালটা যেন টিক টিক শব্দ তুলে হাসল। লিলিকে কেন্দ্র করে পাহাড়ের উপর মনটা বিকৃত হয়ে ওঠে। হাজার গুণাহগার হলাম। জৈনবের কসম খেলাপ হল। রহমৎ মিঞার কঙ্কালটা টেনে নিয়ে গেল বুঝি আমাদের বাপজীর কবরখানায়। বিশ বছর আগের প্রেতাত্মা চার্চের ঘড়িতে বারোটা বেজে আওয়াজ তুলল যেন—বারোটা বাজালাম। বাপজী গলা টিপেছে দোস্তের, তুমি গলা টিপেছ বোনের ইজ্জতের। তোমার নিজের।তাই সেই রাতে বাপজীর মত চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিলাম–খোদা হাফেজ। চোখ থেকে সে রাতেই ঘুম বিদায় নিল। আজ পর্যন্ত ঘুমোতে পারলাম না। দরিয়া কেবল ডাকছে।

করবখানার 'খোদা হাফেজ' চীৎকার তোলার পর কি করে, কেমন করে ফিজ্-রয়ের এক গরম কাঠের ঘরে আশ্রয় পেয়েছিলাম সে খেয়াল নেই। কিন্তু চোখ খুলতে দেখি লিলিও ঝুঁকে আছে আমার মুখের ওপর। অবাক চোখে কিছু যেন বলছে। ওর মা প্রতীক্ষা করছেন। কিছু যেন থেকে থেকে বলছেন। ক'জন লোক -ওরা ডাক্তার আবার প্রতিবেশীও হতে পারে তাদের খুব ধীর এবং সংক্ষিপ্ত পায়চারী। কাপেটের উপর তারা ধীরে ধীরে হাঁটছেন। মনে হল সব ঘরটা জুড়ে উষ্ণ স্রোত। লিলির চোখ দুটো ভার ভার। আমার দৃষ্টি তখন একটি ছবির প্রতি। নিথর, নিঃশব্দ দেহটা। লিলির মা হাতের স্পন্দন গুণছেন হাতের স্পন্দন অনুভব করছেন।

চুপ হয়ে 'নেহ্ শেখর' শুনে শুনে বিরক্ত বোধ করছে না। কিংবা বেইমানের মত বলছে না এতো থাক হয়েছে এসব অনেকবার আর অনেককাল থেকে শুনে আসছি।

সমুদ্রে ভাংগা ভাংগা ঢেউ। ঢেউয়ের মধুর কল কল মিঠে আওয়াজ। এই মিঠে সমুদ্রকে দেখে মনে হয় না সে কোনদিন জাহাজের সংগে তঞ্চকতা করতে পারে, বেইমানী করতে পারে।

কাপ্তেনের ঘর থেকে পোর্টহোলের আলো। তিনি পায়চারী করছেন কেবিনে। পোর্টহোলের আলোটা সে জন্য মাঝে মাঝে অন্ধকার হয়ে উঠছে।

ব্রিজের উইংসে আলো জেবলে দেওয়া হয়েছে। আলো জেবলেছেন সুখানি সাহেব। ব্রিজ থেকে তিনি নীচে নামবার সময় বললেন, এইবার আনন্দ করেন যত পারেন করেন জাহাজ সিডনী হইয়া দেশে ফিরব। সিডনী যাইয়া গম আর রসদ নিব।

সব জাহাজীর চোখে মুখে ঘরে ফেরার আনন্দ। দেশে ফেরার জন্য ওরা মনকে প্রস্তুত করছে। বাংকে বাংকে আবার গল্প-গুজব জমে উঠেছে -দেশের গল্প, ঘরের গল্প। কার বিবি, কার মেমান সফর ফেরৎ কি কি নিতে বলেছে—কলকাতা বন্দরে লাথিতে থাকার খরচ, কতদিন থাকতে হবে তারও হিসেব টানছে তারা।

মোবারকের কোন হিসেব নেই। শেখরও কোন হিসেব টানতে পারছে না। মোবারকের বে-হিসেবী জীবনের জন্য ওর জীবনের হিসেবেরও কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম ভুল আছে। শেখর ভুলের সংশোধন চায় মোবারকের বে-হিসেবী জীবনের গল্প শোনে। মোবারককে স্বাভাবিক করে তোলার ভিতর সূক্ষ্ম ভুলের সংশোধনকে সে খুঁজে পেয়েছে।

মোবারক তখন বলছে, সে পরিবেশ, সে পরিচয়, সে কাহিনী অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই রাত আর দিনকে মনে হচ্ছে আমার আর এক দুঃস্বপ্ন। ফিজরয় যেন অন্য এক

এক দুনিয়া। বাপজী অয়েল পেণ্টিং-এর ভেতর। পাশে লিলি। ওর টানা টানা চোখ দুটোয় আম্মাজানের গভীরতা। বাপজী ঠিক আগের মত। এক গাল ছাঁটা ছাঁটা কুচকুচে দাড়ি। বলিষ্ঠ মুখে সুষ্ঠ গোঁফের রেখা।

চেয়ে আছি। চোখ আমার বাপজীর মুখ থেকে নামছে না। বাপজীকে নূতন করে যেন দেখছি।

লিলির মা আমার চেতনাকে প্রলুব্ধ করার জন্য বললেন, ফটোর মানুষটি মূক বধির।

কবোষ্ণ কাঠের ঘর। একটি মাত্র কথার প্রকাশ যেন!

সকলের চিন্তিত মন উন্মুখ হয়ে উঠল সেই কাঠের ঘরে। যাঁরা পায়চারী করছিলেন তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন। চেতনা ফিরেছে ভেবে লিলির মা আশ্বস্ত হলেন। প্রকাশের রেখাটুকু টেনে তিনি আবার পুনরাবৃত্তি করলেন।—ফটোর মানুষটি মূক বধির। যতদিন ঘর করেছিলেন তিনি একজন মূক বধিরকে নিয়ে ঘর করেছিলেন।

বাপজীর বাঙ্গালীর মুখের কমনীয় রূপ লিলির মাকে মুগ্ধ করেছিল। এক নূতন শান্তির নীড়ে আশ্রয় দিয়েছিল। দুবার স্বামী পরিত্যক্তা মাউরী মেয়ে জানলেন না মানুষটি কোন্ দেশের, কোন্ জাতের। তিনি জানতে চাইলেনও না, জানতে দিলেনও না কাউকে।

কি ভেবে চুপ করে থাকল মোবারক। ইয়াকুব মাস্টে রং করে তখন ফিরে গেছে ফোকশালে। আমলদার ফলগুাগুলো টেনে তুলেছে ফল্কার ভিতর থেকে। মেজ মালোম একবার ব্রিজের উইংসের ভিতর দিয়ে কি যেন দেখে গেছেন।

সত্যি লিলির মা এক অদ্ভুত মেয়ে। লিলির বাপজী যেমন এক অদ্ভুত মানুষ। পৃথিবীর উচ্চতম কাইটিরিয়ার জলপ্রপাতের সংলগ্ন ছোট্ট পাহাড়ের এক অদ্ভুত পরিবেশের ভিতর। এক পাল ভেড়ার ঘাসে ঘাসে চলে বেড়ানোর মাঝে লিলির আম্মা মোবারকের আম্মা হেনলে উইলি বড় হয়েছে। কর্ণফুলির বাঁওড়ের ধারে বাপজীর মত। জলপ্রপাত থেকে হ্রদের তীরে, ছোট্ট নদী রেখায় অনেক বেদনার চিহ্ন উইলিও রেখে এসেছিলেন সেদিন।

ছোট্ট শহর থেকে নেলসনে।

উইলো গাছের ছায়া থেকে এলেন কৌরী পাইনের ছায়ায়। দক্ষিণ দ্বীপের বন্য-ঘাসের পৃথিবী থেকে তিনি এলেন সমুদ্রতীরে—নেলসন বন্দরে। স্থল থেকে জলে। জীবন থেকে যৌবনে। অনেক সুখ থেকে অনেক দুঃখে।

নেলসনে তিনি প্রথমবারের মত স্বামী পরিত্যক্তা হলেন। শহরের স্থানীয় হাসপাতালের লেডী ডাক্তার হেনলি উইলী একদিন তাই শহর পরিত্যাগ করে কুক প্রণালী অতিক্রম করেন। এবং ওয়েলিংটনে এসে দ্বিতীয়বার জীবনকে নূতন করে অনুসন্ধান করার সময় এক নূতন মানুষের পরিচয়ে বিমুগ্ধ হলেন।

বিবাহ করলেন দ্বিতীয়বার। পরিত্যক্তাও হলেন দ্বিতীয়বারের মত।

তিনি বলেছিলেন, সে আমার অন্ধকার যুগ। মনে পড়ছে না কখন কি ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদগুলো এল। তবু বুঝতে আমার বাকি নেই দুটো মতের অমিল থেকেই আমি আর তারা যে যার মত দুদিকে সরে দাঁড়িয়েছি।

তারপর থেকে আবার অনুসন্ধান এবং জীবনের অনুসন্ধানে ক্রমশ তিনি তাঁর মোটর দক্ষিণ থেকে কেবল উত্তরে চালিয়েছেন। মোটর চালিয়ে এসেছেন তিনি

ওয়েলিংটন থেকে ওয়াঙগানাইতে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে। অপরিসীম বেদনায় হেনলে উইলি তখন পীড়িত। শান্তির আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে তিনি চাকুরীর পর চাকুরী ত্যাগ করছেন। তিনি অবলম্বন চান। জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে চান আবার।

এবার তিনি চলেছেন হায়েরার দিকে। সেও দক্ষিণ থেকে উত্তরে। মোটর চলেছে সমুদ্রের বেলাভূমির পাড় ধরে। পিচ ঢালা সড়কের। এঁকেবেঁকে অনেক তীরের বাঁক ঘুরে। মোটর আর উইলি উভয়ই কেমন অন্যমনস্ক যেন। চলতে হবে তাই চলছেন। থামতে হবে তাই থামছেন। একবার শুধু ভেবেছিলেন, এভাবে দক্ষিণ থেকে কেবল উত্তরে না চলে সমুদ্র অতিক্রম করলে কেমন হয়। বিদেশে গিয়ে নূতন ভাবে ঘর বাঁধলে কেমন হয়।

হঠাৎ লক্ষ্য করলেন উইলী প্রবল ঝড়ে এ দেশটা ক্ষত বিক্ষত। দূরের গম ক্ষেতগুলো পর্যন্ত সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে গেছে। সকাল করে দু-একজন গ্রামের মানুষ মাঠের আলে আলে ভেড়ার পাল নিয়ে দূরের পাহাড়ে হারিয়ে যাচ্ছে ঝর ঝর করে নুন ঝরছে গমের শীষ থেকে। আর একটা মাঠ পার হল। ঘাসগুলো বড় নোনা। আর একটা বাঁকে মোটর ঘুরতেই আচমকা স্পিড কমিয়ে দিয়ে কিছু যেন দেখলেন। অনুভব করলেন ঝড়ের শীষ দেওয়া ডাক এখনও কমে নি। দূর দূরান্ত থেকে ভেসে আসছে সেই ডাক।

মোটর দাঁড় করিয়ে দিলেন পথের উপর। দূর থেকে পরখ করলেন তিনি। কিছু যেন বিস্ময় [illegible] পেলেন। প্রবল ঝড় ক্ষত বিক্ষত বেলাভূমিতে ঢেউয়ের ঠোঁট ছুঁয়ে মত মানুষের বুঝি স্বাক্ষর পেলেন।

সন্তর্পণে তিনি পথ অতিক্রম করে বেলাভূমিতে পড়ে থাকা মানুষটার দিকে চললেন। ঝড়ের সমুদ্র হয়তো এখানটায় ফেলে গেছে নির্দয়ের মত। নীরবে যে মানুষটা মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকল।

সেই বেলাভূমি সংলগ্ন অন্য কোন মানুষের সাড়া পেলেন না তিনি। কাকে ডাকবেন। কাকে ডেকে বলবেন, তোমরা আমার সঙ্গে এস। কি বিস্ময় আছে এখানটায় দেখি।

না, তিনি কিছুই বলতে পারেন নি। বলতে পারেন নি—এস তোমরা। কে আছ কাছে—একবার এসে এই ঝড়ে-পড়া মানুষকে রক্ষা কর।

তিনি শুধু হেঁটে গিয়েছিলেন নীচে। চুপচাপ নেমে গিয়েছিলেন বেলাভূমির বুকে।

সমুদ্রের কাছাকাছি এসে টুপিটা হাতে নিলেন। ঈশ্বরকে মনে করে ক্রশ টানলেন বুকে। বুকে লাইফ বেল্ট আঁটা মানুষটা চিত হয়ে আছে। মুখ শুকনো। কপাল ভেজা ভেজা। চোখ দুটো স্থির। কিন্তু উজ্জ্বল। তিনি দ্রুত মানুষটির পাশে হাঁটু-গেড়ে বসে পড়লেন। কোথাও জাহাজ ডুবি কিংবা নৌকাডুবি হয়েছে। হাত তুলে নিলেন। নাড়ীর স্পন্দন শোনার চেষ্টা করলেন কান পেতে। এবার ক্রমশ খুব দ্রুত মুখের কাছে এবং বুকের কাছে কান রেখে আরও কিছু অনুভব করতে গিয়ে অবাক হলেন উইলী। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বেলাভূমির কিনারে কিনারে মানুষ দেখার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু কোন মানুষ নেই, কেউ নেই। যে যাও নেই। উইলী বলে উঠল, ঈশ্বর কি হবে?

মোটর অনেক উপরে। কালো সরীসৃপের মত পথটা এখান থেকে অস্পষ্ট।

বেলাভূমির বুক ভেঙে উপরে ওঠা আরো কঠিন। তবু উইলী ভিজা সপসপ মানুষটাকে দুহাতে তোলার চেষ্টা করলেন। ঘেমে উঠলেন তিনি। এতটুকু নড়ল না দেহটা। এপাশ ওপাশ হল মাত্র। তিনি উপুড় করে দিলেন দেহটা। তিনি তবু সাহায্য চান। মানুষ চান। আর বলেন ঈশ্বর কি হবে!

ঈশ্বর কি হবে। দেহটার ভিতর এখনও যে প্রাণ আছে। অস্থির হয়ে উঠল উইলীর মনটা। ছুটতে ছুটতে গিয়ে তিনি উপরে উঠলেন। মোটর নীচে নামানোর অনেক চেষ্টা। চাকাগুলি ক্যাঁক ক্যাঁক করে উঠল। বালিতে আটকে যাচ্ছে চাকা। মোটর তিনি এতটুকু নড়াতে পারলেন না।

কি উপায় তবে! কি করা যায় তা হলে। যতক্ষণ মানুষের কোন সাড়া না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ তিনি মৃতপ্রায় মানুষটার জন্য কি করতে পারেন! অনেক-গুলো ভাবনা এসে উইলীকে উত্তেজিত করে তুলল।

কিছু শুকনো খড়ের প্রয়োজন। আগুন জ্বালালে শরীরটা অন্তত গরম থাকবে। আগুন জ্বালার জন্য তিনি আকাশ পাতাল ভাবলেন। গ্রাম এখানে কোথায়—কোন্ দিকে কে জানে। শুধু একটু আগুন। আগুন পেলে মানুষটা বাঁচবে। দিগন্ত জুড়ে শুধু সমুদ্র আর বেলাভূমি। আগুন নেই। মানুষ নেই। ঝড় এখানে জীবনের কোন চিহ্ন রেখে যায় নি যাকে ধরে উইলী খড়কুটো অনুসন্ধান করবেন।

মাথাটা নীচু করে কিছু আবার ভাবলেন তিনি। বললেন, ঈশ্বর পেয়েছি। কটকী বটুয়া নিলেন সোফা থেকে। সিগারেট লাইটারটা হাতে নিয়ে ছুরি দিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কেটে ফেললেন সোফাটা। নারকোলের ছোবড়া বের করে হাফ গ্যালন পেট্রল নিলেন টিনে। তারপর আবার নীচে—আবো নীচে। আগুন জ্বালানো হল। ভিজে জামা কাপড়গুলো খুলে একধারে রেখে দিলেন। এপাশ ওপাশ করে সেঁকে নিলেন দেহটা। সেই সময় বিমুগ্ধ হলেন তিনি। মানুষটি পৃথিবীর কোন প্রান্ত থেকে এসেছে কে জানে। বাঙালী চেহারার বিস্ময়ের অভিভূত হয়ে বললেন. ঈশ্বর কি হবে?

বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আরো কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করতে হল ইউলীকে। কোন মানুষের চিহ্ন পান কিনা তার জন্য পরীক্ষা করলেন। ভোরেব কুয়াশা তখন সরে সরে গেছে। সকালের সূর্য উঁকি দিচ্ছেঅন্য কি এক পাহাড় প্রান্তে। এবার উইলী জেলে ডিঙিগব শব্দ পেলেন। তারাও দূরে। অনেক দূরে। শুধু পালের ছায়া দূর থেকে আলতো ভাবে এসে বালিয়াড়ীতে থেমেছে। কানে এসে ঠোক্কর খাচ্ছে কাঠের ঠক ঠক শব্দ। পাশের পাহাড়টাও প্রতিধ্বনি করছে—ঠক ঠক।

উইলী সন্তর্পণে জলের ভিতর নেমে গেলেন। ডিঙিগুলোর কাছে পৌঁছানোব চেষ্টা করলেন তিনি। জলের ভিতর দাঁড়িয়ে তিনি দুহাত মুখের উপর ভাজ করে হু-ই-ই বলে এক বিপদ সূচক চীৎকার তুললেন।

কোন সাড়া এল না। তারা জল ডিঙিয়ে পাড়ে এল না।

তিনি আবার ডাকলেন। চীৎকারগুলো ভেসে ভেসে অন্য কোন এক দেশে গিয়ে পেঁছল। ফের ডাকলেন। আকাশে উড়িয়ে দিলেন হাতের রুমালটা।

জেলে ডিঙিগুলো তখনও শব্দ তুলছে। ছপ ছপ। ঠক ঠক। পাহাড় প্রান্তের অন্য বাঁক থেকে একটা নৌকো এদিকটায় এগিয়ে আসছে।

উইলী মনে মনে আবার সর্বশক্তিমানকে স্মরণ করলেন যেন। ওরা এদিকেই আছে। ওরা আসবে। নীল জলের রেখা পার হয়ে সবুজ রেখায় এসে নিশ্চয়ই

পেঁছবে। তারপর বলবেন এস, এদিকটায় এস। দেখ কি হয়েছে। কোন্ এক পৃথিবীর মানুষ এসে তোমার পৃথিবীতে নৌকা ভিড়িয়েছে।

জল থেকে তীরে উঠলেন উইলী। সাগর ডুবি মানুষটার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বিদেশী নাবিককে দেখে তিনি অন্য কোন এক জগতের কথা চিন্তা করতে করতে—হাতের অনামিকায় দেখলেন আঙটি। জ্বল জ্বল করছে—চিহ্নিত করা কতকগুলি গোল গোল হরফ আংটির উপর। আবার অন্যমনস্ক হয়ে অন্য কিছু ভাববার সময় আঙটিটা পকেটে ভরে দিলেন।

জেলে ডিঙিগটা এসে ভীড়ল তীরে। ডিঙিগটা টেনে টেনে তীরে তুলে ফেলল এবং লাফিয়ে নামল নৌকোর আরোহীরা। যেখানজায় উইলি বসে আছে সেখানটায় তারা ছুটল। যোয়ান যোয়ান উত্তর দ্বীপের মানুষেরা অবাক হল আর একটি বিদেশী যোয়ানকে দেখে। যোয়ানের যোয়ানকী আছে! অনেক সময় ধরে ঝড়ের বিরুদ্ধে, ঢেউয়ের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটেছে। আকাশের নক্ষত্র দেখে তীরের দিকে আসার চেষ্টা করেছে। সংজ্ঞা হারিয়েছে এক সময়। চোখের নীচ তাই গভীর। কালো কালো অক্ষত অনেক রেখা সমস্ত দেহকে কেন্দ্র করে। চিৎ হয়ে আছে। উলঙ্গ। উইলি জামা কাপড় এক ধারে জমা করে রেখেছে। লাইফ-বেল্টের উপর মাথাটা আলতো-ভাবে রাখা। বালির বুকে বিদেশী যোয়ান অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

উইলী বললেন, আপনারা দয়া করে একটু আসুন।

—কি হল? এ ত উত্তর দ্বীপের দক্ষিণ দ্বীপের মানুষ নয়।

—এমন কেন হল?

উইলী বললেন, ঝড়ে জাহাজ-ডুবি হয়েছে নিশ্চয়ই।

—ঝড়। ঝড় বাদলের রাত। কি ভয়ানক দুর্যোগ।

—দয়া করে তুলে ধরুন। দেখবেন বুকে যেন চোট না লাগে। উইলি মাথার কাছে এসে বললেন, মাথাটা আমি ধরছি।

—পারবেন ত একা?

—পারব। এবার আপনারা হাঁটুন।

—কোথায় নিয়ে যাবেন?

—ঐ মোটরে।

—সেখান থেকে?

—অনেক দূরে। হায়রার কোন হাসপাতালে কিংবা ডাক্তারখানায়।

জাহাজ-ডুবি মানুষটাকে মোটরে রাখার সময় জেলেডিঙির মানুষেরা বললে, আমরা আসি।

একজন বললে, বোধ হয় এ যাত্রা মানুষটা বাঁচবে।

—বাঁচবে নয়। বাঁচতে হবে। হের্নালি উইলির তাই মত।

মোটরটা চলেছে। পিছন থেকে জেলে ডিঙির মানুষেরা হাত তুলে বিদায় জানাল। উইলীও মুখটা ফিরিয়ে বাঁ হাতটা উপরের দিকে তুলে দিলেন। পিছনে তাকানোর সময় কৈ। সামনে, আরো সামনে তাকে ছুটতে হবে। পাহাড়ী উপত্যকার পর গ্রাম। মাঠ। বা পাশে সমুদ্রে ছোট ছোট সবুজ দ্বীপ। এখানে এসে সহজ পথ মোড় খেয়েছে। হঠাৎ মনে হল গাছগুলো, মাঠগুলো, ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে চার পাশে। কৌরী পাইনের ছায়া, উইলোর ঝোপ, ঘাসের জঙ্গল সব সমান হয়ে গেছে চোখ দুটোয়। উইলি কি ভেবে স্পীড আর একটু কমিয়ে দিলেন।

এখান থেকে সমুদ্র আর দেখা যায় না। পাহাড় কেটে প্রশস্থ পথ গেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে! কখনও গ্রাম, কখনও মাঠ, কখনও কৌরী পাইনের বনভূমির ভিতর দিয়ে মোটর ছুটছে। মাঝে মাঝে মোটরটা উইলী সহসা থামিয়ে দিয়েছেন। জাহাজ-ডুবি মানুষের বুকে হাত রেখে পরীক্ষা করেছেন। আবার দ্বিগুণ উৎসাহে দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলেছেন।

কিন্তু কি নাম! কি নামে, কি পরিচয়ে হাসপাতালে ভর্তি করানো হবে। কোন্ দেশ থেকে এসেছে! আঙটির উপর গোল গোল হরফগুলো নিশ্চয়ই ওর নাম অথবা দেশের নাম। এখন ওর কি নাম হবে। হতে পারে। হাসপাতালে কি বলব? দক্ষিণ দ্বীপের মানুষ? মন্দ হয় না। মাওরী। ঐ বেশ, ঐ ভাল। হেনাফোর্ড। হেনলি হেনাফোর্ড। বেশ হবে। ঐ ভাল হবে!

হেনলি উইলি আরো কি সব ভাবল। সির শির করে কাঁপল কান দুটো। ঠোঁট দুটো কাঁপল। কি সব ভাবছে। ঐ পথ। পথের মোড়েই ডাক্তারখানা। আরো পরে হাসপাতালের সদর দরজা।

মোবারকের ফুস ফুস থেকে একটি বিলম্বিত দীর্ঘ নিশ্বাস কাঠের পাটাতনকে আসন্ন ঝড় থেকে যেন বিমুক্ত করে দিল। ছায়া ছায়া অন্ধকার সৃষ্টি হয়েছে আবার। দু-নম্বর পরীর সুখানী ব্রিজে ওঠে গেছে। দুউইংসের মাথায় পাক খেয়ে শেষ বেলায় এসে থেমেছে কম্পাসটার সামনে। লাভবাস লাইন ঠিক করছে। তিন নম্বর মালুম পায়চারী করছেন ব্রিজে।

প্রশ্ন করল শেখর, হায়েরাতে তিনি ভাল হয়ে ওঠলেন।

—ভাল হলেন। কিন্তু কথা বলতে পারলেন না আর।

গভীর আগ্রহে শেখর পুনরায় প্রশ্ন করলে, তিনি কি কখনও কথা বলতে পারেন নি, কিংবা কানে শুনতে পান নি।

—না। তিনি কথা বলতে পারতেন না, কানে শুনতে পেতেন না। উইলি একজন বোবা মানুষকে নিয়ে আঠারো বছর ঘর করেছেন। নেলসন থেকে যে অনেক দুঃখকে সঙ্গ করে এনেছিলেন—নিউপ্লাই-মাউথে সে দুঃখ আর এক বিন্দু রইল না। এখানে তিনি এক সুখের নীড় রচনা করেছিলেন। উইলির নূতন জীবনের সংগে বাপজী পরিচিত হল স্বামী হিসাবে। লিলিও উইলির মেয়ে। বাপজীর দ্বিতীয় সন্তান।

মোবারক বুঝি এবার শেষ বারের মত দম নিল। অন্ধকারে শেখরের হাত খুঁজল। হাতের উপর হাত চেপে শেষ বারের মত গল্প করতে চাইল। পাটাতনের উপর কম্বলের নীচে হাত ঢাকা শেখরের। আর একটু সংলগ্ন হয়ে বসল তাই। ফিস ফিস করে বললে, সমুদ্রমানুষেরা সহজে মরে না শেখর। গত সফরে রেংগুনে যাওয়ার পথে সমুদ্র থেকে দুজন জাহাজীকে তুলে নিয়েছি। ওরা ছিল কোরিয়ার যুদ্ধবন্ধী মানুষ। ছত্রিশ দিন ওরা একনাগাড়ে জলের উপর ভেসে ছিল। বিভিন্ন দেশের পত্রিকাগুলো ফলাও করে কত খবর। মোবারক এবার শেখরের হাত দুটো কম্বলের নীচ থেকে টেনে আনল। হাত ধরে বললে, বাপজী জাহাজ ডুবি থেকে বাঁচবেন সে আর বিস্ময়ের কি। সে তেমন বলার কি! তবু বললাম তোকে। অনেক কথা বললাম। আমি না-পাক মানুষ—আমার ডাক আল্লার কানে পৌঁছায় না। তিনি

আমার ডাক শুনবেন না। কিন্তু তুই গুণাহগার হস নি। তোর ডাক তিনি শুনবেন, তুই অন্ততঃ তোর ঈশ্বরের কাছে একবার প্রার্থনা করিস। বলিস, ঈশ্বর তুমি ওকে ক্ষমা কর। মবু অনেক কসম খেয়ে অনেক ভেঙেছে, বোনের ইজ্জত নিয়েছে—এবার তুমি ওকে শান্তি দাও।

সহসা শেখরের দুটো হাত খুব শক্ত করে ধরে চীৎকার করে উঠল মোবারক, বলিস, শেখর তুই বলিস এ গুণাহ-গারের জন্য। তোর ঈশ্বরের কাছে বলিস—ওকে শান্তি দাও, ওকে ঘুমোতে দাও। কসম থাকল তোর উপর শেখর। তুই বলিস, তুই ডাকিস তোর ঈশ্বরকে।

শেখর কিছু বলল না। বলতে পারল না।

দুজন সমুদ্রমানুষ ছায়া ছায়া অন্ধকারে অনুভব করতে পারল সমুদ্র কাঁপছে। ফানেল ঝুঁকছে একবার গঙ্গাবাজু আবার যমুনাবাজু। ঝড় ওঠার লক্ষণ। চিড়িয়া পাখীগুলো তখন আকাশ আর সমুদ্রকে ছেয়ে ফেলেছে। ওরা ডাক তুলেছে ঝড়ের ডাক। টাইফুনের ডাক। অতল সমুদ্র হতে শঙ্খচিলের আওয়াজ।

রাত গভীর। এগারোটা বেজে গেছে। তিন নম্বর পরীর আমলদার আড়ামোড়া ভাঙল। হাই তুলে তুড়ি দিল মুখে। পাশের বাংকগুলোকে সজাগ করার জন্য রেলিং-এ শব্দ করল।

শেখর...কগুলো ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত শব্দে জেগে গেছে। অন্ধকার ফোকসালে একবার চোখ খুলে আবার বুজে পড়ে আছে। পাশের বাংকটা নিশ্চয়ই খালি। প্রতি রাতগুলোর মত সে এখন বোট-ডেকে। ঘড়ির উপর ছায়া ছায়া অন্ধকারটায় ঝুঁকছে। খোদা হাফেজ বলছে দুহাত উপরে তুলে।

উঠবে উঠবে করেও শেখর দেরী করে ফেলল উঠতে। সে জানে তাকে উঠতে হবেই। মোবারককে বোট-ডেক থেকে ধরে আনতে হবে। প্রতি রাতের মত বাংকে জোর করে শুইয়ে দিতে হবে। ঠাণ্ডা শীতের জন্য কম্বল ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করছে না। তার উপর হাত দুটো ভাল করে নিরাময় হয়ে ওঠে নি। একটি ঘোর অবসাদ শেখরকে ঘিরে রেখেছে। উঠবে উঠবে করেও উঠতে পারছে না। শুয়ে শুয়ে পাশের ফোকসালের টুংটাং শব্দ শুনছে। থালা-মগের আওয়াজ। কোন পরীদার বুলি নীচে নেমে দুনম্বর পরীর কিছু ঠিক করছে।

স্টিয়ারিং ইঞ্জিনটা খুব মোচড় খাচ্ছে। খাঁজকাটা বড় হুইলটা কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদছে। ঝড় ওঠার আগে প্রতি রাতে এমনি করে কাঁদে। শেখরের শব্দটা মুখস্থ হয়ে গেছে। এই শুনে ওর নূতন জাহাজী বুকটা ভয়ে ধুক ধুক সুরু করে। কম্বলের নীচে মুখ রেখে সে উঁঠি উঁঠি করে সব শুনল। সামনের পথটা ধরে কজন পরীদার গায়ে নীল উর্দি জড়িয়ে সিঁড়িতে উঠে যাচ্ছে। ওরা তিন নম্বর ওয়াচের পরীদার। সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দ কেমন হাল্কা। কেমন অসংলগ্ন। সমুদ্রের নীরবতা কত ভয়ানক, শব্দগুলো তাই যেন নির্দেশ দিচ্ছে।

উপরের ডেকে কিছু নাবিকের ফেরার শব্দ আসছে। অস্পষ্ট কথা বিনিময় হল। তিন নম্বর পরীদারেরা এখন গিয়ে অফিসার গ্যালীর ছাদে স্টোকলের প্রথম গরমটা এখান থেকেই সংগ্রহ করবে। এ দলে থাকবে মিঞা। বুড়ো বাদশা মিঞা। সকলের শেষে সে অনেকটা হামাগুড়ি দিয়ে অফিসার গ্যালীর ছাদে গিয়ে বসবে।

বাদশা মিঞা কুঁজো হয়ে গেছে জাহাজের কাজ করতে করতে। বছরের পর বছর

সফর দিয়ে হাজারো নাবিকের গল্প জমা করে রেখেছে। ওর সংগে পরী দিয়ে লাভ আছে। আগুন নিভিয়ে, ছাই হাপিজ করে কিছুটা কয়লা সুটের মুখে ঠেলে বাংকে সে বসবে গল্প করতে। বাদশা একের পর এক উজির নাজীরের গল্প করবে। শেষ পর্যন্ত সে গল্প করবে নিজের। পাঁচ নম্বর বিবিটা কি করে এক নম্বর বিবির ছাওয়ালের সংগে ভেংগে পড়েছিল আজকাল রসিয়ে রসিয়ে সে গল্পও করে।

নাঃ, শুয়ে থাকলে আর চলে না। উঠতে হবেই যখন তখন তাড়াতাড়ি ওঠাই ভাল। সোয়েটার গায়ে দিতে হবে। টুপি মাথায় পরতে হবে। অনেক কাজ। অনেক কাজ হাতে নিয়ে শেখর বাংক থেকে নামল। হাই তুলল। কিন্তু এমন করে আর কতদিন। আর কত বার কত রাতে তাকে টেনে টেনে নামাবে। বিরক্তিতে শেখরের মুখটা ছেয়ে গেল। তবু আলো জেবলে কম্বলটা টেনে নিতেই অবাক হল—এক অখন্ড বিস্ময় পাশের বাংকটাতে। সমুদ্রমানুষ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কম্বলটায় এক পাশে পড়ে থাকায় শীত ঢাকছে না ওর। হাতে হাত ঘড়িটা নেই। বালকেডেও ঝুলছে না। তন্ন তন্ন করে পেটি বদনা সব খুলল। সেখানেও নেই। কিন্তু মোবারকের বাংকের পাশে এসে দাঁড়াতেই আর এক হিমেল তরংগ গা বেয়ে নামতে থাকল। সব কিছু অবিন্যস্ত। অসংলগ্ন। পা দুটো, হাত দুটো—সব। মুখ থেকে লাল' গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তীব্র শীত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই।

হাতটা আস্তে বাড়াল। হয়ত শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে এতক্ষণে। কিন্তু হাতটা কিছুতেই সটান হয়ে পড়ে থাকা মানুষটার উপর যেতে চাইছে না। পারছে না একবার পরখ করে দেখতে মোবারক মরে ঠান্ডা হয়ে আছে কি না। চীৎকার করে ডাকতে চাইল—মো—বা—র—ক। কিন্তু কিছুতেই গলা থেকে ডাক উঠল না। তাই অসহায় বিবর্ণ ফোকশালের আলোতে শেখর কেঁদে উঠল—ঈশ্বর। কি হবে ? কি হবে! তবু শেষ প্রচেষ্টা ওর। কোনরকমে এবার হাতটা না বাড়িয়ে মুখ বাড়াল ওর মাথার কাছে। মুখের কাছে মুখ রেখে অত্যন্ত সন্তর্পণে পরীক্ষা করল, আছে কি নেই। ...এবার কাঁদবে কি চীৎকার করবে ভেবে পেল না। ভেবে পেল না ঈশ্বরকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবে না মোবারককে জড়িয়ে ধরে বলবে—মোবারক ঘুমোচ্ছে। ওর চোখে সমুদ্র-ঘুম। কিছুই করতে পারল না। যতক্ষণ পারল মোবারকের সমস্ত শরীরে কম্বলটা ঢেকে দিয়ে ওর মাথার উপর মুখ রেখে পড়ে রইল।

রাত তিনটার সময় কোন জাহাজীর সিঁড়ি দিয়ে ফোকশালে নামার ঠক ঠক আওয়াজে ঘুম ভাংগলো শেখরের। জেগে দেখল সে ঘুমিয়েছিল সমুদ্রমানুষের বুকের উপর মুখ রেখে। বুক থেকে মুখ তুলে সহজ হয়ে দাঁড়াল। চোখ রগড়ে নিজের কম্বল দুটো তুলে আনল বাংক থেকে--বিছিয়ে দিল সমুদ্র-ঘুম ঘুমিয়ে থাকা সমুদ্রমানুষের উপর। খুশিতে উজ্জবল হয়ে উঠল ওর মনটা। পরিতৃপ্ত হৃদয়। আর সে সময় দুটো হাত আপনিতেই জোড় হয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছে—খোদা, তুমি ওকে শান্তি দাও। ঈশ্বর, তুমি ওকে ক্ষমা কর। প্রভু, তোমার আশীর্বাদে সে তার পুরানো সম্পদ ফিরে পাক।

সমুদ্রে আজ কোন সংকীর্ণতা রইল না। সব ধর্ম সব মানুষের ভালর জন্য। সে জন্য বুঝি খোদা, ঈশ্বর, প্রভুকে ডাকতে গিয়ে গলা ওর আড়ষ্ট হয়ে উঠল। চোখ এল ঝাপসা হয়ে। মোবারকের অসহায় পান্ডুর মুখের দিকে চেয়ে খোদা ও ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে সে কেঁদে ফেলল।

রাত সোয়া তিনটার সময় স্টিয়ারীং ইঞ্জিনে তেল দিতে এসে তেলওয়ালা ইমরান

ডেকে গেল মোবারককে। ওকে ওয়াচে যেতে হবে। শেখর নিজের প্রায় শুকিয়ে-ওঠা আহত হাত দুটোকে একবার ভাঁজ করে আবার খুলল। পরীক্ষা করল ওর সামর্থটুকুকে। সমুদ্রমানুষ জাহাজে থাকায় দুনম্বর বয়লার, কোম্পানীর পুষে রাখা কসবী ওর সঙ্গে কিছুতেই বিদ্রূপ করতে আজ সাহস করবে না। তাই ইমরান ডাকলে ওকে বাধা দিয়ে বলল, মোবারককে ডেক না চাচা। ওর পরী আমি দেব। ওকে ঘুমোতে দাও। মোবারক ঘুমোক। খোদা হাফেজ।

———

# সমুদ্র-পাখির কান্না

দূর থেকে দূরান্তে ঘুঘু পাখির কান্নার মত সরে যাচ্ছে নারকেলের বাগান—তাল সুপারীর বন, ছোট বড় খুপড়ী ঘর, তেলের কল।

দু'পাশে জেলে-ডিঙিগুলো—নাচছে ওরা। ঢেউয়ের মাথায় ডিঙিগুলো কাঁপছে। দূরে জাল সরিয়ে নিয়েছে জেলেরা। জাল টানবে তারা। টাটকা ইলিশ ধরবে—বাজারে বলবে গঙ্গার ইলিশ।

একটা ফেরী পারাপার করছে দু'পারের পড়শীদের। ওরা তাদের দেখছে—ভাবছে আকাশ পাতাল।

এখানে পাটকলের চিমনীর ধোঁয়া আকাশটাকে আর কালো করছে না। নীল পাঁশুটে আকাশ। খুব উপরে গণ্ডা চারেক শকুন, খুব নিচে গণ্ডা দুই চিল। ডিঙির জেলেরা হাতে লাঠি নিয়ে এখন চিল তাড়াচ্ছে।

উজান বাইছে গঙ্গার নিচে ইলিশের ঝাঁকগুলো।

চোখ-ঝলসানো দুপুরের রোদ। মাঠে মাঠে ইঁটের ভাঁটা। দুটো গরুর-গাড়ি ইঁট বোঝাই। মাঠ ভেঙে গ্রামের দিকে ওরা চলেছে। গাড়োয়ান হাঁকছে—চল চল। কেমন একটা টাক্-ফাটানো শব্দ।

এত দূরে থেকে সে শব্দ অস্পষ্ট। জাহাজীরা সে শব্দ শুনতে পায় না। প্রপেলারটা গায়ে ছন্দ মেখে শব্দ তুলছে—ঝিক্ ঝিক্। বিচিত্র রকমের আওয়াজ। জাহাজীরা সে আওয়াজে অভ্যস্ত।

এ নদী ভারতবর্ষের নদী। নাম তার গঙ্গা। পারের মাটি বাংলাদেশ, চিল শকুন, গরুড় গাড়ি, টেনে টুনে শাড়ির আঁচল বাঁধা, শির শির করে কাঁপানো হাওয়া, সবুজ-ঘাস, নীল নীল আকাশ, কালো মেঘের ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি—এগুলো বাংলা দেশের গান। সবুজ-ঘাসে, অবুঝ-মনে দোল খাবার মত এই দেশ। বাংলা দেশ। ইতিহাস ভূগোল বলে, বঙ্গদেশ। সাহেবরা বলেন, বেঙ্গল। ও পারের জঙ্গলে খালের ধারে নিশুতি-রাতে চুপি চুপি যারা হাঁটে তাদের বলে, রয়েল-বেঙ্গল-টাইগার।

সেই দেশের একদল মানুষ বিদেশের মালবাহী জাহাজে জাহাজী হয়ে বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে।

দূরে—এ। অনেক দূরের দিগন্তে একটা ঝোপের মত ছোট্ট আকাশ। মেঝ-মালেম সেইদিকে হাত তুলে দিয়েছেন। একটা ঘন-নীল জলের পাশে সবুজ একটা দেশ। বিষণ্ন দেশ।

মেঝ-মালোম ডেকের উপর দাঁড়িয়ে একজন জাহাজীকে ডেকে বললেন, 'দ্যাট্স সুন্ডর-বন্ আই থিংক্। দ্যায়ার ড্যাড্ কিল্ড্ এ রয়েল বেঙ্গল-টাইগ্রেস্।'

—'দ্যাট্স মাইট্ বি!' সেই জাহাজী জবাব দিল। আত্মগত ভাবে বললে, 'রয়েল-বেঙ্গল-টাইগ্রেস্—মেয়ে বাঘ। মেঝ-মালোমের বাপ একটা মেয়ে-বাঘ খুন করেছিলেন।'

আমলদার ক'জন জাহাজীর সাহায্যে ফলগুা বাঁধছে। সেও শুনছে কথাগুলো। শুনতে তারও ভাল লাগছে। মেঝ-মালোমের বাপ একটা মেয়ে বাঘ খুন করেছে। মদৎ আছে, সাহেবের বেটা সাহেব। বিলিতি সাহেব। রং চটে গেছে বাংলাদেশের হাড়গলানো নোনা গরমে। পিঠের ঘা-গুলো দগ দগে লাল। ফোসকা গলে এমনটা হয়েছে।

গঙ্গার জল কেটে জাহাজ গিয়ে নামবে সমুদ্রে। জোয়ারে জোয়ারে নদীর মোহনায় গিয়ে পড়তে হবে। আজকে নিয়ে তিন জোয়ার লাগল। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের গঙ্গা। খাঁড়িতে জল কম। দু'দিন লেগে গেল কলকাতা বন্দর থেকে এতটা পথ আসতে। আজকের জোয়ারে জাহাজ উপসাগরে গিয়ে নামবে।

প্রপেলারটা তেমন পাক খাচ্ছে না। নিচ থেকে কাদা-জল তুলে আনছে। খাঁড়িতে জল কম বলে পাইলটকে জোরে চোং ফুঁকতে হচ্ছে।

ক্যাপ্টেন পায়চারী করছেন ব্রীজে। ব্রীজের দু' উইংসে এসে মাঝে মাঝে থামছেন। উঁকি দিচ্ছেন নিচে। ডেক জাহাজীদের উইণ্ডস্‌হোলে রং করা দেখছেন। পঁচিশ টাকার খালাসী বেঁটে খাটো মোটা মানুষ। তর তর ক'রে মাস্টে চড়ে ডাকছে, 'হেঁইও মিঞা, রঙের টবটা দাও!'

রগচটা আমলদার টেক্কা দিল কথায়।—আরে মিঞা রইয়া সইয়া কাম কর। সারা সফর ত পইড়্যা থাকল, এখন থাইকা এত ক্যান? বাড়িআলারে কাম দ্যাখাও বুঝি!'

পঁচিশ টাকার খালাসী এবার চেপে বসল।—'নিচ থাইকা কইতে মিঞা জুইত লাগে। ওপরে আইসা কথাটা কওত দ্যাখি—মরদের বাচ্চা তবে স্যান কমু।'

ব্রীজের দিকে চাইল আমলদার। বাড়িআলা ব্রীজে আছেন কি নেই দেখল। পাইলট কম্পাসটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। স্টীয়ারিং-এর উপর ঝুঁকে আছেন সুখানী সাহেব। বাড়ীআলা গেছে চার্ট-রুমে। মৌকা বুঝে কথা পাড়লো আমলদার। —'আরে ব্যাডা! ব্যাডার কথা শোন! কাম না কইরা আলমদার হইলাম না কি!'

অনুত্তম উঠে আসছে এন্‌জিন-রুম থেকে। কয়লার কালো নীল জাহাজী উর্দিটা। সমস্ত মুখে কালির ছোপ। ক্লান্ত। আস্তে আস্তে ডেকে পা ফেলছে। মাস্টের নিচে এসে সে ফল্কার উপর প্রথমবারের মত বসল।

পঁচিশ টাকার খালাসী ফলগুা থেকে বলছে, 'দিমু না কি রঙের টব উবুত কইর‍্যা।'

মুখ তুলে হাসল অনুত্তম।—'জাহাজে উঠে সকলকে তো দোস বলে জেনেছি। দোসের যদি এমন তরিবত হয় তবে দেবে রঙের টব উবুত করে।'

—কি রকম লাগছে নতুন সফর? বায়লটের গরমটা ক্যামন? বাবু-মানষের কি এ কাম সাজে!

অনুত্তমের বিষণ্ণ মুখ দেখে আমলদার ডেক-বড়-ট্যাণ্ডলের দয়া হ'ল। দড়িটায় আরো শক্ত ক'রে গিট মেরে বলল, 'যাও গোসল কর গা। দানাপানী দুইটা মুখে দ্যাওগা। চোখ মুখ কই গেছে গা।'

অনুত্তম ফল্কার উপর দু' পা তুলে আরো কিছুক্ষণ বসল। ড্যারিকের ছায়া ওর মুখে পড়েছে। গঙ্গার পশ্চিম তীরটায় একটা মাটি কাটা জাহাজ। ক'জন জাহাজী সে জাহাজটায় রেলিং-এ ঝুঁকে আছে। অনুত্তম হঠাৎ ডাকল, 'চাচা ও চাচা, এদিকটায় একটু শোনবেন?'

—আমারে ডাকছ না কি? বলে, ডেক-বড়-ট্যাণ্ডল কাছে এল। পাশে বসল। টুপিটা খুলে রাখল ফল্কার উপরে। টুপিতে রং লেগে রয়েছে। একটা বিড়ি হুস্‌ হুস্‌ ক'রে টানল ট্যাণ্ডল।

অনুত্তম বলল, 'আচ্ছা, দু'দিনে তো এতটুকু এলাম। জাহাজ সমুদ্রে পড়বে কখন?'

—ক্যান নদীটা ভাল লাগছে না? নিজের দ্যাশটা ছাইড়া যাইতে কষ্ট হয় না!

অনন্তম চুপ করে থাকল। কষ্ট হয়, সে কষ্টের কথা তার মনে মনেই থাক। জাহাজটা মালবাহী—তেল জন ডেক ক্রু, পঁচিশ জন এঞ্জিন-ক্রু। মেস-রুম-বয়, মেট বাটলার। ডেক-অফিসার, ক্যাপ্টেন, পাঁচ জন এঞ্জিনিয়ার। এপ্রেন্টিস দু'জন। জাহাজের সমাজ এবং সামাজিকতা এরাই। ডেক, এঞ্জিন-ক্রু অধিকাংশ পূর্ববঙ্গের। দু'জন মাত্র বাঙ্গালী হিন্দু এঞ্জিন-রুমে আছে। মন এবং মেজাজ মিলিয়ে এদের সংগে চলতে কষ্ট হয়। কাজেই দুঃসহ হয়েছে। তবু সে বলল, 'সমুদ্র আর কতদূর! গঙ্গার বুকে বুকে আর কত সময় কাটবে!'

—দুইটা দিন তো হইলের ব্যাডা! এতেই বিরক্ত হইয়া পড়লা!

বিরক্ত! বিরক্ত কেন সে হবে। তবে জাহাজ ছাড়ার সময় মনটা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। অনেকগুলো ছবির ভিতর সে মা, বোন, পড়শীকে ভেবেছে। মা বোন পড়শীর কথা ভেবে সে বেদনা অনুভব করেছে। বিরক্ত বোধ করে নি। কিন্তু কেন জানি জাহাজের এই দু' দিনকে মনে হয়েছে দু' সপ্তাহ। ডেকের উপর প্রচন্ড গরম, এঞ্জিন-রুমে প্রচন্ড খাটুনি। ঘুম আছে, খানা-পিনা আছে। গাল-গল্পও রয়েছে ডেকে। তার উপর রয়েছে জল, আর জল। রয়েছে জাহাজের প্রথম নোঙ্গর আর সফরের শেষ বন্দর—নিতান্ত আটপৌরে কথা। ডেকের উপর অনেক কৌতূহলও আছে, তবু কিসে যেন ফাঁক, কিসের অভাব যেন দু'দিনকে দুটো সপ্তাহ করে দিয়েছে। ঢাকাই ডেক টান্ডলকে সে অভাবের কথা বলতে পারছে না, বুঝতে পারছে না সে অনন্তমের দাহটা কোথায়।

অনন্তম বিস্মিত হল পারে পারে একটি মেয়েমানুষকে চলতে দেখে। সে বলল, 'দেখতে পাচ্ছেন চাচা ঢিবিটা মাড়িয়ে একটা মেয়েমানুষ যাচ্ছে!'

ডেক-বড়-ট্যান্ডল ঘাড় তুলে তাকাল।

ওর মাথার ঝুড়িতে কি আছে বলুন?

ডেক-বড়-ট্যান্ডল উত্তর করল না। ডায়মন্ডহারবারের কাছে ঢিবিটার নিচে শেষ-বারের মত মেয়েমানুষটা হারিয়ে গেল। গঙ্গার পারে পারে এতক্ষণ সে হেঁটে এসেছে। মাথায় ওর মোট। কাপড়টা টানটান করে পরা।

যে জাহাজীরা এতক্ষণ কাজ করছিল ডেকে, তারা রেলিং-এ এসে ভর করে দেখল অন্য একটা পৃথিবীকে। পৃথিবীটা ঢিবির ওপাশে হারিয়ে গেছে আর দেখা যাচ্ছে না। আর সে অন্য ঢিবিতে উঠছে না। ঢিবির এপাশে একটা গরু লেজ উঁচিয়ে মাঠের দিকে ছুটছে।

অনন্তম এবার ড্যারিকের ছায়া থেকে উঠে দাঁড়াল। জাহাজের যমুনা-বাজুতে বাঙ্গালী আগারওয়ালা হরিদাস সেনকে হাতের ইসারায় ডাকল, 'শোনেন।' কাছে এলে বলল, 'মেঝ-মালোম আপনার সংগে কি কথা বললেন?

—মেঝ-মালোম ব্রীজে যাচ্ছেন। তিনি বললেন, ব্রীজে দাঁড়িয়ে বাইনেকুলার দিয়ে কিছু দেখবেন।

—কি দেখবেন তিনি?

—কিছু দেখবেন হয়ত! গত সফরে এ ঘাটে অনেক মেয়েমানুষকে স্নান করতে দেখেছেন। এবার তারা স্নান করতে আসে কি না তিনি জানতে চাইলেন।

—আপনি কি বললেন মেঝ-মালোমকে?

—কি বলব আর! তবু বললাম, বোধ হয় কুমীরে ঘাট থেকে মানুষ নিয়ে গেছে।

ব্রীজে মেঝ-মালোম দাঁড়িয়েছিলেন। চোখে বাইনেকুলার। অনুত্তম তাও দেখল। মেঝ-মালোম বাঁ দিকের উইংসটায় দাঁড়িয়ে আছেন। দূরবীনের কাচটাতে এখন একটা মেয়েমানুষ মোট-মাথায় হাঁটছে।

মেঝ-মালোম হয়ত ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললেন, 'হাউ লাভলি!'

ক্যাপ্টেন এসে এইমাত্র মেঝ-মালোমের পাশে দাঁড়ালেন। তিনিও দূরবীনটা হাতে নিয়ে দেখলেন মেয়েমানুষটাকে।

ব্রীজে উঠে গিয়ে একবার দেখলে হত। যমুনাবাজার উইংসে ভর ক'রে বললে হত, এনি ওয়্যান সেকেণ্ড! কিন্তু বুড়ো ক্যাপ্টেনের মুখে অনেকগুলো রেখা। রেখাগুলো বুঝি জাহাজী জীবনের বন্দর পাওয়ার প্রতীক। মুখের রেখাগুলো সহস্র বন্দরের কথা বলছে। অনুত্তম আর ব্রীজে উঠতে সাহস করল না। মুখের উপর রেখা পড়ুক তখন উঠবে। সে আবার হাঁটতে থাকলো।

নদীর পূর্বদিকটায় আর একটা নদী এসে এখানে গঙ্গা-যমুনা হয়েছে। পাল তুলেছে দুটো নৌকা—পাটের নৌকা। ওরাও গিয়ে নদীর মোহানায় নামবে। নদীর পশ্চিম তীরে হাঁড়ি-বোঝাই অনেক কোষা নৌকা। নৌকার গলুই থেকে উনুনের ধোঁয়া উঠছে। নৌকার মাঝি কড়াইয়ে ইলিস মাছের ডিম ভাজছে। ভাজা ভাজা গন্ধ ডিমের। অনুত্তম জাহাজের গলুইয়ে উঠে জোরে শ্বাস নিল দু'টো। ভাজা ডিমের গন্ধে জিভটা ভারি হ'য়ে উঠল।

ডান দিকের গ্যালীটায় ডেক-ভাণ্ডারী ঝিমাচ্ছে। হাতে কাজ নেই ওর এখন। মেজাজের গল্প হচ্ছে ডেক কশপের সঙ্গে। গত সফরে ক্ল্যানলাইন কোম্পানীর সারেং সাবের কেচ্ছা কেত্তন হচ্ছে। হুস্ হুস্ পাইপ টানছে ভাণ্ডারী।

ডেক-কশপের হাতে রং-এর টব। রংগুলো ডেক-জাহাজীদের দিয়ে এসে একটু সময়ের জন্য গল্প করছে। গল্প করা তার অভ্যাস। দেশের গল্প, জোত-জমির-গল্প, তিন নম্বর বিবির গল্প। বড় দুঃখ তার, বিবিরা দেশে ফেরার আগে বেইমানী করে। তিন নম্বর বিবিটা এখনও ঠিক আছে। এবার দেশে ফিরে হয়ত তাকেও বেঠিক দেখবে। মিঞামাতব্বরদের ডেকে তালাক দেবে তখন। জাহাজীদের বিবি বদলানোটা সুখের নয়, স্বভাবের নয়—দুঃখের। কিনারার লোকগুলো তা টের করতে পারে না। অযথা গালমন্দ দেয়, দোষারোপ করে।

গলুই'র শেষ দিকটায় যেখানে কোম্পানীর ফ্ল্যাগ উড়ছে, সেই রেলিং-এ ভর ক'রে এঞ্জিন-ছোট-ট্যাণ্ডল গলা ছেড়ে গান ধরেছে। খুব খাটো মানুষ ট্যাণ্ডল। সামনের দু'টো দাঁত সোনায় বাঁধানো। যেমন কালো তেমন রোগা বিশীর্ণ মানুষ। গলার রগগুলো গুনটানা নৌকার মত ট্যাণ্ডলের দেহটাকে টানছে। রগগুলো ভাসা ভাসা। বুকে মাদুলি দুলছে সোনার। হাতের বাজুতে অনেকগুলো ফকির-দরবেশের কবচ আধ-কাঁচাপাকা মাথার চুল। মাথার ফেজ টুপিটা কপাল ঢেকে রেখেছে পিট পিট করছে চোখ দু'টো। খুব ছোট চোখ। অনুত্তমকে গলুইতে দেখে গান থামিয়ে দিল ট্যাণ্ডল। বললে, কিরে বেটা, লাগছে কেমন জাহাজটা! জাহাজ কলম্বোতে নোঙ্গর পাইলে কিনারায় নামবা না? মেয়েমানুষ ধরবা না!'

অনুত্তম জিব কাটল, 'কি যে বলেন চাচা!'

—বেটা জাহাজী হইছ, কিন্তু মনটা মেয়েমানুষের মত ক'রে রাখ্‌ছ ক্যান! গতিক বিতিক তোমার সুবিধার দ্যাখছি না।

—দেশে সফর শেষ ক'রে যখন ফিরব তখন পড়শীকে জবাব দেব কি? তা ছাড়া

ঘরে আমার মা বোন আছে।

—আরে কি যে কও বেটা! মা বোন কি আমার ছিল না? এখনও ঘরে বিবি বেটি সব আছে। কলম্বোতে গেলেই বোঝবা কেমন খত লেখে বিবি। চাচা ত ডাকলা বাতিজা। বাতিজার কাছে একটা আর্জি আছে চাচার। বিবির খতের জবাব কিন্তু তোমায় লিখ্যা দিতে হইব।

—দেব। চাচী যদি খত দেয় তবে নিশ্চয়ই দেব জবাব লিখে।

শুনে ছোট-ট্যান্ডল খুব খুসী হ'ল। আরো অনেক গল্প করল অনুত্তমের সঙ্গে। গত সফরের গল্প। গল্প করতে করতে ট্যান্ডল হি হি ক'রে হাসল। সোনার বাঁধানো দাঁত চিক চিক ক'রে উঠছে তখন।

অনুত্তম একটু রং চড়িয়ে বলল, 'হাসলে সোনায় বাঁধানো দাঁত দু'টো আপনার চমৎকার দেখায়।

এঞ্জিন-ট্যান্ডল এবার আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন।—'পাঁচ নম্বর বিবিও তোমার মতন কথা কইত। খসমের দুইডা দাঁত, দুইডা য্যান মানিক।'

অনুত্তম আরো সংলগ্ন হয়ে দাঁড়াল সাজাদ মিঞার। ট্যান্ডল সাজাদ মিঞা কয়লাওয়ালা থেকে আজ খোদ ট্যান্ডল। ন' কুড়ি টাকা মাসের রোজগার। খানা-পিনা কোম্পানীর। তা ছাড়া বে-ইজ্জতি মালের ব্যবসা আছে কিছু কিছু। ছোট বড় বন্দরে বন্দরে অনেক ছোট বড় চালান। তাতেও একটা মোটা রকমের মুনাফা আছে সাজাদ মিঞার।

গলুইর নিচে প্রপেলারটা জলের ভিতর ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করছে। জলের উপর রেখা টেনে টেনে আসছে জাহাজটা। অনুত্তম রেলিংএর উপর আর একটু ঝুঁকে দাঁড়াল। জল ঘোলা। নিচে পাখাগুলো অস্পষ্ট। বুদ বুদ শব্দগুলো জলের উপর উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

—চাচা?

—কিছু বলবে?

—কলম্বোতে যেতে আর কতদিন?

—জাহাজটা তেমন চলছে না। তবু জোর লাগলে ন'দিন। ন'দিন বাদে আমাদের জাহাজ আবার নোঙ্গর পাইব।

—কিনারায় ইচ্ছামত ঘুরতে পারব ত!

—নিশ্চয়ই পারবা। কোম্পানীর সাধ্য কি ধইর‍্যা রাখে।

—চিঠি পাব কি ক'রে?

—পাইলট আসব চিঠি নিয়া। কোম্পানীর এজেণ্টও আসতে পারে। তোমার চাচীও সে সঙ্গে খত দিব। খতের জবাব কিন্তু লিখ্যা দিবা। সকলের আগে আমার খতের দু'টা টান মারবা। চমি আমার পরীদার।

কতকগুলো পাখি এসে উড়ে উড়ে জাহাজের উপর বসল সেই সময়। গঙ্গায় যে উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো পড়ছে, ডুবে ডুবে এখন তাই খাচ্ছে তারা সাঁতার কাটছে। ভেসে বেড়াচ্ছে।

সুজাদ মিঞা বলল, 'এগুলো চিঁড়িয়া পাখি। জাহাজের পিছন পিছন এবা অনেকদিন পর্যন্ত উড়ে উড়ে চলব।'

খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল অনুত্তম। পাখিগুলো পায়রার মত। সাদা সাদা। পাখা দুটোর শেষ প্রান্তে ছাই-রঙের পালক আছে দুটো দুটো ক'রে।

—এত কি তন্ময় হয়ে দেখছ বাতিজা! দেখবা প্রশান্ত মহাসাগরের চিড়িয়া। চিড়িয়ার মত চিড়িয়া। পাখি যে এত বড় হয়, না দেখলে বিশ্বাস করবা না। সাহেবরা পাখিগুলিরে এ্যালবাট্রাস্ পাখি কয়।

অনুত্তম পাখিগুলির দিকে চেয়ে ভাবল—ট্যাণ্ডল সাজাদ মিঞা। বুড়ো সাজাদ মিঞা। কাঁচাপাকা দাড়ি। জবু থবু হয়ে হাঁটে। জবর জবর কথা কয়। শুকনো পানের পিচে মুখটা থুথুতে ভরে থাকে। ডেকের উপর টলে টলে হাঁটে। বুড়ো কাপ্তান ওর কাছে যমের মত। বাঙ্গালী পাঁচ নম্বর সাব ওর আপনার লোক। দু'দিনে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে।

অনুত্তম বুড়ো সাজাদ মিঞার পাশ থেকে সরে এসে ফোঁকসালে নামার জন্য পা বাড়াল। সিঁড়ি ধ'রে নিচে নামার সময় বাঁদিকের টুইন-ডেকের ফোঁকসালে দেখল জব্বর মিঞা পেট ফুলিয়ে পেটের নিচে তেল মালিশ করছে। পাশের একটা বাংকে কোরান সরিফের পাতা উল্টাচ্ছে জমীর। দু'নম্বর বাংকে জমীর সেখ একটা জালের নকশার উপর ঝুঁকে আছে।—অঃ মিঞাঃ! জমীর নিচ থেকে কাকে যেন ডাকল।

ডাক শুনে জব্বর মুখ তুলল।—কিত্ তা কও।

—জালের এ গিট শিখলা কি করি?

জব্বর মিঞা নিজের পেটের যন্ত্রণায় বাঁচছে না। তার উপর জমীর ভুইঞার কাণ্ডগুলোতে বেসামাল হয়ে পড়েছিল। জব্বর কোন উত্তর করল না।

—আরে মিঞা মুখিতে যে রা নাই।

—মুখিতে রা থাকে না ভুইঞা! তায়—তক্লিফ্ সবগুলি ও আমার। প্যাটের ব্যামোতে পরানটা জবইলা পুইড়া থাক, তুমি তোমার জালের নকসা লইয়া আছ। বিবির পরনাটারে দ্যাশে ফিরা সুখ দিতে চাইছ।

কথাগুলো শুনতে শুনতে আরো দু' সিঁড়ির পাক ঘুরে সে গিয়ে ঢুকল নিজের ফোঁকসালে। হরিদাস সেনের বাংক পার হয়ে তার বাংক। হরিদাস সেন কেমন যেন চুপচাপ থাকে। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে গঙ্গার উপকূলে চুপচাপ কি সব দেখে। সে এই জাহাজের আগওয়ালা। বয়লারে আগুন জ্বালায়, শাবলে কয়লা মারে। অনুত্তমের মত হরিদাস সেনকে কয়লা টানতে হয় না। কোল-বয়ের কাজ গত সফরে হরিদাস সেন শেষ করেছে।

কে যেন উঁকি দিল দরজার উপর থেকে। সারেং। লম্বা সাদা দাড়ি, পাক খেয়ে খেয়ে কোমর পর্যন্ত নেমেছে। বড় বড় চোখ দুটোতে অনেক সফরের বেদনা। অনেক সমুদ্র-তীরে জাহাজ ভিড়িয়েছেন নোঙ্গর ফেলে জাহাজের। অনেক বন্দরের নাম ভুলে গেছেন—তবু তিনি জানেন কলম্বো বন্দর থেকে কাঠের হাতি কিনে নেওয়া যায়। ডারবান থেকে বুয়েন-এয়ার্সে সে-হাতির আটগুণ দামে বিক্রি। ময়ূরীর পালকের পাখা দেখলে বুয়েন-এয়ার্সের সুন্দরী মেয়েরা ধূপছায়া অন্ধকারে ডান্সিগোর সামনে জেঁকে ধরে। বলবে, আমায় একটা। কত দাম? দাম নেই। সারেং পছন্দ-মত মেয়েগুলোকে একটি একটি ক'রে পালকের পাখা বিনা পয়সায় হাতে গুঁজে দিতেন।

সারেং চুপচাপ দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল। চোখ দুটোতে গোলাপী হাসি। তিনি হাসছেন। অনুত্তম ডাকলেই ভিতরে ঢোকেন। অনুত্তমকে কিছু তিনি বলতে চান।

জামা কাপড় ছাড়ার সময় বলল অনুত্তম, 'কি দেখছেন চাচা?'

—দেখছি তোমাকে।

—আমাকে দেখে লাভ ?

সারেঙ্গের কান দুটো লাল হ'ল।—দেখছি বাবু এমনিতেই।

গোঁফের রেখা দু'টো স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে অনুত্তমের। নরম নরম অথচ শক্ত সামর্থ চেহারা তার। বুকের পাঁজরাগুলো উষ্ণতায় ফুলে ফে'পে উঠছে। অনুত্তম উঠে এসে লকারটায় ভর দিয়ে দাঁড়াল।—চুপচাপ এত কি ভাবছেন ?

—ভাবছি বাবু তোমার মার কথা। সারেংকে খুব চিন্তিত মনে হ'ল।

অনুত্তম আড় চোখে চাইল। বুকের পাঁজরাগুলো আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

—আমার মাকে ভেবে আপনার কি হবে ?

—ভাবি, মা কেমন ক'রে এমন দুধের ছেলেকে তার বুকের কাছ থেকে ছাড়ে। জাহাজীদের ইজ্জত নাই বাবু।

—ইজ্জত নাই কেন ?

—ইজ্জত থাকে না। দেশেও না, বিদেশ বন্দরেও না। জাহাজী যখন হয়েছ তখন বুঝতে পারবা বাবু।

অনুত্তমের পাশে এসে বসল সারেং। লুংগিটা টেনে বসল। খক্ খক্ ক'রে কাসল দু'তিনবার। লক্ষ্য করল বালকেডগুলোতে কোথায় কাল দাগ পড়েছে। বললে, জাহাজ কলম্বো যাচ্ছে। কিছু রসদ নিব।

—কলম্বো পৌঁছাতে আমাদের কতদিন ? ফের প্রশ্ন করল অনুত্তম।

ছোট ট্যান্ডল বললে—ন'দিন।

হঠাৎ জিভ কেটে বলল সারেং, 'সোভান আল্লা, ভুলেই গেছি! তোমার তো আবার আটটা বারোটা পরী। গোসাল কইরা দানা-পানী দুইটা যা-হয় খাওগা। পরে এক লাচা ঘুম যাও। জাহাজ কিন্তু তোমার পরীতে দরিয়ায় পড়ব। জৈষ্ঠ আষাঢ়ের দিন। দরিয়ার অবস্থা বড় খারাপ। সারেংকে কেমন চিন্তিত দেখাল।—তুমি ত রে নতুন জাহাজী। বড় তকলিফ্, বড় কষ্ট। বলে সারেং নিজের ফোঁকসালে চলে গেল।

বড় তকলিফ্, বড় কষ্ট!' এ দু'দিন অনুত্তম বুঝতে পেরেছে কতটা তকলিফ্, কতটা কষ্ট।' চার ঘণ্টা একটানা পরিশ্রম ক'রেও স্যুটের মুখ [illegible]লার ভরতে পারে নি। আগওয়ালাদের ঠিকমত কয়লা দিতে পারে নি। বয়লারের জ্বলন্ত পোড়া কয়লাগুলো নামানোর সময় শ্বাস টানতে ভীষণ কষ্ট হয়েছে। হরিদাস সেন বলেছে —জাহাজ তো পুরোদমে চালুই হ'ল না। বয়লারগুলো কয়লা আর্ধেক খাচ্ছে না, এমন ক'রে এখন থেকে মুষড়ে পড়লে তো চলবে না।

এইমাত্র ফোকসালে এসে ঢুকেছে হরিদাস সেন। অনেকক্ষণ পর ডেক থেকে এইমাত্র নামল। খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। ধীরে ধীরে সে বাংকের উপর শুয়ে পড়ল। অনুত্তমের দিকে চেয়ে বলল, 'এখনও চান করলে না! কখন খাবে, কখন ঘুমাবে ? রাতে ফুল স্পিডে চলবে জাহাজ।'

—ফুল স্পিডে জাহাজ চলার সময় কত স্টীম রাখতে হবে ?

—দু'শ পঞ্চাশ।

—কলম্বো কতদূর এখান থেকে ?

—অনেক দূর। অনেক দিনের পথ।

—সেকেণ্ড অফিসার বাইনেকুলার দিয়ে ব্রীজ থেকে কী দেখছিলেন ?

—ঢিবির পাশে সেই মেয়েমানুষটাকে।

—আমরা দেখতে চাইলে দিতেন?

—মেঝ-মালোম ভাল লোক, হয়ত দিতে পারেন।

এবার পাশ ফিরে শুলো হরিদাস। অনুত্তম উপরে উঠে গেল। বাথরুমে চান করতে হবে। দু' টব জল পাম্প থেকে নিয়ে নিয়েছে। এখন পূবের আকাশটা কালো। উত্তরের আকাশটায় অনেকগুলো খণ্ড মেঘ জমে অখণ্ড হয়ে উঠেছে। স্নান সারতে সারতে সে সব দেখল। দু' তীরের সীমারেখা ক্রমশঃ দূরে সরছে। অনেকগুলো ছোট-বড় নদী এখানটায় এসে মিলেছে। বিচিত্র একটি শব্দ তুলছে জাহাজীদের কানে। জেলে ডিঙিগুলো আর নেই, দু' তীরের মানুষগুলো অস্পষ্ট। কোথাও হয়ত পুজো হচ্ছে। ঢাকের শব্দ, ঢোলের শব্দ। কাঁসির শব্দে অনুত্তম এবার মাকে ভাবল...ওরা এখন কি করছে! মা নিশ্চয়ই বাবার সঙ্গে বসে সংসারের গল্প করছেন এখন। পড়শী কি ভাবছে? সে হয়ত এখন অনেক দিন আগের এটকা চিঠি নিয়ে অন্যমনা।

গ্যালী থেকে একটা গন্ধ—দুর্গন্ধ। বাতাসে বাথরুমে সে গন্ধ বয়ে এনেছে। অনুত্তমের কাছে অপরিচিত নয় এ পচা গোস্তের সিদ্ধ গন্ধটা। এ সময়ে ভাণ্ডারী বিকেলের গোস্ত এক হাড়ি জলে শুধু সিদ্ধ ক'রে ঝুড়িতে তুলে রাখে। সন্ধ্যায় আর একটা নূন লংকার ছ্যাক ছ্যাক আওয়াজ গ্যালীতে। গোস্তটা তখন রান্না হয়। গোরুর গোস্ত—গাই গোরুর। ওদের পাপ-পুণ্য বলে বুঝি কিছু নেই।

গাই-গরুগুলি বাচ্চা দেয়। একবার নয়, দুবার নয়, সে অনেকবার গাই-গরুকে বাচ্চা দিতে দেখেছে। বাবা বলতেন, এখানে কি তোমার অনু? ভিতর বাড়িতে যাও। শৈল-গরুটা ত বাচ্চা হতেই মারা গেল। মার কি কান্না! মা সারা দিনরাত গরুটার জন্য জেগে ছিলেন। সারারাত ধরে গরম কাপড়ে লেজের নিচটা সেঁকেছিলেন। তবু শৈলটা বাঁচল না।

মা জানেন না জাহাজীদের কত দুঃখ। গাই-গরুর জন্য তাদের দুঃখ আরো বেশী। অথচ তার গোস্ত খেয়েই জাহাজীদের জাহাজে বাঁচতে হয়। নোনা পানীর ঢেউ গুনতে হয়। দেওয়ানী সহ্য করতে হয়।

—দেওয়ানীর কষ্ট, বড় কষ্ট। গ্যালী থেকে মুখ বার ক'রে বলল ভাণ্ডারী। ওর দাড়িটা শিং মাছের দাড়ির মত। সেই দাড়ি নেড়ে অনুত্তমকে ব্যঙ্গ করল।

—জ্যেঠা আপনি বুড়ো-জানে দেওয়ানী সহ্য করতে পারেন আর আমি যোয়ান মানুষ দেওয়ানী সহ্য করতে পারব না?

অনুত্তমের কথা শুনে ভাণ্ডারী গোস্ত কাটার চাকুটা জোরে জোরে ঘষল টেবিলের কাঠে। রাগে অনুত্তমের দিকে চোখ না তুলেই, বলল, 'বুড়ো জান! আরে—ব ব্যাডা তোমার মত আমারও একদিন জোয়ানকী ছিলরে।' সুঁচলো দাড়িটাতে খুব মোলায়েম ক'রে হাত বুলাল একবার। চোখের উপর রেখে চাকুর ধারটা পরীক্ষা করল। তারপর ধাই ক'রে পাশের একটা পচা গোস্তের টুকরোতে মানুষ খুন করার মত ছ্যাক ক'রে চাকুটা বসিয়ে দিল। ফিক ফিক ক'রে হাসল। বললে, 'কিরে ব্যাডা যোয়ানকীডা দ্যাখলা? বুড়া জান যোয়ান ব্যাডার সামিল, আশা করি বোঝলা।'

অনুত্তম সব বুঝেছে। বুঝেছে জাহাজে উঠে সব মানুষগুলোই কেমন ক্ষেপে গেছে। সে নিজেও নতুবা এতবার নিচ থেকে উপরে উঠছে কেন, উপর থেকে নিচে নামছে কেন! হরিদাস সেন চুপচাপ থাকে। মেঝ-মালোম দু' তীরের দিকে বার বার

বাইনেকুলার তুলে এত কি খুঁজছেন! সারেং সাদা দাড়ির ভিতর বিশদ কতকগুলো বন্দরের গল্প নিয়ে তাকে কি এত শোনাতে চায়। জব্বর মিঞা ভয়ে পেট উঁচু ক'রে রেখেছে। পেটে তেল মালিশ করছে অনবরত। কয়লাওয়ালার কাজটাকে ভয় পেয়ে সারেংএর ফালতু হিসাবে কাজ করতে চাইছে। পাঁচ নম্বর বিবির গল্প ক'রে সোনায় বাঁধানো দাঁত দু'টোর কত গরব আর কেরামতি, খতের ভিতর কত জান-পহচানের কথা লিখা থাকবে, ছোট-ট্যান্ডল প্রকাশ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

মেসরুমে বসে খাবার খেল অনুত্তম। তারপর রেলিং-এ ভর ক'রে দাঁড়াল। আকাশ দেখল—মেঘ মেঘ আকাশ, গঙ্গার ঘোলা জলে আকাশের ছায়া ধূলি-ধূসরিত। তীরের গাছগুলোকে, বাড়িগুলোকে ঝোপের মত মনে হচ্ছে। আগুন জ্বলছে একটা ঝোপের পাশ থেকে। ডেকের উপর কয়েকজন জাহাজী বললে, 'কার জানি সর্বনাশ হল।'

প্রথম জাহাজী গল্প আরম্ভ করল। অনুত্তম রেলিং-এ ভর দিয়ে শুনছে। জাহাজী গল্প আরম্ভ করল, আগুন লেগেছিল। সে রাত দুর্যোগের রাত। ঝড় প্রথম, তারপরে বৃষ্টি। আগুন নিভে গেছিল বৃষ্টিতে। সে আর তার স্ত্রী বৃষ্টি ভিজে সারারাত সেই ভস্ম-ধন-সম্পত্তি আগলে বসেছিল। কান্নাকাটি করেছে বিবিটা, "সব গেল সব গেল" বলে চীৎকার করেছে– তবু রাত ভোরে যখন পড়শীরা আর দাঁড়িয়ে নেই—তখন নাকি.....কি বলছে জাহাজীটা! ডেক জাহাজী মাজেদ বলল, 'তোর সেই বিবিটাই গলায় দড়ি দিয়েছিল?'

মাজেদের প্রশ্নটা ঝুলে আছে জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত। কোন উত্তর দিল না হারুন আলী। কাপ্তেন আর বড়মালোমকে গলুইর দিকে আসতে দেখে রঙের টবটা কোমড়ে ঝুলিয়ে সামনের একটা ড্যারিকে রং দিতে লেগে গেল। সর্বনাশ যার হয়েছে তার হোক। ওর কোন সর্বনাশ হয় নি। বিবি গলায় দড়ি দিয়েছে, বিবির নসিব নিয়ে ভেগেছে। গিয়েছে বলে আর একজন এসেছে। চৌধরীর বেটি নুরভানু এখন ওর পাছদুয়ারের ঘুর ঘুর করে। অমন বিবির নসিব ক'জনের কটা আছে।

মনে মনে হলপ করেছে মাজেদ সেখ—আর না। আর ফাঁকি না। এবার নিয়ে দু'দিনে তিনবার বড়-মালোমের সামনে পড়ল। তাড়াতাড়ি মাজেদ সামনের কয়েল করা হিবিল লাইনটা কাঁধে ফেলে লেহুদা চিৎকার করছে—'অঃ ভাই ডেক-কসপ, কোথায় রাখব হিবিং লাইনটা? শালার পো বড়মালোম যে এবারেও দেখে ফেলল।'

ডেক-কসপ ওপাশের গ্যালী থেকে বলল, 'যাও মিঞা, কামে যাও। দাঁড়াইয়া থাইক্যা আর সং দেখাইয় না।

মাজেদ হিবিং লাইনটা কাঁধে ফেলে ছুটে ছুটে সামনের ডেকে গেল। হারুন আলীর প্রথম বিবিটা মরেছে গলায় দড়ি দিয়ে, নুরভানু মরবে গলায় কলসী বেঁধে। কথাটা ভেবে কিরকম তৃপ্তি পেল যেন মাজেদ। সামনের ডেকে গোটা শরীরটা টেনে আনতে খুব কষ্ট হ'ল ওর। ইতস্ততঃ চেয়ে যখন দেখল কেউ নেই, বেশ আড়াল রয়েছে এই ডেক-ছাদটার নিচে তখন সে মৌজসে একটা বিড়ি ধরাল। বিড়িটা টানল কিছু-ক্ষণ—মেজমিস্ত্রি আবার আসছে! শালা ভোঁদকা হারামজাদা! মেজাজটা ওর তিরিক্ষি হয়ে গেল। পায়ের তলায় বিড়িটা আড়াল ক'রে মেজ-মিস্ত্রি কাছে আসতেই ইচ্ছে করে ফিক করে হেসে দিল। বললে, সেলাম সাব।

—সেলাম। গট গট ক'রে মেজ-মিস্ত্রি বের হয়ে গেলে বিড়িটা ডেক থেকে তুলে আরও দুটো টান দিল এবং মেজ-মিস্ত্রির পিছন ধরে ডাকল অবার, সাব?

মেজো-মিস্ত্রি মুখ ফেরালেন।

এবারেও মাজেদ হাসল। যেন দুনিয়াদারীতে সে ফকির দরবেশ।

মেজ-মিস্ত্রি যমুনাবাজুতে এক নম্বর উইংসের দিকে পা বাড়ালেন। মাজেদ সঙ্গে সঙ্গে এল—সাব?

মেজ-মিস্ত্রি রুখে দাঁড়ালেন—নন্‌সেন্স!

—শালা মদখোর। মাজেদ বাংলায় খিস্তি করল। তারপর মাথাটা নিচু ক'রে বললে, সাব টু পায়ণ্ট হ্যাভ। মাংতা সাব?

মেজ-মিস্ত্রি খুব খুসী হয়ে বলল, বাট...

—নো বাট সাব, নো হাউ মুচ্। টু স্মল, দাম পানি কা মাফিক। মাজেদ গলে গলে পড়ল।

মেজ-মিস্ত্রির চোখ জ্বলে জ্বলে উঠছে। তিনি আরো আড়ালে ডাকলেন মাজেদকে। এবং বিলি ব্যবস্থার আয়োজনটা পর্যন্ত করে ফেললেন।

কড়কড়ে নোটগুলো হাতে নিয়ে মাজেদ বলল, মী সারভেণ্ট সাব। ইউ অর্ডার, মী কেরি আউট। ইউ গিভ রুপি, আই গিভ ড্রিঙ্ক। মী গুড সাব। শালা মদখোর!

মেজ-মিস্ত্রি ঝুঁকে ঝুঁকে কেবল মাথা নাড়লেন। মাজেদ ডেক—ছাদের নিচ দিয়ে আর একবার দেখল তিন নম্বর মালোম দু' নম্বর ফল্কার উপর দাঁড়িয়ে কি করছে, বড় মালোম গলুই থেকে নেমে আসছেন কি না, তারপর আর একটা সেলাম ঠুকে হিবিং লাইনটা কাঁধে ফেলে সামনের ডেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনুত্তম দেখল মাজেদকে অদৃশ্য হয়ে যেতে। মাজেদটা বুনো হাতির মতন থপ থপ করে হাঁটে। ভিতরে ভিতরে কিসের একটা আফশোষ সব সময় চলছে। সারাটা দিন সে সাহেবদের আমলদারদের খিস্তি করে বেড়াবে। পদ্মপুকুরের সোলেমান সাহেবের রেস্তোরার গল্প, খোসবাই পাকাদাড়ি কালু বিশ্বাসের বড় বেটি হয়জুন বিবির গল্প, গান বাজনা, শরাব আর সাথি-সংগতের কথা বলবে বসিয়ে রসিয়ে। সন্ধ্যার পর ডেকজাহাজীদের হাতে যখন কোন কাজ থাকবে না তখন জাহাজী মানুষগুলো গলুইএর একটা বেঞ্চিতে মাজেদকে ঘিরে বসবে। কোন জাহাজী যদি গল্প শোনা শেষ না ক'রেই হাসতে আরম্ভ করে, মাজেদ বলবে, দেব না কি শালা তোরে এক থাপ্পর। কথা না বুঝেই তুমি হাসতে আরম্ভ করেছ। কালু বিশ্বাসের বড় বেটি আমায় বলে কি না—নিকা করতে চাও মিঞা? বড় সখ ত! নিকা করতে কাঁচা পয়সার মোকাবেলা লাগে। দেনমোহরের টাকাটা বাজানকে গুণে গুণে দিতে পারবা ত এ সফরে? পার ত আইস। বাজানকে বলে কয়ে দেখা যাবে'খন। কি জব্বর কথা কালু বিশ্বাসের বেটির!

মাজেদ হেসে হেসে কয়—জব্বর মিয়ার ফোলা পেট দেব না কি ফাঁসায়ে?

জব্বর চোখ দুটো ঈষৎ টেনে বলে, কিততা কও! অঃ কথা ন কইয়। তোর পেডটা দশ মাসের পেডটার মত। তুমি আবার কারে চোখ ঠাওরাও!

—আমারটা যদি দশ মাসের হয়, তবে তোমারটা দশ বছরের। অন্যান্য জাহাজীরা উচ্ছল হ'ল খিস্তি শুনে।—উঠবে মিঞা, পেট আমার কেমন দুগাইছে। জব্বর এই কথা বলে তখন ওঠে, নিচে নামে। বিড় বিড় করে মাজেদকে গাল-মন্দ দেয়।

অনুত্তম ডেকের উপর দাঁড়িয়ে হাসল। তারপর নিচে নেমে গেল। ফোঁকশালের চৌকাঠ পার হয়ে বাংকের উপর শুয়ে গড়াগড়ি দেবার সময় ডাকল, দাদা ঘুমোলেন?

হরিদাস সেন চোখের উপর থেকে কনুই সরিয়ে জবাব দিল, না, ঘুম আসছে না!

—আটটা-বারোটায় আপনারও ত পরী, ঘুমোন।

বালিশটা বুকের কাছে টানল অনুত্তম। উপুড় হয়ে থাকল। প্রপেলারটা ঘুরছে—জাহাজটা কাঁপছে। গত রাতে জাহাজের এই শব্দটার জন্য অনুত্তমের ঘুম হয় নি। হরিদাস সেনও সারারাত ছটফট করছে। গরমে হয়তো—জাহাজ কাঁপছে সেইজন্য হয়তো, কিন্তু হরিদাস সেন ভাল করে বলতে পারে, গরম কি জাহাজের কাঁপুনি, কি অন্য কোন মন, অন্য কোন সুখ, অন্য কোন জীবন। জাহাজের প্রত্যেক জাহাজী যে জন্য কেমন অশান্ত—উদ্বিগ্ন।

দুপুরটা গড়িয়ে গেল। গড়িয়ে গড়িয়ে অনেক দূরে গেল মনটা। অনেক-গুলো কথা মনে হ'ল। অনুত্তম অবাক হ'ল ভেবে, কথাগুলো বড় বেয়ারা। এমন ক'রে ত পড়শীকে কোনদিন ভাবে নি। পড়শীকে এমন ক'রে কোনদিন মনে হয় নি! জাহাজে উঠে বিচিত্র রকমের ভাবনাগুলোতে সে ডুবতে সুরু করেছে।

বিকেল। অনেকগুলো গড়ানো চিন্তার ভিতর অনুত্তম কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হরিদাস সেনের ঘুম আসে নি। সে গ্যালী থেকে এক মগে দু'কাপ চা এনেছে। অনুত্তমকে ডেকেছে। নিজে এখন চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে আত্মগতভাবে।

ডাক শুনে অনুত্তম উঠেছিল। চা খেয়েছিল। গড়াতে গড়াতে সিঁড়ি ধরে ডেকে গেছিল। দু' তীর তখন আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। বাংলা দেশের শেষ রেখা-দুটো আকাশ-সীমান্তে! দিগন্ত বেলায় মেঘের খণ্ডরূপের মত ভেসে উঠেছে সুন্দর বনের অসংখ্য দ্বীপগুলো।

সব জাহাজীরা জড় হয়েছে গলুইয়ে। সরল রেখার মত করে দাঁড়িয়েছে তারা। বঙ্গোপসাগরের নীল নোনা জলে চোখ মেলছে।

অনেকগুলো সমুদ্রপাখি উড়ছে জাহাজের পিছনে। এখন জাহাজের চারিদিকে পাখিগুলো ঢেউয়ের মত উঠছে নামছে। বাতাসের উপর পাখিগুলো পল্টন খাচ্ছে পায়রার মত।

গলুইয়ে অনেকগুলো জাহাজীর কণ্ঠ এক—ওরা হাঁকছে, আল্লা-হু-আকবর। সে চিৎকারে নোনাজল যেন কাঁপছে। বর্শার মত ছুটছে উড়ন্ত মাছগুলো।

এঞ্জিন সারেং দু' হাত তুলে কেমন পাগলের মত বলল, পাগলী এসে গেছি তোর বুকে। এখন তুই আর আমি। আমার খেলা তুই দেখবি, তোর খেলা আমি দেখব।

এ খেলার শেষ নেই, এ খেলার অন্ত নেই—সারেং ভাবল আত্মগতভাবে।

সমুদ্র-দর্শন এই প্রথম অনুত্তমের। নীরব সে। এই মুহূর্তের জন্য সাগরের এই বিশালতার ভিতর অন্য কিছু ভাবতে পারে নি। সমুদ্রের উপর সাগরের মত মনটাকে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হ'ল তাই। উড়িয়ে দিতে সখ গেল। সারেংএর মত বলতে ইচ্ছে হ'ল, পাগলী আমিও এসে গেছি।

পাশে এসে দাঁড়াল সারেং—অনুত্তমের সংলগ্ন হয়ে দাঁড়াল।

—চাচা কতকাল থেকে আপনার জাহাজে চাকরি?

—প্রথম লড়াইয়ের আগে থাইক্যা।

—লড়াই আপনি করেছেন?

সারেং সেই সময় জবাব না দিয়ে দূরে আঙ্গুল তুলে দিল—ঐ দ্যাখ বাবু, দূরে পাইলট জাহাজ। আগে পাইলট জাহাজে কাজ করতাম। প্রথম লড়াইয়ে পাইলট জাহাজের কয়লাওয়ালা ছিলাম। জাহাজটার কি নাম কওত?

—কি করে বলব ?

—লেডী ফ্রেজার। মাইয়ালোকের নাম। জাহাজটা তুফানে ডুবব না কোনোদিন। মাইয়ালোক ত—তুফানের মায়া-দয়া আছে।

—সমুদ্রে আপনি তুফান দেখেছেন ?

—তুফান! কি কও বাবু! তুফান দ্যাখি নাই! কতবার কত তুফানে পড়ছি তার কি শ্যাষ আছে। তুফানকে চিনি, দরিয়াকে চিনি। কখন কোন দরিয়ায় আসমানের কোন রঙে ক্যামন তুফান উঠবে তা আমি কাপ্তানের চাইতে ভাল কইতে পারি।

বারোটা-চারটে যাদের এঞ্জিনরুমে পরী তারা সকলেই বোট-ডেক ধরে নেমে আসছে। টুইনডেকে নেমে ওরাও চিৎকার করে উঠল, আল্লা-হু-আকবর। অনন্ত অসীম সমুদ্রের ওরা খোদাকে স্মরণ ক'রে সাহস ও শক্তি সঞ্চয় ক'রে নিল।

দূরে পাইলট-সিপ্ ছোট্ট এক ভেলার মত। মোহনায় ছোট ছোট নৌকো। জেলে নৌকো কি যাত্রী নৌকো দূরে থেকে ধরা যাচ্ছে না। মোহনা ধরে আর একটা জাহাজ ঢুকছে। টানা মরিসনের জাহাজ, সে জাহাজের নাবিকেরা হাত তুলে দিল—বিদায়!

হাত তুলে এরাও জানালে—বিদায় বন্ধু। তোমরা ঘরে ফিরলে, আমরা ঘর ছাড়লাম। অনেক গল্প জমা ক'রে দেশের মাটিতে গিয়ে যখন তোমরা পৌঁছবে তখন দরিয়ার উপর অন্য বন্দরের প্রতীক্ষায় উন্মুখ থাকব।

এরি নাম বুঝি সাগর-সঙ্গম—ভাবল অনুত্তম। পুণ্যার্থীরা এখানেই বুঝি পুণ্য সঞ্চয় করতে আসে। মৈত্র মহাশয় এখানেই বুঝি তীর্থস্নান লাগি এসেছিলেন একদিন। "পুণ্যলোভাতুরা মোক্ষদা কহিল আসি, 'হে দাদাঠাকুর, আমি তব হব সাথী।'...এও স্থির হল রাখাল যাইবে সঙ্গে। তখন শীতের দিন, শান্ত নদনদী, অনেক যাত্রীর মেলা, পথের বিপদ কিছুই নাই, যাতায়াত মাস দুই কাল—'তোমারে ফিরায়ে দেব তোমার রাখাল।" অঙ্গীকার করেছিলেন ব্রাহ্মণ।

এক সময়—

"চঞ্চল বালক আসি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অধীর উৎসুক কণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে
ঠাকুর, কখন আজ আসিবে জোয়ার ?"

জোয়ার যখন আসে দু'কূল ছাপিয়ে আসে। চন্দ্র-সূর্যের গাণিতিক নিয়মের জোয়ার আসবেই। দু'কূল ছাপিয়েই আসবে। না আসলেও ক্ষতি নেই। জাহাজ এসে ভিড়েছে এখন উপসাগরে। রাখাল বালকের মত অনুত্তম এখন জোয়ারের প্রতীক্ষা করে না। সে প্রতীক্ষা করছে অন্য একটা বন্দরের, অন্য একটা জগতের।

কলম্বো কতদূর ? আর কতদিন ?

'জল শুধু জল, দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল'—এখন থেকেই সে বন্দর চায়, তীর চায়। বন্দরে জাহাজ নোঙর করে মাটির গন্ধ পেতে চায় অনুত্তম। পড়শীর অনুরূপ একটি জগতের সঙ্গে মিশে গিয়ে জাহাজের দুঃখকে, সাগর আর আসমানের দুঃখকে ভুলে থাকতে চায়।

॥ ২ ॥

এ দুঃখ সকলের। সকল মানুষের।

উত্তরের দিকে শেষবারের মত চোখ তুলে দিল অনুত্তম।

দক্ষিণের আকাশ তখন শূণ্যে।

সুন্দর বনের অসংখ্য দ্বীপগুলো আর আকাশ সীমানায় ভাসছে না। পশ্চিমের আকাশে লাল রং। সূর্য আরব সাগরের তীরে ডুবে গেছে।

সুন্দর বনের অসংখ্য দ্বীপগুলোর আলো জ্বলবে এবার। আর একটু অন্ধকার হোক। পশ্চিম আকাশের লাল রংটা মাটির রং ধরুক। আমদানী রপ্তানীর ডিঙিগুলোয় মাঝিরা নামাজ পড়তে বসুক– তখন আলো জ্বলবে।

পাইলট-বোটের মাঝিরা দড়াদড়ি টানছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্টিয়ারি করছে সারেং।

জাহাজে মাঝি-মাল্লারা ঝুঁকল পশ্চিমের রেলিংটাতে। সমুদ্র দেখল পাইলট-বোটটাকে জাহাজের কিনারায় ভিড়তে দেখল। ডেক জাহাজীরা তখন দড়ির সিঁড়ি ফেলে দিচ্ছে। সিঁড়ি ধরে নামছে বাঙালী সাহেব। তিনি সিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে বোটের পাটাতনে নামলেন। হাত তুলে বিদায় জানালেন বড়-মালোম, মেজ-মালোম, কাপ্তানকে।

গড়্গড়্ করে উঠল বোটের মোটারটা। এবার তিনি চললেন, বোটের সারেং তখন দাঁড়িয়ে নিচের পাটাতনে। উপরের পাটাতনে দাঁড়িয়ে তিনি সিগারেট ধরিয়েছেন। সাগর আর আকাশের মাঝখানটার ধোঁয়াটা পাক খাচ্ছে এখন।

সমুদ্র থেকে দুটো মাছ লাফ দিয়ে উপরে উঠল একসঙ্গে। বর্শা ফলকের মত মাছ দুটো উপরের আকাশটাকে গেঁথে দিতে চাইল। ওদের অক্ষমতায় ওরা যেন লজ্জা পেয়েছে। নীল নোনা জলে হারিয়ে গিয়ে ফুটকরী তুলল দুটো লজ্জার শিরোনামায় দুটো আক্ষেপের কথা লিখে রাখল।

পায়লট সাহেবের বৌটা হয়ত আক্ষেপ করছে—একটা কথা বলতে ভুল হল। সাহেব বন্দরে রাত না কাটিয়ে সোজা ট্যাক্সি হাঁকিয়ে ঘরে ফিরে এলেই ভাল করতেন।

অনুত্তমের পাশে এন্‌জিন সারেং হরিদাস সেন উঠে এসেছে ফোঁকশাল থেকে। ভাণ্ডারী হাওয়া খাওয়ার জন্য পাটাতনের উপর পা ছড়িয়ে বসল। মেজ-মিস্ত্রি পিছিলের দিকে নেমে আসছেন। ভাণ্ডারী সেই দেখে বেশী হাওয়া খাওয়ার নাম করে উঠে দাঁড়াল। তিনি পিছিল ঘুরে যাবার সময়, বলল ভাণ্ডারী গুডমর্নিং সাব।

সারেং বলল, সেলাম সাব।

হরিদাস সেন বলল, গুড ইভ্‌নিং সেকেণ্ড।

অনুত্তম অপাঙ্গে চোখ বুলাল। মানুটাকে সে জুজুর মত ভয় করে। মানুষটা তাদের সব এন্‌জিন খালাসীদের বিধি-নিষেধের মালিক, সারেং-এর মা বাপ। ওয়েল্‌স দেশীয় তিনি। ছ'ফিটের উপর লম্বা। পিঠ তাঁর ধনুকের মত বাঁক দেওয়া। চোখ দুটো গোল গোল। নাকটা বাজ পাখির ঠোঁটের মত বেঁকে গেছে। চোয়াল ফজ্‌লি আমের মত ছুঁচ্‌লো—বাংলা পাঁচের মত দেখতে।

মেজ-মিস্ত্রিকে আসতে দেখেই অনুত্তম হরিদাস সেনের পিছনে নিজেকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। মেজ-মিস্ত্রি সিঁড়ি ধরে পিছিলের নিচে নেমে গেছেন। স্টিয়ারিং এন্‌জিনের কল-কব্জাগুলি দেখে যমুনাবাজু ধরে আবার গলুইতে উঠেছেন এবং টুইন-ডেকে নেমে গেছেন। এবার অনুত্তম ঠাট্টা করে বলল, কি জ্যাঠা, সন্ধ্যার সময়

সাহেবকে যে তুমি গুড-মর্নিং বললে। সাহেব ভাববে, তুমি ওর সঙ্গে মস্করা করেছ। নয়তো বলবে, পাগল।

ভাণ্ডারী ক্ষেপে গেল।...অঃ ব্যনাজী কি কইলা? আমি পাগল! আমি আমি মস্করা করছি! মাইজলা মিস্তিরিরে ডাইকা কই দিকি।

—কি করেন?

—কব ব্যনাজী কইছে আমি না কি আপনার সঙ্গে মস্করা করছি, আমি না কি পাগল!

সারেং অনেকদূর গড়াবে ভেবে ধমক দিল ভাণ্ডারীকে।—বাইছালী রাখ মিঞা। একটা ছোট ছাওয়াল তোমার সঙ্গে দুইটা হাসির কথা কইছে, তার লাগি ছোটবা তুমি মাইললা সাবের কাছে!

ভাণ্ডারী চুপ করে গেল। সকলেই চুপ করে গেল। হরিদাস সেন বললে, খানা খাবি চল অনুত্তম। কেন জাহাজে আজে বাজে কথা বললি? ভাণ্ডারী আবার একটা মানুষ না কি!

গ্যালী থেকে মুখ ভেংচে বলল ভাণ্ডারী, কয়লায়ালা একটা চাকরী না কি! জাহাজের কয়লায়ালা, দ্যাশের চৌকিদারী এক সামিলের কাজ রে! বড় বড় কথা ন কইয়। চিনি চিনি, কোন্ ব্যাটার কত ক্ষেমতা তা আমি জানি। গড় গড় করতে থাকল ভাণ্ডারী।

ওরা দু'জন তখন নেমে গেছে ফোঁকসালে। ভাণ্ডারীর শেষের কথাগুলি শুনতে পায় নি। খানাপিনার জন্য তারা বাসন আনতে গেছে। হরিদাস আর অনুত্তম এক বিশু। এক ডেকচিতে ওদের দু'জনের জন্য তরকারী আলাদা থাকে। একটা বড় এনামেলের থালাতে বসে দু'জন এক সঙ্গে খায়। খানা খেতে খেতে দু'জন দেশের গল্প করে।

সারেং সাব। ভাণ্ডারী গ্যালী থেকে মুখ বার করে ডাকল।

—আবার ডাক কিসের লাগি?

—ব্যনাজীর মত ছাওয়াল আমার ঘরে আছে।

—তা হইল কি?

—অরে আপে তাপে কথা কইতে বারণ কইর‍্যা দিয়েন।

—কিছু বে-তরী কইছে তোমার?

—কইছে না! কইছে না আপনে কন! ভাণ্ডারী আড়ষ্ট গলায় বলল।

—কি কইল, সাফ সাফাই কও ত দেখি?

—ব্যানাজী কয়, আমার না কি বয়েস তিনকুড়ি পার হইয়া গ্যাছে। নলী আমি জুচ্চরি কইরা বাইর করছি। আল্লা নাই আমার, আল্লা আমার কসুর ক্ষেমা দিব না।

সারেং গলুই থেকে চিৎকার করে, ডাকল, অনুত্তম, এই দুই নম্বর পরীর কয়লায়ালা!

অনুত্তম সেই চিৎকারে নিচ থেকে সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠল। এবং সারেংএর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, আমায় ডাকছেন সারেং সাব?

—তুমি ভাণ্ডারীরে কি কইছ?

অনুত্তম প্রথমে কিছু বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকল। একবার সারেং-এর দিকে আবার ভাণ্ডারীর দিকে চেয়ে আন্দাজ করতে চেষ্টা করল কিছুর। কিন্তু

অন্ধকার নেমে আসছে জাহাজ ডেকে। ওদের মুখ অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গলুইর আলো এখনও জালানো হয় নি। সে অন্ধকার খুব ভয়াবহ মনে হচ্ছে অনুত্তমের কাছে। সারেংএর রক্তচক্ষুতে সে অন্ধকার আরো গভীরতা পেয়েছে। একবার ইচ্ছা হল হরিদাস সেনকে ডাকে। বলে, দাদা ওরা আমায় ঠেলে ফেলে দেবে। আপনি তাড়াতাড়ি উঠে আসুন। কিন্তু কিছুই বলতে না পেরে আরো অসহায় অনুভব করল নিজেকে।

সারেং গ্যালীর দিকে এগিয়ে বলল, এই ভাণ্ডারী, ব্যানার্জী কি কইছে তোমারে কও ?

ভাণ্ডারী গ্যালী থেকে বের হল না। আলুর ঝুড়ি থেকে চর্বির ভিতর কতকগুলো কাটা আলু ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে ছেড়ে দিল। তারপর ছেনী দিয়ে নাড়ল আলুগুলোকে। সারেংএর কথার কোন জবাব দিল না।

সারেং অনুত্তমকেই জিজ্ঞাসা করল, তুমি কইছ ভাণ্ডারীরে তিনকুড়ির বেশী বয়স হইছে ? তুমি কইছ সে জোচ্চুরি কইরা নলী বাইর করছে।

অনুত্তমও হঠাৎ ভয়ানক হয়ে উঠল। রুক্ষমকণ্ঠে বললে, না আমি বলি নি। এ কথা আমি বলি নি। শুধু বলেছি, ভাণ্ডারী অত্যন্ত বেশী বয়সে আর জাহাজে এলেন কেন ? জাহাজে কাজ করার পক্ষে আপনার খুব বেশী বয়স হয়ে গেছে।

সারেং নিজেও জানে ভাণ্ডারী অত্যন্ত বেশী বয়সের মানুষ। লাঠি ঠুকে ঠুকে ফোকলাগাল হাঁটে। থক্ থক্ করে কাসে সারাদিন। সমস্ত গ্যালীতে দলা দলা কফ পড়ে থাকে। অনুত্তম এ নিয়ে দুদিন নালিস জানিয়েছে। ভাণ্ডারীর রাগ সে জন্য। কোথাকার নবাব এসেছেন! সমস্ত জনম ধরে সফর করেছি, গ্যালীর কাঁড় বরগা কতবার নষ্ট হয়েছে—কিন্তু এমন করে কেউ নালিশ দেয় নি।

সারেং তবু অনুত্তমকেই ধমকাল, ভাণ্ডারীর বয়স নিয়ে আর কিছু বলবে না। তারপর ভাণ্ডারীকেও তিনি ধমকালেন' তোমার হালে নিকা করা বিবিটার বাচ্চা হইব শুনছি, অথচ সাইন কইরা টাকা পাঠাও নাই—খুব সরমের কথা!

ভাণ্ডারী আর কোন কথাই বলছে না। খক খক করে কাসছে গ্যালীতে। গরমে ভীষণ ঘামছে। ঘামগুলো গামছায় মুছল। ভাজা ভাজা আলুগুলি একটি ঝুড়িতে তুলছে এখন।

অনুত্তমের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল সারেং, যাও—খানা খাইয়া ঘুমাও গা। আটটা-বারোটা-পরী। বয়লার ইণ্ডিয়ান কয়লা খাইতাছে। খুব পেরে সান। একটু থেমে আবার বলল, জাহাজে বাপ-মা সঙ্গে আসে না—সারেংই মা বাপ, অন্যায় করলে দুই দশটা কথা কইতে হয়। তার লাগি রাগ করন লাগে না। তোমার মা-বাপও তোমারে দুই চারটা ভাল মন্দ কথা কয়। অনুত্তম নিচে চলে গেল। খানা খেল একসময় হরিদাস সেনের সঙ্গে। হরিদাস সেন পোর্ট-হোলের ফাঁক দিয়ে সমুদ্রের অন্ধকারে আবার কি দেখতে সুরু করেছে।

অনুত্তম বলেছিল, দাদা কি দেখছেন অন্ধকারে ?

—তোর বৌদির মুখটা দেখছি। পোর্ট-হোল দিয়ে অন্ধকার সমুদ্রে ওকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই।

পাশের আর একটি পোর্ট-হোলে অনুত্তম মুখ রাখল। সামনে শুধু অন্ধকার। সমুদ্রে একটি অদ্ভুত বিষণ্ণ শব্দ। শোঁ শোঁ আওয়াজ দূরে, পাইলটসিপের আলোগুলি দুলছে। নীল, লাল, হলুদ, রঙের আলো। সারি সারি বয়ার মুখে আলো

জবলছে দপ্ দপ্। নিভছে, জবলছে—তেপান্তর মাঠে রাত গভীরে ভূতুরে আলেয়ার মত।

জাহাজ এমন সময় খুব ঝুঁকে পড়ল যমুনা বাজুতে, আবার গঙ্গা বাজুতে ঝুঁকে ওঠানামা করতে থাকল। অনুত্তম টাল সামলাতে না পেরে চিৎকার করে উঠল, দাদা, ও দাদা! এটা হচ্ছে কি!

হরিদাস সেন পোর্ট-হোলের ঘুলঘুলি থেকে মুখ তুলে হাসল। জাহাজের এই গঙ্গাযমুনার ওঠানামাগুলো নীল নোনা ঢেউ-র পরিহাস। উন্মুক্ত আকাশের নিচে উজ্জবল তরঙ্গে জাহাজ নেশাগ্রস্ত হয়েছে। একটু দুলবে। একটু টলবে। তার জন্য চিৎকার করলে হবে কেন।

অনুত্তম বালকেড্ ধরে ভয়ে ভয়ে চোখ বুঁজে ফেলল। হরিদাস সেনের হাসিতে সে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করছে। সে আর পারছে না দাঁড়াতে। সিঁড়ি ধরে সে নিচে নেমে গেল। স্টীয়ারিং এন্‌জিনে তেল দিল। ঘরে ঘরে দরজা ঠেলে উঁকি দিয়ে দেখল, দেওয়ানীতে কে কেমন আছে। সকলকে ডেকে ডেকে বললে আবার, মার মার কাট্ কাট্ অবস্থা আগুনওয়ালাদের। এক কয়লাওয়ালা পরীতে দু-দুবার করে পড়েছে। অনুত্তমের ফোঁকসালে ঢুকে বলল, বাঙালীবাবুরও বুঝি দেওয়ানীতে ধরল। প্রথম প্রথম একটু ধরবে। ঠেসে কাজ করবেন। তাহলে দেখবেন পাগলী কাহিল করতে পারছে না।

নিশ্চিন্তে একটু বসল সাত্তার।

হরিদাস অনুত্তমের বাংকে বসে অপেক্ষা করতে থাকল, ডংকীম্যান কখন বলবে, জোয়ান লোক, টাণ্টু। দানাপানি দুটো খাও। আর মাত্র......বলে, সময়ের উল্লেখ করবে।

সাত্তার এখনও কিছু বলছে না। অনুত্তম কখনও ওক দিচ্ছে। পোর্টহোলের ঘুলঘুলিতে সমুদ্রের জল উপছে পড়ছে। বাইরে ঝড়—দেওয়ানী। বাংকের উপর বসে থাকা যাচ্ছে না। অনুত্তমের চোখে মুখে নিদারুণ ক্লান্তি। নিদারুণ অস্বস্তি। সাত্তার বসে বসে বিড়ি টানছে।

হরিদাস আর প্রতীক্ষা না করে বলল, আটটা বারোটার পরীদারদের সময় হয়ে গেছে?

সাত্তার কোন জবাব দিল না। ধীরে ধীরে বাংক থেকে উঠে ফোঁকসালের চৌকাঠে পা রাখল। সে মানুষগুলোর, কয়লাওয়ালা আগুনওয়ালাদের মুখের ভয়ার্ত রূপটা দেখে তামাসা করার জন্য একবার মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। তারপর সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠার সময় বললে, সময় হয়ে গেছে। বয়লারে মার্ মার্ কাট্ কাট্। দু'শ পঞ্চাশ স্টীম্ কিছুতেই দিতে পারছে না আগ্‌য়ালারা। সারেং নিচে চলে গেছে। বয়লারের আগুন সামলানো দায়।

অনুত্তম ভয়ে ভয়ে বললে, দাদা কি হবে! আমি যে উঠতে পর্যন্ত পারছি না। উঠলেই মাথাটা পাক দেয়।

হরিদাস সেন কি বলবে! বলার কিছু নেই। সে চুপ করে বাংকের নিচ থেকে মগটা বের করল। উপরে যাবে। জল খাবে। হাতে মুখে জল দেবে। একবার ভয়ে বিবর্ণ মনটা বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করবে, মনের সঙ্গে জোরজবরদস্তি করে ডেক-জাহাজীদের সঙ্গে খোসগল্পে মাতবে। স্টোক্-হোল্‌ডের দুঃখটাকে সাময়িকভাবে ভুলে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

—দাদা, আপনি হেসে আমার তামাসা দেখছেন। বলছেন না কেন, এমন কেন হচ্ছে?

হরিদাস এবার আরো জোরে হাসল, তোর বৌদি বিশ্বাস করত না। সে কেবল হাসত। জাহাজের এই দেওয়ানী নতুন জাহাজীকে কত অসহায় করে তোলে তোর বৌদি অনুভব করতে পারত না।

জাহাজ সমুদ্রে পড়েছে।

অনুত্তম ধীরে ধীরে এবার বাংকে এসে বসল। মাথাটা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। খাবারগুলো উল্টে আসছে পেটের ভিতর থেকে। বাংকে বসে ওক দিতে আরম্ভ করল।

হরিদাস আর পোর্ট-হোলে দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেল এক গ্লাস জলে নুন মিশাল। বারবার ঢালাঢালি করার সময় ভাণ্ডারী বললে কিরে জোয়ান মরদরে ধরছে বুঝি ইবার! আমারে কয় বুড়া জান! ঠ্যালা ইবার সামলাও।

হরিদাসের ইচ্ছা হল ভাণ্ডারীর গলা টিপে ধরতে। দরজার উপর উঁকি দিয়ে বলল, মিঞা বদখত কথা কম বলবে। তারপর জলের গ্লাস নিয়ে নিচে নেমে গেল। ফোঁকশালে ঢুকে বললে, জলটা খেয়ে ফ্যাল্, গলাফাটানে বমিটা হয়ত কমবে।

হরিদাস সেনের এই কথাগুলোতে মায়ের কথা মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল বয়লারটা, মনে পড়ল মেজ-মিস্ত্রির বাংলা পাঁচের মত মুখটা বাংকারে হাজার টন কয়লা, কয়লাগুলো সব তাকেই টেনে এনে ফেলতে হবে নিচে। বমিটা উঠে আসছে কেবল। জলে পাওয়া রুগীর মত কাঁপতে কাঁপতে বাংকের উপর এলিয়ে পড়ল ভয়ে।

সময়টা এগিয়ে আসছে কচ্ছপের মত। একটা বিবশ জরাগ্রস্ত সময়। হরিদাস সেনের পর্যন্ত ভয় হচ্ছে সময়টার কথা ভাবতে। আটটা বারোটার প্রহরী। রাতে চার ঘণ্টা দিনে চার ঘণ্টা অমানুষিক খাটুনি।

এক নম্বর পরীর ডংকীম্যান পানি নিতে এসেছে পিছলে। স্টোক্-হোলডে এক টব পানি তিনজন ফায়ারম্যান আর দু'জন আগ্‌ওয়ালা আরো মিলে শেষ করেছে। গরমে ধরেছে মানুষগুলোর। আরো পানি চাই। সাত্তার এসেছে সেজন্য। গলুইর উপর উঠে সকলকে বলছে—নিচে বড় হালা-হাল্লি।

আকাশে মুঠো মুঠো তারা। এক আঁজল তারাকে সাক্ষী রাখতে হল। বলতে ইচ্ছে হল—তোমরা আমার পড়শীকে দেখো। পড়শী হয়ত জানালার গরাদে মুখ রেখে ওই এক আঁজল তারাকেই এখন দেখছে। অনুত্তম খুব খুশী হল ভেবে, পড়শীও হয়ত তার মত জাহাজী মানুষটার কথা ভাবছে। বলছে, বলতো সে এখন কোন সাগরে? বলতো সে এখন কি করছে?

অনুত্তম পোর্ট-হোলে চোখ রেখে অনেকক্ষণ উত্তর আকাশের এক মুঠো তারাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। দুটো তারা পাশাপাশি জ্বলছে। তারপর নিচে একটি, শেষে ত্যারচা হয়ে নিচের দিকে আরো চারটি তারা ক্রমশঃ নেমে গেছে। ওরা হয়ত পড়শীর জানালার উপর এখন উঁকি দিচ্ছে। একটি তারা হঠাৎ নিচে গড়াল। অদৃশ্য হল। পড়শী বলেছে, এই সময় তিনটি ফুল, এবং তিনজন ঋষির নাম করতে হয়।

—দাদা! আবার ডাকল অনুত্তম। হরিদাস সেনকে চুপ করে থাকতে দেখে সে আরো—ভয় পেয়েছে আমি কি করব বলুন। শরীরে আমার এতটুকু শক্তি নেই।

আমি পারব না, পারব না। সারেংকে আপনি ডেকে বলুন কিছু। সারেং এসে আমার অবস্থা দেখুক। ভয়ে অনুত্তম আবার বেশী করে ওক দিতে থাকল। বমি যা হবার হয়ে গেছে—এখন শুধু ওক। পিছিলঠা যখন খুব বেশী আকাশ মুখো হয় তখন অনুত্তম ওক বন্ধ করে হাঁফাতে থাকে। রেলিং-এ ভর করে বলে, দাদা সারেংকে দয়া করে বলুন আমি আর পারছি না।

হরিদাস সেন কিছু না বলে উপরে উঠে গেল। বিরক্ত বোধ করছে সে। সারেংকে ডেকে বললেই কি শুনবে! কেন এই জাহাজে কাজে আসা! আর আসা ত কয়লার জাহাজে কেন আসা! কয়লার জাহাজের মেহনতি, মানুষের যন্ত্রণা কি জানা নেই!

হাতমুখ ধুয়ে হরিদাস সেন নেমে এল আবার এক মগ চা করল। চা খেতে খেতে ডাকল, এবার ওঠ্। আর শুয়ে থাকতে হবে না। জামা কাপড় প'রে নিচে চল!।

অনুত্তমের ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সে শুয়ে ছিল, শুয়েই আছে। কোন জবাব দিচ্ছে না।

খবর পেয়ে এঞ্জিনরুম থেকে উঠে এসেছে সারেং গলুই পার হয়েছে ফোকসালে ঢুকে অনুত্তমের শরীরের উত্তাপ দেখল প্রথম। শেষে ওকে দু' হাতে টেনে তুলল - যাও, কাজে যাও। জাহাজে কেউ কারো মা বাপ না। তোমার পরী কে দিব? কোন্ লোক আর ফালতু আছে? উঠ উঠ—জামা কাপড় তাড়াতাড়ি পইরা নেও।

অনুত্তম ফ্যাল ফ্যাল করে সারেংএর মুখের দিকে তাকাল। কোন দয়া কোন মমতার চিহ্ন পেল না মুখটাতে। একবার ইচ্ছা হল বলে, আমাকে কলম্বোতে নামিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু মেজ সাহেবের গোল গোল চোখ দুটোর কথা ভাবতেই সে আঁৎকে উঠল। বাংক থেকে উঠে জামা-কাপড় বের করার জন্য লকার খুলল। জামা-কাপড় প'রে হরিদাস সেনের সঙ্গে গলুইতে উঠে গেল। সেই একমুঠো নক্ষত্র এখনো তেমনি আকাশে ঝুলছে। ওদের দিকে চেয়ে বলল, তাকে বলো আমি বাংকারে যাচ্ছি। সমুদ্রে ভীষণ ঝড়। আমাকে দেওয়ানীতে ধরেছে। ওকে বলো আমি এখন ওক দিচ্ছি।

একটা লোহার রড অবলম্বন করে দাঁড়াল অনুত্তম, সমুদ্র হতে জলের ঝাপটা আসছে। সে নিচের দিকে চাইল। জলের দিকে চাইল। অন্ধকারে ঢেউয়ের রেখা-গুলো অস্পষ্ট। দূরে এখনও সারি সারি বয়া। বয়ার আলো নিভছে, জ্বলছে। অন্ধকার গ্রামের ভিতর এমন অনেক আলো জ্বলত তার দেশে। এ দেশ অন্য দেশ। সমুদ্রের দেশ। এখানেও ফুটকরী ফুটকরী আলো জ্বলে। এখন হয়ত পড়শী কোন এক ফুটকরীর আলোতেই অন্যমনা।

ওরা দুজন টুইনডে পার হয়ে বোটডেকে উঠল। মেজ মালোম একটা ডেক-চেয়ারে বসে আছেন। বোট-ডেকের আলোছায়াতে তিনিও চুপচাপ। তিনিও আকাশের নক্ষত্র দেখছেন, কি বঙ্গোপসাগরের উত্তাপ নিচ্ছেন বোঝা যাচ্ছে না। বোট-ডেকের আলোছায়াতে মেঝ-মালোমকে খুব রহস্যময় মনে হল। চোখ দুটোর দৃষ্টি সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ অতিক্রম করে অন্য কোন এক আলোব পৃথিবীকে যেন খুঁজছে। হরিদাস সেন ডেক-চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে ডাকল, স্যার।

মুখ তুলে মেঝ-মালোম দেখলেন অনুত্তমকে হরিদাস সেনকে। অনুত্তমের প্রতি আঙ্গুল তুলে বললেন, ইয়ু নিউ-কামার, সিট—ডাউন হিয়ার। একটু থেমে মাথা

ঝাঁকিয়ে বললেন, কোল-বয়-জব-ভেরী ট্রাবল-সাম্ জব। বাট ডোণ্ট ফিয়ার।

আত্মগতভাবে বললেন, মেঝ-মালোম, উই আর সেলরস্ উই আর কার্স'ড। ম্যান এক্‌সেপ্ট ওম্যান। মান উইদ্‌াউট ক্যারেক্টার। থেমে থেমে বললেন তিনি, থেমে থেমে উচ্চারণ করলেন তিনি।

কেবিন থেকে কাপ্তানের কুকুরটা পোর্ট-হোলে মুখ বার করে ঘেও ঘেও চীৎকার করছে। মেঝ-মালোম মুখ তুলে চাইলেন উপরে। তিনি হাসলেন। বাঁদিকে ফানেলের সেড্‌টাতে বসে রয়েছে অনুত্তম। মেঝ-মালোমকে দেখছে। দেখতে ভাল লাগল। তিনি কেন হাসলেন। অনুত্তম প্রশ্ন করল, হোয়াই আর ইয়ু লাফিং স্যার?

—ক্যাপ্টেন্‌'স্ ডগ্ ক্রাইং ফর এ বিচ। মেঝ-মালোম আবার হাসতে থাকলেন ঠোঁট দুটো চেপে এবং পরক্ষণেই এমন গম্ভীর হয়ে গেলেন যে অনুত্তম এবং হরিদাস সেন কিছুই আর প্রশ্ন করতে পারল না।

অনুত্তমের শরীরটা আবার গুলিয়ে উঠল। একটি শব্দ নিচে—স্টোক-হোল্‌ডে। ফানেলের গুড়িতে দাঁড়িয়ে প্রথম প্রথম স্টোক-হোলডের দিকে চাইলে এমনিতেই মাথাটা ঘুরে উঠত। আজ জানি কি হবে—অনুত্তম ভেবে সারা হল। শব্দটা এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে। আল্লা-হু-আকবর--তিনজন মানুষের চিৎকার। ওরা কিছুক্ষণ আগে নেমে গেছে। বয়লারের গরম আর কালো কয়লার চাঙগার দেখে ওরা ভয় পেয়েছে; পুরানো জাহাজী বলে শরীরটা গুলিয়ে উঠছে না।

দু'জন লোক উঠে এল সিঁড়ি ধরে। ফানেলের গুঁড়িতে এসে একটা মানুষকে ওরা বোট-ডেকে শুইয়ে দিল। ফিট্ গেছে এক নম্বর পরীর কয়লায়ালা মনু। আগওয়ালা দুজন এখন হাঁপাচ্ছে। উইণ্ডস্‌হোলের উপর হেলান দিয়ে ওরাও কুকুরটার চীৎকার শুনল।

অনুত্তম ভয়ে এখন ওক দিল ক'বার। ধমকাল হরিদাস সেন, এই নিচে যা! এখানে দাঁড়িয়ে আর ঢং করতে হবে না।

মেঝ-মালোম ডেক চেয়ার থেকে উঠে এসে দেখলেন মনুকে। কোন কিছু বললেন না। কেবিন থেকে এক পুরিয়া ওষুধ এনে খাইয়ে দিলেন।

ওরা দুজন আবার মনুকে কাঁধে নিল। হন হন করে সোয়ারীর মত বোট ডেক পার হল। সিঁড়ি ধরে নামল কুইন-ডেকে। তারপর গলুই। গলুইয়ে অনেক জাহাজী। ওরা ভিড় করেছে।

সারেং সিঁড়ি ধরে খুব তাড়াতাড়ি স্টোক-হোলড্ থেকে উপরে এসে উঠেছে। ফানেলের গুঁড়িতে এসে চিৎকার করে বলল, আরে মিঞা, মনুকে গোসল করাবা না সোজা ফোকসালে নিয়া ফেইলা রাখ। আরো কিছু বলতে বলতে বোট-ডেকের উপর দিয়ে গলুইর দিকে ছুটল।

এরি নাম বুঝি হালাহালি—সিঁড়ি ধরে নামার সময় ভাবল অনুত্তম। মনুর মত যোয়ান মরদ পরীতে পড়েছে। অনেক নিচে স্টোক-হোলড্। প্লেটের উপর মানুষ-গুলোকে পুতুলের মত মনে হল। সেখানে বড়-ট্যাণ্ডল আর একজন আগ্‌য়ালা বয়লারগুলোর খবরদারী করছে। দুনম্বর পরীর আগ্‌ওয়ালা টলতে টলতে গিয়ে নামছে। স্টিম-কাক্‌গুলোর ফ্যাচ ফ্যাচ শব্দের ভিতর এক এক করে ওরা নেমে গেল।

ছোট ট্যাণ্ডল নেমে আসছে সকলের শেষে। সিঁড়ি ধরে নামার সময় সেও

চীৎকার করল—জাহাজে বড় হালাহালি। ডর পাবা না মিঞারা। ডর ধরলে সব গেল। মনুর মত তবে অজ্ঞান হয়ে যাবা।

কথাগুলো নিজের পরীদারদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে ছোট ট্যান্ডল। তার পরীর মানুষগুলি ভয় পেলে তার বদনাম ; ট্যান্ডেলী করে করে সে এ কথাটা বেশ ভাল বুঝেছে।

স্টোক-হোল্ডে নামতে তিনটি সিঁড়ি ভাঙতে হয়। দু'নম্বর সিঁড়ির গোড়ায় এসে দেখল তিনজন লোক তিনটি বয়লারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্টীম গেজটা দেখছে। বয়লারের আগুনের হল্কাতে ওদের মুখগুলো শুকিয়ে উঠছে। চুল্লোর দরজা খুলে এখন ক'শাবল কয়লা হাকড়াল।

অনুত্তম আর নিচে নামল না। এখান থেকে দুটো পথ দুদিকে চলে গেছে। ডানদিকের বাংকারে সে ঢুকবে। হেঁটে এসে দরজার সামনে সে দাঁড়াল। দরজার মুখে অসীম অন্ধকার। বাদুরের ডানার মত সে অন্ধকার ওকে গ্রাস করতে চাইছে। একটা ভুতুরে শব্দ উঠছে ভিতরে। দরজার মুখে প্রথম বারের মত সে থামল। ওর ভয় ভয় করছে।

হরিদাস সেন তিন নম্বর সিঁড়ি থেকে মুখ বার করে বলছে, ভয় নেই আমরাও আছি। মনের জোর কিন্তু হারাবি না।

অন্ধকার বাংকারে এবার উঁকি দিল অনুত্তম। মুশকিলাশানের মত একটা কালো লম্ফ জ্বলছে দপ দপ করে। ভিতরে আর কোন আলো নেই। সেই আলো অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না। শুধু একটি শব্দ আসছে—নিশ্চয়ই এক নম্বর পরীদার মজিদ এখন গাড়ি টানছে। আস্তে আস্তে অন্ধকার বাংকারটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দূরে এক কোণায় ভুতুরে ছায়ার মত মজিদের দেহটা একটা শাবল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মজিদ স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। ওকে চেনা গেল না। বাংকারে ঢুকে অনুত্তম লম্ফটা হাতে নিল। মজিদের মুখ দেখে সে হাসল। বাদুরের ডানার মতই রং হয়েছে মুখে। লাল চোখ দুটো পিট্ পিট্ করছে। স্যুট্ তখনও ভরতে পারে নি। তাই শাবল টানছে, গাড়ি টানছে, কয়লা ফেলছে স্যুটের মুখে অনবরত। ঘামে নীল জামা, কোর্তা সব ভিজে গেছে। কয়লার ধূলায় নাকটা পর্যন্ত বন্ধ। ভূতোরে অন্ধকারটার মতই সে নাকি সুরে কথা বলছে, আইলা ব্যনার্জী। বইস।

মজিদ পা দুটো ছড়িয়ে বসল প্রথম। পরে বাংকারের প্লেটের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল—একটু জিড়াইয়া লই। হাত দুইটা পা দুইটা কুলাইতে পারতাছে না আর। বিড়িটা আঙ্গাইয়া দিবা? বলে একটি বিড়ি পকেট থেকে বের করে দিল।

জাহাজটা ভীষণ গঙ্গাবাজু-যমুনাবাজু হচ্ছে বলে ঠেলাগাড়ির উপর শাবলটা ঠুং ঠাং শব্দ করছে। এপাশ ওপাশ হচ্ছে মজিদের মাথাটা। হাত দুটো পা দুটো স্থির থাকছে না।

অনুত্তম ওক দিতে দিতে বসে পড়ল। কতকগুলি জল এসে পড়ল মুখ থেকে, হাত দুটো প্লেটের উপর ভর করে বলল, যমুনাবাজুর বাংকার কে দেখছেরে?

দুর্ভাগ্যের হাসি হাসল মজিদ। হঠাৎ উঠে বসে পড়ল। বলল, এই হারাম। মুখটা নাচিয়ে নাচিয়ে বলল, যোয়ান পুত্ ঘরে আছেরে ব্যনার্জী—ছাওয়ালটা ভাবে বাজান জাহাজে কাজ করে, কিটা না একটা করে। মাইয়াটা তক কইয়া বেড়ায়, বাজান একটা দুইটা টাকা পায়ন, চার কুড়ি দশ টাকা পায়।

সহসা মজিদ চিৎকার করতে আরম্ভ করল। কান্নার মত সে চিৎকার। সমস্ত

বাংকার গুম গুম করছে। সে গান করছে—আরে আমার সাধের মিঞা ভাই, তিন দাঁড়িয়ার কুলে আমি সাধের ডিঙ্গা বাই।

এবার উঠে দাঁড়াল সে। শাবলটার উপর ঝুঁকে শক্ত-সমর্থ হতে চাইল। তারপর শাবলটা কাঁধে ফেলে গাড়িটা টেনে জোয়ান মানুষের মত হাজার টন কয়লার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

—আর এখানটায় বইসা ওক দিলে কি হইব রে ব্যানার্জী। চল, তলায় যাই। আবদুল ডাকল অনুত্তমকে।

আবদুল অনুত্তমের জুড়িদার। একসঙ্গে নামবে বলে সে সিঁড়ি মুখে প্রতীক্ষা করছে।

স্টোক-হোল্ডে নেমে গেল ওরা দুজন।

হরিদাস সেনের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল অনুত্তম,—দাদা!

হরিদাস সেন মুখ ফেরাল। চোখ দুটো সেনের জ্বলছে। ফোঁকসালের চোখ দুটো অন্য। অনুত্তম ভয় পেল ফের কথা বলতে। দাদার গলার রগগুলো এখন এক এক করে ভেসে উঠছে। মানুষ-খেকো বাঘের মত সে বিরক্ত বোধ করছে। দ্বিতীয়বার আর ডাকতে সাহস করল না সে। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দাদার পোর্ট-হোলের মুখটা ভাবতে চেষ্টা করল। এক পা দু'পা করে সরে এসে ট্যাণ্ডেলের মুখোমুখি দাঁড়াল তারপর।

ট্যাণ্ডেল পর্যন্ত একবার চোখ তুলে অনুত্তমকে দেখল না। সে স্টিম গেজটা দেখছে। ভাবছে এখন চুল্লা টানবে কি পরে চুল্লা টানবে। এক এক করে তিন বয়লারের চুল্লাগুলি গোড়ালি উঁচু করে দেখল।

এই স্টোক-হোল্ডের মানুষগুলোকে অনুত্তম চিনতে পারছে না। ওরা বয়লার-গুলোকে নিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে যেন। ওরা কেউ কাউকে চিনছে না—যেন ওরা এখন অন্য দেশের মানুষ। ওদের সম্পর্ক বয়লারের সঙ্গে, আগুনের সঙ্গে। অনুত্তম সমস্ত স্টোক-হোল্ড ঘুরেও ফোঁকসালের কোন পরিচিত ব্যক্তিকে খুঁজে পেল না। ওর জুড়িদার আবদুল পর্যন্ত ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছে। এই সব দেখে সে আবার ওক দিতে আরম্ভ করেছে। টলছে দেহটা। জাহাজের পল্টন খাওয়া এখানেও রেহাই নেই।

এক নম্বর বয়লারের আগ্‌ওয়ালা চিৎকার করছে তখন, আগুন আগুন। পানী পানী! জলদি পানী মার।

অনুত্তম টলতে টলতেই দু ঠ্যাঙের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করল এবং আবদুলের সঙ্গে সি-ওয়াটার-কক্‌ থেকে দু'বালতি জল নিয়ে ছুটল। র‍্যাগ দিয়ে এক নম্বর আগ্‌ওয়ালা আগুন টেনে নামাচ্ছে তখনও। চুল্লা টানছে—পরিষ্কার করছে চুল্লার ভিতরটা। পোড়া কয়লা সব ফেলে দিচ্ছে। ট্যাণ্ডেল জানোয়ারের মত হাঁকল, আরে শালা কয়লায়ালার দল, তোমরা আমরা বিবির বুকের তামাসা দেখছ না কি। পানী নিয়ে দৌড়াতে পারলা না!

বয়লারের তিন চুল্লা। তিনটি করে চুল্লা টানতে হবে আগ্‌ওয়ালাদের। বাঁ দিকের চুল্লাগুলি সকলে টানছে। চার ঘণ্টা ধরে যে কয়লা বয়লার খেয়েছে এখন সেই আগুন-গুলিকেই নামানো হচ্ছে সব। আগুনের উপর পানী ঢেলে দেওয়ায় সমস্ত স্টোক-হোল্ড অন্ধকার। আগওয়ালার উইন্ডস্‌হোলের নিচে দাঁড়িয়ে শ্বাস নিতে পারছে—কয়লাওয়ালাদের সে সুযোগ পর্যন্ত নেই। হরিদাস তখন চিৎকার হাঁকছে পাগলের

মত, আগুন নয়, খুন খুনে! খুন গীরছে। পা......নী। চোখ বুঁজে বলছে, কয়লা-য়ালারা গেল কৈ সব!

বেহুঁশ হয়ে অনুত্তম জল ঢেলে দিল হরিদাসের উপর। আবদুল সেই ছাই অন্ধকারে ধাক্কা খেয়ে প্লেটের উপর গড়িয়ে পা-টা জ্বালিয়েছে। তবু সে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। কক্ থেকে পানী এনে বলছে—দিমু না কি সব পানীটা বয়লারে চুলাতে ঢাইলা? সব আপদ চুইকা যাইব তাইলে।

তিনজন আগ্‌ওয়ালা ন'চুলার আগুন টেনে শেষ করল সব। জল দিয়ে সে আগুন নেভানো হয়েছে। জমা হয়েছে ছাইগুলো দুনম্বর বয়লারের সম্মুখে। শাবল টানতে অনুত্তমের পিঠ কুঁজো--শির-দাঁড়ায় হিমেল স্রোত নামছে। সে সোজা হয়ে শাবল টানতে হবে—সমস্ত ছাইগুলি হাপিজ করতে হবে ভেবে ওর কান্না পেতে থাকল। ট্যান্ডেলকে বসে থাকতে দেখে বলল, চাচা মেহেরবাণী করে একটু হাত লাগাবেন?

ট্যান্ডেল প্রথম বললে না কিছু। আমলদার মানুষ, কম কথা বলতে হয়। তাই ফিক্ ফিক্ করে হাসল। পরে খুব মৌজ করে আমলদারী ঢং বদলে দিয়ে বলল, মাত্র আর আট দিন। দেখতে দেখতে চলে যাবে। খত আসবে দেশ থেকে—বিবির খত। বন্দর পাবে সামনে--মেয়েমানুষ পাবে সে দেশটায়—এই আগুনের জ্বালা, সব পেরেসান ওখানটায় মেয়েমানুষের বুকের ঠান্ডায় জুড়িয়ে নেবে। চালাও চালাও, হাত চালাও, শাবল চালাও।

অনুত্তম ওক দিতে দিতেই ছাইগুলো শাবলে এ্যাস্-রিজেক্টরে ভরে দিতে থাকল। আবদুল উপরে উঠে উইন্‌চ্ চালাচ্ছে। এক নম্বর আগ্‌ওয়ালা বিদ্রূপ করে বলছে, ঢিপলা দ্যাওরে মিঞা মুখে, তবে আর ওক তোমার উঠব না।

হরিদাস সেন এবার ক্ষেপে গেল, এই হারামজাদা রয়ে সয়ে কথা ক'বি। নয়তো র‍্যাগটা দিয়ে দেব মাথা চৌচির করে!

এখন হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে অনুত্তম। দাঁড়াতে ওর কষ্ট হচ্ছে। এতক্ষণ বেহুঁশ হয়ে কাজ করেছিল বলে স্টোক-হোল্‌ডের একশ চল্লিশ ডিগ্রি উত্তাপকে অনুভব করার ফুরসত পায় নি। এই উত্তাপ ওর বুকের রক্ত সব শুষে নিয়েছে যেন। সে কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে উইন্ডস্-হোলের নিচে এসে পড়ল। কোন রকমে জলের টবটা তুলে ঢক ঢক করে সব জলটা খেয়ে ফেলেতে ইচ্ছে করল।

ছুটে এসেছে হরিদাস সেন।—আরে করছিস কি! করছিস কি! এখন জল খেয়ে মরবি যে। জলের টবটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ট্যান্ডেলের জিম্মায় রেখে দিয়ে বলল, তুই জিরিয়ে নে, আমরা সবাই মিলে ছাইটা হাপিজ করে দিচ্ছি।

ট্যান্ডেল কয়েক শাবল ছাই টানার সময় কথাটা স্মরণ করিয়ে দিল আবার। তিনি ফিস ফিস করে বললেন, মনে থাকে যেন ব্যানার্জী। একদিকে জাহাজ নোঙর পাইব, অন্যদিকে তুমি তোমার চাচীর খত লিখতে বসবা। মনে রাখবা আমি তোমার আমলদার। বিবি আমার যোয়ান বিবি। খুব মোলায়েম ভাষায় দু চারটা টান দিয়ে দিবা। বিবি যেন বোঝে ওব লাগি দরদ আমার কত! বলে হি হি করে অনর্থক ট্যান্ডেল হাসল। অনুত্তমের কানের কাছে মুখ রেখে বলল, বিবি আমার জান-রে ব্যানার্জী। বিবি আমার পরানের বাদশাহী।

ট্যান্ডেলের কথা শুনে অনুত্তম এই প্রথম হাসল স্টোক্-হোল্‌ডে। নিজের মেহনতি জীবনটার জন্য যেমন দুঃখ, ট্যান্ডেল চাচার এই কথাগুলি শুনেও তেমনি দুঃখ হয় অথচ হাসি পায়। দুঃখটা হাসি হয়ে ঠোঁটের উপর ভেসে ওঠে। ট্যান্ডেল

বিবি বিবি করে পাগল। ভান্ডারী সাইন করে বিবির নামে টাকা পাঠান নি। সারেং সাব ধমকেছে সেজন্য।

ছাই-হাপিজ শেষ। স্টোক-হোল্ড পরিষ্কার। তিনজন আগ্ওয়ালা কয়লা হাঁকরাচ্ছে রমারম। হরিদাস সেনকে মানুষ-খেকো বাঘের মত মনে হচ্ছে না আর। অযথা এখন শিস দিচ্ছে উইন্ডস্হোলের নিচে দাঁড়িয়ে। অন্য দুজন আগ্ওয়ালার নজর স্টীম গেজে। দুশ পঞ্চাশ স্টীম এখনও তারা তুলতে পারে নি। ট্যান্ডেল গাল-মন্দ দিচ্ছে তাদের।

অনুত্তম সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠার সময় একমুঠো কথাকে ভাবল। জাহাজের কাজে মনের জোর, মনের সাহস। তাগদ, শক্তি কথাগুলো একদম মিথ্যা। বাজে। মনের জোর না থাকলে তাগদ শক্তি কোন কাজে আসে না।

আবদুল পিছনে উঠে আসছে। ওর কাঁধে দুটো শাবল—দু বাংকারের। ভাল শাবলটা ও নিশ্চয়ই নিজের জন্য রাখবে। একবার ইচ্ছা হল রুখে দাঁড়িয়ে বলে, তুমিও কয়লায়ালা, আমিও কয়লায়ালা। এক অধিকার। তুমি ভালটা নেবে, আমি খারাপটা নেব কোন্ নিয়মে। কিন্তু আবদুল এসে ভাল শাবলটাই ওকে দিয়ে দিল। এবার নিয়মের কথা মনে হল না তার। শুধু ভাবল আবদুল ভাল মানুষ। জাহাজে আসার আগে সাদি করে এসেছে। মাটিতে কাজ করলে আর কিছু না হোক সমস্ত দিন মেহনতের পর বিবিকে কাছে পেত। বিবি কাছে না থাকলে অন্য কোন এক মেয়ে জগৎ। সে কলম্বো বন্দরে বিবির কাছে খত লিখবে। নিজে লিখতে জানে বলে এখন থেকেই প্রতিদিন খতের উপর অনেকগুলো সুখ দুঃখের আঁচর কেটে রাখছে। দু একজন জাহাজী ওকে লিখে দেওয়ার জন্য ধরেছে।

বাংকারে ঢোকার আগে সে আকাশমুখো হল। মুখের উপর আয়তক্ষেত্রের মত এক টুকরো আকাশ ঝুলছে। দুটো নক্ষত্র সেখানে। নক্ষত্র দুটো ঘড়ির পেন্ডুলামের মত দুলছে। গলার ভিতর আবার একটা ওক এসে থামতেই মনে হল জাহাজের ওঠানামা এখনও কমে নি। আকাশে নক্ষত্র দটো স্থির নেই সেজন্য। নক্ষত্রগুলো হয়ত কিছু ভেবে হাসল।

আলো থেকে বাংকারের অন্ধকারে ঢুকে মনে হল জাহাজটা অতিকায় একটা তিমি মাছ। হেলে দুলে চলেছে। সে তার অন্ধকার গহ্বরে বসে কয়লা পড়ার শব্দ, এনজিনের শব্দ, শাবলের শব্দ শুনে সন্ত্রস্ত হচ্ছে। কিছুই নজরে আটকাচ্ছে না। গাড়িটা কোথায়? সেই গর্তটা কোন্দিকে, যার ভিতর গাড়িগাড়ি কয়লা ফেলতে হবে! কয়লা কত। মুসাকিলাসানের মত লম্ফটা দূরে জ্বলছে। চারিদিক থেকে বন্ধ বলে লম্ফর শীষও অস্পষ্ট করে রেখেছে বাংকার। পচা গরম। হাই তুলল অনুত্তম। এই অন্ধকারে কয়লার উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা হল। যমুনা-বাজুর বাংকারে গাড়ি ভর্তি করছে আবদুল। এক গাড়ি ফেলল—দু গাড়ি ফেলছে—তিন গাড়ি। বাংকারটা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে চোখে। গাড়িটা টেনে এনে সুটের মুখ দেখল অনুত্তম। অনেক দূরে কয়লা নেমে গেছে। মাথাটা ঘুরে গেল আবার। ওক উঠছে। জাহাজটা গঙ্গাবাজুতে খুব বেশী হেলে গেল অনুত্তম দুহাত বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। আবদুল গাড়িগাড়ি কয়লা ফেলছে এখনও। ক'গাড়ি ফেলল শুয়ে শুয়ে গুণল—এক, দুই, তিন, চার। ঘুমে চোখ দুটো জড়িয়ে আসছে।

অনুত্তম ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়। অনেকক্ষণ ঘুমোল। স্বপ্ন দেখল, মা বাবা বসে গল্প করছেন। ছোট বোন ওর পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে। বাবা হঠাৎ মার উপর

খিঁচিয়ে উঠলেন। তারপর হঠাৎ দেখল, বাবা দৈত্য হয়ে গিয়ে ছোট বোনটার গলা টিপে ধরেছে। জাহাজটা যাচ্ছে তখন ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে। বাঁশ ঝাড়ের নিচ দিয়ে সে সব কিছু দেখতে পেল। ধান ক্ষেতে জল কম। ঠেকে ঠেকে চলছে জাহাজটা। অনন্তম এখন পিছন থেকে জাহাজটা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

ওর মুখের উপর কে যেন জুতো ঠেকাল। সেই দৈত্যটা বুঝি! ধড়্ফড়্ করে ওঠে বসল অনন্তম—কে! কে! দেখল মেজ-মিস্ত্রির গোল গোল চোখ দুটো পিট পিট করছে। অনন্তম কেঁদে উঠল—স্যার, স্যার...। আর কিছু সে প্রকাশ করতে পারল না ভয়ে।

—ইয়ু লেজী বাগার! সুন্তিওয়ালা! ঢাঁই করে অনন্তমের পিঠে লাথি মারলে তিনি। কাম অন, গেট ওয়ার্ক! টিণ্ডেল, টিণ্ডেল বলে চীৎকার করতে থাকলেন মেঝ-মিস্ত্রী।

—ইয়েস সাব, ইয়েস্ সাব! এই কয়লায়ালা হারামজাদা, বেইমানের পুত—বাংকারে পড়ে পড়ে ঘুমান হচ্ছে! বলে, তিনিও একটা ধাক্কা দিলেন অনন্তমকে। পরে ইয়েস সাব, সাব করে পুনরায় বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, আর কিছু ভয় নেই, এ বান্দা বেঁচে থাকতে স্যুটের মুখ ভরবেই।

মেঝ-মিস্ত্রী গড় গড় করে উঠে গেলেন। অনন্তম ছুটছে এখন পাগলা ঘোড়ার মত। পিঠের উপর বসে ট্যাণ্ডেল সাজাদ মিঞা। ও হাঁকছে, এই ব্যাডা জলদি চলো।

অনন্তম সব ভুলে গেছে। হাতের যন্ত্রণা, পায়ের যন্ত্রণা, আর যেন নেই। গলার কাছে এসে ভয়ে থেমে আছে ওকটা।

স্যুটের মুখে ঝুপ ঝুপ শব্দ হচ্ছে এখন। গাড়ি উল্টে কয়লা ফেলছে অনন্তম। গাড়ি টানছে, কয়লা ভরছে, স্যুটের মুখে গিয়ে সেই কয়লা ফেলছে। কতক্ষণ পর্যন্ত এমন চলেছিল সে বলতে পারবে না, কতক্ষণ পর্যন্ত এই দুরন্ত মেহনতী জীবন নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করেছিল তাও বলতে পারবে না—শুধু মনে আছে তিন নম্বর পরীদারের কথা। সে এসে বাংকারে ঢুকে চীৎকার করছে, অরে ব্যনাজী স্যুটের মুখীতে আর কত কয়লা দেবা। কয়লা ভরি এখনত উবদা হয়ে পড়ছে স্যুটের রাণী পেরেসানী।

তিন নম্বর পরীর কয়লাওয়ালাকে সে কান জবাব দিল না। জবাব দেবার মত ক্ষমতা শরীরে নেই। সাবলটা গাড়ির উপর রেখে টলতে টলতে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল। গলার ওকটা ঠেলে উঠছে। গলার শিরা উপশিরাগুলি ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে উঠলো। কোন রকমে একহাতে গলা চেপে সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠার সময় নাকে মুখে এসে ওকটা জমা হয়েছে। বোট-ডেকের উপরে এসে আর টাল সামলাতে পারল না। উপুড় হয়ে গেল অনন্তম। নাক মুখ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ওকটা বের হয়ে এল খানিকটা রক্ত জল। আঁসটে দুর্গন্ধ। রক্ত বমি হচ্ছে। মুখ থুবড়ে পড়ে সে ছট্ফট্ করতে থাকল।

ব্রীজ থেকে ক্যাপ্টেনের কুকুরটা একমাত্র সাক্ষী থেকেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে নামল কুকুরটা। চেটে চেটে রক্তগুলো খেল। অনন্তমের মুখটা চাটল। কিন্তু তবু যেন তৃপ্তি পেল না। সামনে অন্ধকার। জল শুধু জল, জলের অন্ধকার। কুকুরটার এখন কান্না পাচ্ছে।

কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠল—দি ডগ'স ক্রাইং ফর এ বিচ।

সমুদ্রটা কাঁপছে।

সমুদ্রের অন্ধকারে অনেকগুলো কান্নার প্রতীক হয়ে কুকুরের কান্নাটা এখন দূর দিগন্তে ভেসে যাচ্ছে।

জল শুধু জল। এ কান্না জল দেখে কান্না। এ কান্নার বুঝি শেষ নেই।

॥ ৩ ॥

এখানে—জাহাজ আর আকাশের রং, দিগন্তে সোনালী রেখা, রাতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, কখনও কুয়াশা, কখনও মেঘ। ঝড় বৃষ্টি হয়েছে রাতে। সমুদ্রটা আল কেউটের মত দিনরাত্র কেবল ফুঁসছে। জাহাজীরা সাতদিন ধরে এসব দেখে দেখে যন্ত্রে সময় গোনার মত সময়টাকে গুনছে। ওরা তীরের প্রতীক্ষায় বন্দরের প্রতীক্ষায় বার বার চোখ মেলছে দিগন্তের দিকে—বন্দর কখন আসবে, বলয় রেখাতে বন্দর কখন উঁকি দেবে।

এখানে একঘেয়েমি জীবন।

এখানে ভোরে সূর্য উঠবে। লাল সূর্য নীল সমুদ্রটাকে ভেঙেগ দু টুকরো করবে, মনে হবে নীল রাজহাঁসটা অতিকায় একটা সোনার ডিম পাড়ছে। উত্তাপ পেয়ে ওটা ফুলছে, বড় হচ্ছে। এখন সমুদ্রের উপর ভেসে উঠবে। কাঁপবে কিছুক্ষণ। জাহাজীরা কেউ দেখবে, কেউ দেখবে না। ডিমটা আকাশের উপর উঠে ক্রমশঃ গোল হতে থাকবে আর রুপালী রং ধরতে থাকবে। তখন নীল কোর্তা পরে পা টিপে টিপে উপরে উঠবে ডেক-জাহাজীরা, সিঁড়িতে কোন শব্দ করবে না। এনজিন-রুমের বারোটা-চারটার পরীদাররা ঘুমোচ্ছে।

পোর্ট-সাইডের কেবিনের এখন একটা দরজা বন্ধ। দরজার ভিতর অদ্ভুত রকমের একটি সুর। এই সময় প্রতিদিন সমুদ্রের নোনা পানীতে সুরের কতকগুলি প্রতিধ্বনি ওঠে। এনজিন-সারেং কোরানশরীফ পাঠ করেন। তিনি যেন এই সময় কার জন্য কাঁদেন।

ডেক-জাহাজীরা এখন স্টারবোর্ড-সাইডের বেঞ্চিটাতে বসে আছে। যতক্ষণ না সাড়ে সাতটা বাজবে ততক্ষণ ওরা এখানটায় অপেক্ষা করবে।

ডেক-সারেং আসবে। সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ডেক-সারেং ওদের একটু তফাৎ রেখে বসবে। বসবে, কৈ রে ভাণ্ডারী আমার চা কৈ?

ঠিক এই সময়ে অনুত্তম ফোকসাল থেকে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠল। চুপচাপ ওদের পাশে এসে বসল। সে ডেক-জাহাজীদের পরবর্তী বন্দর সম্বন্ধে গল্প শুনছে। যন্ত্রে সময় গোণার মত প্রতীক্ষা করছে, আটটা-বারোটা কখন। কখন আবার মৃত্যুর মত একটা জীবন অস্থিরভাবে তার বুকের উপর পায়চারী সুরু করবে। তবে ঐ বক্ষে রক্ত-বমিটা এখন নেই। গলা আপনিতেই চিরেছিল, আপনিতেই বন্ধ হয়ে গেছে।

ডেক-সারেং অনুত্তমের প্রতি চোখ তুলে বলল, ব্যনাজীর শরীর ভাল যাচ্ছে তরে-ব।

—তা কোন রকমে চাচা। অনুত্তম বলে হাসল। শেষে সারেংএর মুখোমুখি বসে বলল, কলম্বো বন্দরে জাহাজ কতদিন থাকবে চাচা? আমরা নামতে পারব ত? রাতে শহর ঘুরতে পাব?

—হুঁ-হুঁ অনায়াসে। ভোর বেলায় জাহাজে হাজিরা দিতে পারলেই হইল।

—জাহাজ বন্দরে কতদিন থাকবে?

—কি করি কই। মাইজলা-মালোম তো কয় কেবল রসদ নাকি নিব।

পরের প্রশ্নটা অনন্তমের মনে। কলম্বো থেকে কোথায় যাবে জাহাজ? যাবে ডারবান। কয়লা নেবে। মেজ-মালোম তাই বলেছে। স্ন্যাট থেকে কয়লা নিতে মাত্র চার ঘণ্টা। কলকাতার কয়লাঘাটায় তাই জাহাজটা পড়ে থাকে নি। কিছু পাটের গাঁট আছে, তাও নামান হবে। মেজ-মালোম বাইনেকুলারটা হাতে নিয়ে—চুপচাপ সমুদ্রে একটা যাত্রীজাহাজ দেখার সময় অনন্তমকে সেই কথাই বলেছে।

অনন্তম বলেছিল, স্যার কি দেখছেন?

—দেখছি জাহাজটা। কোন্ কোম্পানীর আর কোন্ শ্রেণীর যাত্রী দেখছি।

—কিছু দেখতে পেলেন?

—দেখেছি। দেখলাম কোম্পানীর ফ্ল্যাগ, জাহাজের নাম।

—কোন্ কোম্পানীর?

—পি এন্ড ও কোম্পানীর। যাত্রী কোন্ শ্রেণীর দূরবীনে ধরা পড়ছে না। দূরবীনটা চোখ থেকে নামিয়ে বললেন মেজ-মালোম, গত সফরে জাহাজটাকে নিউয়ার্কের বন্দর থেকে বের হয়ে আসতে দেখেছিলাম। আমাদের জাহাজ তখন হারবারের দিকে যাচ্ছে। বেডলুই দ্বীপের ষ্ট্যাচু অফ লিবার্টির কাছে তখন এই জাহাজটা।

কিসের ষ্ট্যাচু অনন্তমের ইচ্ছে হয়েছিল জানতে। মেজ-মালোম ভদ্র, খুব ভাল—জাহাজ চলার পর থেকে ডেকে ডেকে কথা বলেছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তবু কেন জানি অনন্তম এতগুলো প্রশ্ন করতে সংকোচ করেছিল। কিন্তু মেজ-মালোম ডেক পাটাতন থেকে ফল্কায় উঠে যাওয়ার সময় বললেন, ষ্ট্যাচু অফ লিবার্টিকে দূরবীনে দেখতে হয় না এই যা রক্ষে। প্রকান্ড সেই মূর্তি। মেয়ে মানুষের মূর্তি। ডানহাতে এক প্রকান্ড টর্চ জ্বলছে। হাজার বাতির আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। যদি নিউ-য়ার্ক কোনদিন যাও তবে দেখতে পাবে।

ফল্কার কিলগুলো দেখলেন মেজ-মালোম। টেনে টেনে পরীক্ষা করলেন তিনি, এই কিলগুলো সমুদ্রের ঝড়ে নরম হয়ে গিয়েছে কি না। তারপর বলেছিলেন ফের, জাহাজ এবার পানামা ক্যানেলের উপর দিয়ে যাবে। ক্যানেল দেখে তুমি নিশ্চয়ই খুশি হবে অনন্তম।

সারেং অনন্তমের মুখোমুখি বসে হাই তুলল। একজন পঁচিশ টাকার নাবিক এবং তেইশ টাকার দু'জন নাবিককে ডেক ট্যান্ডেলের হাতে তুলে দিলেন তিনি। মেজ-মালোম বলে গেছেন, ফরোয়ার্ড-পিকের-মাস্ট দুটোয় রং লাগাতে হবে। সারেং বাকি সব নাবিকদের নিয়ে বসে থাকলেন সাড়ে সাতের ঘণ্টির জন্য। ওরা সব মিলে এখন ড্যারিক হাপিজ করবে।

ব্রীজে ঘণ্টি পড়ল। ডেক-সারেং ডাকলেন এবার: ওরে ভাই সব, আইস। ডেক-কসপ পিঠে দড়ি ফেলে এদিকেই আসছে। মাজেদ টুপিটা মাথায় টেনে ড্যারিকের নিচে গিয়ে দাড়াল, মাস্টের কপিকলের ভিতর মোটা লোহার তার ভ'রে হাঁকছে মাজেদ, মার টান হাইয়ো, হোয়ান লোক ভাইয়ো।

সারেং জবাব দিল, সামনে ভাই কলম্বো বন্দর।

শুধু নীল আর নীলের দিকে তাকিয়ে হ্যাঁচকা দিচ্ছে জাহাজীরা, হাইয়ো।

—বেটার বিবি ভারি সুন্দর।

—হাইয়ো।

—সোমন্দির পো বড় মালোম।

—কলম্বো বন্দরে বিবি ধরুম।

—হাইয়ো।

—বিবির চলন বেসামাল।

—হাইয়ো। হ্যাঁচকাটা এবার জোরে পড়েছে। ড্যারিক্‌টা অনেক উপরে উঠে গেল।

—মনের ঝাল হল কামাল।

—হাইয়ো, হাইয়োবলে ড্যারিকটা একেবারে খাড়া করে দিল জাহাজীরা।

—বান্দরে মিঞা জোরে বান্দ। সারেং মাজেদকে কথাটা বলে ড্যারিক্‌টার দিকে চাইল। কপিকলটা ঠিক মত ঝুলছে কি না দেখল। বিকালে জাহাজ বন্দর ধরবে। সারেঙগকে খুব খুশী মনে হল।

অনুত্তম খুশী হল কথাগুলো ভেবে। প্রতিদিন আশা করেছে মাটি বুঝি এই দেখবে, এই দেখবে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে, সমুদ্রের নীল ঢেউগুলোর ভিতর ভূমি দেখার জন্য, মাটির রং দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছে। সমুদ্র-হৃদয়ে অসংখ্য দ্বীপ, কিন্তু সারাদিন ধরে কোন মাটির গন্ধ নেই। বন্দরের কথা ভেবে সমুদ্র-হৃদয়ের মত ওর হৃদয়ও নীল নীল ঢেউয়ে বিমুগ্ধ হতে চাইল। হরিদাস সেনের মত ডেকের উপর দাঁড়িয়ে উড়ুক্কু মাছের চপল উজ্জ্বলতাকে ব্যঙ্গ করে শিস দিতে ইচ্ছে হল। এদিক ওদিক অনেক দূরে সে দৃষ্টি মেলেছে সে জন্য। আকাশ দেখবে, নক্ষত্র দেখবে, মাটি দেখবে। দিগন্তে মাটির রেখা দেখে আশ্চর্য হবে। সকলের আগে মাটির সংবাদ দিয়ে জাহাজীদের অবাক করবে। কিন্তু এমন সময় ডাকল পরীদার ছোট-ট্যান্ডেল —অরে ব্যনাজী যাও। কয়লা সাবল বুঝে নাওগা।

সিঁড়ি ধরে বোট ডেকে ওঠার সময় হেঁকে বলল অনুত্তম, সোমন্দির পো বড় মালোম—কলম্বো বন্দরে বিবি ধরুম।

নিচে স্টোক হোলড। সেই কয়লা, সেই শাবল, বাংকারের গাড়ি। কালো অন্ধকার। মুসকিলাসানের মত লম্ফটা জ্বলছে। একটা মানুষ ছায়ার মত, ভূতের মত। অনুত্তম সিঁড়ি ধরে নিচে নামল। প্লেটের উপর দাঁড়াল। হরিদাস সেনের মানুষ-খেকো বাঘের মত সেই চেহারা। উইন্ডস্‌হোলের নিচে দাঁড়িয়ে এখন তিনি শিষ দিচ্ছেন। ট্যান্ডেলের চীৎকার। সে খিস্তি করছে বাংকারে ঢোকার সময় কাজগুলোকে, কথাগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আজ ভাবল না। বিকেলে বন্দর ধরবে জাহাজ। জাহাজীদের কাছে শিহরণের খবর। গোপনে অনেকের গাল দুটো শির শির করে কাঁপল। অনুত্তমেরও হয়ত কেঁপেছে। বাংকারের অন্ধকারটা ওর মুখটাকে এখন কালো করে দিয়েছে। কেউ বুঝতে পারবে না গালটা কাঁপল কি কাঁপল না।

বন্দর ধরবে জাহাজ।

কতদিন পরে ধরল! কত যুগ পরে মাটির স্পর্শ পাবে তারা?

অনুত্তম হিসেব করে বুঝল, এ কালের গণন। হাতের কটি সীমিত রেখার দ্বারা সম্ভব নয়। সে তাই আর সময়ের হিসেব না করে বাংকারে ঢুকে মজিদের গলা জড়িয়ে আবৃত্তি করল, সামনে ভাই কলম্বো বন্দর, বেটার বিবি ভারি সুন্দর।

—তুই কি পাগল হইলিরে ব্যনাজী!

—আমি পাগল হয়েছি সখি মাটির লাগিয়া, কীর্তনের সুরে অনুত্তম গান ধরল। মজিদ হেসে কুল পাচ্ছে না।—বিকেলে জাহাজ বন্দর ধরবে। অনুত্তম এ কথাটাও গানের সুরে বলল।

—অঃ তোমার ফুর্তি এর লাগি? মজিদ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল।

অনুত্তম মজিদকে নিয়ে বাংকারে বসে গল্প করতে চাইল আজ। নিভৃতে, নীরবে, দুজন চুপচাপ বসে দেশের গল্প, দশের গল্প, মা কি বলেছে, বাবা কি বলেছেন, বোনটা কি ভেবেছে আসবার সময়; পড়শী তখন জানালায় কেমন ভাবে আঁচলটা দুলিয়েছিল, ওর চোখে জল কি মুক্তো ঝুলেছে না কেঁদেছে, সেসব কথাগুলো বলার একান্ত আকাঙ্খা জন্মাল তার। সে গাড়িটার কাছে এসে শাবলটা তুলে নিল হাতে, তারপর অনেক দূরে শাবলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, আজ আর কাজ করতে ইচ্ছে হচ্ছে না মজিদ। আয় একটু বসে গল্প করি।

কিন্তু মজিদ বসল না। সে উঠে দাঁড়াল। বললে, স্যুটের মুখ দ্যাখ।

অনুত্তম শাবল দিয়ে আবার স্যুটের মুখটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখল। নিচে স্টিম-কাকগুলি অদ্ভুত একটি ঝিম ঝিম শব্দ করছে। আল্লাহ্ আকবর কি ইনসে আল্লা এখন আর কেউ নিচে বলছে না।

যাদের মাথা ভয়ে ঝিম ঝিম করছিল তারা পর্যন্ত হাল্কা হয়ে গেছে। মেয়ে-মুখের জন্য মানুষগুলো উৎক্ষিপ্ত।

এমন সময় আবদুল ঢুকল। মজিদ বের হল বাংকারের দরজা দিয়ে। লম্ফটা খুব জোরে জ্বলছে। অনুত্তম বললে মজিদকে, বেটার বিবি ভারি সুন্দর।

—তোবা তোবা। মজিদ কান ছুঁয়ে উপরে উঠে গেল।

ট্যাণ্ডেল ঢুকল। বেসুরো গান ওর রগ বের করা কণ্ঠে। ভিতরে ঢুকে অনুত্তমের পাশে দাঁড়াল। বললে, সাবাস বেটা। তারপর সে বসে পড়ল।

অনুত্তম গাড়িটা ধরে ঠেলা দিচ্ছিল। কিন্তু ট্যাণ্ডেল গাড়ির হাতলটা ধরে ফেললে। বললে, পরী শেষ করে দুটো খাবা, ঘুমোবা। বেশীক্ষণ কিন্তু ঘুমোবো না, তোমার চাচীর খতটা আবার লিখে দিতে হবে। মনে থাকে যেন ব্যনাজী, তুমি আমায় চাচা ডেকেছ। ভাতিজার কিন্তু চাচার লাগি এ কাজটুকু করতেই হবে। লিখবা, মিঞাজান তোমার জবাব পেয়েছে, সে খুব সুখী হয়েছে।......

অনুত্তম হেসে ফেলল। ট্যাণ্ডেলও লজ্জা পেয়ে ফিক্ ফিক্ করে হেসে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গল।

আবদুল বিজ্ঞের মত পাশ থেকে বললে, পাগল।

ভীষণ কড়া রোদ ঝরছে আকাশ থেকে। পরী শেষ করে অনুত্তম্ লাইফ-বোটের ছায়ায় দু ঠ্যাং ছড়িয়ে আজ প্রথম একটু নিশ্চিন্তে বসল। কড়া রোদটাকে আড়াল করে সে তাকাল ব্রীজের দিকে। মেজ-মালোমের এখন ওয়াচ। তিনি ব্রীজে পায়চারী করছেন। মাঝে মাঝে বুকে ঝুলানো দূরবীণটা তুলে দূরের আকাশ দেখছেন।

অনুত্তমও খুঁজল। সমুদ্র যেখানে দিগন্তে মিশেছে সেখানে খুঁজল। সমুদ্র কিনারায় এক টুকরো মাটির আকাশকে সীমিত দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করে বেড়াল।

শূন্য। সব শূন্য। শুধু আকাশ-দিগন্ত। শুধু সমুদ্র-রেখা। ঢেউ, পারপয়েজ মাছ, উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক। অন্য কিছু নেই। অন্য কিছু জীবনের প্রতীক বিহীন দরিয়াটা প্রপেলারের ভাঙগা ভাঙগা শব্দে কেবল কাঁপছে এখন।

মেজ-মালোমের দয়া হল। তিনি দেখছেন, অনুত্তম বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে মাটি

খুঁজছে। ওর মুখ কয়লায় কালো। চোখ দুটো লাল। ক্লান্ত। চোখে বন্দরের আশা। তিনি ব্রীজ থেকে ঝুঁকে ডাকলেন, হ্যাল্‌লো অনুত্তম!

—ইয়েস স্যার! এনি ল্যান্ড সেকেন্ড্‌! অনুত্তম ছুটে ব্রীজের আরো কাছে গেল। মাথার উপর টুপিটা টেনে দিল।

মেজ-মালোম বললেন, ইয়েস!

অনুত্তম চীৎকার করে উঠল, ওঃ ফাইন্‌! কি মজা হবে! কখন? হোয়েন উই উইল এরাইভ দেয়ার? কখন আমরা যাব, মাটিতে নামব?

মেজ-মালোম ব্রীজে এবার সহজ হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, ইউ উইল গেট দি পোর্ট বিফোর ইভনিং। উই উইল ল্যান্ড দেয়ার।

হরিদাস সেন এবং আবদুল এক সঙ্গে এনজিন-রুম থেকে উঠে আসছে। অনুত্তমের পাশে দাঁড়িয়ে ওরাও শুনল। শুনল জাহাজ সন্ধ্যার আগেই বন্দর ধরবে।

অনুত্তম বোট-ডেক থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামল। টুইন-ডেক সে দৌড়ে পার হল। গলুইতে সে এসে থামল প্রথম খবরটা দেবে ভেবে। সকল জাহাজীদের খবর দিতে হবে। মেজ-মালোম দূরবীণে কলম্বো বন্দর দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু এসে দেখল ডেক-জাহাজীদের মেসরুমে হৈ হৈ কাণ্ড! মাজেদটা নাচছে। লুঙ্গি মাথায় পাগড়ী করে হুলা হুলা নাচ। এনামেলের থালা বাজাচ্ছে বসীর, এনারদ্দি। রঙের খালি টব [illegible] করে বাজাচ্ছে মকবুল আর হুইউ হুইউ করছে। সিটি মারছে।

মানুষের এমন বেসামাল চলন অনুত্তম এই প্রথম দেখল। সে লজ্জায় প্রথম চোখ বুজেছে। পরে হেসে গড়িয়ে পড়ল।—এই মাজেদ তুই এটা করছস কি!

ডেক-সারেং এদিকটায় আসতে কে একজন ডেকে বললে, সারেং-সাব এখন ওদিকটায় যাবেন না।

সারেং সাব জানেন, জাহাজে কি হয় কি না হয়। তিনি গলুইয়ে আর উঠলেন না। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে পাহারায় থাকলেন। দেখলেন এখন বড়-মালোম কোথায়! বড়-মালোম আগিলের ডেকে। জাহাজীরা মাটির খবর পেয়ে উন্মত্ত হয়েছে। মেস-রুমে ওরা তাই উৎসবে মেতেছে। তিনি ডেকে দাঁড়িয়ে ওদের চীৎকারগুলো শুনতে পাচ্ছিলেন। ভাবলেন বরং সামনের ডেকে এগিয়ে যাওয়া যাক্‌। বড়-মালোমকে অন্য কাজের কথা বলা যাক। কাজটা বুঝে নিতে যতটা দেরী হয় ততক্ষণ ওরা আনন্দ করুক।

সংক্রামক ব্যাধির মত এই আনন্দটা সকল জাহাজীদের মধ্যে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল। আমলদারদের দুঃখ, নেহাত তারা আমলদার। তারা নিচেই থাকল। ফোঁকসালে বসে ওদের অশ্রাব্য গানগুলো শুনল। উপরে উঠে সাধারণ জাহাজীদের সঙ্গে মিশে যেতে পারল না। অন্যসব জাহাজীরা, যারা শুধু খাটতে এসেছে—খাটাতে আসে নি, লুঙ্গি মাথায় পাগড়ী করে হুলা হুলা নাচল।

ওরা আনন্দ করছে। আজ সন্ধ্যায় বন্দর পাবে সেই আনন্দে।

ওরা উৎসবে মেতেছে। মাটির স্পর্শে উন্মত্ত হবে সেই উৎসব।

মাজেদ ক্লান্ত হয়ে এখন হাঁপাচ্ছে এক কোণায়।

মজিদ নিচে নেমে পোর্ট খুলল। ফোঁকসালের আলোটা জ্বালা ছিল, সে আলোটা নিভিয়ে দিল।

অনন্তম স্নান সেরে হরিদাস সেনের সঙ্গে খেতে বসেছে। পড়শীর কথা ভাবছে। বন্দর আসবে, বন্দরে নেমে পড়শীর মনোমত জিসিন কিনতে হবে, সে কথা ও ভাবল। সহসা মুখ তুলে এক গ্লাস জল ঢালল গলায় ঢক ঢক করে এবং আরো সহসা প্রশ্ন করে বসল হরিদাস সেনকে, দাদা, বৌদিকে চিঠি দেবেন না? বৌদির কথা নিশ্চয়ই খুব বেশী মনে পড়ছে আজ!

হরিদাস সেন চুপ থাকল কিছুক্ষণ। কি ভেবে বলল, নিশ্চয়ই দিতে হবে। তোর বৌদির বাচ্চা হবে। খুব চিন্তায় আছি।

—চিঠি পায়লট নিয়ে আসবে না এজেণ্ট নিয়ে আসবে? অনন্তম ফের প্রশ্ন করল।

—পায়লটও আনতে পারে, এজেণ্টও আনতে পারে।

খেতে খেতে ভাবল অনন্তম, মার চিঠিটা আজই লিখে রাখতে হবে।

হাত মুখ ধুয়ে অনন্তম সিঁড়ি ধরে নিচে নামল। ফোঁকসালে ঢুকল, মজিদ বসে আছে বাংকে। মজিদের পাশে বসে ওর পকেট থেকে দুটো লবঙ্গ তুলে নিল হাতে। বললে, কিরে এখানে বসে আছিস, ঘুম পাচ্ছে না?

মজিদ অনন্তমের কথার জবাব না দিয়ে ফিস ফিস করে বললে, অঃ ব্যনাজী আমার একটা কথা রাখবি!

—তোর আবার কি কথা? খত লিখে দেওয়ার কথা বুঝি? বিবিকে খত দেওয়ার খুব সখ তো দেখছি!

—বিবির কথা কইয়া আর সরম দ্যাস্ ক্যান্?

অনন্তম দেখল মজিদ খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে। কথা বলছে না। কিছু অপ্রকাশের বেদনায় চোখ দুটো ভারি ভারি। অনন্তম এবার মজিদকে জড়িয়ে ধরে বলল, বল্ কি হয়েছে? তোর কথা আমি রাখব।

একটা কাগজের মোড়ক অনন্তমের হাতে তুলে দিল মজিদ।

—কি আছে এর ভিতর?

—আমসত্ব আছে। কেমন ভয়ে ভয়ে জবাব দিল মজিদ। মাইয়াটা আসনের সময় দুটো জোর কইরা পোঁটিতে ভইরা দিছে। কইছে, বাজান আপনে খাইয়েন।... তরে দিলাম। তুই খাইবি।

—সে তো বেশ কথা! খাব। নিশ্চয়ই খাব।

—তুই একলা খাবি।

—তাই খাব। আমার মাও পাকিস্তানের বাড়িতে আমসত্ব দিতো। ওর মনে পড়ল ছোট একটা ঘরের কথা। ছোট একটা দরজার কথা। বারান্দায় অনেকগুলো শ্বেত-পাথর থাকত। মা তার উপর আমের গোলা ঢেলে দিতেন। অনন্তম হাতে একটা পাট-কাঠি নিয়ে কাক শালিক তাড়াত। সে বসে থাকত, ঘুমে ঢুলু ঢুলু হোত চোখ দুটো। মা তখন পুকুরঘাটে স্নান করতে গেছেন। তিনি ভিজে কাপড়ে বাড়ি ফিরে বলতেন, কৈরে অনু কাপড়টা দেত বাবা। চুলগুলি থেকে জল টপ টপ করে মাটিতে পড়ত তখন। মার স্নিগ্ধ মুখে, চোখে অনেক স্বপ্ন জড়িয়ে ছিল সেদিন। বাঁশঝাড়ের নিচে, পুঁটিমাছের জলে, কামরাঙ্গা গাছের ছায়ায়, কমলা রঙের রোদে মার মুখের অনেকগুলো ছবি চোখের উপর ঝুলতে থাকল অনন্তমের। বর্ষার দিনে বাবা নৌকোয় করে ফিরতেন মুড়াপাড়া থেকে। আঁখ আনতেন, বড় বড় জল-কচু আনতেন। ঘাটে নৌকা ভিড়লে বাবা ছৈ-এর ভিতর থেকে ডাকতেন, আয়রে অনু।

তোর জন্য আঁখ এনেছি।

—আমার বড় পুত সোলেমান তর মত! মাইয়াটায় দিব, পোলাটায় খাইব, হেইয়রে ব্যানার্জী, অনুত্তমের হাত ধরে বলল মজিদ, পোলাটা দেখতে তর মত! চুরি কইরা আমসত্ব খায়, মাইয়াটা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কান্দে।

—তোর বিবি সোলেমানকে কিছু বলে না?

—তর যে কথা! বিবি বাঁইচা থাকলে জাহাজে ফের আসতে দেয়! কি যে হেইতের অসুখে ধরল, আল্লাই জানে।

অনুত্তম চুপ করে থাকল এবার। এতদিন ধরে ওর বিবিকে নিয়ে আবদুল মাজেদ এমন কি ছোট ট্যাণ্ডেল পর্যন্ত হাসি-মস্করা করছে। অথচ সে একবারও কিছু বলে নি। চোখ দুটো ভার-ভার করে বাংকে বসে থেকেছে। মজিদের বিবি নেই। বিবিকে জাহাজে আসবার আগে গোর দিয়ে এসেছে।

মজিদ মুখ নিচু করে বললে, বিবির কথা ভুইলা থাকতে চাই। জাহাজে আইছি, তগরে পাইছি—কত কথা এখন মনে হয়।

বাংকে বসেই অনুত্তম আমসত্ত্বটুকু খেল। মজিদ খুব খুসী হল দেখে। বললে, পরাণটা বড় তৃপ্তি পাইল ব্যানার্জী।

মজিদ উঠে গেল তারপর। অনুত্তম দেখল মজিদের যাওয়াটা। ওরা একই কাজ করে। মজিদের বয়েস উত্তর পঞ্চাশে। অথচ তুই-তুকারী করে অনুত্তম। কি ক'রে যে ও ক'দিনে তুই-তুকারীটা এসে গেছে। অনুত্তম বলতে পারে না। উত্তর পঞ্চাশের মানুষটা বড় রোগা। শীর্ণ। মুখের চোয়ালের হাড়গুলো অতিমাত্রায় উঁচু।চোখগুলো সাদা সাদা। বিশীর্ণ। উত্তাপ শূন্য। ঘোলাটে দু'দিন বাদে হয়ত ছানি পড়বে। উপরের চোয়ালে একটাও দাঁত নেই কথা বলার সময় নিচের দুটো দাঁত উপরের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে। অনুত্তম প্রথমদিন ওর কথা শুনেই হেসে-ছিল। ভেবেছিল এই সব মানুষগুলোর সংগে ফোকসালে, বাংকারে দিন-রাত্রি কাটবে। মনটা কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল তখন। আজকে ভাবল অনুত্তম, জাহাজে এরাই তার সব। একটি অদ্ভুত রকমের আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে মানুষ-গুলোর সংগে। মানুষগুলো তার মার মত, বোনের মত, পড়শীর মত।

হাতে কোন কাজ নেই। এখন শোয়া। ঘুম না এলেও শুয়ে চোখ দুটোকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা। আটটা-বারোটার পরীতে জাহাজ-কলম্বো বন্দরে বাঁধা থাকবে। না ঘুমোলেও তেমন কোন ক্ষতি নেই। বরং বাংকে শুয়ে পড়শীকে ভাবা যাক। পড়শীর চোখ দুটো, মুখটা পলাশের নিচে কেমন রাঙ্গা হত, একদিন কান্নাটা কত-দূর পর্যন্ত চোখে জল গড়িয়েছিল তার হিসেব করা যাক।

অনুত্তম শুয়ে ভাবল অন্য কথা। হয়ত এতক্ষণ জাহাজ ডেকে কলম্বো বন্দরের ছায়াটা আকাশ সীমানায় ভেসে উঠেছে। ধরফর করে উঠে বসল সে। ঘুম না এলেও শরীরে জড়তা এসেছে। হাত পা ছুঁড়ে তা ভাংগল। শেষে সিঁড়ি ধরে উপরে ছুটে গেল।

গংগাবাবুর একটা বেঞ্চীতে তিন চারজন জাহাজী রেলিংএর উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে। ওরা অন্য কোন এক বন্দরের গল্প করছে। বুড়ো এঞ্জিন-ভাণ্ডারী গ্যালী থেকেই ফোড়ন কাটছে মাঝে মাঝে। গল্পটা নেহাত গল্পেরই মত। প্রতীক্ষা-গুলো ওদের অন্য আকাশের জন্য। ওরা আকাশ সীমানায় অন্য একটা ছায়ার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

দূরের একটা দেশ ছায়ার রং ধরেও ধরছে না। নীল ঢেউগুলোর ভাজে অস্পষ্ট হয়ে রহস্য ছড়িয়ে রেখেছে। একজন বললে, ঐত! ঐত!

অন্যজন বললে, ওটা ত মেঘের টুকরো। কুমীর ছিল, মানুষ হয়ে যাচ্ছে।

সকলে দেখল—সত্যি। আকসাশের মেঘটা ছড়িয়ে গিয়ে এখন মানুষের রূপ ধরছে। মেয়ে-মানুষের। সব জাহাজীরা এসে গলুইতে ভিড় করল আবার! কিন্তু ওটা শেষ পর্যন্ত নেকড়ে বাঘ হয়ে গেল।

অনুত্তম বললে, তারপর ওটা জাহাজ হবে।

জাহাজ আর হয় নি। মেঘের টুকরোটা সরে সরে সমুদ্রের অন্য-তীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এখন শুধু সামনে নীল আর নীল রংটার উপর কতকগুলো ফিঙেগ পাখির মত। পাখি উড়ে ছায়া ফেলছে। কিংবা হাজারো ফুটকরী থেকে একটা ফুটকরী মুখে দূরে নেচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। নীল আর ধূসর সমুদ্রে পাখি-গুলো বাস্তু-ভিটে শূন্য। দুটো পাখির রঙিগন স্বপ্ন কোন এক বন্দর সীমানায় হয়ত বাসা বেঁধেছে। উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও তীরে ফিরে যাবে। না গেলে অনুত্তম পাখিগুলোকে অসহায় ভাববে। পাখিগুলোও তার মত পেটের দায়ে তীর ছেড়ে সমুদ্রে এসেছে, সঙ্গে এ কথাটাও মনে হবে।

বুড়ো ভাণ্ডারী রসিয়ে রসিয়ে গল্প করতে চাইবে পাখিগুলোকে নিয়ে। গল্পের ভিতর কোন গল্পেরই ইসারা থাকবে না। জাহাজীরা ভাণ্ডারীর গল্প শুনতে চাইবে না। বন্দরের জন্য ওরা উন্মনা। পাখিদের ডানার হাওয়ায় ওদের মনটা এখন বন্দরের উপর উড়ছে।

বুড়ো ক্যাপ্টেনের চোখে বাইনাকুলার। পোর্ট-হোলের ভিতর থেকে বাইনা-কুলারের মুখ দুটো বের কর নিচের দিকে ঝুঁকে আছেন।—বুড়ো বয়সে অত সখ কেন মাটি দেখার! কোন একজন জাহাজী ঠাট্টা করল। হাসল।

চোখের নজরকে ঝুলিয়ে রেখেছে অনুত্তম। সমুদ্রের উপব ঝুলছে। এতগুলি হাসি এবং কথার ভিতর সে একবারও ফিরে দেখে নি কে হাসল, কে বুড়ো কাপ্তানকে বিদ্রূপ করল। আজ সাতদিন হল এই সমুদ্র, দু' দিন হল নদীর মোহনা—জল আর জল, এবার সে মাটি দেখার জন্য পাগল। ডায়মণ্ডহারবারের টিবিটার উৎরাইয়ে যে মেয়েটা নেমে গেল, সে ত এক যুগের কথা হবে। মেজ-মালোম আরো অনেকক্ষণ দেখেছিলেন। দূরবীণের চোখ দুটোতে মেয়ে-মানুষের দেহটা অনেকক্ষণ ঝুলছিল বোধ হয়।

রক্ত বমি, আটপৌরে জাহাজী জীবন, আটটা-বারোটার ওয়াচ—সব দুঃখগুলো বন্দরের প্রতীক্ষাতে অন্য কোন সুখী মনের দরজায় এনে অনুত্তমকে হাজির করেছে। এমন প্রতিক্ষিত জীবন সে কোনদিন হাতরায় নি। সুখী হবার এমন ইচ্ছা মনে তার কোনদিন জাগে নি। সমুদ্র পার হয়ে কোন দেশের কাছে এসে প্রতীক্ষার সফলতায় এমন আধমিশ্র আনন্দ জীবনে সে কোনদিন উপলব্ধি করে নি।

সহসা অনুত্তম পাগলের মত চীৎকার করে উঠল।—মাটি, ঐ মাটি! তোমরা কে আছ নিচে, সব উপরে উঠে এস। মাটি! মাটি! ল্যাণ্ড!

দ্বীপটা আকাশ সীমানায় ভেসে উঠেছে। রূপালী দ্বীপে সোনালী রাজ্য রাবণ রাজার দেশ। সেতু-বন্ধন, রাম-রক্ষ্মণ, অশোক বনে সীতা, ঠাকুমার ছেঁড়া রামায়ণ, ভাঙ্গা চশমা, অনেকগুলো চোখ, বিকেলের বারান্দায় মা-ঠাকুমার রামায়ণ পাঠ, সব এক এক করে চোখে ভাসল। দিগন্ত রেখায় সেতু-বন্ধনের ওপরে একটি

ধূসর উঁচু নিচু দেশ জলরঙা ছবির মত ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

অন্যান্য জাহাজীরাও ঝুঁকল। তারাও বললে, ঐ মাটি, ঐ দ্বীপ!

ঐ মাটি, ঐ দ্বীপ। কেউ কেউ গল্প আরম্ভ করেছে আবার। হাতির গল্প। কাঠের হাতি কিনে অন্য বন্দরে বেচার গল্প। অনুত্তম সব শুনছে। চোখ ওর জলরঙা ছবি থেকে কিছুতেই উঠে আসছে না।

বিকেল আসছে গড়িয়ে গড়িয়ে। জাহাজীরা কাজে ঢিল দিয়েছে। হালটা বেঁকে আছে এখন জাহাজের। সমুদ্রের বুকে প্রপেলারের আঁচরটা বৃত্তাকার হয়ে আসছে। বন্দরের মুখ ধরেছে জাহাজ।

ট্যাণ্ডেল অনুত্তমের পাশে এসে দাঁড়াল। কানের কাছে মুখ রেখে বললে, খতটা লিখে দিবা না?

—চিঠি আগে আসুক।

ট্যাণ্ডেল ঠোঁট কামড়ে হাসল। অবহেলার এক টুকরো হাসি। হাসিতে তাচ্ছিল্যের অনেক টুকরো টুকরো খবর। ওটা একটা কথার কথা নয়। বিবি তার তেমন বিবি নয়। খত একটা না লিখে থাকবে বিবি, কথাটা ভাবতেও কষ্ট হয় ছোট ট্যাণ্ডেলের।

অনুত্তমের ইচ্ছা নেই এই সময় সে ফোঁকসালে নামে; সে তার নিজের জগতের যে আনন্দটুকু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা থেকে বঞ্চিত হয়। সে তাই উঠি-উঠি করে আরো অনেকক্ষণ বসে থাকল।

এক সময় অনুত্তম উঠে দাঁড়াল। বললে, চলুন, চাচা। আপনার খতটা লিখে দিয়ে আবার উপরে আসব।

অনুত্তম যখন খত লিখে উপরে উঠে এসেছিল তখন সে দেখেছে কলম্বো বন্দরের পায়লট এসে জাহাজে উঠেছে। কাপ্তেনের সঙ্গে গল্প করছে ব্রীজে উঠে। মেজ-মালোম, বাড়-মালোম, দুজন ডেক-এ্যাপ্রেণ্টিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে-গল্প শুনছে।

মেজ-মালোম এখন এদিকেই আসছেন। বিষণ্ণ তিনি। ক্লান্ত তিনি। তিনি টুইন-ডেকে নেমে ডেক-সারেংকে ডাকলেন। বন্দর দেখে তিনি খুসী হতে পারেন নি যেন।

বন্দরের জাহাজগুলো দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলো জাহাজ ঘাটে বাঁধা। অনেক দূর-সমুদ্রে বন্দরের সীমানা। ডকে স্থান সংকুলানের বড় অভাব।

সারেঙ-এর হাতে এক বাণ্ডিল চিঠি তুলে দিলেন মেজ-মালোম এবং কিছু বললেন। সারেং মাথা নিচু করে শুনল। তারপর ফিরে এল পিছিলে। তার হাতে চিঠি। দেশের খত। জাহাজীরা সব এসে সারেংকে বৃত্ত করে দাঁড়িয়েছে। সবার কণ্ঠে ব্যাকুল প্রশ্ন, সারেং সাব আমার চিঠি, আমার কোন খত?

সারেং কোন জবাব না দিয়ে হরিদাস সেনের হাতে সব চিঠিগুলি তুলে দিল।

হরিদাস সেন ডাকল, মকবুল হোসেন।

মকবুল চিঠিটা নিয়ে অনুত্তমের গলা জড়িয়ে ধরল—আমার খত। খুব খুসী মকবুল। চিঠিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। বললে, বানার্জী—একটু পড়ে দ্যাখনা কি লিখা আছে?

—দাঁড়া দেখছি। অনুত্তম বাধা দিল মকবুলের কথায়।

—ফরিয়াদ সেখ, জাফর মিঞা। হরিদাস সেন ওদের চিঠিগুলো দিয়ে অনুত্তমের দিকে হাত বাড়াল।—তোর চিঠি ধর।

পড়শীর চিঠি। নীল খামে মোড়া চিঠিটা অদ্ভুত রকমের নরম বলে মনে হল। সে চিঠিটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল আপাতত।

মকবুলের চিঠিটা পড়ে দিল। জাফর মিঞার চিঠি পড়ে দেওয়ার সময় দেখল ছোট ট্যাণ্ডেল চুপি চুপি দূরে সরে যাচ্ছে। ওর কোন চিঠি আসে নি। বিবি খতে দুটো লাইন লিখে খসমের সুবিধা অসুবিধা জানার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নি। তাই ওর কব্জিতে বাঁধা কবচগুলি বড্ড ঝুল ঝুল করছে। গলার রগদুটো বেশী মোটা হয়ে গেছে। মাজেদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে অভিমানে কাঁপল।

অনুত্তম ছোট ট্যাণ্ডেলকে ডেকে এ সময় বিরক্ত করতে চাইল না। ডেক-সারেং তখনও হরিদাস সেনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি নিজেও একটা খতের অপেক্ষায় আছেন। হরিদাস সেনের কণ্ঠে তিনি তাঁর নিজের নাম শুনতে চান। কিন্তু শুনতে পেলেন না। তিনি দুঃখে দু'পাটি দাঁত ঘসলেন। সব জাহাজীদের উপর প্রতিশোধ নেবার ভঙ্গিতে বললেন, জোহাজ জেটিতে বাঁধা হবে না। বয়াতে বাঁধা হবে। নেও ইবারে আল্লাদে আটখানা হও।

সব জাহাজীরাই চোখ কুঁচকাল। তাদের বিস্ময়ভরা কণ্ঠে একটি মাত্র প্রশ্ন, সে কি সারেং সাব?

সারেং নিজের দুঃখটা ঢাকার জন্য সমুদ্রের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে, জেটি খালি নাই।

অনুত্তম ঠিক বুঝতে পারে নি এতক্ষণ সারেং সাব কেন এত বিষণ্ণ, ভাল মানুষ মেজ-মালোমকে কেন এত অসুখী দেখাচ্ছে। ব্যাপারটা এবার তার কাছে কাচের মত পরিষ্কার হল—জাহাজ বয়াতে বাঁধা হচ্ছে। অনেক দূরে বন্দর। জাহাজ থেকে অন্য অনেক জাহাজ অতিক্রম করে বন্দর—একেবারে অস্পষ্ট। বয়াতে জাহাজ বাঁধা হয়েছে। জাহাজীরা বন্দরে নামতে পারছে না।

কলম্বো বন্দরের পশ্চিমের আকাশটা লাল। আর একটা বিকেল। আর কিছুক্ষণ পর নীল অন্ধকার নামবে দ্বীপটার উপর। আলো জলবে সামনের অনেকগুলো জাহাজে। মেজ-মালোম বোট ডেকে তেমনি প্রতীক্ষা করবেন। চোখে দূরবীণ আঁটা থাকবে। ইজি-চেয়ারটায় বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে দেহটা। চোখ দুটো দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়ে বন্দরের অস্পষ্ট রেখায় অন্য একটা জগতকে দেখার চেষ্টা করবে।

বোট-ডেক ধরে তখন জাহাজীরা নামবে। নতুন জাহাজী অনুত্তম মেজমালোমের পাশে বসে প্রতীক্ষা করবে। মনটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলে বলবে, এনি ওম্যান্ সেকেণ্ড?

মেজ-মালোম মাথাটা তুলে দূরবীণের কাচটা মুছে সংক্ষিপ্ত জবাব দেবেন—নো।

আরো অসহিষ্ণু হয়ে উঠবে জাহাজীদের মন। অনুত্তম বলবে, ইফ এনি ওম্যান্, উড্ ইউ প্লিজ......

সন্তর্পণে দূরবীণটা চোখের উপর ঝুলিয়ে বলবেন,......আই মাষ্ট......!

এই দুটো কথার ভিতর থেকে জাহাজী জীবনের যে বেদনার উত্তাপটুকু দূরবীনের কাচটায় সঞ্চারিত হবে এবং প্রকম্পিত হবে মেজ-মালোম হয়ত তাতে লজ্জা পেতে পারেন, কিন্তু না পাওয়ার বিরাট অক্ষমতাকে অস্বীকার করবেন কি করে। তিনি তখন হয়ত বলবেন—আমি তোমাদের নিশ্চয়ই ডাকব। যদি দয়া করে এই দূরবীনের কাচটা একটা মেয়ে-মানুষের দেহ ধরতে পারে, তবে সকলকে ডেকে বলব, এস তোমরা

দেখ। খ্ঁটিয়ে খ্ঁটিয়ে মেয়ে-মান্ষের সবট্কুকে দেখ।

॥ ৪ ॥

ফোঁকসালে অন্ধকার। অদ্ভুত এক দুঃস্বপ্ন থেকে একজন জাহাজী জাগল। সে চুপচাপ বসে রাতের গভীরতার সঙ্গে ঠাকুমার গল্প মনে করছে। সাত-সমুদ্র তের নদীর পারে রাজপুত্র রাজকন্যা। ঠাকুমার সেই চোকোমুখ—বলিষ্ঠ চেহারা, রাত-ভর পাখার হাওয়া, অনেক মধুর গল্প। গ্রহ-নক্ষত্রের খবর। ঠাকুমার সেই আকাশ-গঙ্গা, স্বাতী নক্ষত্র, আরো কি, আরো কি যেন! জাহাজী মানুষটা অন্ধকার ফোঁক-সালে বাংকের উপর বসে আর মনে করতে পারছে না।

বর্ষাকাল। জমিতে জল। ধান খেত। ধান খেতের আল। নৌকা যাচ্ছে। প্রথম কোষা নৌকা, পরে ডিঙিগ নৌকা বড় বড় পানসী নাও। বজরা। ধীরে ধীরে একটা জাহাজ গেল। মেঘনার কালো জল থেকে জাহাজটা জমিতে উঠল। জাহাজীরা লগি মেরে যাচ্ছে। বাঁশঝাড়ের নিচ থেকে ঠাকুমা কাকে যেন বলছেন, আরে ঐ ত তোমার হারানো ছেলে। ও ধন-বৌ এসে দেখ, তোমার ছেলেটা—ঐ দেখ, ঐ দেখ লগি ঠেলছে। বামুনের ছেলে মাঝি হয়ে গেছে। কি হবে! কি হবে ধন-বৌ! ঠাকুমা এবং ধন-বৌ জাহাজীকে দেখার জন্যে আস্তে আস্তে গভীর জলে নেমে গেল। ঐ জলটায় তারাও দুটো ফুটকরী তুলেছে। দুটো ফুটকরী, দুটো শেষ নিঃশ্বাস এবং বিশ্বাসের কথা বলে আবার জলের সঙ্গে মিশে গেছে।

অনুত্তম স্বপ্ন দেখে চীৎকার করে উঠেছিল, মা-আ-আ! ঠাকুমা-আ-আ-আ! বাংকের অন্ধকারে বসে এখন ভাবছে পাশের বাংকের হরিদাস সেন শুনতে পায় নি ত! শুনলে নিশ্চই ডাকত, বলত—এই কাঁদছিস কেন? ওঠ—ওঠ। হাতে মুখে জল দিয়ে আয়। আবার ঘুমো।

ফোঁকসালে ভীষণ গরম। কোথাও থেকে হাওয়া আসার পথ নেই। পোর্ট-হোলের ঘুলি ঘুলি বন্ধ। কাচ দিয়ে আঁটা। ঘুম হাল্কা হলে মানুষ স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সে অনুভব করতে পেরেছে ঘুমন্ত অবস্থায় কে যেন তার মুখের উপর উপুড় হয়েছিল। শ্বাস ফেলছিল জোরে। ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে সে পায়ের শব্দও শুনতে পেয়েছে। সিঁড়ি থেকে সে শব্দটা সারেং-র ঘরে মিলিয়ে গেছে। ঘুম হাল্কা হলে এসবও কি মানুষের হয়!

ভেবে কিছুই হদিস করতে পারল না। তার মুখের উপর কে নুয়েছিল। কে মুখে গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল, তারপর আস্তে আস্তে বাংকে উঠে এসে পাশে শুতে চেয়েছিল! এক এক করে সে সব মনে করতে পারছে। কিন্তু মুখটা মনে করতে পারছে না। মুখের আদলটা কি সারেং-র মত! তিনি কেন হবেন! আর এই গভীর রাতে কেনই বা তিনি আসবেন আমার বাংকে।

অনুত্তম রাতের আর একটা দুঃস্বপ্ন ভেবে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। ষ্টিয়ারিং এন্‌জিন্‌টায় কোন শব্দ নেই। নিঃশব্দ। কোথাও কোন আওয়াজ নেই মনে হল। বাংক থেকে সে নামল। পোর্ট-হোলের ঘুলঘুলিটা খুলে দিল। ফোঁকসালের বাইরে এসে সিঁড়িটার পাশে আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াল। এখানেও অন্ধকার। একটা সুর। দূরের ফোঁকসাল থেকে অদ্ভুত রকমের সুরটি সিঁড়ি ধরে

নেমে আসছে। ডাইনে আরো দুটো ফোঁকসাল। ইঁদুরে খুট খুট শব্দ করছে বুঝি দরজার নিচে। পরের ফোঁকসালটায় আলো জ্বলছে। দরজার ফাঁক দিয়ে অনুত্তম দেখল দুলে দুলে কোরাণশরীফ পাঠ করছে সারেং। ইচ্ছে হল একবার ডাকে, সারেং সাব!

অনুত্তম সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে এল। মেসরুমে আলো নেই। গ্যালী অন্ধকার। দূরে বন্দরের বুকে অনেকগুলি আলোর ফুলকি। জাহাজগুলো ছায়া ফেলেছে। মাস্টের আলোগুলি দুলছে বাতাসে। গলুইয়ে অনুত্তম দাঁড়াল অনেকক্ষণ। এক অদ্ভুত নীরবতা এই জাহাজে। জাহাজটা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বন্দরে এসে নির্বিঘ্নে ঘুমোচ্ছে। কেবল ঘুম নেই আজ অনুত্তমের চোখে। পায়চারী করতে করতে ভাবছে—এ দুঃস্বপ্নটার অর্থ কি!

দুঃস্বপ্নটার অর্থ ভাবতে ভাবতে অনুত্তম আরো দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেল। ডাইনে দুটো ফল্কা। রসদ নেওয়া হয়ে গেছে বলে ডানদিকের ডেরীকটা নামানো। সামনের কেবিনে থাকে পাঁচ-নম্বর-সাব। উপরে বয়-কেবিনের আলোটা হঠাৎ জ্বলে উঠেছে। বাটলার সিঁড়ি ধরে নিজের কেবিনের দিকে চলে যাচ্ছেন। আবার আলো নিভে গেছে।

পাঁচ-নম্বর-সাব ঘুমোচ্ছেন কেবিনে। শ্লিপিং-গাউনের নিচে হাত রেখে শ্বাস ফেলছেন জোরে জোরে। হঠাৎ ধর্‌ফর্‌ করে উঠে বসলেন তিনি। চোখ রগড়ে বালিশ টেনে আবার কিন্তু শুয়ে পড়লেন। পাঁচ-নম্বর-সাবের চোখে যদি কোন দুঃস্বপ্ন এসে থাকে! তাড়াতাড়ি অনুত্তম আরো সামনে পা বাড়াল।

মেজ-মিস্ত্রির ঘরে দুটো ছবি। একটা বই দিয়ে মেজ-মিস্ত্রির মুখ ঢাকা। দেওয়ালে দুটো ছবিই নগ্ন নারী মূর্তির। পায়ের দিকে ছবি দুটো টাঙানো। অনুত্তম এ ঘরে অনেকবার এসেছে। কিন্তু দিনের বেলায় মেজ-মিস্ত্রি অন্য মানুষ। অনুত্তম আরো এগিয়ে গেল।

গ্যাংওয়ের টেবিলের উপর সুখানী সাব ঢুলছিলেন—কেডা? কেডারে তুমি চোরের মত হাঁটছ!

—আমি ব্যানার্জী চাচা।

—অঃ। নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। টেবিলের উপর বসে আবার ঘুম গেলেন। গ্যাংওয়ের নিচে সিঁড়িটা কাঁপছে। সিঁড়িটা তুলে দেওয়া হয়েছে। ভোররাতে জাহাজের হাসিল খোলা হবে। নোঙর তোলা হবে। সুখানী সাব ঘড়ি দেখে সকল ডেক-জাহাজীদের ডাকবেন।

পরের কেবিনটা চিফ্‌ এনজিনিয়ারের। তিনি একটা দৈনিক কাগজ পড়ছেন। মাথার কাছে একটা টিপয়। হুইস্‌কির বোতল টিপয়টার উপর। অনুত্তম দূর থেকে পোর্ট-হোলের ফাঁক-দিয়ে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। আশ্চর্য মানুষ তিনি! ন'দিন জাহাজ চালিয়ে মাত্র দুদিন ডেকে বের হয়েছেন। তাঁকে সে মাত্র দুবার দেখেছে। একবার এনজিন-রুমের ব্যালেষ্ট পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে মেজ-মিস্ত্রিকে কিছু দেখাচ্ছিলেন. আর একবার এই গ্যাংওয়েতে দাঁড়িয়ে তিনি কলকাতা বন্দরের ভাড়া করা মেয়ে-মানুষটাকে এ সফরের মত হাত তুলে বিদায় জানিয়েছিলেন। পরের সফরে এলে তার ঘরেই উঠবেন শপথ করেছিলেন সেই সঙ্গে। কেবিনে পড়ে সারাদিন ঘুমোন তিনি, চোখ দুটো ড্যাবা ড্যাবা নারকেল কুলোর মত ফুলিয়ে রাখেন। সমস্ত রাত টিপয় থেকে মদ তুলে খান। ভোরের দিকে আবার ঘুম যান।

খুব গরম। অফিসারদের কেবিনগুলো পার হলেই তিন নম্বর ফল্কা। ফল্কার উপর বসল অনুত্তম। ফুর ফুরে হাওয়া উঠে আসছে সমুদ্র থেকে, শরীরটা বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। ব্রীজে কেউ নেই। আলো-ছায়ার মিষ্টি মিষ্টি অন্ধকার শুধু। মাস্টের ডানদিকের আলোটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলছে। চক চক করছে ব্রীজের কাচটা।

তিন নম্বর ফল্কার পাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি বোটডেকে উঠে গেছে। ছোটডেকে মেজ-মালোমের কেবিন। তিনি ঘুমিয়ে রয়েছেন। কেমন করে ঘুমোচ্ছেন—একবার সিঁড়ি ধরে উঠে দেখলে হত। সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকল। পাশাপাশি অনেকগুলো জাহাজ। জাহাজের মেলা। অন্য জাহাজগুলোয় সাড়া শব্দ নেই। সে এবার কেবিনের পাশে পোর্ট-হোলের উপর পা টিপে টিপে মুখ বাড়াল। তিনি কেবিনে নেই। কাঠের বাংকে সাদা নরম লিনেনের চাদর। নিভাঁজ। টিপয়ের উপর কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল। দেয়ালে যিশুখ্রীস্টের ছবি। একটি বন্দুক দাঁড় করানো এক কোণায়। অন্য একটা টিপয়ে গোটা পাঁচেক বই। পোর্ট-হোলে লিনেনের পর্দাটা বাতাসে কাঁপছে। কিন্তু মেজ-মালোম কেবিনে নেই।

অনুত্তম পা বাড়াল সামনে। মনে মনে মেজ-মালোমকে খুঁজছে।

মেজ-মালোম এখানটায়। অনুত্তম দেখতে পেল ডেক-চেয়ারে তিনি ঘুমুচ্ছেন। সমুদ্রের ফুরফুরে হাওয়ায় চুলগুলি উড়ছে। হাত থেকে দূরবীণটা সরে এসে কোলের কাছে পড়ে আছে।

অনুত্তম এই প্রথম মেজ-মালোমের মুখটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। মেজ-মালোমের মুখের ভিতর একটি আশ্চর্য রকমের বাঙ্গালী গড়ন। রং বদলালে তিনি বাঙ্গালী হতে পারতেন। বাঙ্গালী-সুলভ নরম চেহারা তাঁর। কিন্তু অনেক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর অনুত্তম বুঝতে পারল মেজ-মালোম বড় অসুখী।

মেজ-মালোম বড় অসহায়। অনুত্তমের মত অসহায়। দূরবীণটা হাতে নিলে কেমন হয়! দূরের জাহাজগুলোর ফাঁক দিয়ে বন্দর দেখলে কেমন হয়! খুব সন্তর্পণে দূরবীণটা তুলতেই মেজ-মালোম জেগে গেলেন। কেমন হকচকিয়ে বললেন, হু আর ইউ?

এমনটা হবে এবং এতটা অতর্কিতে হবে অনুত্তম ভাবতে পারে নি। সেও হকচকিয়ে গেল। থতমত খেয়ে বলল, আমি স্যার, আমি!

- ওঃ ইউ! আই সি! সিট ডাউন প্লিজ্।

মেজ-মালোমের পাশে বসে দূরবীণটা চোখের উপর তুলে ধরার আগে বলল, ইওর বাইনাকুলার সেকেণ্ড।

— অল্-রাইট্ অল্-রাইট্ বলে মেজ-মালোম দূরবীণটা সম্বন্ধে কথাগুলি এড়িয়ে যেতে চাইলেন। তিনি পরিবর্তে বলে উঠলেন, হাভ এ লুক অনুউম—এ প্যাসেঞ্জার সিপ্। গেট্ দিজ্ য়্যান্ড হ্যাভ এ ওয়াচ। মেজ-মালোম সামনের দিকে ঠ্যাং দুটো ছড়িয়ে দিলেন। মুখের উপর একটা পোকা ভন ভন করছে। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলেন। ডেক-চেয়ার থেকে উঠে একটু পায়চারী করে আবার এসে বসলেন।

এখনও ফুরফুরে বাতাস। এখনও পোর্ট-হোলের পাশে এক মুঠো আকাশ— অনেক গ্রহ নক্ষত্র। বন্দরে হাজার আলোর ব্যস্ততা—এ সব দেখে দেখে মেজ-মালোম আবার ডাকলেন, অনুত্তম!

ইয়েস্ সেকেণ্ড্!
ভেরী বিউটিফুল্ নাইট্।
ইয়েস্ সেকেণ্ড্।
—ইফ্ এনি ওম্যান ইন দি প্যাসেঞ্জার ডেক......?
—আই উড্ কল্ ইউ স্যার।
মেজ-মালোম হাসলেন।

গভীর রাত। বোট-ডেকের ঠাণ্ডার ঘুম এসে গেল মেজ-মালোমের। মেজ-মালোম অনুত্তমকে বলেছে ডাকতে, যাত্রী জাহাজের ডেকে যদি কোন মেয়ে-মানুষ এই গভীর রাতে পায়চারী করতে বের হয় তবে যেন তাকে ডাকা হয়। তিনি ঘুম থেকে উঠবেন। গ্রহ-নক্ষত্রের রাত্রিতে তিনি দূরবীনের ভিতর ডুবে যাবেন।

দূরবীন চোখে এঁটে অনুত্তম বসে থাকল। রাত্রিকে পাহারা দিল। দূরবীণের কাচে যাত্রি-জাহাজের ডেক থেকে বন্দরের ফাঁকটুকু দেখার চেষ্টা করল।

কোথাও কিছু নেই।

রাত্রি ক্রমশঃ বাড়ছে। আলো-অন্ধকারে রাত্রির কিছুই স্পষ্ট নয়। যাত্রী জাহাজটাকে অনুত্তম অনেক কষ্টে দূরবীণের আয়ত্তে এনেছে। কিন্তু কিছুই নেই। ডেক খালি।

অনুত্তম কিন্তু তবু বসে থাকল। যাত্রি-জাহাজের পাটাতনে মেয়ে-মানুষ দেখার চেষ্টা করল।

রাত্রি ক্রমশঃ বাড়ছে। গ্যাংওয়েতে ঘন ঘন ঘাড় দেখছেন সুখানী সাহেব। ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ দুটোতে জল ছিটাচ্ছেন। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর বড়-মালোমের দরজায় গিয়ে আস্তে আস্তে বোতাম টিপে ধরলেন।

বড়-মালোম উঠেছেন।

মেজ-মালোমও উঠেছেন এবং প্রথম বলছেন অনুত্তমকে, এনি ওম্যান্?

অনুত্তম চুপ করে থেকেছে। সেই থেকে মেজ-মালোম জেনেছেন যাত্রি-জাহাজের পাটাতন খালি।

সুখানী সাহেব ডেকে তুলেছেন ডেক-জাহাজীদের। নীল কোর্তা পরে মানুষ-গুলো জাহাজের আগিল পিছিল ছুটছে। আবার সেই চীৎকার—হেই মার, মার টান—হাইও। সারেং চীৎকার করছে। ট্যাণ্ডেল হাঁকছে। মেজ-মালোম, বড়-মালোম আগিল পিছিল হাতে ইসারা দিচ্ছেন। বলছেন—উইন্‌চ্ হারিয়া,......হাপিজ।

নিচে সমুদ্রের জলে ছোট ডিঙি নৌকায় তিনজন করে মানুষ। বয়া থেকে তারা হাসিল খুলে দিচ্ছে। ওরা কি সব বলাবলি করল তেলেগু ভাষায়। এই জাহাজের জাহাজীদের গল্প করছে হয়ত। দু'দণ্ডের জন্য জাহাজটা এল, নোঙর খেল, রসদ নিল—কিন্তু জাহাজীরা বন্দর পথে নামতে পারল না। দুঃখ তাদেরও হয়েছে বুঝি! হাসিল খুলতে ওরা দেরী করছে।

এন্‌জিন্ রুমের বারোটা চারটার পরীদাররা নেমে গেছে নিচে। বোট ডেকে দাঁড়িয়ে ওদের কয়লা শাবলের শব্দ পাচ্ছে অনুত্তম।

জাহাজ বন্দর থেকে আবার সমুদ্রে নামছে। আবার অন্য বন্দরের জন্য ওদের প্রতীক্ষা। জাহাজীরা আবার দিন গুনতে আরম্ভ করেছে।

জল আবার জল। সে জলের রং নীল। আকাশের রং নীল। ঝড় উঠবে সমুদ্রে—জাহাজীদের রক্ত নীল হবে। বিবির খতের জন্য প্রতীক্ষা, ছোট-ট্যাণ্ডেলের

নীল খামে একটা চিঠি আসবে অবিরত জল ভাঙগবে প্রপেলারটা, রাতের আঁধারে জলের নিচে লক্ষ জোনাকীর মত ফস্-ফরাস্ জ্বালাবে। ফস্ফরাসের নীল রঙে জাহাজীরা মুখ দেখবে। মেজ-মালোম দূরবীনের কাচটায় দেখতে পাবেন দুটো নীল নীল চোখ। রাতের ঘন অন্ধকারে বাংকের উপর স্বপ্ন দেখবে অনুত্তম, পড়শীর পরনে নীল শাড়ী। একটা নীল স্বপ্ন। পড়শীর মুখটা নীল হয়ে গেছে।

ভোর হয়ে গেছে। জাহাজ অনেক-দূর সমুদ্রে। কলম্বো বন্দর এখনও দেখা যাচ্ছে। জাহাজীরা জায়গা ছাড়ছে না। পিছিলের বেঞ্চিতে বসে ওরা বন্দর দেখছে।

মাজেদ এসে হাত ধরে টানল অনুত্তমের।—এই কয়লায়ালা ওঠ। না ঘুমিয়ে রাত ভর ত বন্দর দেখেছিস। এবার একটু জায়গা দে, আমরাও বসে বন্দরটা দেখি।

অনুত্তম হাত টেনে নিল। বললে, পাটাতনে বসে দ্যাখ্ বে। অমন মোটা গতর নিয়ে বসলে বেঞ্চি ভেঙ্গে যাবে।

—আরে শালা কয়লায়ালা তুমিও দেখছি কথা শিখে গেছ! ওদিন না বমি করে ডেক ভাসিয়েছ আর শালা তোমার এক্ষুনি এত কথা।

অনুত্তম এখনও জাহাজী খিস্তিগুলো রপ্ত করতে পারে নি। সে বললে, বসে দেখতে হয় দ্যাখ্। মুখের সামনে প্যাট্ প্যাট্ করিস না। বেশী প্যাট্ প্যাট্ করলে পেটের ভুড়ি ফাঁসিয়ে দেব।

—আমারটা তুই ফাঁসাবি, কিন্তু তোরটা কে ফাঁসাবে?

—মেজ-মিস্ত্রি।

অনুত্তমের কথায় মাজেদ প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। অনুত্তমের মুখে মেজ-সাব লাথি মেরেছে। এ অপমান শুধু অনুত্তমের নয়, সব বাঙ্গালী জাহাজীদের। মাজেদ অন্ততঃ তাই মনে করে। সে তাই চীৎকার করে বলেছিল, ও সারেং সাব এনজিনের মেজ-সাব আজ মেরেছে অনুত্তমের মুখে লাথি, কাল মারবে আপনার মুখে। তখন কে ধরবে?

এনজিন-সারেং। ধরি মাছ না ছুঁই পানীর মত করে এড়িয়ে গিয়েছিল কথাটা।

মাজেদ অনুত্তমের হাতে ধরে ফেলল।—রাগ করলি তুই!

—রাগ কেন করব। এ ত দুনিয়ার নিয়ম। যে যাকে নরম পাবে সে তার ভূঁড়ি ফাঁসাবে। তুই জব্বরকে, আমি তোকে, মেজ-মিস্ত্রি আমাকে। একদিন সত্যি দেখবি মেজ-মিস্ত্রি আমার ভুঁড়ি ফাঁসাবে।

মাজেদের চোখ দুটো কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল ফাঁসাবে আর তুই তা সহ্য করবি!

অনুত্তম কিছু জবাব দেওয়ার আগে এক নম্বর ওয়াচের তেলওয়ালা সাত্তার এসে ডাকল, আটটা বারোটার পরীদারদের টাণ্টু।

অনুত্তম আর উত্তর করল না। জাহাজ দেখল—পাটাতন থেকে চিমনী পর্যন্ত দেখল। কলম্বো বন্দরকে শেষবারের মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এবার ডাকল মাজেদকে, নে বোস। এনজিন-রুম থেকে উঠে এসে ত আর দেখতে পাব না বন্দরটা। শেষ দেখাটা তুই-ই দেখ। তারপর সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। কতদিন পর্যন্ত এই ভয়াবহ জীবন এক-নাগারে চলবে কে জানে। তেলওয়ালা সাত্তার গ্যালী থেকে

হাসছে। অনন্তমের বিষণ্ণতা দেখে ওর হাসি পেল।

অনন্তম হাসতে পারল না। শাবলটা, ভাঙ্গা গাড়িটা, লম্ফটা ওর জন্য বাংকারের অন্ধকারে প্রতীক্ষা করছে। বাংকারে মজিদ স্যাটের মুখে কয়লা ফেলতো ফেলতে হয়ত ভাবছে, ছেলেটাকে মেয়েটাকে—মাইয়াডায় কয়, বাজী জাজে কাজ করে, কিডা না একটা করে!

॥ ৫ ॥

প্রজাপতির পাখনার রোদের গন্ধ মিলানোর মত আকাশ প্রত্যন্তে নিভাঁজ সমুদ্রটা মিশে গেছে।

প্রজাপতির হৃদয় গভীরতার মতন সমুদ্রটা শান্ত।

কমলা রঙের রোদটা জাহাজীদের মনে অন্য একটা বন্দরের মধুর প্রতীক্ষা এনে দিয়েছে। আবেশ এনে দিয়েছে।

আবার আড্ডা জমেছে ফোঁকসালে ফোঁকসালে। জব্বর মিঞা বসে হুকো টানছে। কাসছে খক্ খক্। পেটে সে এখন হাত বুলোয় না। ফালতুতে সারেং তাকে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পেট ফুলিয়ে বাংকে এখন বসে থাকে না। তেল মালিশ করে না পেটে। বেশ আছে।

সাগরের জল কেটে চলেছে জাহাজ।

জাহাজীদের মন কেটে অনেকগুলো চিন্তা কাঠের পাটাতনে পাক খাচ্ছে।

মেজ-মালোম লিখলেন তার ডায়েরীর পাতায়—ইটস নট এ ষ্টরমী নাইট নট এ ষ্ট্রমী ডে...। সেলরস আর এনকশাস ফর এ পোর্ট।...ওম্যান দে লাইক টু হ্যাভ। ...অল ওম্যান লিভস ফর এ ম্যান...।

তারপর লিখেছেন তিনি—বাইশ দিন ধরে জাহাজ চলবে। ডারবান বন্দরে পেঁছিতে অনেকগুলো দিন। এক পক্ষ আরো ছ'দিন। রাতের এই পূর্ণিমা যাবে। অন্ধকার রাত নামবে। চাঁদ উঠবে। বাইশ দিনে বাইশটি নক্ষত্র আকাশ সীমানায় জাগবে। বাইশজন জাহাজীর চোখে ঘুম থাকবে না। বন্দর নামার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে।

তিনি লিখলেন, কিন্তু জাহাজীরা সেখানেও নামতে পারছে না। তিনি এবার ডায়েরীর পাতা শেষ করলেন। ডায়েরীর পাতা বন্ধ করলেন। পোর্ট-হোলের কাঁপানো পর্দাটা সরিয়ে সমুদ্র দেখলেন। কমলা রঙের রোদটা ক্রমশঃ নীল রং, ধরছে। জাহাজের পিছনের দিক থেকে ছায়া নেমে আসছে। বোট ডেক ঘরে নিচে নেমে যাচ্ছে সুখানী। ফোঁকসালে ফিরছে তখন জাহাজীরা। রং করা হয়েছে ফরোয়ার্ড-পিকে। দুধের মত সাদা ডেকটা সে জন্য। মেজ-মালোম পর্দাটা আবার টেনে দিলেন। দরজা খুলে ইজিচেয়ারটা ডেকের উপর এনে যে নক্ষত্রগুলো এখন উঠছে তাদের জন্য প্রতীক্ষা করে বসে থাকবেন এবার।

গলুইর মানুষগুলো জটলা পাকাচ্ছে। ডেক-জাহাজীরা খাচ্ছে পাটাতনে বসে। কশপ নামাজ পড়ছে ডেকের উপর। খানা খেয়ে নামাজ পড়ে ডেক-কশপ ফোঁকসালে ঢুকে খেয়া জালের গিট দিতে বসবে। নামাজ পড়তে পড়তে বারবার সেজন্য সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে।

ওদিকটার ডেকটাতে বড়-মালোম আর ডেক-সারেং। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে ডেক-সারেং বড়-মালোমকে কি সব দেখাচ্ছেন ডেকের উপর। বুঝি কাজ দেখাচ্ছেন। ডেকে যে একদল মানুষ কাজ করে গেছে তিনি তাদের সাক্ষী। বড়-মালোমকে সব কাগজটা দেখিয়ে তিনিও এবারও গলুইতে ফিরবেন। চান করবেন, নামাজ পড়বেন। খানা খাবেন তারপর। গলুইতে বসবেন শেষে গল্প জমানোর জন্য।

এনজিন-সারেং বসবে গলুইর গঙ্গাবাজুর বেঞ্চিতে। তিনি সাদা দাড়িতে হাতের আঙ্গুলগুলি চালিয়ে দিয়ে ডাকবেন, এ ভান্ডারী কি পাকাইছ একবার দ্যাও দেখি। তিনিও খাবেন। বসবেন। সমুদ্রের নীল জলে গত সফরের অনেকগুলি খোয়াবকে দেখবেন।

অনুত্তম উঠবে এই সময়। বিকেলের অসহিষ্ণু মনটা ফোকসালে শুয়ে শুয়ে যখন ক্লান্ত হবে—যখন হরিদাস সেনের নাকটা গড় গড় করবে সে সময় চোখ মুছতে মুছতে উপরে উঠে বেঞ্চিতে বসবে। মনটা বড্ড ফাঁকা ঠেকে এই সময়। ঘুঘু পাখির ডাকের মত নির্জন হয়ে গেছে যেন জাহাজটা। নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। রাত নামবে আবার ডেকে। চাঁদ উঠবে। নক্ষত্রের রাতকে পাটাতনে বসে দেখবে অনুত্তম। কিছুক্ষণ বাদে সে রাত ডেকের উপর উঁকি দেবে।

গ্রহ-নক্ষত্রের রাত, চুপি চুপি আকাশ, বাদাম দেওয়া নৌকার মত বুড়ি গঙ্গার পারে পারে ভাটার টানে যেন ছুটছে। ভিড়বে গিয়ে হয়ত সদর ঘাটে। এ আকাশ, এ রাত, ফিকে মসলিনের মত জ্যোৎস্না কোন এক পল্লীর অনাবৃতা কন্যার মত। বুড়ি গঙ্গার তীরে সে কন্যার ঘর। সে ঘরে সে উঁকি দেবে। কন্যার দেহ দেখবে। এইসব এলেমেলো চিন্তা সমুদ্রে নোনা-ঢেউয়ের একঘেয়েমি জীবন থেকে তাকে বিমুক্ত রাখে। কয়লা টানার কঠোর পরিশ্রম থেকে সে দু দণ্ডের জন্য তখন পালিয়ে বাঁচে। তখন মনে হয় অনেক সুখ, অনেক সম্পদের ঘরানা এই মুহূর্তগুলো। জীবনের ঠাঁই বজায় রাখছে এরা। স্টোক-হোল্ডের অসহ্য গরম, অসহিষ্ণু মন, টাইফুন-ঝড়, ট্যান্ডেলের লাল-লাল চোখ, মেজ-সাহেবের বাংলা পাঁচের মত মুখ, নয়ত এতদিনে তার সত্বাকে অক্টোপাসের নীরব আলিঙ্গনের মত গ্রাস করে ফেলত। সে তাই সমস্ত আকাশটাকে কোন এক পল্লীর বধূ কিংবা অনাবৃতা সদ্য বিধবা কুমারী কন্যা ভেবে মাঝে মাঝে রাত-জাগা-পাটাতনে মাদুর বিছিয়ে দু ঠ্যাং ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে কল্পনার জগতে ডুবে থাকে। সে জগৎ তার একান্ত নিজের। সে সেখানে পড়শীর সঙ্গে শুক আর শারী। তাল আর তমাল। দেহ এবং মন। কিন্তু এমন সময় তার জগতকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করবে সাত্তার। নীরস কণ্ঠে মেজাজ চড়িয়ে বলবে, চান্টু।

সে কাজে নামবে আবার। কাজ থেকে উঠবে আবার। রাত বারোটায় আর একবার পায়চারী করবে ডেকে। স্নান সেরে সমুদ্র দেখবে, অন্ধকার দেখবে। চুলগুলি উড়বে ফুর ফুর হাওয়ায়। মনটা উড়ু উড়ু করবে। বাংলা দেশের একটি সবজ মাঠ, কোমল জীবন, সড়কে হিজলের সাড়ি ; ডালভাংগা অশথ গাছটা, ভাঁশা আমের আচার, কুলপি বরফ, পড়শীর ভাংগা ভাংগা কথা সব এক এক করে মনে পড়বে।

বোট ডেকে উঠে যাওয়ার সময় দেখল অনুত্তম দুজন লোক মজিদকে বাংকার থেকে তুলে আনছে। কাঁকড়ার ঠ্যাং-এর মত কুঁকড়ে আছে মজিদ। মুখ দেখে মনে হচ্ছে একটা সামুদ্রিক কাঁকড়া ওর পেটে চিমটি কাটছে। আগুনে ছ্যাঁকা দেওয়ার মত

মানুষটা হঠাৎ বলছে, আল্লারে তুই ইডা কিডা করলি!

মজিদ ক্রমশঃ নুয়ে পড়ছে। ওর চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। খালি গা। বাঁ হাত দিয়ে তলপেট চেপে রেখেছে।

—মজিদের কি হল আবার! সুখানী নেমে যাওয়ার সময় বলল। লোক দু'জন উত্তর করলে না। অনুত্তম ওদের পাশে হেঁটে গেল। মজিদের পেটের উপর হাত রেখে প্রশ্ন করল, কোন্ জায়গায় ব্যথা হচ্ছে।

গড় গড় করে কেমন আড়ষ্ট কণ্ঠে জবাব দিল মজিদ, এ জায়গায়। ধরিস নারে! লাগে! আমি ত রে আর বাচুমনা রে ব্যনার্জী।

যে দু'জন লোক তুলে এনেছে, তারা ধমক দিয়েছে।—মানুষের বুঝি অসুখ হয় না মিঞা!

অনুত্তম আর দাঁড়াল না। ছুটে সে বোট-ডেকে গেল। মেজ-মালোমকে খবরটা দিতে হবে।

মেজ-মালোমের কেবিনে ঢুকে দেখল অনুত্তম, তিনি চোখ বুজে আছেন। অনুত্তম ডাকল, সেকেণ্ড।

—ইয়েস কাম-ইন।

বাংক থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। অনুত্তমের পিছনে-পিছনে মজিদের ফোঁকসালে নেমে গেলেন।

মজিদের বাংকের পাশে আরো দু' চারজন জাহাজী জটলা পাকাচ্ছে তখন। ওরা সকলে মেজ-মালোমের অপেক্ষায় আছে। তিনি ভিতরে ঢুকলে জাহাজীরা সরে দাঁড়াল। হাত তুলে নিলেন তিনি এখন নাড়ী দেখলেন। পেট টিপে দেখলেন। বললেন, কন্স্টিপেসন। তারপর দরজার ওপাশটায় পা বাড়াবার সময় তিনি একটু অন্যমনস্ক হলেন। অনুত্তম মজিদের পাশে বসে দেখল মেজ-মালোমের যাওয়াটা। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন তাও সে লক্ষ্য করলে। মজিদের হাত দুটো টিপে দেওয়ার সময় বললে, দেখবি মেজ ঔষধ দিলে তুই ভাল হয়ে উঠবি।

অনুত্তমের হাত ধরে আরো কুঁকড়ে গেল মজিদ। গোঙাল। এপাশ ওপাশ ফিরে ছট্ফট্ করল। পেটের উপর হাত রেখে বলল, আর পারি না রে ব্যনার্জী। আমারে পাগল করে দিছে।

খবর পেয়ে সারেং এসে ঢুকল ফোঁকসালে। অনুত্তমকে বসে থাকতে দেখে ধমক দিল।—এখনটায় বইসা ক্যান। পরীতে, চুলা টানছে—বাংকার খালি, বইসা থাকলে চলব!

অনুত্তম ডেকে উঠে গেল। উঠে যাওয়ার আগে দেখল জব্বর নিজের বাংকে বসে পেটে তেল মালিশ করছে। মজিদের পরিবর্তে স্টোক-হোলডে পাঠানো হবে জব্বরকে। তলপেটে তাই আবার ব্যথা। সে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হবার চেষ্টা করছে।

অনুত্তম ডেকের উপর থামল। এখান থেকেও মজিদের গোঙানীটা শোনা যাচ্ছে। ওর পাশে এখন কেউ নেই। যে যার মত কাজ করছে। মনে হল প্রতিটি জাহাজী অদ্ভুতভাবে নিঃসঙ্গ। অসহায়। মজিদের ভগ্ন মনটা এখন হয়ত ছেলেটার কাছে পড়ে আছে। মেয়েটাকে ছেলেটাকে ভাবছে, বংকারে যে গল্পগুলো জমত মজিদ শেষ পর্যন্ত ওর ছেলেকে মেয়েকে সে গল্পে টেনে আনত। বিবিকে গোড় দেওয়ার পর ওরা দুজন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠত। মজিদ বলেছিল, ওদের দুজনকে মাটিতে রেখে যেতে পারলেই সে খুশী। ওদের জন্য সে পরদেশী হয়ে টাকা কামাচ্ছে। মেয়েটাকে

সাদি দিয়ে ঘর জামাই রাখবে, ছেলেটাকে সাদি দিয়ে অনেক সুখ সাচ্ছন্দ দিয়ে যাবে। সফরের টাকায় জমি কিনবে দু-বিঘা। দাম দস্তুর সব ঠিক হয়ে আছে, গিয়ে টাকাটা দেবে। অনেক পরিকল্পনা মজিদের মনে।

সফরে সফরে জাহাজীদের এক পরিকল্পনা। সফরশেষে ঘরে ফেরা, আবার জাহাজের জাহাজী, বাংকে শুয়ে স্মৃতিজীবি হয়ে থাকা, টাকার হিসেব, জমির হিসেব—ক' কুড়ি টাকায় কটা বিবি পাওয়া যায় তার হিসেব।

অনুত্তম রঙ্গরস করে বলেছিল একদিন মজিদকে, ঘরে ঘিরে নিকা করবি না একটা?

মজিদ দু'পাটি দাঁত বের করে এমন হেসেছিল যে অনুত্তম দ্বিতীয়বার তেমন কথা বলতে সাহস করে নি।---ওটা করব ট্যান্ডলরা, আমলদাররা। ওটা অগ ব্যাপার। আমলদারদের একচেটিয়া ব্যবসা। ওসব কথা আমারে বলে লজ্জা।

ক্যান ব্যনাজী? আমি কি হেই মানুষ! তুই এতদিনে একটা বুঝলি। অনুত্তম জবাব দিয়েছিল, হাসি মসকরা বুঝতে হয়।

মজিদ বলেছিল, বিবিরে যেখানে গোড় দিছি ওখানটাতে আমার একটা জায়গা রাখছি। জাহাজী মানুষের গোড় দেওনের লোক থাকে না। পোলারে কইছি, তরা ভাই-বইন মিলা তগ আম্মার পাশে আমারে রাইখা দিস। দুইটা চেরাগ জ্বালাইয়া দিস রোজ।

এই নীরস ডেকের উপর সব কথাগুলিই মনে পড়ছে অনুত্তমের। সে উঠে এল এবার বোট-ডেকে। তারপর ফানেলের গুঁড়ি ধরে স্টোক-হোলডে নেমে গেল। যন্ত্রের মত কাজগুলো করল। সে এখন শাবলটার মত অথবা লোহার গাঁড়িটার মত হয়ে গেছে। অনুভূতিশূন্য। চেতনাগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে, কয়লাগুলোর মত মনটা বোবা হয়ে গেছে।

পরী শেষ করে অনুত্তম যখন বোট-ডেকে উঠল তখন আকাশে অন্ধকার। গ্রহ নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে না। সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না। এক অখণ্ড অন্ধকারে জাহাজটা যেন থেমে রয়েছে। মাঝে মাঝে আকাশের গায়ে বিদ্যুৎ চমকাল। কতকগুলি শীর্ণ আলোর রেখা ঢেউগুলোর মাথায়। টিপ টিপ বৃষ্টি। ভিজতে ভালো লাগছে। অনুত্তম মুখটা আকাশমুখো করে নীরস ডেকের উপর দাঁড়িয়ে জীবনের কোন এক পরম রমনীয় মুহূর্তকে খুঁজতে থাকল। কিন্তু মজিদ সেখানে বার বার তার শীর্ণ দেহ এবং মন নিয়ে আকাশের অন্ধকারে উঁকি দিচ্ছে। তাই সে টুইন-ডেক অতিক্রম করে সিঁড়ি ধরে গলুইতে উঠল। ভাণ্ডারীর গ্যালীর দরজা বন্ধ। মেসরুমের দরজা বন্ধ। গলুই থেকে সিঁড়ি ধরে ফোঁকশালের দরজাগুলো অতিক্রম করে মজিদের ফোঁকসালে গিয়ে ঢুকল। সে ঘুমোচ্ছে। দুটো হাত বুকের উপর প্রার্থনার মত করে রেখেছে! পাশের বাংকে হেদং মিঞা কোরান শরীফ পাঠ করছে দুলে দুলে।

অনুত্তম বলল, আস্তে চাচা—মজিদের ঘুম ভাঙবে।

হেদৎ কেমন ক্ষেপে গেল। সে আরো জোরে পড়তে শুরু করল।

অনুত্তম অত্যন্ত বিরক্ত হল হেদৎমিঞার কাণ্ড দেখে। হেদতের বাংকাটা পুবমুখো। সে পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়াল। অস্থির ভাবে পায়চারী করতে করতে বললে, আপনাকে বলছি আপনি অত চিল্লাবেন না। আপনি আমলদার বলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবেন না জাহাজে। জাহাজীদের সুখ-দুঃখ আপনার বুঝতে হবে।

ওদের কলহের শব্দে মজিদ কিন্তু ততক্ষণে জেগে গেল। সে গোঙাতে সুরু

করেছে। বলছে, অমন চিল্লাচ্ছ ক্যান্ মিঞা!

অনুত্তম এবার খুব দৃঢ় অথচ নরম গলায় বললে, আল্লার নাম আপনি মনে মনে করুন। কেউ কিছু বলবে না। মজিদকে ঘুমোতে দেবেন।

হরিদাস সেন আর সারেং এল মজিদকে দেখতে। স্নান সারতে অনুত্তম এ সময় বাথরুমে চলে গেল। ওরা দেখবে মজিদকে। স্নান সেরে মজিদকে সে ওষুধ খাওয়াল, জল খাওয়াল। তখনও দুলে দুলে কোরান পাঠ করছে হেদৎ। মজিদের চীৎকার ছাপিয়ে হেদতের কণ্ঠ পোর্ট-হোলে গলে পড়ছে।

সারেং বললে, আরে মিঞা, বোঝার উপর আর শাকের আঁটি চাপাও ক্যান! ওরে একটু শান্তিতে থাকতে দ্যাও।

হরিদাস সেন চোখ রাঙিয়ে বললে, মিঞা, জাহাজটা তোমার একার নয়। আরো দশজন লোক এখানে থাকে। খুশীমত চলতে পারবে না। আল্লাকে মনে মনে ডাকবে।

হেদৎ জিদ ধরেছে।—আমার বাংকে বসে আমি পড়ব, উলঙ্গ হয়ে নাচব। তাতে তোমার কি মিঞা! আল্লার নামের চেয়ে ও মিঞার জানের কষ্ট বুঝি বেশী।

—বেশী, অনেক বেশী। হরিদাস সেন দু হাত তুলে বললে, তোমার মত মানুষের মুখে আল্লা তার নাম শুনতে চান না। আল্লাকে ডাকতে হয় বোট-ডেকে গিয়ে ডাকবে। বাংকে বসে ডাকলে মনে মনে ডাকবে আল্লাকে। যদি তা না কর, ক্যাপ্টেনকে নালিশ জানাব। দরকার হলে পোর্ট-হোল দিয়ে ঠেলে দরিয়ার জলে ফেলে দেব। হরিদাস সেন উত্তেজিত হয়ে অনেকগুলি কথা বলে ফেলল।

—কি মিঞা! কি মিঞা! তোমার মুখে লাথি! থু থু! আল্লার নাম তুমি নিতে দেবে না এত বড় কথা! ইবলিস—শয়তান! হেদৎ মিঞা বাংকের উপর বসে লুঙ্গি টানছে আর লাফাচ্ছে। হরিদাস সেন উত্তেজিত হয়ে ওকে চেপে ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মজিদ গেলাম রে বলে এক ভয়াবহ কণ্ঠে এমন চীৎকার করে উঠল যে হরিদাস সেন, সারেং চোখ দুটো বড় বড় করে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকল। অনুত্তম ভয় পেয়ে কেবল বলছে, কি হয়েছে! কোথায় লাগছে?

মুখটা নীল হয়ে গেছে মজিদের। হেদৎ তখনও অমানুষিক চীৎকার করে অন্যান্য জাহাজীদের কাছে নালিশ জানাচ্ছে। ডেক-জাহাজী মাজেদ মজিদের শিয়রে বসে বলছে—আল্লা! হরিদাস সেন উপুর হয়ে আছে বাংকের রেলিংএ। অনুত্তম হতবাক্। সারেং গেছে মেজ-মালোমকে ডাকতে।

মেজ-মালোম এলেন কিছুক্ষণ পর। দেখলেন তিনি। মাথা চুলকালেন চুপ-চাপ। মজিদের চোখ টেনে রক্ত দেখলেন। রক্ত কম—ফ্যাকাসে। চোখের কোণে পিচুটি। মুখে ভয়ানক দুর্গন্ধ। মুখ সাদা সাদা। ছাইয়ের মত রং। হাত রাখলেন তিনি পেটের উপর—পেটের নাড়ী পল্টন খাচ্ছে। মেজ-মালোমের সাধারণ বিদ্যাটুকুতে এ রোগ ধরা পড়ছে না। তিনি চুপচাপ বের হয়ে গেলেন।

হেদৎ মিঞা ফোঁকসাল থেকে খুশী মনে বের বের হয়ে গেল। সে ঘরে-ঘরে এখন নালিশ দিচ্ছে অনুত্তমের নামে। হরিদাস সেনকে ভয় পায় বলে ওর নামটা জড়ায় নি। ফোঁকসালে বসে সব কথাগুলিই শুনতে পেল অনুত্তম।

মেজ-মালোম তখন উঠে গেছেন। যাবার আগে বলে গেছেন, আগামী বন্দরটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। আর কোন উপায় নেই।

ডাক্তার নেই জাহাজে—আফশোষ। এতগুলো জাহাজীর প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি

খেলছে কোম্পানী ; সারেং বললে, সোভান আল্লা। তিনি বের হলেন পা টিপে টিপে। আরও দু'একজন যার ছিল তারাও চলে গেল।

তারপর অনেকগুলি দিন গেছে জাহাজে। অনেকগুলি রাত কাটল জাহাজে। অনেকগুলো উড়ুক্কু মাছ ডেক-পাটাতনে আছাড় খেয়েছে। ঝড় উঠেছে। ঝড় বাদলের রাত গেছে। জাহাজীরা উন্মুখ অন্য বন্দরের জন্য। মজিদের অবস্থা দিন দিনই খারাপ। অনুত্তম বার বার প্রশ্ন করছে, আর কতদিন সেকেণ্ড্।

মজিদও বিছানায় শুয়ে কেবল এক প্রশ্ন করেছে, আর কতদিন?

জাহাজীরা উত্তর করেছে, এই ত এসে গেছি।

কিন্তু ইদানিং মজিদ আর তেমন প্রশ্ন করছে না। বাংকের সঙ্গে ওর দেহটা মিশে গেছে। অনুত্তম রোজ ভোর বেলায় পাগুলো হাতগুলো টিপে দেয়।

এমনি কোন এক ভোরে মজিদের পাশে বসেছিল অনুত্তম। ফোঁকসালে আর কেউ নেই। পোর্ট-হোল দিয়ে সমুদ্রের গর্জন গানের মত ভেসে আসছে। মজিদ উৎকর্ণ হয়ে যেন শুনছে সে গান। সমুদ্রের গান। অপলক তার দৃষ্টি। ডেকের উপর দু'একজন মাঝি-মাল্লার পায়ের শব্দ। তারা চলছে। হাঁটছে। কাজ করছে। শব্দগুলো তার প্রতীক। জীবনের প্রতীক। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল মজিদ, ব্যানার্জী।

অনুত্তম মজিদের মুখের কাছে এগিয়ে গেল। কপালে হাত রেখে বললে, আমায় কিছু বলবি!

—তুই আমার পুত।

মজিদের ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজগুলো বড় অস্পষ্ট। বড় অসহায়। —আমি তোর পুত। অনুত্তম স্বীকার করল।

—ইবারে শেষ বন্দরে নোঙর ফেললুম। মজিদ অপ্রত্যাশিতভাবে খুসী হল। হাসল। প্রশ্ন করল, কোন্ দরিয়ায় আছিরে ব্যানার্জী?

—দেশের দরিয়ায়।

হঠাৎ সে দুটো হাত চেপে ধরল অনুত্তমের। বুকের কাছে টেনে বললে, খোদাকে ডাক, আল্লার ডাক। আমার লাইগা মোনাজাত কর, মরি ত মরি এ দরিয়ার পানীতে মরি য্যান। এ দরিয়ার পানীতেই গোড় খাই যান। এ পানী আমার দ্যাশের পানী।

—এমন কথা বলতে নেই মজিদ।

—তুই আমার পুত। তর কষ্ট হয় বুজি। কিন্তু কত আশা। সোলেমানরে কইয়া রাখছিলাম আমারে তগ আম্মার পাশে রাখবি।

অনুত্তম যেন এখন ওর অন্য বন্দরে নোঙর ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তাই সে জবাব দিচ্ছে না। কথা বলছে না।

একটা কথারে ব্যানার্জী, সোলেমানরে লিখা দিবি হেগ আম্মার পাশে আমার নামে যান একটা চেরাগ জ্বালায়। রোজ চেরাগটা জ্বালানের সময় মোনাজাত করবে। আমি আমার বিবির মুখটা তখন দ্যাখতে পামু।

চেরাগের আলোতে মজিদ তার বিবির মুখ দেখতে চায়। পেয়ারা গাছের নিচে মাটির অন্ধকারে বিবি তার প্রতীক্ষা করছে। অনেক আলো বিবির মুখে পড়বে চেরাগের আলোতে। দুটো চেরাগের দুটো নাম। দুটো মন। দুটো আলোর রেখা। সে রেখা দুটোয় মজিদ বিস্মৃতির অন্তকারে কোন এক গোপন স্মৃতিকে লালন করছে।

পরী দিতে অনন্তম এবং হরিদাস সেন উপরে উঠে গেল একসময়। শীত পড়েছে খুব। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া আফ্রিকার উপকূল থেকে নেমে আসছে। মাঝি মাল্লারা খুব বেশী জামা চাপিয়েছে শরীরে। অনন্তম ঠক্ ঠক্ করে শীতে কাঁপছিল। ফল্কার কহাছে এসে সে প্রশ্ন করল, দাদা মজিদ কি সত্যি বাঁচবে না?

—কি বলব বল্! মেজ-মালোম ত সেই কথাই বলেন। কাল ক্যাপ্টেন বড়-মালোম সকলেই ওকে দেখে গেছে।

—ওকে বাঁচাবার তবে কোন উপায় নেই?

ঠোঁট উল্টাল হরিদাস সেন।

আকাশে তখন অনেক আলো।

বয়লারের চুল্লীতে তখন গন গনে আগুন।

মেজ-মালোম চুপচাপ বসে আছেন ডেকে।

রঙের টব নিয়ে মাজেদ তর তর করে মাস্টে উঠে যাচ্ছে। ডেক-সারেং, ভাণ্ডারী আর বাটলার কলহ করছে। কোথাও এতটুকু অন্যমনস্কতা নেই। ব্রীজে ক্যাপ্টেন। তার কুকুর। চীৎকার করছে কুকুরটা। সুখানী কম্পাসটার উপর ঝুঁকে আছে। ডেক-এ্যাপ্রেণ্টিস্ দুজন লাইফ-বোটে বসে একটা ইংরেজী গানের কলি কোরাস ধরেছে। এই সব দেখতে দেখতে অনন্তম নিচে গিয়ে নামল। জব্বর মিঞা বাংকার থেকে বের হয়ে বললে, মজিদের অবস্থাটা কেমন ব্যনাজী?

—ভাল না।

—বাঁচব না?

—না।

জব্বর মিঞা ফোলা পেটের উপর হাত রেখে বলল, সব নসিব।

ছোট-ট্যাণ্ডেল সেই সময় নিচে নামল, হারে'ব সব নসিব! বিবির খত কলম্বোতে মিলল না! ডারবানে নিশ্চয় একটা মিলব। ব্যনাজী তোমার চাচীর খতের জবাবটা লিখা দিবা ত!

—দেব চাচা দেব! অনন্তম কেমন বিরক্ত হয়ে জবাব দিল।

স্টোক্-হোলডে আবার সেই ব্যস্ততা।

পরী শেষ করে ট্যাণ্ডেল, অনন্তম, হরিদাস সেন একসঙ্গে উঠে এল। ওরা বোট-ডেক থেকে নেমে জলের জন্য অফিসার গ্যালীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গলুইর ট্যাংকে জল নেই। এখন এনজিন-রুমের ট্যাংক থেকে মেপে জল দেওয়া হচ্ছে। অনন্তমের মনটা কিন্তু মজিদের ফোঁকসালে পড়ে আছে। জল দিতে দেরি দেখে সে গলুইতে চলে গেল। নিচে নেমে ফোঁকসালে ঢুকল। মজিদ চিত হয়ে শুয়ে আছে। হাতগুলো শক্ত। পাগুলো শক্ত, কস দিয়ে লালা পড়ছে—তার দাগ! চোখ দুটো ওর ভূত দেখে ভয় পাওয়ার মত। মনে হয় চোখ দুটো এক্ষুণি বের হয়ে আসবে।

আরো কাছে গেল অনন্তম। কপালে হাত রাখল। অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মজিদকে। ওর চোখ দুটো স্থির, অপলক। এখনও যেন অনন্তমকে কিছু বলতে চাইছে।

—কি রে কিছু বলবি? অনন্তম কেঁদে দিল।

কোরান পড়ছে হেদৎ মিঞা। আন্দোলিত হচ্ছে ওর সুরের ওঠানামা। সুরটা আজ বড় ভাল লাগল শুনতে। মজিদের পাশে একটু জায়গা করে বসল অনন্তম। বসল দুটো আয়াৎ শোনার জন্য। পোর্ট-হোলটা খোলা। কনকনে হাওয়া আসছে।

এবার অনন্তম মজিদের দেহের উপর হাত রেখে অন্য একটা জগতে ডুবে গেল।

সারেং দরজায় উঁকি দিয়ে বললে, তুমি চান খাওয়া না করেই এখানটায় এসে আবার বসে থাকলা। তুমিও দেখছি অসুখ না বাধিয়ে ছাড়বা না। ফের এদিক ওদিক উঁকি দিয়ে বলল, মজিদ আছে কেমন?

অনন্তম এবার উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে এল সন্তর্পণে। ধীরে ধীরে বললে, মজিদ মারা গেছে সারেং সাব।

হেদৎ মিঞা কেঁপে উঠল। বাংক ধরে সে ঝুঁকতে থাকল। কোরানশরীফটা ঠেলে দূরে ফেলে দিয়েছে। —সারেং সাব, সারেং সাব! বলে সে চীৎকার করে উঠল।

—কি হয়েছে হেদৎ! এমন চীৎকার করছ কেন?

—এ ফোকসালে আর থাকছি না সারেং সাব! আমি অন্য ফোঁকসালে যাব।

সারেং এবার জোরে ধমক দিলেন, চুপ করে মিঞা। জাহাজটা তোমার ইচ্ছায় চলে না।

সারেং ফোঁকসালে ফোকসালে খবরটা দিল। উপরে উঠে ক্যাপ্টেনকে বললে, সাব, মজিদ ডেড।

ক্যাপ্টেন বুকে ক্রস টেনে টেলিগ্রাম করলেন এনজিন-রুমে।—জাহাজ থামিয়ে দেওয়া হোক। জাহাজের একজন জাহাজী মারা গেছে।

তিন নম্বর সাব সারেংকে দিয়ে স্টোক-হোলডে খবর পাঠালেন, আর যেন বয়লারে কয়লা হাঁকরানো না হয়। জাহাজ সমুদ্রের উপর থামবে। জাহাজের এক জাহাজীকে সলিল-সমাধি দেওয়া হবে।

ফোঁকসালে বসে অনন্তম বুঝতে পারল জাহাজ আর চলছে না। প্রপেলারটা থেমে গেছে। স্টিয়ারীং এনজিন থেকে থেকে শব্দ করছে। মজিদের মৃত্যুতে ওর কান্না পাচ্ছে বুঝি! মজিদের ফোকসালে এখন ভিড়। সারেং এসে এখন বলবে, অনন্তম এবার উঠে এস। মজিদকে আর ছুঁয় না।

অনন্তম উঠে দাঁড়াল। মজিদকে সে আর ছুঁল না। ক্যাপ্টেন, বড় মিস্ত্রি, মেজ-মালোম তারা গলুইয়ে ভিড় করেছে। কয়েকজন জাহাজী মজিদকে ওর বিছানাটাসহ উপরে নিয়ে গেল। সাহেবরা সরে পথ করে দিলেন। ডেকের উপর মজিদকে রাখা হল।

উপরে নীল আকাশ। নিচে নীল দরিয়া। সাদা জাহাজটা চুপচাপ থেমে আছে। উসখো-খুসকো চুলগুলি হাওয়ায় কাঁপছে। ছায়া ছায়া হয়ে গেছে কমলা রঙের রোদটা। মাঝি মাল্লার মৃত্যুতে রোদের রং বিষণ্ণ। অস্পষ্ট পৃথিবী ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তখন ছোট-ট্যান্ডেল গেছে স্টোর-রুমে। একটা বড় পাটের থলে লাগবে। মজিদকে ঘিরে ক'জন জাহাজী কপাল চাপড়ে শোক করছে এখন।

অনন্তম শোক করছে না। কাঁদছে না। ডেকের উপর সে সকল থেকে আলাদা হয়ে সমুদ্র আর আকাশকে দেখছে। সমুদ্রের নিচে অনেক মাছ। কিছুক্ষণ পর মজিদের দেহটা ঠুকরে ঠুকরে তারা খাবে।

হরিদাস সেন গলুইর উপর দাঁড়িয়ে আছে। মজিদের মৃত্যু নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবছে। ঘরে তার বৌ আছে। বৌর প্রথম বাচ্চা হবে। বাচ্চা হতে গিয়ে বৌটা হয়ত তার মরবে। হরিদাস সেনের বুকটা ধড়াস করে উঠল।

সাহেবরা জটলা করছে অন্যদিকে। মেজ-মালোমের হাতে বাইবেল। তিনি পাতার

পর পাতা উল্টে যাচ্ছেন। বড় মিস্ত্রি পাইপ টানছে। মাঝে মাঝে বাইবেলের উপর ঝুঁকে তিনি মেজ-মালোমকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

বারিক আর লুৎফল থলের মুখে মজিদকে ঠেলে দিল। তার সংগে ঠেলে দিল কতকগুলো কালো ভারি পাথর। তারপর দড়ি দিয়ে মুখটা শক্ত করে বেঁধে দিল। পাটের থলেটা মজিদের কফিন। পাথরগুলো ওর তৈজস! পাথরগুলো দিয়ে সে সমুদ্রের সিঁড়ি ভাংগবে। সমুদ্রের অতল অন্ধকারে নেমে যাবে ধীরে ধীরে। হাংগর, তিমি, অক্টোপাস একটি অপরিচিত জীবকে দেখে প্রথমে আঁৎকে উঠবে। পরে ওরা চোখ ট্যারা করে বলবে, রাজ্য জয় করতে বের হলে বুঝি!

সব জাহাজীরা সার করে দাঁড়াল। অনুত্তম সকলের শেষে। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না মজিদের কফিনটা। বাংকারে কত মসকরা, কত হাসি-ঠাট্টার গল্প মজিদের সংগে। সে মানুষ আজকে সাদা জাহাজ থেকে নীল সাগরে আশ্রয় নিচ্ছে। কোরান পড়ছে বড় ট্যান্ডেল। আয়াৎগুলো অদ্ভুত রকমের অনুভূতি সৃষ্টি করছে সকলের মনে। ওরা সকলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মজিদের জীবনটাকে অনুত্তম কবিতার মত করে ভাবতে চাইল। মৃত্যু সমুদ্র গানের মত উদার, আক্ষেপ-শূন্য। হৃদয়ের বিশাল সমুদ্রে যেমন ঝড়ের পর প্রশান্তি। শান্তি। আনন্দ। কবিতা। মৃত্যুকে সে কবিতার মত করে ভাবছে। আজ হৃদয়ে তার পরম রমনীয় সুর। সে কাঁদছে না। অনেকগুলো কবিতার সুর বার বার করে মনের দরজায় হোঁচট খাচ্ছে অনুত্তমের।

মেজ-মালোম বাইবেল পড়ে মৃত আত্মার শান্তি কামনা করছেন।

জাহাজীরা সকলে মজিদের কফিনটা কোলের কাছে তুলে ধরল। অসীম সমুদ্র। অনন্ত আকাশ। মুখার্জী সাহেব ব্রীজে। সকলে আকাশমুখো মুখ করে রেখেছে। সৌর জগতের কোন এক কোণ এক টুকরো কান্না আজ। জাহাজের হুইস্‌লটা এবার আকাশ-পাতাল মথিত করে দিক-দিগন্তে সেই বেদনার বার্তাকে বহন করে নিয়ে চলল। এমন সময় মজিদকে সমুদ্রে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হেদৎ মিঞা ডেকের উপর দাঁড়িয়ে দু' হাত উপরে তুলে চীৎকার করে উঠল, ইন্‌সে আল্লা। আল্লা—হু—আকবর।

সকলে একসংগে চীৎকার করছে, আল্লা—হু—আকবর।

অনুত্তম কিছু বলতে পারল না, গীতা থেকে তার কোন শ্লোক মুখস্থ নেই। কোন মন্ত্র সে উচ্চারণ করতে পারল না। শুধু কতকগুলি কবিতা বার বার আয়াৎ-গুলোর সংগে সুর মিলিয়ে আবৃতি করতে ইচ্ছা হল।

মজিদের কফিনটা ধীরে ধীরে সমুদ্রের অতলে ডুবছে। 'যেন হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে—সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে।'

অনুত্তমের প্রাণ খুলে বলতে ইচ্ছা হল, 'অতিদূর সমুদ্রের পর হাল ভেংগে যে নাবিক হারিয়েছে দিশা সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর।' মজিদ সমুদ্রের অঞ্চলে অন্ধকারে কোন এক দারুচিনি দ্বীপের অন্ধকারেই হয়ত আশ্রয় নেবে আজ।

অনুত্তম ধীরে ধীরে বলল, 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ; পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ; পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি

বসিবার নাটোরের বনলতা সেন।'

মজিদ চেয়েছিল ওর শেষ আশ্রয়টুকু যেন ওর বিবির কাছেই মেলে। সব লেনদেন চুকিয়ে আর এক অন্ধকারে সে বিবির মুখোমুখি হতে চেয়েছিল।

সিন্ধু-সারসীদের যখন পাহাড়ে ফেরার সময় হয়েছিল জাহাজীরা তখন শুনেছে জাহাজ রাত দশটায় বন্দর ধরবে। অবশ্য ইতিমধ্যে অনেকেই পশ্চিমের আকাশে এক-খণ্ড দেশকে আবিষ্কার করেছে। সেজন্য ডেক-জাহাজীদের গলুইয়ে ভিড়। ভিড়ের ভিতর মানুষগুলো সব জবু থবু হয়ে বসে আছে।

এনজিন্-সারেং কিন্তু হাসি মস্করায় মস্গুল হতে হতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। জাহাজেরই কোন একজন জাহাজীর কথা ভাবছে। দুটো হাত, দুটো পা —মুখটা ডিমের মত। চোখ টানা টানা। নাক-মুখের কথা ভাবল। বয়সের কথা ভাবল। ওর মুখটা ভিজে ভিজে ঠেকছে। চোখ দুটো, হাত পা সব নরম, মসৃন। কমলার কোয়ার মত টসটসে। মেয়ে-মানুষের মত ঠোঁট দুটোতে উত্তাপ।

অনুত্তমকে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে রসিকতা করেছিল ডেক-সারেং। —আপনার কপাল ত ভাল মিঞা। যাহোক একজন ত তবু জাহাজে এসেছে।

এনজিন-সারেং বিরক্ত বোধ করে ডেক-পাটাতনে নেমে গেল। জাহাজে দশজনের দশটা কান আছে, যদি একটা শুনতে পায়! কেলেংকারী! মুখটা এবারে তিনি দু-হাতে মুছলেন। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর জমে উঠছে। ঘসে ঘসে দুটো হাত গরম করে নিজের গলুইতে এসে উঠলেন। অনেকগুলো নজর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিয়ে কিছু যেন খুঁজছেন। সারেংসাবের বিরক্তি-বোধটা ক্রমশঃ বাড়ছে। কিন্তু এ সময় তিনি দেখতে পেলেন অনুত্তমকে। তিনি খুশী হলেন।

হরিদাস সেন প্রথমে, পিছনে অনুত্তম বের হল। ওদের হাতে টিনের কলাই করা থালা। প্রত্যেকের হাতে কাচের গ্লাস। দু'নম্বর পরীর জাহাজীরা খেতে আসছে। সারেং-সাব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। ওরা এখন টিন থেকে ভাত নেবে—বিলু থেকে গোস্ত নেবে, কফিভাজা নেবে। গ্যালীর ভিতর থেকে সারেং-সাব উঁকি দিলেন মেস-রুমে। তিনি অনুত্তমের সংগে গল্প করতে চাইবেন। খানা-পিনা একেবারে তুলে দিয়েছে অনুত্তম। ভাত সে একেবারেই খায় না, বাটলার থেকে সারেঙের নাম করে দু' একটা ডিম নিয়ে সে অন্ততঃ খেতে পারে এ কথাগুলোও তিনি বলবেন।

অনুত্তম বলবে, বেশ ত আছি চাচা, আর কেন!

সারেং বলবেন, কেন নয়! জাহাজে শরীর রাখতে হবে ত!

—যে শরীর আছে, ওতেই চলে যাবে। অনুত্তম বলবে।

খেতে খেতে হরিদাস সেন কনুইটা টিপে দেবে অনুত্তমের। ডংকী-ম্যান দাড়ির নিচে লজ্জার হাসি হাসবে। আগওলা হাফর আলি, আকবর ভয়ে বিশার্ণ হবে। সারেং-সাব ক'দিন থেকেই বিরক্ত বোধ করছেন। সারেং-সাব এবার জাহাজে তার ফালতু সংগ্রহ করতে পারেন নি। সেজন্য দিন যত যাচ্ছে তত বেশী করে অনুত্তমের পিছন নিচ্ছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত কাকে জানি ধকলটা সহ্য করতে হবে। ভেবে ভেবে ওরা সকলে লজ্জায় বিবর্ণ হল। সব দেখে অনুত্তমের গলা ঠেলে হাসি পেল। সে হাসতে গিয়ে জোর বিষম খেয়ে খক্ খক্ কাসে।

সারেং-সাব অনুত্তমকে সব সময় সংগ দিতে চান। অনুত্তম হাতমুখ ধুয়ে নিচে গিয়ে বসল, তিনিও তার পাশে গিয়ে বসলেন। কথা বলল অনুত্তম সকলের সংগে, তিনি বসে বসে সব শুনলেন। সেই দুঃস্বপ্নের পর থেকেই এমন হয়েছে! তিনি

কিসের যেন জ্বালা অনুভব করছেন। উত্তপ্ত হচ্ছেন দিনের পর দিন।

ফোঁকসাল থেকে জাহাজীরা যখন ফালতু-ঘরে গেল কাপড় ছাড়তে এবং অনুত্তম উঠবে উঠবে করছে সে সময় সারেং-সাব তার হাতটা জোরে চেপে ধরে বললেন, দেখত বেটা জ্বর আইল না কি আমার?

জ্বর আপনার আসে নি ; কোনদিন জ্বর আসবে বলেও মনে হয় না। বলে, কাপড় ছাড়তে ফালতু ঘরে চলে গেল অনুত্তম। সারেং-সাব বিছানাটা আঙ্গুল দিয়ে টিপলেন। টিপে দুটো নরম ঠোঁটের উত্তাপ পেতে চাইলেন। বিছানাতে দিনের পর দিন যে ডিমের মত মুখটা লেপ্টে থাকে, সে মুখের সহজ স্পর্শ পেতে চাইলেন যেন তিনি।

অনুত্তম নিজের বাংকে ফিরে এলে সারেং আরো কিছু বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে না-বুঝি ভাবটা দেখিয়ে উপরের উঠে গেল। এ-পরীতে হালা-হালি হবে না ভেবে নিশ্চিন্তে রেলিং-এর উপর ভর করে দাঁড়াল।

ডারবান সহরে আলোগুলো জ্বলেছে। অনেকগুলো তারা হয়ে আকাশ-দিগন্তে ওরা ঝুলছে। সমস্ত রাত ধরে ঝুলবে। দূরে ইতঃস্ততঃ কিছু কিছু জাহাজের আলো দেখা যাচ্ছে। লাল নীল। ছোট ছোট জাহাজ। ওরা হয়ত তিমি মাছ ধরছে। সারেং এসে এসময় আবার পাশে দাঁড়াল। তিনি গল্প আরম্ভ করলেন—জাহাজগুলো অনেক দূরে হারিয়ে যাবে, আট-দশদিন ধরে একটা তিমি মাছের পিছনে ঘুরবে—হয়ত একটা তিমি মাছ ধরবে ও। তিনি সে গল্প থেকে অন্য সফরের গল্পে এলেন। সে সফরে এ-বন্দরে তার জাহাজ দু' মাস ছিল। জাহাজের দেওয়ানী আর কয়লার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কিঙ্করনাথ এক নিগ্রো মেয়ের সঙ্গে পালিয়ে গেল। বন্দরে পালিয়ে গিয়ে বাঁচাল। আরো বললেন, অনুত্তমও পারবে বলে মনে হয় না।ফালতুতে তেমন কষ্ট নেই। সারেং-এর ফালতু হয়ে থাকবে। ভালভাবে জাহাজে বাঁচবে। যদি অনুত্তম রাজী থাকে ত মেজ-মিস্ত্রিকে তিনি বলে কয়ে দেখতে পারেন।

অনুত্তম উত্তর না দিয়ে আর একটু সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল শুধু। কানের ভিতর সারেং-এর ফালতু শব্দটি খুব বিশ্রীভাবে আঘাত করেছে।

সারেং-সাব অনুত্তমকে বুঝিয়ে বলার মত করে বলেছিলেন—ভেবে দেখুক কথাটা। ফালতুতে থাকা মানেই কোন কাজে না থাকা। সরেং-এর সঙ্গে নামবে এনজিন-রুমে, এবং এক সঙ্গেই উঠবে। কোন হালা-হালি নেই। সমস্ত রাত ঘুম হবে। বন্দর ঘুরতে পাবে অনেক।

তিনি আরো সংলগ্ন হলেন। দরকার হয় আমার থাইকা টাকা নিবি। কিরে রাজী আছস? কমু মেজ-মিস্ত্রিরে।

মুখটা ওর কালো হয়ে উঠেছে। নিঃশব্দে সে বোট-ডেকে উঠে গেল। ইচ্ছে হল সব খুলে হরিদাস সেনকে বলে। কিন্তু হরিদাস সেন হয়ত উত্তরে বলবে—কি দরকার ছিল এই কাঁচা বয়সে জাহাজে আসার! রাগে এবং বিরক্তিতে নিজের হাত পা কামড়াতে ইচ্ছে হল সেজন্য। কিন্তু পরীর সময় হয়ে গেছে ভেবে সিঁড়ি ধরে নিচে নামতে থাকল।

কিছুক্ষণ পর জাহাজ থামিয়ে দেওয়া হবে। পায়লট উঠবে জাহাজে। সিগনেলিং হচ্ছে। একটা মোটর-বোট উড়ে আসছে অন্ধকারে। জাহাজের পাশে এসে বোটটা থামবে। জাহাজীরা দড়ির সিঁড়ি ফেলবে সমুদ্রে। সেই ধরে পায়লট ডেকে উঠবে।

আগওয়ালারা বসে গল্প করছে স্টোক-হোলডে। জাহাজ বেশী গতিতে চলছে

না। কয়লা কম খাচ্ছে বয়লারগুলো। একটু অবসর পেয়েছে বলে প্লেটের উপর সবাই গোল হয়ে বসেছে। ওরা প্রাণ খুলে গল্পের ভিতর হাসল। আকাশী-রঙের আলোর ভিতর মানুষগুলোকে অদ্ভুতভাবে ভালো লাগল দেখতে। অনুত্তমও সেই দেখে ওদের পাশে জম-জমাট হয়ে বসে পড়ল।

বড়-ট্যাণ্ডেল বললে, কিরে এত তাড়াতাড়ি যে নিচে নামলা!

—বড্ড শীত চাচা ডেকে। তাই নেমে এলাম।

—ডারবানে গিয়া বৌমার কাছে খত লিখবা না!

অনুত্তম হাসল।

—কিনারার আলো দ্যাখতে পাই'ছ?

—বন্দর এসে গেছে। আর একটু পর জাহাজ পায়লট ধরবে।

তারপর ট্যাণ্ডেলের কথায় শেষ বারের মত বয়লারে কয়লা হাকড়ালো আগওয়ালারা। ফার্নেস ডোরে র‍্যাগ ঢুকিয়ে দুটো টান মারল। শেষে উইণ্ডস-হোলের নিচে এসে জড় হল ওরা। উপরের দিকে চেয়ে দেখল দু-নম্বর পরীদাররা নামছে কি নামছে না। নামতে থাকলে এরা উপরে উঠতে থাকবে।

দু-নম্বর পরীর আগওয়ালারা নেমে আসছে। ওরা নেমে এবার শাবল ধরবে।

ছাইগুলি হাপিজ করে বাংকারে ঢোকার আগে আবদুল বললে অনুত্তমকে, সারেং-সাবের নজর কিন্তু খুব বেশী ভাল ঠেকছে না ব্যানার্জী।

—ওনার না কি জ্বর-জ্বর ঠেকছে আজকাল! জ্বর-জ্বরটা বের করে দেব।

অনুত্তম বাংকারে ঢুকে গেল। লম্ফটার ভূতুড়ে আলোয় উঁকি দিয়ে দেখল স্ল্যাটের গর্তটার কত নিচে কয়লা নেমেছে। কয়লা যদি কম নামে শাবলের উপর বসে একটু বেশী সময় বাড়ি-ঘরের চিন্তা করবে। একটু বেশী সময় পড়শীর আটপৌরে জীবন নিয়ে বিমুগ্ধ হয়ে থাকবে। কিন্তু কয়লা অনেকখানি নেমেছে দেখে আজ আর শাবেলের উপর বসল না। গাড়ী টেনে, শাবল টেনে হাজার টন কয়লার সামনে দাঁড়াতেই আর একটা ছায়ার অন্ধকার এসে ওর শরীরকে ঢেকে ফেলল।

কে! কে!! চীৎকার দিয়ে উঠল অনুত্তম। ওর কেমন ভয় ধরেছে।

- আমি সারেং-সাব। ফিস ফিস কণ্ঠে মানুষটা বলল।

সারেং-সাব অদ্ভুতভাবে নজর ঘোরালেন বাংকারে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি দেখছেন বাংকারটা। অনুত্তম শাবলে কয়লা টানছে। অনুত্তমকে তিনি দেখার কিংবা আলাপ করার জন্য আসেন নি এ ভাবটা করে তিনি সমস্ত বাংকার ঘুরে বেড়ালেন। যেখানে হাজার টন কয়লা আছে এবং অনুত্তমের শাবল শব্দ করছে সেখানে গেলেন না আপাততঃ।

অনুত্তম গাড়ী টেনে স্ল্যাটের গর্তে উল্টে ফেলে দিয়ে বলল, চাচাকে খুব [illegible] মনে হচ্ছে?

তা হইছে। জাহাজ বন্দর ধরব, কয়লা নিব, ক—ত কাজ! বাংকারে কত কয়লা আছে তার রিপোর্ট দিতে হইবে মাইজলা-সাবকে।

এবার সারেং-সাব অনুত্তমের পাশে এসে দাঁড়ালেন। অনুত্তমের সংগে কথা বলতে সাহস পেয়েছেন। ওর হাত নিজের হাতে টেনে বললেন, আমার ফালতু হইতে তর লজ্জা হয়। সরম লাগে। লজ্জার কি! কোন হালা-হালিতে থাকতে হইব না। সুখের চাকরী। কিনারায় যখন যাইবি টাকা নিবি আমার থাইকা। কি রে নিবি ত?

—কোম্পানীর ঘরে আমারও ত টাকা জমেছে চাচা।

—তা আমি জানি না। টাকা সকলের জমছে। টাকার জন্যই ত এই চাকরী। কিন্তু বাতিজারে দুই চারটা টাকা চাচায় দিব তার জন্য অমত করতে নাই। নিবি। নিবি কিন্তু। বলে, অনুত্তমের হাত দুটো দাড়ির ভিতর ঘষতে চাইলেন।

অনুত্তম মরিয়া হয়ে বলল, চাচা খবরদার। আমি আপনার চেয়ে বেশী যোয়ান।

সারেং খিল খিল করে হেসে উঠল। —তা জানি না, তা জানি না। কিন্তু বাতিজা মনে রাইখ এইটা জাহাজ। এখানটায় অনেক তবিবৎ আছে আবার অনেক পেরেসান আছে। হাতটা ছেড়ে দিলেন সারেং এবং সোহাগ করার মত অনুত্তমকে জড়িয়ে ধরলেন দু'হাতে। আদর করার মতই বললেন, রাগ করস ক্যান! চাচা-বাতিজার সম্পর্ক আমাগ। কোন বেইজ্জতের কথাই উঠতে পারব না।

অনুত্তম বলল, হাত দুটো সরিয়ে নিন।

সারেং-মিঠে-কড়া হাসল। এবার তিনি আরো জোরে চেপে ধরেছেন। অনুত্তম সারেংগের গলা টিপে ধরতে চাইল। স্যাটের গর্তে ফেলে দিয়ে গাড়ী গাড়ী কয়লা ফেলতে ইচ্ছে হল। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। সে শুধু পাগলের মত চীৎকার করে উঠল, সারেং-সাব! তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে এমন জোরে ঠেলে দিল যে সারেং উপুড় হয়ে প্লেটের উপর পড়ে গোঙাতে থাকলেন, আল্লারে আমার হাত ভাঙ্গি গেলরে!

সারেংগের অবস্থা দেখে অনুত্তমের মন শূন্যে ঘুরতে আরম্ভ করছে চড়কী-বাজীর মত। ফাটা বেলুনের মত মন তার চুপসে গেছে। শূন্য ঠেকছে সব। অত্যন্ত বিচলিত বোধ করল সে। সারেং সাব প্লেটের উপর পড়ে গোঙাচ্ছেন এখনও। উঠতে চেষ্টা করছেন—পারছেন না। নিচ থেকে দুজন মানুষের গলার আওয়াজ পেল সে। ওরা সিঁড়ি ধরে যেন উঠে আসছে। ওরা গোঙানী শুনে বাংকারে হয়ত ছুটে আসবে। ধরে ফেলবে ওকে। কাপ্তেনকে নালিশ দেবে, এ আদমী সারেং সাবকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। ভয়ে আড়ষ্ট হল অনুত্তম। এবং দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সিঁড়ি ধরে পাগলের মত ছুটল। বোট-ডেক পার হল। টুইন-ডেকে নেমে দেখল প্রায় সব জাহাজীরাই এখানে জড়ো হয়েছে। বন্দর দেখছে ওরা। ভিড় থেকে একটু দূরে হ্যাচের উপর মেজ-মালোম। তিনি চুপচাপ বসে আছেন। চোখে সেই আগের মত দূরবীন আঁটা।

অনুত্তম হাঁপাতে হাঁপাতে হ্যাচের উপর বসে পড়ল। মেজ-মালোমের পাশে বসে কিছুই হয়নি এমন মুখ করে সেও বন্দর দেখতে থাকল। তারপর চুপি চুপি প্রশ্ন করলে—এনি ওম্যান সেকেণ্ড?

অন্যান্য জাহাজীদের মনেও তেমনি একটি প্রশ্ন। সকলের নজরে এক প্রতীক্ষা। কিন্তু রাত গভীর। দুদিকে আলো অন্ধকারের ভীড়। অনেক জাহাজ বাঁধা একটা অর্দ্ধ-বৃত্তের মত বন্দর রাতের মত ঘুমোচ্ছে।

'এনি ওম্যান সেকেণ্ড' এই প্রশ্নের পর অনুত্তম আর কোন প্রশ্ন করে নি। মেজ-মালোম মাঝে মাঝে তীরের ঝোপগুলি দেখছেন। অনুত্তমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কোন জবাব দেন নি। এই থেকে সে বুঝে নিয়েছে দূরবীনের কাঁচ দুটোয় উত্তর দেবার মত কিছু ঝুলে নেই। কিন্তু ধূসর ডেকটার মত রং চটা ভয়ে মাঝে মাঝে ওর বুকে ধ্বস নামছে। সে আঁৎকে উঠছে। একবার ইচ্ছা হল মেজ-মালোমকে সব

খুলে বলে—সারেঙের কথা, সারেঙের হাত ভাঙার কথা।

ভয়ে অনুত্তম কুঁকড়ে গেল সত্যি। হ্যাচের উপর দুটো হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে থাকল। মেজ-মালোম বলেছিলেন, কি হয়েছে অনুত্তম! মনমরা কেন?

অনুত্তম মিথ্যা কথা বলেছিল, বাড়িঘরের কথা বড্ড বেশী মনে পড়ছে।

মেজ-মালোম দুটো ঝাঁকি দিলেন ওর মাথায়। দূরবীনটা ওর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, বসে বসে দেখ। কিছু নজর করতে পারলে আমাকে ডেকো। জাহাজ এখন বাঁধবে। আফ্‌ট-পার্টে যাচ্ছি।

জাহাজ যখন কয়লার জেটিতে বাঁধা হচ্ছে, ওয়ান-পিন-ড্রামগুলো যখন গড় গড় করছে তখনই দুটো কথা রাষ্ট্র হল। প্রথম কথা জাহাজ ভোর-রাতে সেইল করবে—কোন জাহাজীকে বন্দরে নামতে দেওয়া হবে না, দ্বিতীয় খবর এনজিন-সারেং আছড়ে পড়ে হাত ভেঙেছেন।

জাহাজীরা নামতে পারবে না, কেন নামতে পারবে না? কোন কোন নাবিক এই কথাগুলো বলে চীৎকার করেছে। জাহাজীরা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে এই খবরে। তাদের মন থেকে আশা-আকাঙ্খার জগত ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। গুঞ্জন উঠেছে ফোকসালে ফোকসালে। ওরা বিদ্রোহ করতে চায়।

সারেং একটু রংগরস করতে চেয়েছিল অনুত্তমের সংগে। আছড়ে পড়ে হাত ভেঙেছে না ছাই। অনুত্তমের ইচ্ছা হল জোর গলায় বলে, ওসব ঢং ও সব মিথ্যে! কিন্তু ভোর-রাতে জাহাজ বন্দর থেকে সেইল করবে ভাবতেই মুখটা তেতো হয়ে উঠল। ভোর রাতের ভিতর কয়লা ফেলার যন্ত্রটা ক্রসবাংকারে এবং সমস্ত ডেক কয়লা বোঝাই করে দেবে। কিছু পাটের গাঁট পর্যন্ত নামানো হবে, শুধু জাহাজীরা নামতে পারবে না। হতাশায় ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। একমাসের সমুদ্র-যাত্রাকে মনে হল অনেক যুগের সমুদ্রযাত্রা। মাটির স্পর্শ না পেয়ে মন ক্রমশঃ বিষিয়ে উঠছে। বিরক্ত হল সে। দূরবীনটা হ্যাচের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল। খালি-চোখে বন্দর দেখে আফশোষ তার—এ বন্দরেও নামতে পারল না। কিন্তু দূরে রেল-পুলের নিচে একটা ছায়া দুলছে। বুকে যে ধ্বস নামছিল আবার তা নামছে। দূরবীন চোখের উপর এঁটে লাফ দিয়ে নামল হ্যাচ থেকে; রেলিং-এর উপর এসে ঝুঁকল অনুত্তম। অন্যান্য জাহাজীরাও ছুটে এসেছে। এতক্ষণে ওরা দেখতে পেল—ওটা নেড়ী কুকুরের ছায়া। দূরবীনের কাঁচে সে ছায়া স্পষ্ট। অনুত্তম যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে জাহাজে প্রথম আজ জাহাজী খিস্তী করল।

তারপর অনুত্তম গরম জলে স্নান সেরেছে। সারেংকে দুজন লোক ধরে ধরে নিচে নিয়ে গেছে, সে তাও দেখল। তিনি এখন বাংকে পড়ে গোঙাচ্ছেন। জাহাজ-বাঁধা হয়ে গেছে। যন্ত্রের মুখ থেকে এখন ক্রস-বাংকারে কয়লা পড়ছে। যন্ত্রটা অনেকটা হাওড়ার ব্রীজের মত। ব্রীজে উঠতে একদিন একটি খোঁড়া মেয়ে দুটো পয়সা চেয়েছিল। দুটো পয়সা সে দিয়েছে। আজ হলে সে ডবল দিত। সব দিত।

অনেকগুলো নিগ্রো-সোর-ম্যান জাহাজে ওঠে ক্রস-বাংকের এবং বোট-ডেকে ছড়িয়ে গেছে। ওরা কয়লা সামাল দেবে। কেউ কেউ ভাণ্ডারীকে খুঁজল। ওরা ভাত কিনবে। পকেটে ভাতগুলি রেখে মুড়ির মত খাবে।

অনুত্তম রাত্রির পোষাক পরে মাজেদের সংগে ফোঁকসাল থেকে উপরে উঠল। গলুইতে কয়েকজন নিগ্রো জটলা করছে। ওরা ভাত কিনে খাচ্ছে। ভাণ্ডারী চুপি চুপি ভাত বিক্রি করে তখন পয়সা গুনছে। অনুত্তমকে দেখে সে আমতা আমতা করে

কি সব অস্পষ্ট কথা বলল।

অনুত্তম লক্ষ্য করল না। সে মাজেদকে বললে, কিরে দেখবি দূরবীনে?

—কি দেখব, কি আছে দেখার! এত রাতে বন্দরে মেয়েমানুষ আসতে বসে আছে!

ও-পাশের ডেকে দুজন নিগ্রোকে কেন্দ্র করে কয়েকজন জাহাজী ভাঙগা ভাঙগা ইংরেজীতে ওদের বিবির খবর নিচ্ছে। নিগ্রোগুলো হেসে লুটিয়ে পড়ছে। ওরা বললে, ওদের দুজন করে বিবি। ওয়ান, নো গুড। টু, গুড। অর্থাৎ একজন বিবিকে নিয়ে ঘর করে সুখ নেই। দুজন থাকবে। তিনজন থাকবে। দরকার হয় আরো বেশী থাকবে। দিনের খাটুনি রাতের আনন্দে সামঞ্জস্য খুঁজবে। জাহাজীদের সে সৌভাগ্য নেই। কাজেই বন্দরে এসে শাক দিয়ে ভাত খাওয়ার মত কথাগুলিকে গিলছিল—কিন্তু হজম করতে পারছে না।

মাজেদ এ-পাশ থেকে জোর গলায় বললে, ওরে জাফর নিগ্রোগুলোকে বলে দে একমাস ধরে আমরা বিবির মুখ দেখতে পাচ্ছি না। কোন ব্যবস্থা করতে পারলে বখশিস দেব। অনুত্তমের হাত থেকে এবার দূরবীনটা নিল মাজেদ। - নসিবে থাকলে মিলতেও পারে। দূরবীনটা চোখের উপর তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে বন্দর-পথ দেখল—কিছুই নেই, সব ফাঁকা। দু একজন নিগ্রো পরুষ যন্ত্রটার নিচে কাজ করছে। কয়েকজন ওলন্দাজ কাস্টম অফিসার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে একটা গাড়ীর ভিতর অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। অন্যান্য জাহাজের নাবিকেরা গভীর রাতে ফিরছে। ওরা পর্যন্ত নিঃসংগ।

তবু মাজেদের আশা, অনুত্তমের আশা, যে মেজ-মালোম এসে এখন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁরও আশা; সমস্ত রাত ধরে তারা যদি এই ডেকে দূরবীন নিয়ে প্রতীক্ষা করে বসে থাকে, তবে এক সময় অন্ততঃ দূরবীনের কাঁচে একটা মেয়ে-মানুষের দেহ আটকে যাবেই যাবে। মাজেদ সেই আশায় ক্যাম্বিশের ডেক-চেয়ার বোট-ডেকে টেনে এনেছে। ওরা এখন প্রতীক্ষায় বসবে! মেজ-মালোম এবার ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসবেন। শিকার ধরার মত অনুত্তম পাশে বসে থাকবে। মাজেদ এবং আরো ক'জন জাহাজী বসে রাতকে পাহারা দেবে।

সমস্ত রাত ওরা ডেকের উপর বসে থাকল। ডেকের উপর সমস্ত কাজগুলোকে শেষ হতে দেখল। ক্রস-বাংকারে কয়লা ভরে যন্ত্রটা এখন ডেকের উপর কয়লা ফেলছে। দুজন ডেক এ্যাপ্রেণ্টিসকে নিয়ে তিন-নম্বর-মালোম ফল্কার উপর কাঠের পাটাতন বিছিয়ে দিচ্ছেন। তারপর তিনি ফল্কাটা ত্রিপল দিয়ে ঢাকবেন। ফল্কার কিনারে কিনারে লোহার পাতের উপর কিল ঠাসবেন। স্টারবোর্ড-সাইডের ডেক কয়লায় ভরে গেলে জাহাজের হাসিল খোলা হবে। এই সময় মেজ-মালোম দূরবীনটা হাতে নিয়ে কেবিনে ঢুকবেন। পোর্ট-হোলের কাঁপানো পর্দাটা টেনে দিয়ে বাংকে তিনি এলিয়ে পড়বেন। বালিশে মুখ গুঁজে আর একটা দুঃস্বপ্নের জন্য প্রতীক্ষায় থাকবেন।

ভোর রাতে জাহাজ যখন অন্য বন্দরে পাড়ি জমাবার জন্যে সমুদ্রে পড়েছিল তখন কনকনে ঠাণ্ডা শীত থেকে নিজেদের দেহগুলিকে টেনে জাহাজীরা যার যার ফোঁকসালে এসে ঘুম যাবার জন্য কম্বল মুড়ি দিয়ে কোন এক রুগ্ন উত্তাপে গড়াগড়ি দিতে চেয়েছিল। কোন জাহাজীর ঠ্যাং দুটো কট্ কট্ করছে, কোন জাহাজীর বুক ঢিপ ঢিপ করছে। মনটা বিচিত্র সংলাপ তুলছে। অনুত্তম একবার এপাশ হল, আবার ও-পাশ হল। কিন্তু কোথাও যেন সুখ নেই। আনন্দ নেই। হরিদাস সেন একটা

রবারের পুতুল টেনে বের করছে। ঐ দেখে সে উপুড় হয়ে শুল। শরীরে তার বিশেষ প্রশান্তি নেমে আসছে। সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হয়ে গেছে। সমুদ্রে শীত বেড়েছে মনে হয়। জাহাজীরা গরম পোষাক পরেছে। কুয়াশায় ডেক আচ্ছন্ন ; জাহাজ, দরিয়া, আকাশ সব। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মত কুয়াশার টুকরোগুলো দানা বাঁধছে। ভেজা ডেক। ফ্যানেলের ধোঁয়াটা কম। কুয়াশায় পড়ে তারাও দানা বাঁধছে। আটটা-বারোটার পরীদারদের ডাকতে লুৎফল উপরে উঠে এসেছে। ওর শরীরেও শীত। এখন সে গ্যালীতে। উনুনের উপর হাত দুটো সেঁকতে সেঁকতে ভাণ্ডারীর সঙ্গে বিশুর গোস্ত সম্বন্ধে আলাপ তুলল।

ডেক-জাহাজীদের হাতে হোস-পাইপ, ষ্টিক্-ব্রুম। ওরা ডেকে জল মারছে। সমুদ্রের নোনাপানীতে গলুই, ফল্‌কা সব ধুয়ে দিচ্ছে। সাবান-জল নিয়ে দেয়াল ধুতে গেছে একদল জাহাজী।

মেজ-মালোম উঠেছেন। ঘুম ভেঙেছে আজ সকাল সকাল। চা খেয়েছেন তিনি। স্যাণ্ড-উইচ্ মুখে পুরে আবার পোর্ট-হোলের পর্দাটা খুলে দিয়েছেন। মেস্-রুম-বয় দুটো আপেল রেখে গেছে টিপয়তে। ধীরে ধীরে তিনি সে দুটোও খাবেন। কিন্তু পর্দাটা টেনে দেবার সময়ই মনে হয়েছিল শরীর বড্ড দুর্বল। মাথাটা কেমন ধরেছে। রাতের দুঃস্বপ্ন তাকে অত্যন্ত কাহিল করে ফেলেছে। তিনি বিছানার উপর ফের বসে পড়লেন। দরজার পাশ থেকে রাতের পোষাক টোপাস তুলে নিয়ে গেছে। টোপাসকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছেন।

শীতের মধ্যেও আজ খুব ভোর রাতে স্নান করেছে সারেং। জাহাজীরা নিচে হাসাহাসি করেছিল এ নিয়ে। সেই হাসাহাসির শব্দ শুনেই অনুত্তম ঘুম থেকে উঠেছে। কাজে যাওয়ার জন্য কাপড় পরেছে। সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠার সময়ই শুনল মানুষটার সেই কান্না। দরজা বন্ধ করে কোরানশরিফ পাঠ করছেন তিনি। মেস- রুমের কাছে এসে সেও মাথাটা কেমন ভারি ভারি অনুভব করল। পা দুটোয় শক্তি পাচ্ছে না। সমস্ত রাত জেগে থাকায় শরীর খুব দুর্বল। এনজিন-রুমে ফালতু থাকতে পারলে বেশ হত। মেহনতি কাজ থেকে রেহাই পাওয়া যেত। সারেং-এর কান্না আর থাকত না।.. অযথা হাসল সে গ্যালীর সামনে। বুড়ো ভাণ্ডারী তখন গোস্তের গন্ধ নিচ্ছে হাঁড়ির ঢাকনা ফাঁক করে। চোখ কুঁচকান ভাণ্ডারী। নাক কুঁচকাল। মাংসের গন্ধ এখন ওর নাকের ডগায় ঝুলছে।

বোট-ডেকে উঠতেই মনে হল মজিদকে। চারদিন আগে ওকে সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওর বিবির কবরের পাশে আর একটা চেরাগ জ্বালানোর কথা লিখেছে অনুত্তম। ওর বিবি দেখতে কেমন ছিল ? ওর, ওর মেয়েটা। আরো কিছু ভাবতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। অবাক হল দেখে—দুটো পাখি। বিমুগ্ধ হল সে। দুটো পাখি ফানেলের গুড়িতে। ওরা ফুর ফুর করে উড়ছে। ফানেলের উত্তাপে ওরা প্রচণ্ড শীত থেকে আত্মরক্ষা করছে নিজেদের। পাখি দুটো পাশাপাশি এখন। ওরা স্বামী-স্ত্রী। পাশাপাশি থাকায় বড় ছোট ধরা পড়ছে। ছোট পাখির সিঁথিব লাল দাগ। অনুত্তম বুঝতে পারল যেন কিছুদিন হল ওদের বিয়ে হয়েছে।

সে ঝুঁকে দাঁড়াল পাখি দুটোর সামনে। কিন্তু পুরুষ চড়াইটা সব সময় মেয়ে চড়াইটাকে আড়াল করে রাখতে চায়। অনুত্তমের রাগ হল দেখে। কিন্তু কথায় কোন বিরক্তি প্রকাশ করল না। সে হাঁটু গেড়ে বসল। বলল, হ্যাল্‌লো মিষ্টার হাউ ডু ইউ ডু। নিশ্চয়ই ভাল আছ আশা করছি। সমুদ্রযাত্রা লাগছে কেমন। মন্দ লাগছে

না নিশ্চয়ই। মিসেসকে নিয়ে খুব সুখে আছ। আমাদের ভাগ্যে কিন্তু তা নেই!

অবশ্য মেয়ে চড়াইটাকেই সে খুব বেশী করে দেখছিল। দেখছিল আড়চোখে। ওর কথা শুনে পাখি দুটো যেন আরো বেশী সংলগ্ন হল। কিচমিচ করে দুজনের ভিতর কি কথা হচ্ছে অনন্তম বুঝতে পারল না। বুঝি ভয়ে সংলগ্ন হয়েছে। অনন্তমের রাগ ক্রমশ চড়ছে। অত কি কথা তোমাদের! এবার সে রেগে গিয়ে বলেই ফেলল, মিসেস আমাদের সঙ্গে তোমার জমবে ত! ভালো লাগবে ত! তুমি শুধু মিষ্টারকে নিয়েই পড়ে থেক না। আমাদেরও দেখো। নতুবা খুন খারাবি নিশ্চয়ই একটা কিছু হবে।

পাখি দুটো ভয়ে উড়ে গেল। অনন্তমের হাসি পেল ভীষণ। সে ষ্টেন্‌সান ধরে খুব জোরে হাসছে। —ভয় পেয়েছে!

সমস্ত জাহাজ জুড়ে একটি মাত্র কথা—মিষ্টার! মিসেস! মেয়েমানুষের সঙ্গে বোট-ডেকে অনন্তম কথা বলছে। নাবিকেরা উন্মত্তের মত বোট ডেকের দিকে এগিয়ে আসছে। এল-ওয়েৱ পথে গুড়ি গুড়ি এলেন এন্‌জিনিয়ার এবং অফিসারেরা। ভাণ্ডারী নাকে মাংসের গন্ধ ঝুলিয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোনরকমে বোট-ডেকে উঠে এল। সারেং-এল। ট্যাণ্ডেলরা এল। সব জাহাজীরা জড়ো হল বোট-ডেকে। অবাক হয়ে দেখল-দুটো পাখি। দুটো চড়াই। অনন্তম তাদের সঙ্গে গল্প করছে।

চড়াই দুটোকে পরম বিস্ময় নিয়ে দেখল নাবিকেরা। পাখি দুটো এখন লাইফ-বোটের কার্নিসে গা ঝাড়ছে। মেজ-মালোম সবাইকে ঠেলে সামনে গেলেন। তিনিও পাখি দুটোকে সমুদ্র-জীবনের নিঃসঙ্গ দুনিয়ায় পরম বিস্ময়ে দেখতে থাকলেন। বললেন, ইউ আর মাই গেষ্ট! কটুকরো আপেল তিনি কাগজের উপর রেখে শিস দিয়ে ডাকলেন, কাম্ অন্। গেট্ ইয়োর ফুড্ য়্যাণ্ড মেক ফ্রেণ্ডসিপ্।

## ॥ ৬ ॥

একটি মেয়ে-চড়ুই, একটা পুরুষ-চড়াই। একটি মেয়ে-জগত, একটি পুরুষ-জগত। সুতরাং দুদিনের মধ্যেই জমে উঠল আলাপ। অন্তরঙ্গতা ঘনিয়ে এল সকলের, বাড়লো আন্তরিকতা পাখি দুটোর সঙ্গে। কফিনে ঢাকা মৃতদেহের মত নির্জীব জাহাজ-ডেকে মিসেস্ স্প্যারো পৃথিবীর মেয়ে-জগত হতে দুটো রক্ত ঠোঁটের উজ্জ্বল জীবন নিয়ে এল। মিষ্টারও আসেন। শিস্ দিয়ে স্প্যারো দুটোকে নাচানো হয়। অনন্ত শিস দিতে জানে ভাল। মেয়েচড়ুইটাকে নিয়ে সে সমস্তটা বিকেল পড়ে থাকে।

জাহাজ তখন কেপ-অফ-গুডের পাশাপাশি।

পরবর্তী সকালে জাহাজীরা দেখবে সূর্য উঠছে আটলাণ্টিক মহাসাগরে! আকাশ পর্যন্ত কাঁপছে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে। জাহাজটা তখন কাঁপবে। ফোঁকসালে ঢুকে কিচ মিচ কান্না তুলবে পাখি দুটো।

শীতের বিকেল। বালিচরের মত সমুদ্র নীরব। তিতির পাখির কান্নার মত জাহাজীরা আবার অন্য বন্দরের জন্য কাঁদছে। কান্নাটা অনন্তমেরও। বিকেলে গেছে সে ডেকে। বর্ষার ফড়িং ধরার মত মেয়েচড়ুইটার পিছনে লেগেছে। পাখী দুটোকে সমস্ত ডেক জুড়ে উড়িয়ে বেড়াল। শিস দিল। খাবার দিল। পুরুষ-চড়াইটা

অনন্তমকে এখনও ভয় পায়। তাই পুরুষ-চড়াইটা উড়ে গেলে মেয়ে চড়ুইটাও পিছন পিছন ওড়ে। অনন্তম আকাশমুখো হয়ে থাকে তখন। বাতাসে পাখি দুটোর দোল খাওয়া দেখে। পড়শীকে মনে হয় তখন। পড়শীর ঠোঁট দুটো মেয়ে চড়ুইটার মত যেন লাল। লজ্জা পেলে আরক্তিম হয়। অনেকদিন ঠোঁট দুটোকে রক্তাক্ত করতে চেয়েছে। পারে নি। পারবে না। লজ্জায় নয়, সংকোচে নয়, ভয়ে। পাখিদুটো এখনও ডেকের উপর উড়ছে—উড়ুক, এই পর্যন্ত ভেবে অনন্তম আকাশমুখো হতে ডেক-মুখো হল।

পোর্ট-হোলে ক্যাপ্টেনের মুখ। তিনি অপলক দেখছেন। তিনিও ভাবছেন, পাখি দুটো উড়ছে—উড়ুক। নীরস ডেকে জীবনকে খুঁজে পাক।

মেজমালোমের এখন ওয়াচ। ব্রীজে তিনি দাঁড়িয়ে দেখছেন। নজর ওর ডেকের উপর। অনন্তম পাখিদের পেছনে লেগেছে। ওর চোখের উপর চড়ুই দুটো। ওরা উড়ছে—পাখি দুটো উড়ুক।

সন্ধ্যার-সময় মেজ-মালোম বোট-ডেকে বসে মিসেস্ স্প্যারোকে ডেকেছেন। ওরা বোট-ডেকের উপর দিয়ে উড়ে গেল। মেজ-মালোম বললেন, এস, বস। তামাসা দেখাও। তোমরা আমাদের বন্ধু। জাহাজে যখন দৈবাৎ এসে গেছে তখন দু' দণ্ডের আলাপ ত করতেই হবে।

মিসেস স্প্যারো স্কাইলাইটের উপর বসে এবারও গা ঝাড়ল। মেজ-মালোম খুব সন্তর্পণে হেঁটে হেঁটে গেলেন। পাখিটা উড়ে গেল। মাথার উপর পাক দিয়ে পাখি দুটো উড়ছে।

অনন্তম বোট-ডেক ধরে উঠে গেল। সে বিষণ্ণ। চুপচাপ ফানেলের গুড়িতে ষ্টোক-হোলডে নামার জন্য বসল। মেজ-মালোম মেস-রুম-বয়ের কেবিনের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। পাখি দুটো রেলিং-এর উপর চুপচাপ বসে আছে। মেজ-মালোম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাখি দুটোকে দেখছেন। অনন্তম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের মনটাকে দেখল। জাফর আলি বলেছে—সারেংগের ষড়যন্ত্রের কথা। সারেং মেজ-মিস্ত্রির সংগে ক'দিন ধরে কি সব সলা পরামর্শ আঁটছে। জাফর আলি এল্-ওয়ের পাশ থেকে শুনে ফেলেছিল—সাব অনন্তম ব্যাড—নো গুড সাব, নো গুড জব্। মি অর্ডার, হি সায়লেণ্ট। হি হোপলেস্ সাব। মেজ-মিস্ত্রিকে নালিশ দিচ্ছিল।

কাল থেকে অনন্তমের পরী বদল হবে। পাখি দুটোকে উড়িয়ে যখন সে ক্লান্ত এবং একটু দম নেওয়ার জন্য যখন সে ফক্সার উপর বসেছিল, সারেং এসে এই সময় বলেছে—তোমার পরী বদল হইলরে অনন্তম। তুমি কাইল থাইকা মাইজলা-মিস্ত্রির ওয়াচে কয়লা ফেলবা।

ওয়াচ বদল হল। পরী বদল হয়েছে। বাংলা পাঁচের মত যে মানুষের মুখটা সে হয়ত এবার থেকে রোজ বাংকারে এসে দু ঠ্যাং ফাঁক করে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে থাকবে। হয়ত লাথি এবার মুখে না মেরে পেটে মারবে। হাত দুটো খুব শক্ত শক্ত মনে হল। ষ্টেন্সান ধরে হাতের শক্তি পরীক্ষা করল অনন্তম। তারপর আস্তে আস্তে সে সিঁড়ি ধরে পাখি দুটোর উজ্জ্বল জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে নিচে নেমে গেল। শিস দিল। একটা কবিতা আবৃত্তি করল।

ভোরের বেলা সমুদ্র তার রং পাল্টাল। ঢং বদলাল। সমুদ্র গভীর নীল। ঢেউ-গুলোর ভিতর কালো কালো অন্ধকার যেন। আকাশ চিরে মেঘের টুকরোগুলি ক্রমশঃ নেমে আসছে। উড়ুক্কু মাছগুলো বর্শা-ফলকের মত ছুটছে দিগন্তের দিকে।

জাহাজ ওঠা নামা করছে ভয়ানক। হিবিংলাইন বাঁধা আছে ডেকের উপর। প্রকান্ড ঢেউগুলো আছড়ে পড়ল। ঢেউয়ের ধাক্কায় গাড়ীটা উল্টে গেল একবার। আবার পড়ল। অনুত্তম এবার গাড়ীর হাতল দুটো শক্ত করে ধরেছে। এবার পড়লে অনেক কষ্টে সে সত্যি কেঁদে ফেলবে। সারেং-সাবের ষড়যন্ত্র। সারেং এবং মেজ-মিস্ত্রির নির্দেশ, ঝড়ের ভিতরও ডেকের কয়লা যেন টানা হয়। ঝড়, টাইফুনে মেজ-মিস্ত্রি ডেকের উপর কয়লাওলাদের চরম দুঃখটা দেখতে চান। ছাপোষা কোলু-বয়দের এত ঘাড় বাঁকা হবে কেন!

মেজ-মিস্ত্রি ভয়ানক চটে গেছেন।

সমুদ্রের জলে ভিজে ভিজে অনুত্তম প্রচন্ড শীতে থর্ থর্ করে কাঁপছিল।

ও-পাশের ডেকে কাজ করছে জব্বর। সে খিস্তি করছে মেজ-মিস্ত্রিকে। বার বার ডেকের উপর তার কয়লার গাড়ী উল্টে পড়ে যাচ্ছে। আছাড় খাচ্ছে সে। অনুত্তমকে উদ্দেশ্য করে বলল, আরে ব্যানার্জী আমলদার যদি মেইন্দামুইখ্যা হয় তবে জাহাজের দুঃখ আর রাখনের জায়গা নাই।

অনুত্তম নীরব ছিল। ভয়ে সে কিছু বলছে না।

জব্বর নিজেই যেন জবাব দিল, ডেকের উপর কয়লা নিতে এই পয়লা দেখলামরে-ব। পানীতে জামা কাপড় ভিজা কি হইছে একবার মাইজলা-সাব হুমুন্দির পো আইসা চোখ মেইলা দেখুক!

কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার সংগে সমুদ্রের জল খুব বেগে নেমে আসছে। ওদের মুখ ভিজছে নোনা জলের ঝাপটায়। চোখ নাক মুখ জ্বলছে!

অনুত্তম পাতলুনের নোনা-জলগুলি কেঁচে ফেলল। সারেং-সাব ত্যারচা চোখ মেরে হিবিং লাইনে ঝুলে ডেক পার হলেন। —কিরে-ব কাজ করতে কষ্ট লাগে বুঝি! জব্বর মিঞাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা যেন বললেন তিনি। ঝড়ের জন্য গংগা-বাজুতে জাহাজটা এত বেশী ঝুঁকেছিল যে আর একটু হলে অনুত্তম এবং সারেং দুজনই সমুদ্রে ছিটকে পড়ত। সারেং-সাব বুদ্ধি করে ডেকের উপর শুয়ে পড়েছেন। অনুত্তম দৈবের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে গাড়ীর হাতল ধরে ঝুলেছিল।

জব্বর মিঞা এখন ঠক্ ঠক্ করে শীতে কাঁপছে। ডেকের উপর হাঁটু-তক নোনাপানী জমেছে। গংগাবাজু যমুনাবাজুতে জাহাজ ওঠা নামা করছে বলে কিছুটা জল নেমে গেছে এখন। নোনাপানীর ভিতর দিয়েই ওরা গাড়ী দুটোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শীতে হাত দুটো ঠান্ডা—অবশ। গাড়ীর হাতল শক্ত করে ধরতে না পারায় গাড়ী ওরা ঠিক টানতে পারছে না। কয়লা শাবলে ঠিক তুলতে পারছে না। ওরা কেবল জলের ভিতর উল্টে পড়ছে। জব্বর মিঞা ফোলা পেটে হাত বুলিয়ে শুধু বলল, আল্লারে। একটা অসুখ দেনারে আল্লা! জ্বর, সর্দি, কাশি যা হয় কিছু একটা! মজিদের মত প্যাট ফুলি মরি না ক্যানরে! তুই কি নাইরে আল্লা! হুমুন্দির পো মাইজলা মিস্তিরির ঘাড়টা চাবাইয়া খাইতে পারস না তুই।

অনেক কষ্টে এ কথাগুলি বলল জব্বর। বয়লারের প্রচন্ড গরম ভোগ করে ডেকের উপর কনকনে শীতটায় সে ভেঙ্গে পড়েছে। এখানে ঝড় বেশী। দেওয়ানী বেশী। ঝড়ো হাওয়ায় সমুদ্রের জলে ওরা ভিজছে। চোখ মুখ জ্বালা করে বলে হাতরে হাতরে শাবলটা বের করতে হয়। শ্বাস টানতে কষ্ট হয় বলে হিবিংলাইনে ঝুলে ওরা উপুড় হয়ে থাকে।

ডেক-ভান্ডারীর গ্যালীতে জড়ো হয়েছে সব জাহাজীরা। ঝড়ের ভিতর অনুত্তম,

জব্বরকে কয়লা টানতে দেখে আফশোষ করছে তারা। মেজ-মিস্ত্রি কি মানুষ না! দুটো মানুষকে এমনভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে! ঝড়-জলে মানুষগুলো তো মরবে! সারেং-সাবের কি চোখ নাই গ! বাংকারে কয়লা থাকতে এ ঝড়ে ডেকের কয়লা ওদের ফেলতে হচ্ছে। কয়লায়ালাদের সুখ-দুঃখ না বুঝলে তোরা আমলদাররা কি করতে আছিস।

মাজেদ বলল, তোমরা তো জাননা মিঞা! এটা সারেং-সাবেরই সলা-পরামর্শ। ওরা দু-জন মিলে অনুত্তমকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করছে। সবাই যদি এর বিরুদ্ধে না দাঁড়াও তবে ব্যনাজী নির্ঘাত মারা যাবে জাহাজে।

জাফর বললে, এনজিন খালাসীদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

আর একটা পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ এল জাহাজে। সমুদ্রের ঝড় ক্রমশঃ যেন বাড়ছে। ডেকের উপর দিয়ে ঢেউটা চলে যাওয়ার সময় সে এবং গাড়ীটা দুই-ই গড়িয়ে পড়ল নিচে। সে এখন উঠতে চেষ্টা করছে জলের নিচ থেকে। কোনরকমে উঠে দাঁড়াল জলের উপর। প্রচন্ড শীতে সে আর দাঁড়াতে পারছে না। ভিজে জামাটা খুলতে চাইল শরীর থেকে। গ্যালী থেকে জাহাজীরা চীৎকার করল, খুলিশ না অনুত্তম। তবে ঠান্ডা লেগে নির্ঘাত মরে যাবি! ঝড়ো হাওয়ার জন্য কথাগুলি অস্পষ্ট। সে আরো সামনে এগিয়ে গেল। কথাগুলো শুনল এবং কয়লার স্তূপকে দেখল। সে দাঁড়াতে পারছে না। টলছে। ডেক জাহাজীদের কথাগুলোয় কান্না পেতে চাইল।

সমুদ্র কাঁদছে। মিসেস স্প্যারোও যেন কাঁদছে। সে কান্নাটা সে শুনতে পেল। ঝড়ো হাওয়া ওকে বোট-ডেক থেকে তাড়িয়ে বুঝি সাগর অতলে ডুবিয়ে মারছে!

সে গাড়ী শাবল ফেলে বোট ডেকে ছুটল। পাখি দুটো ওর মতই অসহায় জাহাজে।

অনুত্তম বোট-ডেকে এসে শিস দিল। বললে, তোমরা গেলে কৈ গো? তারপর তন্ন তন্ন করে খুঁজল। বোট-ডেকের কোথাও পাখি দুটো চুপ করে বসে নেই। ঝড়ো হাওয়াটা প্রতিধ্বনি করে হাসছে। দূরের ঢেউগুলো অনেকগুলো সাপের মত কিল-বিল করে উঠল। অনুত্তম এবার জোর গলায় ডাকল, মিসেস মিষ্টার তোমরা উত্তর দাও। কোথায় আছ বল? আমি এখানে রয়েছি। তোমরা আমার কাছে এস। আমার ঘরে চল। শিস দিয়ে দিয়ে সে সামনের ডেকে নামল। কেউ কোন উত্তর দিল না। কিচ মিচ করে বললে না, আমরা এখানটায় আছি।

ব্যানাজী গেট ব্যাক টু ইয়ুর জব। একটি দৃঢ় কণ্ঠের জবাব। অনুত্তম ভয়ে পিছনে তাকাতে পারছে না। বাংলা পাঁচের মত মুখটা প্রতীক্ষা করছে।

চারটা-আটটার পরীদারদের শেষ ঘণ্টি পড়ল। ওদের ওয়াচ শেষ।

অনুত্তম বলল, আই হ্যাভ ফিনিসড মাই জব স্যার।

—ষ্টিল ইউ হ্যাভ্......আই থিংক! কাম এলং। ওরা দুজন এগিয়ে গেল। বোট-ডেকে উঠল। সিঁড়ি ধরে ষ্টোক-হোলডে নামল। মেজ-মিস্ত্রি বয়লারের নিচে টর্চ মেরে বললেন, ট্যাংক টপ হাম ক্লীন মাংতা। ঘাড়টা কাত করে বললেন, ইউ উইল ডু ইট্। এভরী-ডে এ্যান্ড ইন এভরী-ওয়াচ।

—হাও লং আই স্যাল হ্যাভ টু ওয়ার্ক হিয়ার?

—সাট আপ ইউ হেল্। আই এ্যাম ইওর বস্, রিমেম্বার!

অনুত্তম আর কোন কথা বলল না। সে একটা বালতি ও খুড়পী নিয়ে বয়লার-গুলোর নিচে নেমে গেল। ডেকের বিক্ষুব্ধ ঝড়, বয়লারের প্রচন্ড গরমে ওর মুখ

ভয়ানক লাল হয়ে উঠেছে। মুখটা মনে হল ঝলসে যাবে। সে বয়লারের নিচ থেকে উঠে কশপের কাছ থেকে একটা পাটের থলে চেয়ে নিল। থলেটা মাথায় মুখে প্যাচ দিয়ে নিচে নেমে গেল আবার। খুরপী দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে ছাই তোলার সময় সে বুঝতে পারল দুঘণ্টা করে প্রতি পরীতে বেশী করে খাটলে চার থেকে পাঁচ মাস লাগবে ছাইগুলো নিচ থেকে তুলে উপরে হাফিজ করতে। খরপী দিয়ে ছাই তুলে যখন বালতি ভরছিল তখন দেখল জামা আর পাতলুন থেকে জলটা বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে।

মেজ-মিস্ত্রি দু ঘণ্টার পর এক সময় নিচে নেমে এসেছেন। বয়লারের নিচে টর্চ মেরে দেখেছেন—অনুত্তম কি করছে! ওকে তখন ও কাজ করতে দেখে তিনি খুশী হয়েছেন। বলে পাঠিয়েছেন তেলয়ালাকে দিয়ে, ওকে এবার যেতে বল।

প্রচণ্ড উত্তাপে অনুত্তম তখন ভীষণভাবে ঘামছিল। তাকে যেতে বলা হয়েছে —সে খুশী হল। এর্নজিন-রুম ধরে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠার সময় আবার মনে হল পাখিদুটোর কথা। ওরা কোথায়—কি করছে! কিন্তু সমুদ্রের মত এক বিশাল ক্লান্তিতে সে অবসন্ন। মেজ-মালোম এখন ঘুমোচ্ছেন। ওর কেবিনে একবার খোঁজ করতে হবে। এর্নজিন রুমের বালকেড ধরে ধরে সে এল। বোট-ডেকে মেজমালমের কেবিন। সিঁড়ি দিয়ে বোট-ডেকে উঠতে হবে।

একটি শব্দ প্রথম। দুটো শব্দ হল। এবার একসঙ্গে অনেকগুলো শব্দ। কিচ-মিচ আওয়াজ। অনুত্তম থমকে দাঁড়াল। সঙ্গীতের মত শব্দগুলোকে সে কান পেতে শুনছে। সিঁড়ির নিচে এক-যষ্ট-পাইপ। তার পাশে দুটো পাখি পাশাপাশি। এক-যষ্ট-পাইপ থেকে উত্তাপ নিচ্ছে তারা। ঝড় জল থেকে আড়াল নিয়েছে। অনুত্তমকে দেখে এখন কিচ মিচ করে উঠল।

অনুত্তম ওদের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। পাখি দুটো উড়ল না। সে ধমক দিল —হয়েছে বাবা, অনেক হয়েছে। এবার থামত বাপু। খুব ত ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে।

পাখি দুটো কিচ মিচ করে ঠোঁট মেলাল।

অনুত্তম বললে ফের, বেশ আছ তোমরা! শেষে সে অনেকক্ষণ পাখি দুটোকে দেখল। চেয়ে থাকল ওদের দুটো ঠোঁটের দিকে। বসে বসে অনেক ক'বার বিশ্লেষণ করল জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে পাখি দুটোর সমৃদ্ধির কাছে তাদের জাহাজী-জীবন খুব বেশী হার মেনেছে।

এদিকে ওদিকে চেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াল পাখি দুটো।

মিসেস স্প্যারোর ঘর নেই। কথাটা ভাবল অনুত্তম ফোঁকসালে ঢুকে।

দিন দুই পরে খবর পেল অনুত্তম, মিসেস স্প্যারো শীতে কাঁপছে। মেজ-মালোম অনেক সাধাসাধি করেছেন ওর ঘরে যাওয়ার জন্য। কিন্তু মিসেস স্প্যারো অসম্মতি জানিয়েছে। মেজ-মালোমকে দেখে বেটের উপর থেকে উড়ে গিয়ে স্কাই-লাইটে বসেছে। মিষ্টার-ত বেচারা! মিসেসকে ফেলে সে যেতে পারছে না। সুতরাং একটা ঘর চাই।

ঘর ওদের করতে হবে। অনুত্তম এই ভেবে ডেকে উঠে গেল। আকাশ পরিষ্কার। সমুদ্রের ঢেউ নেই। শান্ত। প্রপেলারটা গঙ্গার মোহনার মত শব্দ করছে এখন। শীতের বিকেল। জাহাজটা ইকোয়েডরের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে। শীতের দিনগুলি বড় হয়ে আসছে ক্রমশঃ। আরো বড় হবে।

সেই শীতের বিকেলে অনন্তম দেখল বোট-ডেকে জাহাজের সব অফিসাররা গোল হয়ে বসেছে। মেজ-মালোম ব্রীজে ছিলেন—তিনিও এসে ওদের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। সাহেবরা খানা-পিনা করছেন। মিসেস স্প্যারো ওদের মাথার উপর উড়ছে। তারা মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিচ্ছেন পাখিটাকে। ক্যাপ্টেন হাসির কথা বলছেন। ওরা অনেক হাসি-ঠাট্টা করল। মেজ-মিস্ত্রি সব চেয়ে বেশী মিসেসকে নিয়ে বেয়াদপি করছে। বেয়াদপ! অনন্তম লাইফ-বোটের আড়ালে বসে সব শুনছিল। বিরক্ত হয়ে সে নেমে গেল। কশপকে ডেকে বলল, চাচা একটা কাঠের বাক্স দিতে পারেন?

—কি হবে বাক্স দিয়ে?

—মেয়ে-চড়ুইটার জন্য ঘর করব! শীতে ওদের খুব কষ্ট। রাতে ভাল ঘুম হয় না। তার উপর সাহেবদের যন্ত্রণা ত আছেই।

মনে মনে অনন্তমও একটি ষড়যন্ত্র করে ফেলল। পাখি দুটোর সংগে মেজ-মিস্ত্রির আলাপ মোটেও ওর পছন্দ নয়। মেজ-মিস্ত্রির সব কথাগুলো ওর বেয়াদপি বোধ হয়েছে। ভাবল মেজ-মালোমকে মেজ-মিস্ত্রি সম্বন্ধে নালিশ দেবে। প্রত্যেকের একটা মান-সম্ভ্রম আছে। মেজ-মালোম নিশ্চয়ই মেজ-মিস্ত্রিকে শাসিয়ে দেবেন।

মিসেস স্প্যারোর জন্য ঘর করবে—মেয়ে চড়ুইটা পুরুষ চড়াইটার সঙ্গে থাকবে, সুখে থাকবে সচ্ছন্দে থাকবে। বোট-ডেক থেকে গলুইতে নিয়ে যাবে পাখি দুটোকে। তখন টের পাবে মেজ-মিস্ত্রি কত ঘণ্টায় দিন হয়, কত ধানে কত চাল হয়। কত দুঃখে কত বিদ্রোহ হয়। মেজ-মিস্ত্রি আস্তে আস্তে সব টের পাবে। দাঁতে দাঁত চাপল অনন্তম। ষড়যন্ত্রটা খুব পাকা পোক্ত—টের পাবে না—কাজ হাসিল হবে। বোট-ডেকে বসে পাখি দুটোর সংগে হাসি-মসকরায় আর মসগুল হতে হবে না। মেজ-মিস্ত্রি এবার নীরস ডেকে আকাশের নক্ষত্রগুলোর কড়িকাঠ গুনবেন। মনে মনে খুব হেসে নিল অনন্তম।

অনন্তম কশপের কাছ থেকে একটি ছোট কাঠের বাক্স সংগ্রহ করল। কিছু খড়কুটো, বাটালী, হাতুড়ী পেরেক নিয়ে গলুইর এক কোণায় বসে ঠুক্ ঠুক্ করে ছাই অন্ধকারে ঘরটি তৈরী করে আনন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াল কিছুক্ষণ। হরিদাস সেনকে ডেকে বললে, দাদা আসুন, দেখে যান।

সকলকে সে ঘরটা দেখাল। ডেকে জাহাজীদের দেখাল। ভাণ্ডারীকে দেখাল। এনজিন-খালাসীদের ফোঁকসালে ঢুকে বলল, চাচা দেখেন ত মেয়ে চড়ুইটার ঘরটা কেমন হল? এখানটায় ওরা শোবে, এখানটায় ওরা বসবে। এটা দরজা—এই পথ দিয়ে বের হয়ে আকাশে উড়বে। বোট-ডেকে যেতে ওদের বারণ করব। মেজ-মিস্ত্রির ট্যারা-চোখ মেয়ে চড়ুইটার পছন্দ নয়।

জাহাজীরা খুসী হল। খুসী হল এই ভেবে মেয়ে চড়ুইটা ওদের গলুইতে চলে আসছে। বোট-ডেকে আর ফুর ফুর করে উড়ছে না। গলুইতে উড়বে। ওরা তখন গল্প করবে খোস-মেজাজে। ছোটে-ট্যাণ্ডেল সোনালী দাঁত দুটো বের করে হাসল। কলম্বোতে বিবির খত আসে নি; ডারবানে সে খতের জবাব দেয় নি, আমেরিকার বন্দরে খতের জবাব নিশ্চয়ই আসবে। তখন জবাব দেবে দুটো লাইনে—আমাদের জাহাজে একটা মেয়ে চড়ুই এসেছে। ওকে নিয়েই আমরা সকলে পড়ে থাকি। কিন্তু বিবি তোর চিঠি না পেলে মনটা কেমন করে।

অনন্তম ভাবল সারেংকে ডেকে বলা যাক—দেখুন চাচা আমার হাতে কি! আপনি

আমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে পারেন কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই। মেয়ে-চড়ুইটার জন্য ঘর করতে পেরে আজ আমার খুব আনন্দ। আপনার সঙ্গে আজ আবার কথা বলব।

সে চুপচাপ দাঁড়াল সারেঙের দরজাটার পাশে। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ আজও। তিনি সুর ধরে কোরাণসরিফ পাঠ করছেন রোজকার মত। আয়াতের শব্দ-গুলো কান্নার শোকচিহ্ন হয়ে গলে পড়ল বাইরে। অনুত্তম হাত রাখল দরজার উপর —আস্তে আস্তে। ডাকল—চাচা, ও চাচা।

—কে! ভিতর থেকে আওয়াজ এল।

—আমি চাচা, আমি অনুত্তম। দরজা খুলে দেখুন কি এনেছি।

সারেং ছুটে এসে দরজা খুলে দিলেন। অনুত্তমকে দরজার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, আয়, ভিতরে আয়।

অনুত্তম ভিতরে সংক্ষিপ্ত পা ফেলে বলল, হাতে এটা কি বলুন ত?

—কাঠের বাক্স।

—না, ঠিক হল না। চড়ুইটার ঘর। এবার থেকে চড়ুই দুটো এ ঘরে থাকবে। শীতে ওদের খুব কষ্ট।......একটু থেমে বলল অনুত্তম, ভাল হয়েছে না ঘরটা? এ ঘর পেয়ে ওরা খুশী হবে ত!

সারেং-সাব মাথা তুলে বললেন, খুশী হবে

গ্যালীর কাছে এসে ভাবল অনুত্তম মেজ-মালোম ভাল লোক। পাখি দুটোর শীতের দুঃখ তিনি বুঝবেন। গলুইতে পাখি দুটোকে নিয়ে এলে তিনি রাগ করবেন না। দু দণ্ডের আলাপ যদি করতে হয় মেজ-মালোম গলুইতে এসে করবেন। গলুইয়ে এবার থেকে মজলিস বসবে, সে মজলিসে বসবে, সে মজলিসে নিশ্চয়ই ভিড়বেন তিনি।

অনুত্তম খুব সন্তর্পণে টুইন-ডেক ধরে হেঁটে গেল। সে প্রথমবারের মত আসল দু নম্বর ফল্কার পাশে এবং উঁকি দিল গোড়ালি তুলে। স্পষ্ট দেখতে পেল য়্যাকজষ্ট পাইপের উত্তরে 'পাখিদুটো চুপচাপ বসে রয়েছে। বোট-ডেকে উঠবার সিঁড়িটার নিচে এসে সে দ্বিতীয়বারের মত থামল। চুপি দিয়ে দেখল এলওয়ের পথে মেজ-মিস্ত্রি আবার দেখে ফেলছে কি না। কিন্তু এলওয়ে খালি। মেস-রুম মেট ডাইনিং হলের দিকে যাচ্ছে। খুব আস্তে আস্তে পাখি দুটোর পাশে কাঠের বাক্সটা নামিয়ে রাখল অনুত্তম। কিছু বিস্কুটের গুড়ো ভিতরে ছড়িয়ে আর একটু দূরে যেয়ে সে বসল। শিস দিল জোরে জোরে। বললে, তোমাদের জন্য ঘর করেছি।...ঘাড় বাঁকিয়ে আমাকে এত কি দেখছ—ঘরটা দেখ! এত কষ্ট করে করলাম অথচ ঘর দেখে খুশী হলে না! কিচ কিচ করলে না একবার! ভিতরে খাবার দেওয়া আছে—খিদে পেলে খাবে। যদি না খাও তবে আমরা সবাই রাগ করব।

অনুত্তম এসে এবার রেলিং-এর উপর ভর করে দাঁড়াল। সামনের অন্ধকারটা নিকষ কালো। এখানে রাতের অন্ধকার সমুদ্রের অতল স্পর্শ করেছে। সে চোখ বুজল। প্রাণী জগতের সবগুলো চেনা অচেনা মুখ এসে ওর চোখের উপর এক এক করে ভিড় করতে আরম্ভ করেছে। এখান থেকে মিসিসিপি অনেক দূর। আর অনেক অন্ধকার এই পথটার উপর শুয়ে আছে। সমুদ্রের এই যে অন্ধকার, এই যে নীরবতা, সমুদ্র-গান। জাহাজ আর জাহাজীরা, পাখিদুটো মিলে এক বিরাট অখণ্ডতা। এক বিরাট বিস্ময়। প্রাণী জগতের সব চেনা অচেনা মুখ এবং হৃদয়গুলোকে, পাখি

দুটোর ভালবাসার হৃদয় দিয়ে সে অনুভব করতে চাইল। পড়শীর মুখ জানালার কছে—আকাশ থেকে শেষ রাতের নক্ষত্রটা জানালার আরো কাছে গিয়ে থেমেছে ওরা দুজন হয়তো জানালায় আরো সংলগ্ন—আরো মুখোমুখি। পড়শী হয়তো শুধু শেষ রাতের নক্ষত্রটাকে দেখছে এখন।

পকেট থেকে চিঠিটা বের করে অন্যান্য রাতের মত আজ শেষবার তারিখ মিলিয়ে নিল অনুত্তম। আজ সেই দিন। আজ সেই রাত। যে দুঃখ ভুলে থাকার জন্য সে এতদিন পাখি দুটোকে ডেকের উপর উড়িয়ে বেড়িয়েছে আজ সেই দুঃখের রাত। পড়শীর ঘরে শানাই বাজছে। ডারবানে পাওয়া চিঠিতে মার নরম হৃদয়ের শেষ দুটো লাইন—অনু, মিতুর বিয়ে হবে। তুমি দুঃখ পেয়ো না।

জাহাজী-মানুষের আবার দুঃখ! সে সমুদ্রের বিশাল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হেসেছিল। এ সময়ে ওর চোখ দুটোয় জল নেমেছে। চোখের অস্পষ্ট অন্ধকারে ক্রমশঃ মিতুর মুখটা মেয়ে-চড়ুইটার মত হতে থাকে। সে চোখের জল মুছে ফেলল। এবার দেখল মিতু চড়ুই হয়ে গেছে এবং শেষরাতে যে নক্ষত্রটা উঠবে তার চারিদিকে ফুর ফুর করে উড়ছে।

॥ ৭ ॥

নীল ঢেউয়ের মাথায় সোনালী রোদের চুমকী। সমুদ্রে জল-তরঙ্গ আওয়াজ। আঁকাশের কোন এক প্রত্যন্তে শুধু একটুকরো ভেড়ার লোমের মত সাদা মেঘ। কোন এক সকালে বৃষ্টি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে না। সমুদ্রের উত্তাপ বাড়ছে। জাহাজের উত্তাপে উত্তপ্ত হচ্ছে জাহাজীরা।

মাজেদ বললে, তোমরা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও।

জাফর আলি বলল, আজ অনুত্তমের উপর দিয়ে যাচ্ছে, কাল আমার ঘাড়ে চাপবে।

মকবুল হোসেন বলল, আমলদারদের গলা টিপে মার। ওদের চোখ নেই · ওরা দেখতে পায় না। সারেং কোন্ বুদ্ধিতে অনুত্তমের বিরুদ্ধে নালিশ দিতে গেল!

অনুত্তমের ফোঁকসালে আজ অনেকগুলো জাহাজী এক সঙ্গে বসে একটা ফায়সলা করতে চাইছে। চালু জাহাজে মেজ-মিস্ত্রির এই বেয়াদবিকে ওরা অগ্রাহ্য করতে চায়। সমুদ্রের উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে জাহাজের উত্তাপ বাড়ছে। ইকোয়েটরের উপর জাহাজ। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে কোনো প্রবাল দ্বীপকে দেখতে গেলে পায়ে এখন ছেঁকা লাগে। ফোঁকসালে ফোঁকসালে প্রচণ্ড গরম। কিন্তু অনুত্তমকে আরো নিচে নামতে হয়। বয়লারগুলোর তলায় বসে বস্তার উপর বস্তা শরীরে চাপিয়ে কাজ করার সময় সেঁকারুটির উত্তাপে সে মৃত্যুর মত-কঠিন হয়; দাঁতে দাঁত চাপে সে। মেজ-মিস্ত্রি তাকে খুন করতে চায়। বয়লারের নিচ থেকে উঠে আসার সময় তাকে পাগলের মত লাগে। চোখ দুটি খুনী রক্তে লাল। মরবে মরবে ভাব। পাগলের মতই সে সিঁড়ি ভেঙে উপরে ছুটবে। এনজিন-রুমের দরজা পার হলেই ফল্কা। ফল্কার উপর চিত হয়ে অনুত্তম হাত পা ছুঁড়ে বলবে, মাজেদ আমি টানতে পারছি না। হাওয়া নেই। তোরা আমায় ধর।

—তবু তোদের দয়া হয় না।...মাজেদ উত্তেজিতভাবে ফোঁকসালে পায়চারী করছে। —তবু তোরা মাস্টার দিতে ভয় পাস্। তোরা মানুষ না। জাহাজী বলে তোরা সব কুকুর পাঁঠা!

হরিদাস যেন চুপ করে বসে আছে। সে জানে জাহাজীরা সবই কুকুর পাঁঠা। জাহাজী মানুষগুলো বিদ্রোহ করতে জানে না। অনেকগুলো জাহাজ-জীবনের গল্প সে শুনেছে। কিছু কিছু সে নিজেও দেখেছে। বিদ্রোহের শেষে অধিকাংশ জাহাজীরা ভাল সেজে কাপ্তেনকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়—স্যার আমরা তা কিছু করতে চাই নি—ঐ লোকটাই আমাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে।...তারপর সে লোকটির যা হবার তাই হয়। জাহাজের মা-বাপ ক্যাপ্টেন। তিনি বিচার করে ওকে লক্ করতে পারেন। কিনারায় তাকে নির্বাসনও দিতে পারেন। বন্দরের কোর্টে বিচার হয়ে ওর ফাঁসির ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। সব কিছুই সেই মা-বাপের ইচ্ছা। হরিদাস সেন তাই কথাগুলো না-শুনি, না-শুনি করে একটা সিগারেট টানছে।

সিগারেটের ধুয়োটা ফোঁকসালে পাক খেল। জাহাজী মানুষগুলোর নিঃশ্বাসকে স্তব্ধ করে দিয়ে সিগারেটের ধুয়োটা উপরে উঠল। ধাক্কা খেল ছাদে। নিচে তারা আবার গড়িয়ে গেল। বিড়ির ধুয়োগুলো মিশে গেল তার সঙ্গে। ফোঁকসালে আবার একটা ছায়া ছায়া অন্ধকার। জাহাজী মানুষগুলোর মুখ অস্পষ্ট। অনুত্তম নিজের শরীরটা বাংক থেকে টেনে তুলতে পারছে না। অত্যন্ত গরমে হাত-পা'র রক্তপ্রবাহ থেমে যেতে চাইছে। ঝির ঝির করছে সমস্ত শরীর। হাড়ের ভিতর মজ্জাগুলো হয়তো গলে গেছে বিশীর্ণ উত্তাপে। শরীরটা দিন দিন শীর্ণ হয়ে উঠছে।

সব জাহাজীরা মিলে ফোঁকসালে যখন মসগুল হচ্ছিল অনুত্তম তখন ডেকে উঠেছে চুপি চুপি। গ্যালী পার হয়ে ফল্কা পার হয়েছে। গোড়ালি তুলে দূর থেকে খুঁজছে পাখি দুটোকে। আজ পর্যন্ত পাখি দুটো ওর তৈরী করা ঘরটায় আশ্রয় নিল না। কাঠের বাক্সটার ভিতর যে বিস্কুটের গুঁড়ো কিংবা মাংসের কুচি দেওয়া থাকে সেগুলো দিনের পর দিন নষ্ট হচ্ছে। মাত্র একদিন দেখেছে পাখি দুটোকে কাঠের বাক্সটার উপর বসতে। সে তখন কত রকমে শিস দিয়েছে। এখন ত আবার গরমই পড়ে গেল! মেয়ে-চড়াইটা আবার ফুর ফুর করে উড়ছে।

সমুদ্রের উত্তাপে এবং জাহাজের উত্তাপে সে উত্তপ্ত। তার উপর পাখি দুটো দিনের পর দিন বেইমানী করছে। তবু প্রতিদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর কত-রকমের শিস দিয়ে বুঝিয়েছে—এ ঘর তোমার—তোমাদের। পুরুষ চড়ুইটাও থাকবে। কোন ভয় নেই। সব বিপদ আমরা আগলাব। আমরা দেখব। কিন্তু মেয়ে-চড়ুইটা এমনি বেইমান—শুধু ঢেউ খেলিয়ে অনুত্তমের মাথার উপর উড়ল। আজও উড়ছে। কিছুতেই কাঠের বাক্সটার ভিতর গিয়ে বসবে না, খাবারগুলো খাবে না।

চোখ দুটো বড় করে মেয়ে-চড়াইটাকে শাসাল অনুত্তম, দেব আজ ঘরটাকে ভেঙে! কি বাপু দরকার আমার তুমি জাহাজে থাকলে আর গেলে! মেজ-মিস্ত্রির পয়সা বেশী ত কাজেই যত বেঢঙের আলাপ সব তোমার ওর সঙ্গে। গলা টিপে মেরে দেব। চিনতে পারবে তখন যেমন ভালবাসি তেমন বিদ্রোহ করি!

আস্তে আস্তে মেয়ে-চড়ুইটা নিচে নেমে আসছে।

খুব কাছে আসলে চড়ুইটা, অনুত্তম মিষ্টি শিস দিল। পড়শীর বাড়ীর কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় যে শিসে ওকে সজাগ করত সেই শিস। শিসগুলো অদ্ভুত ভাবে আজ মোলায়েম হল। খুব মিষ্টি মিষ্টি শোনাল। মেয়ে-চড়ুইটা তখন উড়ে এসে

দুটো পাক খেয়ে ওর মাথার উপর বসে পড়ল। সমুদ্রের নীল-ঢেউ, এক-ঘেয়ে, জীবন, রাত্রির নিরুত্তাপ আলাপ মনে হল সুন্দর, মনে হল মজলিসি আলাপ। সে আহ্লাদে চীৎকার করে ডাকল, দাদা, ও দাদা ; ও মাজেদ তোরা সবাই আয়—দেখ দেখ কি হল!

মেজ-মিস্ত্রি এলওয়ে থেকে চুপি দিল সেই সময়।

সব কিছুর সংকীর্ণতা ভুলে অনুত্তম অদ্ভুত আনন্দে বলে উঠল, স্যার মিসেস্ স্পেরো লাভস মি।

কিন্তু মনে হল মেজ-মিস্ত্রির চোখে যেমন রুক্ষ দৃষ্টি। সে এবার ঢোক গিলতে থাকল, বলতে থাকল, লাভস্ সি! নো নো, নট লাভস মি, বাট লাইক্স মি। তারপর সে অপরাধীর মত চোখ দুটো নামিয়ে নিল মেজ-মিস্ত্রির মুখ থেকে।

মেজ-মিস্ত্রি তখনও চোখ দুটো কুঁচকে রাখলেন। কপালে অনেকগুলো রেখা ফুটে উঠছে। ঠোঁটে ঠোঁট চাপলেন তিনি। একটা পা রাখলেন এলওয়ে থেকে বের হয়ে আসবার দরজার চৌকাটে। চড়ুইটাকে দেখছেন তিনি। মেয়ে-চড়ুইয়ের মাথার লাল দাগটা কলকাতা বন্দরের কোন কোন মেয়ের সিঁথির রেখার মত। মেয়েদের সেই কপালের রক্ত-টিপ আর সিঁথির রক্ত-রেখা ওঁকে বিচলিত করেছে কতবার। বন্দর পথে হাঁটতে হাঁটতে কতবার তিনি অন্যমনস্ক হয়েছেন। বলতে চেয়েছেন তিনি কিছু। কিন্তু বলতে পারেন নি। চড়ুইটার সিঁথিতে রক্তরেখা দেখে তিনি কলকাতা বন্দর-পথকে কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ ভুলে থাকতে পারেন।

কিন্তু অনুত্তম......

মেজ-মিস্ত্রি কেবিনে ফিরে গেলেন। অনুত্তম ঠায় দাঁড়িয়েছিল—মেজ-মিস্ত্রিকে ফিরে যেতে দেখে ধীরে ধীরে ফল্কার পাশ থেকে কাঠের বাক্সটা নিয়ে গলুইয়ের দিকে পা বাড়াল। মেয়ে-চড়ুইটা এবং পুরুষ-চড়ুইটা আজ উড়ে উড়ে ওর সঙ্গে গলুইতে প্রথম এসেছে। সে কাঠের বাক্সটা গ্যালীর দক্ষিণে গঙ্গাবাজার উইনচ-মেশিনের আড়ালে রেখে বলেছে, তোমাদের ঘর এখানে রাখলাম। বসতে হয় বসো—না হয় কাল নির্ঘাত তোমাদের ঘর ভেঙে দেব। সমুদ্রে ডুবিয়ে দেব সব।

অনুত্তম ফোঁকসালে নেমে দেখল কেউ নেই। একমাত্র হরিদাস সেন বাংকে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বালিশের ভিতর মুখটা ডুবে গেছে — ল অনুত্তম বাংকের রেলিঙে হাত রেখে ডাকল, দাদা, ও দাদা মেয়ে-চড়ুইটা আজ আমার মাথার উপর এসে বসেছে। ভয় ডর কিছু নেই ওর।

হরিদাস সেন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। শেষে পাশ ফিরে শুয়ে বলল, মেয়ে-জাতটার ভয় ডর কম। তোর বৌদি কি লিখেছে জানিস? লিখেছে আবার যদি সফরে বের হই, তবে নির্ঘাত সে আত্মহত্যা করবে। করুক, আত্মহত্যা করুক! আমি সেজন্য জাহাজে না এসে পারি!...আত্মগতভাবে বললে হরিদাস সেন—পুরুষ জাতের ওপর মেয়ে-জাতটার দাবীর আর অন্ত নেই।

ফোঁকসালে ফোঁকসালে তখন ফিস ফিস কণ্ঠের আওয়াজ। ফিস ফিস কণ্ঠের আলাপ। হরিদাস সেন নিজের ফোঁকসালে বসে কিছুই বুঝতে পারছে না। তবু আলাপগুলো যে ভাল আলাপ নয় বে তাঁর জীবনের যে বে-হিসেবি আলাপ হরিদাস সেন এই বাংকে বসেও তা বুঝতে পারল। সে এসেছিল ফোঁকসালে একটি সিগারেটের প্যাকেট নিতে—বয়লারের ভার দিয়ে এসেছে ছোট ট্যাণ্ডেলের উপর। সে একটি সিগারেট পাবার বিনিময়ে বয়লার আগলাচ্ছে। অনুত্তমের বাংকটা খালি। ওর কতক-

গুলি জামা-কাপড় বাংকের উপর এলোমেলো ভাবে পড়ে আছে। ওর দু'ঘণ্টা করে ওয়াচ্। মেজ-মিস্ত্রি ওকে দিনে ছ'ঘণ্টা, রাতে ছ'ঘণ্টা করে খাটাচ্ছেন, বাঁ দিকের ফোঁকসালটায় ওর পরীদাররা স্নান-খাওয়া সেরে পরবর্তী বন্দরের গল্প আরম্ভ করেছিল, এখন তারাও ফিস ফিস করে কিছু বলছে। অনুত্তম বয়লারের নিচে খুড়পী দিয়ে হয়তো এখনও ছাই খুঁড়ছে। মেজ-মিস্ত্রির এই অত্যাচার দেখে হরিদাস পর্যন্ত ভেঙে পড়ছে।

এক নম্বর পরীদাদের ফোঁকসালে তখনও চুপি চুপি কথার শেষ নেই। হরিদাস সেন ভাবল কোনো গোপনীয় কথা হচ্ছে। পা টিপে টিপে সে বালকেডের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ফিস ফিস কণ্ঠের সেই আলাপগুলোকে অনেক তরিবৎ করে শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে না। শুধু দুটো অতি পরিচিত শব্দ কানে এসে ঠোক্কর খাচ্ছে। ব্যানার্জী, অনুত্তম—একটা খুন-খারাপীর আলাপ যেন। বিস্ময়ে হৃৎপিণ্ডটা হরিদাস সেনের ধড়ফড় করে উঠল। কিসের খুন-খারাপী! কেন এই খুন খারাপী!

হরিদাস সেন তর তর করে সিঁড়ি ধরে প্রথম সিঁড়ি ভাঙল। পাশের ঘরটাতে বড়-ট্যাণ্ডেল থাকে, একজন তেলওয়ালা থাকে। ওদের মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া নেমেছে। হরিদাস অনেকগুলো বে-খাপ্পা চিন্তায় নিজে- কাঁপছিল। এখন ওদের উৎকণ্ঠিত মুখগুলি দেখে নিজেকে আর সংযত করতে পারল না। চীৎকার করে উঠল, কি হয়েছে জাহাজে! আপনারা সবাই এমন চুপচাপ কেন!

বড়-ট্যাণ্ডেলের ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। তেলওয়ালা ইমরান চোখ দুটো নিচে নামিয়ে বললে, লাই-লোহ্-ই-ল্লেলা!

কেউ কিছু বলছে না! সব চুপ! এমন কি ব্যাপার চলেছে জাহাজে! এমন সময় ডেকের উপর চীৎকার শুনতে পেল সে। মজিদ চীৎকার করছে—জাহাজীরা পাঁঠা! পাঁঠা! পাঁঠা! কই সারেং হারামজাদা কই! ও শালোর গলা টিপে ধরব এখন। শালোকে খুন করব। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সে বলছে—তোরা কে আছিস আয়।

হরিদাস সেন নিচ থেকেই বুঝতে পারল, ডেকের উপর ওরা ছুটছে। ছুটে ছুটে ওরা ডেক-গ্যালী অতিক্রম করছে। এবার সিঁড়ি ধরে নিচে নামবে। হরিদাস সিঁড়ির গোড়ায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। সমুদ্রে দেওয়ানী আছে বলে জাহাজটা বড্ড ওঠা নামা করছে। সে সিঁড়ির রেলিঙে ভর করে দাঁড়াল। সকলে সিঁড়ি ধরে নিচে নামছে। সারেঙের দরজা বন্ধ।

হরিদাস সেনকে নিচে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মাজেদ প্রথমে অবাক হল। জাহাজে এমন ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে গেছে অথচ সে এখানে! মাজেদ মুখের উপর ঝুঁকে প্রশ্ন করল, তুমি এখানে মিঞা।

হরিদাস সেনের মাথাটা সামনে আরো ঝুঁকে পড়ল,—কি হয়েছে মাজেদ! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

মাজেদ হরিদাস সেনের গলা জড়িয়ে ধরল। হাউ হাউ করে কাঁদল। বলল, মেজ-মিস্ত্রি অনুত্তমকে মেরে ফেলেছে।

অন্যান্য জাহাজীরা পাশে দাঁড়িয়ে হরিদাস সেনের মুখের দিকে চেয়ে প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু ওর মুখটা দেখতে পুতুলের মত মনে হল। কাচের পুতুল। মুখের ভিতর স্পষ্ট—রক্ত নেই মনে হচ্ছে। মাজেদ কান্না ভুলে গেছে এতক্ষণে। সে একটা

হুঙ্কার ছাড়ল। সে এখন সারেঙের দরজার উপর হুমড়ী খেয়ে পড়েছে। দরজাটা ভাঙবে। দরজাটা সবাই ঠেলছে। সবাই মিলে সারেঙকে এখন খুন করবে।

হরিদাস সেন ডাকল, মাজেদ।

মাজেদ দরজা থেকে উঠে এল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাহাজীরাও উঠে এল। ভিতর থেকে সারেঙের কোনো আওয়াজ পাচ্ছে না।

হরিদাস বলল, ফোঁকসালে কেউ নেই। সারেং ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ব্রীজে গেছেন।

সব জাহাজীরা মিলে ব্রীজের দিকে ছুটছিল। হরিদাস আবার ডাকল, মাজেদ!...মাজেদ ঘুরে দাঁড়ালে বলল, অনুত্তম কোথায়? কি করে এমন সব হল!

—অনুত্তম এনজিন-রুমে। মেজ-মিস্ত্রি ধাক্কা মেরে প্লেটের উপর ওকে ফেলে দিয়েছে। মাথাটা ফেটে গেছে। নাকে মুখে রক্ত। জাফর আলি দেখে এল সে চিত হয়ে পড়ে আছে। বড়-মালোম, বড়-মিস্ত্রি, বাড়ীওয়ালা সব ওখানে।

হরিদাস সেন আর কোনো কথা না বলে ওদের সকলকে ডিঙিয়ে ছুটল এনজিন-রুমে। ওর পিছনে অন্যান্য জাহাজীরা ছুটছে। ডেক থেকে প্রত্যেকে বড় বড় কয়লার চাং হাতে করে নিল। ওরা মেজ-মিস্ত্রিকে ঢিল মেরে খুন করবে। এই দেখে আমলদাররা যে যার মত ফোঁকসালে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে আছে। মেস-রুম-বয়, ক্যাপ্টেন-বয়, বাটলার দরজা বন্ধ করে পোর্ট হোলের কাচটা খুলে রেখেছে। উন্মত্ত জাহাজী-মিছিলটাকে ওরা দেখে আল্লার নাম স্মরণ করছে।

মকবুলের হাতে একটা হাতুড়ি ছিল। সে হাওয়ার উপর হাতুড়িটা ঘুরিয়ে বলল, মুখের উপর ঢিল মারবা মিঞারা। মাইজলা সাবেরে ঢিল দিয়া ভূত বানাইবা।

সরীসৃপের মত আদিম হিংস্রতা ওদের চোখে মুখে। হাতের কাছে যে যা পেল কুড়িয়ে নিল। ওরা হৈ হৈ করতে করতে এনজিন-রুমের দরজার সামনে এসে দাড়াল। বাঙ্গালী পাঁচ-নম্বর-সাব দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। যারা আগে এসে দরজায় ভিড় করেছে তাদের তিনি আগলে রেখেছেন। এনজিন-রুমে কাউকে নামতে দিচ্ছেন না। হরিদাস দরজার কাছে এস দৃঢ় গলায় বলল। নামতে দিন সকলকে।

পাঁচ-নম্বর-সাব দরজার হাতল দুটো আরো জোরে চেপে ধরল। দরজার উপর উপুড় হয়ে বলল, ক্যাপ্টেনের বারণ আছে। তোমরা সবাই অপেক্ষা কর। এক্ষুনি অনুত্তমকে এনজিন-রুম থেকে তুলে আনা হচ্ছে।

জাফর আলি দরজার উপর ধাক্কা দিল। ওর দেখাদেখি অন্যান্য জাহাজীরা দরজার উপর হুমড়ী খেয়ে পড়ল। ওরা দরজায় ধাক্কা মারছে আর বলছে, মাইজলা-সাবের খুন চাই। খুন দিয়ে অনুত্তমের গোসল চাই।

ওদের শব্দগুলো—ক্র্যাক-ওয়েভের আবর্তে পড়ে বীভৎসভাবে পাক খাচ্ছে! বড়-মালোম শুনে শিউরে উঠলেন। বুড়ো কাপ্তানের চোখে চোখে রাইফেলটা ভেসে উঠল। তিনি সিঁড়ি ধরে ব্রীজে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মেজ-মালোম বাঁধা দিলেন- এখন উঠতে হবে না। জাহাজীরা ডেকের উপর বিদ্রোহ করেছে।

মেজ-মিস্ত্রি এভাপরেটারের পাশে দাঁড়িয়ে বেতস-পাতার মত কাঁপছেন। খুন-খারাপটা একমাত্র তার জন্যই অপেক্ষা করছে যেন।

মেজ-মালোম ধীরে ধীরে অনুত্তমের মাথাটা চ্যাটে চ্যাটে রক্ত থেকে একটা নরম বালিশের উপর তুলে রাখলেন। দুটো ইন্‌জেকসান দেওয়া হয়েছে—আরো একটা দেবেন কি না ভাবছেন। এমন সময় আবার ওদের চীৎকার তিনি শুনতে পেলেন—

মাইজলা সাবের খুন চাই।...তিনি চীৎকারের অর্থ ধরতে পারেন নি তবু বুঝতে পেরেছেন জাহাজীদের মাথায় খুন চেপে গেছে। বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মেজ-মালোম চোখ তুলে কাপ্তানকে দেখলেন। তিনি অসংযত। অনেক বিচ্ছিন্ন অন্ধকার তার চোখে। এই সময় বিরাট শব্দ করে এনজিন-রুমের দরজাটা ত্রিশ ফুট নিচে গড়িয়ে পড়ল। আর সেই জাহাজী ভিড়টা পাগলের মত সিঁড়ি ধরে গড়িয়ে নামছে। এর সামনে দাঁড়ানো কার সাধ্য—মেজ-মালোম ভাবলেন। তিনি নিজেও হকচকিয়ে গিয়েছেন। মেজ-মিস্ত্রিকে টানেল-পথটার মুখে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া যায় কিন্তু তখন হয়তো ক্যাপ্টেনের গলা টিপে ধরবে। অনেকগুলোর খুনের আশঙ্কা করে মেজ-মালোম তাড়াতাড়ি অনুত্তমের দেহটা বাঁধে ফেলে নিলেন এবং অপ্রশস্ত সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালেন।

জাহাজী ভিড়টা নামতে নামতে দেখল মেজ-মালোমকে। চোখ দুটো মেজ-মালোমের ভারি ভারি। তিনি বেদনাহত। তিনি বিষণ্ণ। অনুত্তমের নীল জামাটা রক্তে ভিজে গেছে। নীল জামা থেকে মেজ-মালোমের সাদা জামায় রক্তের ছোপ লাগছে। নিচের ঠোঁট তিনি দাঁতে চেপে রেখেছেন। এতগুলো জাহাজীর ভিড় দেখে কান্নাটা তাঁরও বুঝি পাচ্ছিল। জাহাজীরা দেখল ব্যাণ্ডেজ করা মাথাটা তিনি অত্যন্ত সযত্নে ধরে রেখেছেন। এই সব দেখে সিঁড়ির রড ধরে ওরা থমকে দাঁড়াল।

সিঁড়ি ধরে মাত্র একটি লোক উপরে উঠতে পারে। মেজ-মালোম সিঁড়ির মুখ আগলে দাঁড়ালেন। বললেন বিষণ্ণ সুরে, লেট্ মি গো।...কিন্তু রড ধরে যে জাহাজীরা ভিড় করে ছিল তাদের চোখে একটি মাত্র প্রশ্ন ঝুলছে—সেকেণ্ড, অনুত্তম ডেড? মেজ-মালোম তাদের চোখ দেখে বুঝতে পেরেছেন যেন। তিনি বললেন, হি ইজ্ নট্ ডেড্। হি সুড্ লিভ য়্যাণ্ড এলাইভ। প্লিজ ইয়ু অল্ লেট্ মি হ্যাভ্ সাম ওয়াটার।

তারপর ওরা এক এক করে যখন সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকল তখন তিনি সিঁড়ি ভাঙতে আরম্ভ করলেন—বললেন, হি ইজ সেন্সলেস।

জাহাজীরা ডেক ধরে আবার ছুটছে। মুহূর্তের ভিতর বিদ্রোহের কথাগুলো ওরা ভুলে গেল। কয়লার চাংগুলো ওরা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মকবুল আনন্দের আতিশয্যে হাতের হাতুড়িটা পর্যন্ত সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ওরা হৈ হল্লা করে গ্যালীর উনুনে টবের পর পর টব জল গরম করতে লাগল।

মেজ-মালোমের অনেক দুঃখ—তবু তিনি হাসলেন। বোট-ডেক থেকে তিনি দেখলেন টবের পর টব গরমজল এনে ওরা বোট-ডেকের উপর তুলছে। এতগুলো গরম জল দেখে তিনি আত্মগতভাবে অনুত্তমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখেচ তোমাদের দেশের লোকগুলি কেমন বোকা বোকা!

কেবিনের ভিতর ঢুকে তিনি অনুত্তমের মুখের উপর ঝুঁকে থাকলন কিছুক্ষণ। কিন্তু কোনা সাড়া পাচ্ছেন না বলে তিনি কেমন মুষড়ে পড়েছেন যেন। ওর শরীরের রক্ত গরমজলে তিনি পরিষ্কার করেছেন আনমনাভাবে। কেবিনে হাওয়া খেলার জন্য পর্দাটা সরিয়ে দিলেন তিনি। আকাশ দেখলেন। নীল আকাশ। কোনো গ্লানি নেই—কোন মালিন্য নেই। অনেক নক্ষত্র দেখলেন—তারপর একটি ধীর সংক্ষিপ্ত দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, লর্ড ইয়ু হেল্প্ আস। লেট হিম্ ব্যাক্ টু হিজ সেন্স্।

অনুত্তমকে নিজের কেবিনে রেখেছেন মেজ-মালোম। একটা টেবিলফ্যান আছে

—অনবরত ঘুরছে ফ্যানটা। মেস-রুম-বয় দেখাশুনা করছে। মেজ-মালোম অন্য বাংকটায় বসে কতকগুলি দরকারী ঔষধপত্রের বই দেখছেন। আরো দশদিন বন্দর ধরতে। তবু তিনি আশা করেছেন রাতের ভিতরই ওর জ্ঞান ফিরবে। জাহাজীরা এসে একসময় ভিড় করেছিল—তিনি সকলকে ভিড় করতে নিষেধ করেছেন। মেসরুম-বয় রয়েছে, তিনি আছেন রাত জাগার জন্য যদি কারো দরকার হয় তবে তিনি নিশ্চয়ই ডাকবেন।

ঘড়িতে সময় গুনছেন মেজ-মালোম। রাত্রির অন্ধকারগুলোকে ভাগ ভাগ করে পল দণ্ডের হিসেব টানছেন। সামনের একটা চেয়ারে বসে তিনি অনুত্তমের শ্বাস--প্রশ্বাসের ওঠা-নামা দেখছেন। বার্মিংহামের কোনো এক রাত্রির কথা মনে হল। ছোট একটি ঘরের কথা ভাবলেন তিনি। বার্মিংহামের কোন এক মৃত্যুর প্রত্যক্ষ চিন্তায় অনুত্তমের মুখ দেখলেন। বিবর্ণ মুখে প্রতিচ্ছবি দেখলেন অন্য কোনো এক প্রিয়জনের। সমুদ্রের বুকে সবুজ দ্বীপের মত মুখ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠল। দু-হাতে মুখ ঢেকে বলে উঠলেন--গড্ সেভ হিম। হি ইজ মাই লস্ট ব্রাদার। প্লিজ লেট হিম ব্যাক্ টু হিজ সেন্স .মেজ-মালোম পুনরাবৃত্তি করলেন কথাটার। তারপর মুখ থেকে দু হাত নামালেন তিনি এবং ধীরে ধীরে চোখ তুলতেই দেখলেন অনুত্তম ফ্যাল ফ্যাল করে কেবিনটার চারিদিকে চেয়ে দেখছে। অনেক বিস্ময় তার চোখে। তার মুখের রেখাগুলো দেখে তিনি বুঝতে পারলেন ভিতরে সে খুব যন্ত্রণা পাচ্ছে।

অনুত্তমের জ্ঞান ফিরতে দেখে মেজ-মালোমের এত আনন্দ হল যে একবার ইচ্ছা হল তিনি সকলকে বলে বেড়ান অনুত্তমের জ্ঞান ফিরেছে, তোমরা সকলে এসে ওকে দেখে যাও। জাহাজের গলুই থেকে আগিল পর্যন্ত একবার ছুটে ছুটে বেড়াতে ইচ্ছা হল। ইচ্ছা হল - অনুত্তমকে কোলে তুলে তিনি আকাশের সব নক্ষত্রদের দেখেন। কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। ধীরে ধীরে অনুত্তমের ডান হাতটি নিজের ডান হাতে তুলে বললেন, ইউ ফিল বেটার আই থিংক।.. ফিস ফিস করে আবার বললেন, হোয়াট্ এ লাভলি নাইট!. তিনি পোর্ট-হোলের পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে বললেন, ইটস এ মুন-লিট-নাইট।. .এবার তিনি দরজার ভিতর থেকে উঁকি দিয়ে ডাকলেন, ক্যাপ্টেন গেট ডাউন প্লিজ। হি হ্যাজ রিটারনড্ টু হিজ সেন্স্।

ক্যাপ্টেন উপর থেকে নেমে আসলেন। অনুত্তমের পাশে একটা চেয়ার টেনে তিনি বসে বললেন, হি ইজ্ কোয়াইট ও কে নাউ।

মেজ-মালোম বললেন, হি সুড হ্যাভ এ লং রেস্ট।

ক্যাপ্টেন বের হয়ে যাবার সময় বললেন হি উইল গেট।

খবর পেয়ে অন্যান্য জাহাজীরা এল দরজার উপর। মেজ-মালোম দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সকলকে অনুরোধ করলেন - এক এক করে দেখে যাওয়ার জন্য। আর কোনো চিন্তা নেই। সে শীগগিরই ভাল হয়ে উঠব। ভিতরে যেন ভিড় না হয়। ওকে যেন কেউ কোনো কথা না বলে, কেঁদে না দেয়। কিন্তু মাজেদ এবং হরিদাস সেনকে দেখে অনুত্তমে কিছুতেই চোখের জল ধরে রাখতে পারল না। সে কেঁদে দিল, বলল, দাদা আমি কি আর বাঁচব না? দেশে আর ফিরতে পারব না। মা যে কাঁদবেন। মাকে না বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। অনুত্তম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

মাজেদ কাঁদল। হরিদাস সেনের ঠোঁট দুটো থর থর করে কেঁপে উঠল। মাজেদ কাঁদল হরিদাসের গলা জড়িয়ে। মেজ-মালোম ধমক দিতে গেলেন—ওরা যেন এ ভাবে রুগীর সামনে না কাঁদে। কিন্তু ধমক দেওয়ার আগে ওঁর গলাটাও কেঁপে

উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি নিজের দুর্বলতাটুকু ঢাকার জন্য পোর্ট-হোলের ভিতর মুখ ঢুকিয়ে দিলেন—জ্যোৎস্না রাত। অষ্টমীর ভাংগা চাঁদ। নীল সমুদ্র। দূরে এক অখণ্ড রহস্যের ছায়া। কিন্তু সেখানেও তিনি অনুত্তমের অসহায় মুখটিকে শুধু দেখতে পাচ্ছেন—অনুত্তম কাঁদছে। ওর মা কাঁদছে। মার চোখে কোন এক সুদূর দরিয়ায় জাহাজ ডুবীর স্বপ্ন হয়তো। সে স্বপ্ন থেকে তিনি এখন জেগেছেন। সারারাত ধরে ছটফট করছেন। ঘরবার হচ্ছেন। তিনিও হয়তো আকাশের নক্ষত্র দেখার সময় অনুত্তমের দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার কথা ভাবছেন। সমুদ্রে নিঃসংগ জীবনের কথা মনে করছেন।

হরিদাস চোখের জল মুছে বলল, দেশে ফিরবি না কেন? ভাল হয়ে নিশ্চয়ই ফিরবি।

মাজেদ প্রশ্ন করল, মেজ-সাব তোকে মেরেছে কেন? ..সে একটা ফয়সালা করতে চায়। ধাক্কা দিয়ে মেজ মিস্ত্রিকে সে দরিয়ার পানীতে অন্ধকার রাতে গোপনে ঠেলে দেবে সে এ-কথাটাও ভাবল। যদি অনুত্তম ভাল হয়ে না ওঠে, মেজ-মিস্ত্রিকেও আর দেশে ফিরতে হবে না। একরাতে মেজ-মিস্ত্রি যখন ওয়াচ শেষ করে ডেকের অন্ধকারে পা-বাড়াবে তখন পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে বলবে-তুমি জাহান্নমে যাও। তোমার দেশে আমি একটা খত পাঠাব তোমাকে খুন করার সংবাদ দিয়ে।

অনুত্তম ধীরে ধীরে সব খুলে বলল। মেজ-মালোম অধীর আগ্রহে শুনলেন। তিনি বাংলা বোঝেন না। কিন্তু অনুত্তমকে কথা বলতে দেখে তার এত ভাল লাগল যে—এ সময়ে যে কথা বলা ঠিক উচিত হচ্ছে না তা পর্যন্ত ভুলে গেলেন।

মেজ-মিস্ত্রি অনুত্তমকে দু দুবার করে বয়লারের নিচে পাঠিয়েছেন। গায়ে বস্তা পেঁচিয়ে সে বয়লারের নিচে নেমে ট্যাংক-টপ খুব ভালভাবে দু দুবার পরিষ্কার করেছে। প্রচণ্ড উত্তাপ দাঁত কামড়ে সে সহ্য করেছে। কোথাও ছাই আর এতটুকু নেই। অথচ মৃত্যুর মত মেজ-সাব দূরে দাঁড়িয়ে বলেছেন তাকে আরো ভালভাবে নিচটা পরিষ্কার করতে হবে। কিন্তু আরো কিছুক্ষণ বয়লারের নিচে বসে থাকার অর্থই মৃত্যুর কাছাকাছি কোনো স্থানে পেঁছানো। সে তখন নিচ থেকে এনজিন-রুমে উঠে এসেছিল, বলেছিল—আর সে পারবে না, আজকের মত তাকে অন্ততঃ ছুটি দিতেই হবে। সামান্য কয়লায়ালাকে মুখের ওপর কথা বলতে দেখে তিনি অপমানিত বোধ করেছেন—সেই জন্য অনুত্তমের কলার ধরে বলেছিলেন, ইউ ইণ্ডিয়ান ব্লাডি: ইউ উইল নট কেরী আউট মাই অর্ডার!...অনুত্তম অপমানিত বোধ করেছিল—তা ছাড়া একদিন তিনি বাংকারে লাথি মেরেছেন—মেজ-সাবের সবগুলো দুর্ব্যবহার এক এক করে মনে পড়ছিল! সে প্রচণ্ড উত্তাপে মাথা ঠিক রাখতে পারে নি—মেজ-সাবের মুখে সে ঘুষি চালেয়েছিল। মেজ-সাব ওকে জেনারেটরের উপর ঠেলে ফেলে দিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছেন।...

এতগুলো কথা বলতে অনুত্তমের অনেক সময় লাগল। মেজ-মালোমের মনে পড়ল অনুত্তমের কথা বলা ঠিক উচিত হচ্ছে না। তিনি সকলের প্রতি এবার মুখ তুলে বললেন, নো, নো, নো' তিনি সকলকে কেবিনে যেতে বলে দিলেন। অনুত্তমের কথা বলা বারণ। হরিদাস এবং মাজেদ মেজ-মালোমের কথামত বোট-ডেক ধরে নিচে নেমে গেল। অনুত্তমকে গরম দুধ খাইয়ে তিনি পাশের একটি বাংকে শুয়ে জাহাজী-জীবনের কিছু কিছু দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করলেন।

তারপর রোজকার মত সমুদ্রের একঘেয়েমী জীবনটা ভোরের দরজায় এসে আবার

উঁকি দিয়েছে। অনুত্তমকে ধরে এনে মেজ-মালোম পোর্ট-হোলের পাশে ইজিচেয়ারে বসিয়ে দিয়েছেন। পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন পোর্ট-হোলের। ফুর ফুর করে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। জাহাজীরা এসে কেউ কেউ আলাপ করে গেছে অনুত্তমের সঙ্গে। শরীরের সমস্ত ক্লান্তি যেন দূর হয়ে গেছে। অনেক রক্তক্ষরণে যে দুর্বলতা সে অনুভব করেছিল সমস্ত রাত্রির ঘুমের প্রশান্তিতে তা দূর হয়ে গেছে। ভোরের সূর্যালোকের সঙ্গে পাখি দুটোর কথা মনে হল।—সেকেন্ড্! অনুত্তম ইজিচেয়ার থেকে মাথা না তুলে ডাকল মেজ-মালোমকে।

মেজ-মালোম ক্ষুর চালাতে গিয়ে হঠাৎ সেটা বন্ধ করলেন। ঝুঁকে দাঁড়ালেন এসে অনুত্তমের মুখের উপর।—এনি থিংগ ইয়ু লাইক টু হ্যাভ?

—দি টু বার্ডস—মিসেস স্পেরো য়্যান্ড মিস্টার স্পেরো—প্লিজ কন্‌ভে মাই গুডমর্নিং টু দেম।

মেজ-মালোম হাসলেন।—ইয়ু লাভ দেম টু মাচ্।

অনুত্তম তখন পোর্ট হোলের ফাঁক দিয়ে দূর সমুদ্রে কতগুলি শুসোক মাছ ভাসতে দেখল। বললে, ইয়েস আই ডু—য়্যাজ দি ডলোফিন'স লাভ টু দি সি।

মেজ-মালোম দেখলেন অনুত্তমের মুখটা সাদা সাদা পাঁশুটে চোখ দুটোতে ওর সমুদ্রের ওপারের অন্য কোনো বিদেশের কথা কাহিনীর ছবি যেন। তিনি আয়নাটার সামনে সরে দাঁড়ালেন। নিজের মুখের রেখাগুলোর সঙ্গে অনুত্তমের মুখের রেখাগুলো মিলিয়ে ভাবতে চাইলেন কিছু। কিন্তু সাবানে ঘষা মুখটার ছদ্মবেশে তিনি হাজার বছরের সভ্যতার এবং সংস্কৃতির ছদ্মবেশকে দেখতে পেলেন। মুখটা তাই অনুত্তমের মুখের সঙ্গে এত বেশী ফারাক। বিদেশী বিদেশী। তিনি এবারও হাসলেন।—য়্যাজ দি সি য়্যান্ড দি সি বিচ উই হ্যাভ মেড ফ্রেন্ডসিপ উইত দি টু স্পেরোজ।

অনুত্তম মনে মনে ভাবল, মেঘ যেমন আকাশকে ভালবেসেছে, মাটি যেমন সমুদ্রকে, তেমনি এক বন্ধুত্বের গভীরতা আজ পাখি দুটোর সঙ্গে। অনুত্তম মেজ-মালোমকে বললে, সেকেন্ড, উড্ ইয়ু প্লিজ টেক্ মি টু দেম?

মেজ-মালোম মুখটা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলেছিলেন তখন এবং তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছবেন ভাবছেন—। —বাট ইয়ু আর উইক্ য়্যান্ড ইট্ ‌ টু মাচ্। সো ইট্ ইজ নট্ টুডে বাট্ টুমরো।

—উইল টুমরো কাম এগেইন?

—ইয়েস ইট্ উইল কাম।

পরদিন খুব ভোরবেলায় মেজ-মালোম অনুত্তমকে ধরে বোট-ডেক থেকে টুইন ডেকে নেমেছিলেন। ওকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু পাখি দুটো বোট-ডেকে নেই। পাখি দুটো কোথাও উড়ছে না। উড়তে না দেখে অনুত্তমের বুকটা কাঁপল।

ওরা এসে এখন গলুইতে উঠেছে। গলুইতে সেই পাখি দুটো। কাঠের বাক্সটার চারপাশে ওরা উড়ছে না। অনুত্তমের বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। সে কেমন রুক্ষ কণ্ঠে বললে, মেজ, শেষ পর্যন্ত পাখি দুটো অ. .র সঙ্গে বেইমানি করলে! ওরা পালিয়ে গেল জাহাজ থেকে? কিন্তু যাবে কোথায়, তবে যে ওরা সমুদ্রে ডুবে মরবে!

সে মেজ-মালোমের কাঁধ ধরে বাক্সটার আরো সামনে এগিয়ে গেল। তারপর

বাক্সের ভিতর উঁকি দিয়ে সে অদ্ভুত এক আনন্দে দুহাত আকাশের দিকে তুলে দিয়ে বলল, দেয়ার আর দি টু বার্ডস।...পাখি দুটো আজ ঘর পেয়েছে।

অনুত্তম এবার বাক্সটার ভিতর ভালভাবে উঁকি দিয়ে মেজ-মালোমকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরল—সেকেণ্ড! সেকেণ্ড! ইটস্ এ গ্লরিয়াস্ ডে ফর আস।... মেয়ে-চড়ুইটা ডিম দিয়েছে। দুটো বাচ্চা হবে। মেক ফ্রেণ্ডসিপ এগেইন।

মেজ-মালোম মেয়ে-চড়ুইটা এবং দুটো ডিমের উত্তাপ দেখে আত্মগত ভাবে বললেন, দিস্ ইজ টু-মরো, য়্যাণ্ড ইট্ উইল কাম এগেইন।

## ॥ ৮ ॥

জাহাজ ক্যারেবিয়ান-সমুদ্র অতিক্রম করে মেক্সিকো-উপসাগরে পড়বে পড়বে সময়ে খবরটা এল জাহাজে। (

জাহাজীরা ভেবেছিল দুদিন পর আমেরিকার তীর দেখে কলম্বাস এবং তার নাবিকদের মত চীৎকার করবে—ল্যাণ্ড! ল্যাণ্ড! কি দীর্ঘ যাত্রা।...কিন্তু তা হয় নি। হবে না। এখন মনে হচ্ছে হাজার বছর ধরে যেন জাহাজীরা গংগার উপকূল থেকে জাহাজ বাইছে।

সুতরাং সমুদ্রের ঝড় আর টাইফুন দেখে যখন নাবিকেরা ক্লান্ত, পড়শীর মেয়ে-জগতটা যখন মেয়ে-চড়ুইটার ঠোঁট থেকে তীরের প্রতীক্ষাতে ক্রমশঃ জাহাজীদের মন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছিল, খবরটা সেই সময় ডেকের উপর গড়াগড়ি খেয়েছে।

খবরটা জাহাজীদের কাছে একান্ত অপ্রত্যাশিত। ডেকে খবরটা গড়াগড়ি খাবার সংগে সংগে জাহাজের আগিল অন্যদিবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।। জাফর আলি, মকবুল মার্কনিকে গিয়ে বলেছে, সাব, হোয়াট্ সাব? সাব নো পোর্ট! নো ওম্যান!

কোম্পানীর উপর সব মানুষগুলিই ক্ষেপে গেছে।

মার্কনি বলেছেন, আমাদের কি হাত আছে বল? ২১ নং বারী স্ট্রীট, লণ্ডন থেকে যে খবর এসেছে সে খবর মত আমরা জাহাজ চালিয়ে নিচ্ছি।

কি করবে! জাহাজীরা এখন যে যার মত কাজ করছে। কাজ করতে প্রত্যেকের কান্না পাচ্ছিল। দুমাস ধরে জল আর জল দেখে ওরা জাহাজী জীবনটাকে কিছুতেই আর সহজ করে তুলতে পারছে না। মেয়ে-চড়ুইটা বাচ্চার উপর তা দিচ্ছিল—কোনো কোনো জাহাজী গিয়ে এখন ওখানটায় বসেছে।

জাহাজীদের অনেকগুলো আকাংক্ষা ছিল আগামী বন্দরটা সম্বন্ধে। মিসিসিপি নদীর তীরে সে বন্দর। অনুত্তম জানত সে বন্দরে তারা নামতে পারবে না। আমেরিকার দক্ষিণ-দেশগুলোতে কালো আদমীর প্রতি এখনও অহেতুক অনেক ঘৃণা। তবু বন্দরে দশদিন দশরাত জাহাজ থাকবে—পাটের গাঁট নামানো হবে—সালফার বোঝাই হবে নিও-প্লাইমাউথ বন্দরের জন্য। কিনারার অনেক খবর মেজ-মালোম এসে দেবে। রাত কাটানোর গল্প, মেয়েমানুষের গল্প। তা ছাড়া মিসিসিপির তীরে দু-একজন মেয়েমানুষ নিশ্চয়ই শহর থেকে মোটর করে বেড়াতে আসবে। অনুত্তম তাদের দেখবে। জাহাজীরা একটি মেয়ে-জগতের মুখ দেখে দীর্ঘ-সফরের বেদনাহত

জীবনকে, সমুদ্রের একঘেয়ে ক্লান্তিকে ভুলে যাবে। সমুদ্রে আবার যদি ঝড় আসে, টাইফুন আসে, নতুন আর এক বন্দরের কথা ভেবে অনায়াসে বাংকে ঘুমিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু দু'মাস ধরে এই নীরস সমুদ্র-সফর জাহাজী-জীবনকে উৎক্ষিপ্ত করে তুলেছে। কিছুই নেই, কিছুই নেই ভাব। কিছুই আর ভালো লাগছে না ভাব। তাই ডেক ধরে জাহাজীরা হাঁটবার সময় সভ্যতার বড় বড় বুলিগুলির কথা ভেবে এখন একটা 'ফুঃ' শব্দ করে। জাহাজী মানুষের দুঃখকে কিনারার মানুষগুলো করুণার চোখে দেখে। —ফুঃ ফুঃ। তারা অনেকগুলো ফুয়ে সে সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করে। সভ্যতার নামে যে সব মানুষেরা বড় বড় বুলি আওড়ায় তারা ইতর—অভদ্র। মেয়ে চড়ুইটার দুটো বাচ্চা হয়েছে এবং কেন হয়েছে পুরুষ-চড়ুইটা পাখা দিয়ে সে কারণগুলোকে আড়াল করে নি। মেয়ে-চড়ুইটা খুব খুশী। পুরুষ-চড়ুইও খুব খুশী। খুশীতে ডগমগ করছে এখন। মানুষের সভ্যতাকে ল্যাং মারছে।

অনুত্তম ভেবে ভেবে খুব খুশী হল। মারুক ল্যাং। মেরে মেরে মাটির সভ্যতাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিক। কিন্তু চড়ুই দুটোর কত ক্ষমতা। চড়ুই দুটোর অক্ষমতার কথা ভাবল বাক্সটার ভিতরের দিকে চেয়ে। উঁকি দিয়ে ভাল করে দেখল এবং বললে, খবরটা শুনতে পেলে? পাও নি? তা পাবে কেন। খুব সুখে আছ—স্বামী-স্ত্রীতে বেশ খেলা হচ্ছে। আর আমরা হা-হুতাশ করে মরছি। জাহাজ নিউজিলান্ড যাচ্ছে—পাটের গাঁট ওখানেই খালাস দেওয়া হবে। কোম্পানীর কি সব মর্জি অথচ ওরা ভাবে না যে একদল মানুষ জাহাজটাতে কাজ করছে। মেয়েমানুষ দেখার জন্য ওরা পাগল! নীল সমুদ্রের নীল ঢেউ গুনতে কত আর ভালো লাগে। তুমিই বলো! তোমাকে সাক্ষী রাখলাম।

জাহাজীরা এসে সব গলুইয়ে ভিড় করেছে। ওদের হাতে কাজ সরছে না। তাই ডেক থেকে ঘুরে যাচ্ছে। দুদিন বাদে বন্দর ধরবে, পাটের গাঁট নামানো হবে, সালফার বোঝাই হবে নিও-প্লাইমাউথ বন্দরের জন্য। এখন সেই নোঙ্গরের কথা ভুলে জাহাজ বরাবর নিউ-প্লাইমাউথ যাবে। হেড-আফিসের মর্জির কথা ভেবে জাহাজীরা মনে মনে আফসোস করছে। দুদিন পরে মিসিসিপির তীরে লুসিয়ানার যে বন্দরটা পেত সে বন্দর ডাইনে ফেলে জাহাজ সোজা মেক্সিকো-উপসাগর অতিক্রম করবে কোন এক সন্ধ্যায় তারপর পানামার তীরে ভিড়বে জাহাজটা।

বারিক ডেক ধরে আসার সময় বললে—বন্দর পাইতে আবার একমাস।

গলুইয়ের উপর যে জাহাজীরা ভিড় করে ছিল, একমাসের সময়টাকে তারা অনন্তকাল বলে ভাবল, ভাবল—যেদিন ওরা পায়ের তলায় মাটির স্পর্শ পাবে সে দিনটি হল কোনো এক অনন্ত-কালকেই অতিক্রম করে। অনেক প্রতীক্ষা আর অনেক সময় গোনার ইতিহাস অনন্তকালের পর্দাকে সরিয়ে দেবেই একদিন। তখন পায়ের তলায় মাটির স্পর্শে ওরা উন্মাদ হবে। পাগল হবে। কিনারার মানুষগুলো ট্যারা-চোখে দেখবে—একটি জাহাজী মানুষ একটি মেয়েমানুষের কোমর ধরে ছুটছে। জাহাজী-গুলো ইতর। জাহাজীগুলোর ইজ্জত নেই।

জাফর আলি বললে, হায়রে নসিব।

অনুত্তম এবং মাজেদ পাখি দুটোর সমৃদ্ধির কথা ভাবছিল। সেই সময় দেখল তারা জাফর আলি আকাশের দিকে চেয়ে বলছে, হায়রে খোদা।

মাজেদ বলল ঠাট্টা করে, হায়রে খোদা! পেটের ব্যামোতে পেল নাকি রে, জাফর?

—নারে ভাই।

জাফরের পিঠের উপর কয়েল করা হিবিং লাইনটা ডেকের উপর ঝুলে পড়ল। এখন ওটা বাতাসে নড়ছে। হিবিং লাইনটা সামলে বলল—বিবির মুখটা স্মরণে আনতে পারছি না।

—সব নসিবের খেইল।—মাজেদ বলল।

জাফর হাঁটতে হাঁটতে বলল, একমাস আরো লোহার-ডেকে থাকবে রে মিঞা। জমির দেখা নাই, পারের দেখা নাই। বিবির মুখটারে দেখে দেখে বাংকের উপর মুখ গুজে থাকি—নসিবতের এমন খেইল সে বিবির মুখটা পর্যন্ত আজ স্মরণে আনতে পারছি না। হারিয়ে গেছে, সব হারিয়ে গেছে।...জাফর আলি কথাগুলি বলে লাফিয়ে লাফিয়ে বোট-ডেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিবির মুখটা স্মরণ করতে পারছে না বলেই যেন ডেকের উপর সে উন্মাদের মত লাফ দিল।

মাজেদের মনটা এমন সময় অদ্ভুত এক আনন্দের প্রাচুর্যে ভরে উঠল। খুশীতে সে উচ্ছল হল। জাহাজ বন্দর না ধরে ভালই করেছে। কোম্পানীর ঘরে টাকা জমছে অনেক। বন্দর ধরলে রাস্তার অনেক খরচ। হয়জুন-বিবির জন্য টাকা জমত না। মেয়ে-চড়ুইয়ের দুনিয়া বন্দরে ওত পেতে থাকত। কোম্পানীর টাকায় বে-হিসেবী খরচে বন্দরে সে ডুবত। জাহাজে ফেরার সময় ভাবত—জীবনটা ফেরার হয়ে গেছে। হয়জুনের বাপকে কড় কড়ে নোটগুলি তুলে দিতে আর পারল না, মিঞা দিলাম তোমারে দেন-মোহরের টাকা। কবে এবার বিবিকে ঘরে পাঠাবা বলে দাও। ঘর আমার খাঁ খাঁ করছে।

এবার কোম্পানীর ঘরে টাকায় টাকা আনবে। বলতে বলে ব্যাংক লাইনের সফর—তিন বছরে দুবার। গোটা দুনিয়া চষে বেড়াবে জাহাজটা। চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া কত দেশ। দেশে দেশে টাকা। বারো-মাসের পর তের মাসের সময় কোম্পানীর ঘরে সুদ জমবে। টাকায় টাকা বাড়বে। সামনের বন্দর পেতে আরো একমাস। সে-মাসের টাকাটাও কোম্পানীর ঘরে জমল। সে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সাধারণ একটা হিসেব টেনে ফেলল। টাকাটা অনেক নয়। তবু দেন-মোহরের টাকাটা হয়ে যাবে। চড়ুই দুটোর কাছে গিয়ে আবার সে বসল। হয়জুন বিবির মুখটা স্মরণ করতে গিয়ে দেখল সেও সে-মুখটা হারিয়ে ফেলেছে। অনেক চেষ্টা করেও মুখের আদলটাকে চোখের উপর ছবির মত করে টানতে পারল না। একটা আবছা ভাব হয়জুন বিবির মুখের। মুখের উপর মাকড়সার জালের মত মসলিনী পর্দাটা কে যেন বিছিয়ে দিয়েছে। পর্দাটা এখন কাঁপছে। কাঁপা পর্দাটা ছিঁড়ে গেল। ফাঁক দিয়ে হয়জুনের সুর্মা টানা চোখ দেখতে পাচ্ছে মাজেদ। কিন্তু সে চোখে মাজেদের কথা নয়, অন্য কোনো মানুষের কথা যেন। সে ফিস ফিস করে বলল অনুত্তমকে, দেখবি পানামা খালে খবর আসবে হারুন আলীর বিবিটা গলায় কলসী দিয়েছে।—বলে ফিক ফিক করে হাসল মাজেদ। তারপর চড়ুইর বাচ্চা দুটোকে হাতে নিয়ে বলল, গলাটা ছিঁড়ে জবাই করে দেই।

অনুত্তম তাড়াতাড়ি মাজেদের হাতটা জোরে চেপে ধরল,—খবরদার।

মাথাটা ব্যাণ্ডেজ করা অনুত্তমের। দু-চারদিনের পর মেজ-মালোম খুলে দেবেন বলেছেন। মাজেদ জোর করল না। বাচ্চা দুটাকে জায়গা মত রেখে বলল—বলেছি বলেই কি জবাই করে দেব। পাখি দুটোর জন্য আমার বুঝি দরদ নেই। কিন্তু ভাবল সে হয়জুন বিবির সুর্মাটানা চোখে যে মরদের জন্যই টান থাকুক না কেন— দুটো বাচ্চার

জন্যই যে মরদের দরদ সেটা সে বুঝতে পারল। এখন ভাবল টাকাটা এত না জমলেও পারত কোম্পানীর ঘরে। আরো ভাবল, বন্দরে খরচ হক-খরচ। হক-খরচটি করতে না পেরে তার অনেক দুঃখ। সুতরাং জমি দেখার জন্য মাজেদও আবার ব্যাকুল হয়ে উঠল।

মাজেদ গলুইতে এসে দু হাত তুলে চীৎকার করে উঠল, কোম্পানীকে বলে দাও জাহাজ থামাতে। না হলে জাহাজ ফুটো করে দেব। ফুটো কোম্পানীর মাথায় লাল চেরাগ জ্বালিয়ে ছাড়বে।

এত দুঃখেও জাহাজীদের হাসি গেল। মাজেদ বলছে কি! হারুন আলি একটা বেঞ্চির এক কোণায় বসে চোখ বুজেছিল। মাজেদের বে-তরী কথাগুলোকে সে যেন হজম করতে পারছে না। এখানে অন্ধকার থাকালে সে কানে আঙ্গুল দিতে পারত। নূর-ভানুর মুখ বেশী করে ছবির মত চোখের উপর ভাসাতে পারত। তবু সে ভাবল বিবির মুখ বড় খুপসুরৎ। এখন সে পাঁচ দুয়ারে নিশ্চয়ই ঘুর-ঘুর করছে আর তার জাহাজী খসমের কথা ভাবছে। ভাবুক। ভেবে ভেবে সারা হক। নাকের নোলক হয়তো দখিনা বাতাসে নড়ছে। বিবির খত আসবে পানামা-খালে। খতে অনেক মোহব্বতের কথা থাকবে।

মাজেদ হারুন আলির সামনে এসে দাঁড়াল। নাড়া দিয়ে ডাকল, এই মিঞা ঘুমোচ্ছো না কি! চিত হয়ে তো পড়বা পানীতে।

হারুন আলি চোখ বন্ধ করেই বলল, মিঞা ফাইজলামি করার জায়গা না পাওত নিচে গিয়া চিত হইয়া বাংকে পইড়া থাক।

মাজেদ ক্ষেপে গেল। বলল, চিত হয়ে থাকব কেন? আমি কি কারুর বিবির মুখে ঠোঁট ঠেকাইছি।

হারুন আলি এখনও চোখ খুলল না।—মিঞা ভাই, দুইটা পায়ে ধইরা কই ক্ষেমা দাও আমারে। আমারে চোখ বুইজা শান্তিতে থাকতে দ্যাও।

—থাক থাক চোখ বুইজাই থাক। চোখ বুইজাই দুনিয়ারে দেখ। চোখ খুইলাত দুনিয়াডারে দ্যাখনের সময় পাইলা না। দ্যাখতে পারলে বুঝতে পারতা খপসুরুত দুনিয়াডাই দুনিয়া নয়। আরো দুনিয়া আছে, সেখানে মরদের লাগি যে দরদ সেটা বিবির সখের বাচ্চার জন্য। ওঁয়া ও'য়া করবে, তোঁরা [illegible] করবে। আমার সোনারে, মনিডারে বলবে।

হারুন আলি বিরক্ত হয়ে নিচে নেমে গেল। মাজেদ হাসল গলা ছেড়ে। ডেক-সারেং গলুইতে উঠে আসার সময় বলল· মাজেদ তুমি বড় চিল্লাও। দরিয়ার পানীতে এমন কইরা চিল্লাইলে পাগলী রাগ করে।

মাজেদ বিনয়ের অবতার সেজে বলল, আচ্ছা সারেং সাব আর হবে না। এখন চোখ ট্যারা করে অনুত্তমের দিকে চেয়ে মুচকি হাসল। অর্থাৎ সারেং-সাবের সঙ্গেও সে মসকরা করছে।

অনুত্তম উঠে এল বাচ্চা দুটোর পাশ থেকে। গ্যালীতে উঁকি দিয়ে দেখল ভাণ্ডারী ময়দা ডলছে। উনুনের উপর গোস্তের হাঁড়ি—পচা গোস্তের চামসে গন্ধ। সমস্ত ডেক জুড়ে গন্ধটা উড়ছে। গুনগুন করে আবার গান করল ছোট-ট্যাণ্ডেল। রসের গান—অঃ নাইয়া বইল গিয়া তারে আমার সাধের যোয়ান বিবিরে...। পানামার তীরে এজেণ্ট আসবে। ওর সঙ্গে চিঠি আসবে। সোনালী দাঁত দুটোয় আবার অনেক হাসির ঝলক। মাজেদ অনুত্তমকে টেনে ফোঁকসালে নিয়ে গেল। ট্যাণ্ডেলের গান

শুনে সে বুঝতে পেরেছে—ট্যান্ডেলের চোখে পাঁচ-নম্বর-বিবির খোয়াব। এক্ষুনি হয়তো অনুত্তমের পিছন ধরবে—বাতিজা খতের জবাবটা।

পরদিন সকালেও ধরেছিল অনুত্তমকে, বাতিজা খতের জবাবটা লিখা দিবা ত?

—কাকে না দিয়েছি বলুন। কিন্তু খত আপনার এল কৈ?

—তা দিয়েছ, তা দিয়েছ। এবারে দেখবা বিবি খত দিবই দিব। না দিলে তোমার ট্যান্ডেল চাচার কান কেটে দিবা।

হরিদাস সেন বালকেডে হেলান দিয়ে হাসিটা জোর করে চেপে রাখতে চেয়েছিল কিন্তু পারে নি। ট্যান্ডেল ধরতে পারল হরিদাস সেন ওর কথা শুনেই হাসছে। হাসুক। বিবিকে নিয়ে হাসা! মসকরা! আল্লা তায়লা কিছুতেই সহ্য করবে না। পাঁচ নম্বর বিবি তেমন বিবি না। এ হাসির মুখে পোকা পড়বে। কিন্তু ট্যান্ডেল কিছু প্রকাশ করল না। চুপচাপ ডেক ছাদে উঠে গেল। গানের শেষ কলি দুটো বাকি আছে—গলা ছেড়ে তাই বাকিটুকু গাওয়ার ইচ্ছা। এবার গলুইয়ের ছাদে বসে আসমান আর দরিয়াকে সাথি রেখে গান করবে আর বিবির যৌবন-পুষ্ট দেহটার কথা ভাববে। দেন-মোহরের সময় দশ বিঘা জমি আর তের কুড়ি এক টাকা লেগেছে—লাগুক। বিবির একটা খতেই দেন মোহরের হিসেব উসল হবে।

সকাল প্রায় দশটায় ডেক ভান্ডারী প্রথম সকলকে জানান দিল যে কিনার দেখা যাচ্ছে। তারপর এক এক করে সকলেই এসে গলুইতে জড় হল এবং কিনার দেখল।

মেজ-মালোম বোট-ডেকে স্কাই লাইটের ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে ডাকলেন তিন নম্বর সাবকে। কিনার এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তিন নম্বর ডেকে উঠে দেখে যাক কিনারা। কিন্তু নিচে এনজিনের শব্দে তিনি কিছুই শুনতে পান নি। তিনি সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকলেন, মেজ-মালোম কি বলেন শোনার জন্য। সিলেন্ডারের পাশে এসে বুঝতে পারলেন মেজ তাকে কিনারা দেখার জন্য ডাকছেন। তিনি এবার সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠলেন। সকলের সঙ্গে মিশে গিয়ে বললেন, ম্যাক্সিকান-গার্ল হাউ নাইস সেকেন্ড। ·

বড় মালোম চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিল, ফাইন! টেষ্ট।

মেজ মালোম বললেন, আই লাইক দেয়ার ড্রেস এ্যান্ড দি আমব্রেলা। কান্টিগার্ল পুটস অন ফাইন সিল্কী গাউন এ্যান্ড ফাইন ফ্রক।...তিন নম্বর সাবের দিকে চেয়ে পুনরায় বললেন, ডিড ইউ গেট এনি ফ্রেন্ডসিপ হিয়ার?

তিন নম্বর সাব কাঁধটা অদ্ভুতভাবে নাড়ালেন।—সারটেনলী। সি ওয়াজ এ ফাইন লেডী।

—উইল সি ওয়েট?

—নো, নো, নেভার।

মেজ মালোম এতক্ষণে বুঝতে পারলেন তিন নম্বর সাবের ভাড়া করা স্ত্রী কোলন শহরে কিংবা পানামা-বন্দরে অপেক্ষা করবে না। প্রথম কথা জাহাজের আগিল হঠাৎ মুখ ফেরাল, দ্বিতীয় কথা কোলন শহরে কিংবা পানামা বন্দরে কখনও এ কোম্পানীর জাহাজ নোঙ্গর করে না।

অনুত্তমের কাজ থেকে ছুটি। ডেক-জাহাজীরাও গা লাগিয়ে কাজ করছে না। তাই জাহাজের যমুনা-বাজুতে কিনার দেখার জন্য যে ভিড়টা জমেছিল এখনও তাদের দু-একজন বসে কিনারা দেখছে। অনুত্তম নিচ থেকে উঠে এল। হাতে কাজ নেই

বলে সেও কিনার দেখতে বসে গেল।

পাঁচ নম্বর সাব বলেছে জাহাজ মধ্য-আমেরিকার কিনার ছুঁয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় জাহাজ লিমন-বেতে পেঁছিবে। আরো বলেছেন, খালটা পাহাড়ের উপর কাটা হয়েছে। কৃত্রিম হ্রদ রয়েছে পাহাড়ের উপর। জাহাজটা সমুদ্র থেকে লক প্রথায় প্রায় পঁচাশি ফুটের মত উপরে তুলে দেওয়া হবে।

মেজ-মালোম বলেছিলেন, তুমি আশ্চর্য হবে পানামা ক্যানেল দেখে। অনুত্তম আশ্চর্য হয়েছে কিনারা দেখে। আশ্চর্য তীরের পাহাড়শ্রেণী দেখে। উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো সবুজ একটা পাঁচিল সমুদ্রকে যেন বেঁধে ফেলেছে। বেলাভূমিতে কোনো মানুষ নেই। প্রাণী নেই। কোনো জেলে-ডিঙ্গি মাছ ধরছে না। এখানে সমুদ্র পাঁচিল-ঘেরা পাহাড়ের ভিতর শুধু জাহাজী মানুষের খন্ড আলাপে বিমুগ্ধ থাকে। সমুদ্র এখানে শান্ত : কোনো তাড়া নেই। মাটি এখানে ভেজা—জাহাজীরা জাহাজ থেকে সে ভেজা গন্ধ পাচ্ছে। অনেক দূর থেকে ঘাসের সবুজ গন্ধটা হঠাৎ হঠাৎ জাহাজীদের উৎক্ষিপ্ত করে তুলছে। গাছের আড়ালে হয়তো কোনো কাঠবেড়ালী এখন উঁকি দিয়ে দেখছে জহাজটাকে। জাহাজী-মানুষদের খন্ড আলাপটুকু সেও শুনেছে।

সমুদ্র কিনারে জাহাজটাকে দেখে আজ প্রথম বুঝতে পারল অনুত্তম জাহাজটার গতি যেন বেড়েছে। তীরের দিকে চেয়ে মনে হল সে ট্রেনে বসে রয়েছে। গ্রামগুলো, নগরগুলো পিছনের দিকে ছুটছে। এখানে গ্রাম নেই, নগর নেই, অরণ্য আছে। অরণ্যের হৃদয় আছে। অরণ্যের গাছগুলো ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে অনুত্তমের চোখ থেকে। ওর কষ্ট হতে থাকল। কারণ সে এই অরণ্য জীবনে বাংলা দেশের কোনো এক গ্রাম, গ্রামের পথ, শ্যাওলা ভরা এঁদো পুকুরের ছবি আঁকতে আঁকতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছিল। কষ্ট হচ্ছে ওর স্বপ্নগুলো খন্ড বিখন্ড হয়ে যাচ্ছে বলে। অরণ্য জীবন জাহাজকে ফেলে হৃদয়কে ফেলে কেবল ছুটছে। ভেজা গন্ধ, কোন এক অজানা পাখির ডাক, দু দণ্ডের শান্তি ওকে দিল না। শুধু কবির কবিতা আবৃত্তি করতে ইচ্ছা হল। মজিদের মৃত্যুর পর যে কবির কবিতা নীরস-ডেকে তাকে বাঁচতে শিখিয়েছে।

সে তার দৃষ্টিকে এবার সংক্ষিপ্ত করল। নিচে সেই নীল সমুদ্র। জল এখানে গভীর নীল নয়, ফ্যাকাসে নীল। বুদ বুদ উঠছে জলে। র একটা প্রকান্ড সামুদ্রিক মাছ ভেসে ছিল। প্রপেলারের শব্দ সে আকাশের দিকে লাফ মের এখন সমুদ্রের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সারেং বলল, মাছটার নাম সুরমাই-মাছ। জাহাজ চলার সময় জাহাজীরা মোটা তারের বড়শী ফেলে এ মাছ অনেক ধরে। এ সফরে অনেক দুঃখ জাহাজে। মাছের জন্য মোটা তার তাই নীল জলে আর ফেলা হয় নি।

আর কিছুক্ষণ পর আমেরিকার অন্য তীরে সূর্য অদৃশ্য হয়ে যাবে। কাল এমন সময় তাদের জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে থাকবে। ক্যানেল অতিক্রম করে জাহাজ সাগরে পড়বে। ট্যান্ডেল বলেছিল গঙ্গার মোহনাতে প্রশান্ত মহাসাগরের এ্যালবাট্রসগুলো খুব প্রকান্ড। সে চিড়িয়া দেখলে অনুত্তম অবাক হবে।

পানামা খালের ওপারে সূর্য ডুবে গে.।। ধূসর অন্ধকার নেমে আসছে জাহাজ ডেকে। জাহাজীরা দড়াদড়ি সব জড় করছে। লিমন উপসাগরে জাহাজ। জাহাজের গতি কম। এক্ষুনি থামবে। ছোট ছোট মোটর বোটে কতকগুলো নিগ্রো জাহাজে উঠে এল। ওরা হৈ চৈ বাধিয়ে দিয়েছে ডেকের উপর। নোঙ্গর

ফেলা হবে।

জাহাজী জীবনে পানামা খাল যারা কোনোদিন অতিক্রম করে নি— পাহাড়ের উপর শহর দেখে এবং তার ফাঁক দিয়ে জাহাজ নেমে আসতে দেখে তারা বিস্মিত হল। জাহাজীদের এখন আকাশ মুখোমুখী। পাহাড়ের ভিতর জাহাজ ঝুলছে। ক্রমশঃ নেমে এল জাহাজটা। তারা দেখল এবং আশ্চর্য হল। হাতে তাদের কাজ নেই। সব কাজগুলো নিগ্রো স্যোর-ম্যানরা বুঝে নিয়েছে। পানামার তীরে লক্-গেটগুলোতে যত দড়াদড়ি বাঁধা সব ওরাই করবে। ডেকে এখন পায়চারি করবে মাজেদ, জাফর, মকবুল, সবাই। যারা সঙ্গে করে কিছু ব্যবসা এনেছে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিনারার লোকদের সঙ্গে তাদের দর কষাকষি চলবে।

—চিঠটি! চিঠটি! অনেক চিঠি।—এক বাণ্ডিল চিঠি নিয়ে ডেকসারেং ছুটে আসছে।—হরিদাস, অনুত্তম,! জোরে জোরে ডাকল ডেক সারেং।

হরিদাস সেন গ্যালী থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, দিন, দেখি কার কার চিঠি আছে।

ছোট-ট্যাণ্ডেল দর কষাকষি করছিল নিগ্রোদের সঙ্গে। কিন্তু চিঠির খবর শুনে সেও ছুটে এল। গলুইর উপর উঠে হাঁপাতে থাকল। এদিক ওদিক ইতি-উতি করে বলল—আমার চিঠি, আমার খত! কোন খত আসে নি আমার?

এনজিন-সারেং ধমক দিল, দাঁড়াও। খত আসলে ত পাইবাই।

জাহাজী মানুষগুলো ধর্মীয় কথা শোনার মত হরিদাস সেনের মুখে নামগুলো শুনছে।—মকবুল হোসেন। একটা, দুটো, তিনটে—মকবুলের তিনটি চিঠি! কি নসিব!

অনুত্তম এক এক করে চিঠিগুলি ভাঁজ করছে। তার অনেক চিঠি। মনে হল নীল খামে পড়শীও একটা চিঠি দিয়েছে। চিঠির ভিতর আতর মাখানো। চিঠির মুখ খুলতেই ভুর ভুর করে গন্ধ বের হল। সে আশা করেছিল নীল খামের চিঠিতে অনেক খবর থাকবে, কিন্তু খুলে দেখল দুটো মাত্র লাইন—তোমার শরীরের প্রতি যত্ন নিও। আমি ভাল আছি। মাসিমা মেসোমশাইর শরীর ভাল আছে।.. এর চেয়ে বেশী কিছু লেখার বুঝি আজ ফুরসত নেই পড়শীর। আর একবার অজানা পাখির ডাক শোনার জন্য তীরের অরণ্যে চোখ মেলল সে। কিন্তু সেখানেও বার বার পড়শীর অবশ দুটো চোখ অরণ্যের ফাঁক থেকে উঁকি দিতে থাকল।

হরিদাস সেন ডাকল—মাজেদ আলী—

মাজেদ খতটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। কে তাকে এ খত দিল। তার দুনিয়ায় এমন কে আছে যে তাকে একটা খত দিয়ে তার খবরগুলো রাখতে চায়! তবে যে মানুষই খত লিখুক না, মাজেদের আনন্দ সেও একটা খত পেয়েছে। জাহাজী মানুষগুলো যেন মনে না করে মাজেদের দুনিয়ায় কাক-প্রাণী বলে কেউ নেই। সে অনুত্তমকে জড়িয়ে ধরে বলল, চিঠিটা পড়তো, কে কি লিখেছে দেখি?

চিঠিটা পড়ে দিল অনুত্তম। লিখেছে ওর গ্রাম সম্পর্কে এক ফুফাত ভাই। মাজেদের শেষ সম্বল ভিটেমাটিটুকু সে কিনতে চায়।

হরিদাস সেন ডাকল—জনাব মাজাদ মিঞা।

এনজিন ছোট ট্যাণ্ডেল সোনালী দাঁত দুটোতে আর এক ঝলক হাসি টেনে বলল, হুঃ বলছিনা খত আমার আসবেই। বিবি কি আমার তেমন বিবি! খত না দিয়ে থাকবে বিবি! কৈরে অনুত্তম, চাচা আমার গেলি কৈ? তর চাচীর খতটা

একবার দেখ।

অনন্তমকে ধরে নিয়ে ট্যান্ডেল নিচে নেমে গেল। ফোকসালে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর ট্যাঁক থেকে লক্ষ মণি-মুক্তোর মত চিঠিটা বের করে দিয়ে ফিস ফিস করে বলল, খতে লিখা দেবা দেশে ফেরার সময় বিবির জন্য তামাম দুনিয়ার জিনিস কিনে নিয়ে যাব।

অনন্তম চিঠি খুলে বলল, খত আপনার বিবি দেয় নি চাচা।

—কে দিল, কে দিল তবে!

—সোলেমান।

—কি লিখেছে তবে!

—লিখেছে, বহুত বহুত আদাবপর সমাচার এই যে বাপজান আপনার দুখানা খতের জবাবে লিখিতেছি যে ছোট আম্মাজান মাসখানেক ধরে নিখোঁজ হইয়াছেন। বর্তমানে জানিতে পারিলাম তিনি সোনামুখীপুরের মৌলভী সাহেবের বাড়িতে ছোট সাহেবের সঙ্গে আছেন।

ট্যান্ডেল চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। শুনল কথাগুলো। পোর্ট-হোলের দরজায় উঁকি দিল সে। সে তার মুখটা এখন ঢেকে রেখেছে। ছোট বিবির বেইমানীর খবরে সে কতখানি আঘাত পেয়েছে, সে আঘাতের বেদনাটুকু গোপন রাখতে চায়। পোর্ট-হোলের পর সমুদ্র। নীল জল। গভীর জল। ছোট বিবির চোখ দুটোতেও অনেক গভীরতা ছিল। সফরে আসার আগে বিবি তার কেঁদেছিল। এখন সে বেইমানী করেছে। করুক। ডেকের উত্তাপ তার সব দুঃখের স্মৃতি মুছে দেবে। ছোট বিবির বেইমানীতে, তার দু চোখে, আর কত উত্তাপ আছে!

অনন্তমের চোখ দুটো তখন ফোকসালের ছাদে। দুটো আরশোলা ছাদে ঘোরাফেরা করছে। সামনের পোর্ট-হোলটা খোলা। ছোট ট্যান্ডেল এক সময় চিঠিটা নিয়ে চুপি চুপি বের হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগেও ঘুলঘুলিতে ওর মুখটা ঝুলেছিল। ঘুলঘুলিতে তীরের খণ্ড ছবি ভেসে উঠছে এখন। চাল-চিত্রের মত মনে হচ্ছে। ট্যান্ডেল সাহেবের বিবির কথা মনে পড়তেই বালিশে মুখ গুঁজে দিতে ইচ্ছে হল। সে বালিশটা বুকে টেনে শুয়ে পড়ল এই সময়। চোখ বুজে চুপচাপ পড়শীকে ভাবতে চাইল। কিন্তু ট্যান্ডেলের মুখ, ৫ পাঁচনম্বর বিবির মুখ, সোনামুখীপুরের ছোট সাহেব, বালিশে মুখ গুজে পড়ে থাকতে দিল না। নিজের চিঠিগুলি খুলে বারবার করে পড়ল। পড়শীর দুলাইনের চিঠি মুখস্ত। তবু খুলেছে, তবু পড়েছে। তারপর এক সময় বাংকে পড়ে ছটফট করতে করতেই উঠে এসেছে ডেকে।

অনন্তম হেঁটে এল বোট ডেক পর্যন্ত। তখন প্রথম লক্‌গেট থেকে দ্বিতীয় লক্‌গেটে ঢুকেছে জাহাজটা। আগিল এবং পিছিলে দড়াদড়ি নিয়ে ছুটোছুটি করছে নিগ্রোগুলো। তরমুজের মত কাল রং ওদের। ঘাড় এবং কাঁধ দুই-ই চওড়া। ঈষৎ অন্ধকারে ওদের রং আরো কালো হয়, ঘন হয়। অনন্তমের পাশেই একটা অন্ধকার। অন্ধকারে দুজন মানুষ। ফিস ফিস করে ওরা কথা বলছে।

অনন্তম পিছন ফিরে দেখল, সেই ঘন অন্ধকারে ছোট ট্যান্ডেল। সোনালী দাঁত দুটোর ঝিলিকে সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে সেখানে কারা এবং কেন দাঁড়িয়ে আছে। ওর গলার আওয়াজে মেস-রুম-মোটর কেবিন পার হয়ে অন্যদিকে চলে গেল মানুষ দুজন। সে হাসল। সোনামুখীপুরের ছোট সাহেব এখন পাঁচ নম্বর

বিবির সঙ্গে হাসি মসকরা করছে। ছোটট্যান্ডল এখন ডেকের বুকে চোরা-বেসাতি বিক্রীতে অন্য একটা হিসেব টানছে—সে হিসেবে ছ নম্বর বিবির মুখ নিশ্চয়ই আবার বাঁধা পড়েছে।

সামনের কাঠের-ডেকটা পার হয়ে অনুত্তম নামল এসে লোহার ডেকটাতে। এখানে তিনটি লাইফ বোট হুকের উপর ঝুলে আছে। তারই এক পাশে মেজ মালোম বসে আছেন সেই আগের মত। চোখে বাইনোকুলার। কোলন শহরের নীরস ইঁটকাঠের ফাঁকে ফাঁকে পই পই করে কি যেন খুঁজছেন।

—এনি ওম্যান সেকেন্ড?

—নো।

—ইফ্ এনি ওম্যান উড ইয়ু প্লিজ...। সেই কলম্বো বন্দরের পুনরাবৃত্তি।

মেজ মালোম সেই বন্দরের মত দুবার মাথা ওঠা-নামা করে জানিয়েছেন, নিশ্চয়ই ডাকবে। কোলন শহরের ইঁট কাঠের ফাঁকে দূরবীনের কাঁচে যদি কোনো-রকমে ওদের একটা দেহ আটকে যায় তবে নিশ্চয়ই ডাকবে সকলকে। বাইনোকুলারটা দিয়ে বলবে, নাও—দেখ। মেয়েমানুষটার সবটুকুকে দেখ। কিন্তু কৈ কিছুইত নজরে এল না! শুধু-ইঁট কাঠ, শুধু মরা শহরটা আর কটা কুকুরের মাঝে মাঝে ঝিমোনো আর্ত চীৎকার। পানামার তীরে কোলন শহরটা খুব সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছে।

তিন নম্বর লক গেট অতিক্রম করে নিগ্রো স্যোরম্যানদের হাতে তেমন কোনো কাজ

॥ ৯ ॥

থাকে না ; অন্তত যতক্ষণ না জাহাজ গ্যালার্ড-কাটে গিয়ে পেঁছিবে।

এখন জাহাজ চলেছে একটা কৃত্রিম হ্রদের উপর দিয়ে। পানামা কর্তৃপক্ষ কয়েক মাইল জুড়ে পাহাড়ের উপর এই হ্রদ সৃষ্টি করেছেন। হ্রদের ভিতর ছোট বড় পাহাড়ী দ্বীপ ঘন জঙ্গলে ঢাকা। কেয়া ফুলের মত এক রকম ফুলের সমারোহে পাহাড়ী দ্বীপেরা হলদে রং ধরেছে।

জাহাজের সার্চ-লাইট আজ জ্বলছে। ফরোয়ার্ড পিকে কয়েকজন জাহাজীর সঙ্গে বিদঘুটে ইংরেজীতে একজন নিগ্রো জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারদের গল্পে মসগুল। নিগ্রোটা গল্প করতে পারবে গ্যালার্ড কাট পর্যন্ত। তারপর আবার একটা ছুটো-ছুটি দড়াদড়ি নিয়ে। বড় বড় মানীলা জ্যাম্পের, হাসিল, কয়েল করা মোটা মোটা তার নিয়ে ওরা আবার ডেকে টানা হ্যাঁচড়া করবে।

কয়েকজন জাহাজী মেজ-মালোমের দু পাশে বসে রয়েছে। তিনি চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে ডেক চেয়ারে মাথা এলিয়ে দিয়েছেন। এখানে শুধু কৃত্রিম হ্রদের বুকে ছোট বড় ঢিবি। ছোট বড় পাহাড়। গভীর অন্ধকার চারপাশে। তিনি মাঝে মাঝে টর্চ মেরে পাহাড়ের বুকে কোন বসতি আছে কি না দেখছেন।

উইংস থেকে একটা হলুদ রং-এর আলো জলের উপর পড়েছে। সেই আলোতে অনুত্তম দেখল লাল নীল সারি সারি বয়াগুলি পাশে সাপলা ফুলের মত ফুল। সে মেজ-মালোমের টর্চটা নিল। টর্চ জেবলে দেখল বয়াগুলি অতিক্রম করে আরো

অজস্র ফুল ফুটে আছে। জাহাজটা খুব আস্তে চলেছে বলে তেমন ঢেউ নেই। ফুলের ডগাগুলো তাই কাঁপল না।

কিন্তু মেজ মালোম কি ভেবে হঠাৎ আবার উঠে দাঁড়ালেন। ছোট ছোট পাহাড়ের ছায়ায় কিছু দেখার জন্য উন্মুখ হলেন। প্যালার্ড কাটে জাহাজ ঢুকতে এখনও অনেক সময় বাকি। দূরবীনের মুখটা সেজন্য ঘুরিয়ে দিলেন কবার। কিছুই নজরে আসছে না। সব অস্পষ্ট। ছোট বড় টিবিগুলো অতিক্রম করে, অনেক দূরে, ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে কোলন সহরটা। পানামা ক্যানেল হাস-পাতালের স্তিমিত আলোটাও নেই। স্পেনীল-মিশান ধাঁচের ওয়াশিংটন হোটেলের উজ্জ্বল আলোটাও নিভে গেছে।

সব জাহাজীদের মত দুমাস ধরে সমুদ্রের নীল ঢেউ গুনে অনুত্তম এখন একান্ত নিরাশ। আর কি কিছু মিলবে কোথাও।

পানামা বন্দরে পৌঁছতে রাত আরো অনেক গভীর হবে। শুধু শুধু এই রাত জেগে বসে থাকা। বোট ডেকে মেজ-মালোমের এই পাগলামীটুকু তার আজ ভাল লাগল না। কিন্তু বসে না থেকেই বা উপায় কি! একমাস পর বন্দর পাবে নিউ প্লাইমাউথ। প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে সে বন্দর। সেখানে জাহাজীরা সব নামতে পারবে।

বন্দরটা পাহাড়ী বন্দর। চড়াই উৎরাই পথ। মাউরী মেয়েদের দেশ। দেখতে মানুষগুলি বাঙ্গালীদের মত। মেয়েগুলো বাংগালী বৌদের মত। সব শোনা কথা। অনুত্তম ভাবল—কতটা সহ্য হবে কে জানে। সুতরাং সে বন্দর পাবার আগে পানামা শহরই একমাত্র বন্দর যেখানে দু চোখ মেলে প্রত্যাশায় আপাততঃ বসে থাকা যাবে। সেখানে মেজ-মালোম হয়তো হঠাৎই বলে উঠবেন, ওম্যান! ওম্যান! বোট-ডেকের উপর চীৎকার করে সকল জাহাজীদের জাগিয়ে দেবেন তিনি। যদি হয়—কি যে একটা হবে। অনুত্তম আর ভাবতে পারল না।

পাহাড় কেটে এখানে খাল করা হয়েছে। দুদিকে খাড়া পাহাড় তার ভিতর দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে। উপর থেকে জল পড়ার শব্দ সকল জাহাজীদের কানে এল। ঝরণার জল পড়ছে। মকবুল বললে, জাহাজ সেই ঝরণার পাশে এসে গেছে।

জাফর আলী বললে, একপাশে এখানে আমরা কুমীর দেখে ছিলাম। জাহাজের বড়-মালোম বন্দুক দিয়ে মারতে চেয়েছিলেন কুমীরটাকে। কিন্তু নিগ্রোগুলো বারণ করলে। বললে, ক্যানেল এরিয়াতে কিছু শিকার করা নিষেধ আছে। তিনি কুমীরটা তাই মারলেন না।

জমীর আরো সংলগ্ন হয়ে বসল অনুত্তমের। জাহাজ খালের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে বলে গরম সকলের বেশী লাগছে। অনুত্তম মনের বিরক্ত ভাবটা ঢেকে বলল, আর একটু ফাঁক ফাঁক হয়ে বোস। ভোর রাত পর্যন্ত এখানে সকলকে বসে থাকতে হবে। এত ঘন হয়ে বসলে গরম বেশী লাগবে।

জমীরের কণ্ঠে ফিস ফিস আওয়াজ তখন—যদি খবর আসে পানামা বন্দরে আজ থামাতে হবে।

মাজেদ কথাটা শুনে ফেলল। সে রেগে গেছে।—দেখ জমীর অধিক আশা ভাল না। এবার সফর করতে এসে কার মুখ না জানি দেখে জাহাজে উঠেছিলাম। বসে আছিস, চুপ চাপ বসে থাক। কি হবে কি না হবে এখন থেকে বলে লাভ নেই।

মেজ-মালোমের মুখে কোন কথা নেই। তিনি বসে বসে পায়ের আঙ্গুল নাড়াচ্ছেন। জাহাজে দড়াদড়ি টানার শব্দে তিনি শুধু মুখ তুলে একবার দেখলেন, কোথায় এল জাহাজ। বুঝতে পারলেন গ্যালার্ড-কাটে পৌঁছতে আর দেরী নেই।

জাহাজ আবার ত্রিশ ফুটের মত নিচে নামিয়ে দেওয়া হল। আরো নিচে, আরো নিচে নামছে জাহাজ।

পানামা-বন্দরের তীর ছুঁয়ে জাহাজ যখন প্রশান্ত মহাসাগরে পড়বে সেই সময় মেজ মালোম শেষবারের মত দূরবীনটা চোখে তুলে নিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ। পানামা বন্দরের বুকে কোন মানুষের সাড়া পাচ্ছেন না। জাহাজীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

মেজ মালোম দূরবীনের কাচটায় এখন অস্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছেন যেন। লাল বাড়িটা থেকে কোন মানুষ যেন পথের উপর নেমে আসছে। তিনিও অন্যান্য জাহাজীদের মত দূরবীনের ভিতর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকলেন। কাচটায় অস্পষ্ট ছবিটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। তিনি ভাবলেন-আরো স্পষ্ট হয়ে উঠুক। জাহাজীদের নিঃশ্বাস এখন তিনি শুনতে পাচ্ছেন। পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে অনুত্তম। অন্যান্য জাহাজীরা উঁকি দিয়ে আছে। ওরা আর ধৈর্য রক্ষা করতে পারছে না হয়তো। তিনি বললেন—দেয়ার ইজ সামথিং বাট..।

অনুত্তম বললে, ইয়েস, ইয়েস। দেন?

—দেন? সি ইজ এ ফাইন লেডী। মেজ-মালোম এবার সত্যি ডেকের উপর চীৎকার করে উঠলেন—ওম্যান। ওম্যান। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ডেক-চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। দূরবীনটা হাত থেকে পড়ে গেল। এখন তাই নিয়ে ঝগড়া লেগেছে জাহাজীদের ভিতর। অনুত্তম জোর কবে দূরবীনটা টেনে নিল এবং চোখের উপর সেটে দিল। কিন্তু মেজ-মালোম তখন বলছেন, সি ইজ আউট অফ সাইট।

অনুত্তম কান্নার সুরে বলে উঠল, হোয়াট?

মেজ-মালোম আর কোনো উত্তর করতে পারলেন না। সামনের একটা গীর্জাতে বুড়িমেয়েটা কখন ঢুকে গেছে। গীর্জাতে ঢং ঢং ঘণ্টা পড়তে থাকল। মেজ-মালোম ভাবলেন মেয়েমানুষটা গীর্জার ভিতর এখন ঘণ্টি বাজাচ্ছে। পানামা শহরের ঘুমন্ত মানুষগুলোকে যেন বলছে, 'এবার তোমরা ওঠ, প্রার্থনার সময় হয়ে গেছে।'

গীর্জাতে ঘণ্টাধ্বনি আর বাজছে না। ভোরের সূর্য পানামার তীরে উঠে গেছে। পাহাড় এসে নেমেছে প্রশান্ত মহাসাগরে। আজ রবিবার। পানামা শহরের মানুষগুলো ভাল পোশাক পরে এখন হয়তো রওনা হয়েছে গীর্জাতে।

বোট-ডেকে জাহাজীরা এতক্ষণ অবশ হয়ে বসেছিল। তীরের শেষ বিন্দু ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। ওরা টলতে থাকল। তারপর ডেক থেকে টলতে টলতে নেমে গেল জাহাজীরা। অবসন্ন মন এবং দেহকে নিয়ে কোনো রকমে ফোকসালে ঢুকে পড়ল।

জাহাজ থেকে কিনারার লোকগুলি ছোট একটা মোটর-বোটে নেমে গেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের মুখে যে জাহাজগুলো ক্যানেল অতিক্রম করার জন্য বসে আছে এখন সেই সব জাহাজগুলোতে গিয়ে ওরা উঠে পড়বে।

অফুরন্ত শূন্যতা নিয়ে নিচের ডেকে নেমে এল অনুত্তম। থামলো এসে

পাখিদুটোর রাতের আবাসে। রাতের অন্ধকারে পাখি দুটো ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। সে পাখিদুটোর ঠোঁটের উপর ঝুঁকে বসে পড়ল। দিনের পর দিন ধরে সমুদ্রের নীল ঢেউ গুনে এল—আশা, মেয়েমানুষ অন্ততঃ পানামার তীরে চোখে পড়বেই। কিন্তু মনটা চরম আশাহত। পরম প্রত্যাশাগুলা টুকরো টুকরো হয়ে অনেক আগেই ভেঙেগ গেছে। চড়ুই দুটো এখনও ঘুমুচ্ছে। নির্বিঘ্নে, নির্ভয়ে।

পানামা-বন্দর কেবল দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। জাহাজ চলেছে আবার ফুল-স্পীডে। তীরের রেখাগুলো ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। আবার এক মাস জল শুধু জল। আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করার সময় তবু দু-একটা প্রবাল দ্বীপ চোখে পড়েছে, মাটির গন্ধ পেয়েছে তারা কিন্তু এই সমুদ্রজগতে তাও নেই। মনে ভয়ানকভাবে মুষড়ে পড়ল অনুত্তমের।

ক্যারোবিয়ান সমুদ্রে সূর্য উঠেছে অনেক আগে। আকাশের লাল চওড়া পাড়টায় তীরের রেখার পাশে জাহাজীরা দেখল একদল পাখি উড়ে উড়ে ক্রমশঃ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে আসছে। পাখির ডানাগুলো প্রকাণ্ড। পাখিরা সমুদ্র-পাখি এবং অতিকায়।

পানামা-বন্দর থেকে কয়েকটি জাহাজ একসঙেগ ছেড়েছে বিভিন্ন বন্দরের উদ্দেশ্যে। জাহাজগুলো এখন বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন দেশের উদ্দেশে পাড়ি জমাল। পাখির দলটা সমুদ্রের উপর এসে জোড়ায় জোড়ায় ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এই জাহাজেরও পিছন নিয়েছে দুটো পাখি। জাহাজটা সমুদ্রের বুকে যে জল কেটে এসেছে সেই জল-রেখার উপর তারা বিশ্রাম নেবার জন্য বসল। সেখানে সাঁতার কাটছে, ঢেউ দিচ্ছে, লুটোপুটি খাচ্ছে আবার কখন নীল ঢেউয়ের তলায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। প্রপেলারের আবর্তে পড়ে যে মাছগুলো ডানা ভেঙেগছে ঠুকরে ঠুকরে পাখি দুটো এখন তাই খাচ্ছে। অনেক আনন্দ ওদের। অনেক সুখী ওরা। জাহাজীরা বোলিঙে ঝুকে অবার আফসোশ করতে আরম্ভ করেছে।

দুটো পাখিকে অনুত্তম অনেকক্ষণ উড়তে দেখল, ডুব দিতে দেখল, সাঁতার কাটতে দেখল। ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামছে সমুদ্রে। কোন্ অসীম থেকে এক খণ্ড মেঘ এসে হাসি-খুশী সমুদ্রকে চঞ্চল করে তুলল। ঝড়ে-পড়া ঢাউস ঘুড়ির মত পাখি দুটোও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ওরা আকাশ থেকে ঝুপ করে সমুদ্রের নিচে হারিয়ে গিয়ে চঞ্চল সমুদ্রকে আরো চঞ্চল করে তুলল। ওরা ঝড় ভালবাসে। টাইফুনে চকা-চকীর হৃদয়বৃত্তিতে প্রেমালাপে রত হয়। জলের নিচে অব আকাশের তলায় পল্টন খেয়ে বিমুগ্ধ হয়। জলের নিচ থেকে ওরা পূবের সমুদ্রে ভেসে উঠল আবার। জলের উপর হাঁসের মত সাঁতার কাটছে। সব জাহাজীরা প্রায় ভিড় করেছে গলুইতে পাখি দুটো দেখার জন্য। তীর দেখা যাচ্ছে না আর। ওরা নিঃসঙ্গ। ঝড়ের সমুদ্রে এই পাখি দুইটিই তাদের জীবনের বিচিত্র অনুভবের প্রতীক। ওরা সকলে মিলে পাখি দুটোকে নিয়ে আলাপ তুলেছে তাই।

এক সময় সারেং এসে বললেন, ব্যানার্জী কাজে যাওরে। মাইজলা-সাব আজ থাইকো তোমারে কাজ করতে কইছে।

অনুত্তম ভিড় থেকে বের হয়ে প্রশ্ন করল—কোন্ পরীতে?

—পরীতে না। ফালতু তুমি। এনজিন রুমে পাঁচ নম্বর সাবের সঙেগ কাজ করবো। দুইটো যা হয় কিছু খাইয়া জলদি যাও।

অনুত্তম এনজিন-রুমে নামার আগে আর একবার কাঠের বাকস্‌টার পাশে গিয়ে

বসেছিল। চড়ুই দুটো তখন বাচ্চা দুটোকে খাওয়াচ্ছে। সে এখানে এসে বেদনার সান্ত্বনাকে খোঁজে। বাচ্চা দুটোকে খাওয়াতে দেখে সে খুব খুশী হল। দীর্ঘ এক-মাসের সমুদ্র-যাত্রা। চড়ুই দুটোর সমৃদ্ধ পরিবারটিকে কেন্দ্র করেই একমাসের সমুদ্র-যাত্রার নিঃসঙ্গ জীবনকে অতিক্রম করতে হবে।

এনজিন-রুমের দরজায় এসে দেখল প্রায় ত্রিশ ফুট নিচে পাঁচ-নম্বর সাব বাইশ-টেবিলে কাজ করছেন। স্ট্রেপার ফাইল করছেন তিনি। অনুত্তম তিনটি সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে বাইশ -টেবিলটার পাশে দাঁড়াল। পাঁচ-নম্বর সাবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করল। বাঙ্গালী পাঁচ-নম্বর সাব অনুত্তমকে খুশী-খুশী দেখে বলল, কি ব্যাপার, খুব যে উচ্ছল মনে হচ্ছে!

অনুত্তম খুশী খুশী হয়েই জবাব দিল, আর বলবেন না স্যার। বাচ্চা দুটো চড়ুইর মতো খেতে শিখে গেছে। কি কিচির মিচির করে। কান ঝালাপালা করে দেয়।

—ও তার জন্য! ঠোঁট ওল্টালেন পাঁচ-নম্বর সাব। অনুত্তম বড্ড ছেলেমানুষ। তিনি সেজন্য হাসলেন।

আর একজন জাহাজীকে সারেং এনজিন-রুমে পাঠিয়েছেন। প্লেটগুলো না ঘষায় জং ধরেছে। লাল হয়ে উঠেছে। খড় খড় করছে পায়ের নিচে। প্লেটের উপর পা ফেলতে অসুবিধা হচ্ছে। সে জাহাজী এসে প্রথম অনুত্তমের পাশে দাঁড়াল। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, একটা বিশেষ খবর আছে।

অনুত্তম বিস্মিত হল। খবর! কিসের খবর! জাহাজে কি আবার হুলা-হুলা নাচ আরম্ভ হল। জাহাজীরা কি আবার ক্ষেপে গেছে। মাজেদ কি আবার উলঙ্গ হয়ে নাচছে! কি যে করে মাজেদ। এনারদ্দি, জমীর, জাফর ওকে উসকায়। উসকিয়ে উসকিয়ে ওর মেজাজকে বিগড়ে দেয়। কি দরকার বাপু ভাল মানুষটাকে ক্ষেপিয়ে! ক্ষেপে গেলে তো আর রক্ষে থাকে না। তখন যা খুশী তাই করে।

—কিসের খবর? অনুত্তম প্রশ্ন করল। একটা স্ট্রেপার হাতে তুলে দেখল ঠিকমত ফাইল হয়েছে কি না। আঙ্গুল দিয়ে ঘষে ঘষে দেখল। কিন্তু সেই জাহাজী তখনও চুপ করে বসে আছে। সে মনে মনে রাগ করল। —কিরে চুপ করে যে যে আছিস বড়!

খবরের বুকে রহস্য জড়াবার জন্য বললে জাহাজীটা, আছে, আছে। খবর আছে।

অনুত্তম পাঁচ নম্বরকে আর একটা ফাইল দিয়ে বলল, ঠাট্টা করছিস বুঝি? মাজেদ পাগলামী শুরু করে দেয় নি তো আবার?

জাহাজীটা হাতে ছোবড়া নিয়ে প্লেট ঘষতে বসল।

—খবরটা গোপন করছিস কেন? বল না—কিসের খবর!

সে জাহাজী প্লেটের উপরে ঝুঁকে বলল—জাহাজের পিছনে যে অ্যালবাট্রস দুটো উড়ছিল ওরা এখন এসে মাস্টে বসেছে।

অনুত্তম অবাক হয়ে বলল, তাই না কি! তাই না কি!

—হ্যাঁ মিথ্যে বলছি না। লেডী অ্যালবাট্রস তো পারলে গ্যালীর ভিতর ঢুকে পড়ে।

—লেডী অ্যালবাট্রস বুঝি কিছু খেতে চায়? কিছু মাংসের কুচি ছুঁড়ে দিলেই পারতিস।—পাঁচ-নম্বর সাবের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করল, অ্যালবাট্রস পাখি

জাহাজের পিছনে কতদিন উড়তে পারে?

—জাহাজটা যতদিন চলবে ততদিন। হাজার হাজার মাইল।

কিসের আওয়াজে ওরা তিনজনেই উপরের দিকে চোখ তুলে দিল। ওরা দেখল উপরে স্কাই-লাইটের ভিতর একটি উৎকণ্ঠিত মুখ। মাজেদ চীৎকার করে কি যেন বলছে। এনজিনের বীভৎস আওয়াজে শব্দগুলো অস্পষ্ট। শব্দগুলো আওয়াজের ভিতর ঢাকা পড়েছে। শেষ শব্দটা সিলিন্ডারের পিঠে ধাক্কা খেয়ে এনজিনের তীব্র আওয়াজের ভিতরও অনুত্তমের কানের কাছে কাছে এসে থমকে গেল—ডেড্।

ডেড্! ধক্ করে জ্বলে উঠল অনুত্তমের চোখে। নীল জলে ফসফরাস জ্বলার মতো চোখ থেকে আগুন বের হচ্ছে। সিঁড়ির রড ধরে উপরে উঠে স্কাই-লাইটের ভিতর মুখ বাড়াতেই শুনল—মেয়ে-চড়ুইটা মরেছে। ছোট চিঁড়িয়া পাখিটা ওটাকে খেয়ে ফেলেছে।

অনুত্তম কোনরকমে স্কাই-লাইটের ভিতর থেকে বোট-ডেকে উঠে এল। পা দুটো উত্তেজনায় কাঁপছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে যেন। কোনরকমে টাল সামলে আবার সে ছুটল মেজ-মালোমের কেবিনে। কিন্তু কেবিনের দরজা বন্ধ। ভিতরে তিনি নেই। নিশ্চয়ই তিনি ব্রীজে আছেন এখন। অনুত্তম একোমডেসান-ল্যাডারের পাশে ঝুঁকে দাঁড়াল। চীৎকার করে ডাকল, সেকেন্ড, সেকেন্ড—গেট-ডাউন প্লিজ। মিসেস স্পেরো: ডেড্, সোয়ালোড বাই লেডী অ্যালবাট্রস।

যত জোরে ডেকেছিল অনুত্তম তার চাইতে বেশী জোরে নেমে এসেছিল মেজ-মালোম। কেবিন থেকে বন্দুকটা হাতে নিয়ে এসেছেন তিনি। বোট-ডেকে এসে দাঁড়ালেন। বন্দুকের উপর একটা হাত ভর করে রেখেছেন। দেখলেন, অ্যালবাট্রস দুটো তখন অনেক দূরে। বন্দুকের পাল্লার বাইরে. ঢেউয়ের চড়াই-উৎরাইয়ের ভাঁজে ভাঁজে ওঠা-নামা করে দিগন্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। বন্দুক তুলে এক এক করে কয়েকটা গুলি করলেন তিনি। কিন্তু সব কটা আওয়াজই ঢেউয়ের ভিতর ডুবে গেল। মেজ-মালোম ক্ষেপে গেলেন।

মেজ-মালোম বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে শপথ করেছিলেন, লেডী অ্যালবাট্রসকে তিনি খুন করবেন। হাতের উপর বন্দুকটা চেপে গজ গজ করছেন। অনুত্তম ভাবল, জাহাজে একটা খুন-খারাপী হবে।

জাহাজীরা যে জগতটিকে নিয়ে মুগ্ধ ছিল সেখানে সে জগতটি নেই। অনুত্তম কাঠের বাক্সটার সামনে গিয়ে বসল। দেখল, তার পুরুষ-চড়ুইটা পর্যন্ত কোথায় পালিয়েছে। বাচ্চা দুটো পায়ের আওয়াজে কিচ কিচ করে উঠল। ওরা যেতে চায়। পুরুষ-চড়ুইটা থাকলে আর কিছু না হোক, বাচ্ছা দুটো বাঁচত। ওরা বড় হত। উড়তে পারত আবার ডেকে। পুরুষ-চড়ুইটা কোথায় গেল! কাঠের বাক্সটার সামনে বসে ভাবতে ভাবতে আনমনা হল সে।

কিন্তু এ-ভাবে আর কতক্ষণ বসে থাকবে সে। পাখিটাকে খুঁজতে হয়। পুরুষ-চড়ুই হয়তো এনজিন-রুমের কোন অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে। সেজন্য অনুত্তম এনজিন-রুমে নেমে গেল। তন্ন তন্ন করে খুঁজল। সমস্ত এনিজন রুমে শিস দিয়ে বেড়াল। কোথাও নেই। কোন অনুসন্ধান নিতে পারল না। ফল্কায় খুঁজছে। মেজ-মালোমের কেবিনে উঁকি দিয়ে বলে এসেছে—পুরুষ-চড়ুইটাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু মেজ-মালোম উত্তর করেন নি। বন্দুকের উপর থুতনি রেখে বাংকে বসে আছেন। মিসেস স্পেরোর মৃত্যুতে তিনি একটি মেয়ে-জগতের মৃত্যুর বেদনা অনুভব করছেন।

ফোঁকসালে ঢুকে অনুত্তম দেখল, মাজেদ, জাফর উন্মুখ। জমীর বললে, পেলি খুঁজে ?

অনুত্তম নিঃসঙ্গ জীবনটাকে বাংকে ছাড়য়ে দিয়ে বলল, না, কোথাও পেলাম না। ক্যাপ্টেন, মেজ-মিস্ত্রি সকলে আজ আফসোস করছেন। হঠাৎ অনুত্তমের সমস্ত অভিমানটা মাজেদের উপর ভেঙ্গে পড়ল। —তোরা ডেকে কাজ করিস, মেয়ে চড়ুইটার দিকে একটু নজর রাখতে পারলি না। ছিঃ ছিঃ, অসহায় দুটো পাখিকে তোদের মত সাঁই সাঁই জোয়ান জাহাজীরা থাকতে রক্ষা করতে পারলি না।.. অনুত্তম বাংকের উপর শুয়ে সকল জাহাজীদের গাল ছিল। —তোরা মরে যা। সব মরে যা। কোনো দরকার নেই তোদের মত পুরুষ-মানুষ জাহাজে থাকার।

মাজেদ, জাফর নিজেদের অপরাধী ভাবল। তারা মাথা নুয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অনুত্তমের সামনে। কোনো জবাব দিল না। অনুত্তম সেই দেখে বালিসের উপর মুখ গুঁজে ফুঁফিয়ে কাঁদল।

বিকেলে অনুত্তম ডেকের উপর পায়চারী করেছে। পাহারায় থেকেছে কখন অ্যালবাট্রস দুটো বন্দুকের পাল্লার ভিতর আসে। মেজ-মালোমও চেয়ারে বন্দুকটা হাতে নিয়ে প্রতীক্ষায় আছেন। জাহাজীরা ডেকে নামতে উঠতে পাখি দুটোর গতিবিধি লক্ষ্য রাখল। কিন্তু সমস্ত দিনমান পাখি দুটো আকাশের উপর উড়েই চলেছে। জাহাজের পিছন পিছন এখন আসছে তারা। বন্দুকের পাল্লায় ভুলেও একবার এল না।

বিকেল গড়িয়ে রাত এল ডেকে। অনুত্তম ভেবেছিল রাতে এসে অন্ততঃ পাখি দুটো মাস্টে বসবে। সমস্ত দিনের পর ডানায় যখন ক্লান্তি নামবে, রাতের অন্ধকারে যখন দৃষ্টিকে হারিয়ে ফেলবে পাখি দুটো, জাহাজের উপর নিশ্চয়ই আশ্রয় চাইবে তখন। দেখেছে—পাখি দুটো মাস্টের উপর আশ্রয় নেয় কি না। কিন্তু তারা জাহাজে আসে নি। হয়তো সমুদ্র-বুকে এখনও উড়ছে, নয়তো কিনারায় ফিরে গেছে।

সারা-রাত জেগে ভোর বেলায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল অনুত্তম। একটা দুঃস্বপ্নে সে এখন ছটফট করছে বাংকের উপর। লেডী অ্যালবাট্রসের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। লেডী অ্যালবাট্রসের কান্নায় সমস্ত চরাচর বুঝি কাঁদছে। পড়শীর মুখ জানালার পাশে। সেখানেও সে পাখিটার জন্য কান্না দেখতে পেল।

এক তীব্র আওয়াজে দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেল অনুত্তম। বাংকের উপর বসে স্বপ্নটার কথা ভেবে চোখ রগড়াল। জাহাজের গলুইতে কতকগুলো মানুষের ছুটে যাওয়ার আওয়াজ উঠছে। সিঁড়িতে এক সঙ্গে অনেকগুলো মানুষের উপরে ওঠার শব্দ হচ্ছে। ওরাও যেন ছুটছে। এমন সময় একজন জাহাজী উপরে ওঠার মুখে বলে গেল, শীঘঘীর অনুত্তম!

আর একজন জাহাজী মুখ বাড়াল। সেও উপরে ছুটছে। —পুরুষ অ্যালবাট্রসটা খুন হয়েছে।

খুন! আর একটা মৃত্যু জাহাজে! একের পর এক মৃত্যুর বিভীষিকা নেমে আসছে জাহাজ-ডেকে! অনুত্তম আর ভাবতে পারল না। সেও সিঁড়ি ধরে ডেকে উঠে গেল। গ্যালী পার হয়ে দেখল মাস্টের গুঁড়িতে মেজ-মালোম। পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে পুরুষ-অ্যালবাট্রসটা। জাহাজীরা ঘিরে দাঁড়িয়ে পাখিটার মৃত্যু দেখছে। লেডী-অ্যালবাট্রস চিঁ চিঁ করতে করতে ছুটছে ঢেউয়ের দেশ পেরিয়ে অন্য কোনো এক দেশে। আকাশের নীলিমাতে ভয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

অনুত্তম একান্ত চুপ হয়ে দাঁড়াল পাখিটার পাশে। ওর বুক চৌচির হয়ে গেছে। রক্ত ছুটছে ফিনকী দিয়ে। মাঝে মাঝে ফাঁক করে দিচ্ছে ঠোঁট দুটা। সমস্ত ডেক জুড়ে প্রায় পাখা দুটো নড়ছে। অন্য-দেশের ছাড়পত্র চাইছে। সেই সংগে এক ফোঁটা জল—জল চায়। অনুত্তম ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এল। ঠোঁটের ভিতর জল ঢেলে দিল। মনটা হুঁ হুঁ করে উঠছে।

পাখিটা বাঁচল না।

কি ভেবে অনুত্তম চেয়ে আনল বাইবেলটা। ক'জন জাহাজীকে সার করে দাঁড় করিয়ে দিল। প্রার্থনা করল। যেমন করে একজন নাবিকের মৃত-দেহ সলিল-সমাধি দেওয়া হয় ঠিক তেমনি সাগরের চিড়িয়াকে সাগরের অতলেই ডুবিয়ে দেওয়া হল। অনুত্তম দেখল আর একটা জীবন, যেখানে ছিল লেডী অ্যালবাট্রসের মত মেয়েজাত, যাদের বিচরণ ছিল সমুদ্র আর আকাশ, দুর্যোগ রাতে নীল ঢেউ ছিল যাদের পোতাশ্রয়, তেমনি একটি পৃথিবীর মানুষ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জন্মগ্রহণ করা জীব ধীরে ধীরে নীল সাগরের তলায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

লেডী-অ্যালবাট্রসের কান্না তখনও থামে নি। সে আবার জাহাজের দিকেই ফিরে আসছে। বিশ্ব-চরাচর জুড়ে সে তার কান্নাকে ছড়িয়ে দিল। সাগরকে সাক্ষী রাখল। পুরুষ-অ্যালবাট্রসটা এখন যে সমুদ্রের উপর ভেসে আছে সেখানে গিয়ে বসল। তার নোনা কান্নার দু-ফোঁটা চোখের জলে সাগরের জলকে আরো গভীর করে দিয়ে শেষে আকাশের নিচে উড়ে চলল।

পাখিটা জাহাজের পিছন নিয়েছে ফের।

ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সব দেখতে দেখতে আজ অনুত্তমের মনে পড়ল মল্লিদকে। নোনা-জলের অতলে সে হয়তো সম্পূর্ণই হারিয়ে গেছে। ওর বিবির কবরের পাশে আজও হয়ত চেরাগটা জ্বালছে কেউ। নুয়ে নুয়ে ডেক পার হবার সময় হৃদয়ের গভীরে বিশ্ব-চরাচরের অদ্ভুত এক কান্নাকে উপলব্ধি করে সে টস টস করে ডেকের উপর চোখের জল ফেলল। সমস্ত সমুদ্রটা পড়শী মত হয়ে চোখের উপর ভাসল। গভীর আত্মোপলব্ধিতে সে চোখ বুজল এবার।

নীল সমুদ্র।

নীল ঢেউ।

নীল আকাশ।

অনেকগুলো নীল মৃত্যু দুঃসহ শূন্যতা এনে দিয়েছে জাহাজ-ডেকে।

নীরস ডেক আর একটা নীল মৃত্যুর অপেক্ষায় হাহাকারে করছে। লেডী-অ্যালবাট্রস খুন হবে, ফিনকী দিয়ে নীল রক্ত ছুটবে, ডেক ভিজবে। মেজ-মালোম গজগজ করছেন, গড়গড় করছেন—লেডী-অ্যালবাট্রস মেয়ে-চড়ুইটাকে খুন করেছে, খুনের আসামী এখনও জাহাজে ভিড়ছে না—সমুদ্রের নীল অন্ধকারে আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু মেজ-মালোমের নজর এড়ানো কষ্ট। অনেক ঢেউ পার হয়ে তার দৃষ্টি —তার নজর। প্রপেলারটা যে জল কেটে এসেছে তার উপর পাখিটা বসেছে। যে ছোট ছোট গাছগুলো পাখার আঘাত সারছে পাখিটা ডুবে ডুবে তাই খাচ্ছে।

দিনের পর দিন মেজ-মালোম বোট-ডেকে পায়চারী করলেন বন্দুকটা হাতে নিয়ে। ব্রীজে পায়চারি করার সময় নজর রেখেছেন দূরে। কোনদিন দেখেছেন পাখিটা আকাশে উড়ে নীলিমাতে হারিয়ে যাচ্ছে, আবার কোনোদিন দেখেছেন সেই নীলিমা থেকেই সে আত্মপ্রকাশ করছে।

কতদিন লেডী-অ্যালবাট্রস জাহাজকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে উড়ল। কত ঝড়ের-রাতে পাখিটার কান্না তিনি শুনতে পেয়েছেন। চিঁ-হি, চিঁ-হি করে কাঁদছে। ঝড়ের দুরন্ত ঘূর্ণিতেও কান্না থামে নি ওর। প্রতিদিন ভোরে অনুত্তম গলুইতে উঠে বেঞ্চিতে বসত। মেজ-মালোমের মত সেও দেখতে পেত পাখিটা জাহাজের পিছনে উড়ে উড়ে আসছে। কিন্তু এ-ভাবে সে আর কত দিন উড়বে! হয়তো সে জানে জাহাজ একদিন তাকে তীরে পেঁৗছে দেবে। তার আগে যদি মেজ তার বুক চৌচির করে রক্তে আবার ডেক ভেজায়! বেঞ্চিতে বসেই অনুত্তম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল, লেডী-অ্যালবাট্রস যেন বন্দুকের পাল্লার ভিতর উড়তে উড়তে চলে না আসে। কোন-রকমে আর কিছুদিন সমুদ্রে বিচরণ করতে করতে, কিনারায় যেন ভীড়ে যায়।

অনুত্তম এই বেঞ্চিতে বসেই ভাবত দীর্ঘ একটানা সমুদ্র-যাত্রার দিন-রাত্রির নীল রঙগুলো শেষ হবে কি করে। ভাবতে তার আরো আশ্চর্য লাগে দিন-রাত্রির নীল রঙগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে কি করে! ভোরে উঠে এই বেঞ্চিতে বসা—লেডী-অ্যালবাট্রসের সমুদ্র-বিচরণ দেখা, সমুদ্র-গান শোনা এনজিন-রুমের ফালতুর কাজ, দুবেলা দুমুঠো আহার, বিকেলে আবার সমুদ্র-দর্শন, সমুদ্র-পাখির কান্না শোনা। রাতেও সে কান্না শুনতে পায়। গভীর রাতে পাখিটা শুধু কাঁদে না। গভীর রাতে সমুদ্র-গানের সঙ্গে সে কান্নার আওয়াজ মিশে থাকে না।

গভীর রাতে সে ডেকে উঠে দেখল সোনালী চাঁদ রুপালী রাজ্য সৃষ্টি করেছে। সমুদ্র-পাখি সে রাজ্যে উড়ছে না যেন। ডেক-জাহাজীরা ঘুমিয়ে পড়েছে। মেজ-মালোম আটটা-বারটা পরী শেষ করে কেবিনে পড়ে ঘুমুচ্ছেন। দু উইংসের দুটো আলো জাহাজকে সমুদ্রের উপর স্পষ্ট করে রেখেছে।

অনুত্তম ভাবল, এ সময়ে লেডী-অ্যালবাট্রস এসে যদি জাহাজে আশ্রয় নিত, গলুইতে এসে যদি পাখা ছড়িয়ে বসত। ওর ইচ্ছা হল—মেয়ে-চড়ুইর মত গল্প গলুইতে আবার জমে উঠুক। জাহাজীরা বসুক গোল হয়ে। চড়ুইর জীবনকে লেডী-অ্যালবট্রসের ভিতর খুঁজে পাক। তারপর ভোর রাতে মেজ-মালোমের অলক্ষ্যে সমুদ্র দিগন্ত উড়ে যাক পাখিটা। সমুদ্রের অসীমে হারিয়ে গিয়ে আবার আবার তার পুরুষ-অ্যালবাট্রসের জন্য কান্না জেগে উঠুক। ভেবে, অনুত্তম গ্যালী পার হয়ে টুইন-ডেকে নামল। সুখানী নেমে আসছেন বোট-ডেক থেকে। চায়ের একটা মগ হাতে। সুখানী হয়তো এখন প্রশ্ন করবে, তুমি এখন ডেকে ব্যানার্জী!

হ্যাঁ ডেকেই আছি। ফোঁকসালে আর ভাল লাগছে না জবাব দেবে, ভাবল অনুত্তম। কিন্তু সুখানী এদিকে না এসে বোট-ডেক থেকে নেমে অফিসার-গ্যালীতে ঢুকে গেল। সেখানে আগুন জিয়ানো আছে। চা গরম হবে।

অনুত্তম ডেকের উপর হেঁটে এসে সোনালী চাঁদকে দেখল। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। এক অফুরন্ত নীল বিস্মৃতির ভিতর রুপালী রাজ্যকে অনুভব করতে চাইল। লেডী-অ্যালবাট্রস রুপালী রাজ্যের অসীমে, ঢেউগুলোর আবর্ত-অন্ধকারে উত্তাপ পাওয়ার জন্য হয়ত জলের ফসফরাসে ঠোকরাচ্ছে এখন। ঢেউয়ের মাথায় চুমকী বসানো নীল-রাত্রিকে শাপ-শাপান্ত করছে।

সোনালী চাঁদ রহস্য ছড়িয়ে রেখেছে বিশ্ব-চরাচরে। নীল আকাশ। দুঃসহ আকাশ। হাজার নক্ষত্রের রাত আকাশ। লেডী-অ্যালবাট্রসের কান্নার উত্তাপে সে রাত-গুলো আর কত গরম হবে। লেডী-অ্যালবাট্রসের হিমেল স্পর্শের বা সে আকাশ-গুলোতে কতটা বরফ নেমে আসবে। সমুদ্র-পাখির কান্না সেরে লোককে কতটুকু

আর বেদনার কথা বলবে! কিন্তু অনন্তম জানে তার মনের সৌরলোকে সে বেদনা অসীম—অপার। হাজার নক্ষত্র-রাতের চেয়ে তার এই জাহাজের রাত, পাখিটার কান্না, তিন তিনটি মৃত্যু অনেক বড় সত্য জীবনে। সৌরলোকের কাছে সে যত ক্ষুদ্র হোক, আকাশের বেদনার কাছে সে যত ক্ষীণ হোক, জাহাজ-ডেকে সে কান্না একটি মানুষেরই কান্না।

সৌরলোকের এই নিদারুণ সুখ-দুঃখের ভিতর সহসা অনন্তম আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে আনার সময় দেখল, লেডী-অ্যালবাট্রস মাস্টের মাথার উপর। গভীর রাতে সেই জন্যই কান্না শুনতে পায় নি তার। প্রতিদিন রাতে কখন সব ডেক-জাহাজীরা ঘুমিয়ে পড়েছে, যখন মেজ-মালোম পরী শেষ করে শেষ-বারের মত পাখিটাকে অনুসন্ধান করে কেবিনে ঢুকে গেছেন তখন হয়তো সে এসে মাস্টে আশ্রয় নিয়ে রাত যাপন করেছে। হয়তো ভোর রাতে আবার সমুদ্রে নেমে গেছে।

সে মাস্টের নিচে দাঁড়িয়ে দেখল পাখিটা নির্বিঘ্নে বসে আছে। বুঝি-বা ঘুমুচ্ছে। হয়তো ভোর-রাতে জাগবে। ভোর-রাতে উড়বে। কোনদিন যদি সেই রাতের শেষে ঘুম না ভাঙে, মেজ-মালোম বোট-ডেক ধরে হামাগুড়ি দিয়ে চলবে। তারপর হয়তো একটি শব্দ। আর একটি কান্না। জাহাজ-ডেকটা শেষবারের মত রক্ত এবং কান্নার দুঃখে ব্যথিত হবে। বিষণ্ণ হবে। অনন্তম আস্তে আস্তে মাস্টের গুঁড়িতে বসে পড়ল। আর সে ডেকটাকে বিষণ্ণ হতে দেবে না। মনে মনে বলল, তুমি ঘুমোও আমি পাহারায় থাকি।

সে হাঁটুতে মুখ গুঁজে মাস্টের নিচে বসে থাকল।.. পাখিটা কতকাল থেকে উড়ছে। ডানার পালকগুলোতে পর্যন্ত ক্লান্তি নেমেছে। স্নিগ্ধ নীল চোখ দুটোতে ওর ঘুম। গভীর ঘুম।

ঠান্ডা হাওয়া সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। অনন্তমের শীত শীত করতে লাগল। তবু হাঁটুর উপরই মুখ গুঁজে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে জানত না—যদি না পড়শীকে স্বপ্নে দেখে ঘুম ভাঙত। কি সব আজগুবি স্বপ্ন! একটি বিদেশী মেয়ের মুখ, চোখ তার নীল, গোলাপী রঙের দেহ অথচ হুবহু পড়শীর মত। তার নাকি বাচ্চা হবে। অন্য একজন অত্যন্ত অপরিচিতা বিদেশী মেয়ে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বলছে, আপনি সৌভাগ্যবান, পড়শী পুরুষ সন্তান প্রসব করেছে। সে যেন দরজার গোড়ায় পায়চারী করতে করতে এতক্ষণ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল—এখন একটি কান্না শুনে ভেবেছে পড়শী মা হল।

কিন্তু বিদেশিনী খাঁচায় করে শেষ পর্যন্ত বাচ্চাটা বের করে দিল। পড়শীর সন্তান খাঁচার ভিতর নড়ছে না। বিদেশিনী অনন্তমের হাতে খাঁচাটা দিয়ে বলল, ভাগ্য মন্দ আপনার। পড়শীর সন্তান মারা গেছে। সমুদ্রের জলে সে এবার খাঁচাটা ডুবিয়ে দিল। তখনই সে স্বপ্ন থেকে জেগেছে। পুব দিগন্তে চেয়ে দেখল শেষ রাতের আলোটুকুই আকাশের কিনারাতে ধূসর হয়ে উঠেছে। ভোরের রং চড়ছে। চড়ুইর বাচ্চা দুটো মরে গেছে কবে! সে ভাবল এবার, জাহাজে তিনটি মৃত্যু হয় নি। বাচ্চা দুটোর মৃত্যুকেও মৃত্যু বলে ভাবল। ঠিক সেই সময় হাত দুটো উপরের দিকে তুলে হুস করল। লেডী-অ্যালবাট্রসকে আকাশে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ফোঁকসালে নেমে শিস দিল দুটো। কিন্তু তখনও সে সময় সময় পুরুষ-চড়াইকে জাহাজের অলিগুলিতে খুঁজছে। এই অনুসন্ধান তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

দিন আসে জাহাজে। রাতও আসে। তবু অনন্তমের মনে হয় এ-দিন বুঝি

আর শেষ হবে না। এ-রাত শেষে জাহাজ ডেকে ভোর বুঝি আর আসবে না।

সবই হয়। দিনের পর দিন প্রপেলার যত পাক খাচ্ছে, জাহাজীদের মন বন্দরের প্রত্যাশায় তত বেশী উন্মুখ হচ্ছে।

অনুত্তমকে চুপ করে গলুইর বোঁণ্ডতে বসে থাকতে দেখে মাজেদ তাকে আশার কথা শোনাল—বন্দরে কার্নিভেল আছে। অনুত্তম আর মাজেদ একসঙ্গে যাবে। তামাসা দেখবে। কোম্পানীর ঘরে পাঁচশ টাকা আছে। না হয় সবটাই তুলবে।

অনুত্তম উত্তর করেছিল তখন, হয়তো শুনব জাহাজ নিউ-প্লাইমাউথ যাবে না, অক্ল্যাণ্ডে যাবে। আবার দিন গুনব বসে। তার চেয়ে বরং দিন না গুনে বসে থাকি—যেদিন জাহাজ মর্জিমত ভিড়বে সেদিনই নামব।

সে হিসেব করে দেখলো আরো প্রায় দু-হাজার মাইলের মত সমুদ্রের জল ভাঙ্গতে হবে প্রপেলারটাকে। আরো প্রায় ন-রাত্রি মাস্টের নিচে বসে পাহারা দিয়ে পাখিটার রাত্রি-যাপনে সাহায্য করতে হবে। তারপর বন্দরে মেজ যখন মেয়ে-মানুষ পাবে তখন চড়ুই-পাখির দুঃখটা ভুলে নিজের সেই ভাড়া-করা স্ত্রী-জগত নিয়ে ডুবে থাকবে। লেডী-অ্যালবাট্রসকে খুন করার তখন কোনো প্রশ্নই থাকবে না।

মাজেদ অনুত্তমের পাশে বসে আগামী বন্দর সম্বন্ধে ছবি আঁকছে। নিউ প্লাইমাউথ বন্দর, পাহাড়ী বন্দর সমুদ্রের তীর থেকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। চড়াই-উৎরাই পথ। পথের দু-পাশে আপেল গাছ। গাছে গাছে আপেল ঝুলছে। আপেল সংগ্রহ করছে মেয়ে-পুরুষ। মাজেদ এমন সব ভাবল বসে বসে।

মেয়ে-পুরুষদের অনেকগুলো ছবি অনেক-রকমভাবে অনুত্তমের মনের দরজায় এখন উঁকি মারছে। মেজ'র জন্য যে মেয়েটা বন্দরে অপেক্ষা করবে সে না জানি দেখতে কেমন। পড়শীর মত দেখতে নিশ্চয়ই হবে না। যদি সে কোনো মেয়েকে খুঁজে পায় ঠিক পড়শীর মত দেখতে তবে সেও মাজেদের মত কোম্পানীর ঘর থেকে সব টাকা তুলবে। একটি পরিপুষ্ট হিসেবে ওর মন আরো অনেক দূর এগিয়ে গেল। সেখানে পড়শীর দেহকে সে আরো খোলাখুলি ভাবে দেখল।

প্রশান্ত মহাসাগরের দিনগুলো উজ্জ্বল দিন। কয়েকদিন থেকে রাতগুলোও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সমুদ্রে ঝড় নেই, কুয়াশা নেই। আকাশে মেঘ জমছে না। দিগন্ত-বেলায় সমুদ্র কচ্ছপের পিঠের মত বেঁকে গেছে। সেখানে দু-এক খণ্ড মেঘ জমে, কিন্তু আঁধার রাতে তারা পৃথিবীর অন্য আধারে আশ্রয় নেয়। সে অনেক দিন সমুদ্রে তিমি মাছ দেখার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। কিন্তু কোথাও আজ পর্যন্ত তিমি মাছ জলের উপর ভেসে উঠল না। তবে এখন আর আক্ষেপ নেই। লেডী-অ্যালবাট্রস সমুদ্রের উপর আর একটি মিষ্টি জগত সৃষ্টি করেছে। অনুত্তম গলুইর বুকে বোঁণ্ডতে বসে সে জগতকে নিয়ে এখন বিমুগ্ধ থাকে।

সে জাহাজ-ডেকে রাত্রিগুলোকে পাহারা দিত সন্তর্পণে। কোনো কোনো দিন গভীর রাতে ডেকের উপর পায়ের শব্দ শুনে সে চমকে উঠত। মেজ-মালোম বন্দুক নিয়ে বোট-ডেকে হামাগুঁড়ি দিচ্ছেন না তো! চোখ মেলে সে জাগত। জাফর বোট-ডেক দিয়ে নামছে। করোয়ার্ড-পিকে মিডল্‌ওয়াচের পরী শেষ করে গলুইতে ফিরছে। ওরই পায়ের শব্দ। জাফরকে ডেকের উপর দেখেই সে আড়াল করে রাখত নিজেকে। উইনচ-ম্যাসিনের পাশে মাথাটা নুইয়ে দিত। তারপর মাস্টের উপর চেয়ে যখন দেখতে পেত পাখিটা নির্বিঘ্নে ঘুমচ্ছে, তখন আবার দু হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকত। যখন পূবের আকাশটা পরিষ্কার হতে আরম্ভ করত অথবা সোনালী চাঁদের

রূপটাকে ফ্যাকাশে হতে দেখত তখন সে হুম করত হাত তুলে। পাখিটাকে তাড়িয়ে রাত্রির হিসেব করত, আর ক'রাত্রি, আর কতদিন!

অনুত্তম মাঝে মাঝে বোঁগুতে বসে ভাবত মেজ কি মেয়ে-চড়ুই দুটোকে তার চেয়ে বেশী ভালবেসেছিল! মেজ কি মেয়ে-চড়ুইটার ঠোঁট দুটোয় বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের কোন মিষ্টি-ঠোঁটের রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন! চড়ুইটাকে নিয়ে সকল জাহাজীরা এখনও সে জগতকে ভেংগে নতুন বন্দরের প্রতীক্ষায় আছে। তিনিও সেই বন্দরের প্রতীক্ষায় থাকুন না। সে গলুই থেকে দেখল মেজ ব্রীজ থেকে দূরবীণ দিয়ে লেডী-অ্যালবাট্রসকে দেখছে। দক্ষিণ-সমুদ্রে পাখিটা বিচরণ করছে। মেজ উদ্বিগ্ন। অনুত্তমকে দুটো রূপই বিস্মিত করল।

আজকাল এনজিন রুমে অনেক কাজ অনুত্তমের। ফিল্টারের পাইপ বদলানো, এভাপরেটারের তামার পাইপ স্ক্রেপ করা, টেস্ট-টিউবে বয়লার-ওয়াটার রাখা, পাঁচ-নম্বর সাবকে হাতের কাজ এগিয়ে দেওয়া অনেকগুলো কাজের হিসাব টেনে সে এনজিন-রুমে নেমে গেল। নেমে যাওয়ার আগে দেখেছিল লেডী-অ্যালবাট্রস জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। মেজ-মালোম নজর রেখেছেন তার উপর। মেজর উপর মনটা বিদ্রোহ করতে চাইল। ভাবল, বিকেল বেলায় মেজর সংগে পাখিটা সম্বন্ধে মোকাবেলা করবে। বলবে, মেয়ে চড়ুইটার জন্য তোমার যে এত দরদ ছিল আমার দরদ তার চাইতে কোনো অংশেই কম ছিল না। মিসেস মরেছে বলে তুমি যতটা আঘাত পেয়েছ আমি তার চেয়ে অনেক বেশী আঘাত পেয়েছি। সে আঘাত আমি ভুলেছি, তুমিও ভুলে যাও। এস না আমরা সব ভুলে লেডী-অ্যালবাট্রসকে আবার ভালবাসতে শুরু করি। তুমি আর আমি আবার একটা স্বতন্ত্র জগৎ সৃষ্টি করি জাহাজে।

মেজ-মালোম ব্রীজে পায়চারি করছেন। পাখিটা ক্রমশঃ উড়ে আসছে এদিকে। দুশ্চিন্তায় অনুত্তম খুব অন্যমনস্কভাবে ফিল্টারের পাইপ বদলাল আজ। বয়লার-কক থেকে টিউবে গরম জল রাখল।

এভাপরেটর খোলা হয়েছে। দরজার সংগে তামার কয়েল করা পাইপ আঁটা। পাইপগুলোয় নুনে ভরা। অনুত্তম বসে বসে সেগুলো স্ক্রেপ করতে থাকল।

স্কাই-লাইটের ভিতর আজ আবার একটি মুখ। মুখে দুশ্চিন্তার রেখা স্পষ্ট। উৎকণ্ঠিত সে। মেয়ে চড়ুইটার মৃত্যুর দিনে এমনি মুখ সে স্কাইলাইটের ফাঁকে উঁকি মারতে দেখেছিল।

মাজেদ সিঁড়ি ধরে তরতর করে নেমে আসছে। কয়েলকরা পাইপ থেকে চোখ তুলে অনুত্তম এখন কোন দুর্ঘটনার প্রত্যাশা করছে। ওর হৃৎপিন্ড কয়েল করতে থাকল। মাজেদ এসে ওর সামনে দাঁড়িয়েছে তৎক্ষণে। কিন্তু উভয়ে নির্বাক। মাজেদ খুব হাঁপাচ্ছে। জোরে শ্বাস ফেলছে সে। মুখ খুলে শ্বাস ফেলল। বলল, তাড়াতাড়ি উপরে চল। লেডী-অ্যালবাট্রসকে খুন করতে যাচ্ছে মেজ-মালোম।

অনুত্তম ঢোক গিয়ে বলল, পাখিটা জাহাজে ফিরে এল আবার!

মাজেদ আর অনুত্তম সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। প্রথম সিঁড়িটা অতিক্রম করে কশপের ঘর পার হবার সময় মাজেদ বলল—দু নম্বর মাস্টে এসে পাখিটা বসেছে। মেজ-মালোম ব্রীজের উপর হামাগুড়ি দিচ্ছেন।

খাড়া সিঁড়ির দু রড ধরে উঠছে দুজন জাহাজী। ওরা উন্মাদের মত ছুটছে।

জাহাজী দুজন সিঁড়ি থেকে স্কাই-লাইটের ভিতর মুখ বাড়াল। আরো উপরে উঠবে তারা। বোট-ডেকে উঠবে। আরো সিঁড়ি ভাংগবে।

মেজ-মালোম এখনও ক্রলীং করছেন ব্রীজে। খুব সন্তর্পণে। মাস্ট থেকে পাখিটা যেন দেখতে না পায়। তিনি মাথা এবং বন্দুকের নল আড়াল করে এগোচ্ছেন। ট্রিগারের উপর আঙ্গুলটা কাঁপছে।

মাজেদ স্কাই-লাইটের ভিতর দিয়ে বোট-ডেকে উঠে গেল। অনুত্তম ওঠার জন্যে শেষ তিনটি ধাপ অতিক্রম করবে- এমন সময় সে দেখল মেজ ফায়ারিং করবার জন্য বন্দুক তুলে ধরেছেন। ট্রিগারের বুকে একটা আঙ্গুল চেপে বসছে।

লেডী-অ্যালবাট্রস খুন হচ্ছে দেখে অনুত্তম শিউরে উঠল। শিরায়-উপশিরায়, ধমনীতে ধমনীতে রক্তের কালো কালো দাগ পড়ছে। বুকটা শুকিয়ে গেল। সে সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে যেন ডেক, বোট-ডেক, ব্রীজ সব। মেজ-মালোমের মুখ মাকড়সার জালের মত হয়ে গেছে। অনুত্তম চীৎকার করে উঠল, সেকেণ্ড! মুহূর্তের ভিতর মনে হল সে অন্ধ হয়ে গেছে। তিনটি ধাপের শেষ ধাপে ওর হাত ঠেকছে না। পায়ের নিচে কোনো অবলম্বন নেই। সে কি শেষ পর্যন্ত পাখি হয়ে গেল! সে কি দুর্যোগ-রাতে নীল আকাশে নিঃসঙ্গী-কান্নার উত্তাপ পাওয়ার জন্য লেডী-অ্যালবাট্রসের প্রেতাত্মার সঙ্গে উড়ছে!

মেজ-মালোম বন্দুক তুলে ফায়ারিং করেছিলেন। হাত কেঁপেছিল। ট্রিগারের উপর আঙ্গুল কেঁপেছিল। অনুত্তমের মুখে আর্ত চীৎকার শুনেছিলেন, সেকেণ্ড! লেডী-অ্যালবাট্রসের পাশ কেটে গুলিটা বের হয়ে গেছে। লেডী-অ্যালবাট্রস উড়ছে না। নড়ছে না। কিন্তু মাজেদ স্কাই-লাইটে মাথা কুটছে। মেজ মালোম বন্দুক ফেলে ছুটছেন নিচে।

অনুত্তমের রক্তাক্ত দেহটা চিত হয়ে সিলেণ্ডারের উপর পড়েছিল। মেজ-মালোম অনুত্তমকে তুলে কাঁধে ফেললেন। বললেন, হোয়াই, হোয়াই। আড়ষ্ট-কণ্ঠে আর কিছু তিনি প্রকাশ করতে পারলেন না।

ওর চোখ দুটো স্নিগ্ধ আজ। মৃত্যুর সহজ দুটো ঠোঁট আর কিছুক্ষণ পর হয়তো চুমু খাবে। সে চোখ বুজে মেজ-মালোমের মুখ সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। মাকড়সার জালের মত সে মুখ হিজি-বিজি নয়। সে মুখে অনুত্তম বিশ্ব চরাচরকে দেখতে পেল। সেখানে মা, বাবা, পড়শী, দুটো চড়াই সকলে যেন ভিড় করেছে। এই আস্তে আস্তে এবং চুপি চুপি যেন বলল অনুত্তম, সি ইজ দি ওনলি ওমান ইন দি সিপ, য়্যাণ্ড স্টিল টু ডেজ টু হ্যাভ দি পোর্ট, সেকেণ্ড!

ফেরজাহাজ থামল সমুদ্রে। ফের জাহাজীরা গোল হয়ে দাঁড়াল। মেজ-মালোম আবৃত্তি করলেন। তিনি সামগানের মত উচ্চারণ করলেন কথাগুলো। হে প্রভু, তোমার এই শান্ত পারাবারে খুদে নাবিকটিকে আশ্রয় দাও। মেজ-মালোম বাইবেল পাঠ করতে গিয়ে খুব ভেঙ্গে পড়েছেন। মেজ-মিস্ত্রি একটা সাদা চাদর দিয়ে অনুত্তমের শরীরটা ঢেকে দিলেন। হরিদাস সেন পাশে বসে রয়েছে। একমাত্র মাজেদ আলী বুক চাপড়ে পাগলের মত কাঁদছে। সারেং কোরাণ শরিফ পাঠ করছেন। ক্যাপ্টেন শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি স্থির। নিষ্পলক।

অনুত্তমকে সলিল সমাধি দেওয়ার পর ওরা সকলে যখন সমুদ্রের জল শরীরে ছিটিয়ে আকাশ দেখছিল সে সময় মেজ-মালোম দেখলেন, লেডী-অ্যালবাট্রস মাস্তুলের ডগায় বসে। বুকের নিচে পুরুষ চড়াইটা। পুরুষ চড়াইটা এবং লেডী-অ্যালবাট্রসের চোখে আজ বন্দর জাহাজের মত নির্ভয়ের দৃষ্টি।

# গম্বুজে হাতের স্পর্শ

এক

ওরা জাহাজের মুখ লাইট-হাউসের বাঁদিকে ঘুরিয়ে দিল। এখন সূর্য মাথার ওপর। আর জাহাজের চারপাশে ছোট ছোট পাহাড়ী সব দ্বীপ, কোনটা উটের মতো আবার কোনটা প্রাচীন জন্তুর মতো মুখ হাঁ করে সমুদ্রের ওপর ভেসে রয়েছে। কোন দ্বীপকে দেখে মনে হয়, ছাতা মাথায় দিয়ে কোন মানবী, একেবারে উলঙ্গ হয়ে আছে সমুদ্রের বুকে। বিচিত্র এইসব দ্বীপ, ছোট ছোট। মনে হয় খেলনা মাফিক। দ্বীপের পাশ কেটে কেটে জাহাজটা বন্দরের দিকে এগুচ্ছে। জাহাজীরা, যাদের হাতে কাজ নেই—যারা আর ওয়াচে নামবে না, কারণ জাহাজ বন্দর ধরছে বলে, ওয়াচ যাদের ভেঙে দেওয়া হয়েছে তারা রেলিঙে ঝুঁকে এইসব খেলনার মতো পুতুলগুলো নিয়ে নানা রকমের রসিকতা করছিল।

পাথরের মানবীর মাথায় ছাতা, ঝড় বৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার মতো জাহাজীরা সেই মানবীর পাশ কাটিয়ে যেতেই সবাই বলল, দ্যাখ দ্যাখ, এই দ্বীপের পাহাড়টা কেমন একটা মেয়েমানুষের মতো হয়ে আছে। কেউ কেউ বলল, জলে নেমে যাব নাকি শালা! চুমু খেয়ে আসব।

কেউ [illegible] এতটা জল ভেঙে না হয় ওঠা যাবে দ্বীপে, কিন্তু ওর শরীর বেয়ে কাঁধে চড়ে বসতে শালা তোমার কোমর ভেঙে যাবে।

পুলক শুধু কিছু বলল না। যতক্ষণ জাহাজটা পাশ দিয়ে গেল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। বন্দর থেকে বেশিদূর নয়। ডানদিকে তাকালে লাইট হাউস। এই লাইট হাউস রাতে জাহাজের উদ্দেশ্যে আলো ফেলে এবং নানা রকমের বয়া বাঁধা আছে, বয়ার আলোগুলো প্রায় মালার মতো এই সব দ্বীপের চারপাশ বেষ্টন করে আছে। কারণ দ্বীপের নিচে পাহাড়, বস্তুত অতল সমুদ্র থেকে এইসব পাহাড় সমুদ্রের ওপর অগ্রভাগ ভাসিয়ে কেমন দুষ্টু বালকের মতো ডুব দিয়ে আছে। জাহাজের কাপ্তেনকে পাইলটের সাহায্যে সন্তর্পণে জাহাজ চালিয়ে নিতে হয়। পাইলটের প্রতিটি পাহাড়ের অগ্রভাগ চেনা। তাই কাপ্তেনের পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হয় না জাহাজ চালিয়ে নেওয়া, বন্দর থেকে পাইলট উঠে এলে তবে [illegible] রক্ষা।

উলঙ্গ মানবীর মতো যে পাহাড়টা জলের ওপর ভেসে রয়েছে ওর নাম ভিভাইন লেডি। ছুটির দিনে, অথবা রবিবারের বিকেলে, যদি সমুদ্রে ঢেউ অথবা ঝড় না থাকে, তীর থেকে এইসব পাহাড়ে ছোট ছোট স্কীপে অনেকে চলে আসে। ছোট ছোট ফার্ন জাতীয় গাছ, ওপরে নীল আকাশ, নিচে নীল সমুদ্র। এবং এমন উদার আকাশের নিচে বসে বড় ইচ্ছা করে দু-হাতে হাত নিয়ে অথবা প্রিয়তমের মুখ দেখতে দেখতে এইসব নির্জন নিরিবিলি পাহাড়ে সময় কাটিয়ে দিতে। যারা আসে তারা প্রায় যুবক যুবতী। এখানে এলে সবাই সাদা রঙের স্কার্ট পরে আসে। একটা সংস্কার আছে এ দেশের মানুষের। এখানে খৃষ্টের জন্মদিন পালনের সময় কেউ অন্য রঙের পোশাক পরে না। এইসব ছোট ছোট দ্বীপ শুধু প্রেম ভালবাসার জন্য। প্রেম ভালবাসা মানেই বিশুদ্ধ একটা ব্যাপার এবং সাদা রঙ তার প্রতীক।

এত সব, নতুন জাহাজীরা জানবে কি করে। সব চেয়ে যে প্রাচীন নাবিক

জাহাজী ইমাদুল্লা, সে এসব বলছিল। নতুন জাহাজীরা নিবিষ্ট মনে শুনছিল সব। ওরা ক্রমে নানা রকম গল্প-গাথার ভিতরে দেখল, বন্দরে জাহাজ ঢুকে যাচ্ছে এখন আর সেই সব পাথরের পাহাড় দেখা যাচ্ছে না। কারণ বড় একটা পাহাড়, নাম ওর লায়ন রক, সব এখন ঢেকে দিয়েছে।

পুলক কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। অন্যান্য জাহাজীরা যখন সেই মূর্তি দেখে নানা রকমের রসিকতা করছিল, অথবা খিস্তি খেউড় তখন সে চুপচাপ সেই আশ্চর্য পাহাড়ের অগ্রভাগ নিবিষ্ট মনে দেখেছে। প্রকৃতি কি বিস্ময়করভাবে এই সমুদ্রের ওপর একটা নীল রঙের পাথর দিয়ে এক যুবতীকে এঁকে রেখেছে। বিরাট এই যুবতীর শরীর কি মসৃণ মনে হয়েছে! স্বর্গীয় সুষমা যেন মুখে। দূর থেকে চোখ মুখ স্পষ্ট নয় খুব। আদৌ চোখ মুখ আছে কিনা এবং দূর থেকে সেই মানবী যে নীল রঙ গায়ে মেখে জাহাজীদের উদ্‌ভ্রান্ত করে দিচ্ছিল তা কতটা নীল, অথবা কাছে গেলে আদৌ মসৃণ কিনা ত্বক, এবং চোখের মণি কালো কিনা, যা দূর থেকে পাহাড়টাকে যতটা যুবতী মনে হয় কাছে গেলে তার কতটা ঠিক ঠিক শরীর নিয়ে বেঁচে আছে জানার জন্য সে এ সময় ইমাদুল্লাকে খুঁজল। কারণ সে ইমাদুল্লাকে ওদের সামনে কোন প্রশ্ন করে নি। প্রশ্ন করলেই বলত, আবার শালা পুলক ক্ষেপে গেছে।

সে নিরিবিলি কোন জায়গায় খুঁজছিল ইমাদুল্লাকে। ইমাদুল্লা এই বন্দরে এবার নিয়ে সাতবার এসেছে। ইমাদুল্লা এ বন্দরে একবার প্রায় এক নাগাড়ে অনেক দিন ছিল। স্ট্রাইক জাহাজীদের এবং সরফাই হবে জাহাজে, সরফাই হলে দেখা গেল জাহাজের বয়লার বসে গেছে। বয়লার মেরামত এবং অন্যান্য কাজ সারতে সারতে জাহাজটা এক নাগাড়ে অনেক দিন কাটিয়ে দিল। তখন শীতকাল ছিল না। গ্রীষ্মকাল, আকাশ পরিষ্কার, আপেলের বাগানে মরশুম লেগেছে, চারপাশে যত সব গাছ-গাছালি আছে সবার ডালে ডালে পাতায় পাতায় কি সুষমা! পাহাড়ের নিচে যেসব পথ আছে, সে পথে কত হরেক রকমের দোকানি নানারকমের ফুল নিয়ে বসে থাকত। এখন শীতকাল, কি তীক্ষ্ম শীত, হিমেল হাওয়া। জাহাজীরা প্রায় প্রত্যেকেই হাতে দস্তনা পরে কাজ করছে। সেই গ্রীষ্মকালে শীত ছিল না, আকাশ পরিষ্কার ছিল বলে এবং সমুদ্রে ঢেউ ছিল না বলে ইমাদুল্লা স্কিপ ভাড়া করে এইসব দ্বীপে চলে এসে বিকেল এবং অনেকদিন রাত কাটিয়ে গেছে। ইমাদুল্লা বলেছে, এক আজব নগরী মনে হবে তুমি জ্যোৎস্না রাতে এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের ভিতর ঘুমিয়ে আছ অথবা জেগে আছ।

সে প্রশ্ন করল, ইমাদুল্লা সেই মানবীর মুখ তুমি ভাল করে দেখছ?

ইমাদুল্লার চোখ কেমন প্রথম হতবাক হয়ে গেল। সে কি বলবে ভেবে পেল না। বস্তুত, সমুদ্রের কাছে এসব খেলনা হলেও ওর কাছে এসব ছোটখাটো লম্বা পাহাড়ের সামিল অথবা মূর্তিগুলো এত বেশি অতিকায় যে সে নিচে গিয়ে দাঁড়ালে প্রায় কোন অতিকায় পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে আছে এমন মনে হত তার। স্পষ্ট সব কিছু দেখা যেত না। সে পায়ের নোখগুলির ধার দেখেছে এবং নোখগুলি বাজপাখি প্রায়, যেন হাতির দাঁতের চেয়ে মোটা। এবং সেই পাহাড়টায় অর্থাৎ যে পাহাড়ের অগ্রভাগ সমুদ্রের ওপর মানবীর মতো ভেসে রয়েছে, সেখানে সে গিয়ে উঠলে দেখতে পেত, বড় এক মাঠের মতো বেদী এবং বেদী এত মসৃণ যে হাঁটতে গেলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। ওর পা দুটোর চারপাশে সে ঘুরতে পারত না। কারণ

পাহাড়টা মাঝখানে প্রায় ঘাগরার মতো হয়ে আছে। দূর থেকে যতটুকু উলঙ্গ মনে হয় কাছে গেলে তাও মনে হয় না। ওপরের দিকে তাকালে মনে হয় মুখটা অন্যদের দিকে নিবন্ধ। সে চোখ দুটো অথবা মুখ দেখতে পায় নি। সুতরাং ইমাদুল্লা ওর কথার জবাবে কি বলবে ভেবে পেল না। একবার ভাবল, সে বলবে দেখেছে। সে ওর শরীর বেয়ে সেই সত্তর আশি ফুট ওপরে উঠে দেখে এসেছে। বস্তুত সেখানে সেই মানবীর শরীর বেয়ে ওঠা যায় না, এবং এত খাড়া যে কোন সময় পা হড়কে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। একমাত্র যখন এই অঞ্চলে তুষার ঝড় হয়, এবং ক্রমে, ঝঞ্ঝা কমে এলে তুষারপাত হতে থাকে, তারপর ক্রমে বরফ পড়তে থাকলে চারপাশের সমুদ্রে বরফ জমে যায়, অতি উৎসাহী যুবক যবুতীরা তখন শোনা যায় সাইকেলে সমুদ্রের ওপর বরফ ভেঙে এই সব দ্বীপে চলে আসে। এবং দোতলা মই বেয়ে ওপরে উঠে যায়। পড়ে গেলেও হাত পা ভাঙার ভয় থাকে না। তুষার পাতের জন্য নরম কোমল একটা দু-তিন ফুটের আস্তরণ চারপাশে থাকে ওদের পক্ষে সম্ভব হলেও ইমাদুল্লা মই পাবে কোথায়। সে তাই চোখ দেখতে পায় নি। সে শোনা কথাই বরং পুলককে নিজের চোখে দেখে এসেছে এমনভাবে যেন বলে দিল।

চোখ নেই পুলক। সে ধীরে ধীরে এ কথাটা বলল। ইমাদুল্লার বয়স এখন অনেক কত বয়স সে নিজেও জানে না। নলিতে ওর একটা বয়সের হিসাব আছে, সেটা মনগড়া হিসেব। চাকরির জন্য হিসেব। ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায় সে এখন [illegible]। বরং এতক্ষণ যারা ওর পাশে ছিল, যেমন গঙ্গা, আলতাফ, ওরা সবাই [illegible] জানতে চাইত, এই পুলক তার চেয়ে একেবারে আলাদা। ওরা ফিসফিস [illegible] গেছে, তুমি চাচা কেন যেতে সেখানে আমরা জানি।

কেন!

ওরা কিছু না বলে দাঁত বের করে হাসত।

ইমাদুল্লা বলত বেকুফ। আমার কি সে বয়স আছে।

তখন কি তুমি আর এখনকার মতো বুড়ো হাবড়া ছিলে?

তোরা জানিস না, তোরা যা জানিস [illegible] না তা আমাকে বলতে আসিস না! [illegible] বয়সে জাহাজের কাজ নিয়ে আসি, সেটা তোদের এখনকার বাপের বয়স।

ওরা বুঝতে পেরেছিল, চাচা রেগে যাচ্ছে। সুতরাং রেগে গেলে চাচা যা তা বলে দেয়। ওরা চলে গেলেই এসেছিল পুলক। জাহাজ ঘাটে বাঁধা হচ্ছে। জেটি বয়রা এখন হল্লা করছে। এবং ক্রেনগুলোর ছায়া লম্বা হয়ে গেছে। দিন ছোট বলে মাথার ওপরে যে সূর্য ছিল, নিমেষে তা সমুদ্রের ওপাশে হেলে পড়েছে। এবং এক সময় সমুদ্রে ডুবে গেছে। মনে হয় না দিন এত ছোট হতে পারে। এখন ওদের অন্ধকারে এই নিশীথে কাজ করতে হবে। চারপাশে নানা রকমের আলো, এবং জেটির ওপর আলোর মালা। জাহাজের সব আলো জ্বালা হয় নি বোঝা যাচ্ছে না। সুতরাং ডেকের ওপর অন্ধকার। এই অন্ধকারেই জাহাজীরা ছুটে ছুটে কাজ করছে। হাসিল ফেলে দিচ্ছে। ওয়ারপিন ড্রাম ঘুরছে। উইনচে স্টীমের শব্দ। পুলকের ওয়াচ নেই। সে এনজিনরুমের জাহাজী। ওদের ওয়াচ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ইমাদুল্লা। সামনে সেই লায়ন রক, রকের ওপরে সেই ডিভাইন লেডি এবং বিচিত্র সব পাহাড়ের শীর্ষ ভাগ আর ডানদিকে সেই লায়ন রকে লাইট হাউস সমুদ্রের ওপর। আলোটা বৃত্তাকারে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে

এখন। যত জাহাজ আসবে এ বন্দরে, আলো ফেলে ফেলে ওদের সেই লাইট হাউসটা পথ দেখাবে।।

ইমাদুল্লা বলল, লেডির মুখ চোখ কিছুই নেই পুলক। এবার ইমাদুল্লা কেমন সরল কথাবার্তা বলতে থাকল। একবার আমি রাত কাটিয়েছিলাম। কেউ কেউ রাত কাটাতে যায়। আমারও শখ হয়েছিল। এখান থেকে ধরো প্রায় মাইল দশেক হবে। এই দশ মাইল আমাদের জাহাজ কি ধীর গতিতে এসেছে বুঝতেই পারছ। স্কিপ নিয়ে গেলে ঘণ্টা খানেকের পথ। যদি তোমার পথটা চেনা থাকে। না চেনা থাকলে তুমি এমন সব দ্বীপের গোলমালে পড়ে যাবে যে সেখানে পেঁছাতে পেঁছাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাবার হয়ে যাবে। তখন তোমার মনে হবে, সমুদ্রের সেই আদি প্রেতাত্মা তোমাকে ঘুরিয়ে মারছে।

প্রাচীন নাবিকের গন্ধ রয়েছে এই ইমাদুল্লার গায়ে। পুলক যত বন্দরে গেছে সে এই ইমাদুল্লার সঙ্গেই যা কিছু বন্দর সম্পর্কে কথাবার্তা বলেছে। কারণ পুলক জাহাজে উঠে আসার পর থেকেই বড় বিষণ্ণ। সে বড় বেশি কথা বলে না। জাহাজ থেকে আজকাল বেশি নামে না। বন্দরে যায় না। মেয়েমানুষ জাহাজে এসে বিরক্ত করলেও সে ফুর্তি করার জন্য নেংটা হয় না। বরং সে তার ফোকশালের দরজা বন্ধ করে রাখে। কিছু বই নিয়ে এসেছে সঙ্গে। ইংরেজী, বাংলা, সেগুলো সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ে। পয়সা হলে সে বন্দর থেকে দুটো একটা বই কিনে নিয়ে আসে। এবং কোন কোন বন্দরের সৌন্দর্য ওকে মুগ্ধ করলে একা নেমে বাসে চড়ে দূরে চলে যায়। কোন পাহাড়ের নিচে, পাথরের গায়ে সে একটা নাম লিখে আসে। নামটা বড় ওর প্রিয়। নামটা একটি সুন্দর বাঙালী মেয়ের। যে লম্বা, এবং যার লাবণ্য ভরা শরীর। সে সাদা জমি আর লাল রঙের পাড় দেওয়া শাড়ি পরতে ভালবাসে। সে মেয়ের নাম নন্দিনী। নন্দিনী আমি এখন একটা পাহাড়ের কোলে ওক গাছের নিচে বসে আছি। সে, গাছের কাণ্ডে একটা ধারালো ছুরি দিয়ে এমন লিখে রাখে। অথবা পাথরের গায়ে লিখে রাখে ছোট্ট দুটো কথা, নন্দিনী আমি ভাল আছি। তুমি কেমন আছো?

নতুবা অন্য সময় জাহাজে সে বড় বিষণ্ণ। সে কাজ করে। সেকাজে আর কাজের ভিতর ডুবে থাকে। সে সেই পাঁচ বছর আগে এক নিস্তব্ধ দুপুরে ঘর ছাড়া হয়েছিল, আজও সে তাই আছে। তার বয়স যদি তখন বিশ থাকে, এখন তার পঁচিশ হয়েছে। সে যদি তখন নন্দিনীকে ভালবেসে থাকে, সে এখন তাকে তবে স্বপ্নের ভিতর নিয়ে গেছে। নন্দিনী, মেয়ের নাম নন্দিনী। নন্দিনী বড় সুন্দর তুমি। তোমার চোখ এই দূর দেশেও আমি বর্ষার দিনে অথবা তুষারপাত হলে পোর্টহোলে স্পষ্ট মনে করতে পারি।

- তা হলে ওর চোখ নেই ইমাদুল্লা চাচা!

—না।

মুখ নেই।

—না।

—তবে কি আছে।

—কি আছে জানি না। পায়ের কাছে দাঁড়ালে ওর চোখ মুখের কথা তোমার মনেও আসবে না।

- এত সুন্দর।

—এত সুন্দর পুলক!

—রাতে যে থাকলে, কি দেখলে?

—দেখলাম নিশীথে সেই বাতিঘরের আলো এসে বার বার সেই মূর্তির ওপর কিছুক্ষণের জন্য থেমে যাচ্ছে। তারপরে আবার ঘুরে ঘুরে কি যেন দেখছে সমুদ্রে, ফের এসে আলোটা মূর্তির ওপর থেমে থাকছে। একটা আশ্চর্য রকমের মায়া তৈরি হয় তখন। তুমি সেটা দেখার জন্য সারারাত সেই মূর্তির পায়ের কাছে পড়ে থাকবে।

—তুমি একবারই গেছ চাচা।

একবারই। আর যেতে পারি নি। কারণ তারপর যতবার এসেছি সে শীতকালে। চারপাশে তুষারপাত। সমুদ্রের ওপর বরফ পড়তে থাকে। বরফ ভাসতে থাকে। সমুদ্রে বরফ একেবারে পাটির মতো বিছিয়ে না গেলে যাওয়া খুব রিস্ক্। আর যেতে পারি নি।

-এবার শীতকালে এসেছি আমরা।

সুতরাং তোমার যদি যাওয়ার ইচ্ছা থাকে যেতে পারবে না। এটা জুন মাসের প্রথম। জুলাই মাসের শেষাশেষি এখানে সমুদ্রের জল বরফ হয়ে যায়। ততদিন জাহাজ এখানে থাকবে না। থাকলে তুমি আমি এক রাতে সাইকেল যোগাড় করে দেখে আসব।

বুড়ো মানুষ তুমি। তোমার কষ্ট হবে যেতে।

যাওয়ার একটা নেশা আছে। সেই কবে একবার দেখেছি এখনও চোখের ওপর দৃশ্যটা যেন ভাসছে।

পুলক ইমাদুল্লার চোখ দেখে টের পেল, সে যাবেই। পুলক ভাবল, এক রাতে যাওয়া যাবে। যারাই আসে তারা এই দৃশ্য না দেখে বড় যায় না। পুলক মনে মনে সেখানে যাবে স্থির করল। যদি জাহাজ ততদিন এ বন্দরে না থাকে, তবে সে একটা স্কীপ ভাড়া করে যাবে। সেখানে সে ধারালো ছুরি দিয়ে নন্দিনীকে লিখবে, আমি এখানেও এসেছিলাম। নিশীথের জ্যোৎস্নায় আমি সারারাত তোমাকে প্রতীক্ষা করেছি।

## দুই

বন্দরের চারপাশটা এখন নির্জন। শীতের রাত বলে এই নির্জনতা আরও ভয়াবহ। দূরে গির্জায় ঘণ্টা বাজছে এবং হু হু করে ঠাণ্ডা শীত দক্ষিণ মেরু থেকে অথবা আবাস্টুন পাহাড় থেকে নেমে আসছে। বন্দরের বাড়ি ঘর ছোট ছোট। খুব বড় অট্টালিকা চোখে পড়ে নি। অধিকাংশ কাঠের বাড়ি। লাল নীল রঙের কাঠ দিয়ে যেন বাড়িগুলো তৈরি। শীতের রাতে ওদের কাচের জানালায় শিশিরের টুপটাপ শব্দ কান পাতলে শোনা যাবে। এই ঠাণ্ডায় ডেকে কেউ নেই। যে যার মতো ফোকশালে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বে এবার। তখন মনে হল বন্দরের পথ ধরে কেউ একটা লণ্ঠন হাতে এদিকে নেমে আসছে।

পুলক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছিল। শীতে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

ফোকশাল গরম রাখার জন্য যে সামান্য ব্যবস্থাটুকু আছে তা পর্যন্ত ঠাণ্ডা মেরে গেছে। জাহাজীরা যে যার ফোকশালে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ছে। কেবল এনজিন ভাণ্ডারির কাজ শেষ হয় নি। সে মেসরুমে বসে কিছু খাবার আগলাচ্ছে এখন।

এই শীতের রাতে মেজ-মালোম গেছেন কিনারে। কাপ্তান নিজের ঘরে বসে এখন হয়ত বাইবেল পড়ছেন। এবং কোয়ার্টার মাস্টার গ্যাঙওয়েতে বসে ভাবছিল সেই লণ্ঠনের আলো এদিকে নেমে আসছে কেন? এই শীতে নির্জন এই জেটিতে এমন আলো কেমন ভয়াবহ। দূরের সমুদ্র তেমনি শান্ত। কেবল সেই ঠাণ্ডা হাওয়া! করণ তুষারপাত আরম্ভ হবার আগে এমন একটা ঝড়ো ঠাণ্ডা হাওয়া এই সব উপকূলে বইতে থাকে। যারা মেষপালক যারা তৃণভূমিতে মেষের পাল অথবা গরুর পাল নিয়ে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারা এই ঝড়ো হাওয়া বইতে দেখলেই তাদের জীবজন্তু নিয়ে শহরের কাছে চলে আসবে, এবং যার যা কিছু আছে যেমন মেষ, গরু, বাছুর সব কিলখানায় ঢুকিয়ে দিয়ে যে যার দেশে চলে যাবে। এই শীতের রাতে, কোন উৎসব না থাকলে এমন নির্জন এক জেটিতে কেউ নেমে আসে না। অথচ একটা লণ্ঠন ক্রমে শেষ ক্রেন পার হয়ে এই জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে।

পুলক চায়ের জল গরম করতে ওপরে উঠে এসেছে। সে দেখল লণ্ঠন হাতে কে এখন গ্যাঙওয়ের সিঁড়ি ধরে জাহাজের ওপরে উঠে আসছে। ওরা ফসফেট নিয়ে এসেছে জাহাজে। লণ্ঠন হাতে এজেণ্ট অফিস থেকে কেউ আসবে না। আর যখন জেটিতে তেমন অন্ধকার নেই, তখন কেউ হাতে লণ্ঠন নিয়ে জাহাজে উঠে আসতে পারে ভাবাই বিস্ময়ের। সে জল গরম না করে ওভারকোটের কলারটা উঁচু করে দিল। এবং যে স্কার্ফটা গলায় জড়ানো আছে সেটা মাথায় তুলে ডেক ধরে হাঁটতে থাকল। ওর মনে হল সেই লণ্ঠন হাতে মানুষটা কোয়ার্টার মাস্টারকে কি যেন বলছে!

ডেকের যমুনাবাজুর উইংসে একটা লাল মতো আলো জ্বলছে। সে আলোটার নিচে এসে দাঁড়াল; এবং এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যার হাতে লণ্ঠন তিনি একা নন। পিছনে কেউ যেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। একটা শেডের মতো জায়গায় ওরা দাঁড়িয়ে কি বলাবলি করছিল, সে কৌতূহল আর নিবৃত্ত করতে পারল না। কারণ লণ্ঠন হাতে যখন নিশ্চয়ই কোন কিনারার মানুষ হবে। যেন কিছু হারিয়েছে ওরা। এই জাহাজে ওরা তা খুঁজতে এসেছে।

সে আরও দু পা এগিয়ে গেল। জল বসিয়ে এসেছে উনুনে। জলটা গরম হয়ে পড়ে যেতে পারে। এত শীত যে একটু চা না খেতে পারলে শরীর গরম হবে না। দাঁত প্রায় সক্ত হয়ে আসছে। এবং এবার বোধহয় ঠকঠক করে কাঁপতে থাকবে। পুলক সামনে যেতেই দেখল একজন প্রায় বৃদ্ধা গোছের মানুষ এবং অন্যজন যুবতী কি কিশোরী এই সামান্য আলোর ভিতর বোঝা যাচ্ছিল না। বৃদ্ধার হাতে লণ্ঠন। সে যেন প্রায় অনেকদূর থেকে হেঁটে এসেছে এমন চোখ মুখ এবং ক্লান্ত। কিশোরী মেয়েটি কোন কথা বলছে না। সে তার ঠাকুমার কথা শুনছে।

কোয়ার্টার মাস্টার সিরাজ ভাল ইংরেজি জানে না। এবং সে ওদের কথা ঠিকমতো ধরতে পারছে না। কোয়ার্টার মাস্টার পুলককে দেখেই বলল, এরা এই জাহাজে কিছু বোধহয় খুঁজতে এসেছে।

পলক বলল, গুডইভিনং মাদাম। আপনারা এই ঠান্ডায় জাহাজে?
বৃদ্ধা বললেন, তুমি মিস্টার একটা খবর দিতে পার।
–কি খবর বলুন।
–এই জাহাজটা ভারতবর্ষ থেকে এসেছে ত?
–এটা কোথা থেকে ঠিক এসেছে আমি বলতে পারবো না মাদাম।

বৃদ্ধা কেমন বিস্ময়ের চোখে তাকাল। মেয়েটির মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সে তার ঠাকুমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকার দরুন ঠাকুমার ছায়া ওর শরীরে আবছা অন্ধকার সৃষ্টি করেছে। সেই মেয়েটি ওর দিকে এখন কেমন-ভাবে তাকাচ্ছে পলক বুঝতে পারছে না। সেও এমন একটা কথায় বিস্মিত হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছে না। জাহাজের ওপর এই লণ্ঠন দুলতে দেখে যারা জাহাজের শেষ বাঁধাছাঁদার কাজ করে ফিরছিল তারা পর্যন্ত এদিকটাতে জড় হতে লাগল।

পলক বলল, মাদাম, আপনাকে আমি কোন মস্করা করছি না। পলকের এই স্বভাব। সে সহজে কোন কিছু ব্যাপারে স্থির না হয়ে কিছু প্রকাশ করে না। সে বলল, মাদাম, জাহাজটা ইংরেজদের। কলকাতা থেকে জাহাজী নিয়েছে। আমরা ভারতবর্ষ ছেড়ে বের হয়েছি সেই দশমাস আগে। কিছুদিন আগে আমরা গিনিতে ছিলাম। তার আগে সেণ্টিসে। সূর্য মাথার ওপর উঠলে আমরা জাহাজ ছেড়ে গেছিলাম ওসানিক আয়র্লেণ্ডে। কত দেশ ঘুরে আমরা এখানে এসেছি। ভারতবর্ষ থেকে এ জাহাজ আসে নি। জাহাজ ইংরেজদের। আমরা জাহাজ নিয়ে আপনাদের বন্দরে এসেছি ফিজি দ্বীপপুঞ্জ থেকে।

বৃদ্ধা এবার কিছু বলতে চাইলে পলক বলল, এই শীতে আপনি বড় কষ্ট পাচ্ছেন। যদি কিছু না মনে করেন, আমাদের ফোকশালে এসে বসতে পারেন। আপনার সব কথা শুনে যথসাধ্য চেষ্টা করতে পারি।

বৃদ্ধা এবার লণ্ঠন তুলে পলকের মুখ দেখল। লণ্ঠনটা তুলতেই আলোর কিছু অংশ সেই মেয়ের মুখে গিয়ে পড়েছে। যা এতক্ষণ অস্পষ্ট ছিল এবং এতক্ষণ যা রহস্যময় ছিল। এখন পলক এবং অন্যান্য জাহাজীদের চোখে একেবারে তা স্পষ্ট হয়ে গেল। এত সুন্দর এবং বিষণ্ণ মুখ সে পৃথিবীর কোন বন্দরে যেন দেখে নি। সে এতক্ষণ যে সরল সহজভাবে কথা বলছিল, মেয়েটির মুখ দেখেই সে আর তেমন সরল সহজ থাকতে পারল না। সে কেমন নিজের ভিতর গুটিয়ে গেল। কোথায় যেন তার এমন একটা মুখ দেখা। বড় চেনা চেনা। সে যেন কবে কোন পাথরের গায়ে এমন একটা মুখের ছবি এঁকে রেখেছিল। সে আর সেজন্য কিছুই বলতে পারল পারল না। কেবল বলল, আমি সব আপনাকে বলতে পারব না। আমাদের জাহাজে ইমাদুল্লা চাচা আছে। তার কাছে আসুন সে আপনাদের সব সমস্যা শুনলে নিশ্চয়ই সমাধানের একটা সূত্র বের করে দিতে পারবে।

পলক, গঙ্গা, জিয়া হায়দর সবাই সেই দুইজন আগন্তুকের সঙ্গে নিজেদের ফোকশালের দিকে হাঁটতে থাকল।

আকাশ পরিচ্ছন্ন। বোধ হয় এটা কৃষ্ণা চতুর্দশী হবে। নতুবা আকাশের নক্ষত্র এত উজ্জ্বল কেন। প্রায় ঝলমল করছে সারা আকাশ। শীতের রাতেই আকাশ সবচেয়ে বেশি পরিচ্ছন্ন থাকে, পলকের এমন মনে হল ডেকে দাঁড়িয়ে। মেয়েটি বড় ধীরে ধীরে হাঁটছে। মেয়েটার তার ঠাকুমার জন্য এর ধীরে হাঁটছে কিনা জানে না, না ওর স্বভাবই এমন, পলক ডেক পার হতে গিয়ে তা ধরতে পারছে না। সে নিজে

সিঁড়ি ধরে নামবার আগে জিয়াকে বলল, কেটলির জলটা ফুটছে কিনা দেখতে। এবং না ফুটলে সে যেন আরও দু-কাপ জল দিয়ে দেয়। যারা আগন্তুক এসেছে তাদের জন্য এই দু-কাপ। তবে আর ভিন্ন করে চা বানাতে হবে না।

সিঁড়ির মুখে এলে পুলক বলল, এমন খাড়া সিঁড়ি ভাঙতে আপনার কষ্ট হতে পারে। আমার ওপর আপনি নির্ভর করতে পারেন, এই বলে সে তার শক্ত কাঁধ বাড়িয়ে দিল।

ইমাদুল্লা চাচা জাহাজের বড় টিণ্ডালের কাজ করে, তার ফোকশালে সে একা। এনজিন সারেঙের ফোকশাল পার হলেই ইমাদুল্লা চাচার ফোকশাল। পুলক এবং গংগা, যমুনাবাজুর মোহন সবাই এসে গেল নিচের টুইন ডেকে। ওরা ওকে ইমাদুল্লার ফোকশালে ঢুকিয়ে দিল।

ইমাদুল্লা তখন তামাক খাচ্ছিল। সে দেশ থেকে আসার সময় একটিন রাব আর এক বস্তা তামাকের পাতা এবং কিছু বেনারসের জর্দা পাতার আরক সংগে নিয়ে আসে। আর সংগে আনে গড়গড়ার নল। রুপোর বাঁধানো গড়গড়া, এক ডজন কলকে। কারণ ঝড় উঠলে জাহাজ বড্ড দোলে। সে তাব কলকেটাকে সুতোয় বেঁধে রাখে। এবং ঝুলিয়ে রাখে বাঙ্কের নিচে। খুব বেশি দোল খেলে জাহাজে উল্টে পাল্টে যায় সব। কলকে ছিটকে গিয়ে অন্য কোনখানে দুখান হয়ে ভেঙে পড়ে থাকে। ইমাদুল্লা বড় প্রাচীন আর হিসেবী জাহাজী। সে কত ধানে কত চাল হয় জানে। কতদিনের সফরে কটা কলকির দরকার তার জানা। ব্যাংক লাইনের সফর হলে কবে ঘরে ফেরা যাবে তার ঠিক থাকে না। কেবল সমুদ্র এবং সমুদ্র, এবং বালিয়াড়ি, দ্বীপপুঞ্জ চারপাশে, অথবা শীতের দেশে বরফ পড়ছে তো পড়ছেই। এসব সবই জানা আছে ইমাদুল্লার। সে দু মাসে একটা কলকি, এই হিসাবে এক ডজন কারণ ব্যাংক লাইনে উঠলেই বিশ বাইশ মাসের সফর না হয়ে যায় না। সেই ইমাদুল্লা বেশ শীতের ভিতর কম্বল গায়ে চুপচাপ প্রায় নামাজের ভংগীতে বসে তামাক টানছিল, তামাক টানা শেষ হলেই কলকিটা উপুড় করে রাখবে। বালিশে তিনটি থাপ্পড মারবে, মেরে চারপাশের যত কিছু আছে সব বন্ধন করে দেবে, কারণ ইমাদুল্লার বয়স যত বাড়ছে তত জীন পরি অথবা ভূত--প্রেতের ভয় বাড়ছে। আর এই সব জাহাজে কত কিছু থাকে, সে নিশীথের জ্যোৎস্নায় কতদিন এমন সব বিচিত্র জাহাজের গল্প করেছে যে কাপ্তানের চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেছে ভয়ে। সেই সব গল্প সময় পেলেই পুলককে বলে। অথবা অন্যান্য জাহাজীদের হাতে যখন কাজ থাকে না, ডেকের কাজ শেষ, সাফ-সুতরোর কাজ শেষ, অথচ এজেন্ট অফিস থেকে জাহাজ ছাড়ার কোন নির্দেশ আসছে না—তখন আর কি করা, ডেকের ওপর বসে মাদুরে শুয়ে বসে থাকা অথবা এই ইমাদুল্লা চাচার সেই সব পুরানো সফরের অভিজ্ঞতার কথা শোনা। শুনতে শুনতে কাপ্তান ত কাপ্তান, বুড়ো মানুষ, জোয়ান মানুষ, মায় পুলক, যে শিক্ষিত নাবিক জাহাজে যার সংস্কার বলতে কিছু নেই, যে ভয়ংকর সৎ এবং সাহসী সেই মানুষের পর্যন্ত ভয়ে টেঁসে যাবার অবস্থা।

সুতরাং পুলক ওদের যে কি ভেবেছিল! ওরা কি জাহাজে আদৌ মানুষ হিসাবে এই শীতের রাতে এসেছে! সে অবাক, কারণ এতক্ষণে যেন মনে হচ্ছে লণ্ঠন নিয়ে আসার কি কারণ থাকতে পারে! ইমাদুল্লা চাচা সব জানে। সব বোঝে। সে দেখলেই সব টের পেয়ে যাবে।

ইমাদুল্লা চাচা ওদের দেখেই চিনে ফেলেছে। সে তাড়াতাড়ি নল ফেলে উঠে

দাঁড়াল, আরে আপনি! বলতেই সেই বৃদ্ধা লণ্ঠন তুলে ওর মুখ দেখল।

—তুমি ইমাদুল্লা না?

জি আমি ইমাদুল্লা।

যাক বাঁচা গেল। বলে হাতে স্বর্গ পাবার মতো সে বাঙ্কের উপর বসে পড়ল। একটু থেমে বলল, তুমি অনেকদিন পর এদিকটায় এলে তবে!

আজ্ঞে তাই। আপনার শরীর ভাল।

বৃদ্ধার মাথায় কালো ঝালরের ক্যাপ ছিল সে ওটা খুলে ফেলল। সারামাথায় সাদা চুল। হাতে সাদা ফ্লানেলের গরম দস্তানা। পায়ে রাবারের হাঁটু পর্যন্ত জুতো। এবং গায়ে লম্বা ল্যাদার জ্যাকেট। ইমাদুল্লা এবার দরজার পাশে মুখ তুলতেই দেখল একজন সুন্দর মতো মেয়ে চুপচাপ নাবিকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম সে বুঝতে পারে নি মেয়েটিকে। কার সঙ্গে মেয়ে এই রাতের জাহাজে উঠে এসেছে। সে বিস্ময়ের চোখে তাকাতেই বৃদ্ধা কি বুঝতে পেরে বলল, আরে তুমি ওকে চিনতে পারছ না?

ইমাদুল্লার চোখ সামান্য সংকুচিত হল। সে বলল, না। ঠিক চিনতে পারলাম না মাদাম ইলিয়া।

—আমাদের ব্রাউস!

ব্রাউস! এত বড় হয়ে গেছে! বলেই সে যেমন লাফ দিয়ে উঠেছিল উত্তেজনায়, তেমনি সে সহসা নিস্তেজ হয়ে বসে পড়ল সেই কবে এসেছি! বলে সে মিনমিনে গলায় বলল, কত বছর আগে! সে কর গুণে হিসাব করে বলল, তা তেরো বছর হয়ে গেছে। তখন ব্রাউস শিশু। কত বছর বয়েস ছিল মাদাম ইলিয়া তখন ব্রাউসের?

— চার বছর হবে।

ভুলে গেছি সব। কত সহজে মাদাম ইলিয়া, আমাদের সময় পার হয়ে যায়। ইমাদুল্লা কিঞ্চিৎ দার্শনিক তত্ত্বে ডুবে গেল যেন।

পুলক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে গোটা ব্যাপারটা যে রহস্যজনক নয় এখনই ইমাদুল্লা সব খুলে বলবে তাকে এবং খুলে বললে সে সবটা বুঝতে পারবে কারণ এই ইমাদুল্লা যেন সব জানে বোঝে, কেন সমুদ্রে কত জল। সে প্রায় পুলকের কাছে ঈশ্বরের সামিল তবু ইমাদুল্লা গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানছে এবং আয়েসি মানুষের মতো গল্প করছে দেখে পুলক মনে মনে রাগ না করে পারল না। সেই নিয়ে এসেছে ওদের ইমাদুল্লা চাচার কাছে, অথচ চাচা এখন ওর দিকে একবার তাকাচ্ছে না পর্যন্ত, এরা কারা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে না, এবং কেন রাতে লণ্ঠন নিয়ে এই জাহাজে উঠে এসেছে, যেন উঠে আসাই স্বাভাবিক, না এলেই বরং সেই রাতে ওদের খুঁজতে বের হতে হত এমন মুখ নিয়ে চাচা ওদের সঙ্গে কথা বলছে। এমন কি পুলককে কোন কথা বলছে না পর্যন্ত। পুলক ভাবল, ধুস শালা, কাম কি দাঁড়িয়ে থেকে, নিজের ফোকশালে গিয়ে সে শুয়ে পড়বে এমন ভাবল এবং সে এই-টুকু ভেবে দরজা অতিক্রম করতেই কড়া গলা চাচার, পুলক কোথায় যাচ্ছ। ওদের জন্য কিছু গরম কফি। একবার ভাণ্ডারিকে ডাকলে হয়। পুলক ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে, বলল, ইনি হচ্ছেন মাদাম ইলিয়া আর ও হচ্ছে ব্রাউস মিলান। এরা ইলিয়া পরিবারের মানুষ। এবং এই ইলিয়া পরিবারের সাত পুরুষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিল। এদের আচারে ব্যবহারে কিছুটা ভারতীয় সংস্কৃতি আছে। এ-মাসটা ওদের

পরিবারের মৃত্যুমাস। এই মাসেই হিসেব করে দেখা গেছে প্রায় সকলেই ওদের মারা গেছেন। এরা গত মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে আসে। এবং এই শহর থেকে কিছু দূরে ছোট্ট এক পাহাড়ের মাথায় ওদের ছবির মতো বাড়িটা দেখলে বাড়িটাকে না ভালবেসে পারবে না।

একটু থেমে ইমাদুল্লা বলল, আমাদের পুলক। পুলক বসু। বছর পাঁচেক হল জাহাজী হয়েছে। এ বন্দরে প্রথম, সৎ সাহসী, এবং বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কেন যে ছোকরা জাহাজে মরতে এল বুঝি না। তোমরা তো জান আমাদের দেশটা এখন ভাগ হয়ে গেছে। এই বছর সাত-আট হল ভাগ হয়েছে, কি খবর রাখ না! ইলিয়াকে সামান্য সংকুচিত দেখাল। তোমরা ভারতবর্ষে ছিলে। যুদ্ধের সময় চলে এসেছ। ব্রাউসের বয়স তখন বোধহয় বছর খানেক। আমি এলাম বছর তিনেক বাদে। আমাদের কনভয় তোমাদের ভেড়ার মাংস, আপেল আর গম নেবার জন্য এসেছিল। সে একটা দিন গেছে!

ইলিয়া বলল, তা গেছে।

ইমাদুল্লা বলল, তখন আমরা ছিলাম এক দেশের মানুষ। ভারতবর্ষের মানুষ। এখন পুলক হিন্দুস্থানের আর শালা আমি পাকিস্তানের। আমার শালা বড় বিদঘুটে স্বভাব, বড় বেশি কথা বলি। তা পুলক দাঁড়িয়ে থাকলে কেন। কিরে গঙ্গা বেশ যে দেখছিস শালা! যা যা। শুয়ে পড়গে। এখানে ভিড় জমাস না।

পুলক বলল, চাচা, চায়ের জল গরম করেছিলাম।

—তবে ঐ চা-ই করে দাও। কি মাদাম, আর কিছু! কিছু শুকনো ফল দিতে পারি। পনির দিতে পারতাম, কিন্তু বেটা স্টুয়ার্ডকে এখন পাওয়া যাবে না। সে শালা ঠিক কিনারায় নেমে গেছে।

মাদাম ইলিয়া বললেন, না না, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি এক্ষুনি উঠব।

—আপনার যেতে কষ্ট হবে না! বেশ দূর। সেখানে এই রাতে ওকে একা নিয়ে যাবেন। বলে ইমাদুল্লা ব্রাউসের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

—আমাদের গাড়ি আছে!

—তখন কিন্তু আপনাদের গাড়ি ছিল না।

—ব্রাউসের বাবা লাইট-হাউসে কাজ পেয়েছে। সে সরকার থেকে একটা গাড়ি পায়। বলেই কি বলতে গিয়ে বিষণ্ণ হয়ে গেল মাদাম ইলিয়া।

এবার যা বলবে বলে ভেবেছিল, মাদাম ইলিয়ার রুগ্না কন্যা অর্থাৎ ব্রাউসের মার খবর নেবার জন্য মুখ বাড়াতেই চা নিয়ে এল পুলক। এই শীতের রাতে চা-টুকু এত বেশি লোভনীয়, এত বেশি ভাপ উঠছে যে ইমাদুল্লা সেই গরম চায়ে হাত রেখে হাত গরম করতে চাইল।

ব্রাউস এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। পুলক এমনিতেই বিষণ্ণ থাকে, কথা কম বলে। ঠিক ইমাদুল্লার বিপরীত। অনেকক্ষণ থেকে পুলক একটা কথাই ভাবছে, এরা জাহাজ বাঁধতে না বাঁধতেই কেন ডেকে এসেছে। এবং সে ইমাদুল্লাকে দেখে ঠিক টের পেয়েছে, সে গোটা ব্যাপারটা জানে। তাই ওর মুখে কোন বিস্ময়ের রেখা ফুটে নেই। ওরা চলে গেলেই যেন ইমাদুল্লা সব খুলে বলবে।

পুলক আলগা করে চা ঢেলে দিল ব্রাউসের কাপে। হাত খুব বেশি গোলাপী রঙের এবং নীল শিরা উপশিরা সব ভাসমান, আর এইসব দৃশ্য ওর দস্তানার ভেতর

থেকে প্রায় ফুটে বের হবার মতো। ব্রাউস ডান হাতের দস্তানা খুলে ফেলেছে। না খুলে ফেলালেও সে যেন ধরতে পারত কত উজ্জ্বল আর নীল রঙ নিয়ে এই শরীর এই সমুদ্রের তীরে এক পাহাড়ের ছায়ায় অথবা আপেলের বাগানে বড় হচ্ছে। চোখ বড় বড়। চুল বব করে কাটা। পায়ের পেশী নরম। এবং যেমন লম্বা তেমনি ডিমের মতো মসৃণ মুখখানিতে বড় বড় চোখ দুটো প্রায় প্রতিমার মতো। সে বসেছিল। ওর দুহাত সামনে। ওর সাদা রঙের পোশাক গায়ে। কোমরে লাল রঙের বেল্ট আঁটা। পায়ে সাদা চামড়ার জুতো। নীল রঙের মোজা। এক আশ্চর্য সুষমা নিয়ে মেয়েটা চুপচাপ বসে আছে। কথা বলছে না। পুলকের ইচ্ছা হল একবার কথা বলে। অথচ সে যে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

এখন অন্যান্য জাহাজীরা উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। কোনো দূরের গির্জায় রাত আটটার ঘণ্টা পড়ছে। বেলা চারটা না বাজতেই রাত নেমেছিল ডেকে। এখন তাই ওরা যেন গভীর নিশীথে জাহাজটার ভিতর সকলে ডুবে আছে। মেয়েটা একটা কথাও বলছে না। বিষণ্ণ প্রতিমার মতো এই ফোকশালের চারপাশটা দেখছে। স্টিয়ারিং এনজিনের শব্দ নেই। কেমন নিঃসাড়ে জাহাজটা এ বন্দরে পড়ে আছে।

অথচ ওরা যে কেন এসেছে পুলক বুঝতে পারছে না। লণ্ঠনটা বাংকের নিচে নিবু নিবু করে রাখা হয়েছে। ওদের ওঠারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইমাদুল্লা বলল তখন, ওর মা কেমন আছে।

বৃদ্ধা কোন জবাব দিলেন না। চোখ মুছে ফেললেন। এই বয়সে কেবল কোন দুঃখের কথা মনে হলেই কান্না আসে তার। ইমাদুল্লা কি টের পেয়ে বলল, সেই রোগেই গেছে?

ইলিয়া ঘাড় নাড়ল শুধু। ব্রাউস কোন কথা বলছে না দেখে ইমাদুল্লা ইলিয়ার দিকে তাকাল।

—এও তাই।

এত অল্প বয়সে!

- তাই দেখছি। এখন আর কিছু ভাবি না। যা হবার হবে। এটা তো বংশানুক্রমিক। এমন হয়ে আসছে বার বার। আমার বড় ছেলেকে তো ভারতবর্ষের মাটিতে রেখে এসেছি। ভেবেছিলাম এই দেশের জল হাওয়া হয়ত কোন প্রতিরোধের কাজ করতে পারে। কোথায়! ছোট ছেলেটা আমার সংগে সংগেই মারা গেল। মেয়ে জামাই সংগে ছিল। ভাবলাম যাক অন্তত মেয়েটা বাঁচবে।

ইমাদুল্লা বলল, তোমার দাদা এবং কাকা দুজনই তো এমন একটা রোগে গেছেন বলেছিলে।

—কবে থেকে যে চলে আসছে জানি না। এই এক বিষণ্ণ হয়ে যাওয়া। দিন রাত কি যে এক বিষণ্ণতা কাজ করে জানি না।

-তুমি তো দীর্ঘদিন বেঁচে গেলে!

—আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না ইমাদুল্লা। কেমন দুঃখের গলায় কথাটা বলল ইলিয়া।

ইমাদুল্লা বলল, আমাদের কবে যেতে হবে?

—কালই।

—যদি জাহাজ না ভিড়ত আজ?

ইলিয়া চুপ করে থাকল। কয়েক বছর থেকে এটা হয়েছে। গত বছর একটা

জাহাজ কোচিন থেকে এসেছিল এ সময়ে, তার আগের বছর সব মাসেই কোন না কোন জাহাজ এসেছে, কিন্তু জুন মাসে কোন জাহাজ আসেনি। ফলে কাউকে বলাও হয়নি।

কোন ভারতীয়কে খাওয়াতে পারেনি বলে খুব খারাপ গেছে বছরটা।

ইলিয়া লণ্ঠনের আলো উসকে দিল। তারপর উঠে পড়ার সময় বলল, কখন যাচ্ছ।

—সকাল সকালই চলে যাব ছুটি নিয়ে। সঙ্গে এই ছোকরা নাবিককে নিয়ে যাব। কেমন হবে? বলে সে ব্রাউসের দিকে তাকাল।

ব্রাউস কোন উত্তর করল না। ইলিয়া বলল, বুঝতে পারছ! এখন আর চেষ্টা করি না কিছু। রোজ গির্জায় যাই সঙ্গে নিয়ে।

ওরা চলে গেলে পুলক প্রায় ক্ষোভের সঙ্গে বলল, এরা কারা, কেন এসেছে, কিসের জন্য যেতে হবে কিছুই জানালে না চাচা।

—এখন ঘুমোতে যাও। কাল সকালে যখন যাব তখন সব বলা যাবে।

—এত আলো থাকতে এই লণ্ঠন হাতে এখানে আসা!

—সবই বলা যাবে। রাত হয়েছে। সারেঙের ঘুম ভাঙলে রেগে যাবে। চুপ চাপ শুয়ে পড়োগে। সকালে আবার ছুটি নিতে হবে।

পুলক জানে এখন আর ইমাদুল্লা চাচা কোন উত্তর দেবে না। গঙ্গা, আলতাফ এবং অন্যান্য জাহাজী যারাই ছিল, বলল, চাচা, আমরাও যাব। আমাদের ফেলে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না।

পুলক ডেকের ওপর উঠে গেল। ক্রেনের নিচে ওরা এখন হাঁটছে। ক্রমে ওরা জেটি পার হয়ে গেল। এটা জুন মাস। এই মাস এবং মাস শেষ হলে ক্রমে এই দ্বীপে তুষারপাত আরম্ভ হবে। জাহাজ ততদিন থাকবে কিনা সে জানে না। ব্রাউসের একটা অসুখ আছে। মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়। সে ডেকের ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে ভাবল, তুষার পাতের পর যখন সমুদ্র বরফে ঢেকে যাবে একবার তাকে নিয়ে যাবে সেই মূর্তিটার কাছে। ওরা দুজনে সেখানে চুপচাপ বসে থাকবে। পাঁচ বছর পর এই প্রথম ওর কেন জানি ব্রাউসকে দেখে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ফের অর্থ খুঁজে পাচ্ছে।

## তিন

শহরের ঠিক নিচে যে পথটা অকল্যাণ্ডের দিকে গেছে সেই পথে যেতে হবে। ওরা বাসে চেপে বসল। এখন শীতকাল বলেই কৌরিপাইনের সব পাতা ঝরে যাচ্ছে। আপেলের বাগানে যারা কাজ নিয়ে এসেছিল, ওরা এখন ছুটিতে চলে গেছে। বড় বড় কোল্ড স্টোরেজগুলো এখন সব ভেড়ার মাংসে অথবা নানারকম ফলমূলে ভরে উঠবে। এই বন্দর থেকে গম, কাঁচা মাংস, ডিম এবং ফলমূল রপ্তানি হবে।

আর এই দেশে বরফ পড়ার আগে জাহাজগুলো সব ভেড়ার মাংস, গম অথবা আপেল নিয়ে তাড়াতাড়ি সমুদ্রে পাড়ি জমাবে। তা না হলে বরফ পড়লে চারপাশ বন্ধ। জাহাজগুলো বরফে বসে সমুদ্রের ভিতর অনড় হয়ে গেছে। তখন একমাত্র বরফ কাটা কলের সাহায্যে এইসব জাহাজ গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং

ওরা যখন বের হচ্ছিল বন্দর থেকে তখন চারপাশে যত জাহাজ রয়েছে, সবগুলোতে একসঙ্গে মাল উঠছে। বিশ্রাম নেই। বিরাম নেই। ক্রেনগুলো ঘড়ঘড় শব্দ করছে। ওরা এই সব দেখে ভেবেছিল জাহাজ মাল বোঝাই হতে খুব সময় নিলে পনের-ষোল দিন। তার আগে জাহাজ যে রসদ নিয়ে এসেছে সে সব নামাতে হবে। এইসব দিন এক সঙ্গে গুণলে বড় জোর জাহাজ এক মাসের মতো এই বন্দরে। ওরা এদেশের বরফ পড়া দেখতে পাবে না। পুলক যেতে যেতে বলল, চাচা তোমার কি মনে হয় আমাদের জাহাজের দাঁড়দড়া তুলতে তুলতে বরফ পড়বে না?

ইমাদুল্লা বলল, এখন কথা নয়। চারপাশটা দেখ। কি সুন্দর দেশটা। মানুষগুলো আরো সুন্দর, বাসের মেয়ে কন্ডাকটার ভারি মজার গল্প বলছিল যেতে যেতে। ওদের বাসটা সমুদ্রের পাশে পাশে যেন ছুটছে। বাঁ দিকে বিস্তীর্ণ পাহাড়ী জমি, উপত্যকা এবং সুন্দর সুন্দর কটেজ, ফার্ম হাউস, তেলের পিপে, নীল রঙের গাছ এবং কৌরিপাইনের ঘন জঙ্গল। এসব দেখে পুলকের কেন জানি আর কথা বলতে ইচ্ছা হল না। এখানে এই সব বনে জঙ্গলে নেমে গেলে হত। বনে জঙ্গলে যে সব বড় বড় কৌরিপাইন আকাশের দিকে মাথা তুলে কত কাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম সে সব কাণ্ডে সুন্দর করে লেখা, নন্দিনী আমাদের এ বাদে কোন গত্যন্তর ছিল না। কারণ তুমি আমার সম্পর্কে কাজিন হও। আমাদের ধর্মে তোমার আমার ভালবাসা অবৈধ। তোমার বিয়ের দিনে আমি কি খেটেছিলাম! এমনভাবে মনপ্রাণ দিয়ে আর কোথাও আমি কাজ করতে পারি নি। বিয়ে বাড়ির হৈচৈ কখন থেমে গেছে, আমি কখন বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কখন তোমাদের বাসব এসব কিছুই টের পাইনি নন্দিনী। কেবল সকালে দেখেছিলাম আমার শরীরে কে একটা গরম চাদর দিয়ে পা পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছিল। টের পাচ্ছিলাম ভোর রাতের দিকে আমার সামান্য শীত করছে। টের পাচ্ছিলাম কেউ এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। গোটা বাড়িটাতে তখন ক্লান্তি। সকলে ঘুমে আচ্ছন্ন। টের পাচ্ছিলাম। আমার কপাল থেকে কে চুল সরিয়ে সামনে মুখ নিয়ে আসছে। বুঝলাম তোমার উষ্ণ নিঃশ্বাস। আমাকে ঘুমের ভিতর বড় কাতর করছিল। আমি তবু জেগে যাইনি। জেগে গেলে আমি যেন আমার এতদিনের ভালবাসার সম্মান রাখতে পারতাম না।

সে ভাবল, এত সব কি লেখা যায় একটা গাছের কাণ্ডে! কিন্তু সে যেখানেই গেছে কিছু না কিছু পাথরে অথবা গাছের কাণ্ডে লিখে এসেছে। যেন সে বলতে চেয়েছিল, নন্দিনী আমার এ ভালবাসা নিরন্তর সুষমা বয়ে বেড়ায়। আমি গাছে গাছে পাতায় পাতায় কত কথা লিখতে চাই। এসব তোমাকে বললে, তুমি হয়ত আমাকে ছেলেমানুষ ভাববে, বলবে, বড় আবেগধর্মী মানুষ আমি, তবু বলি কেন যে আমি পৃথিবীর যত বন্দরে গেছি, তোমার আমার কথা লিখতে ভালবাসি। তোমার আমার কৈশোরের প্রেম গাথা, অথবা নদীর পারে ছোটা, কাশবনে হারিয়ে যাওয়া, সূর্যাস্তে হাত ধরাধরি করে বাড়ি ফেরা এবং শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে তোমাদের বাড়িতে যেদিনটিতে চলে আসি, তোমার সেই সুন্দর চোখের হাসি কেন জানি এখনও আমি ভুলতে পারি না। যা আমি বন্দরে বন্দরে পাথর এবং পাহাড়ের গায়ে লিখে বেড়াচ্ছি। আমার মনে হয় এই যে আমাদের ভালবাসার পৃথিবী, যেখানেই গেছি শুধু মনোরম দৃশ্য, এই যেমন এখন এক মনোরম দৃশ্যের ভিতর আমরা ব্রাউসের কাছে যাচ্ছি। ব্রাউসকে দেখে আমার মনে হয় সেও তেমন এক পৃথিবীর

সন্ধানে আছে। তাকে সেই পৃথিবীটা কেউ এনে দিতে পারছে না। সে ক্রমে বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। সে বিষণ্ণ হয়ে গেলেই আজ হোক কাল হোক সে মরে যাবে। কেন যে সে এমনভাবে মরে যাবে বুঝি না। আমরা নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছি। এই মাসে ওরা প্রতিদিন দুজন ভারতবাসীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে। অন্তত প্রতিদিন না হলেও একদিন খাওয়ানো চাই। কারণ ওদের পূর্বপুরুষরা সকলেই ভারতবর্ষের মাটিতে সমাহিত হয়েছেন।

সে ভাবল, ব্রাউস বড় সুন্দর নাম!

সে দেখল বাসটা ছোট্ট পাথরের পাহাড়, কোনো গাছগাছালি নেই তার নিচে থেমেছে। চাচা হাতে ইসারা করে ডাকল। সে নামার সময় দেখল, ওরা সুন্দর একটা ছবির মতো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একজন ভদ্রলোক ইমাদুল্লাকে দেখেই ছুটে আসছে। যেন কত আপনার জন কত দীর্ঘদিন পর ফিরে এসেছে। পথের ডান পাশে বালিয়াড়ি অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। সমুদ্রের গর্জন আসছে। নীল রঙের সমুদ্র বালিয়াড়ি পার হলে আর বাঁ দিকে একটা পাহাড়ের ছোট্ট পাঁচিল যেন ও-পাশের মরুভূমি সদৃশ উপত্যকা থেকে বাড়িটাকে রক্ষা করছে। বাড়িটা কাঠের। দুপাশে সবুজ ঘাসের লন, এবং নুড়ি বিছানো পথ, পাশে পাশে গোলাপের কেয়ারি। এত বড় গোলাপ ফুল পুলক কোন দিন দেখে নি। আর বাসটা রাস্তার ওপর। সাদা রঙের বাস। জানালায় ব্রাউসের মুখ দেখা যাচ্ছে। বৃদ্ধা গাড়িবারান্দায় ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। সবই ছবির মতো। ওপরে আকাশ, নিচে বালিয়াড়ি, সমুদ্র, এবং সবুজ রঙের গ্রানাইট পাথরের পাহাড়ের নিচে লাল রঙের বাড়ি। ইমাদুল্লা বলল, যিনি আসছেন তাঁর নাম মগো মিলান। ব্রাউসের বাবা হন তিনি।

মিলান হ্যান্ডস্যাক করল। ওদের আগে আগে হাঁটতে থাকল। সামনের গোল মতো বারান্দায় উঠে আসতেই বৃদ্ধা ইলিয়া ছুটে এলেন। কি খুশী সে! বারান্দায় লাল কার্পেট পাতা। সবুজ রঙের বেতের চেয়ার। ফুলদানিতে সব বিচিত্র ফুলের গাছ। মিলানের সঙ্গে ইমাদুল্লা পুলককে পরিচয় করিয়ে দিল। মিলনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। খুব অমায়িক আর আবেগপ্রবণ। খুব মনে হয় হাসতে পারে। মনেই হয় না মিলানকে দেখে যে তার মেয়ে ব্রাউস সেই নিষ্ঠুর নিয়তির কাছে ধরা পড়েছে। ইমাদুল্লা মিলানকে ঠিক আগের মতোই খুশী দেখে বলল- তোমার লাইট-হাউসে আমরা একদিন বেড়াতে যাব ভাবছি।

—খুব আনন্দের কথা।

—তোমার ডিউটি কখন থাকে?

—ও ঠিক থাকে না। আমাদের সুবিধা মতো ভাগ করে নিই। মাসখানেকের ছুটিতে আছি।

—তোমাদের সেই বড় মিসলটোস লতার গাছটা দেখছি না?

—ব্রাউসের মা যে বছর মারা যায় সে বছর গাছটাও মরে গেল।

—ব্রাউসকে একবার ডাকো দেখি। দেখি মুখখানা।

—একেবারে কথা বলে না!

—কথা বলে না কেন? এবার পুলক প্রশ্ন না করে পারল না।

মিলান কেমন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইমাদুল্লার দিকে তাকাল। ইমাদুল্লা বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে পুলকের কথার কোন জবাব দিল না। শুধু বলল, তুমি

যাও না পুলক, ব্রাউস কি করছে দেখে এস।

মিলান চায়, মিলান কেন, যারা এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত তারাই জানে ইলিয়াদের বংশে এই দুরারোগ্য ব্যাধি ক্রমান্বয়ে পুরুষানুক্রমিক চলে আসছে ; সকলেরই যে হয় তা না—তবু অধিকাংশ যুবক যুবতীকে এমন একটা রোগে পেয়ে বসলে, দিনের পর দিন চুপচাপ, হাসে না কথা বলে না—প্রাণে বিন্দুমাত্র ঐশ্বর্য যেন নেই : সব কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে—কখনও এভাবে আত্মহত্যা, কখনও খাওয়া কমে আসে, কখনও এক অজীর্ণ রোগ দেখা দেয় এবং এভাবে এক অতি নাটকীয় মৃত্যু এই ইলিয়া পরিবারের মানুষদের জন্য প্রতীক্ষা করে। সুতরাং মিলান চায়, মিলান কেন, সকলেই চায় এই যে দুঃখটা ব্রাউসকে এক ঘোরতর বিপদে বন্দী করে রেখেছে তা থেকে যে ভাবে পারা যায় মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হোক। মিলানেরও সায় ছিল কথাটাতে। পুলকের বাঙালি চেহারা সুন্দর, চুল ব্যাকব্রাস করা। নাকটা একটু চাপা, চোখের চেয়ে ভ্রূ প্রশস্ত। এবং উঁচু লম্বা মানুষ পুলক। চোখ দেখলে মনে হয় সেও কোন বিষণ্ণতায় ডুবে থাকতে ভালবাসে।

ইলিয়া এসে বলল, পুলক, ভেতরে এস।

পুলক ভিতরে ঢুকতেই দেখল কাঠের পাটাতন কি মসৃণ। এ-ঘরে একটা কালো রঙের কার্পেট, দেওয়ালের নিচটা কালো রঙের, ওপরে মেজেণ্টা রঙের। দেয়ালে সারি সারি ফটো এবং উত্তরের দেয়ালে একটা তৈলচিত্র। ইলিয়া ছবিগুলো দেখাচ্ছিল এবং ওদের জন্ম-সাল, মৃত্যু-সাল সম্পর্কে নানারকমের কথা বলছিল। এখান থেকে ইলিয়ার্ক দেখা যায়। পুলক একবার এই রোগ সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাইলে ইলিয়া হাত তুলে ঠোঁটে ইসারা করল। বলল, তুমি কিছু বল না। এ-সুখের কথা কিছু বলো না। এতে ব্রাউস আরও ঘাবড়ে যেতে পারে। ওর যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে আমরা তার সঙ্গে ব্যবহার করি।

অথবা পুলক যেন আরও প্রশ্ন করলে জানতে পারত, এই রোগ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের কম বৈঠক হয় নি। এমন কি সুদূর সাইণ্টিফিক ইনস্টিটুট অফ ওকলাহামা অন মেডিসিন এই পারিবারিক রোগ সম্পর্কে রিসার্চ করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে নি। সুতরাং এই বংশ সবই ভবিতব্য ভেবে এখন ব্রাউসের মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে।

অথচ ব্রাউস কি সুন্দর। কি চোখ তার! হাত কি মসৃণ এবং চুপচাপ থাকে বলেই শান্ত আর বড় স্থির মনে হয়। এভাবে বছর পার হয়ে যাবে। নতুন বছর আসবে, আপেলের বাগানে আবার লোকজন ফিরে আসবে। নতুন পাতা গজাবে গাছে গাছে, কি বিচিত্র বর্ণের সব ফুল ফুটবে পাহাড়ী সব উপত্যকায় এবং ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি উপত্যকার ওপর উড়ে উড়ে সমুদ্রের সব ছোট ছোট দ্বীপে হারিয়ে যাবে। ব্রাউস জানালায় বসে সব দেখবে। উপত্যকার ও-পাশে সূর্য ওঠা দেখবে। সূর্যাস্ত দেখবে সমুদ্রে। সমুদ্র-পাখিদের কলরব শুনতে শুনতে ব্রাউস কেমন নিজের মনের ভিতর ডুবে যাবে। মায়ের মৃত্যুর দিন মনে পড়বে ব্রাউসের। মাও ঠিক এমনি এক জানালায় বসে থাকতেন। সারাদিন তার মুখে অদ্ভুত এক অলৌকিক প্রচ্ছন্ন হাসি ভেসে থাকত ঠোঁটে। যেন এই যে পৃথিবী দেখছ, বড় অনিত্য এবং এই যে গাছ এবং এই যে গাছ ফুল পাখি দেখছ বড় কাব্যময় অথচ সবই কত কম সময়ে পৃথিবী থেকে ফুরিয়ে যাবে। এবং এইভাবে দেখতে দেখতে ব্রাউসের মনে হত মায়ের মৃত্যু দিনটি। মা চুপচাপ শুয়ে আছেন যেন। সাদা

কাপড়ে ঢাকা মুখ। পা দুটো দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য রকমের সাদা মনে হয়। সেও মায়ের মতো শুয়ে থাকবে। পা দুটো আশ্চর্য রকমের সাদা দেখাবে।

আর তখন পুলকে পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। ডাকল, ব্রাউস!

ব্রাউস তাকাল না। সে যেমন চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে সমুদ্র অথবা বালিয়াড়ি দেখছিল, তেমনি অপলকে দেখছে।

সে বলল, তুমি কি দেখছ বালিয়াড়িতে?

ব্রাউস চুপচাপ। নিঃশব্দ।

সে বলল, তুমি কখনও দূর সমুদ্রে গেছ?

ব্রাউস হাতটা এনে এবার কোলের কাছে রাখল।

সে বলল, জান ব্রাউস, আমরা পৃথিবীর সব সমুদ্র দেখেছি।

ব্রাউস নিজের হাত দেখল এবার। যেন বিরক্ত হচ্ছে পুলকের কথায়।

সে আবার বলল, ব্রাউস, একটা অদ্ভুত পাথরের মূর্তি আছে তোমাদের এখানে?

ব্রাউস নিজের ফ্রকটা টেনে দিল। ফুল ফল আঁকা ফ্রক। ইলিয়া ওকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে। ডানদিকের ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছিল। ইমাদুল্লা এবং মিলান বারান্দায় বসে থাকতে পারেনি। কাঁচে মোড়া বারান্দা এবং চারপাশটা কাঁচ দিয়ে ঢাকা। ঠাণ্ডা হাওয়া এতটুকু ঢুকতে পারছে না। ঘরে ঘরে ফায়ার প্লেস। আজ সব কটা ফায়ার প্লেসেই আগুন দেওয়া হয়েছে। লোকজন আরও আসবে। ইলিয়া কিচেনে এখন কি সব করছে। টিন ফুড খোলাখুলি হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে ডুনেদিন থেকে এসেছে ব্রাউসের পিসি। সে এখন ইলিয়াকে কিচেনে সাহায্য করছে।

পুলক ব্রাউসের পাশে এবার একটা চেয়ার টেনে বসল। সে বলল, জান ব্রাউস, আমাদের দেশটা ঠিক তোমাদের উল্টো। এখন তোমাদের শীতকাল। আর আমাদের দেশে এখন গ্রীষ্ম অথবা বর্ষাকাল। পুলকের ভাল লাগছে কথা বলতে। কারণ এই মাত্র ব্রাউস ওর দিকে একবারের জন্য চোখ তুলে তাকিয়েছে। এবং সেই অলৌকিক প্রচ্ছন্ন হাসি ঠোঁটে। সকলে যখন ওকে নিয়ে ব্যস্ত, চিন্তান্বিত তখন ওর ঠোঁটে এই প্রচ্ছন্ন হাসি প্রায় জীবন সম্পর্কে হাসি ঠাট্টার অথবা তামাশার সামিল।

পুলক বলল, পিছনে যে পাহাড়টা আছে, ওর ওপাশে কি আছে, বন মাঠ না তৃণভূমি।

ব্রাউস এবার উঠে দাঁড়াল!

পুলক বলল, তুমি কি আমাকে বেহায়া ভাবছ!

ব্রাউস কেমন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

—তা না হলে উঠে যাচ্ছো কেন! আশ্চর্য ব্রাউস নিঃশব্দে ওর পাশে বসে পড়ল। আর আশ্চর্য পুলক এখন মেয়েটির সঙ্গে এত কথা বলছে কি করে! এত কথা তার বলতে ভাল লাগছে কেন! সে সহসা কি ভেবে—ইলিয়া যখন যাচ্ছিল, সে বলে ফেলল, ব্রাউস বড় ভাল মেয়ে। ওর কোন অসুখ নেই।

ইলিয়া এই আগন্তুকের কথা শুনে সামান্য না হেসে পারল না। পুলককে সে ইশারায় কাছে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে ইমাদুল্লা বসেছিল, সেখানে এসে সে ফিসফিস করে বলল, ওর অসুখের কথা ওর সামনে আবার বলছ কেন?

পুলক কেমন বিশ্বাস করতে পারছে না। এমন এক সরল তরুণী, শান্ত স্থির এবং ধীর মেয়ে চুপচাপ আছে বলেই একটা অসুখ হয়েছে ভাবতে হবে—এ কেমন কথা! সে কিছু কৌতুক জানত। কারণ সে পিতৃমাতৃহীন হয়ে নন্দিনীর বাবার কাছে মানুষ হয়েছে। নন্দিনীর মা কোনদিন পুলককে ভাল চোখে দেখেনি। সে বড় অবহেলায় মানুষ হয়েছে। নন্দিনীই ওকে যা কিছু মর্যাদা দিয়েছিল এবং সে কত বড় কৌতুক জানে, বিয়ের সময় তা টের পাওয়া গেলে। অথবা যখন বাবা সম্বন্ধ দেখতে গেল পুলককে নিয়ে, পুলকের ব্যবহারে, সেই এক কৌতুককর ব্যবহার যা দেখে নন্দিনীর শাশুড়ী পর্যন্ত হেসে ফেলেছিল। পুলক নানারকম কৌতুকে অথবা জাদুতে বরযাত্রীদের হাসাতে হাসাতে নিজের দুঃখ চেপে রেখেছিল। এখানেও সে এক সামান্য মানুষ, অসামান্য হাত পা ছুঁড়ে, নানারকমের জাদু দেখিয়ে একবার যদি মেয়েটাকে বালিয়াড়িতে টেনে নিয়ে যেতে পারত। সে বলল, ইমাদুল্লা চাচা ওর মায়ের কি রোগ হয়েছিল?

মিলান এখন কাছে নেই। সে বাজারে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। ইমাদুল্লা এবং পুলক স্রেফ বাংলায় কথা বলছে। ইমাদুল্লা বলল, ওর মা'র বিষণ্ণতা দেখা দেয়, ক্রমে হাত পা শুকিয়ে আসে। এবং রাতে রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে।

ওর বাবার সে অসুখ হতে পারে?

ওর বাবার হবে না। কারণ ইলিয়ার বংশের সে কেউ নয়।

— তা হলে গ্রাউসের মামা অথবা ইলিয়ার বাবা, কাকা কিংবা তাদের ঠাকুর্দা এমন রোগে মরেছে।

— সবাই যে মরে তা ঠিক নয়। অধিকাংশ এ-ভাবে মারা যায়।

কোন প্রি-কসান নেওয়া যায় না।

— ওদের হয়ে অনেক বিশেষজ্ঞরা ভাবছে।

— কেন এটা হয়?

কি করে বলব। পাগলের বংশে কেউ না কেউ পাগল যেমন হয়, আমার মনে হয় এও তেমনি।

গ্রাউসের কিন্তু চোখ মুখ বলছে সে ভাল আছে।

তুমি ডাক্তারি করতে কবে শিখলে?

আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে না গ্রাউস মরে যাবে।

বিশ্বাস না হলে, থেকে যাও। চোখের ওপর দেখতে পাবে কি ভাবে মরে যাচ্ছে গ্রাউস।

ঠাট্টা রাখ চাচা। পুলক কেমন শক্ত গলায় কথাটা বলে ফেলল।

কিন্তু ইমাদুল্লা ওর এই ধমকে কান দিল না। সে হা হা করে হেসে পরিবেশটাকে একটু হালকা করতে চাইল। তা না হলে কি করে প্রমাণ পাবে যে গ্রাউসের অসুখ হয়েছে।

পুলক আর কথা বলতে পারল না। সে কাঁচের জানালায় মুখ রাখল। দূরে সমুদ্রের প্রবল ঢেউ বালিয়াড়িতে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ওর ভিতরটা কেন জানি হু হু করে উঠল।

সে বলল, কি করে ভাল করা যায়?

—কেউ যদি ওকে সবল কথায় আবার জীবনের ভিতর ফিরিয়ে আনতে পারে।

--তার মানে?

—তার মানে, যতদিন আছে বেঁচে থাক ভালভাবে। হাসো গাও, ছুটে বেড়াও। সমুদ্র দেখলে জলে ঝাঁপিয়ে পড় এবং সাঁতার কেটে নীল আকাশের নিচে ঝিনুকের মুক্তো খোঁজো।

—ঠিক করে বুঝিয়ে বল।

—জীবনের বড় কাজ হচ্ছে মুক্তো খোঁজা। সেটা পেতেও পার আবার সারা জীবন খোঁজা বৃথাও হতে পারে। অথচ এই খোঁজার ভিতর একটা বাঁচার রহস্য আছে। গ্রাউসের কাছে সে রহস্যটা মরে গেছে।

—কেন এমন হয়?

—কোনো না কোনো ভাবে সে জেনেছে—এটা একটা দুরারোগ্য ব্যাধি। এর থেকে ওর নিস্তার নেই। ওর মা গেছে, মায়ের মাসি গেছে। দিদু গেছে—ঠিক এই একটা রোগে। তবে রোগটার আক্রমণ ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ওপর বেশি। এ পরিবারের মেয়েদের সেজন্য সহজে কেউ বিয়ে করতে চায় না। যৌবন ভালভাবে আসতে না আসতেই ওরা সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ইমাদুল্লা একটু থেমে বলল, এটা বংশগত রোগ। এই এক মেলাঙকোলিয়া, কি যে ভীষণ মেলাঙকোলিয়ায় এদের পরিবারের কোন কোন মানুষকে পেয়ে বসে ভাবা যায় না।

এমন সময় গ্রাউসের বাবা ফিরে এল। সংগে যেন কেউ আছে। বোধহয় ওর লাইট হাউসের কোন কর্মী। ওরা এসেই মুরগি নামিয়ে দিল চার পাঁচটা। সব ছোলা মুরগি। বড় বড়। ছোলা বলে মুরগি না টার্কি বোঝা যায় না দূর থেকে। কাছে এলে ইমাদুল্লা বুঝতে পারল, ওগুলো মুরগি। সে নিজে উঠে গিয়ে ওদের কাজে হাত লাগাল। এবং এ ভাবে কত সহজে আপন হওয়া যায়। ইমাদুল্লা বেশ নিজের মানুষের মতো আজ ওদের ভোজের নিমন্ত্রণে দেখা শোনা করতে লাগল, পুলক একা একা কি ভাবতে ভাবতে ওদের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। ওর ইচ্ছা হচ্ছিল বার বার গ্রাউসের কাছে ফিরে যেতে। কিন্তু সে এ-সময় কেন জানি বেশি সময় গ্রাউসের কাছে বসে থাকটা বাঞ্ছনীয় নয় এমন ভাবল। কেউ কিছু মনে করতে পারে। একমাত্র ইমাদুল্লাই জানে এ-পরিবার সম্পর্কে। সে গত সফরে অনেকদিন গ্রাউসের বাবার সংগে সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছে। ওদের একটা খামার বাড়ি আছে সেখানে নানা রকম পশু পালন হয়, নানা রকমের ফলের গাছ আছে, আর বড় বড় পুকুরে নানা রকমের লিলি ফুল ফুটে থাকে। ইমাদুল্লা এত বড় খামার দেখে লোভে কিছুদিন জাহাজ থেকে ছুটি নিয়ে থেকে গেল। এবং প্রায় এই পরিবারের আত্মীয়ের মতো হয়ে গেল। সুতরাং সে কি রান্না হচ্ছে, বাড়ির পেছনে যে সব পারসিমন গাছ ছিল তার সুমিষ্ট গন্ধ কেমন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, সে যে একটা গাভীর বাচ্চা হতে দেখে গিয়েছিল এবং বাচ্চাটার নাম, সে তার দেশের একটা নদীর নামের সংগে মিলিয়ে রেখে গিয়েছিল, সেই গাভী এখন কোথায়, কটা তার বাচ্চা, কত পরিমাণ দুধ দেয়, না কি কিলখানাতে তারা ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে—কারণ এতদিনের সেই বাচ্চা গাভী হয়ে প্রায় বুড়ো হতে চলল—সে বোধহয় এখন বাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে গ্রাউসের বাবার কাছে সে-সব খবরও নিচ্ছে। আর এ-সময়েই ভেড়ার মাংস রোস্ট হচ্ছে সে বুঝতে পারছে। কারণ এই রোস্টের গন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। সে এবার পিছনের দিকে তাকাল। দেখল তেমনি স্থির এবং অচঞ্চল গ্রাউস। গ্রাউসকে কেন যে সংগে করে গতরাতে জাহাজে নিয়ে গিয়েছিল

ইলিয়া সে বুঝতে পারল না।

আর তখন ইলিয়া বারান্দায় এসে এমন ঠান্ডায় ওভার কোটের পকেটে হাত রেখে সদরে পলুককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বুঝল, পলুক এখানে হোমলি ফিল করছে না। ইলিয়ার এটা ভাল লাগল না। সে সাধারণত অতিথি অভ্যাগতদের জন্য নানা রকম ইনডোর গেমের ব্যবস্থা করে রাখে। যেমন ইমাদুল্লা খেয়ে-দেয়ে তাস খেলতে বসবে। যাদের তাস অথবা দাবা পছন্দ নয়, তাদের জন্য নানা রকমের লাল নীল রাবারের রিঙ। এবং ছোট্ট একটা কাঠের স্ট্যান্ড। স্ট্যান্ডে যে যতবার রিঙ গলাতে পারবে ততবার সে একটা করে পেনি পাবে। আর পেনিগুলো পর পর সাজানো থাকে। ওপরের পেনি থেকে নিতে হবে। যদি পেনিতে ষষ্ঠ জর্জের মাথা থাকে তবে সে আরও দশটা পেনি পাবে, যদি পেনিতে আবু পাহাড়ের ছবি থাকে তবে তাকে দশটা পেনি ঘুরিয়ে দিতে হবে। এই এক খেলায় বেশ মজা আছে। সমুদ্র থেকে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাবে। গাছগুলোর শাখা প্রশাখা দুলবে। শীতের সূর্য উঠতে উঠতে আকাশের অন্য প্রান্তে হারিয়ে যাবে। মেয়ে এবং ছেলেদের, এই যারা সদ্য যুবক হচ্ছে অথবা যুবতী হবে তাদের কাছে খেলাটা খুব প্রিয়। কিন্তু এখানে পলুকের সমবয়সী কেউ নেই। ব্রাউস আছে। সে তো চুপচাপ থাকে। পলুক ইচ্ছা করলে ব্রাউসের সঙ্গে গল্প করতে পারে। ব্রাউস যে একেবারে কথা বলে না, এখনও তেমন হয় নি। সময় সময় ব্রাউস হাসে পর্যন্ত। সেটা মুহূর্তের জন্য। এবং ইলিয়া যেমন ব্রাউসকে পারিবারিক উৎসবে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করে তেমনি পলুককে ব্রাউসের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলে ব্রাউস সামান্য সময় হয়তো মনে মনে খুশী থাকবে। তাছাড়া আর কি করা। ব্রাউসের এই ব্যবহারে কোনো বন্ধু বান্ধব নেই। কার দায় পড়েছে একা একা নিশিদিন বক বক করে যাবে। ব্রাউস কোনো কথা বলতে চাইবে না। ওরা মাঝে মাঝে ব্রাউসকে নিয়ে সুদূর তৃণাঞ্চলে চলে যায়। সেখানে সব সুন্দর সুন্দর পাখি দক্ষিণ সমুদ্র থেকে উড়ে আসে ডিম পাড়বে বলে। তৃণভূমির পাশে পাশে ঘর বাঁধে। ব্রাউসকে একবার সেই সব পাখির ডিম অন্বেষণে তারা নিয়ে গিয়েছিল। আর যাবতীয় উৎসবে, মেলায়, জাদুঘরে এবং কার্নিভেলে ইলিয়া এই ব্রাউসকে নিয়ে ঘুরেছে। কিন্তু ব্রাউস যে কে সেই। সে এবার পলুকের সামনে এসে দাঁড়াতেই পলুক সামান্য স্বভাবসুলভ হাসি হাসল।

—তুমি ভিতরে এসে বস। এই ঝড়ো হাওয়া ভাল না। সেমার ভীষণ ঠান্ডা লেগে যাবে।

পলুক ইলিয়ার সঙ্গে হাঁটতে থাকল।

—তুমি যদি কিছু মনে না কর—বলে ইলিয়া পলুকের মুখের দিকে তাকাল।

পলুক আর হাঁটল না। সে বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

—তুমি যদি ব্রাউসের সঙ্গে বসে বসে গল্প করতে—

পলুক কি বলবে ভেবে পেল না। সে আবার চুপচাপ ওভার কোটের কলার টেনে হাঁটতে থাকল।

—জানি তোমার একা বক বক করতে ভাল লাগবে না।

—না না, ভাল লাগবে। সে সহসা কেমন চিৎকার করে কথাটা বলল।

—আমাদের কথা পলুক ফুরিয়ে গেছে! যা যা দেখেছি, যা যা জানি জীবন সম্পর্কে, সব ওকে বলে দেখেছি, সে আগের মতোই আছে। তুমি জাহাজী মানুষ। কত দেশ এবং মানুষের গল্প তুমি জান। যদি এ-সব বলে সামান্য সময় ওকে

অন্যমনস্ক রাখতে পার। যতটা সময় পারবে, ততটা সময় সে বাঁচবে, বলে ইলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সত্যি সে জাহাজী মানুষ। পাঁচ বছরে সে বিচিত্র দ্বীপ, পাহাড়, সমুদ্র এবং বিভিন্ন বন্দর দেখেছে। বিচিত্র দেশের নরনারী দেখেছে। তাদের কাম ভালবাসা প্রেম দেখেছে। কোনো শুষ্ক মরুভূমিতে একটা অদ্ভুত ফার্ন গাছ দেখেছে। এবং সেখানে হলুদ রঙের ফুল দেখেছে। সেই ক্যাকটাস জাতীয় গাছে বিরল হলুদ রঙের ফুলের মতো এই ব্রাউস। সেই ফুল চুপচাপ পৃথিবী থেকে ঝরে যাবে—তার স্বাদ আহ্লাদ কেউ চেটেপুটে খাবে না—ভাবতেই ওর কেন জানি নন্দিনীর মুখ মনে পড়ে যাচ্ছে। এখন সেই পৃথিবীতে নন্দিনী তার স্বামীকে জানালার পাশে দাড় করিয়ে নিশ্চয়ই চুমু খাচ্ছে।

পুলক ধীরে ধীরে ব্রাউসের পাশে বসার সময় বলল, মাদাম ইলিয়া, একটা কথা বললে কিছু মনে করবেন না!

--না।

ব্রাউসকে ফাদার কখন্ বাইবেল শোনাতে আসেন।

সন্ধ্যার সময়।

সময়টা একটু পাল্টানো যায় না।

—কেন বলত!

এই সব কিছু একটু বদলে দেখুন না। আমি ভেবেছি আজ সন্ধ্যায় ওকে নিয়ে বেলাভূমিতে একটু বসব।

— সে তো হবে না।

— পুলক কেমন যেন বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ভাবল। সে আর কিছু বলছে না দেখে ইলিয়া এবার বলল, বিকালে তুমি আর ব্রাউস বালিয়াড়িতে গিয়ে বসতে পার। কিন্তু সূর্যাস্তের আগে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।

পুলক বলল, একটা কথা বললে আপনি কিছু মনে করবেন না?

— কি কথা। বলে ইলিয়া ময়দার হাতটা খুঁটতে থাকল।

—আপনি লণ্ঠন নিয়ে গিয়েছিলেন জাহাজে। ব্রাউস কি ভয় পায়, সামান্য অন্ধকারকে ভয় পায়?

আবার ইলিয়া ওকে চোখে ইসারা করল। যেন বলার ইচ্ছা এখানে এসব কথা নয়। দক্ষিণের দিকের ঘরটায় এস, সব বলি।

এখানেই আপত্তি পুলকের। সব কিছু বদলে না দিতে পারলে হবে না। আর পুলকের কেমন জিদ এসে গেল। সে যেন যাবতীয় দুঃখ এই মেয়ের সারিয়ে তুলবে। কেন এমন হয় মানুষের, মাঝে মাঝে একটা ইচ্ছা হয় পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ মুছে দিতে, সে ব্রাউসের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, ব্রাউস কিন্তু আমার কথা শুনে একবার হেসেছিল মাদাম।

পুলক এত বেশি ভালমানুষ যে ইলিয়া ওর এমন কথা শুনে না হেসে থাকতে পারল না। সামান্য একটু হেসেছে বলেই গোটা মেলাঙকোলেয়া ওর সেরে যাবে—আবার হাসি খুশি, ঠিক সেই বছর দুই আগের ব্রাউস হয়ে যাবে এমন ভাবছে পুলক! সে বলল, তুমি এস। জাহাজ থেকে সময় পেলেই এস। যতক্ষণ খুশি গল্প করবে ব্রাউসের সঙ্গে। মনে মনে বলল, আমি ব্রাউসের সেই হাসিটুকু লুকিয়ে দেখেছি। দীর্ঘদিন ব্রাউস যেন এ-ভাবে হাসে নি। তোমার চোখে চোখ রাখলে

সে যদি হাসে, সে যদি স্বাভাবিক হয়, তুমি ভারতবর্ষের মানুষ, জাদুকরের দেশ ওটা, যদি কোনো অলৌকিক ক্রিয়ায় তুমি ওকে ভাল করতে পার...যেমন মানুষ সমুদ্রে ডুবে গেলে কুটোগাছটি ধরার জন্য ব্যাকুল হয়, এই ঝড়ের দরিয়াতে ইলিয়া তেমনি আকুল। সে বলল, আমি যাচ্ছি পুলক। ব্রাউস, এ-আমাদের আপনার লোক। তোমার পূর্ব পুরুষেরা সবাই ভারতবর্ষে ছিলেন। ভারতবর্ষের মাটিতে তারা এখনও আছে। সে দেশ থেকে এই মানুষ সঞ্জীবনী সুধা নিয়ে এসেছে। তাদের আশীর্বাদ নিয়ে এসেছে। তুমি ভাল হয়ে যাবে।

পুলক এখন ব্রাউসকে দেখছে না। বৃদ্ধার ছলছল দুটো চোখ দেখে মনে মনে কেমন সে নিজেই বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধার সেই লণ্ঠন হাতে ডেকের ওপর মুখখানা ওর চোখে ভেসে উঠল। লণ্ঠন হাতে তিনি গিয়েছিলেন ব্রাউস ভয় পায় বলে। সামান্য অন্ধকারে পড়ে গেলেই ব্রাউস চিৎকার করে ওঠে। অন্ধকারটাকে মনে হয় ব্রাউসের মৃত্যু। সে জন্য সব সময় চারপাশে নানারকমের বাতি জ্বালানো থাকে এ বাড়ির চারপাশে।

রাতে সে বুঝতে পারল, এ বাড়ির যেদিকে তাকানো যায় সর্বত্র নানা রঙের আলোর ডুম জ্বলছে। ইলিয়ার পৈতৃক সম্পত্তি প্রচুর। সে সব বিক্রি করে এখানে একটা বড় খামার করেছে। হাজার পাঁচেক ভেড়ার একটা পাল আছে। কয়েক হাজার বিঘা ওদের তৃণভূমি আছে। সব আয় যেন এখন এই মেয়েকে রক্ষা করার জন্য। কেবল আলো আর আলো। যে এত আলো ভালবাসে, যার এত আলোর শখ সে কেন অন্ধকারের ভয়ে মরে যাবে?

রাতের বেলা সে জাহাজে ফিরে যাবার আগে ব্রাউসের কাছে গিয়ে বলল, আমরা যাচ্ছি ব্রাউস। কাল বিকেলে আবার আসব। ব্রাউস মাথা নিচু করে রেখেছিল। সে পুলককে মুখ না তুলেই বলল, তোমার সমুদ্রে কোনো সোনালী দ্বীপ নেই!

আছে। কিন্তু আর কোনো কথা নেই ব্রাউসের মুখে। ব্রাউসকে চুপচাপ দেখে পুলকই বলল তুমি সে দ্বীপে যাবে নাকি?

ব্রাউস আর জবাব দিল না। পুলক বার বার চেষ্টা করল জবাব পেতে কিন্তু কিছুতেই কোনো জবাব পেল না। যেন চাঁদ মেঘের ফাঁকে উঁকি দিয়ে আবার আকাশের ভিতর ডুব দিয়েছে।

## চার

জাহাজে ফিরে যখন পুলক নিজের ফোকশালে ফিরে যাচ্ছিল, যখন জাহাজে প্রায় সকলেই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে ইমাদুল্লা দরজার তালা খুলছে তখন মনে হল কেউ তাকে ডাকছে। পুলক ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, ইমাদুল্লা তালা খুলতে খুলতে ওকে ডাকছে। এতক্ষণ ওরা দুজন একসঙ্গে ছিল, ওরা শেষ বাসে ফিরে এসেছে। নানা রকমের কথা হয়েছে দুজনার ভিতর, তারপরও কি কথা হতে পারে ভেবে পেল না। সে সিঁড়ি ভেঙে ইমাদুল্লার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ইমাদুল্লা প্রশ্ন করল, কি খুব ঘুম পয়েছে?

পুলক বলল,তা পেয়েছে।

—তবে যাও। কাল বলব।

– খুব জরুরী কিছু বলবে?

–না। জরুরী তেমন কথা কিছু নয়।

—তবে?

—যাওনা এখন। কাল বলব।

– এখন শুনে গেলে তোমার আপত্তি আছে চাচা?

—আপত্তি থাকবে কেন? তবে বোস। আমি ওপর থেকে আসছি। বলে ইমাদুল্লা শরীর থেকে ওভার কোট এবং মাথা থেকে ক্যাপটা খুলে বাংকে ফেলে দিল। তারপর গট গট করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল। মানুষটা যে বুড়ো হয়েছে চলায় বলায় কিছুতেই তা ধরতে দেবে না। একেবারে তাজা মানুষের মতো সব সময় ব্যবহার।

পুলক আকাশ পাতাল ভাবছিল। এমন কি জরুরী কথা যা বলতে বেশ সময় নেবে। কারণ এখন ইমাদুল্লা বাথরুমে গেছে। সে নিচ থেকেই তা টের পেয়েছে। দরজার খুটখাট শব্দ হচ্ছিল। ঝড়ো হাওয়া যে ক্রমে বাড়ছে বোঝা যাচ্ছিল। সে চুপচাপ পোর্ট হোলে মুখ রেখে বসে দেখল, ইমাদুল্লা দরজা ঠেলে ঢুকছে। তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছতে মুছতে বলছে, ব্রাউস তোমার সংগে কথা বলেছে?

---বলেছে।

—কি বলেছে?

—বলেছে সমুদ্রে কোথায় সোনালী দ্বীপ আছে?

- কথাটা শুনে তুমি কি ভেবেছ।

– কি আবার ভাবব। একটা কথা বলেই ও চুপচাপ। বললাম, ব্রাউস তুমি যাবে সোনালী দ্বীপে, আমি নিয়ে যাব।

– তুমি খুব বোকা আছ। তুমি ওর কথা থেকে বুঝি ভেবেছ সে সোনালী দ্বীপে যেতে চায়।

আমার কিন্তু তাই মনে হয়েছে।

-যদি নিয়ে যেতে পার ভাল।

- কিন্তু তুমি আমাকে ডাকলে কেন? কি বলবে বলছিলে?

-ইলিয়া বলেছে, ব্রাউস তোমার সংগে কথা বলছিল। কি কথা বলেছে তারা শুনতে পায় নি। তাই জিজ্ঞাসা করলাম, কি এমন কথা বলেছে।

—ও, এজন্য ডেকেছিলে!

—হুঁ। তবে ওরা তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইল।

পুলক হাঁ করে তাকিয়ে আছে ইমাদুল্লার দিকে। সে একটু বেশি খেয়েছে আজ। রাতে সামান্য ককটেল ছিল। পুলক এসব পান করে না। ওর অভ্যাস নেই। শীতের জন্য মাঝে মাঝে সে যেটুকু খায় তা প্রায় ওষুধের মতো। সুতরাং ওরা যখন ককটেল পার্টিতে মত্ত ছিল, তখন পুলক কাঁচের জানালায় ব্রাউসের সামনে বসে ওর সুন্দর চোখের মণিকোঠায় অথবা হৃদয়ের গভীরে কি ব্যঞ্জনা আছে ধরার চেষ্টা করছিল।

ইমাদুল্লা দেখল, পুলক ওর সম্পর্কে ইলিয়া অথবা মিলান কি জানতে চাইছে তার জন্য কোনো আগ্রহ প্রকাশ করছে না। সুতরাং সে নিজেই বলতে থাকল—বললাম খুব ভাল ছেলে। বন্দর এলে জাহাজীদের যে একটা দুরারোগ্য ব্যাধি

থাকে সেটা ওর একেবারেই নেই। খুব শান্ত প্রকৃতির ছেলে।

—আর কিছু বল নি!

-বলেছি, বন্দর এলেই সে বিকালে বাসে শহরের চারপাশটা দেখে বেড়ায়। রবিবার অথবা কোনো ছুটির দিন পেলে সে বাসে করে দূরে দূরে চলে যায়। বন অরণ্য এবং নির্জন উপত্যকায় সে চুপচাপ বসে থাকতে ভালবাসে।

-বাবা! তুমি দেখছি চাচা আমাকে একজন কবি করে ফেলবে। ওরা বলল না, ছোঁড়াটার মাথায় কবিতার বাতিক আছে কিনা!

তা বলে নি। তবে আমিই বলেছি, সে জাহাজে বসে পালিয়ে পালিয়ে কবিতা লেখে!

এ্যাঁ! তুমি বলছ কি, আমি কবে কবিতা লিখলাম?

—মিথ্যা বলছ কেন পুলক? আমি সব জানি। তোমার অসুখের সময় তোমার স্যুটকেশ খুলে কিছু টাকা বের করে দিতে হয়েছিল। তুমি তখন বাংক থেকে উঠতে পর্যন্ত পারতে না। আমি সব দেখেছি।

পুলক বলল, কি করব চাচা, একঘেয়ে এই জাহাজ একেবারে ভাল লাগে না। তাই পালিয়ে পালিয়ে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে।

এ সবের জন্য আমি তোমায় ডাকি নি। আমার কথা শুনে ওদের তোমার ওপর অদ্ভুত একটা বিশ্বাস এসে গেছে। ছুটি হলে তুমি ওখানে চলে যেও। ব্রাউসের সঙ্গে গল্প করলে ইলিয়া এবং ব্রাউসের বাবা খুশী হবে।

পুলক ইমাদুল্লার ঘর থেকে বের হয়ে এল। দু পাশেই ফোকশাল। মাঝখানে সিঁড়ি নেমে এসেছে টুইন ডেক থেকে। এবং একটা সিঁড়ি আপার ডেক পর্যন্ত উঠে গেছে। এখন ওর ঘুম আসবে না। প্রচণ্ড শীতে কাঁপছে। নতুবা ওর এখন চুপচাপ বাংকে শুয়ে না থেকে রেলিঙে দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড় এবং বাতিঘরের আলো দেখার ইচ্ছা। কিন্তু প্রবল ঠাণ্ডার জন্য তার আর ওপরে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে নিজের ফোকশালে নেমে গেল। সেখানে ডান দিকের বাংকে গঙ্গা, নিচে সূর্য এবং ওপরের বাংকে সে থাকে। এই শীতে এখন কম্বলের নিচে ঢুকে যেতে পারলে বড় মনোরম। অথচ কেন জানি যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। নন্দিনীকে আজ একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

পাঁচ বছর আগে নন্দিনীর (ঠিক বিয়ের পর পরই) স্বামী একটা চিঠি দিয়েছিল পুলককে। চিঠিটা ওদের হানিমুনের চিঠি। সে লিখেছিল, দাদা হানিমুনটা যে কোথায় করি, একবার ভেবেছি পুরীতে চলে যাব। সমুদ্রের বালিয়াড়িতে আমি আর নন্দিনী। নন্দিনীর ইচ্ছা সে খুব ছুটবে বালিয়াড়িতে। আমি তার পিছু নেব। নন্দিনী যখন ছুটে ছুটে আর পারবে না, খপ করে ওর আঁচলটা ধরে ফেলব এবং সে বালিয়াড়িতে পড়ে যাবে—কি মজাটাই না হবে।

অবশ্য আমার ইচ্ছা কোনো পাহাড়ে যাই। দূরে, যে সব পাহাড়ে নির্জন কোনো কুঠিবাড়ি আছে এবং নানারকমের গাছপালা আছে, কাঁচের ঘর আছে আর নানারকমের ক্যাকটাস আছে, সারাদিন আমি এবং নন্দিনী খুশি মতো কেবল গাছপালার ভিতর ছুটব।

পুলক অবশ্য এই ছোটার ভিতর নন্দিনীর উলঙ্গ শরীর প্রত্যক্ষ করত। যেন তার ভালবাসার পোষা পাখিকে শিকারী বেড়াল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

সে তখন আর স্থির থাকতে পারত না। নন্দিনী, নন্দিনী বিয়ের পর আমি

কেমন আছি একটা চিঠি দিয়ে জানলে না।

নন্দিনীব বর অবশ্য আরও কিছু লিখেছিল। হানিমুনের জন্য ওর কোনো সোনালী যব অথবা গম খেতের কথাও মনে হয়েছে। কোনো সমতলভূমিতে কোনো পাহাড়ী উপত্যকাতে, যেখানে যব গম হয়, যেখানে চাষী মানুষেরা পরিশ্রম শেষে ঘরে ফিরে আসে, কুপি জেলে বউএর মুখ দেখে এবং ছোট্ট নদীতে কোনো নৌকা গেলে তার যে গান দূরে থেকে ভেসে আসে, তেমন এক নীরব নিভৃত পল্লীতে সে নন্দিনীকে নিয়ে হানিমুনের জন্য জায়গা নির্বাচন করতে চায়।

চিঠি পাওয়ার পর পুলক দুদিন ঘুমোতে পারে নি। সে ছটফট করেছে। সে যে কত মহিমান্বিত জীবন নিয়ে বেঁচে আছে তা দেখাবার জনাই যেন চিঠির জবাব দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। চিঠিতে সে নন্দিনীর কথা দায় সারা ভাবে লিখেছিল। আশা করি নন্দিনী ভাল আছে।

অথচ সে চিঠিতে সে যে কিছু লিখতে চেয়েছিল কিন্তু কি যেন এক অভিমান ওকে নিয়ত কুরে কুরে খেয়েছে যার জন্য যেন-তেন প্রকারে চিঠির জবাব দেওয়া এবং নন্দিনী প্রায় সমবয়সী· কিছু সে বড়, এই বছর দুই বয়সের বড় হবে। নন্দিনীর কোনো ভাই-বোন নেই। সংসারে এই আত্মীয়টিই ওর যা কিছু আবদারের অংশীদার ছিল। সে কত কিছু লিখতে পারত, নতুন জীবন কেমন লাগছে, ওর কথা দুসময়ে মনে হয় কিনা, কিন্তু সে কিছু লেখে নি। কেবল লিখেছে, যেখানেই যাবেন হানিমুনে নন্দিনীর শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন।

তারপরই সে কেমন উদাসীন হয়ে গেল। মাঝে মাঝে কোনো রেল স্টেশনে দাঁড়ালে মনে হত, নন্দিনী একা চলে আসবে, দরজায় সে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং পুলককে দেখলেই ছুটে এসে বলবে, তুমি কেন এমনভাবে ছেড়ে দিলে আমাকে, আমার কিছু ভাল লাগছে না। আমি চলে এসেছি পালিয়ে।

কত রাত সে না ঘুমিয়ে জানালায় বসে রয়েছে। যেন দূরের মাঠে কেউ তার জন্য ছুটে আসবে। এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলবে, তোমার মতো নিষ্ঠুর মানুষ বাপু আমি দেখি নি। তুমি কি করে আমাকে না দেখে আছ! আমিও পারলাম না বাপু। চলে এলাম পালিয়ে।

এ-ভাবে কতদিন, কতরাত বিনিদ্র কাটলে ওর কবিতা লিখতে ইচ্ছা হত। কত কাল সে একা জানালায় বসে কাটিয়ে দিয়েছে, সে বৃষ্টির রাতে হাতে জল ধরত। এবং কল্পনায় সেই ঠান্ডা জল দুহাতে মেখে দিত নন্দিনীর গালে। মনে হত খুব ঝড় উঠেছে। আকাশ কালো মেঘে উথাল পাতাল করছে। সে এবং নন্দিনী একটা ফাঁকা মাঠে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। ঝড়ের দাপটে নন্দিনীর চুল উড়ছে, আঁচল উড়ছে। এবং পুলকের কোঁচা লুটিয়ে পড়তে পড়তে ঝড় আবার তুলে নিচ্ছে ওপরে। ঘন ঝাপসা মতো আধো আলো অন্ধকারে ওরা প্রবল বর্ষণে ভিজে ভিজে মাঠময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কোনো কোনো দিন, চুপচাপ বসে থাকলে জানলায় রাখা মাথাটা কেমন ফাঁকা মনে হত ওর। অসহ্য লাগত সব কিছু। এবং সে ছটফট করত ভিতরে ভিতরে। ছুটে যাবার ইচ্ছা হত। ওকে জোর করে ধরে নিয়ে কি যেন করার ইচ্ছা হত। নন্দিনীর বর ওর চেয়ে কত বড়। প্রায় দশ বছরের। নন্দীর বর তবু পুলককে দাদা বলে ডাকে। পুলক এসব ভেবে একদিন হা হা করে হেসেছিল জানালায় বসে। নন্দিনী কোনোদিন আর তার মেসবাড়িতে দেখা করতে এল না।

তারপর তার এই নিরুদ্দেশে চলে আসা। জাহাজে জাহাজে কাজ। তার যা বিদ্যা সে জাহাজে মোটামুটি একটা কেরানীর চাকরি পেতে পারত। কিন্তু কেন জানি সেই যে অভিমান নিয়ে সে জাহাজের জাহাজী হয়ে বের হয়ে এল এবং আর তার যেন কোনো ব্যাপারেই মোহ নেই। এবং নন্দিনীকে ফের দেখা হলে সে যা যা বলত, এখন ঠিক সে সবই এই সব দূরের বন্দরে সমুদ্রের কোনো নির্জন দ্বীপে, চিনার গাছের জঙ্গলে এবং কোনো নীল উপত্যকায় লিখে রাখে। লিখে রাখতে রাখতে মনে হয় পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য নন্দিনী ওর শুষে নিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম মনে হল ব্রাউস আর এক মেয়ের নাম, যে আজ হোক কাল হোক মরে যাবে, যে সমুদ্রের সোনালী দ্বীপ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছে কারণ সবারই জীবনে একটা সোনালী দ্বীপ চাই, সেটার জন্য সবাই ছুটে মরছে। নন্দিনী কি তার সোনালী দ্বীপ আবিষ্কার করে ফেলেছে। চিঠি লিখে এসব জেনে নেবে এমন ভাবল। সে সেজন্যই আর শুতে গেল না। নিচের বাংকটা খালি। এখানে সবাই কাজের ফাঁকে বিশ্রামের জন্য এসে বসে। একটা পুরানো ম্যাট্রেস পাতা আছে। সে ওপরের আলোটা জ্বেলে রাখল না। ঘুম ভেঙে গেলে সবাই চেঁচামেচি করবে। সেজন্য সে নিচের আলোটা জ্বেলে হাতের দস্তানা খুলে লকার থেকে কাগজ এবং কলম বের করে লিখতে বসে প্রথমেই লিখল,

সুচরিতাষু,

তোমাকে সহসা একটা চিঠি লিখে ফেলছি। তুমি কেমন আছো জানি না। এ চিঠি পেয়ে তুমি কি ভাববে তাও জানি না। তবু আমাকে কেন জানি লিখতে হচ্ছে। অনেক কথা লিখব বলে বসেছি। তুমি সব কথা মনে করে রেখেছ কিনা জানি না। কিন্তু আমি একা এবং সমুদ্রের মতো আমি নিঃসঙ্গ বলে মনে করে রেখেছি। তুমি হয়তো ভুলে গেছ সব।

এইটুকু লিখেই সে কেমন আর লেখার কিছু পাচ্ছে না। কেন জানি ওর মনে হচ্ছে নন্দিনী এখন একা জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। সামনের মাঠ ফাঁকা। মাঠে কত সবুজ গাছপালা ছিল, নিমেষে সব মুছে গিয়ে রুক্ষ মাঠ চোখের ওপর ভেসে উঠেছে।

তা হলে কি নন্দিনীর কাছে এখন আর কোনো জীবনের রহস্য বলে পদার্থ নেই। পাঁচ বছরে ওর মানুষটি ওর সব চুরি করে নিয়েছে। ওর যা কিছু ছিল, গর্ব করার মতো যা কিছু ছিল, সব ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে! সে হাই তুলল এবার। কাল খুব সকালে উঠতে হবে। সে চিঠি ছিঁড়ে ফেলল। এবং পোর্টহোলে ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

## পাঁচ

আজ ঝড়ো হাওয়াটা তেমন নেই। সকাল থেকেই ডেকের জাহাজীরা বোট ডেকে উঠে গেছে। ডেক-টিণ্ডালে ব্রীজের ছাদে উঠে সি-ওয়াটার ভালবগুলো খুলে দিচ্ছে। নিচে হোস পাইপে জল মারছে জাহাজীরা। আকাশ পরিচ্ছন্ন। এখনও সূর্য ওঠে নি। আটটা বেজে গেছে। সূর্য উঠতে প্রায় সাড়ে আটটা বেজে যাবে। ওদের ওয়াচ সাতটা থেকে। তখন ডেকে যথেষ্ট অন্ধকার থাকে। তখনও মনে হয় রাত

আছে এবং নীল লাল আলো বন্দরের চারপাশে জ্বলতে থাকে। এবং এই ঠাণ্ডায় যারা বন্দরে কাজ করতে আসে তারা কেউ কেউ শুকনো ডাল, অথবা ঘাস পাতা দিয়ে আগুন জেবলে রাখে ক্রেনের নিচে। পুলক রেলিঙে দাঁড়িয়ে সেই আগুনের ভিতর ব্রাউসের মুখ যেন দেখতে পেল।

গতকাল সে গিয়েছিল ব্রাউসের বাড়িতে। ওর বাবা বাড়ি ছিল না। ওর ঠাকুমা একটা ছোট মোয়ার দিয়ে সামনের লনে ঘাস ছেঁটে দিচ্ছিল। একটা বেতের চেয়ারে ব্রাউস বসেছিল। সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসছে। ওকে দেখেই ইলিয়া ছুটে এসেছিল। এবং ভিতরে নিয়ে বসাতে চাইলে ও বলেছিল, এই তো বেশ। আপনি একটু বিশ্রাম নিন। মোয়ার দিয়ে আমি ঘাস কেটে দিচ্ছি।

ইলিয়া বলেছিল, তা কি করে হয়?

- কেন হবে না!

--তুমি বরং ব্রাউসের সঙ্গে গল্প কর। আমি তোমার জন্যে কফি করে আনছি।

—না মাদাম ইলিয়া। আমি এলে, আপনি যদি এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েন তবে আর আসব না। বলে সে আর দেরি করে নি। মোয়ারটা টেনে টেনে এক কোনায় নিয়ে গিয়েছিল। এবং চাকাগুলো অ্যাডজাস্ট করে সে এমন নিখুঁতভাবে ঘাস কেটেছিল যে ইলিয়া দেখে অবাক।

ইলিয়ার হাতে কোনো কাজ থাকে না বিকেলে। সে তার বাগানে পড়ে থাকে। বাগানের মাঝখানে ব্রাউস স্থির অপলক বসে আছে। প্রায় দেবীর মতো চোখ মুখ তার। বিষণ্ণ প্রতিমা এই ব্রাউস। এবং যারাই গাড়িতে অথবা বাসে এসে এখানে নেমে যায়, দেখতে পায় এক বৃদ্ধা এক সুন্দরী কিশোরীকে বসিয়ে রেখেছে গোলাপের বাগানে এবং নিজে কখনও গাছের পাতা ছেঁটে দিচ্ছে, কখনও কথা বলছে ব্রাউসের সঙ্গে।

—আচ্ছা ব্রাউস, এই গোলাপটা কত ইঞ্চি হবে বলত এটার রঙ কালো হল কেন! এই যে লাল রঙের গোলাপ এটাকে বলে এডিনবরার গোলাপ। তোমার দাদু আনিয়েছিলেন। কি সুন্দর?

কখনও পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে--কি, এখন কি গাছগুলোর ডাল ছেঁটে দেওয়ার সময় হল? এই তো শীতকাল এসে গেল। এখন বরং গোড়ায় কিছু এমনিয়া দিয়ে দি। কি বলিস ব্রাউস?

ইলিয়া কাজ করছিল আর অনবরত কথা বলে যাচ্ছিল। সে যখন ঘরে থাকে, তখনও সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে জিজ্ঞেস করে যাবে, কিরে ব্রাউস এখন কি এই নীল রঙের পর্দা মানাবে? আমি বলছিলাম এখন তো বসন্তকাল এসে যাচ্ছে, হলুদ রঙের পর্দা করে দিলে কেমন হয়? তোর কি মত? তা হলে দিতে বলছিস! যখন সব কিছুই ভবিতব্যের সামিল তখন সে ব্রাউসের সঙ্গে তুই-তুকারি করে। আবার যখন মনে হয়, না বেঁচে যাবে, ভবিতব্য বলে কিছু নেই, চেষ্টা, মানুষের অনন্ত চেষ্টায় কিনা হয় তখন ইলিয়া বলবে, ব্রাউস এবার আমরা, পামার হিলসের জলপ্রপাতের পাশেই যে সুন্দর ঘাসের ঘর আছে, তোমার জন্যে তার ঘর ভাড়া করব।

কিন্তু ব্রাউসের কোনো সাড়া থাকে না। সে যেমন চুপচাপ বসে থাকে তেমন চুপচাপই বসে থাকে, যেন সে দূরের সমুদ্র গর্জন শুনতে পাচ্ছে। ব্রাউস আশ্চর্য রকমের তখন নীল হয়ে যায়।

পুলক সারাটা বিকাল কাজ করেছে বাগানে। ইলিয়া ঘরে কফি করেছে। দু টুকরো মটন স্যান্ডউইচ এবং একটু পনিরের সঙ্গে গাজর সিদ্ধ করে এনে দিয়েছে পুলককে। কি সুন্দর সুন্দর সারি সারি গোলাপের গাছ। লনের চারিদিকটা গোলাপের কেয়ারি করা বাগানগুলো থেকে এবার সব পাতা ঝরে যাবে। ফুল ফুটবে না। বরফ পড়ার আগে যেন ইলিয়া দুহাতে এইসব গাছগুলোকে পরিচর্যা করছে। কারণ যখন বরফ পড়তে শুরু করবে, তখন এইসব গাছগুলো বরফের গাছ হয়ে যাবে। আশ্চর্য রকমের সাদা হয়ে যাবে চারপাশটা। কাঁচের জানালায় বরফ পড়ে নকশি কাঁথার মাঠ হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে সেখানে ব্রাউস তার সরু সুন্দর আঙুলে দাগ কেটে কেটে বুঝি লিখবে, আগামী বসন্তে আমি মরে যাব পুলক।

গত বিকেলে সে নানাভাবে কথা বলার চেষ্টা করেছে, কিছুক্ষণ সামনা-সামনি দুজন বসেছিল। গরম জ্যাকেট গায়ে ব্রাউসের। হাতে সবুজ রঙের দস্তানা এবং সাদা রঙের ফ্রকে একটা পাখি। গাছটার কোনো পাতা নেই। অথচ পাখিটা গাছে বসে রয়েছে।

পুলক গাছ পাখি, ফ্রকের সাদা রঙ, হাতের দস্তানা এবং বিষণ্ণ মুখ দেখে বলেছিল, ব্রাউস, তুমি বলেছিলে সোনালী দ্বীপে যাবে। সেটা কবে যেতে চাও, আমি নিয়ে যাব। অথবা সেই সব কৌতুক এখন এখানে করা চলে কিনা! সে ভাঁড় সাজবে। এবং যেমন একজন কমেডিয়ান সকল দর্শককে হাসায়, সে তেমনি কোনো হাসির গল্প বলে হাসাবে। হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে কিনা দেখার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল পুলক এবং মাই লেডি বলে কিছু বলতেই ব্রাউস বলেছিল, পুলক তুমি বোস। তুমি দাঁড়িয়ে হাত পা নাড়লে আমার ভয় করে।

পুলক বলেছিল, আমার সঙ্গে তবে এস। আমি হাত পা নাড়ব না। আমরা বালিয়াড়িতে গিয়ে বসব। তোমাকে পেনিব খেলা দেখাব।

আমার ভাল লাগে না কিছু।

—কেন ভাল লাগে না।

--জানি না। আমার কিছু ভাল লাগে না।

পুলকের সঙ্গে এত কথা বলছে, এমন সব কথা একেবারে আপনার জন যেন এই পুলক, সে বলল, তুমি কখনও কোনো সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে গেছ ব্রাউস?

কি করে যাব বল।

—আমার ইচ্ছা হয় তোমাকে নিয়ে তেমন এক দ্বীপে চলে যাই। নানা রকমের রঙিন গাছপালা রোপণ করব। যেখানে যত ছোট ছোট রবিন পাখি আছে - অথবা মুনিয়া - সব ছেড়ে দেব আকাশে।

পুলক খুব ছেলেমানুষের মতো কথা বলছে এখন। যেন সে নাবিক নয়। এক বালক, সরল বালক--সে যে কিভাবে আরম্ভ করবে কথা, এবং কি কি কথায় ব্রাউস আনন্দ পাবে, ওর ভিতরে যে গ্লানি দেখা দিয়েছে সেটা সরে যাবে এমন কি কথা আছে, পৃথিবীতে এমন কি রহস্য আছে জীবনে বেঁচে থাকার, যা এই মেয়ের প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে।

তখন ব্রাউস বলল, বরফ পড়লেই বাবা আমাকে লাইট হাউসে নিয়ে যাবে। ঠাকুমাকে নিয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু তিনি যাবেন না। তারপরই মনে হল কি দেখে, অঃ ইলিয়া চলে আসছে, যেন ইলিয়াকে দেখে ফের গম্ভীর হয়ে গেল ব্রাউস।

আহা নিমেষের জন্য পুলক দেখেছিল একেবারে স্বাভাবিক মুখ। সে বলল,

ব্রাউস। তারপর কি বল! আমি তোমার কথা সব শুনব।

পুলক এমন আগ্রহভরে তাকিয়েছিল যে ব্রাউস বলল, পুলক- আমার কিছু ভাল লাগে না। আমি মরে যাব ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।

—কেন তুমি মরে যাবে!

—কেন যে মরে যাব জানি না।

—তোমার কি কষ্ট ব্রাউস?

আমার কি কষ্ট! আমার কষ্ট এই যে সুন্দর সব ফুলের গাছ, বরফ পড়লেই তারা সব ঝরে যেতে থাকবে। কিছুই গাছে থাকে না। সব ঝরে যায়। আমার বড় কষ্ট হয় পুলক। কোনো কষ্টের ছবি দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না। শরীর আমার ঠান্ডা হয়ে আসে, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে, যেমন আমার মা ঠান্ডা হতে হতে ক্রমে মরে গেলেন।

—এটা তোমার অহেতুক ভয় ব্রাউস।

—তুমি পুলক দেখছি ডাক্তারের মতো কথা বলছ।

—না না আমি ডাক্তার নই। আমি সামান্য জাহাজী।

—ডাক্তারের কাছে গেলেই বলবে এটা তোমার মনের রোগ ব্রাউস। আমার মনের রোগ তো, আমার মামারা, মা এবং দিদিমার বোন, তার মা সবাই এ-ভাবে মরে গেল কেন পুলক?

পুলক এ-কথার জবাব দিতে পারছিল না। সে চুপ করে ছিল।

সন্ধ্যা নামার আগেই সব আলোগুলো জেবলে দেওয়া হয়েছিল। সে কেন জানি ভাবল, ব্রাউসকে একবার কোনো অন্ধকারের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে। অন্ধ-কারকে ওর বড় ভয়। সে অন্ধকারে গেলেই অযথা সারাক্ষণ চিৎকার করে। আমি যাব, তোমরা কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলে! আমি বাড়ি যাব।

শুধু ব্রাউস কেন, ওর মা এবং ওদের যার যার এমন একটা রোগ দেখা দেয় তাদের জন্য অন্ধকার বড় ভয়াবহ।

ইলিয়া একসময় ফাঁক বুঝে কাছে এসে বলেছিল, পুলক, ব্রাউস আজ আমার কাছে খাবার চেয়ে খেয়েছে। পুলক, তারপরই আবার সেই ব্রাউস। ওর মার মতো জানালায় বসে যেন সমুদ্র গর্জন শুনছে। তুমি যতদিন এ বন্দরে আছো একবার অন্তত এসো। ইমাদুল্লাকে আসতে বলো।

সে বলেছিল, বলব মাদাম ইলিয়া। আমি নিশ্চয়ই আসব।

সে নিশ্চয়ই আর যাবে কি, যেন এই যাওয়া এখন আর ওর হাতে নেই। যে কোনো কারণেই হোক ব্রাউস ওর কথায় কেমন সাড়া দিচ্ছে। আর সেও কোনোদিন জীবনে এমন বাহবা অথবা সে যে একবার এক দূরবর্তী ভালবাসার ভিতর আচ্ছন্ন ছিল, ক্রমে যেন এই ব্রাউস তা কেড়ে নিচ্ছে। সে চিঠি লিখতে পারে নি। সে এখন কতক্ষণে বারটা বাজবে, কতক্ষণে দুটো খেয়ে জাহাজ থেকে ছুটি নিয়ে চলে যাবে কিনারায় সেই আশায় আছে।

গতকালও সে হাফ ছুটি নিয়েছিল। ইমাদুল্লাকে সারেঙ ভয় পায়। সে ইমাদুল্লাকে দিয়ে ছুটি করিয়ে নিয়েছে। সারেঙ এখন কাজের চাপ কম বলে, ওকে ছেড়ে দিচ্ছে। কারণ এখন এ অঞ্চলে দুটো না বাজতেই সূর্য হেলে যায়। চারটা না বাজতেই রাত। সে যে কি করে ওকে নিয়ে যাবে সেই দ্বীপে, যেখানে সেই এক পাহাড় মাথা উঁচু করে একেবারে মানবী সেজে সমস্ত আকাশে তুরে ফুরে

বস্তুত পুলকের এ সবই কৌতুক। এবং সে আজ এই দিনে কিছু কিছু কৌতুককর হাসি অথবা কথা বলে যেন, আর তো দেখা হবে না সুতরাং নিজের যা কিছু গুণাগুণ সব গ্রাউসকে দেখিয়ে দেওয়া। সে চলে গেলেই গ্রাউস আবার বিষণ্ণ হয়ে যাবে। সে গ্রাউসকে এত করেও বুঝি ভাল করতে পারল না। বস্তুত গ্রাউসকে ভাল করার চেয়েও ওর কাছে এখন গ্রাউস যদি সামান্য সময়ের জন্য বিষণ্ণ হয়ে যায়, ওর ভিতরটা কেমন বেদনায় মুষড়ে ওঠে।

এখন প্রার্থনার সময়, খাওয়ার সময় নয়। প্রার্থনা শেষে খেতে হয়। কুনুইয়ের ঠেলায় গ্রাউস পুলককে এমন বোঝাতে চেয়েছিল। কারণ সকলেই যখন ভোজ্যদ্রব্য সামনে রেখে প্রার্থনা করছে তখন তুমি কেন খাচ্ছ! ভোজ্যদ্রব্য বলতে গ্রিনপিজ সেদ্ধ। আস্ত বাচ্চা ভেড়ার রোস্ট। বড় একটা কেক। এবং সুপ জাতীয় কিছু, ডাল অথবা মাংসের ঝোল। এবং সেই খামার থেকে আনা পুরানো সঞ্চিত দামী মদ। পুলক ভেবেছিল, বুড়ি এবার সকলকে খেতে বলছে। সে নিচু হয়ে দু' চামচ গ্রিনপিজ এবং সামান্য পনীর সহ নরম রোস্ট থেকে মাংস ছিঁড়ে খাবার লোভে মুখে পুরে দিতেই গ্রাউস ঠেলা দিয়েছিল কুনুই দিয়ে। ডেকে বললে অপ্রস্তুত হবে পুলক। সে কুনুইতে ঠেলা মেরে সজাগ করে দিয়েছিল। ইলিয়া খেতে বলে নি, এখন প্রার্থনা করতে বলেছে—পুলক ঠেলা খেয়ে এসব টের পেয়েছিল। সুতরাং সে মাথা নিচু করে যেমন সাপ ব্যাঙ গিলে বসে থাকে তেমনি সে লজ্জায় চোখ মুখ বুজে বসেছিল। কিন্তু পরে ঠেলা খেয়ে সে এমন চোখ মুখ করে তাকাল যে গ্রাউস হাসিতে গড়িয়ে পড়ল।

মিলান টেবিলের ওপাশে খাচ্ছে। সে মেয়ের এই হাসি দেখে ভাবল, যে এমন হাসতে পারে, সে আর বিষণ্ণতায় ভুগতে পারে না। সে পুলককে প্রশ্ন করল, তোমাদের জাহাজ আর কতদিন আছে?

সে বলল, বলতে পারব না স্যার। কবে যে জাহাজ ছাড়ছে কাপ্তানও বলতে পারবে না।

—কেন?

—এজেন্ট অফিস থেকে এখন পর্যন্ত খবরই এল না। আমরা এখান থেকে কি নিয়ে কোথায় যাবো?

—বরফ পড়লে আমাদের লাইট-হাউসে চলে এস। তুমি খা… অকলেণ্ডের বাসে পিয়াদ্রোতে নাম, তবে মাইল পাঁচেকের মতো পথ। বরফ পড়লে হেঁটে মেরে দিতে পার পথটা।

কিন্তু গ্রাউস বলল, বাবা, ও যদি ঠিক মতো চিনে যেতে না পারে! বরফ যেখানে পাতলা, সেখানটা ভেঙে জলে ডুবে যাবে।

মিলান বলল, তা ঠিক। তুমি সাবধানে যাবে। খুব রিস্কি যাওয়া।

গ্রাউস বলল, না পুলক, তোমাকে যেতে হবে না। এইটুকু বলতেই গ্রাউসের বুকটা ভীষণ মুচড়ে উঠল। এবং বাবাকে তার কেন জানি আজ বড় স্বার্থপর মনে হল।

আর সেদিনই প্রথম পুলক জাহাজে ফিরেছিল টাল মাটাল হয়ে। সে ভীষণ মদ্যপান করে ফিরেছে। সে মাস্টের নিচে এসে অনেকক্ষণ বসে থাকল। ইমাদুল্লা জেগে আছে। কারণ বন্দরে তুষার ঝড় আরম্ভ হয়ে গেছে। এখনও ছোকরাটা ফিরে এল না। সে উঠে গিয়ে দেখল পুলক মাস্টের নিচে চুপচাপ গুঁড়ি মেরে এই ঠাণ্ডায়

বসে রয়েছে। ওর হাত-পা সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চোখে মুখে কেমন একটা আর্তি ফুটে উঠেছে।

ইমাদুল্লা বলল, এখানে বসে বসে কি করছ?

সে জড়ানো গলায় বলল, পাখিটা মাস্টে আছে, না উড়ে গেছে?

অথবা সে যেন বলতে চাইল, চাচা আমাকে ওরা একটা পেনি দিয়েছে। সেই পেনিটা ছিল কেকের ভিতর। কেকটা খেতে গিয়ে পেনিটা গলায় কেমন আটকে গেছে। তারপর যেমন আমি ইচ্ছা করলে ওক দিয়ে গলা থেকে পেনি তুলতে পারি, এক পেনি, দু' পেনি, তেমনি করে কেবল সরাক্ষণ আমি খেলা দেখালাম, ওক দিয়ে গলা থেকে পেনি তোলার। ব্রাউস কি হেসেছে! একটু থেমে ফিসফিস গলায় বলল, আসার পথে দেখি ব্রাউস ওর জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। একা। কাছে গেলাম। দেখলাম চোখে জল ব্রাউসের। সে একা একা ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে! জান চাচা আমার কান্না-ফান্না ভাল লাগে না। কান্না দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না। ওকে হাসাবার জন্য সেই পেনিটা গিলে ফের ওক দিলাম ওর সামনে। ওক দিতেই জিভে পেনিটা, আবার ওক ফের একটা পেনি জিভে। প্রতি ওকে একটা পেনি, ওর কোঁচড়ে এতগুলা পেনি দিলাম। কিন্তু যাকে কত অবহেলায় হাসিয়েছি, সে আমার পেনির খেলাটা দেখে হাসল না। আরও জোরে জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। চাচা আমি জান কান্না-ফান্না সহ্য করতে পারি না। তাই একটু খেয়েছি। আচ্ছা একটু টেনেছি বলে কি দোষ করেছি?

না, কোন দোষ কর নি। ডেকে দাড়ানো যাচ্ছে না। দেখছ কেমন তুষারপাত হচ্ছে। বলে ঠেলতে ঠেলতে সে ওকে নিয়ে সিঁড়ির ভিতর টেনে ফেলে দিল। তার-পর দরজা বন্ধ করে বলল, তুমি কি মরে যাবে ভেবেছ!

কেন এ-কথা বলছ চাচা! আমি মরে যাব কেন?

এই তুষারপাতে কেউ বের হয়? আর ওদেরই বা কি আক্কেল তোমাকে এ-অবস্থায় ছেড়ে দিল!

- ওদের দোষ দিও না মাইরি। ওরা আমাকে জেটিতে ছেড়ে গেছে। ওরা চলে গেলে আমি কি করব ভেবে পেলাম না। জান, ব্রাউস কাল ওর বাবার সংগে লাইট-হাউসে চলে যাচ্ছে!

ইমাদুল্লা কথা বলছে আর ওর জামাকাপড় খুলে দিচ্ছে। ভিতরে এখন প্রত্যেক ঘরে ইলেকট্রিক হিটার জ্বালানো। সুতরাং পুলককে একেবারে চাংগা করে দিল ইমাদুল্লা। তারপর ওর পাজামা, একটা গেঞ্জি, ফুলহাতা ফানেলের জামা গায়ে দিয়ে ওর বাংকে শুইয়ে দিল। অন্যান্য জাহাজীরা এসে ভিড় করেছিল, কিন্তু ইমাদুল্লার এক ধমকে যে যার ফোকশালে চলে গেল।

সারারাত বন্দরে তুষার ঝড়টা ছিল। ভোরের দিকে তুষার ঝড়টা আর থাকল না। এখন ক্রমে বরফ পড়ছে। সমুদ্রের জল পর্যন্ত বরফ হয়ে যাবে। এজেন্ট অফিস থেকে কি মাল বোঝাই হবে কোন খবরই দিচ্ছে না। এবং যে-ভাবে তুষার ঝড় শেষে বরফ পড়তে শুরু করেছে তাতে করে এই বন্দরে অনেকদিন আটকা পড়ে থাকতে হবে। বিকেলের দিকে পুলক কোত্থেকে একটা স্কীপ নিয়ে জাহাজের গংগাবাজুতে ভিড়িয়ে দিল। সে ডাকল, ইমাদুল্লা চাচা দ্বীপে যাবে!

ইমাদুল্লা রেলিঙে উঁকি দিল ডাক শুনে। কে ডাকছে! এখন আর তুষার ঝড় হচ্ছে না। বাইরে বের হওয়া তেমন কষ্টকর নয়। সে উঁকি দিতেই দেখল পুলক

জাহাজের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। সে ডেকের ওপর থেকে বলল, কোথায় ?

—লায়ন রকে।

—কেন ?

-পাখিটা আর জাহাজে আসছে না। পাখিটা কেমন আছে দেখতে যাব।

—পাখি দেখার তোমার এত গরজ কেন বাপু বুঝি না!

তুমি না গেলে আমি একাই যাব। দেখে আসি পাখিটা কেমন আছে।

লায়ন রক তো অনেক দূরে।

বোটে যেতে হাফ্ এন আওয়ার। সে কম করেই বলল। যেন সে এখন এ-বন্দর সম্পর্কে ইমাদুল্লার চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখে।

এক দেড় ঘণ্টার আগে যেতে পারবে না।

- তা লাগলে আর করার কি আছে। তোমার সেই যে ডিভাইন লেডি, ডিভাইন না ছাই। দু' ঠ্যাঙয়ালা একটা গাছের মতো।

ইমাদুল্লা দেখল একদিনে পুলক কেমন একটু বেয়াড়া হয়ে গেছে। এ-সময় সমুদ্রের অবস্থা ঠিক থাকে না। কোথাও বরফ ভাসতে পারে। এবং বোটের সঙ্গে ধাক্কা খেলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। জীবন বিপন্ন করে কি দরকার যে যাওয়ার বোঝা যাচ্ছে না। সে বলল, পুলক তুমি মরে যাবে। এখন সমুদ্র ভয়াবহ। কখন কি হবে বলতে পার না।

সে কোন কথাতেই আর কর্ণপাত করল না। বিকেল হলেই ছুটি। কাজ নেই একেবারে জাহাজে। সে কোথায় যাচ্ছে, কি করছে কারো দেখার নেই। সে কাজের সময় উপস্থিত থাকলেই হল। সুতরাং ইমাদুল্লা কিছু বলতে পারল না। একবার ভাবল, ব্রাউসের কাছে যাবে কিন্তু ব্রাউসও নেই। সে তো বরফ কাটা জাহাজে আজ সকালে লাইট-হাউসে চলে গেছে।

## নয়

পুলক খাড়ি থেকে একটা স্কীপ ভাড়া করে নিল। সে আজ একা। সেদিন ব্রাউস ওর সঙ্গে ছিল। আজ ব্রাউস নেই। বরং সেই দ্বীপে গেলে লাইট-হাউসটা দেখা যায়। সে মেজ-মালোমের কাছ থেকে দূরবীনটা চেয়ে নিল। অর্থাৎ এই যে ছুটির দিন, এই ছুটির দিনে যে কি করে সেই দ্বীপে যাওয়া যায়, এবং গিয়ে অনেক দূর থেকে দূরবীনে ব্রাউসের মুখ অথবা সেই পাখিটা যা ছিল এতদিনের নিত্য সহচর। অর্থাৎ পাখিটা প্রথম জাহাজে এসেছিল তার পুরুষ-পাখিটাকে নিয়ে। তখন ঝড় সমুদ্রে। সে তার পুরুষ-পাখিটার সঙ্গে এসেছিল। পুরুষ-পাখিটা খুব সম্ভবত রুগ্ন ছিল, সে উড়তে পারত না, তাকে প্রায় সময় মাস্টে বসে থাকতে দেখা যেত। এবং মেয়ে-পাখিটা জাহাজের চারপাশ থেকে অথবা সমুদ্রের ঢেউ থেকে ছোট ছোট ফ্লাইং ফিস ধরে আনত। এবং মাস্টে বসে দুজনে বেশ খেত। অথচ এত করেও একদিন দেখা গেল পাখিটা বেঁচে থাকল না। সকালে সবাই দেখল মাস্টের নিচে পুরুষ অ্যালবাট্রস পাখিটা মরে পড়ে আছে।

এবং এ ভাবে এক মায়া, মায়া বেড়ে যায়। জাহাজীদের নিঃসঙ্গ সমুদ্রযাত্রায় পাখিটা অদ্ভুত এক প্রিয়জনের ভূমিকা নিল। জাহাজীদের কাজ থাকে না ওয়াচের

পর। ওরা পাখিটাকে তখন খাওয়াতে ভালবাসত। নানারকমের ফলমূল, কখনও মাংস এবং মাছ পাখিটার জন্য মাস্টের গোড়ায় রেখে দিলে সে ঠিকটাক খেয়ে যেত। পাখিটা উড়ে আর সমুদ্রে যেত না। মাঝে মাঝে জাহাজের চারপাশে ঘুরে ঘুরে নীল জলের ওপর এক মায়াবী খেলা সৃষ্টি করত।

পাখিটার জন্য পুলকেরও ভীষণ মায়া ছিল। সে তো পাখিটাকে যেন আলাদা করে ভাবত না। পাখিটা তার কাছে নন্দিনীর মতো অসহায় ছিল। অথবা ওর মনে হত বেশ হয় যদি সে পাখিটার ডানায় একটুকরো কাগজ আটকে দেয় এবং লিখে দেয় —নন্দিনী আমার এ ভালবাসা নিরন্তর সুষমা বয়ে বেড়ায়। এখন সে পাখিটাকে পেলে যেন আরও লিখে দিত, ব্রাউস বড় সুন্দর নাম।

ব্রাউস লাইট-হাউসে চলে যাবার পর তার কিছুই ভাল লাগছিল না। সে কেমন একগুঁয়ে হয়ে উঠছে। কাপ্তান অথবা মেজমালোমকে সে ভয় পাচ্ছে না। মেজ মিস্ত্রিকে সে কেমন একটু অবহেলা করছে। কারণ ওর এ ভাবে জাহাজ থেকে নেমে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। তবু সে ছোট, এবং কম বয়সী বলে তাকে নানা ভাবে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু সে যেন বড় বেশি সে সুযোগ নিয়ে ফেলছে। নিজের মনেই সে কেমন সামান্য নিজেকে অপরাধী ভাবল।

পুলকের বোট ছিল সাদা রঙের। দুপুরের দিকে যে গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারপাত ছিল এখন সেটা নেই। এই দুদিনেই কেমন সমুদ্রের চেহারা পালটে গেছে। মাঝে মাঝে সাদা সাদা ফেনার মতো ঢেউ উঠছে, অথচ সাদা ভাবটা ভেঙে যাচ্ছে না। এবং ক্রমে এরাই জমতে জমতে বরফ হয়ে যাবে। কিনারে যে সব গাছপালা আছে সব ক্রমে কেমন নেড়া হয়ে গেল। আশ্চর্য ঝড়ো হাওয়া আর বড় বড় ঢেউ। ওর স্কীপটা জাহাজ থেকে আর দেখা যাচ্ছিল না। ইমাদুল্লা জাহাজে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সে রেলিঙে ঝুঁকে আছে। স্কীপটা বেশ এঁকে বেঁকে ঢেউয়ের মাথায় একবার হারিয়ে যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে। এখনও এ সব অঞ্চলে চোরা স্রোত সমুদ্রের অতল থেকে ভেসে ওঠে নি। ভয়ংকর সব চোরা স্রোত। এই সব চোরা স্রোতে পড়ে গেলে সাধ্য কি পুলক স্কীপের স্টিয়ারিং ঠিক রাখে। চোরা স্রোত সম্পর্কে ওকে কিছুটা যেন বলে দেওয়া উচিত ছিল।

ঝড়ো বাতাসের জন্য ইমাদুল্লা বেশি সময় ডেকে দাঁড়াতে পারল না। জাহাজে এখন তেমন কোন কাজ নেই। জাহাজের যা কিছু রঙ করা বাকি ছিল এই যেমন ডেক, মেসরুম, ফরোয়ার্ড পিকের চার নম্বর ডেরিক সবই রঙ করা হয়ে গেলে বাকি থাকে শুধু সব দড়াদড়ি তুলে রাখা। এখন জাহাজীরা আফটার পিকে সব দড়াদড়ি বাঁধছে। ওয়ারপিন ড্রামের হাসিল পালটে দিচ্ছে। কাজ না থাকে তো খৈ ভাজ। এমনই একটা ব্যাপার এখন জাহাজে চলছে। অথচ জাহাজটা কেন যে বন্দর ছাড়ছে না বোঝা যাচ্ছে না। যে ভাবে ক্রমে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাতে করে বন্দর ছেড়ে চলে যাওয়াই ভাল। নাকি কাপ্তান খবর পেয়েছে, সমুদ্রে এক ভয়ংকর সাইক্লোন ওঠার সম্ভাবনা আছে। সব না দেখে জাহাজ ছাড়া ঠিক হবে না।

ইমাদুল্লা এবার সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে এল। ওর ফোকশাল থেকে পোর্টহোল দিয়ে সমুদ্র তেমন ভালভাবে দেখা যায় না। তবু সে অবাক, পোর্টহোলের নীল কাচে বিন্দুমতো একটা সাদা রঙের দৃশ্য ভাসতে দেখল। প্রথম সে বুঝতে পারল না ব্যাপারটা। সমুদ্রের জল নীল বলে কাচটা কেমন সব সময় নীল রঙের হয়ে

থাকে। সেখানে সাদা এই বিন্দু কি ভাসছে। সে কাছে গেল। হাত রাখল। এবং আশ্চর্য সে দেখল, অনেক দূরের পুলকের সাদা রঙের বোটটা এখনও এই পোর্ট-হোলের কাচে ছায়া ফেলছে। অনেক দূরে অথচ ছায়া, কেমন মায়া বেড়ে যায় এ ভাবে তার। পুলকের জন্য সে আশ্চর্য এক বেদনায় মুখ ভার করে রাখে। ব্রাউসের ভালবাসায় ছেলেটা কেমন হয়ে গেল।

এবং এ ভাবে ইমাদুল্লা জানে জাহাজী মানুষের অনেক দুঃখ। এভাবে এক-ঘেয়ে সমুদ্রযাত্রার পর তীরের কোন ছবি, আপেলের গাছ, সূর্য ওঠা পাহাড়ের ওপর, জাহাজীদের পাগল করে দেয়। আর এতো মেয়ে। আশ্চর্য নাম, ব্রাউস। লম্বা। হাত-পা লাবণ্যে ভরা। নীল চোখ। সোনালি রঙের চুল। চোখে মায়া। চোখ খুব খুলে তাকায় না ব্রাউস। মুখ নিচু করে বসে থাকার অভ্যাস। এমন এক মেয়ের কাছে ধরা পড়ে গেছে পুলক। কেমন একটা ভয় এখন ইমাদুল্লাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই যে ওর যাওয়া, উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো দ্বীপে দ্বীপে, সবটাই কেমন যেন পুলক আবেগের বসে করছে। জাহাজীদের এই আবেগ ভাল না।

এই আবেগ জাহাজীদের ভাগ্যে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির জন্ম দেয়। যেমন এই পুলক এখন ইচ্ছা করলে এমন সব অঘটন ঘটাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে যে সামান্য মৃত্যু বড় তুচ্ছকর ঘটনা। সে যাচ্ছে লায়ন রকে। সেখানে লালবর্ণের পাথর। এবং নিচু দ্বীপে নানারকম পাখির বাস। সে যাচ্ছে এই মাস্টে বসে থাকা পাখিটার অনুসন্ধানে। ওটা কোন ঘটনাই নয়। কারণ সে জানে এই যে পুলক বের হয়ে গেল, দ্বীপে যাবে বলে চলে গেল— সেটা শুধু ব্রাউসকে দেখবে বলে। সে যদি সেই দ্বীপে যায় তবে ব্রাউসের বাবা যে দ্বীপে থাকে সেটা সে স্পষ্ট দেখতে পাবে। সে যদি দক্ষিণের দিকের দ্বীপটায় হেঁটে হেঁটে চলে যায় তবে খুব কাছে চলে যাবে। এবং খাড়া পাহাড়ের উত্তরের দিকটা তবে তার চোখে পড়বে।

ইমাদুল্লা বুঝতে পারল না পুলক সোজাসুজি ব্রাউসের দ্বীপে চলে যাচ্ছে না কেন। কেউ তো ওকে বারণ করে নি। সে তো অনায়াসে চলে যেতে পারে। পাখি দেখার নাম করে যাবার কি দরকার।

কিন্তু ইমাদুল্লা জানে না, এক ভীষণ অভিমান পুলককে কেমন খাপছাড়া করে দিচ্ছে। ব্রাউসের সোজাসুজি বলা, না পুলক তুমি যাবে না, এই যে তারা তোমাকে যেতে বলছেন, এটা ঠিক না, বাবা তোমার কথা কিছু বিবেচনা করছেন না, বাবা কেবল তাঁর মেয়ের দিকটা দেখছেন—তিনি জানেন, তুমি এলেই আমি ভীষণ খুশি থাকব, তিনি জানেন তোমাকে নিয়ে যেতে পারলে তার লাভ, এমন কি আমার ভয় হয়, বাবা তোমাকে কোথাও নিয়ে রেখেও দিতে পারেন, বাবা যে এখন কি পারেন না ভাবতে পারছি না, তিনি তোমার চেয়ে আমার কথা বেশি ভেবেছেন, বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে তুমি অনায়াসে আসতে পারবে দ্বীপে, কিন্তু একটু এদিক ওদিক হলে অর্থাৎ, এমন সব পাতলা আবরণ থাকে বরফের, বোঝাই যায় না, পা দিলে পাতলা কাচের মতো মুড়মুড় করে ভেঙে যাবে, এবং নিচে ডুবে গেলে চোরা স্রোত, তুমি যে সমুদ্রের ভিতর কোথায় হারিয়ে যাবে কেউ জানবে না। পুলক তুমি এলে, এ-ভাবে এলে আমি বড় দুঃখ পাব।

তখন মেয়েটা পুলককে অত কিছু বলে নি, শুধু বলেছে, তুমি আসবে না

পুলক। পুলক সেজন্য চট করে এমন একটা দ্বীপের কাছাকাছি থাকবে যেখান থেকে চুরি করে গ্রাউসকে দেখা যায়।,

পুলক এবার পিছন ফিরে তাকাল। সে আর তার জাহাজের মাস্তুল দেখতে পাচ্ছে না। সে এখন বুঝতে পারছে বেশ দূরে চলে এসেছে। লায়ন রক এবং পাশাপাশি দ্বীপগুলো ক্রমশ বড় লাগছে। এদিকটাতে বরফ জমছে না। কিনারায় সমুদ্রের জল ধীরে ধীরে জমে যাচ্ছে। এবং এই সব পাশাপাশি দ্বীপগুলোর চারপাশে বরফ জমে থাকতে পারে। কি ঠাণ্ডা! সে হাতে দস্তানা পরেছে। সাদা চামড়ার দস্তানা। মাথায় মাংকি ক্যাপ। এবং লম্বা ওভার কোট। পায়ের নিচে সালদেরাজ। সাদা রঙের মোজা। আর সাদা রঙের জুতো। তারপর গামবুট নিয়েছে। প্রয়োজন হলে বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় অথবা দ্বীপে যদি কোথাও কোন জলাভূমি থাকে সে সেসব অনায়াসে পার হয়ে যাবে।

সে স্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসে রয়েছে। প্রায় মোটর বোটটা রাজহাসের মতো সমুদ্রের জল কেটে উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমুদ্র-পাখি ওর বোটের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল। লেগুনের দু-পাশটা ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। যত সমুদ্রের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে, তত দু-পাশের পাহাড় নানারকম গাছপালা নিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। বেশ লাগছিল পুলকের। পাখিটার নাম করে সে বের হয়ে পড়ল। চারপাশটা ভীষণ নির্জন। কেবল মোটর বোটের একটা বিশ্রী শব্দ। বরফ পড়বে বলে অথবা তুষার-পাতের সময় ভেবে মানুষেরা খুব একটা কেউ আর বোটে সমুদ্রের দ্বীপগুলোতে যাচ্ছে না। সে যাচ্ছে, কারণ তার সব বলতে নন্দিনী নামের মেয়েটি কোন এক আশ্চর্য সকালের মতো তার কাছে আবার এসে যেন হাজির। গ্রাউসকে সে কেন জানি পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়ে ভেবে ফেলেছে।

সে যখন দ্বীপটায় ঢুকে গেল তখন সূর্যাস্তের সময়। সকাল সকাল সূর্যাস্ত হচ্ছে। এখানকার বিকেল বেশিক্ষণ থাকে না। অথবা সকাল শেষ হলেই বিকেল আরম্ভ হয়ে যায় এমন ভাব। সূর্য দিগন্ত রেখায় ঘুরে ঘুরে অস্ত গেলে একটা অদ্ভুত আলো, এবং স্নিগ্ধ ভাব এই দ্বীপগুলোতে ছড়িয়ে থাকে। পুলক বোট একটু ওপরে তুলে ফেলল। ' চারপাশটায় সমুদ্রের স্রোত ঘুরে ঘুরে নেমে যাচ্ছে বলে জল জমতে পারে নি। অথবা এ-অঞ্চলে কোথাও উষ্ণপ্রবাহ আছে সমুদ্রের যা কোন কোন দ্বীপের চারপাশটাকে সব সময় নীল করে রাখে। যত ঠাণ্ডাই নেমে আসুক না কেন কখনও কেউ এ-সব দ্বীপের চারপাশটায় বরফ জমতে দেখবে না। বোধ হয় এই দ্বীপটাও তেমন কিছু একটা হবে। এমন সব গাছ রয়েছে দ্বীপে যে সে হেঁটে যেতে গেলে গাছগুলো ওর কোমরের নিচে পড়ে থাকে। কোথাও সে একটা বড় গাছ দেখতে পেল না। দ্বীপে গেলেই হাজার হাজার পাখি ওর মাথার ওপর উড়তে লাগল। ওরা টের পেয়েছে—এই সব মনুষ্যের অপোগণ্ড এসে ওদের ডিম চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু তুষারপাতের সময় ওরা ডিম প্রসব করে না বলে এখন পাখিরা তেমন ভয়াবহ নয়। অন্য সময় হলে ওরা ওকে তাড়া পর্যন্ত করত।

তারপর সে সামনের দুটো ছোট টিবি পার হয়ে গেলে দেখল, পাখিগুলো আবার যার যার আস্তানায় ফিরে গেছে। সে দুপাশেই বাস দেখতে পচ্ছে। বাচ্চা পাখিগুলো পাথরের খাঁজ থেকে, ছোট ছোট গর্ত থেকে মুখ বের করে ওকে দেখছে, সে পাখিদের এমন আস্তানা কখনও দেখে নি। সব গোল বালির গর্ত।

নানাবর্ণের নুড়ি পাথর এবং কিছু খড়কুটোয়। আর এমনভাবে খড়কুটোগুলো ভাঁজ করা যে দেখলে মনে হবে ঠিক পাটি বোনার মতো বোনা।

কিন্তু যা পুলককে সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য করল, এই সব পাখিরা কোথায় যে মলমূত্র ত্যাগ করে। কোন মলমূত্রের গন্ধ সে পেল না। মনে হয় ভীষণ পরিচ্ছন্ন ব্যাপার। কেউ ধুয়েমুছে রেখে গেছে। তারপর সে আরও কিছু দূর হেঁটে গেল, দেখল একটা সমুদ্রের ভীষণ পাতলা ঢেউ এই দ্বীপের ওপর দিয়ে ক্রমে ভেসে যাচ্ছে। ওর পায়ের পাতা ভিজে গেল। পাখিগুলো কি করে যে টের পায় এ-সব, সে জানে না। সব পাখিরা নিমেষে হাওয়ায় পাখা গ্লাইড করতে থাকল। ছোট ছোট পাখিরা, যাদের ওড়বার বয়স হয় নি, ওদের জন্য প্রত্যেক বাসার কাছে একটা হাঁটু সমান পাথর। জলটা উঠে এলেই ছোট ছোট পাখিরা কোনরকমে উড়ে গিয়ে পাথরটায় বসে পড়ে। যখন শীতকাল তখনই হয়তো এমনটা ঘটে। সে ভাবল, ইমাদুল্লা চাচাকে বলে সব জেনে নেবে। এবং সেই জল ওদের মলমূত্র ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়।

এখন পুলক আর কিছু ভাবছে না। সে যাবে দক্ষিণের দ্বীপটাতে। সেখানে গেলে সে, লাইট-হাউসের আলো পড়ছে সমুদ্রে, দেখতে পাবে। এখন সূর্যাস্তের সময়। এখন ব্রাউসের বাবা আলো জ্বালবে না। আর একটু পরে হয়তো সে এ পাহাড় থেকেই ডায়নামোর শব্দ পাবে খুব নির্জন বলে, সমুদ্রের শোঁ শোঁ বাতাস, এবং তুষারপাতের জন্য পাতলা মেঘেরা পর্যন্ত আকাশের নিচে নেমে আসতে পারছে না তখন—সে শুনতে পাবে অনেক দূর থেকে মৃদু একটা শব্দ, প্রায় কম্পনের মতো ব্যাপারটা, সে টের পাবে তখন সিঁড়ি বেয়ে ব্রাউসের বাবা ওপরে উঠে যাচ্ছে। ঠিক ঠিক আলো ফেলছে কিনা, অথবা কোন গোলযোগের আশঙ্কা দেখা দিলে যে ভয়াবহ কঠিন মুখ ব্রাউসের বাবা করে রাখবে সেটা যেন সে এখানে দাঁড়িয়েও টের পাবে।

পুলক যেতে যেতে একবার সেই পাখিটার নাম করে ডাকল। কারণ জাহাজে ওরা পাখিটার একটা নাম দিয়েছিল। যেমন সবারই জাহাজে কোন না কোন নাম থাকে তেমনি পাখিটারও একটা নাম ছিল। পাখিটাকে ওরা ডাকত কপিলা বলে। বাঙালী জাহাজীদের দেওয়া নাম সাহেব-সুবে অফিসারেরা ধরতে না পারলে ওরা সবাই মিলে কপিলা মানে কি, ইংরেজিতে তার কি ব্যাখ্যা করা যায় এমন একটা সমস্যায় পড়ে গেলে একসময় সবাই সমুদ্রের নিকষ ঘন কপিশ রঙের মেঘ দেখে যেন মানেটা ধরতে পেরেছিল। কেউ আর শব্দটা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। সবাই একসঙ্গে জাহাজ থেকে ডেকে উঠেছিল ক পি লা। একসঙ্গে এমন শব্দের এক উচ্চারণ সারা জাহাজময় ডেকময় এবং সমুদ্রে আশ্চর্য ভালবাসা নিয়ে ডুবে গিয়েছিল। এখন যেন তেমনি তেমনি একটা গভীর রঙ অর্থাৎ সে যদি জোরে ডেকে ওঠে ক পি লা তবে সেই এক নিদারুণ দুঃখ এবং বেদনার কথাই ধরা পড়বে। পুরুষ পাখিটার জন্য কপিলার সেই বড় বড় চোখ এবং বিষন্নতা এখনও যেন ধরতে পারে। এবং নিজের ভিতর তেমন এক দুঃখ নিয়ে বেঁচে থাকলে গভীরে ডুবে যেতে সব সময় ভাল লাগে। সে এই যে জোরে জোরে ডাকছে -ক পি লা, এই যে দ্বীপের ভিতর ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে, ক পি লা, ক পিলা, সারা দ্বীপময় এক করুণ চেনা শব্দ ক পি লা, এবং কোথাও সাড়া নেই যার, কারণ পাখিটাকে জাহাজে নাম ধরে ডাকলে কাছে আসত, ডাকত, অর্থাৎ কথা বলার ভীষণ আকাঙ্ক্ষা, এখন তার এত-

টুকু আভাস নেই। সে ভেবে পেল না—কেন এমন হয়, পাখিটা হয়তো ভয়ে ডাকতে পারছে না, ওর পুরুষ-পাখিটা তাকে ধমক দিচ্ছে—এবং এ-ভাবেই সারা দ্বীপময় এক মেয়ে নাম যার নন্দিনী, এবং যে শৈশবে ছিল তার একমাত্র সংগী, ভালবাসার মানেটা তখনও স্পষ্ট নয়, অথচ একসংগে বড় হয়ে ওঠার ভিতর আশ্চর্য এক ভাল-বাসার সুষমা আছে যা ধরা যায় না, অথচ ছোঁয়া যায়, এমন সুষমার ভিতর সে এখন পাখিটাকে দেখতে চায়।

আর তখনই দেখল দ্বীপের শেষে সেই লাইট-হাউসের পাহাড়। পুলক দেখল, সমুদ্র থেকে খাড়া পাহাড়টা উঠে গেছে। সে লাফিয়ে লাফিয়ে এসেছে, এবং এদিকটা খুব উঁচু বলে সে নিচ থেকে দেখতে পায় নি, সামনের কিছুটা বনঝোপ এবং টিলা পার হলেই ফের সমুদ্র, সমুদ্রের ওপাশে একটা পাথরের দেয়াল একেবারে খাড়া অনেক ওপরে উঠে গেছে। এমন কি সেই পাহাড়ে এতটুকু খাঁজ নেই যে একটা সমুদ্র পাখি যেখানে বাসা বানাতে পারে। সে তার জায়গা থেকে এতটুকু নড়তে পারল না।

পৃথিবীতে এমন সব সুন্দর জায়গা ঈশ্বর সৃষ্টি করে রেখেছেন! এখানে সে সমুদ্রে এতটুকু ঢেউ দেখতে পেল না। ইচ্ছা করলে সে সাঁতরে যেন সামনের পাহাড়টায় উঠে যেতে পারে। সে চারপাশটা ভাল করে দেখছে, বা দিকে একটা ছোট্ট দ্বীপ। সেখানে কোনো গাছপালা নেই। কেবল বালি। এবং বালির সঠিক কি রঙ ধরা যাচ্ছে না। কারণ বালি, গাছপালা এবং দ্বীপের সব স্বাভাবিক রঙ এই সূর্যাস্তে কেমন স্বপ্নবৎ দেখতে। অথবা সে যেন কোনো রঙিন ছায়া ছবির নায়ক। সে এই দ্বীপে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

তারপর সে আর যা দেখল, তাতে তার বিস্ময়ের সীমা থাকল না। সে সেদিকে তাকাতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে যতটা কাছে মনে হচ্ছে পাহাড়টা, ওপরের দৃশ্য দেখে, তত কাছে নয় পাহাড়টা-বরং বেশ দূরে। সে চোখে এবার দূরবীনটা তুলে ধরল। ঠিক যা আন্দাজ করেছে তাই।

## দশ

এ-ভাবে একটা রাত কেটে গেল ব্রাউসের। ভাল ঘুম হয় নি রাতে। বাবা বুঝতে পারছিলেন, ব্রাউস সারারাত ঘুমোয় নি। কেমন কেবল এ-পাশ ও-পাশ করছে। মাঝরাতে বাবা উঠে একবার ব্রাউসের শিয়রে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন ব্রাউস এ-পাশ ও-পাশ না করে খুব ভাল মেয়ের মতো ঘুমের ভান করে থেকেছে। কারণ সে চায় না তার জন্য বাবা কোনো কষ্ট পাক। সে যদি না ঘুমোয়, বাবা চিন্তা করবে। বাবার চোখ মুখ দেখলে সে সকালে টের পায় বাবা ভীষণ কিছু ভাবছে। সে বাবাকে পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি ভালবাসে। কিন্তু তারপরই মনে হল বাবাকে সব চেয়ে বেশি ভালবাসলে কাল রাতে সে ঘুমোতে পারল না কেন। বাবা ওর শিয়রে এসে দাঁড়ালে ওকে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতে হল কেন। সে তখন কেমন উদাস হয়ে যায়।

এবং এই উদাসীনতা সে টের পায় জীবনের পক্ষে খুব খারাপ। আজ আর অন্যদিনের মতো সে বাগানের ভিতর হেঁটে বেড়ায় না। রেলিঙের ধারে এসে

ফুলের সব গাছপালায় কি সব নূতন কুঁড়ি এসেছে সে আজ খুঁজে দেখে না। বারান্দার ডেক চেয়ারে চুপচাপ কেবল বসে থাকতে ভাল লাগে।

বাবার ডিউটি সকাল ছটায়। বাবা যখন বের হয়ে গেছেন তখন অন্ধকার ছিল। এখন এখানে সকাল হতে সাড়ে আটটা। তখন দিগন্তে কিছুটা চাঁদের ফ্যাকাসে আলো নিয়ে সূর্য উঠে আসে। মনে হয় শীতের জন্য সূর্য ঠিক কিরণ দিতে পারছে না। এবং কখনও সূর্যের উত্তাপ আছে বোঝা যায় না। বাবা আসবেন ন'টায়। তখন ঘণ্টাখানেকের মতো টিফিন। বাবা এসেই খুব তাড়াতাড়ি প্যানট্রিতে ঢুকে যাবেন। বেসিনে সব কাপ প্লেট ধুয়ে সামান্য মারমেলেডের সঙ্গে রুটি কিছু গ্রীনপিজ সেদ্ধ এবং দুটো বিসকুট এই দিয়ে টিফিন। একটা আপেল কিছু খেজুর থাকবে সঙ্গে। বেশ এই দিনে ওদের টিফিন হয়ে গেলে আবার এই কোয়ার্টারে কেমন নির্জনতা। এখানে এসে ওর ভাল লাগছে না। সে ইচ্ছা করলে দাদিমার কাছে থাকতে পারত। কিন্তু সে টের পায় বাবা ওকে ছেড়ে থাকতে পারবে না বেশিদিন। ছুটি নিয়ে বাবা চলে যান তার কাছে।

সে এখন ভীষণ একটা সমস্যায় পড়ে গেছে। ওদের কোয়ার্টার পা[illegible]ল [illegible]সনদের কোয়ার্টার। এবং পরে চিফ এগ্রিকালচারের বাংলো। বাংলোটা [illegible] পড়ে থাকে সব সময়। তিনি মাঝে মাঝে ইনসপেকশানে এলে এখানে ওঠেন। [illegible] না। তিনি মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব লণ্ঠনে [illegible] আসেন। [illegible] উত্তাপ [illegible] অথবা গাছে ফুল ফুটলে পছন্দ করত। এখন সে সব [illegible] ভাল লাগে না। কিছুই ভাল লাগছে না। একদিকে [illegible] হয়েছে অনেক [illegible] ছেড়ে সে এসেছে। কেমন একা একা ভার। এই পাহাড় এবং [illegible] ভাল লাগত। অথচ অসুখটা তাকে আক্রমণ করলে সে কেমন [illegible]। এখন পৃথিবীর যাবতীয় মায়া তার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছে। [illegible] বারে বারে গড়ে উঠছিল প্রাণে। সেটা যে কেন সে বুঝতে পারছে না [illegible] সে [illegible]ম আবার কোথাও যেন তলিয়ে যাচ্ছে।

ক্লাউস দেখল বাবা পাহাড়ের কটা গোলাপ ফুলদানিতে সাজিয়ে [illegible]। তুষারপাতের সময় গোলাপের রঙ ঠিক থাকে না। কেমন বিবর্ণ হয়ে যায়। এবং পাপড়ি ঝরে যাচ্ছিল। এবার বোঝাই যায় সে যেমন শরীরের ভিতর এক [illegible] শীতলতায় ভুগে ভুগে মরে যাবে তেমনি এই গোলাপ গাছগুলো [illegible]। সবই [illegible]। বাবা মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে কথা বলছিলেন পাশে থেকে। সে বুঝতে পারছে বাবা যতক্ষণ থাকবেন ঠিক এভাবে কথা বলে যাবেন।

বুঝলে ক্লাউস বিকেলে তোমাকে নিয়ে মাছ ধরতে যাব।

বারান্দায় ক্লাউস মাথায় হাত রেখে নিচের সমুদ্র দেখছে। সেখানে কেউ নেই। ঠাণ্ডা বলে কেউ নেমে যাচ্ছে না। বারান্দার চারপাশটা কাচে ঢাকা। কাচে এখন নানারকমের নকশা তৈরি হবে। যত শীত পড়বে ঠাণ্ডা বাড়বে তত কাচে বরফ জমে ছোট ছোট লতাপাতায় গাছ তৈরি হবে। এবং এটা একটা খেলা ছিল ক্লাউসের। সে আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে কাচ থেকে সব লতাপাতা তুলে ফেলত এবং মুছে দিত। আবার সকাল হলে সে দেখতে পেত বাবা সব এর [illegible] ভেড়ার পাল কাচের ভিতর ছবির মতো এঁকে দিয়ে গেছে। সে আবার মুছে দিত সেখানে সে ফের পরদিন দেখত একটা ছোট্ট পাহাড়ের ছবি। এভাবে বাবাটা শীতের সময় যখন কেবল বরফ জমে আছে, চারপাশটা কি আশ্চর্য সাদা এবং গাছে একটা পাতা নেই,

তুষারপাতের রিনরিন শব্দ তখন সে এই দ্বীপটায় একটা সোনালি রঙের ফ্রক গায়ে দিয়ে স্কি করে বেড়াত। তার কাছে সারা দ্বীপটা বরফ পড়ে তখন মায়াবী এক দেশ। সে এ-পাহাড় থেকে সে পাহাড়ে, এ-উপত্যকা থেকে সে উপত্যকায় ঘুরে বেড়াতো। এবং কখনও দিগন্ত রেখায় পলাতক সূর্যের আলো এসে সহসা উঁকি মারলে, নীল জলের চারপাশে একটা রূপোলি রাজকন্যার দেশ যেন। সে, তার বাবা, বোসান, তার মা বাবা এ-রাজ্যের নিবাসী। আর আছে এক বুড়ো। সে এখান থেকে কোথাও যায় না। তার কাজ নেই। তবু সে কাজ করে।

কারণ এই বুড়োর সারাটা জীবন এই দ্বীপে কেটে গেছিল। তার বাবা মা এসেছিল লাইট-হাউসের কিপার হয়ে। মা বাবার পর সে এবং তার স্ত্রী। ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনার ফাঁকে এখানে আসত। এবং ছুটি কাটিয়ে আবার চলে যেত। এ-ভাবে দিন গেলে বুড়োর বয়স বাড়ে। ছেলেমেয়েরা বিয়ে থা করে আর আসে না। স্ত্রী মারা গেছে সমুদ্রে ডুবে। এটা কি আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা বুড়ো বোধহয় এখনও সেটা আবিষ্কার করতে পারে নি। ওকে সকাল হলেই দেখা যাবে হাতে লাঠি, সে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কখনও সে একটু প্যান্ট তুলে জলের পাতা ভিজিয়ে বালিতে হেঁটে হেঁটে যায়। দেখলে মনে হবে সে এবং আর একজন পাশাপাশি হাঁটছে। বুড়োর চোখে মুখে তেমন একটা ভাব থাকে। মাঝে মাঝে শোনা যায় সে কথা বলছে, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছে। বোঝা যায় বুড়োর এটা স্বভাব। সে হাঁটতে হাঁটতে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। অনেক ভালমন্দ কথা, ভালবাসার কথা। বুড়োর সব জানা আছে এই লাইট-হাউস সম্পর্কে। ব্রাউসের বাবা অথবা বোসানের মা বাবা কেউ ঠেকে গেলেই বুড়ো লোকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়। দুটো নাট বোল্ট ঠেলে ঠেলে জেনারেটরের ভিতর কি উঁকি দিয়ে দেখে তারপর কিছু টেনে দিলেই গড় গড় করে মোটরটা ঘুরতে থাকে। এক এক সময় ব্রাউসের বাবা অথবা বোসানের মা-বাবা ভাবত ওটা বুড়োরই কাণ্ড। বুড়ো ওদের বেকায়দায় ফেলার জন্য রাতে চুরি করে ওপরে উঠে যায়—এবং কোথায় কি করে আসে। এখন আর তারা তেমন ভাবে না, কারণ মনে হয় কোথাও একটা ভুতুড়ে ব্যাপার আছে এই দ্বীপে, সে জন্য মাঝে মাঝে সব অন্ধকার হয়ে যায়। তখন কি ভয় সবার! দ্বীপের ও-পাশটায় একটা যেন আলো দেখা যায়। সমুদ্র স্রোতে ফস-ফরাস ভেসে আসতে পারে, ফসফরাস ভেসে এলেও এতটা আলো হওয়া স্বাভাবিক না, ফসফরাসের কোনো কেমিকেল মিশে কিছু একটা হয়ে থাকতে পারে, বুড়োটা তখন একমাত্র হাসতে হাসতে সব ঠিক করে দেয়। স্বাভাবিক করে দেয়।

বুড়োটার সে-জন্য ওদের ঘরে বাঁধা বরাদ্দ। ও ব্রাউসের বাবার কাছে, বোসানের মা বাবার কাছে একবেলা করে খেতে পায়। সেই বুড়োটার জন্যও ব্রাউসের একটা মায়া ছিল। সেই দ্বীপটা সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানে। কোথায় কোন পাথরের খাঁজে কি চার ফেলে রাখলে কি মাছ উঠবে সে বলে দিতে পারে। অথবা কখন সব বড় বড় কাঠ ভেসে যাবে সমুদ্রের স্রোতে, এবং সে সব এনে কিনারে ফেলে রাখা অথবা কখন কোন জাহাজের আসার সময়, স্রোতে কি সব ঝিনুক কোন কোন ঋতুতে ভেসে বেড়াবে সব সে জানে। এই দ্বীপটার প্রত্যেকটা গাছ, কাঁটা, লতা এবং পাথর তার চেনা। কেউ একটা পাতা ছিঁড়লে পর্যন্ত বলে দিতে পারে, গাছটায় একটা পাতা কম।

সুতরাং এমন যখন একটা মানুষ আছে দ্বীপে তখন তার খারাপ থাকবার কথা

না। অথচ সেই অসুখটা, না কি অন্য কিছু কেমন তাকে পাগল পাগল করে রাখছে। সে বাবার সংগে খুব অন্যমনস্কভাবে খেল। বাবা মাঝে মাঝে খেতে খেতে ওকে দেখছে। সে বাবাকে কাজে সাহায্য করার জন্য নিজে কাপ প্লেট বেসিনে রেখে দিল। সে বাবাকে বলল, তুমি যাও। আমি সব ঠিক করে রাখছি।

মিলান খুব আশ্চর্য হল। মেয়ে তাকে কাজে সাহায্য করছে। এটা ঠিক ছিল ওর আগের স্বভাব। কিন্তু এমনটা ওর বেশিক্ষণ থাকে না। আবার চোখ কখন সাদা এবং বিষন্ন হয়ে যাবে, খেতে বসে মিলান পুলকের গল্প করছিল। ওর খুব প্রশংসা করছিল। পুলকের জাহাজ কবে ছাড়বে ঠিক নেই। বোধহয় বরফ গলে না গেলে যেতে পারবে না। বরফ গলে না গেলেও যেতে পারে—কারণ বরফ কাটা কল এসে ওদের পথ করে দিতে পারে। কি হবে না হবে এখন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবু পুলক এলে ভালই হত। মিলান না বলে যেন পারল না, আমি গিয়ে একদিন ওকে নিয়ে আসি। সোজা পথটা দেখিয়ে দিলে সে চলে আসতে পারবে।

ব্রাউস বলল, সে আসবে কি করে? এখানে এলে মোটর বোট ভাড়া করতে হবে। রোজ রোজ সে এ-ভাবে পয়সা খরচ করে আসবে কেন বাবা।

কথাটা সত্যি। পুলক জাহাজী মানুষ। খুব একটা ভাল রোজগার ওর নেই। আর সে বলতেও পারে না, যা লাগে আমি দেব পুলক, তুমি আসবে। বরং ভাল ছিল, যে ক-দিন সে জাহাজে আছে সে ক-দিন ওকে ওর দিদিমার কাছে রেখে দেওয়া। কিন্তু মিলান জানে শীতকাল এলে ব্রাউসের দিদিমাকে আরও শীর্ণ দেখায়। একটা কষ্টকর কাশি ওকে সারাক্ষণ শুইয়ে রাখে। তাছাড়া কখন সহসা বরফ পড়তে শুরু করবে, লাইট-হাউসের সংগে কিনারায় যোগাযোগ থাকবে না, তখন ব্রাউসকে লাইট-হাউসে নিয়ে আসা মুশকিল। এবং যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ব্রাউস তাকে দীর্ঘ করে কি লাভ এমন একটা ভাবনাও তাকে পেয়ে বসে। তবু এ সকালে ব্রাউসের সুন্দর মুখ এবং তাজাভাব ফের ওকে কেমন ঘরের দরজা জানালা খুলে দিতে বলল। সে ব্রাউসের কাছে গিয়ে ডাকল, ব্রাউস।

ব্রাউস নিবিষ্ট মনে কাজ করছে। সে খুব সুন্দর ভাবে কাপ প্লেটগুলো ধুয়ে মুছে তুলে রাখছে, ব্রাউস নীল রঙের রিবন বেঁধেছে চুলে। ঘরের হিটারটা সে আর একটু বাড়িয়ে ঘরের উত্তাপ বাড়িয়ে নিয়েছে। ওকে দেখলে মনে হয় ওর অস্বাভাবিক শীত। এবং এই শীতের ভিতর পড়ে গেলেই মিলান ভেবে নেয় মেয়েটার সময় আর বেশি নেই। সে নানারঙের গরম জামা ব্রাউসের জন্য হ্যাঙারে সাজিয়ে রাখে, যখন যেটা খুশি ব্রাউস পরতে পারে। ব্রাউস খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে। ও যে ওকে ডাকল, ব্রাউস যেন শুনতে পায় নি, এবং মনে হচ্ছিল ব্রাউস গুন গুন করে গান গাইছে। সে কি ভেবে ফেলেছে—বাবা আজ হোক কাল হোক পুলককে আনতে যাবে!

মিলান বলল, আমি যাচ্ছি। তুমি ইচ্ছা করলে আমার সংগে আসতে পার।

ঠিক সেই আগের মতো কথা। কারণ ব্রাউসের মা যখন অসুস্থ তখন ব্রাউস খুব ছোট। ঘরে মাকে যন্ত্রণা করবে ভেবে মিলান ব্রাউসকে সংগে নিয়ে যেত। ওর তো তখন কোনো কাজ নেই। কেবল মেসিন ঘরের সব কলকব্জা অথবা মিটারগুলো দেখা। গেজে টেমপারেচার দেখা। কখনও গরম জলের সারকুলেটিং ঠিক আছে কিনা দেখা। ব্রাউস তখন সিঁড়ি ধরে কখনও লাইট-হাউসের মাথায় উঠে

যেত। ঘুরে ঘুরে সিঁড়ি। যেন শেষ নেই। কতদিন ব্রাউস ভেবেছে সে বুঝি আর শেষ সিঁড়িটার নাগাল পাবে না। ওর খুব ভয় লাগত তখন। সে ডাকত, বাবা, আমার ভয় লাগছে।

মিলান নিচ থেকে বলত, ভয় কি, আমি তো এখানে আছি।

এমন শব্দ পেলেই ব্রাউস আবার সাহস পেত। সে শেষ সিঁড়িটায় উঠে গেলে দেখতে পেত কাচের ঘর। আলোর বড় হেড-লাইট। কেবল ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। দিনের বেলা আলো ফেলার কাজ থাকত না বলে কেমন মরা মরা অথবা নির্জীব মনে হত। রাতে এই বড় হেড-লাইট, পাশাপাশি দুটো হেড-লাইট একটা বন্ধ থাকলে অন্যটা ঘুরে ঘুরে অনেক দূরে আলো ফেলে জাহাজের কেবল ক্রমান্বয় পথ দেখিয়ে যাওয়া। ব্যাপারটা ব্রাউসের কাছে ম্যাজিকের মতো মনে হত। এবং সেখানে দাঁড়ালেই ব্রাউসের চারপাশে কত সব দ্বীপ, দ্বীপের পাহাড়, পাখিদের উড়ে যাওয়া সমুদ্রে চোখে পড়ত। সে সেখানে দাঁড়িয়ে একবার একটা নতুন দ্বীপ দেখে অবাক হয়ে গেছিল। কখনও সে ওটা দেখে নি। অথচ আশ্চর্য কি করে ওটা যে ভেসে এল। বেশ বড় কচ্ছপের পিঠের মতো গোল গোল আর ঢেউ খেলানো। যেন একের পর এক দ্বীপের বাহার। এখানটায় এমনভাবে পাথর ভেসে ওঠে কি করে।

সে ডেকেছিল -বাবা।

মিলান ব্রাউসের গলায় কেমন একটা ভয়ের স্বর শুনে ছুটে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেছিল। সে যেতেই ব্রাউস বলেছিল, বাবা, দ্যাখো কেমন দ্বীপটা জলের ওপর ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। এমন কি করে হয় বাবা।

মিলান দেখেই টের পেল। আবার অনেক ক-বছর পর আর একটা তিমির ঝাঁক নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে এদিকটায় চলে এসেছে। সে বলল, এগুলো এখানে থাকবে না। ওরা আবার চলে যাবে। পর্বাপদু দ্বীপের মানুষেরা নিশ্চয়ই আবার উত্তর সাগরে তিমি শিকারে বের হয়েছে। বের হলেই এরা টের পায়। পাহাড় অথবা পাথরের খাজে পিঠ ভাসিয়ে লুকিয়ে থাকে।

ব্রাউস বলেছিল, ও দ্বীপটা কত দূর ·

- অনেক দূর। এই ধরো শ চারেক মাইল হবে।

ব্রাউসের কেমন মনটা হালকা হয়ে গেছিল। যাক তবে এরা এদের খোজ পাবে না। এবং এরা যে কেন এখানে না থেকে আবার ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে।

এই সব স্মৃতি তার মনে হলেই সে ভাবে পুলক এলে এবার সেই সব মাছের গল্প করবে। তিমি মাছেরা কেমন ঝাঁক বেঁধে থাকে, এবং সে আশা করে ঠিক হুবহু বর্ণনা দিতে পারবে মাছের। পুলক এলে বুড়ো দাদুর কাছে নিয়ে যাবে। লাইট-হাউসের মাথায় যে কাচে ঘেরা ব্যালকনিটা আছে সেটা দেখবে। এবং কোথায় পাহাড়ের খাঁজে রুপোলি চাঁদা মাছ ধরা যায়, এবং কোথায় সিঁড়ির মতো একটা পাথর সমুদ্রের ভিতর নেমে গেছে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবে।

এ-ভাবে এক আশা, আশা কুহকিনী মানুষের বেঁচে থাকার জন্য দরকার। না-থাকলে বেঁচে সুখ থাকে না। ব্রাউসের জীবনে কোনো আশা ছিল না। আশা যতই কুহকিনী হোক, আশা নিরাশা থেকে বাঁচায়। প্রেরণা মানুষের এ-ভাবে আসে।

পুলক আসবে, এলে সে এ-ঘরে পুলককে নিয়ে হিটারের পাশে বসবে। এবং সে বসে বসে দ্বীপের সব নানা রকমের গল্প বলে যাবে। বলবে, আমি তোমাকে নিয়ে সেই লাইট-হাউসের ব্যালকনিতে বসে থাকব। দুটো ইজিচেয়ার থাকবে, আহা

পুলক গ্রীষ্মের দিন হলে দেখতে পেতে চারপাশটা কি সবুজ। দেখতে পেতে কত রঙবেরঙের পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। দেখতে পেতে নানা রকমের উড়োক্কো মাছের খেলা। ঝড়ের সময় আমাদের বালিয়াড়িতে কত সব উড়োক্কো মাছ। একেবারে মনে হয় সকালবেলায় বালিয়াড়িতে ওর সাদা ফুল হয়ে ফুটে আছে। তখন সবার কি আনন্দ। কে কত কুড়োতে পারে। একবার বাবা আমি দু ঝুড়ি মাছ কুড়িয়ে ছিলাম। মা তখন বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে চুপচাপ বসে থাকত। মাছগুলো দেখে মা কেমন আরও ভয় পেয়ে গেছিল। মাছের চোখে মরার ছবি খুব কষ্টের বুঝি।

এমন মনে হলেই সে ভাবে, না, সে পুলককে আসতে বারণ করে ভালই করেছে। পুলকের সোজাসুজি আসার পথ, বরফ পড়লে একটা পেয়ে যাবে। মাইল দশেকের মতো পথ তাকে বরফের ওপর দিয়ে চলে আসতে হবে। বরফ মাত্র জমতে আরম্ভ করেছে। এবং এভাবে সমুদ্রের ওপর বরফ জমতে জমতে অনেক দূর এগিয়ে এলে এই দ্বীপের কাছাকাছি চলে আসবে। পুলক একটা সাইকেল ভাড়া করে চলে আসতে পারে। কিন্তু সেই ভয়টা, যা তাকে মাঝে মাঝে ভীষণ ভয় পাইয়ে দেয়, পুলক তো জানে না কোথায় কতটা বরফ জমেছে।

যারা এ-দেশের মানুষ তারা টের পায় সব। তারা অনেকে বরফ পড়ে গেলে সাইকেলে বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরার জন্য বের হয়ে পড়বে। সামনে যত দূর দেখা যায় সমুদ্রের ওপর ভাসমান বরফ। এবং মাঝে মাঝে ছোট ছোট গর্ত, সেখানে নীল জল। মাছেরা সেখানে শ্বাস ফেলার জন্য আসে। তেমন একটা ছোট গর্তের পাশে বসে বঁড়শি ফেললে ছোট ছোট সারডিন মাছ, সবাই বেশ এক ঝাঁকমাছ ধরে ঘরে ফিরে যেতে পারে। খুব মিষ্টি খেতে এসব মাছ। ওরা বরফের রঙ দেখে কোথায় বরফ মোটা হয়ে জমেছে, আর কোথায় বরফ পাতলা কাচের মতো বুঝতে পারে।

সে তার জানালায় বসে কেমন নিরাশ হয়ে গেল। এত সব ভাবনা সব মিছে। পুলক এখানে আর কখনও আসবে না। ভিতরে যে ছোট একটা পাখির মতো প্রাণ আছে, প্রাণটা কেমন কষ্ট পাচ্ছে। সে বাবাকে একটা কথারও জবাব দেয় নি। বাবা বের হয়ে যাচ্ছেন। সে বলল, বাবা, আমি যাব।

মিলান বারান্দায় এসে একটা ডেক-চেয়ারে বসে পড়ল। ত্রাউসকে পোশাক পাল্টে নিতে হবে। সে নিশ্চয়ই তার মোটা পুলওভার পরে নেবে। সে মোটা সাদা উলের মোজপা পরে নেবে। বরফ ভাল করে পড়ছে না বলে একটা কাদা কাদা ভাব এখনও আছে। ওকে গামবুট পরে নিতে হবে। এবং সব ব্যাপারেই ত্রাউসের ভিতর একটা আকাঙ্ক্ষ জাগছে ভেবে সে কেমন খুব খুশী হয়ে উঠল। কারণ পুলক, এবং পুলক এসে ওকে ভীষণ আকাঙ্ক্ষার ভেতর ফেলে দিল। তবে এই পুলককে সে যদি কোনো ভাবে এই দ্বীপে আটকে ফেলতে পারে—তুমি পুলক এখানে থেকে যেতে পার। তুমি থেকে গেলে ত্রাউস বেঁচে যাবে। পরক্ষণেই মনে হল না, তা হয় না। ত্রাউসের মাকেও সে যখন ঘরে আনে, ভেবেছিল, কোনোদিন সেই ভীষণ রোগটা আক্রমণ করলে এক অতীব আকাঙ্ক্ষার ভিতর ফেলে ওকে নীরোগ করে তুলবে। পরে দেখেছে সে আর হয় না। কাছাকাছি থাকলে, দীর্ঘদিন কাছাকাছি থাকলে—একঘেয়েমি আসে। পরস্পরের প্রতি কৌতূহল মরে যায়। এই পুলক এখানে থাকলে এটা হবে। পুলক ত্রাউসের কাছে ভীষণ দূরের মানুষ।

দূরের বলে এবং নাগালের বাইরে বলে—গ্রাউস এখন পুলককে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। মিলান কেন যে ভাবল এ-স্বপ্নটাকে যে কোনো ভাবে তার বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বাঁচিয়ে রাখতে পারলে গ্রাউস বেঁচে যাবে। গ্রাউসের মৃত্যু তাকে চোখের ওপর দেখতে হবে না।

বেশ সেজেগুজে গ্রাউস বের হয়ে এল। কাছেই লাইট-হাউসে উঠে যাওয়ার রাস্তা। বেশ পাথর কেটে কেটে বড় লম্বা গম্বুজের মতো করে রাখা হয়েছে। সে এখন বাপের সঙ্গে সারাদিন সেখানে থাকবে। দুপুরে বাবা আসবে খাবার নিতে। এবং খাবারটা গ্রাউস কনট্রোলিং টাওয়ারে বসেই খাবে। ভারি মজা লাগে। এবং ওর ইচ্ছা যদি পুরোপুরি বরফ পড়ে যায় এবং একদিন যদি সত্যি সত্যি পুলক চলে আসে তবে ওকে নিয়ে এখানে উঠে আসবে। অনেক দূর থেকে কেউ যদি এখন ওকে দেখে তবে দেখতে পাবে, পাহাড়ের মাথায় একটা ছোট মতো দেয়ালে সে ঝুলে আছে। এবং নিচ থেকে যে কেউ চিৎকার করে উঠতে পারে—গ্রাউস এ ভাবে দাঁড়াবে না। গড়িয়ে পড়ে যাবে। গড়িয়ে পড়ে গেলে তুমি বাঁচবে না। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। গ্রাউস তুমি ও-ভাবে হাঁটবে না। এই, এই, একেবারে ফাঁকা জায়গায় তুমি ঝুঁকে আছ। কি করছ গ্রাউস। নিচে সমুদ্র। পাহাড় খাড়া পড়ে গেলে তুমি একটা রঙিন ফানুসের মতো উড়ে যাবে।

কিন্তু কেউ তো দূর থেকে টের পায় না বস্তুত কাচের দেয়াল ঘেরা জায়গায় গ্রাউস দাঁড়িয়ে আছে। এত পাতলা কাচ যে মসৃণ জলের মতো। অনেক দূরে লায়ন রকের একটা দ্বীপে পুলক যে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে—সে যে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না, এবং চিৎকার করলেও যে এতদূর থেকে কেউ টের পাবে না, গ্রাউস লক্ষ্মী মেয়ে তুমি এ-ভাবে আমাকে আর ট্র্যাপিজের খেলা দেখাবে না। আমার শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে।

পুলক বুঝতে পারে নি গ্রাউস একটা মসৃণ জলের মতো পাতলা কাচের ভিতর এখন মোমের পুতুল হয়ে গেছে। দূরবীনটা ওর হাতে কাঁপছিল। মেয়েটার অসুখ, অথবা আত্মহত্যার বাসনা। সে যে কি করবে বুঝতে পারছে না এখন। ক্রমে অন্ধকার নেমে আসছে। সে বোট নিয়ে যেতেও পারছে না। এবং গেলে এদিকটা এত বেশি খাড়া যে কিছুতেই সে অতদূরে উঠে যেতে পারবে না। আর ছোট স্কীপটাকে খুব বেশি মনে হলে সাদা উড়োক্কো মাছের মতো দেখাবে। একটা মাছ ঝড়ে মরে গিয়ে সমুদ্রের জলে ভেসে উঠেছে। অত ওপর থেকে তার চেয়ে বেশি কিছুই বোঝা যাবে না।

## এগার

ইমাদুল্লা বসে বসে তামাক টানছিল। এখনও পুলক ফিরে আসে নি। সে স্কীপ নিয়ে লায়ন রকে গেছে। যারা অন্য জাহাজী তারাও কেউ কেউ ফিরে আসে নি, ওদের জন্য ইমাদুল্লা ভাবছে না। ওরা গেছে কিনারায়। শহরে কেউ কেনাকাটা করতে গেছে, কেউ ফুর্তি করতে গেছে। যত তুষার ঝড়ই হোক ওরা ঠিক সময় হলে ফিরে আসবে। কিন্তু পুলকের ফিরে আসাটা এই রাতে কঠিন। প্রায় আটটা বেজে চলল, এখনও আসছে না। রাত আটটা অনেক রাত। অন্ধকারে সে স্কীপ ঠিক

ঠিক চালাতে পারবে কিনা সেও ভাবনা। যে সব বরফ মাত্র জমতে আরম্ভ করছে সেখানে ধাক্কা ফাক্কা খেলে একেবারে গঁুড়িয়ে যাবে। এই রক্ষে। ওর স্কীপে অর্থাৎ মোটর বোটে আলো আছে। সে আলো ফেলতে ফেলতে আসবে।

আর তখন কেউ জানে না পুলক ওর মোটর বোট নিয়ে বাতি-ঘরের ঠিক নিচে বসে ছিল। অর্থাৎ ওর যা ভাবনা, যদি মেয়েটা কিছু করে ফেলে—এ সব ভাবনা কেন যে হয়, হতে পারে মেয়েটা মার মতো করে মরে নাও যেতে পারে--তবু ভালবাসার এক নিরন্তর বেদনা আছে, যা সহজে মুছে দেওয়া যায় না।

এবং অনেক পরে যখন পুলক দেখল, না সেখানে এখন বাতিঘরে আলো জ্বলছে, নিশ্চয়ই এখন তবে ব্রাউস ঘরে ফিরে গেছে। ওদিকটায় যাবার সে কোনো পথ খুঁজে পেল না। সে ভেবেছিল সমুদ্র লেগুনের মতো দুটো পাহাড়ের ফাঁকে ঢুকে গেছে কিন্তু কাছে গেলে দেখল, না কোথাও ফাঁক নেই ওদিকে যাবার। একমাত্র পথ সেই ঘুরে, ঘুরে যেতে গেলে সারা রাত লেগে যাবে। পশ্চিমে যেতে হবে মাইল পঞ্চাশের মতো। তা ছাড়া বিকেল থেকেই হাওয়াটা জোর উঠছে। চারপাশে নানা রকম দ্বীপের মালা ছড়িয়ে আছে বলে ঢেউ তেমন প্রবল নয়। এবং ক্রমে ক্রমে রিনরিন কাচের শব্দের মতো তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গেলে সে স্কীপের মুখ বন্দরের দিকে ঘুরিয়ে দিল।

ইমাদুল্লার তামাক টানা শেষ হলে সে হুঁকোটা নিচে রেখে দিল। সে এ সময় কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। পাখিটার নাম করে পুলক চলে গেছে। পাখিটার জন্য তার আশ্চর্য মায়া থাকা স্বাভাবিক। সেই সব রকের কাছাকাছি একটা রকে বাতিঘরে। কিন্তু ইমাদুল্লা জানে সেখানে যাওয়া সহজ নয়। তবু যদি সে নিজে যেত, একটা সহজ পথ আবিষ্কার করা যেত। এ-অঞ্চলে সে একবার প্রায় বছর খানেকের ওপর ছিল। তখন ছিল যুদ্ধের সময়। ওরা এখানে আটকা পড়েছিল। দেশে ফিরতে সে প্রায় বুড়ো হয়ে যাবার মতো। ইমাদুল্লা ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ডেকে উঠে গেল। এবং রেলিঙে ভর করে দাঁড়ালে দেখল শুধু অন্ধকার। কিছু জাহাজ লেগে আছে। নানারকমের লাল নীল আলো মাস্টে অথবা ডেরিকে। এবং ডাইনিঙ হলে কোথাও ব্যান্ড বাজছে। হয়তো কোনো জাহাজের কাপ্তান এই শীতের রাতে পার্টি দিচ্ছেন।

যখন এত সব সমারোহ জাহাজে, যখন আকাশ নীল অথচ সমুদ্রে এক গভীর অন্ধকার, এমন কি জলে ফসফরাস জ্বলছে না তখন স্বাভাবিক কারণে ভয় পাবার কথা। ইমাদুল্লা সারেঙকে ডেকে বলল, পুলকটা তো এখনও ফিরল না সারেঙ সাব।

সারেঙ সাব মাদুর পেতে নামাজ পড়ছিলেন। নামাজ পড়া মাত্র শেষ। এখন ইমদুল্লার এমন উদ্বিগ্ন মুখ দেখে কেমন বড় বড় চোখে তাকালেন তিনি। বললেন, ঠিক চলে আসবে।

- যদি না আসে!

—না এলে কি করতে পারি আমরা।

এটা অবশ্য ঠিক, জাহাজ থেকে কেউ যদি সরে পড়ে তবে কাপ্তান অথবা সারেঙ সাব কি করতে পারে! ওরা খুব বেশি হলে একটা এজেণ্ট অফিসে খবর দেবে। একজন নাবিক মিসিঙ। তার বেশি কিছু ওরা করবে না। তারপর যা কিছু দায়-দায়িত্ব এজেণ্ট অফিসের। ওরা স্থানীয় থানা পুলিসের সাহায্য নেবে। তখন

জাহাজ গভীর সমুদ্রে, হয়তো বা অন্য বন্দরে ওরা আর খবরও পাবে না, ওদের সেই ছোট্ট জাহাজীর খবর কি।

সারেঙ তবু নির্ভয় দেবার মতো বলল, দ্যাখো ঠিক চলে আসবে।

ইমাদুল্লার আর কি করার আছে। তবু এই ছোট্ট জাহাজীর জন্য ওর কি একটা মায়া গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। প্রায় বছর পার হতে চলল ওরা একই জাহাজে আছে। যখন প্রথম কলকাতা বন্দরে পুলককে দেখতে পায় তখন কি অবাক ইমাদুল্লা। পুলক, বাবু-মানুষ। এমন মানুষের এ-সব কাজ সাজে না, যেন কার ওপর এক ভীষণ অভিমানে দেশ ছেড়ে জাহাজে কাজ নিয়ে চলে যাচ্ছে।

অথবা এও হতে পারে পুলকের ভিতর এক কোমল প্রাণ আছে, ওর চোখে আশ্চর্য মায়া আছে—চোখ তুলে তাকালে কেউ সহজে অবহেলা করতে পারে না। যত কঠিন প্রাণ হবে এক সময় না এক সময় পুলকের কাছে এলে সহজ হয়ে যেতে হবে। সারাক্ষণ সে জাহাজে সবার এমন একটা মানুষ হয়ে গেছে যা বড় বেশি কাছের এবং ভালবাসার।

পুলক এবার বোটের স্টিয়ারিঙ ঘুরিয়ে দিল।

ঠিক পাহাড়ের ওপর তখন বাতিঘরের সবাই দাঁড়িয়ে আছে। যেমন নানা রকমের বিস্ময়কার ঘটনা এই দ্বীপগুলোতে নানাভাবে ঘটে থাকে অথবা কিংবদন্তী আছে—এটা ছিল এক আদিবাসী রাজার দেশ। এই যে সমুদ্র এবং দ্বীপমালা সব জুড়ে ছিল তার রাজত্ব। মূল ভূখণ্ডে সে যেতে পারত না। তাকে বনবাসী করে রাখা হয়েছিল। ইংরেজ অধিবাসীগণ এই মূল ভূখণ্ড দখল করে নিলে রাজার আর থাকে কি। সে চলে এসেছিল এখানে। তারপর শোনা যায় এক প্রবল সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস সব দ্বীপ ধুয়ে নিয়ে যায়। কেউ বাঁচে না। কেবল রাজা তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে এই বাতি ঘরের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিল। কারণ তখন এই পাহাড়টাই ছিল সব চেয়ে উঁচু। সে ধুয়ে মুছে যায় নি। রাজার কেউ থাকল না। দু চার-জন পুরুষ সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে কাজ চলে কিন্তু জীবন চলে না। ওরা তারপর বড় একটা মতিহার কাঠের নৌকায়-ফিজির দিকে চলে গেছিল। এবং বোধ হয় এই অভিশাপ আছে, এখানে আর কেউ বসবাস করতে পারবে না' অথবা কিংবদন্তীর জন্য মানুষ আর এইসব দ্বীপে বাড়িঘর করে বসবাস করে না। ফলে এমন নির্জন সব দ্বীপ। এবং কিছু পাখির ডাক। কেবল ভয় এক, কখনও না কখনও এখানে বসতি গড়ে উঠলে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস সব ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে। এ-ভাবে আরও সব বিচিত্র উপকথা জুড়ে এই সব দ্বীপমালা বিচিত্র এক জগতের বাসিন্দা হয়ে যায়। এবং অন্ধকার রাতে ওদের চোখে অদ্ভুত একটা আলোর রেখা খাড়া পাহাড়ের নিচে দেখা গেলে—ওরা বুঝতে পারল না, এই তুষার ঝড়ের ভিতর এবং দুর্যোগ কার এখানে আসার সাহস। ওরা কাচের ভিতর থেকে দেখছিল বলে ঠিক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। বাতিঘরের কাচে জলকণা লেগে লেগে সব অস্পষ্ট করে দিচ্ছে। কিন্তু কাচ মুছে দিলে আবার স্পষ্ট হয়ে উঠছে, মনে হয় সমুদ্রে কেউ পথ হারিয়ে ফেলেছে। এমনও হতে পারে যারা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় তাদের কেউ এই সব দ্বীপ-পুঞ্জের ভিতর পড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

অথচ ওদের করার কিছু ছিল না। এমন খাড়া পাহাড়ের নিচে নামে সাধ্য কার। ওদের দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ব্রাউসের কেবল বার বার মনে

হয়েছে—এ অন্য কেউ নয়। ঠিক পলক। পলক জাহাজ থেকে পালিয়ে এখানে এসে গেছে। সে যে এখন কি করে। এখান থেকে সে যত জোরেই চিৎকার করে ডাকুক, এত নিচে তার গলার আওয়াজ পেঁছিবে না।

বোট ঘুরিয়ে দেবার সময় মনে হল পলকের একটা দুটো পাথর পাহাড়ের গাছপালার ভিতর সিঁড়ির মতো দেখা যাচ্ছে। সে এবার টর্চ জেবলে আরও কাছে গেল। সেই রাজা কি এমন একটা গুপ্ত সিঁড়ি করে রেখে গেছলেন, দ্বীপ থেকে পালাতে হলে—এই পথে সমুদ্রে নেমে যাওয়া যাবে। কেউ জানে না। কারণ এমন খাড়া পাহাড়ের নিচে কারো আসার দরকার হয় না। পলকের মতো আর এমন কে পাগল আছে। পলক বোটটাকে একটা ছোট গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। তারপর গাছপালা ফাঁক করে টর্চ মারতেই মনে হল সে যা ভেবেছে ঠিক তাই। এ-ভাবে পাথরের পর পাথর ভেঙে প্রায় কোন স্বর্গের সিঁড়ি কে তৈরি করে রেখেছে। এবং অনেকটা উঠে এলে মনে হল হঠাৎ সেই সিঁড়ি থেমে গেছে। সে আর কোনো রাস্তা দেখতে পাচ্ছে না। আর পঞ্চাশ গজের মতো উঠে গেলেই দ্বীপের মাথায় সে উঠে যেতে পারবে। ওর মনে হল সেটা সে আর পারবে না। এমন একটা রিস্ক নিয়ে সে উঠে এল। যখন লাইটহাউসের আলো ঘুরে ঘুরে পড়ছে তখন জায়গাটা আর অন্ধকার থাকছে না। বেশ দিনের বেলার মতো ব্যাপারটা হয়ে যাচ্ছে।

পলক বসে পড়ল একটা পাথরে। তাকে আবার নেমে যেতে হবে। সে ঠিক বুঝতে পারছে না এমন অন্ধকারে ফিরেই বা যাবে কি করে। তার মনে হল, একটা মেয়ে মরে যাবে ভেবে যখন সে তাকে নানা ভাবে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছে তখন সে নিজেই কেমন বোকার মতো আর একটা অসুখে পড়ে গেল। সে এখানে আসবে না বার বার ভেবেছে। বার বার মনে হয়েছে, অথবা অভিমান হয়েছে বার বার ব্রাউসের ওপর। সে কেন যে এমন অভিমানের ভিতর পড়ে গেল। ওর তো এমন হবার কথা নয়। সে এসেছিল এখানে সেই পাখিটাকে দেখবে বলে—এবং এখন সে বুঝতে পারছে ভীষণ এক জটিল আবর্তে পড়ে গিয়ে তার আর পাখি দেখা হল না। সে ব্রাউসের যতটা কাছাকাছি থাকবে ততই যেন সে খুশী থাকবে।

সে বুঝতে পারে এখন আর তার নেমে যেতে পর্যন্ত ইচ্ছা হচ্ছে না। আর ওঠার জায়গা নেই অথবা সে নেমেও আর যেতে পারছে না। কারণ নামার সময় নিচের দিকে তাকালে তার কেমন মাথা ঘুরে যাচ্ছে। তার তো পাহাড়ে ওঠার অভ্যাস কোনো দিন ছিল না। এত অন্ধকারে নামা যায়! কিন্তু যখন আলো এসে ঘুরে ফিরে যায়, বাতিঘরের আলো এসে দিনের মতো করে ফেলে তখন সে নিচের দিকে তাকাতে পারে না। জোরে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হয় তার, ব্রাউস আমি এখন কি যে করি।

তবু দিনের বেলা সে সন্তর্পণে নেমে যেতে পারবে। হঠাৎ হঠাৎ আলো পড়ে ওর চোখ ঝলসে দেবে না। সে এই যে বসে রয়েছে, চারপাশে নানা বর্ণের গাছ, পাতা নেই গাছে, এবং ঝড়ের দাপটে ডালপালা সব ঝুলছে ভীষণভাবে আর সে বসে আছে একা, একা বসে থাকা ছাড়া কি আর উপায় তবু তার একা বসে থাকতে ভাল লাগছে—ও-পাশের উপত্যকায় ব্রাউস এখন নিশ্চয়ই জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর শরীরে সাদা রঙের ফ্রক। ফ্রকে কি সব সমুদ্রের হিজিবিজি নীল ঢেউ-এর ছবি। ওর হাতে সোনালি দস্তানা। পায়ে সে মোজা পরেছে সাদা রঙের। ও চুলে আজ কোন রঙের রিবন বেঁধেছে? বোধ হয় সবুজ রঙের! ওর জানালার কাচে তুষার-

পাতের শব্দ। ঠাণ্ডা, এমন ঠাণ্ডায় পুলক ভাবল, সে মরে যাবে। কিন্তু অবাক, ওর পোশাক, এই যেমন শালদেরাজ নিচে, ওপরে গরম প্যাণ্ট, মোজা পায়ে, মোটা চামড়ার জুতো আর গামবুট এবং গলায় কমফরটার, মাথায় মাংকি ক্যাপ, খয়েরি রঙের দস্তানা ওর হাতে, তবু কি শীত! পাথরের ছাদ মাথার ওপর। তুষার ঝড়ের ঝাপটা তেমন লাগছে না।

পুলক সারা রাত এখানে একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে থাকল। ওর চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। পাশেই সেই বোধহয় নীলবর্ণের উপত্যকা। উপত্যকায় এক আশ্চর্য মেয়ের বাস। যার চোখ নীল রঙের ; যার মুখে সুন্দর হাসি সে ফুটিয়ে তুলেছে, এবং যে আজ হোক কাল হোক এই উপত্যকায় ছুটে বেড়াবে তার সংগে।

পুলকের কোনো দুঃখ ছিল না। সে ফিরে যেতে পারছে না বলে তার কোনো দুঃখ নেই। সে এমন একটা পাহাড়ের ছাদ আবিষ্কার করতে পেরেছে ভেবে খুশী। এখানে এসে সে প্রতিদিন বসে থাকবে। সে এখানে এলেই দ্বীপের বর্ণমালা তার কাছে নানা রঙ নিয়ে ফুটে উঠবে। সে ভাবে এখানেই আছে তার সেই ছোট্ট মেয়েটি। এখানে সে এলে বুঝতে পারবে সে গ্রাউসের কাছ থেকে খুব একটা দূরে নেই। যত-দিন বরফ ভাল না করে পড়ছে ততদিন এ-ভাবে অন্তত তার বিকেল এবং রাত কাটিয়ে দিতে পারলে কোনো কষ্ট থাকবে না। সে খুব ভোরে বোট দ্রুতগতিতে চালিয়ে দিলে ঠিক কাজের সময়ে জাহাজ ডেকে হাজির থাকতে পারবে। তবে আর তাকে নিয়ে কোনো কথা উঠবে না। সে বেশ যে ক'দিন আছে এভাবে কাটিয়ে দিতে পারলে আবার একটা নাম, গাছে গাছে পাতায় পাতায় অথবা কোন বন্দরের ছোট্ট পাইন গাছে সে লিখে রাখতে পারবে, গ্রাউস বড় সুন্দর নাম, বেশি সুষমা তার। আমি আর গ্রাউস এক বিকেলে সমুদ্রের পাড়ে পাড়ে অনেকদূর হেঁটে গেছি। এমন সব কত কথা যে সে লিখে রাখবে ভাবছে। তার তখন বিস্ময়ের সীমা থাকবে না। সে নিজের ভিতর নিজেই এক সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করে ফেলবে। সেখানে কে বড়। নন্দিনী না গ্রাউস তখন টের পাবে না। সবাই তার বড় কাছের মনে হবে।

পুলক পাথরে মাথা রেখে দুটো পা সামনে ছড়িয়ে দিল। কিছু লতাপাতা তার মুখ ঢেকে রেখেছে। ওপরে আকাশ অস্পষ্ট। সে লতাপাতার ভিতর থেকে কেন জানি আজ আকাশে একটা মাত্র নক্ষত্রকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে দেখল। ওর চোখ অপলক এবং এভাবে সে জানে না কখন ঘুম জড়িয়ে আসে সারা শরীরে। লতাপাতার ভিতর আশ্চর্য এক মানুষ এই গভীর দ্বীপপুঞ্জের ভিতর ঠিক একটা পাখির মতো ঘুম যাচ্ছে।

## বারো

এ-সমুদ্রে কি হয় না হয় বোঝা দায়।

ক্রমে শীতকালের তুষার ঝড় এ-বন্দরের গাছপালা বৃক্ষ পত্রহীন পুষ্পহীন করে দিল।

প্রতি বিকেলে—অবশ্য বিকেল না রাত বোঝা দায়—কারণ কতদিন থেকে আর সূর্য উঠছে না, কেবল ঝড়ো ঠাণ্ডা হাওয়া, প্যাচপ্যাচে তুষারপাত এবং ছাই রঙের একটা অন্ধকার চারপাশে ঝুলে আছে—এই অন্ধকারের ভিতর পুলক স্কীপ ভাড়া করে

চলে যাচ্ছে সেই সব দ্বীপে। পাখিরা এখন শীতের ভিতর আর সেখানে ডিম পাড়ছে না। পাখিরা আর শীতের জন্য উড়তে পারছে না। পাথরের খাঁজে খাঁজে ওরা ঘর তৈরি করছে কেবল। শীতকালটা তার ভিতর কাটিয়ে দিতে হবে। পুলকের ধারণা সে সব দ্বীপে ওর পাখিটা উড়ে গেছে। সে এখন জাহাজে ফিরে এমনই রোজ রছে। সে যে রাতে সেই ছাদের মতো পাহাড়ের নিচে নিজেই একটা পাখি হয়ে বাস করছে সেটা সে কিছুতেই বলছে না।

পাখিটার নাম করে রোজ রোজ জাহাজে কাজ শেষ হলেই পুলক চলে যাচ্ছে। ওর সব জমানো টাকা পয়সা বোট ভাড়া দিতে দিতেই শেষ হয়ে গেল।

খুব সকালের দিকে পুলক ফিরে আসত।

এলেই ইমাদুল্লা বলত, রাস্তাটা খুঁজে পেলি?

—না চাচা।

—এ-সব দ্বীপে এখন যাবার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। বরফ পড়লে যেতে পারতিস। কিন্তু তাও খুব রিস্ক।

—বরফ তো পড়ছে।

—এখনও তেমন ভাল করে বরফ জমে নি। তুই একদিন আমাকে নিয়ে চল।

—যাবে চাচা? সত্যি!

—গেলে মন্দ হয় না।

—রোববার দেখে চল।

—সেই ভাল হবে।

—ব্রাউসের দিদিমার কাছে গিয়ে রাস্তাটা জেনে

– আমার খুব খারাপ লাগে। ওরা কি ভাববে!

—কি ভাববে আবার? ভাল ভাববে।

পুলক চুপ করে থাকল। এখন কাজের সময়। সে এনজিনে চলে যাবে। এনজিন ঘরে তেমন কাজ নেই এখন। তবু এদিক ওদিক দেখে কিছু কাজ বের করে নিতে হয়। কাজ করাতে হয়। সে টিফিনে এসে ফের ইমাদুল্লা চাচাকে বলল, আজ বিকেলে যাবে ব্রাউসের দিদিমার কাছে?

—চল। তারপর ইমাদুল্লা কিভাবে বলল, বুড়ি কি বাড়ি আছে! সে শীত-কালে নিজের বাড়িতে চলে যায়।

তবু ওরা বিকেলে সেখানে গেলে দেখতে পেল বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ। গেটে বড় তালা ঝুলছে। বাড়িটা কেমন নিঃসঙ্গ এবং মুহ্যমান হয়ে আছে।

পুলক বলল, একটা চিঠি লিখলে হয় না?

—কাকে?

—ব্রাউসকে?

—দিতে পারিস। কিন্তু সে তো রাস্তাটার খবর দিতে পারবে না।

—লাইট-হাউসে কারো যেতে হলে কি করে যায় এখন!

—সে তো তোমার—স্যান্টিস থেকে রসদ যায়। সেখান থেকে বোট ভাড়া পাওয়া যায়। সেটা তো এখানে নয়। এই সব দ্বীপের পূবে স্যান্টিস। আমরা আছি পশ্চিমে। আমাদের কাছে দ্বীপগুলো স্যান্টিসে যেতে পাঁচিলের কাজ করে থাকে। যাওয়া যায় না।

ইমাদ্দুল্লা টের পাচ্ছিল, পলুক এখন অস্থির হয়ে উঠছে। শেষ পর্যন্ত বোধ হয় ব্রাউসের বাবা অথবা দিদিমা বুঝতে পেরেছিল—পলুক যতই ওকে স্বাভাবিক করে তুলুক, তাকে নিরাময় করতে পারবে না। অথবা ভেবেছিল, খুব কাছাকাছি থাকলে আকর্ষণ বাড়ে। ওরা হয়তো ব্রাউসকে সেজন্য সেই দ্বীপে পাঠিয়ে দিয়েছে। ইমাদ্দুল্লা এ-সব ভেবে বলল, যত সব আজে বাজে চিন্তা। ব্রাউসের মঙ্গল কিসে হবে না হবে সেটা ওরাই ভালভাবে জানবে। পলুক অথবা সে কেন যে অযথা চিন্তা করছে।

তবু মনে হল যাবার আগে একবার দেখা করা দরকার। কারণ দেখা হলে ব্রাউস খুব আনন্দ পাবে। ইমাদ্দুল্লাও আনন্দ পাবে—এইসব দ্বীপের ভিতর সে যত হেঁটে বেড়াবে তত তার মনটা খুশী হয়ে উঠবে। জাহাজের একঘেয়েমি কাজ কি যে নিদারুণ, কখনও এই সব দ্বীপে নেমে গেলে টের পাওয়া যায়।

ওরা যখন ফিরছিল তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ট্রলিবাসের মাথায় কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না। গড় গড় করে, বাসটা বের হয়ে গেল। ওরা বাসটা চলে গেলে রাস্তা পার হল। এখনও কিছু কিছু লোক রাস্তায় দেখা যাচ্ছে। পাব-গুলোতেই এখন বেশি ভিড়। শীতের জন্য সবাই মদ খেতে ঢুকে গেছে।

রাস্তার ঠিক মোড়ের পথটা পিকাকোরা পাহাড়ের দিকে গেছে। একটা মুসকোদাইন লতার গাছ বাড়িটার সামনে ঝুলে রয়েছে। আর বাড়িটাতে এখনও যখন একটা কাচ খোলা তখন মনে হচ্ছে কেউ বের হয়ে আসছে। আসলে লোকটা রাস্তা অতিক্রম করার জন্য পাঁচিল ঘেঁষে আসছিল—দেখলে মনে হবে সামনের বাড়ি থেকে লোকটা বের হয়েছে। সামনে কাস্টম হাউসের ঝুল-বারান্দা থেকে আলো এসে পড়ছে। লাইট পোস্টের আলোগুলো খুব জোরালো নয়। এই আলোটার জন্যই মিলান টের পেল, ইমাদ্দুল্লা আর পলুক কিনার থেকে জাহাজে ফিরছে।

ইমাদ্দুল্লা এবং পলুক যাকে ভেবেছিল, বাড়িটা থেকে বের হয়ে এসেছে, আসলে সে বাড়ি থেকে যে বের হয়ে আসে নি, সে যে পলুকের খোঁজে জাহাজে গেছিল—মিলানকে আবিষ্কার করতেই তা ধরা গেল।

মিলানকে দেখে ওরা উভয়ে ভীষণ অবাক। সে এল কি করে?

মিলান বলল, যাক বাঁচা গেল। তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল হল।

ইমাদ্দুল্লা বলল, চল জাহাজে।

পলুক কেমন লাজুক মুখ করে রেখেছে। এমনিতেই সে সবাইকে মান্য করে থাকে খুব। ব্রাউসের বাবা বলে সে খুব বেশি মান্য করছে। সে যেন ওদের কেউ নয়, কোনো সম্পর্ক নেই এমনভাবে হাঁটছে।

ইমাদ্দুল্লা বলল, জাহাজে হঠাৎ!

—ব্রাউস পলুককে নিয়ে যেতে বলেছে।

—তুমি এলে কি করে।

—জীপে।

—জীপে! ইমাদ্দুল্লা অবাক।

—স্যাণ্টিস থেকে এসেছি জীপে।

—তা হলে কখন রওনা হতে হয়েছিল।

—দেড়টা দুটো হবে।

ইমাদ্দুল্লা বলল, পলুক গেলে আসবে কি করে?

—পরশ্বদিন স্যাণ্টিস থেকে এখানে একটা গাড়ি আসার কথা আছে। আমরা তাকে গাড়িতে তুলে দেব।

ইমাদ্বল্লা বলল, দ্ব তিন দিন এক নাগাড়ে ছ্বটি পাবে বলে তো মনে হয় না!

—তোমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে হয়ে যাবে।

সত্যি সেটা হয়ে গেছিল। মিলান এনজিন সারেঙকেও খ্বব অন্বরোধ করল এ-ব্যাপারে। সব খ্বলেও বলল। মেয়েটা বাঁচবে না ঠিক, তব্ব যে কদিন মনটা একট্ব ভাল থাকে।

ইমাদ্বল্লা বলল, তুমি তো ইচ্ছা করলে প্বলককে রেখে দিতে পার।

প্বলক তখন কাছে ছিল না। যেন বড়দের কথায় ছোটদের থাকতে নেই—সে তার ফোকশালে বসে আছে। এবং যেমন কিছ্ব বইপত্র উল্টে পাল্টে দেখার স্বভাব তেমনি দেখছে। রাত বাড়ছে। ঝড়ো হাওয়া নেই। চারপাশের পোর্টহোল বন্ধ। চার পাশে গ্যাস পাইপ খোলা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ওর হাত-পা সাদা হয়ে গেছিল এখন এই সময়ে শরীর বেশ তাজা মনে হচ্ছে। সে যদি যায় তবে ব্রাউসের বাবার সঙ্গেই যাবে। নিশ্চয়ই ব্রাউসের বাবা কাল আবার আসবে।

মিলান হাসল। যেন বললে এমন শোনাতো—সে হয় না। আমার সব জানা আছে। সেই য্বদ্ধের ঠিক পরে পরে ব্রাউসের মা একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেল। আমার সঙ্গে গীর্জায় ওর ছবি, সাদা পোশাকে আমাদের ছবি দেখলে তুমি ইমাদ্বল্লা অবাক হয়ে যাবে। কি স্বন্দর ছিল ব্রাউসের মা। ওর ম্বখের সেই পবিত্রতা আমি এখনও ভুলতে পারি না। এবং ভিতরে যে এত বড় একটা রোগ প্বষে রেখেছে কে বলবে! ওর আত্মীয়স্বজনেরা তো ভাবল ব্রাউসের মা নিরাময় হয়ে যাচ্ছে। কারণ প্রথম ভালবাসাবাসির দিনগ্বলি ব্রাউসের মাকে ভীষণ তাজা করে রেখেছিল। তারপর আমাদের দিনগ্বলো তো আর নিত্য ন্বতন চমকে ভরে থাকে না, লাইট-হাউসের একঘেয়েমি, এই সকালে বের হয়ে যাওয়া, নটায় এসে টিফিন আবার এক নাগাড়ে বারোটা পর্যন্ত কাজ, তারপর লাঞ্চ এবং আবার পাঁচটা পর্যন্ত বাতিঘরে কাজ—এ সবের ভিতর এক বিস্ময়কর একঘেয়েমি এবং রাতে আমার আর কি সম্বল। কাছে টেনে নিলেই কেমন আঁতকে উঠত। চোখ ওর নীল হয়ে যেত ভয়ে। এবং এ-ভাবে এ দ্বঃখ ভিতরে জেগে গেলে ব্রাউসের মাকে আর বাঁচানো গেল না। ঠিক এখন ব্রাউসের চোখ ম্বখ দেখলে আমার এমন মনে হয়।

পরদিন মিলান প্বলককে নিয়ে জীপে চলে গেল।

রাস্তাটা ভারি মনোরম ছিল। নানা রকম পাহাড় কেটে উঁচ্ব নিচ্ব পথ। যাবার সময় মিলান পিঁয়াদ্রোতে একট্ব বিশ্রাম নিল। সেখানে সে প্বলকের সঙ্গে সামান্য কফি আর বিস্কুট খেল। দ্বপ্বরে বোসানের মা ওদের খাবার ঠিক করে রাখবে। বোসানের বাবা মা ব্রাউসের বাড়িতে আজ খাবে। এবং এটা বোধ হয় আর একটা ম্বত্যুবার্ষিকী। অবশ্য কেউ খ্বলে বলছে না। মিলানও খ্বলে বলছে না—আজ ওর স্ত্রীর ম্বত্যুবার্ষিকী। ব্রাউসও গেলে বলবে না, প্বলক এই দিনে আমার মা মারা যান। যেন ম্বত্যুর এই ভয়াবহ ছবি সবাই ভুলে থাকতে চায়। সবাই জানে অথচ সবাই গোপন করে রাখে। এবং গোপন না করলে, সব খোলামেলা হয়ে গেলে এক সময় স্ম্বতিতে ড্ববে যাওয়া এবং এমন হ্বশ বিকেল থেকেই হয়তো আবার দেখা যাবে—ব্রাউস একটা কাচের জানালায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সবাই তাই এ-ভাবে গোপনে একটা ম্বত্যুবার্ষিকীর উৎসব করে ফেলে।

রাস্তার দুপাশে সব গাছপালা যা পুলক চিনতে পারে না। মিলান গাড়ি চালাচ্ছে। সে কিছু কাজু বাদাম পাশে রেখেছে। একটা দুটো করে কথাবার্তা বলার ফাঁকে খাচ্ছে। পুলকও মাঝে মাঝে দুটো একটা তুলে নিচ্ছিল। সে যে গ্রাউস যাবার পর সব ক'দিন পাহাড়টার পেছনে একটা গোপন স্থানে রাত কাটিয়েছে এবং এক ভীষণ আকর্ষণ, যেন পুলকের তর সইছে না, সে লায়ন রক থেকে দূরবীনে দেখেছে গ্রাউস মাঝে মাঝেই লাইট-হাউসের কনট্রোলিঙ টাওয়ারে উঠে ট্র্যাপিজের খেলা আরম্ভ করে দেয় এবং দিলেই ভয়—সে যেন আজ কেবল বলতে যাচ্ছে দোহাই গ্রাউস তুমি আমাকে এ-ভাবে ভয় দেখিও না। এ-ভাবে ভয় দেখালে রাতে আমি ঘুমোতে পারি না। তোমার জন্য দ্বীপের পাশে পাহারায় থাকি। যেন তুমি পড়ে গেলেই আমি তোমাকে ধরে ফেলতে পারব।

আশ্চর্য সব ভাবনা। পুলকের জাহাজে ফিরে এলেই মনে হত, আবার গ্রাউস ট্র্যাপিজের খেলা বোধহয় আরম্ভ করে দিয়েছে। সে জাহাজে কিছুতেই কাজে মনোযোগ দিতে পারত না। কখন সারেঙ বলবে টান্‌টু, অর্থাৎ ছুটির ঘণ্টা পড়বে, এবং সে সব সময় ঘড়ির দিকে চোখ তুলে রাখলে টের পেত বুকের ভিতর ঘণ্টা বাজছে এক দুই তিন, সে ঘণ্টার শব্দ শুনে কেমন প্রতিকূল আবহাওয়ার ভিতর সারা জীবন লড়ে যাবে এমন ভাবত—আর তখনই মনে হত, নন্দিনী একটি মেয়ের নাম। নন্দিনী একটি ভালবাসার নাম। নন্দিনী তারপরে কি যে অস্বাভাবিকভাবে শুয়ে থাকে। শীতের ভিতর এসব মনে হলে ওর কপালে ঘাম দেখা দিত।

পুলক বলল, আর কতদূর?

—বেশ দূর। সামনে একটা ব্রীজ পার হতে হবে।

পুলক ব্রীজ পার হবার সময়ই মিলান বলল, খুব দূরে মেঘের মতো কিছু দেখতে পাচ্ছ।

—সামনে না পেছনে?

—পেছনে।

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

—ওটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির পেছনটা।

পুলকের মনে হল সেই নীল উপত্যকা, যেখানে সে গ্রাউসের হাত ধরে ছুটে বেড়িয়েছে। গ্রাউসের সাদা হাত, ঠিক সাদা নয়, গোলাপী রঙ, সে হাতে হাত রাখলেই রঙটা গোলাপী হয়ে যেত, ভিতরে তখন প্রাণের খেলা, এমন মনে হলে পুলকের আর ইচ্ছা করছে না পেছনে তাকাতে। ওরা ডানদিকে লাইট-হাউস ফেলে আরও সামনে চলে যাচ্ছে। বড় বেখাপ্পা জায়গায় এই বাতিঘর। পুলক ঠিক ভেবে পায় না, এমন একটা জায়গায় সরকার বাতিঘরটা কেন করলেন!

মিলান বলল, দ্বীপটা খুব তোমার পছন্দ হবে।

পুলক একটা চুইংগামের প্যাকেট খুলে সামনে রাখল। সে একটা টেবলেট মুখে পুরে চুষতে থাকল। সে বলল, গ্রাউসের দ্বীপটা ভাল লাগে না?

—একসময় ও দ্বীপটাকে খুব ভালবাসত। স্কুল ছুটি হলেই চলে আসত। আর যেতে চাইত না। কিন্তু তারপর...। মিলান যেন খুব ভালভাবে চারপাশটা দেখে এখন গাড়ি চালাচ্ছে।

এমন মুখ দেখলেই কেন জানি বলতে ইচ্ছা হয়, আপনি ভাববেন না, গ্রাউস ঠিক ভাল হয়ে যাবে। গ্রাউসের ভিতর আমি সেই ভালবাসার সুষমা আবিষ্কার করে

ফেলেছি। এ মেয়ে সহসা অকারণ মরে যেতে পারে না। সে অথচ কিছু না বলে কেবল বলল, দ্বীপের মাথায় যে বাতিঘরটা আছে ওখানে কি কেউ ট্রাপিজে খেলা দেখায়?

মিলান এমন কথা শুনে খুব অবাক চোখে তাকাল।

পুলক না তাকিয়েই বুঝতে পারল, মিলান এখন ওকে খুব অপলক চোখে দেখছে। সে বলল, লায়ন রকের পিছন দিককার একটা দ্বীপে আমি মাঝে মাঝে যেতাম। দূরবীনে কনট্রোলিঙ টাওয়ারে চোখ রাখলে আমার কেন জানি মনে হত ব্রাউসের মতো একটা মেয়ে কেবল দুলছে। সে, আত্মহত্যার জন্য বার বার রেলিঙে ঝুঁকতে দেখেছে মেয়েটাকে এমন বলল না।

মিলান বলল, সেখানে ব্রাউস মাঝে মাঝে যায়। ওর ভাল না লাগলেই যায়।

--এখন কি সে সেখানে গিয়ে বসে রয়েছে।

—থাকতে পারে।

—পুলকের বুকটা কেমন কেঁপে উঠল। সে নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। বলল, ওকে ওখানে যেতে দেবেন না। জায়গাটা আমার খুব ভয়ের মনে হয়।

মিলান বলল, ভয়ের কি আছে।

—এত উঁচু থেকে ও যদি পড়ে যায়।

মিলান একটা চুরুট ধরাচ্ছিল তখন। সে গাড়িটাতে তেমন স্পীড দিতে পারছে না। পুলক তাকে ভয়ের কথা বলছে। কি ভয় থাকতে পারে সে বুঝতে পারছে না। সামনের একটা বড় টিলা ঘুরে সোজা পথে উঠে যাবার সময় কেমন একটু অবসর পেয়ে বলল, অত উঁচু থেকে সে পড়তে পারে না।

পুলক আর কি বলবে। খুব বিশ্বাস ব্রাউসের ওপর। দুর্ঘটনার ব্যাপারটাকে আদৌ আমল দিচ্ছে না। পুলক দেখাছিল তখন দুপাশেই পাহাড়। বেশ এঁকে বেঁকে গাড়ি দ্রুত ছুটছে। সে দুম করে বলে দেবার মতো বলে ফেলল, দুর্ঘটনা কখন ঘটে কেউ বলতে পারে না।

—সে ঠিক।

—তবে!

—তবে ওখানে কি করে সেটা ঘটবে। গোটা কনট্রোলিঙ টাওয়ার দামী কাচে মোড়া।

—কাচের ভিতর ব্রাউসকে এত স্পষ্ট দেখা যাবে কি করে!

—খুব দামী কাচ। ভীষণ পাতলা। মনে হবে জলের মতো মসৃণ।

পুলক আর কিছু বলতে পারল না। সে কেমন বোকার মতো বসে থাকল। সে কি যে বোকা! সে সারারাত একটা পাহাড়ের খাদে কাটিয়ে দিয়েছে। পাহারা দেবার মতো ব্যাপারটা। আসলে সে বুঝতে পারছে না নিজের ভিতরই আছে এক আশ্চর্য ভালবাসার খেলা। সে খেলা আরম্ভ হলে রক্তের ভিতর বিস্ময়কর তাড়না। এক জায়গায় স্থির থাকতে দেয় না। নন্দিনী তাকে এ-ভাবে ছুটিয়ে মেরেছে। এখন ব্রাউস। সে বলল, এবার আমরা বোধ হয় এসে গেছি।

—এসে গেছি।

কারণ পুলক সমুদ্রের ধারে নানারকম ছোট ছোট বোট দেখতে পেল। কিছুটা সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেতে হয়। ওর জানা নেই সমুদ্রের ওপর বরফ জমতে থাকলে কিভাবে হাঁটা যায়। সে এখানে কিছুটা রপ্ত করে নেবার মতো বরফের

ওপর সন্তর্পণে হেঁটে বেড়াল। যাতে সে পড়ে না যায়, পা-টা স্লিপ না করে সে সেজন্য বেশ কায়দা মাফিক হাঁটতে থাকলে—মিলান হাত তুলে ইসারা করল। বোট রেডি। এবার আমরা দ্বীপে পৌঁছে যাব।

পুলক একটা সাদা ফ্রকপরা মেয়েকে সামনের দ্বীপে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বুঝতে পেরেছিল—এটা সেই দ্বীপ, যেখানে ব্রাউস নামে একটি মেয়ে তার আকাঙ্ক্ষায় দিন গুণছে। সে বোটে দাঁড়িয়ে হাত তুলে দিল।

দ্বীপে তখন বেশ হাওয়া ছিল। মেয়ের চুল হাওয়ায় উড়ছে। হাতে তার নীল রঙের দস্তানা। পায়ে সাদা রঙের জুতো। সাদা রঙের গরম মোজা। এবং গরম ফারের কোট হাঁটু পর্যন্ত। একটা মোমের পুতুলের মতো ব্রাউসকে দেখাচ্ছে।

আর তখন ছিল নীল সমুদ্রে অজস্র ঢেউ। কি উঁচু উঁচু ঢেউ এবং বেশিদিন ঢেউ থাকছে না। বরফে জমে গেলে সমুদ্র, আশ্চর্য নীরবতা বিরাজ করবে চারপাশ-টায়। তখন তুষার ঝড়ের শব্দ মাঝে মাঝে দূরবর্তী কোন পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভীষণ এক কঠিন খেলায় মেতে যাবে। তখন ব্রাউস কি ভাবে বেঁচে থাকে এই দ্বীপে পুলক ঠিক বুঝতে পারে না।

## তের

ইমাদুল্লা বলল, বুঝলে সারেঙসাব!

সারেঙসাব ঠিক বুঝতে না পেরে পেছন ফিরে তাকাল।—আমাকে কিছু বলছ!

—বলছিলাম জাহাজীদের কপালে কতরকমের দুঃখ লেখা থাকে।

সারেঙসাব এনজিনের লোক। সে এনজিন-সারেঙ। তার দোস্তি বয়লারের সংগে। এখন তো অনেক জাহাজ অয়েলে চলে। আবার বেশ কয়েকটা মোটর ভেসেলও কোম্পানি কিনেছে। বয়স হয়েছে যেহেতু—সেজন্য সে জানে এই বয়লার-গুলি কি যে কসবি! কয়লার জাহাজেই তিনি বেশি কাজ করেছেন। কয়লার জাহাজে কাজ করলে অনেক দুঃখ লেখা থাকে কপালে। সে কি ভেবে বলল, তা থাকে। বলেই সে কেমন একটু বিস্ময়ের সংগে বলল, তা হঠাৎ এমন কথা!

—না বলছিলাম, এটাই জাহাজীদের ভাগ্য।

—একবার একটা বয়লার কিছুতেই স্টিম দেয় না, গেজে স্টিম কিছুতেই দুশো দশের ওপর তুলতে পারছি না আর দরিয়াতে তেমনি দেওয়ানি—কি যে কষ্ট, দেওয়ানি দেখলেই বয়লারটা কেমন ভয় পেয়ে যেত। ছোট টিণ্ডাল তো একদিন ফায়ারম্যানকে পাছায় লাথি মেরে দিল। ছোট টিণ্ডালের নালিশ বয়লারটাকে কেন বাগে আনতে পারছে না আগুয়ালা। সে কি করবে কও...

ইমাদুল্লা বুঝল কথা বলতে বলতে দ্যাশের কথা বাইর হইয়া গ্যাছে। সে হেসে দিল। বলল, সারেঙসাব কষ্ট অনেক রকমের। আমি বলছিলাম পুলকের কথা।

—বয়সের দোষ ইমাদুল্লা। বয়সের দোষ।

ইমাদুল্লা বলল, ছোকরাটা এমন একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ল! কিছু বলাও যায় না। অথচ সারাটা জীবন কষ্ট পাবে।

—তা পায়। জাহাজীদের এমন একটা দুঃখ কখনও না কখনও পেতেই হয়।

কবে আবার পলেক এ-বন্দরে আসতে পারবে কেউ জানে না। আর আসবে কিনা তাও কেউ বলতে পারে না। অথচ দ্যাখো কি দুঃখ কপালে। জাহাজ ছাড়ার সময় ডেক থেকে লাফ দিয়ে না সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে আবার আত্মহত্যা করে! এবং এ-ভাবে সারেঙসাব তার নাবিক জীবনে কতবার কতভাবে এমন সব ঘটনা দেখেছে সে-সব এখন এক দুই করে যেন বলে যেতে থাকবে। আর ব্যাপারটা হবে তার কাছে মামার বাড়ির মাসির খবরের মতো। সুতরাং এখন সারেঙসাবের দার্শনিক মুখচোখ দেখতে হবে ভেবেই ইমাদুল্লা বলল, তবু যা হোক আপনার চেষ্টায় সে জাহাজ থেকে দুটো দিন ছুটি পেল।

এমন কথায় চিড়া ভিজবে কি ভিজবে না ইমাদুল্লা বুঝতে পারল না। সে যে কথাটা বলবে ভেবে রেখেছিল, অর্থাৎ সে এবার নিজেও দুতিন দিনের ছুটি চায়। তার ইচ্ছা যখন পুলক গেছে দ্বীপটাতে, তখন সেও দু একদিন থেকে আসে। অবশ্য এখন নয়, বরফ যখন বেশ জমে যাবে তখন। সে ভাল সাইকেল চালাতে জানে। সে পুলকের সংগে ঘুরে আসবে। এবং পুলকের যা স্বভাব, বরফ পড়লে সে ঠিক একা একা বের হয়ে যাবে।

ইমাদুল্লা কেন এমন ভাবছে এখন বুঝতে পারছে না। এই বয়সে ওর তো বরফের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাবার সখ থাকার কথা না। সে কি সেই দ্বীপটায় অথবা যেখানে ডিভাইন লেডি আছে সেটা আর একবার দেখবে বলে যেতে চাইছে। সেখানে ওর ঠিক পুলকের বয়সে এমন কোন স্মৃতি এড়িয়ে নেই যে না গেলে মনটা খাঁ খাঁ করবে। সে মেসরুমের ভিতর দাঁড়িয়ে নানাভাবে নিজের এই ছুটি নেবার ইচ্ছা এবং ভিজা কথায় চিড়া ভেজে কিনা এসবের ভিতর আশ্চর্য হয়ে গেল ভেবে—জাহাজে থাকতে থাকতে কখন এই পুলক তার সন্তানের মতো হয়ে গেছে। ওর ভয় কখন ছেলেটা না ওর কাছ থেকে দূরে সরে যায়। অথবা যা সব রাস্তাঘাট এবং যে-ভাবে এ-অঞ্চলের আবহাওয়া ক্রমে খারাপের দিকে যাচ্ছে তাতে করে পুলকের সবচেয়ে দুঃসাহসিক যাত্রার সময় তার সংগী হওয়া দরকার।

সে বলল, সারেঙসাব একটা কথা ছিল।

সারেঙসাব ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। সে মেসরুমের দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। গ্যালি থেকে উনুনের আঁচ আসছে বলে ঘরটা সামান্য গরম। এখন আর নিচে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। এখানেই চা আর রুটি খেয়ে নেবে। ন-টার বেল পড়লে আবার এনজিন রুমে নেমে যেতে হবে।

সারেঙসাব বলল, কি কথা?

—দু দিনের ছুটি আমারও দরকার।

- তোমারও কি শেষ পর্যন্ত

—সারেঙসাব, আমারও শেষ পর্যন্ত কিছু একটা হয়েছে বুঝতে পারছি।

—মরেছ তবে। এই বুড়ো বয়সে .

—বুড়ো বয়সে আমার এমনটা হবে বুঝতে পারি নি।

সারেঙসাব বলল, সে হয়ে যাবে, মেজমিস্ত্রিকে বললেই হয়ে যাবে। কিন্তু কি বলে ছুটি নেওয়া যায় বলতো!

—কেন, যা হয়েছে আমার!

—মেয়েটা কে! জাহাজে কখনও এসেছিল!

ইমাদুল্লা হেসে দিল। তারপর বলল, সব কথা সবসময় বলা যায় না সারেঙসাব।

আমার এমন দুর্বলতার কথা আপনি নাই জানলেন।

—তা তুমি পার। তোমার ঘরে তো কেউ নেই। বিবি বেটা সব খেয়ে বসে আছ।

ইমাদুল্লা অপরাধীর মতো মুখ করে রাখল।

—সে বলব। তোমার জন্য না হয় বলে দুটো দিন ছুটি করিয়ে নেয়া যাবে।

ইমাদুল্লা বলল, আমার জন্য যে ভাবেই হোক এটা করিয়ে নিতে হবে। তারপর কেমন ইতস্তত করে আরও কিছু বলবে বলে এগিয়ে গেলে সারেঙসাব বলল, তোমার শরীরটা খুব ভাল দেখাচ্ছে না। তোমার কি জ্বরটর হয়েছে। বলে কপালে হাত রাখল সারেঙসাব।

—না, জ্বরটর কিছু হয় নি।

—তবে, চোখ মুখের এমন অবস্থা কেন। ক-দিন কাজের এমন চাপ গেছে কারো দিকে মুখ তুলে দেখবার সময় পাই নি।

—ক রাত ভাল ঘুম হয় নি।

সারেঙসাব কেমন ক্ষেপে গেল। বুড়ো বয়সে মরণের কাঠি কানে বাঁধছ মিঞা।

ইমাদুল্লা কিঞ্চিৎ হাসল। তারপর বলল, যাই হোক কেউ যেন না জানে সারেঙসাব।

সারেঙসাব নিচে নামবে না অথচ এমন কথা শুনে আব মেসরুমে দাঁড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে না। কি যে হয় মানুষের! কোথায় কি করে যে মানুষ এ-ভাবে জাহান্নামে নেমে যেতে পারে। সে বলল, ঠিক আছে, কাউকে বলব না।

এই বয়সে ইমাদুল্লার চোখে মুখে ঘুম না থাকবার কথা নয়। তবু যে কেন সে রাতে কিছুতেই ঘুমোতে পারত না। এই ছেলেটা কোথায় থাকে রাতে। একবার ভেবেছিল সারেঙকে দিয়ে কাপ্তানেব কাছে নালিশ জানাবে ছেলেটা এভাবে খারাপ আবহাওয়ায় সারাটা রাত কোথায় থাকে, আপনি কাপ্তান বারণ করুন। এবং কাপ্তান ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু তিনি জানেন এই সব জাহাজীদের দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার পর বন্দরে এলে একটু এলোমেলো স্বভাবেব হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। আবার বন্দর ছেড়ে সমুদ্রে পড়লেই এক ভীষণ একঘেয়েমী। এই একঘেয়েমী সমুদ্র যাত্রা থেকে রক্ষা করাও তার কাজ। জাহাজীরা খুব একটা মারাত্মক কিছু করে না বসলে। কাপ্তান কিছুতেই নাক গলাতে চান না। কাজের সময় হাজির থাকলেই তিনি খুশী। আর এই পুলকের পক্ষে তো খুবই সুবিধা-জনক কিছু কিছু ঘটনা জাহাজে ঘটেছে। কারণ সে তো খুব ভাল ছেলে, কাজে আন্তরিক। সে ভালভাবে ইংরেজি ভাষাটা রপ্ত করেছে। অনেক বই পড়েছে। অনেকদিন সে দেখেছে পুলক বোট-ডেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেজমিস্ত্রির সংগে কি সব দামী দামী কথা বলে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। সে এত সব কথা বোঝে না, তবু সে জানে অথবা বোঝে মেজমিস্ত্রির ভীষণ ভাল লাগে পুলকের কথা শুনতে। চোখে মুখে মেজমিস্ত্রির খুব একটা আন্তরিকতা থাকে তখন। এবং ইমাদুল্লার পুলককে বড় মানুষ ভাবতে কষ্ট হয় না তখন।

পুলক এইসব ছুটির ব্যাপারে সারেঙসাবের চেয়ে কম যায় না। সে ইচ্ছা করলে মেজমিস্ত্রিকে দিয়ে ছুটি করিয়ে নিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য কাজের সময় পুলক ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খায় না। আর ওর মুখে চোখে খুব একটা উদাস ভাব, অথবা বিষণ্ণতা ঝুলে থাকে বলে জাহাজীরা ওর হাতের কাজটুকু সেরে ফেলতে

ইতস্তত করে না।

কিন্তু ইমাদুল্লার হয়েছে জ্বালা। সেই যে কলকাতা বন্দরে উঠেই সে বলেছিল, চাচা সফরে যাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে সুখ দুঃখে দিন কেটে যাবে, তখনই ইমাদুল্লার মনে হয়েছিল এমন বাবু মানুষ, লেখাপড়া জানা মানুষ জাহাজের এমন কাজে কেন! অবশ্য ভদ্রা জাহাজ থেকে কিছু কিছু বাঙালীবাবুরা আসছে। ইমাদুল্লার স্বভাবই তখন ছিল এমন, ওরা হিন্দু বাঙালী ছেলেদের বাঙালীবাবু বলত। তবু সে যেন ওসব বাঙালীবাবুদের সঙ্গে এ-বাঙালীবাবুর একটা বড় রকমের তফাত খুঁজে পেয়েছে।

আর বন্দরে বন্দরে কত প্রশ্ন পুলকের। চাচা, এটা কেন হল, ওটা কেন হচ্ছে না, চাচা, তোমার সঙ্গে আমার একজায়গায় একটা বড় রকমের মিল আছে, তোমারও দেশে কেউ নেই, আমারও নেই, সমুদ্রই আমাদের ঘর, দেশ বন্দর যা কিছু বল। দেশে গিয়ে বেশি দিন থাকতে পারি না। কেমন সমুদ্র কেবল টানে।

সমুদ্র কেবল টানে কথাটা ওর ভিতরেও কাজ করে থাকে মাঝে মাঝে। সে যেন বুঝে ফেলেছিল, ঠিক ইমাদুল্লার নসিবের মতো পুলকের নসিব হয়ে গেল। দেশে গিয়ে আর পুলক কখনও ঘর বেঁধে কিনারায় কোন কাজ খুঁজে থেকে যেতে পারবে না। কিছু সময় পার হলেই ওর চোখে মুখে সমুদ্রের জন্যে বিষণ্ণতা জাগবে। ওর মনে হবে, অনেক দিন হয়ে গেল, সে সমুদ্রে পাল তুলে যাচ্ছে না। নোনাজলের কি এক ভীষণ মায়া আছে।

এই মায়ায় সেও জড়িয়ে পড়েছে জাহাজে। জাহাজে এটা হয়। কত সব জায়গা থেকে জাহাজীরা আসে। কারো বাড়ি সুদূর অরাকানে কেউ ভোলা সন্দীপের লোক, কেউ আবার মেদিনীপুর থেকে এসেছে, নোয়াখালির মানুষই জাহাজে বেশি থাকে। এ-জাহাজে ইমাদুল্লা গুণে দেখেছে সংখ্যায় সারেঙসাবের দেশের লোকই বেশি। সাধারণত এটা সারেঙসাব নোয়াখালির মানুষ বলে সিপিঙ অফিসের মাস্টার থেকে বেছে বেছে বেশি করে নোয়াখালির লোক নিয়েছে। ইমাদুল্লা নিজের বাড়ি কোথায় এখন যেন সঠিক জানে না। সে কবে কলকাতায় এসে যে থেকে যায় আর দেশে ফেরার ইচ্ছা হয় না, এবং স্মৃতিতে দেশের কথা সে খুব একটা বেশি মনে করতে পারে না, আর পারে ছোট বিবি, নাকে নোলক পরে থাকত তার বিবিটা, পাছা পেড়ে শাড়ি পরতে খুব পছন্দ করত, সফর থেকে ফিরে গেলেই বিবিটা পেটি থেকে খুঁজে বের করত তার শাড়ি, সেমিজ আর চোখে সুরমা দেবার সখ ছিল ভীষণ। কোনবার ভুলে সুরমা না নিলে বিবি মুখ ভার করে রাখত। সেই বিবির একছেলে, ছেলে এবং বিবি মহামারীতে গেলে—সে আর কিছু মনে করতে পারে না। সে তখন সফরে ছিল। সমুদ্র সফরে জাহাজীদের এমন খবর এলে যা হয়, কেবল ডেকে পায়চারি করা, জাহাজ থেকে ফেরার কোন পথ থাকে না। সে জাহাজে তার শোক দুঃখ, সমুদ্র আর পাহাড় অথবা দ্বীপ দেখতে দেখতে কখন ভুলে গেছিল। যখন সে কলকাতায় ফিরে আসে শোকটা আদৌ বুঝি ছিল না। কি যে হয়ে ছিল মনে, সে এখন ভেবে পায় না, কেন যে যে আর দেশে ফিরেই যায় নি। কেবল দেশের লোক এলে সে সাথিতে খবর নিয়ে ওর বিবির খুঁটিনাটি জানতে জানতে কেমন উদাস হয়ে গেছে। তারপর সে বেশ ছিল। কোন মায়া অথবা বন্ধনে সে বাঁধা ছিল না। জাহাজে একসঙ্গে থাকতে থাকতে একটা মায়া গড়ে ওঠে তবে যেন এটা ঠিক তেমন ব্যাপারও নয়। সে পুলকের জন

ক-রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। খারাপ আবহাওয়ায় সন্তান সমুদ্রে গেলে যেমন চিন্তা, ইমাদুল্লাকে তেমনি পেয়ে বসেছে। সে খুব সকাল হলেই সে জন্যে রেলিঙে দাঁড়িয়ে থাকত। এবং যখন দেখতে পেত পুলক বোটে ফিরে আসছে ওর বুক থেকে একটা পাষাণ ভার নেমে যেত যেন। পুলক কি করে যে এই জাহাজে তার সন্তানের মতো হয়ে গেল।

## চোদ্দ

ওপাশ থেকে দ্বীপটাকে দেখলে যা মনে হয় এপাশটায় তার বিপরীত। পুলক লায়ন রক থেকে দ্বীপটাকে দেখেছিল—এবং এত খাড়া পাহাড় যে সে ভাবতেই পারে নি স্যাণ্টসের মুখে দ্বীপটা ঢালু। অনেকটা দেশের বাড়িতে সে সরস্বতী পুজোয় যে পাহাড় নির্মাণ করত তেমনি। ঠাকুরের পেছনটা একেবারে খাড়া, তারপর ধীরে ধীরে নদী পাহাড় বন সমতল ভূমি। সে সামনের বেলভূমিতে নেমে এমনই ভেবেছিল। এবং ব্রাউসের আশ্চর্য দেবীর মতো মুখ তার দেশের বাড়িতে কোন শীতের সকালে দেবী প্রতিমার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। যেন এই সমুদ্র আকাশ এবং পেছনের শীতের পাহাড় না থাকলে ব্রাউসকে ঠিক বোঝা যেত না। সে ব্রাউসের কাছে খুব ধীরে ধীরে হেঁটে গেল। দেখে বোঝাই গেল না, সে এতদিন পর ব্রাউসকে দেখে কতটা খুশী।

ব্রাউসের যেমন স্বভাব, একটু বয়সী মেয়ের মতো কথা বলার ব্যতিক, স্বভাবে একটু ভারি ভারি। কখনও কখনও খুব গম্ভীর মনে হয় সেজন্য অথবা ওর অসুখ-টারই বুঝি এমন স্বভাব, একটু বয়সী হয়ে যাওয়া—সে পুলককে হ্যাণ্ডসেক করার সময় বলল, রাস্তায় কোন অসুবিধা হয় নি তো?

—অসুবিধা হবে কেন। কি সুন্দর রাস্তা। খুব প্লেজাণ্ট জার্নি। দুপাশের পাহাড়ের ভিতর দিয়ে কি জোরে আমরা আসছিলাম।

মিলান তখন বোটটা বেলাভূমির ওপর টেনে তুলছে। দুটো বোট। ছোট এবং বেশ চওড়া বোটে পাল খাটাবার পর্যন্ত ব্যবস্থা আছে। বোটের মোটর কোন কারণে মাঝ সমুদ্রে বিগড়ে গেলে পাল খাটিয়ে সহজেই এ-দ্বীপে চলে আসা যায়। স্যাণ্টস থেকে সমুদ্রপথে কত সহজ আসা। ওরা যদি স্যাণ্টসে জাহাজের নোঙর ফেলত—তবে শেষ কটা দিনও সে অনায়াসে রোজ একবার বিকেলে এই দ্বীপ থেকে ঘুরে যেতে পারত। স্যাণ্টস থেকে বেশ দূর অথচ যাতায়াতে খুব সুবিধা।

একটা বোট কাজে বের হয়ে গেলে আর একটা স্ট্যাণ্ড-বাই থেকে যায়। কারণ কত কারণে স্যাণ্টসের সঙ্গে একটা যোগাযোগ রাখতে হয়। বরফ জমছে ধীরে ধীরে, খুব বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বোট চালিয়েছে মিলান। যখন সে ব্রাউসকে নিয়ে এসেছিল, সঙ্গে ছিল লট বহর। বরফ কাটা কলের জাহাজ এদিকটায় কি কারণে এসেছিল। সেই জাহাজে আসার দরুন ব্রাউস ঠিক জার্নির মজাটা টের পায় নি। সে বলল, তুমি ভীষণ লাকি।

—তা বলতে পার।

মিলানের আসতে দেরি হবে, কারণ সে বোট বাঁধাছাদা করে আসবে। একটা ছোট পাহাড়ের শেষ ধাপ সমুদ্রের জলে নেমে গেছে। বোটটাকে টেনে বালিয়াড়িতে তুলে সেখানে সে ফেলে রাখল। এখন যা কিছু ঝড় উত্তর থেকেই আসার কথা।

এই পাহাড়ের আড়ালে বোট ফেলে না রাখলে ঝড় দড়িদড়া ছিঁড়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এসব কাজ সারতে মিলানের বেশ দেরি হয়ে গেল। সে দেখতে পাচ্ছে ধীরে ধীরে ব্রাউস এবং পুলক হাঁটছে। পুলককে খুব লম্বা লাগছে কেন জানি আজ। বোধ হয় পুলক ওভার কোট পরেছে বলে এমনটা লাগছে।

পুলক হাঁটতে হাঁটতে বলল, কেমন আছো?

—ভাল।

—ভাল আমারও মনে হচ্ছে।

—কি করে বুঝলে?

—যখন দাঁড়িয়েছিলে তখনই বুঝলাম এটা ব্রাউসের দ্বীপ। তুমি ভাল না থাকলে দাঁড়িয়ে থাকতে না।

—কেন লাইট-হাউসটা দেখতে পাও নি?

—লাইট-হাউস দেখার আগে তোমাকে দেখে ফেলেছি।

ব্রাউস এমন কথায় ম্লান হাসল।

—তুমি হাসছ।

—হাসব না তো কি করব।

—সত্যি বলছি তোমাকে আমি আগে দেখেছি।

—এত বড় লাইট-হাউসটা আগে চোখে পড়ল না!

—জানি না কেন এমন হয়।

সত্যি জানা যায় না এমন কেন হয়। এখানে আসার পর ব্রাউস দুদিন না ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দিলেই আবার অসুখটা ভিতরে জেগে যায়। যেন চারপাশে তার মৃত্যুভয়। একটা সাদা মরুভূমি, জল নেই বাতাস নেই, শূন্য আকাশ আর চারপাশে সে চাপা আর্তনাদ শুনতে পায়। কেবল সবাই হাটছে, সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবু হেঁটে যাচ্ছে। মরীচিকার মতো জলের রেখা খুব দূরে মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠলেও আবার সব কেমন মিলিয়ে যায়। ব্রাউসের বেঁচে থাকার সামগ্রী অথবা উত্তেজনা সবই কেমন নিমেষে মিলিয়ে যায়, আর সহসা সব শূন্য হয়ে গেলে সে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে। তখন তাকে কেন জানি বরফের দেশে একটা পত্রপুষ্পহীন গাছের মতো মনে হয়।

ব্রাউস বলল, কাল সকাল থেকেই আবার তাজা হয়ে গেলাম। তুমি আসছ।

—ঠাট্টা করছ। যদিও এটা ঠাট্টা নয় পুলক বোঝে তবু স্বাভাবিক প্রয়োজন—এবং এমন সব কথার ভিতর নিয়ে যেতে হবে, যা তার কাছে খুব আনন্দের। ওর বোধ বুদ্ধি সব স্বাভাবিক করে দিতে পারলেই—সে সেই মেয়ে, কোন হেমন্তের রোদে দাঁড়িয়ে থাকা বালিকার ছবি। পুলক বলল, আবার কবে আসব জানি না।

—কেন, জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে!

—দেবে। আজ হোক কাল হোক জাহাজ তো ছেড়ে দেবেই।

ব্রাউস বলল, তুমি থাকবে এ-দ্বীপে।

—থাকলে তুমি ভাল হয়ে যাবে?

—আমার মনে হয় আমি ভাল হয়ে যাব।

পুলক বলল, সে হবে-খন।

ব্রাউস কি বলবে ভেবে পেল না।

—আমি জানি এমন কথায় তুমি কষ্ট পাচ্ছ।

—আমার আবার কষ্ট কিসের!

—তোমার অভিমান আমি ঠিক ধরতে পারি।

—পুলক! গ্রাউস কেমন দৃঢ় গলায় এবার কথা বলল।

—বল।

—কেন আবার এলে।

—জানি না।

—না ঠিক জবাব দেবে।

—তোমাকে দেখতে।

—আর কিছু না?

—না।

—পুলক তুমি বলতে চাও আমি কিছু বুঝি না।

পুলক বলল, কেন বুঝবে না। তোমার তো বয়স হয়েছে। এ বয়সেই তো মেয়েরা সব কিছু বেশি বুঝতে পারে।

—তবে তুমি থেকে যাবে না কেন। বাবাকে বললে তিনি রাজী হবেন। এখানে তুমি থেকে গেলে সব তিনি করে দেবেন।

পুলক বলতে চাইল, তবে তুমি আর ভাল হবে না। কিন্তু বলার মুখে সে ভাবল এমন বলাটা ঠিক হবে না। তাকে এ-সব বুঝতে দিতে নেই। আর পুলক তো জানে এমন একটা শীতের দেশে সে বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারবে না। অথবা তার মনে হয় সে যে এখানে ছুটে এসেছে, এটা শুধুই তার ভিতরের হাহাকারের জন্য। সে এ-মেয়ের কতটা ভাল চায় ঠিক বুঝতে পারছে না। অথবা এখানে থেকে গেলে বোধ হয় খুব স্বার্থপরের মতো ব্যাপারটা হয়ে যাবে। তবে তুমি একটা অসুস্থ মেয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছ! মিলান এমন ভাবলে, সে যে পুলক এবং তার কাছে যে মনে হয়, ভালবাসার সুষমা থাকা দরকার, সব অর্থহীন হয়ে যাবে। সেটা সে বুঝতে পারে। নন্দিনী তাকে এটা শিখিয়েছে। আজীবন নন্দিনী একটা নাম, ভালবাসার নাম তার কাছে।

পুলক এবার একটা সরু রাস্তায় ঢুকে যাবার সময় বলল, সে ভেবে দেখা যাবে। তারপর আর একটু এগিয়ে গেলেই বাংলো টাইপের ঘর দেখিয়ে গ্রাউস বলল, ঐ যে আমাদের বাড়ি।

পুলক পিছনে তখন তাকিয়ে দেখল সমুদ্র আর দেখা যাচ্ছে না। ওরা দ্বীপটার ভিতর ঢুকে গেছে।

তারপর এ দ্বীপে ক-টাদিন—কি যে দিন, পুলক ভেবে পায় না, এমন দিন কবে সে উপভোগ করেছে!

সকাল হলে সে ও-ঘরে কাপ প্লেটের শব্দ পেত। পায়ের ঠিক নিচে হিটারটা জ্বলছে। তার একটা কেমন রিনরিন শব্দ কানে আসত। সে কম্বলের নিচ থেকে উঁকি দিলেই দেখতে পেত, জানালা দিয়ে সামনের সব কিছু খুব অস্পষ্ট হয়ে ভেসে আছে, সকাল হয়েছে, তবু কেমন অন্ধকার কাটে নি। কখন মিলান কাজে বের হয়ে গেছে টেরও পায় নি। গ্রাউস ওর জানালায় চা এবং একটু পরিজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কত সকালে যে গ্রাউস উঠে পড়ে আজকাল।

গ্রাউসের স্বভাব, ঘর খুলে দিলেই হিটারটা কমিয়ে দেওয়া।

—তুমি এমন গরমে থাকো কি করে!

পলুক চা খেতে খেতে বলত, আমার তবে শীত যাবে না শরীর থেকে।

গ্রাউস বলত, তুমি ভীষণ শীত কাতুরে মানুষ বাবা।

—তুমি বড় হলে একবার ভারতবর্ষে তোমাকে নিয়ে যাব। পলুক বলত।

—সত্যি।

—তখন দেখবে তুমি কেমন গরমে ছটফট করবে।

—তাই বুঝি!

—আমি তখন বলব কি গরম কাতুরে তুমি বাবা।

গ্রাউস বেশ জোরে হেসে দিত।—তোমার তো আমাকে জব্দ করাই কেবল কাজ।

—যা, কবে তোমাকে আমি জব্দ করলাম।

—করছ না! সেদিন করলে না। পেনি গিলে গিলে আমাকে জব্দ করলে না!

—সেটা তো একটা খেলা।

আমার কাছে তোমার আসাটাও খেলা।

তখন আর যেন পলুক কথা বলতে পারত না। মেয়েটার মুখ খুব বিষণ্ণ দেখাতো। এ-বিষণ্ণতার মানে অন্য রকম। তার খুব কষ্ট হয় এবং এই বিষণ্ণতা গ্রাউসকে যথার্থই নিরাময় করে তুলবে। সে বলত, খেলা অবশ্য তুমি বলতে পার।

—তাছাড়া কি বলব। আমি আর কবে বড় হব ভাবছ?

—আরও বড় না হলে ঠিক তুমি আমার দেশে যেতে পারছ না।

সবই কথার কথা গ্রাউস বুঝতে পারে। সে দুদিনে দেখেছে একবারও বাবাকে পলুক তার থাকার ইচ্ছাটা প্রকাশ করে নি। এবং গ্রাউস কেমন অভিমান ভরে আর কথাটাকে মনেও করিয়ে দেয় নি। যার স্বভাব এমন, বন্দরে বন্দরে যে ঘুরে বেড়াবে, এবং এভাবে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যার নেশা তাকে সে আর কিভাবে আটকে রাখতে পারে।

ছুটি বলেই ভীষণ আলস্য শরীরে। পলুক তক্তপোশ থেকে কিছুতেই নামতে চাইত না। পায়ের নিচে কম্বল, কম্বলটা খুব দামী এবং কি যে মিহি, মনেই হয় না পশমের তৈরি। গ্রাউস পরে থাকত লম্বা আলখাল্লার মতো শিল্পিত গাউন, সে পরত ডোরাকাটা পাজামা। ওর পা হাত তার ভিতর বের হয়ে থাকলে ভীষণ ভাল লাগত দেখতে। গ্রাউস চুরি করে ওর মুখ দেখত, হাত পা দেখত। পলুক একটু অন্যমনস্ক হলেই অপলক দেখত গ্রাউস। কি যে শরীরে ওর আশ্চর্য ঘ্রাণ। গ্রাউস টের পায় কোন দূর দেশ থেকে যুবকেরা এলে, শরীরে তাদের আশ্চর্য এক ঘ্রাণ থাকে, প্রায় সবুজ লতাপাতার মতো ঘ্রাণ কিন্তু শীতের সময়ে যখন তুষারপাত শুধু, বরফের কুচি সমুদ্রের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে, কখনও বড় বড় বরফের শীলা ভাসমান তখন এমন সবুজ লতাপাতায় গন্ধ নানারকম বিস্ময় তৈরি করবে—আশ্চর্য কি!

আশ্চর্য কি পলুক যে বলবে, তুমি গ্রাউস ক্রমে বড় হবে, আমি জাহাজী মানুষ, ঘুরে ঘুরে তোমার বন্দরে আসব, তুমি ক্রমে বড় হবে, আমি ঘুরে ঘুরে বার বার এ-বন্দরে এসেই দেখতে পাব তুমি বড় হয়ে যাচ্ছ, যুবতী হয়ে যাচ্ছ। বুঝি সুন্দর এক জলছবির মতো ঘরবাড়িতে বেশ নানারকম ফুল ফোটাচ্ছ, কেউ আসবে দেখতে, কারো আসার কথা আছে, আজ অথবা কাল আসবে, যখন আসবে বলে গেছে, তখন সে নিশ্চয়ই আসবে, তোমার সুন্দর সুন্দর ফুটফুটে ছেলেমেয়েরা বিকেল হলেই খেলা করবে। এবং গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল তুলে রাখবে—মানুষটা যদি রাতে

অথবা সন্ধ্যায় আসে, সে তো এসেই চুপচাপ থাকবে না, বাগানে হৈ-হল্লোড় আরম্ভ করে দেবে, ছোট ছোট শিশুদের সোনালি চুলে চুমো খাবে। নানা দেশ থেকে সে সংগ্রহ করে রাখবে, কতরকমের টফি, এবং শিশুদের জন্য এই সব টফি সে যখন তার বিচিত্র রঙের ব্যাগ থেকে তুলে দেবে তখন তুমি ব্রাউস বুঝতে পারবে ভালবাসার মানে কত গভীর। আমাকে তুমি আর যাই বল, এই দ্বীপে আটকে যেতে বল না। দ্বীপের ভিতব আটকে গেলে ভালবাসার আর কোন দাম থাকে না।

ওরা পাশাপাশি বসে থাকত দুজন, দ্বীপের সকাল হওয়া দেখত, এবং কখনও সেই খেলা, যেন ব্রাউস এক আশ্চর্য রূপবতী কন্যা অথবা সেই যে গল্পে মধুমালা সেজে বসে থাকা আজীবন, এই দ্বীপে তারা কাছাকাছি থাকার বাসনায় যতটা পারত ঘনিষ্ঠ হত। ভীষণ দামী মনে হত জীবন, এবং এমন সময় সব, যা কিছু-তেই যেন শেষ হযে না যায়, শেষ হয়ে গেলেই সব কিছুর জন্য আবার আকাঙ্ক্ষা।

সকাল হলেই বালিয়াড়িতে অজস্র পাখি উড়ে আসত। সমুদ্রের জলে সামান্য ঢেউ থাকত। গাছপালা ক্রমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে বোঝা যেত। কেমন প্রাণহীন শুষ্ক মরুভূমি প্রায়—বরফ পড়ে গেলে দ্বীপের লাবণ্য কমে যায়। কর্কশ, মরা কাকের মতো দ্বীপটা সমুদ্রে শুধু পড়ে থাকে।

সেই মরা দ্বীপে বিকেল হলেই দেখা যেত একটা তাজা ছেলে একটা বুনো মেয়েকে ছুটিয়ে মারছে। দ্বীপে গাছপালা কম বলে, কেবল পাথর, নানাবর্ণের নুড়ি এবং ছোট ছোট ঝোপ, যা এখন ঝোপ বলে চেনা যায় না, কিছুটা কাঁটা গাছের মতো, আর কিছুদিন বাদেই ওগুলো সাদা বরফে ঢেকে যাবে, এবং ঝড় উঠলে কাঁচের মতো ঝরে পড়বে সব, যেন মনেই হয় না পৃথিবী কখনও এ-ভাবে ঘুমিয়ে থাকতে পারে। স্থির এবং স্থবির এক দ্বীপের উপত্যকায় ওরা ছুটে ছুটে এই দ্বীপমালাকে জাগিয়ে রাখছে। সেই বুড়ো মানুষটা ছিল ওদেব সঙ্গী। সে তো প্রায় দ্বীপের রাজার মতো।

কারণ সে দিন ক্ষণ দেখে বলতে পারত, কোন মাছ কোন জলে অথবা কোন সময়ে পাথরের গাযে গায়ে ঘুরে বেড়াবে। সে তাদের নিযে যেত, একেবারে যেখানে দ্বীপের একটা দিক সিঁড়ির মতো কিছুটা নেমে গিয়ে তারপর সোজা খাড়া নেমে গেছে সমুদ্রে, এই আট দশ ফুটের মতো খাড়া, ওরা ওপরে বসে হাঁটু মুড়ে তিনজনেই উঁকি দিয়ে থাকত। এবং বুড়ো মানুষটা শামুকের জিভ আলাদা আলাদা করে কেটে নিত। জিভের রঙ সাদা। ছোট ছোট চাকতির মতো কেটে সে ঠিক জলে ছন্দ তোলার মতো এক দুই করে ফেলে যেত। তারপর সহসা দেখা যেত, নীল জলে সাদা চৌকো মতো শামুকের মাংস নেমে যাচ্ছে, সেগুলো খাবার জন্য চোরের মতো নীল জলেব গভীর থেকে পাথরের দেয়াল বেয়ে বড় বড় গলদা চিংড়ি উঠে আসছে। বুড়ো মানুষ নানারকম কায়দা জানে। সেও চোরের মতো কিছুটা দূরে একটা ছোট জাল, এই দু ফুটের মতো জাল, যার রঙ একেবারে নীল জলে বোঝা যায় না, জলের সঙ্গে মিশে আছে, এবং চোরের মতো যত চিংড়ি একটা দুটো উঠে আসছে সে ওটা জলের ভিতর টেনে আনছে। তারপর কি কি আশ্চর্য কায়দায় সে জল থেকে তাজা বড় চিংড়ি একটা দুটো তিনটে, কারণ সে জানে কোন কোন দিন এই মাছগুলোর খিদের তাড়নায় এত বেশী ছটফট করতে থাকে যে শামুকের জিভের মাংস অতীব সুস্বাদু, ওরা যেন সব ছুটে এসে দলে দলে ধরা দিতে পারলে বাঁচে। কিন্তু বুড়ো মানুষটা জানে, সব ধরে ফেললে,

অথবা সে চালান দিলে বন্দরে এই দ্বীপের যে আলাদা একটা সুখ আছে অর্থাৎ সে এবং এই দ্বীপের মানুষেরা একটু আলাদা জাতের মানুষ, খুব একটা প্রয়োজনের বেশি তাদের কিছু লাগে না, গুণে গুণে সুতরাং সাতটা চিংড়ি। তারপরই বুড়ো মানুষটা আবার অন্যরকম হয়ে যায়। ম্যাকরোল মাছের ঝাঁকের মতো সে কেমন এই দ্বীপের ভিতর ভেসে থাকে। বোঝাই যায় না এই দ্বীপে একজন বুড়ো মানুষ বেঁচে আছে।

বুড়ো মানুষটা তাদের বিকেলে আর একটা খেলা দেখাতে নিয়ে গেল। সে বলল, পুলক গরমের সময় এলে দেখাতে পারতাম—এখন এই শীতে নামতে ভীষণ ভয় লাগে। বুড়ো মানুষের শরীরে একদম ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। কিন্তু তুমি কবে আসবে—সে যেন পুলককে একজন ভিনদেশী মানুষ পেয়ে তার যা কিছু জানা ছিল দ্বীপ সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছে।

সে বলল, ওখানে ওটা কি আছে?

—একটা ভাঙা জাহাজ।

—জাহাজই বটে। তবে কবেকার তোমার জানা নেই?

—না। আমার মনে হয় ওটা চার-পাঁচশ বছর আগের ব্যাপার।

—এখানে ফেলে রেখেছে কেন?

—বসন্তকালে অনেক দূরের মানুষেরা দেখতে আসে।

পুলক বুঝতে পারল—দ্বীপের আকর্ষণ বাড়াবার জন্য স্থানীয় সরকার এটা এখানে রেখেই দিয়েছে, শুধু মাস্তুলের ওপরটা ভেসে আছে নীল জলে।

—আমি তোমাকে নিয়ে সমুদ্রে নেমে যেতাম পুলক। নীল জলে তুমি এই পাহাড়ের গায়ে যতই নিচে নেমে যাবে মনে হবে, অতলে এক পাতাল রাজার দেশ আছে। তোমাকে সেখানে নিয়ে গেলে কি সুন্দর বাজনা শুনতে পেতে।

পুলক বলল, সমুদ্রের নিচে কারা বাজনা বাজায়?

—আমারও ভীষণ এ-ব্যাপারটা একসময় বিস্ময়কর মনে হত।

ব্রাউস বলল, আমি ভাল হয়ে গেলে দাদুর সঙ্গে হাতে পায়ে মাছের ডানা লাগিয়ে পিঠে অক্সিজেনের বোতল এঁটে নেমে যাব। দেখে আসব সে-দেশটা।

পুলক বলল, বাজনাটা কারা বাজায়। কেমন শুনতে।

—তুমি বিঠোফেনের ফিফথ সিমফনি শুনেছো?

—না।

—সেই ঝড় আসছে, ভেড়ার পালের চিৎকার, রাখাল বালকদের ছুটোছুটি, ঝড় বৃষ্টি, স্টর্মি নাইট। অথবা সেই প্যাস্টরেলের দৃশ্য ভেসে ওঠে মনে।

পুলক ঠিক ঠিক বুঝতে পারল না বলে বুড়োর দিকে তাকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ।

—তেমন অরকেস্ট্রা। আমার বুকটা কাঁপত। সারা জীবন ওটাই আমরা শুনতে পাই।

পুলক দেখেছিল সেই বুড়ো মানুষটার মুখ চোখ ভীষণভাবে ছোট হয়ে আসছে। বলতে বলতে চোখ বুজে ফেলছে। বুড়ো মানুষটার একটা ছাই রঙের ওভারকোট গায়ে এবং মাথায় কালো রঙের টুপি। সে টুপিটা এখন বগলে রেখেছে। হাতের লাঠিটা সে পাশে ফেলে রেখেছে। ওর প্যান্ট তালিমারা কিন্তু খুব পরিচ্ছন্ন। সে বলল, আমি মাছের ডানা লাগিয়ে সমুদ্রের জলে নেমে যেতাম। তখন আমাদের কি বা বয়েস। আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমরা এই দ্বীপে কাজের

ফাঁকে ফাঁকে সব জলের নিচে নানারঙের পাথর দেখে বেড়াতাম। তখন জাহাজের মাস্তুল জলে ভেসে ছিল না। ওটা আরও গভীর জলে ছিল। আমার স্ত্রীই ওটা আবিষ্কার করে ফেলে। তারপর জাহাজের নিচে একটা দ্বীপ জেগে উঠলে মাস্তুলটা ক্রমে ওপরে উঠে আসে। বলেই সেই বুড়ো মানুষটা বড় হাই তুলছিল।—খুব ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সে ওভারকোটের কলার দিয়ে তার কান এবং গলা ভাল করে ঢেকে বলল, একদিন বিকেলে আমার স্ত্রী বলল, জানো সমুদ্রের নিচে কারা আশ্চর্য সিমফনির সুর তোলে।

আমি বলেছিলাম—যাঃ কি করে হবে!

বলেই বুড়ো কিছু গুঁড়ো মুখে ফেলে দিল। বোধহয় পাতাটা নেশার কাজ করে। পাতা গুঁড়ো করে সে একটা ডিবেতে—রেখে দেয়। মাঝে মাঝে গুড়োটা দাঁতের ফাঁকে লাগিয়ে রাখলে—চোখ আরও ছোট হয়ে আসে।

সে বলল, আমার বৌ ছিল ভারি একগুঁয়ে।

হঠাৎ এমন কথা শুনে পুলক খুব ঘাবড়ে গেল। বৌ সম্পর্কে কোন নিন্দাবাদ হয়তো এক্ষুনি আরম্ভ করবে। আর বুড়ো হলে যা হয়—এমন সব কথা বেমক্কা বলে দিতে পারে যে কান গরম হয়ে ওঠে লজ্জায়। অথচ এই বুড়ো মানুষেরা কত কথা বলে দিতে পারে। যেন ব্যাপারটা কিছুই না। ডাল ভাত মেখে খাওয়ার মতো ব্যাপার।

সে বলল, জানো পুলক, ওর একটা শেষদিকে নেশা হয়ে গেছিল।

পুলক বুঝতে পারল—এমন কিছু একটা বুড়ো বলবে—যার জন্য প্রস্তুতির দরকার। এবং পুলক তাড়াতাড়ি পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট দিয়ে বলল, তুমি খাবে।

সে সিগারেট পেয়ে কেমন সব ভুলে গেল। বলল, বুঝলে সেই ১৯১১ সালে একটা জাহাজ ফিজি থেকে এসেছিল। তখন একজন নাবিক আমাকে একটা চুরুটের বাক্স দেয়। চুরুটগুলো ছিল সোনালী প্যাকেটে মোড়া। আমার খেতে কেমন কষ্ট হয়েছিল। আমার ঘরে শোকেসে ওগুলো সাজিয়ে রেখেছিলাম। একজন বিদেশী মানুষ কিছু দিলে খেয়ে ফেলতে নেই। ওটা রেখে দিতে হয়। খুব স্মৃতির কাজ করে তখন। স্মৃতির ভিতর ডুবে থাকাও একটা নেশা।

পুলক বুঝেছিল, বুড়ো মানুষটার সঙ্গে কথা বলার লোকের খুব অভাব, সে যে কোন কথাই অতি আরামে অনেকক্ষণ বলে যেতে পারে। তার আশ্চর্য এতটুকু একঘেয়েমী মনে হয় না।

বুড়ো মানুষটা চোখ বুজে কি মনে করার চেষ্টা করল একবার। খুব গভীরে ডুবে যাবার মতো, তারপর দুই চোখ মেলে—প্রায় আর্কিমিডিসের সূত্র আবিষ্কারের মতো বলে উঠল, হ্যাঁ পেরেছি। ওর এই নেশা কেন সেটা মনে করতে পেরেছি।

বুড়ে মানুষটা বলল, দ্বীপে থাকতে থাকতে একটা একঘেয়েমী আসে। আমরা কতদিন এই দ্বীপের একঘেয়েমী থেকে রক্ষা পাবার জন্য উলঙ্গ হয়ে থেকেছি সারাদিন। আমরা জীবনে বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছি নানাভাবে। আমরা দুজনে মাছের ডানা হাতে পায়ে লাগিয়ে সমুদ্রে নেমে যেতাম। আমরা একবার একটা বিরাট হাঙরের পাল্লায় পর্যন্ত পড়ে গেছিলাম। আমাদের দুজনের হাতেই বর্শা ছিল। বিষ মাখানো থাকত। কাছে এলে ঠিক মতো ছুঁড়ে দিলেই বেটা শেষ। এবং এ-ব্যাপারে বিশ্বাস কর ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি সাহসী হয়। ও না থাকলে

সেদিন জল থেকে উঠে আসতে পারতাম না।

বুড়ো মানুষটা দেখল তখন ব্রাউস খুব গা লাগিয়ে বসেছে। শীতের জন্য ব্রাউস মাথার চুল এবং মুখ কমফরটার দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছে। বুড়ো মানুষটার বোধহয় খুব শীত করছিল। সে একটা মাংকি ক্যাপ পকেট থেকে টেনে বের করে মাথায় জড়িয়ে দিল। তারপর বলল, তখন এই দ্বীপের রাজা অথবা রানী বলতে আমরা। ছেলেদের এখানে রাখতাম না। ওরা থাকলে দ্বীপের রাজা রানী সেজে ঘুরে বেড়াতে আমাদের অসুবিধা হত। তারপর পুলকের দিকে তাকিয়ে বলল, বেশ মজা আছে। যেমন একঘেয়েমি আছে তেমনি মজা আছে। যদি কোনদিন পার, একটা দ্বীপে একা একটি মেয়েকে নিয়ে থাকবার চেষ্টা করবে। শুধু ভাল লাগবে না, অনেক অনেক কিছু পাবে, ঠিক্ সভ্য জগতে থাকলে যা তুমি বুঝতে পারবে না।

পুলক ঠিক এর মানে বুঝতে না পেরে বলল, বুড়ো কর্তা আপনি খুব সুখী মানুষ।

—সুখী, হ্যাঁ তা বলতে পার।

—খুব সুখী না হলে—এ-দ্বীপে আপনি একা থাকতে পারতেন না।

—হ্যাঁ তা ঠিক, যা বলছ ঠিক। তবে, সেই যে নেশা, সিমফনি শোনার নেশা। কোন কোনদিন বাতিঘরে কাজ পড়ে গেলে, বিকেলে আমার নামা হত না। কনট্রোলিঙ টাওয়ারে উঠে আসার পথে সে দাঁড়িয়ে থাকত। গ্রীষ্মকাল। খুব রোদ চারপাশে। গাছে গাছে নানা বর্ণের পাখি। আর সমুদ্রের নীল জল। আমার বৌ তখন আদিবাসী মেয়ের মতো একেবারে দ্বীপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। বগলে তার মাছের ডানা। হাতে সবুজ রঙের বর্শা। চুল খোলা। নীল আকাশ আর এমন উদার সমুদ্রে দৃশ্যটা কেমন দেখতে, বুঝতেই পারছ।

পুলক দেখল, ব্রাউসের মুখ ভীষণ লাল হয়ে গেছে। সে পুলকের দিকে তাকাতে পারছে না পর্যন্ত। সে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

ব্রাউস অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, তখন আপনি না নেমে থাকতে পারতেন!

—না। পারতাম না। বলে বুড়ো মানুষটা কেমন চুপ হয়ে গেল।

—তবে! ব্রাউস যেন বলে খুব বোকা বানিয়ে দিয়েছে বুড়ো মানুষটাকে।

—সেই যে বলছিলাম, বলে বুড়ো মানুষটা তার লম্বা সাদা দাড়িতে হাত বোলাল। মাথায় সাদা চুল ঘাড় পর্যন্ত। কি ঘন চুল। ম্যাংকি ক্যাপ পরেছে বলে মাথাটা ঢাকা। ঘাড়ের কাছে কেবল কিছু চুল দেখা যাচ্ছে। বিকেল বলে একটা অন্ধকার ভাব চারপাশে। সূর্য তো এখন আকাশে দেখাই যায় না। কেবল কুয়াশার মতো এক ধরনের ভেজা আবহাওয়া। ওরা লেদার জ্যাকেট পরেছিল বলে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। এবং বুড়ো মানুষটা বেশ যেন নির্ভাবনায় বলে যাচ্ছে। শীতের পরোয়া এতটুকু করছে না।

বুড়ো মানুষটা বলল, তুমি কখনও পুলক সমুদ্রের নিচে মাছের ডানা লাগিয়ে নেমেছ?

—না।

—আবার যখন আসবে এ বন্দরে, ব্রাউসকে নিয়ে জলের ভেতরে নেমে যাবে।

পুলকের মনে হল সত্যি ভারি মজার ব্যাপার। মাছের ডানা লাগিয়ে যেন সে এবং ব্রাউস গভীর জলে নেমে যাচ্ছে ক্রমে। পিঠে অক্সিজেনের সিলেণ্ডার বাঁধা।

গ্রাউসের খালি গা। আর সাদা হাত পা। নীল জলে সেই সাদা হাত পা কেমন রুপোলি মাছের মতো মনে হয়। এবং নীল জলে খেলা, ঘুরে ঘুরে খেলা। দুটো মাছের মতো এই এক খেলা। সে চোখ বুজলে টের পায় গ্রাউস এখন মনে মনে কি যেন ভাবছে। জলের নিচে মাছের ডানা লাগিয়ে পুলকের পাশে পাশে একটা রুপোলি মাছ হয়ে ঘুরতে চাইছে। অথবা গভীর জলে, লাল পাথরের পাহাড়, কত রকমের শামুক, স্টার ফিস, স্পঞ্জ এবং জলজ ঘাস, ঘাসের ভিতর হারিয়ে গিয়ে অথবা পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে গিয়ে পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল থেকে দূরে সরে পুলক নামে এক তরুণ যুবকের সঙ্গে বুঝি মেলামেশা। এবং ঘন হয়ে এলে ওর চোখে আশ্চর্য কামনা বাসনাতে ভরে যায়। পুলক তাড়াতাড়ি কেমন ভয়ে চোখ খুলে বলল, তারপর বুড়ো কর্তা!

—তারপর, কতদিন কতভাবে, কোথা থেকে সেই সিমফনিটা আসে খোঁজার জন্য, আমরা রোজ বিকেলে সমুদ্রের জলে নেমে যেতাম। যেখানে ওটা বাজত, তার পাশে দুটো মাছের মতো ঘুরে বেড়াতাম। কেন এমনটা হয়—জলের নিচে কোন শব্দ হবার যখন কথা না তখন কেন এমন হয়—বলে সে একটু সময় চুপ করে থাকল।

—ক্রমে আমরা দুটো পাহাড়ের ফাঁকে একটা ফাটল আবিষ্কার করে ফেললাম। এবং ভিতরে মনে হল ভীষণ অন্ধকার। খুব ভয় করছিল—আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি—কেবল বেজে যাচ্ছে। যত ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি তত কানের কাছে একেবারে সেই দ্রুততালে শব্দ ওঠানামা করছে। এবং অন্ধকারে পুলক বিশ্বাস কর—একটা পাথরের সাদা দেয়াল আবিষ্কার করে ফেললাম। মনে হয় পাতাল থেকে সেটা বেশ সোজা উঠে এসেছে। বড় বড় গোলাকার জাফরি কাটা যেন হাজার সূর্য সেঁটে আছে দেয়ালে। সেই দেয়ালের জাফরি কাটা ঘুলঘুলি দিয়ে যা দেখলাম—ভাবা যায় না।

গ্রাউস এবং পুলক কথা বলছে না।

গ্রাউস ভেবে পেল না, এতদিন পর এমন একটা রহস্যময় জীবনের কথা পুলকের কাছে কেন বলে যাচ্ছে! এতদিন এই দ্বীপে আছে গ্রাউস, অথবা বোসানের মা-বাবা, তার বাবা কেউ এসব জানত না। একজন বিদেশী মানুষ ওর কাছে সমুদ্রের খবর জানতে চাইলে যেন খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য দেখানো, পুলক তুমি জান না, পৃথিবীর সর্বত্র ঈশ্বর কত সব আশ্চর্য জায়গা গড়ে রেখেছেন। ঈশ্বরের মহিমা দেখার জন্য খুব বেশিদূর যেতে হয় না এমন বলার ইচ্ছা বুঝি। অথবা বলার ইচ্ছা তুমি সারা পৃথিবী ঘুরে ঈশ্বরের যে মহিমাটুকু আবিষ্কার করেছ, আমি এই দ্বীপে তার চেয়ে অনেক বেশি আবিষ্কার করে ফেলেছি।

পুলক কেমন অধীর হয়ে প্রশ্ন করল, কি দেখলেন!

—দেখলাম, ওপাশে সূর্যের আলো সমুদ্রের জলে বেশ তেরচা হয়ে পড়েছে।

—জলের নিচে ডুব দিয়ে কি করে দেখতে পাচ্ছেন এ-সব।

—আমরা যেখানটায় গেছি সেটা দ্বীপের লায়নরকের কাছাকাছি। পাহাড় ওখানে খাড়া। সমুদ্রের চোরা স্রোত সেখানে আছে। এবং বৃত্তাকারে অজস্র পাথরের দেয়াল সেখানে*এবং সূর্যের আলো সমুদ্রের ওপরে, তরে ঠিক আলো বলা যায় না, সবুজ আভায় স্পষ্ট সব মাছেদের খেলা, সেই চোরা স্রোতে ঘুরে ঘুরে দেয়ালের পাশে মনে হয় হাজার ম্যাকরোলের ঝাঁক বৃত্তের মতো ওঠা নামা করে আশ্চর্য এক সিমফনি তৈরী করছে। এমন দৃশ্য—যেটা এখন ঠিক আমি তোমাকে

বোঝাতে পারছি না, অথচ কি আশ্চর্য মহিমা ঈশ্বরের, তিনি তার জন্য কত সব বিচিত্র উপাদান রেখে দিয়েছেন—এমন একটা ঈশ্বরের ঘর আবিষ্কার করার পর ওর রোজ সমুদ্রে নেমে যাবার বাতিক হয়ে গেল।

—রোজ? পুলক বিস্ময় প্রকাশ করল।

—রোজ। আমার রোজ নামা হত না। কাজ থাকত হাতে। এখনকার মতো অত আরামের চাকরি ছিল না। একার ওপর ভার ছিল বলে, ওকে কিছু কাজকর্ম শিখিয়ে নিয়েছিলাম। সে বেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ চালিয়ে যেতে পারত। বড় ভাল মেয়ে।

তারপরই দুম করে বলে দেবার মতো বলে ফেলল, এক বিকেলে ও আর উঠে এল না। আমি সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে ডাকলাম—সামা। শুধু সমুদ্র গর্জন শুনতে পেলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। যখন ডেকেও কোন সাড়া পেলাম না, জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ঠিক একটা মাছ হয়ে দ্বীপের চারপাশে খুঁজে বেড়ালাম। না, কোথাও সে নেই।

বৃদ্ধ এবার একটু দম নিল বলতে।—মেয়েদের যেন কি একটা আছে পুলক। ঠিক চেনা যায় না।

সে ফেব বলল, আমি ওকে সারারাত খুঁজেছিলাম। সারারাত আমি সেই পাথরের দেয়ালে ওকে খুঁজেছি। লাল নীল পাহাড়ের ফাঁকে খুঁজেছি। তখন লায়ন রকে পাখিদের ডিম দেবার সময়। গ্রীষ্মকালে জাহাজ এসে ভিড়ত দ্বীপ-গুলোতে। পাখিদের ডিমের একটা বড় ব্যবসা পেরু সরকারের সঙ্গে তাদের ছিল।

বৃদ্ধ বলল, দ্বীপটা অনেকদূর। দ্বীপের মাথায় বসে এখানকার কনট্রোলিঙ টাওয়ার কত ছোট দেখায়। দূরবীন না হলে মানুষ আছে কি না বোঝা যায় না। অথচ সামা কেন যে সেই সিমফনি শুনতে একা একা রোজ চলে যেত। মাছেরা বড় বেশি চঞ্চল হয় পুলক।

এসব কথার কোন অর্থ ধরতে পারছে না পুলক। তিনি বলে যাচ্ছেন, সে শুনে যাচ্ছে। বুড়ো হলে বলতে বলতে যেমন কথা গুলিয়ে ফেলার স্বভাব মানুষের তেমনি হয়তো কিছু একটা হচ্ছে। সে সেজন্য বাধা দিয়ে বুড়োর মনে কষ্ট দিতে চাইল না।

ব্রাউস অপলক এই দ্বীপের চারপাশটা এখন দেখছে না। ও চেয়ে আছে অনেক দূরে একটা ছোট্ট মোটর বোটের দিকে। সন্ধ্যায় আকাশ পরিষ্কার থাকলে ওরা সাদা জ্যোৎস্নায় মোটর বোটে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

বুড়ো তখনে পাশের লাঠিটা খুঁজছিল। পুলক লাঠিটা এগিয়ে দিলে সে উঠে দাঁড়াল। বাঃ বেশ লোক তো। হাফ বলে চলে যাচ্ছে। সবটা বলছে না। পুলককে কেমন বিরক্ত দেখাল।

বুড়ো মানুষটা তখন বলল, সকাল বেলাতে ওকে বেলাভূমিতে খুঁজে পেয়েছিলাম। ওকে যেন কারা বেশ সুন্দরভাবে শুইয়ে রেখে গেছিল। যখন আমি সমুদ্রের নিচে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তখন কারা তাকে পাহাড়ের নিচে রেখে গেল। মৃত্যুর কোন কষ্ট মুখে ছিল না। সে চোখ বুজে হেসে হেসে এ-দ্বীপ থেকে চলে গেল। কে বা কারা তাকে হত্যা করেছিল জানি না। না এটা নিজের জন্য আত্মহত্যা—বুঝি না। কেবল বুড়ো মানুষটা ফিসফিস গলায় বলল, মেয়েদের তুমি আর যাই কর ওদের বিশ্বাস করো না। অথচ দ্যাখো, বলে বুড়ো মানুষটা

আকাশের দিকে লাঠি তুলে বলে গেল—পৃথিবীতে এই মেয়েটির মুখ এখনও চোখ বুঝলে টের করতে পারি। মনে হয় সে আছে আমারই পাশে। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি। বলি, তুমি সামা সিমফনি শোনার নাম করে কোথায় যেতে। তুমি কি সাঁতরে সাঁতরে অন্য দ্বীপে উঠে যেতে। যেখানে পাখিরা ডিম পেড়ে রেখে যেত, অথবা যে সব হার্মাদ মানুষেরা আসত ডিমের ব্যবসা করতে তাদের তুমি দ্বীপের পাশ দিয়ে কখনও যেতে দেখেছিল—অথবা ওরা, ওরা কি দেখেছিল, এক ভুবন-মোহিনী রূপ বেলাভূমিতে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথবা এক রূপোলি মাছ রোজ রোজ কোথায় যায়। ওরা তোমাকে জলের নিচ থেকে তুলে নিয়ে গেছে!

আবার কখনও বুড়ো মানুষটার আর্তনাদ, তুমি সামা কি আমাকে প্রতারণা করে সেই সিমফনির সুর শোনার নামে অন্য কোন যুবকের প্রলোভনে পড়ে গেছিলে! সে তোমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে দ্বীপে নিয়ে গেল, অনেক হার্মাদ তোমার শরীর থেকে ঈশ্বরের মতো মহিমময় ভালবাসা শুষে নিল। কোনটা! বল! বল সামা!

বুড়ো লোকটা নিচে নেমে যাবার সময় বলল, এ-মৃত্যুর রহস্য আমি এখনও আবিষ্কার করতে পারি নি। তুমি তো নানা দেশে যাও, নানা জনে কথা বল, বলে দেখবে তো কে কি বলে! কেমন কিছুটা পাগলের মতো হাসতে থাকল—এবং সে নেমে যাবার সময় বলল, এই এক আশ্চর্য সিমফনি আছে মানুষের মনে। তার মায়া তুমি আমি কেউ কাটাতে পারি না। বুড়ো হয়ে গেছি, এখনও এক সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াই। মনে হয় একজন কেউ খুব দ্রুততালে, কখনও খুব আস্তে আস্তে আবার কখনও নিরিবিলি এক আশ্চর্য সিমফনির সুর তুলে যাচ্ছে ভুবনময়। তুমি আমি সেখানে পুলক কিছু না। আমাদের ভাললাগা মন্দ লাগা নিরর্থক। তবু আমরা হাঁটি, কেবল হাঁটি, সমুদ্রের পারে পারে; পাহাড়ের ছায়ায় ছায়ায়; গাছের নিচ দিয়ে হেঁটে যাই। পৃথিবীকে যে তখন কত ভালবাসি নিজেও টের পাই না।

ক্রমে বুড়ো মানুষটা নিচে নেমে গেলে পুলক কি কারণে যে বুঝে ফেলেছিল, সে কিছু করতে পারে না ব্রাউসের জন্য। সে শুধু ব্রাউসকে সঙ্গ দিতে পারে। মানুষটার কথা শুনে মনে হল, পৃথিবীর কোথাও, অথবা কোন গ্রহলোকে ব্রাউসের জন্য কেউ সব কিছু ঠিক ঠাক করে রেখে গেছেন সেখানে সে তো সাধারণ একজন জাহাজী। তার কি আর করার আছে। সে খুব নীরবে ব্রাউসের পাশে হাটতে হাঁটতে বলল, আমি আবার এলে তোমাকে নিয়ে সমুদ্রের নিচে নেমে যাব। কোথায় সেই ফিফথ সিমফনিটা বাজানো হচ্ছে দেখে আসব।

## পনের

ইমাদুল্লা বিকেল থেকেই জাহাজ ডেকে দাঁড়িয়েছিল! বিকেল বলতে এখানে কিছু নেই। সারাটা দিনই আকাশ ঘোলাটে, সারাটা দিনই কেবল রিনরিন করে কাচের গুঁড়ো ঝরে পড়ছে মতো। দাঁড়িয়ে থাকলে কিছুক্ষণের ভিতরই পোশাক সাদা হয়ে যায়। সেটা ঝেড়ে না ফেললে, শরীর ভারি হয়ে যাবে। সে দাঁড়িয়েছিল। আজই পুলকের আসার কথা। এবং সকালেই আসবে বলে কথা ছিল। আবহাওয়া খারাপ বলে হয়তো আসে নি। কিন্তু আজ না এলে সারেঙসাব এই নিয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। মেজমিস্ত্রির কাছে নালিশ যাবে—এবং জাহাজে ডিসিপ্লিন

বলতে একটা ব্যাপার আছে। সে সকাল থেকেই খুব উদ্‌বিগ্ন ছিল।

রোববার হলে জাহাজে কোন কাজ থাকে না। জাহাজটা কয়লার জাহাজ বলে একটা বয়লার চালু রাখতে হয়েছে। এবং দুজন মাত্র আগয়ালার ওয়াচ। আর সবাই ফোকশালে শুয়ে বসে বেশ কাটিয়ে দিচ্ছে। যা হয় জাহাজে, ছুটির দিনে ফোকশালে কেউ প্রায় থাকতেই চায় না। বিকেল হলেই কিনারায়। কিন্তু আজ কেউ বের হচ্ছে না। বাঙালীর হাড়ে এমন কনকনে শীত ভীষণ লাগছে। যার যত গরম পোশাক আছে সবাই সব বের করে ফেলেছে। পোর্টহোলের কাচ খুলে কেউ আর উঁকি দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে না।

ইমাদুল্লা দেখল কালো কোটের ওপর বেশ গুঁড়িগুঁড়ি বরফের গুঁড়ো উড়ে বেড়াচ্ছে। সে সব ঝেড়ে ফেলল না। সে এবার গ্যাঙওয়ের দিকে হাঁটতে থাকল। শীত এবং প্রচন্ড ঠান্ডা বলে জাহাজের কাজকর্ম যেন তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে গেছে। যারা জেটিতে ছিল, তাদের এক একজন হেঁটে হেঁটে শহরের দিকে উঠে যাচ্ছে। কেবল পিকাকোরাতে যাবার যে পথটা তার মোড়ে একটা বড় পাব আছে সেখানে কিছু মানুষের ভিড়। এবং সি-ম্যান মিশনেও কিছু ভিড় থাকতে পারে। পাবে লোকেরা লাইন দিয়ে বিয়ার খাচ্ছে। সি-ম্যান মিশনে জাহাজীরা চলে গেছে। এই শীতের বিকেলে বসে থাকলে হাত-পা যেন আরও অসাড় হয়ে যায়। এই শীতের বিকেলে কঠিন এক পীড়া মানুষের মনে বিশেষ করে এইসব জাহাজীদের মনে উঁকি দিলে স্থির থাকা যায় না। সারেঙসাব অনেকক্ষণ থেকে দেখছে, ইমাদুল্লা ডেকে বেশ সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। এই বয়সে কিনারায় নেমে যাবার সখ! শীতের বিকেলে ইমাদুল্লা আর দশটা কম বয়সের নাবিকের মতো হয়ে যাচ্ছে।

সারেঙসাব গ্যালিতে এসে এটা লক্ষ্য করেছিলেন। ভান্ডারি মাংস বসিয়েছে। বেশ একটা ভাজা মাংসের গন্ধ। জেটিতে ক্রেনগুলো কেমন নিরিবিলি দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে সমুদ্র। সমুদ্রে এতটুকু ঢেউ নেই। সব কেমন শান্ত এবং সীমাহীন নিস্তব্ধতা।

সারেঙসাব ডেকে নেমে গেলেন। ইমাদুল্লার পেছনে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, টিন্ডাল।

—কী সাব। কারণ ইমাদুল্লা না দেখেও বলতে পারছে কে এসে ওকে ডাকছে।

—এই ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে! কিনারায় যাবে ভাবছ।

—ও না এলে একবার নেমে দেখে আসতে হয়।

—ওর আসার কথা আছে!

—আজই আসবে কথা আছে। টিন্ডাল যেমন রহস্যের গলায় কথা বলে থাকে এখনও তেমন বলতে গিয়ে বুঝতে পারল, সে গলায় তেমন রহস্য ধরে রাখতে পারছে না। সে বলল, ভাল লাগছে না। খুব চিন্তায় আছি।

—তুমি ওকে জাহাজে নিয়ে এলে, কিন্তু কথা উঠবে।

—কেন কথা উঠবে!

—উঠবে না! বলে সারেঙ ইমাদুল্লার পাশে গিয়ে রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়াল।

টিন্ডাল এখন কেন জানি, না বলে পারল না, অর্থাৎ খোলাখুলি না বললে যেন ঠিক বলা হবে না। সে বলল, সারেঙসাব আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি পুলকের জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

—তোমার ভারি স্বভাব খারাপ টিন্ডাল।

—তা খারাপ। এটা আমাদের হয়।

—তুমি টিণ্ডাল একা মানুষ। তোমার তো এমন হওয়ার কথা না।

—আমারও তাই মনে হত।

—তুমি কতকাল থেকে সমুদ্রে সফর করে বেড়াচ্ছ। তুমি তো জানো জাহাজের দিনগুলি মুসাফিরের মতো অনেকটা।

—এতদিন তাই ভেবেছিলাম।

—জাহাজ ছেড়ে দিলেই কেউ কারো কথা আর মনে রাখে না।

—তাই মনে হত।

—তুমি কোথাকার একটা বাচ্চা ছোকরার জন্য এমন করছ!

সাব, আপনি কি ভেবেছেন আমি জানি না। তবে ছেলেটার জন্য আমার ভারি কষ্ট হয়।

সারেঙসাব এখন কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। তিনি জানেন জাহাজে অনেক রকমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু ইমাদুল্লার স্বভাব উল্টো। সে ছেলে-টাকে কেমন নিজের সন্তানের মতো ভেবে ফেলে কষ্ট পাচ্ছে। তিনি বললেন, ইমাদুল্লা আমি ভুল বুঝেছিলাম।

ইমাদুল্লার মনে হল কথাগুলি এই ঠাণ্ডার দিনে খুব বেমানান। এই জাহাজে, আর দীর্ঘ সফর পরেও জাহাজ কোথায় যাবে যখন জানা নেই—এবং এমন একটা তুষারপাতের সময় খুব বেমানান এ সব ভালো ভালো কথা। সে বলল, আমি ওর বাপ নই সারেঙসাব। এলে ভেবেছি—ওর আগাপাশতলা চাবকাব।

ইমাদুল্লার কথায় সায় দিয়ে সারেঙসাব বললেন, আজ না এলে মেজমিস্ত্রিকে যে কি বলি! কাপ্তানের কানে উঠলেই বা কি হবে!

সারেঙসাবের দিকে মুখ ফিরিয়ে ইমাদুল্লা বলল, আমার মনে হয় কোন কারণে আটকে গেছে।

—এখন তো কোন তুষার ঝড় নেই। সারাটা দিন তবু বলব বেশ আবহাওয়া ভাল ছিল। এমন তুষার ঝড় তো এখানে লেগেই থাকে।

—এমনও হতে পারে সে আর আসবে না সারেঙসাব।

—তবে তো একটা কেলেংকারি হবে। থানা পুলিশ হবে।

—সে তো আপনার ভাবনার কথা না। ইমাদুল্লা কেমন আবার পুলকের পক্ষে টেনে কথা বলতে থাকল।

সারেঙসাব আর কথা না বলে চলে যাচ্ছিলেন। বেশ রুষ্ট হয়েছেন মনে হচ্ছে। এবার একটু তোষামদের মতো করে বলা যেন, সারেঙসাব আর একটা দিন, না এলে আমি নিজেই ওকে নিয়ে আসব। আপনি জাহাজীদের জন্য কত না করে থাকেন, এটা তো সামান্য কাজ।

কেমন ভিজে গেলেন সারেঙসাব। তিনি বললেন, তুমি আর ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকো না। ভিতরে চলে এস।

—একটু কিনারায় নেমে খোঁজ নিয়ে আসব। ব্রাউসের দিদিমা যদি ফিরে আসে।

—তাঁর তো আসার কথা না এখন।

—কাল রেমরেলা বলল, আসার কথা আছে। বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে কথা হচ্ছে। কিছু দলিল দস্তাবেজের খোঁজে এখানে কিছুদিন ফের এই শীতের দিনেও তিনি থেকে যাবেন।

—বাড়িটা বিক্রি করে দিলে বছরে একবার দুবার যে ভারতীয়দের খাওয়াবার একটা আয়োজন করেন, সেটা কোথায় করবেন।

—বন্দরের কাছেই একটা বাড়ি কেনার কথা হচ্ছে ওঁদের। ওঁর বয়স হয়ে যাচ্ছে। এতদূর থেকে আসা ওঁর পক্ষে খুব কষ্টকর। এই বন্দরের কাছে কোথাও থাকতে চান এখন।

সুতরাং সারেঙসাব উঠে গেলেন। তিনি একটা নীল রঙের টুপি পরেছিলেন। গলায় কমফরটায়। গায়ে সাদা মোটা সোয়েটার, নিচে ফ্লানেলের জামা। তার নিচে মনে হয় হাতকাটা সোয়েটার দুটো গরম গেঞ্জি। ওকে এই পোশাকে খুব বেঢপ দেখাচ্ছিল।

সারেঙসাব উঠে গেলে ইমাদুল্লা গ্যাঙওয়েতে নেমে কেমন অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকল। ওর কেমন ভয় লাগছে। পুলক যদি এখানে পালিয়ে থেকে যায় তবে জাহাজে ওর নিঃসঙ্গতা ভীষণ বাড়বে। এবং এটা যে কেন হয়, সে তো এমন ছিল না!

বরং যা সে ভেবে পায় না, এই সফরের প্রথম দিনগুলোতে পুলকই ছিল এক-ঘরে মতো। অথচ জাহাজ যত সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছিল, যত বছরের পর বছর অতিক্রম করে যাচ্ছিল—এই পুলক এক অসাধারণ আকর্ষণ তৈরি করে সবাইকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছে। এই সফরে আরও চার পাঁচজন বাঙালী হিন্দু নাবিক সে কাছে পেয়েছে। ওদের সঙ্গে আর দশটা সাধারণ নাবিকের সে কোন তফাত খুঁজে পায় নি।

কিন্তু একবার মনে আছে, পুলক সেটা বোধ হয় কার্ডিফ বন্দরে হবে—ঠিক এমনি শীত, এবং জাহাজীদের যা অভ্যাস, যেন নিদারুণ অভাবী মানুষ, শীতের ভিতরও সামান্য সুতির জামাকাপড় পরে শহরের রাস্তায় চলাফেরা। এবং এটা যেন ওদের স্বভাব—উপরি পাওনা হিসাবে ফাউ পেয়ে যাবে—এমনি একটা ফাউ পাবার লোভে ওদের জাহাজী মকবুল শীতের রাস্তায় হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে যাচ্ছিল—কি শীত! কি ঠান্ডা—! অনেকটা আরো বেশি দেখনোর মতো করে যাওয়া, যদি কোন ধার্মিক মহিলা দয়া করে গায়ের ওপর কোট ছুঁড়ে দেয়। এই দয়া পাবার লোভে যখন মকবুল যাচ্ছিল এবং পুলক ফিরছিল ইমাদুল্লার সঙ্গে তখন রাস্তায় মোড়ে ঘটনাটা ঘটে গেল। মেমসাব একটা ওভারকোট ছুঁড়ে দিয়ে গেলে একেবারে লুফে নিল মকবুল।

আর তখন পুলকের চিৎকার, সে হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়েছে ওভারকোটটা—সে হঠাৎ ছুটে যাচ্ছে, মকবুল অবাক, ওর দানের ওভারকোটটা এমন করে বাঙালীবাবু ছিনিয়ে নিয়ে ছুটল কেন! ইমাদুল্লাও ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। সেও পুলকের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। ওর তো পাগলামি স্বভাব। ইমাদুল্লা কাছে গেলে দেখল, একজন যুবতী মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে সে ইংরেজীতে কি বলে যাচ্ছে। এবং ইমাদুল্লা এমন মুখ চোখ কখনও পুলকের দেখে নি। পুলককে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

ইমাদুল্লা বলল, ওকে তুই ওভারকোটটা ফেরত দিলি!

—দিলাম! ও হারামজাদা কোথায়।

—মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—চলুন। বলে টানতে টানতে সে ইমাদুল্লাকে নিয়ে গেল। ওর সামনে গিয়ে

ওর কলার চেপে ধরল। তারপর টানতে টানতে একটা ট্যাক্সির ভিতর। এবং সোজা জাহাজঘাটায়। একটা কথাও পুলক ট্যাক্সিতে বলে নি। ইমাদুল্লা পর্যন্ত ঘাবড়ে গেছিল।

জাহাজে উঠে সকলকে সে জড় করেছে। তারপর ডেক সারেঙ, এনজিন সারেঙকে ডেকে বলেছে—আপনারা ভেবেছেন কি। আমাদের কোন ইজ্জত নেই!

মকবুল বলেছে, ওরা দিলে আমি কি করব!

—তোর পেটি খোল দেখি। পুলক হুঙ্কার দিয়ে উঠেছে।

পেটিতে অনেক গরম জামা। সবই সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট থেকে কেনা। সে একটাও ব্যবহার করছে না। এবং কলকাতায় ফিরে গিয়ে সব বিক্রি করার তালে ছিল।

এই হচ্ছে পুলক! আবার সে দেখেছে পুলককে—কোথাও গেলেই সে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। চুপচাপ থাকে। কথা বলে না। নিজের বাংকে বসে কবিতা লেখে। একদিন কি একটা কাজে সে পুলকের সঙ্গে বচসা পর্যন্ত করে ফেলেছিল। সে বলেছিল, বাঙালীবাবু, তুমি এটা বুঝবে না।

আর কি রাগ পুলকের। বাঙালীবাবু মানে। আপনারা কি। আপনারা বাঙালী নন! তারপর কেন জানি ইমাদুল্লার মনে হয়েছে সে বাঙালী, অথচ নিজেকে সে এটা ভাবতে পারছে না। কোথাও একটা কষ্ট হচ্ছে। ওর দেশে তো বাংলা ভাষার জন্য কারা প্রাণ পর্যন্ত দিল। সেই থেকে ছেলেটা ওর কাছে কেন জানি আপনার মনে হতে থাকল। যেন চোখে আঙুল দিয়ে সে কিছু সব সময় সবাইকে দেখিয়ে দিচ্ছে। সে সেই থেকে ছেলেটাকে সন্তানের মতো বোধ হয় ভালবাসতে শুরু করেছিল।

ওর হুঁস হল সে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এসেছে। ইচ্ছা করলে এখন থেকে বাসে ব্রাউসের দিদিমার কাছে ঘুরে আসা যায়। সে ঘড়ি দেখল। সে এখন গেলে রাত নটার ভিতর ফিরতে পারবে।

একটা বাসের জন্য সে অপেক্ষা করার চেয়ে ভাবল একটা রিঙ করবে কিনা। অনেকদিন কোন খোঁজখবরও নেওয়া হয় নি। সে পাশে একটা টেলিফোন বক্সের ভিতর ঢুকে বলল, হ্যালো হ্যালো।

ওপর থেকে যে কথা বলছে সে ব্রাউসের দিদিমা। বুঝতে কষ্ট হল না। সে বলল, আমি ইমাদুল্লা বলছি।

—তোমরা আর আসছ না কেন?

—আপনি তো দেশের বাড়িতে গেছিলেন।

—আবার চলে এসেছি। ক'দিন থাকব।

—খবর আগেই পেয়েছি, আপনি একটা কাজে আবার ফিরে এসেছেন। সে, বাড়ি বিক্রি করার কথাটা বলল না।

—তা একটু কাজ পড়ে গেল। তুমি কাল পুলককে নিয়ে চলে এস।

—সে তো জাহাজে নেই। ব্রাউসের কাছে গেছে।

—সে তো আজই বিকেলে ফিরে এসেছে। ব্রাউসের বাবা আমাকে রিঙ করে কিছুক্ষণ আগে জানালে।

—সে ফিরে এসেছে!

—কেন তুমি জান না!

—আমি জাহাজ থেকে সন্ধ্যার আগে নেমে গেছি।

—সন্ধ্যার পরে হয়তো সে জাহাজে উঠে গেছে।

ইমাদুল্লা ফিরে এসে দেখল, পুলক তার লকার থেকে কি সব টেনে বের করছে। ইমাদুল্লা খুব সন্তর্পণে এসে দাঁড়িয়েছিল বলে সে টের পায় নি। সে তার সব বইপত্র বের করে ফেলেছে, এবং বইগুলোর পাতা উল্টে উল্টে দেখছে। একটা দেখা হয়ে গেলেই পাশে রেখে আবার আর একটা দেখছে। এমনি দেখতে দেখতে সে খেয়ালই করছে না ইমাদুল্লা ওর পেছনে প্রায় দশ বারো মিনিটের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পাশের বাংকে যে ছিল, অর্থাৎ নবীন সে কিছু বলতে গেলে ইমাদুল্লা ঠোঁটে আঙুল রেখে কিছু বলতে বারণ করল।

এবং শেষে ইমাদুল্লা দেখল, পুলকের হাতে একটা ছবি। ছবিটা পুলক বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। ছবিটা ওর আরও কম বয়সের। মনে হয় সে তখন স্কুলে পড়ত। স্কুলে পুরস্কার-টুরস্কার হাতে নিয়ে ছবিটা। বেশ তাজা এবং সপ্রতিভ। ছবিটাতে পুলক ধুতি পরে আছে। এবং মাঝখানে তখন তার সিঁথি ছিল। একেবারে নিরীহ বাঙালী ছাত্রদের যেমন মুখ হয় তেমনি। পুলক ছবিটার একপাশে ধরে ধীরে ধীরে রুমালে মুছে আলোতে দেখতেই মনে হল কেউ ওর পিছনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, চাচা তুমি।

ইমাদুল্লা বলল, ছবি দিয়ে কি হবে?

পুলক কেমন লজ্জায় পড়ে গেল। এই এমনি।

ইমাদুল্লা বলল, এত রাত হল কেন!

—ব্রাউস এসেছিল সংগে।

ইমাদুল্লা বুঝতে পারল, যতক্ষণ এক সংগে থাকা যায়।—ব্রাউস আজই চলে যাবে।

—আজ বোধ হয় থাকবে। কাল সকালে চলে যাবে।

—ও আছে কেমন?

—ভাল।

—ওর বাবা?

—ভাল আছেন।

—ব্রাউসকে জাহাজে নিয়ে এলি না কেন। দেখতাম।

—ওর দেরি হয়ে যাবে।

—আমার কথা কিছু বলে?

—খুব।

—কেমন কাটল?

—খুব ভাল। তোমার মতো একটা মানুষ ঐ দ্বীপে থাকে। তোমাকে নিয়ে আমি বরফ পড়লেই চলে যাব চাচা।

এই ছেলেটা ব্রাউসের মায়ায় জড়িয়ে গেল। খুব কষ্ট পাবে! ওর মুখ দেখলেই ইমাদুল্লা টের পায়, ভিতরে এক আশ্চর্য ভালবাসার সুষমা নিয়ে ছেলেটা আজ হোক কাল হোক বন্দর ছেড়ে চলে যাবে। আবার সে সেই যেমন গাছের কাণ্ডে, পাথরের গায়ে এবং জেটির দেয়ালে অথবা দূরগামী জাহাজের খোলে লিখে যেত—নন্দিনী একটি মেয়ের নাম, ভালবাসার নাম, তেমনি সে লিখে যাবে ব্রাউস একটি ভারি সুন্দর মেয়ে।

সে মরে যাবে কথা ছিল, সে এক দীর্ঘ বালুবেলায় হেঁটে যেতে ভয় পেত, এবং মরে গেলে থাকে কি এবং আশ্চর্য বিষণ্নতা মেয়ের—সে আরও লিখে যাবে ব্রাউস ভারি সুন্দর নাম। তার কাছে আমার আবার ফেরার কথা আছে।

ইমাদুল্লা বলল, খেয়ে এসেছিস তো! না হলে ভাণ্ডারিকে বলে দিচ্ছি তের মিল দিতে।

পুলক বলল, আমরা সবাই একটা রেস্তোরাঁতে খেয়ে নিয়েছি। খিদে নেই। তুমি খেয়ে নাও চাচা।

ইমাদুল্লা ধীরে ধীরে সিঁড়ি ধরে উঠে গেলে পুলক ভাবল, সে আরও একজনের নাম এই সব পাহাড়ে অথবা নদীর পারে যে সব গাছপালা বৃক্ষ আছে সেখানে লিখে রাখবে। আমার প্রিয় চাচা ইমাদুল্লা একটি আশ্চর্য মানুষের নাম।

## ষোল

রোববারে পুলক জাহাজে থাকত না। সকাল হলেই বের হয়ে পড়ত। সে ছুটি নিয়ে চলে যেত।

কাপ্তান পর্যন্ত সব শুনে কেমন ওর ওপর সদাশয় মানুষের মতো ব্যবহার করতে থাকলেন। অন্য নাবিকদের মতো ওর ওপর কড়াকড়ি থাকল না। জাহাজ যাবার কথা ব্রাজিলে। সেখানে ভিক্টরিয়া পোর্ট বলে একটা ছোট বন্দর আছে। সেখান থেকে আকরিক লোহা নিয়ে সোজা জাপানে। অথচ কেন যে দেরি হচ্ছে। এজেন্ট অফিসের অন্য কিছু ইচ্ছা থাকতে পারে। আবার শোনা গেল একটা জাহাজ আসছে ক্যারেবিয়ান দ্বীপগুলো হয়ে। যারা সেই জাহাজের জাহাজী তাদের সঙ্গে এদের বদলা বদলি হবে। কারণ দীর্ঘদিন হয়েছে, এরা সফরে বের হয়েছে। এতদিন একসঙ্গে রাখা যায় না। দেশে পেঁছে দেওয়ার একটা ব্যাপার আছে। যে কোন কারণেই হোক এজেন্ট অফিস কিছু স্থির করতে পারছে না। জাহাজে কিছু মাল ওঠার কথা। কি মাল এখন বোঝাই হবে, ব্রাজিলে গেলে এক মাল, জাহাজ দেশে গেলে অন্য মাল—সুতরাং নানা কারণে সমুদ্রে বরফ জমে যাওয়ার সময় হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

জাহাজে এখন নাবিকেরা শীতে বসে বসে শুধু কাঁপছে। গ্যাসের উত্তাপে আর ফোকশাল গরমে রাখা যাচ্ছে না। যেখানে হাত দেওয়া যাচ্ছে ভীষণ ঠাণ্ডা। ফলে ওরা ঘর ছেড়ে গ্যালিতে এসে ভিড় করত। গ্যালির উনুনে গনগনে আঁচে ভেড়ার মাংস সেদ্ধ হচ্ছে। বেশ একটা গন্ধ থাকলে ওরা নাক টেনে টেনে কথা বলত। অর্থাৎ ওরা কথাও বলত, মাংসের ঘ্রাণও নিত।

তখন পুলক দ্বীপের সব পাথরে অথবা পাহাড়ের বুকে বরফ পড়া দেখত। তুষার ঝড়ের ভিতর সে ছুটোছুটি করত—কি যেন এক পাখি মিলে গেছে, ভালবাসার পাখি, সে তাকে এ-বন্দরে এসে ভালবেসে ফেলেছে।

সমুদ্রের জল যত বরফ হয়ে যাচ্ছে তত তার দ্বীপে ঘোরাঘুরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্কীপ নিয়ে আর কোথাও বের হতে পারছে না। সে জাহাজ থেকে একেবারেই এখন বের হতে পারছে না। ওর চোখে আবার বিষণ্নতা। কবে কি-ভাবে যে আবার সে যাবে। চারপাশের সমুদ্র এখন আর নীল নয়। একেবারে সাদা মসৃণ চাদরের মতো লম্বা সীমাহীন আকাশের দিকে চলে গেছে। সে বোট থেকে উঠে দেখার

চেষ্টা করল কতদূর পর্যন্ত বরফ পড়েছে। কিন্তু সে কিছু বুঝতে পারছে না বলে মাস্তুলের ডগায় উঠে দূরবীন দিয়ে দেখল, বেশ ধীরে ধীরে সমুদ্র ক্রমে বরফে জমে যাচ্ছে। সে ভাবল, কাল খুব সকালে উঠে সাইকেল যোগাড় করবে। এবং বরফের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে দেখে আসবে কতটা আর ফারাক আছে লাইট-হাউসের সঙ্গে।

এবং এ-ভাবে সে এক সকালে সবার অলক্ষ্যে একটা সাইকেল নিয়ে বের হয়ে গেল। খুব সকালে ছুটির দিন বলে কিনারার কিছু মানুষজনকে পর্যন্ত সে দেখল বের হয়ে পড়েছে বরফের ওপর। ওরা মাছ ধরার জন্য যাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় গর্ত। ভিতরে নীল জল। জলে সমুদ্রের সেই ছোট ছোট মাছ শ্বাস ফেলতে আসে। এবং এমন একটা ছোট্ট গর্ত অথবা কুয়োর মতো পেয়ে গেলে বেশ মজা। যতখুশী বঁড়শি ফেলে মাছ ধরো। এবই এ-ভাবে অনেক সব গর্ত আছে বরফের ভিতর যেখানে সমুদ্রের জল আপন মনে খেলা করে বেড়াচ্ছে। এবং যা দেখলে মনে হবে, এটা কোন দ্বীপের ওপর দিয়ে যাওয়া নয়, অথবা উপত্যকার উপর দিয়ে—এটা যাওয়া হচ্ছে, সমুদ্রের ওপর দিয়ে। এই ছোট ছোট গর্ত দেখলেই আরোহীকে একটু সাবধানে সাইকেল চালাবার কথা কেউ যেন বলে দেয়। কোথাও জল জমে নি এখনও। পাতলা সরের মতো কাচের ছাদ গড়ে উঠছে। এমন একটা জায়গায় পড়ে গেলেই শেষ।

পুলকের কথা ছিল ইমাদুল্লাকে নিয়ে আসবে। কিন্তু এখন তো শুধু আবিষ্কারের পালা। সে রাস্তাটা খুঁজতে বের হয়েছে। ইমাদুল্লা বুড়ো মানুষ। এমন কঠিন শীত সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। সে পরে নিয়েছে কালো রঙের পোশাক। সাদা বরফের ওপর সে ক্রমে বিন্দুর মতো হয়ে যাচ্ছে। এমন সাদা হয়ে যায় একটা দেশ তার জানা ছিল না। আর সে রাতে উঠেও দেখেছে একটা আলো থাকে দিগন্তরেখায়। এবং খুব একটা অন্ধকার কিছুতেই মনে হয় না, দিনের বেলায় সে যদি কখনও সূর্যোদয় দেখে, মনে হবে, এটা একটা সৌভাগ্যের মতো। বরফের ওপর সূর্যোদয়ের ছটা সে পৃথিবীর কোন বন্দরে গিয়ে দেখতে পায় নি।

পুলক এসব জায়গার নাম তেমন ভাল জানে না। দূরে সেই ডিভাইন লেডির দ্বীপ, অথবা যে দ্বীপে ওদের মাস্তুল থেকে পাখিটা উড়ে গেছে সেই দ্বীপ। আরও বাঁদিকে লাইট-হাউস। সে বুঝতে পারল বেশ কাছে চলে এসেছে। এবং কিছুটা গিয়েই দেখল আর যাওয়া যাবে না। পাতলা সরের মতো এদিকটা। পা রাখলে ঝুরঝুর করে ভেঙে যাবে, বরফের রঙ দেখলে এ-সব টের পাওয়া যায়। বরফ সাদা থাকে না। কেমন নীল জলের আভা ভেতর থেকে ফুটে বের হতে থাকে। সে এখানে এসেই কেমন হতাশ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ সে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। চারপাশে এক ভয়ংকর নিস্তব্ধতা। সে এখানে বসে যেন দূরের লাইট-হাউসে গ্রাউস কি করছে সব টের পাচ্ছে। ওর ব্যাগে সামান্য রুটি মাংস ছিল। সে সাইকেলের ক্যারিয়ার থেকে সেটা নিয়ে অন্যমনস্কভাবে খেতে থাকল। এই শীতের দেশে ভীষণ খিদে পায়। গতকালের রুটি মাংস লকারে রেখে দিয়েছিল। একটা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। ওর চুল উড়ছিল। আকাশ আজ পরিচ্ছন্ন। রোদ উঠতে পারে। রোদে এতটুকু উত্তাপ নেই এবং রোদ উঠলে যেন শীতটা বাড়ে।

এই ভয়ংকর নিস্তব্ধতার ভিতর শুধু থেকে থেকে বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ।

এবং এটুকু না থাকলে বুঝি পুলক ভয় পেত। জলে সামান্য ঢেউ। ঢেউ গর্জন করলেও এক অসাধারণ নিস্তব্ধতা টের পাওয়া যায়। দূরে দূরে সব দ্বীপ। এবং দ্বীপগুলো সব সাদা। এমন কি সে দূরবীন চোখে লাগালে দেখল দ্বীপের ডিভাইন লেডি সাদা পোশাকে বেশ মনোরম সেজে বসে আছে।

এবং এ-ভাবে এই শীতের দেশের মতো অথবা বরফের ওপর যে পবিত্রতা জেগে আছে তার মতো সে মেয়েদের ভেবে থাকে। ব্রাউসকে সে এ-ভাবে ভেবে থাকে। নন্দিনীকে এ-ভাবে ভেবে এসেছে। পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য মেয়েরা বয়ে বেড়ায়। সে বলল, হে উত্তরে-হাওয়া তুমি এবার একেবারে থেমে যেতে পার না। তুমি থেমে গেলেই বরফ আরও কঠিন হবে। সামনের জল নীল থাকবে না। আমি আর ইমাদুল্লা চাচা সাইকেল চালিয়ে সে দ্বীপটায় অনায়াসে চলে যাব।

আর একটু সামনে পা টিপে টিপে হেঁটে যাওয়া যায় কিনা সে এবার দেখবে। যেন শেষ পর্যন্ত না দেখে গেলে সে শান্তি পাবে না। এক পা হেঁটেই কতটা বরফ জমেছে জুতোর টো দিয়ে খুঁটে খুঁটে দেখার তার স্বভাব। সে বরফের অবস্থা দেখে সাহস পায় না। মুখে এত ঠান্ডা লাগছে যে মনে হচ্ছে সব অবশ হয়ে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারল, এই বরফের ওপর সে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। ওকে ভীষণভাবে ছুটে ছুটে চলাফেরা করা দরকার। নয় তো বাঙালীবাবুর রক্ত মাংস একেবারে জমে নিমেষে বরফ হয়ে যাবে।

সে এবার বরফের ওপর খেলা করে বেড়াতে থাকল। যেমন একজন সার্কাসে সাইকেল খেলোয়াড় ঘুরে ঘুরে খেলা দেখায়, সে তেমনি এমন একটা নির্জন জায়গায় সাদা বরফের ওপর কালো পোশাক পরে বৃত্তের মতো ঘুরে ঘুরে খেলা দেখাতে থাকল। বেশ শরীর গরম হয়ে যাচ্ছে। বেশ এক নীল আকাশের নিচে সাদা বরফের ওপর এবং অপরিচিত এক জায়গায় তার খেলা দেখতে ভাল লাগছে। এসব দেশের সে উদ্ভিদের নাম জানে না, ফুলের নাম জানে না, সবই প্রায় অপরিচিত, অথচ তার কেন যে সব এত আপনার মনে হচ্ছে। পরিচিত মনে হচ্ছে। যেন সে কতকাল আগে এমন বরফের দেশে চলে এসেছিল. এ-ভাবে সে এই বরফের ওপর সাইকেল চালিয়ে যেত, এবং সঙ্গে থাকত একটা সাদা ব্যাগ, ব্যাগের ভিতর ফল রমুল এবং আহারের জন্য যাবতীয় সামগ্রী। সে এভাবে এমন একটা দেশে, চারপাশে যখন শুধু পাইনের জঙ্গল, অথবা কোরিপাইনের গাছ তখন ক্রিং-ক্রিং ঘণ্টা বাজিয়ে ছোট লাল-নীল কাঠের ঘর সরু রাস্তা ধরে পার হয়ে যেত, রাস্তার দুপাশে সব নেড়া উইলো গাছের ঝোপ, এবং বেশ কায়দা করে সে ঘুরে ঘুরে সাইকেল চালিয়ে যেত, যেন গাছের ডালে শরীর লেগে গেলে বৃষ্টির মতো টুপটাপ বরফের কণা শরীরে না ঝরে পড়ে। সে যেত এ-ভাবে, যেতে যেতে বুঝি তার একটা বড় উপত্যকা মিলে যেত। সে দেখতে পেত আশ্চর্য সাদা গোল গম্বুজের মতো বরফের ঘরে ব্রাউস দাঁড়িয়ে আছে। সে পরে আছে সাদা সাটিনের ফ্রক। সাদা ফারের কোট। নীল রঙের জুতো। একটা সাদা হরিণ ওর পায়ের কাছে শুয়ে আছে। একটা শ্লেজ গাড়ি আছে। যেন সে গেলেই সাইকেলটা ইগলুতে ঢুকিয়ে এই সাদা হরিণের গলায় শ্লেজগাড়ি জুড়ে ব্রাউস পুলককে নিয়ে এক নীল উপত্যকার সন্ধানে চলে যাবে। যেখানে বরফ কত প্রাচীন কাল থেকে শুধু জমছেই। যেখানে বরফ গলে না—প্রাচীন লতা-গুল্মে মিলে এক অতীব সমারোহ। সেখানে ব্রাউসের ফারের কোট, পালকের টুপি এবং তার সুন্দর মীনা করা গম্বুজে হাতের স্পর্শ—ব্রাউস নিশ্চয়ই

তখন চোখ বুজে ফেলবে। এমন কঠিন ঠাণ্ডায় এর চেয়ে মনোরম কিছু থাকবে না। সাদা বলগা হরিণটা পর্যন্ত তখন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে।

ব্রাউস হরিণটা দেখতে দেখতে বলবে, আমার ভীষণ লজ্জা করছে।

পুলক যেন বলছে—এমন সুন্দর পৃথিবীতে আমাদের আর কি সম্বল আছে।

তারপর সেই এক খেলা, ঘুরে ঘুরে খেলা, এবং গম্বুজে হাতের স্পর্শ, এই স্পর্শ রক্তে নানা বর্ণের ছবি এঁকে রাখে। তারপর কেবল খেলা, আবর্তের মতো শরীরের ভিতর রক্ত কণিকারা নীল নক্ষত্রের মতো ছুটোছুটি করে দিলে প্রাণের ভিতর সেই আশ্চর্য মহিমা টের পাওয়া যায়। পুলক ঘুরে ঘুরে প্রাণের ভিতর সেই আশ্চর্য মহিমা টের পাচ্ছে। এবং সে জাহাজের দিকে এবার ফিরে যাবে ভাবতেই দেখল, তার পুরানো বন্ধু সেই শীতের পাখিটা ঠিক ওর মতো মাথার ওপর গ্লাইড করে একবার উঠে যাচ্ছে, আবার নেমে যাচ্ছে। বরফের ওপর পাখিটার প্রতিবিম্ব ভীষণ-ভাবে অলৌকিক মায়াজাল সৃষ্টি করছে।

তার মনে হল ফিরে যেতে যেতে, ব্রাউসের সঙ্গে এই তার প্রথম পরিচয় নয়। কারণ চোখ বুজলেই সে ব্রাউসকে নিয়ে নানা ভাবে সেই প্রাচীন কাল থেকে—যখন মানুষ আগুন জ্বালতে জানত না, যখন মানুষ বন থেকে পশুপাখি শিকার করে কাঁচা মাংস খেত, সেই কাল থেকে সে তার পাশাপাশি চলে আসছে। কারণ চোখ বুজলেই মনে হয় সে কখনও কালাহারিতে, অথবা কখনও সুদূর আফ্রিকার জঙ্গলে। কালো মেয়ে ব্রাউস কি যে সুন্দর সিংহ শাবক ধরে এনেছে বন থেকে, বাপের সঙ্গে সে গেছে, পিছনে, কাঁধে টাঙ্গি পুলক হাঁটছে—আবার সব দ্বীপগুলো এই যেমন সব মনোরম দ্বীপ আছে পৃথিবীর চারপাশে ছিটিয়ে, সেখানে সে দেখেছে এই মেয়েকে, বাপের সঙ্গে গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ফিরছে। বড় বড় মাছের সঙ্গে মেয়েটার তখন খেলা। অথবা দক্ষিণ সমুদ্রে যারা তিমি শিকার করে বেড়ায়, যেন ব্রাউস সেখানে হাতে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছে। ওর চুল নীল রঙের। এবং পিঠের নিচে এসে চুলটা এলিয়ে পড়েছে। একেবারে নয়। কি একটা আদি-মতা আছে তিমি শিকারের সঙ্গে। মেয়েটাকে তার জ্ঞাতিভাইরা শিকারের শুভা-শুভের জন্য দেবী বানিয়ে রাখতো। হাতে, এক ধরনের সবুজ গোল পাতা। পাতায় তিমির চর্বি, শুকনো লতা চর্বি থেকে ঝুলে পড়ছে। সেখানে আগুন জ্বলছে। যতক্ষণ না মাছটাকে সবাই টেনে টেনে কিনারায় আনতে পারছে, ততক্ষণ মেয়েটা দাঁড়িয়ে থাকে আলো জ্বালিয়ে। সে কতভাবে যে ব্রাউসকে জীবনের চার-পাশে অথবা মহাজীবনে অর্থাৎ এই সৌরলোকের চারপাশে যেখানে যখন তার যে-ভাবে অস্তিত্ব থাকে—মেয়েটা যেন আছে তার পাশে পাশে। এমন মনে হলে, পুলকের ভিতরটা আশ্চর্য এক ভালবাসার সুষমায় ভরে যায়। যেখানেই ব্রাউস থাকুক, নন্দিনী থাকুক, তার আসে যায় না। মনে হয় ওরা আছে পাশাপাশি। সে চোখ বুজলেই ওদের ছুঁতে পায়।

## সতেরো

তখন জাহাজের নাবিকেরা ঠাণ্ডায় বসে বসে কাঁপত। নাবিকেরা তেমন উত্তাপ পেত না ফোকশালে। এ-ভাবে শীতে বাঁচা যায় না, স্ট্রীম পাইপ ঠিক মতো কাজ করছে না, অথবা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বলেই ঠিক মতো গরম রাখতে পারা যাচ্ছে না ফোকশাল-

গুলো। এ-নিয়ে একদিন জাহাজীদের সঙ্গে দুই সারেঙএর বচসা হয়ে গেছে। অর্থাৎ সারেঙরা এ-জন্য দায়ী। জাহাজীদের সুখ সুবিধা সব ওদের দেখার কথা। অথচ ওরা মেজমালোম অথবা কাপ্তানের ভয়ে কিছু বলতে পারছে না। না বলেই বলছে, এখন আর এর চেয়ে বেশি কিছু হবে না।

জাহাজীরা ফোকশালে বসে ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপত বলে প্রায় সবাই গ্যালিতে জড় হত। গনগনে আঁচ উনুনে। ওরা চারপাশে গোল হয়ে বসে থাকত। কাচের দরজা দিয়ে বাইরের পৃথিবী দেখা যেত। এবং আকাশের প্রচণ্ড তুষারপাতের ছবি ওদের কাছে কঠিন কিছু মনে হত। অর্থাৎ ওরা ভাবত এ-ভাবে বেশিদিন বাঁচা যায় না। জাহাজ কবে যে নোঙর তুলবে। এবং যা শোনা যাচ্ছে, বরফের দিন-গুলো শেষ না হলে কিছুই হচ্ছে না। এ-ভাবে একটা আরাম আছে, কারণ কাজ-কর্ম থাকে না, জাহাজে কিছু বোঝাই হচ্ছে না, সাফ-সুতরোর কাজটাও কম, যাদের ফলণ্ডা বেঁধে জাহাজের আগিল রঙ করার কথা ছিল, এমন তুষারপাতে কাপ্তান তা পর্যন্ত করতে বারণ করে দিয়েছে। ফলে শুধু এখন মাস্তুলে নিশান উড়ছে। জাহাজীরা খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমোচ্ছে। আর দেশে ফেরার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে। কবে কিভাবে যে একদিন ওরা দেশে পেঁৗছে যাবে এমন কেবল ভাবছে।

তখন একমাত্র পুলক জাহাজে থাকত না। সে দ্বীপের সব পাথরে অথবা পাহাড়ের বুকে বরফ পড়া দেখত। ব্রাউসের কাছে যাবার জন্য সে বরফ কতদূর এগোচ্ছে আর কতদূর গেলে সে প্রায় লাফ দিয়ে একটা জলা পার হয়ে ব্রাউসের দ্বীপ পেয়ে যাবে—সে এজন্য একা একা, কখনও ইমাদুল্লাকে নিয়ে বরফের ওপর সাইকেল চালিয়ে একটা নির্মল সাদা প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতো। তুষার ঝড়ের ভিতর ছুটোছুটি করত—কি যেন এক পাখি মিলে গেছে, ভালবাসার পাখি, যার কেউ নেই, কোন সম্বল নেই, ভালবাসার জীব নেই, সে তাকে পর্যন্ত ভালবেসে ফেলেছে এই বন্দরে এসে।

তারপর একদিন পুলক দেখতে পেল, উপকূল থেকে লায়ন রকের এই বিস্তৃর্ণ অঞ্চল বরফে একেবারে ঢেকে গেছে। সব কিছু এখন নিশ্চল হয়ে গেছে। ইমাদুল্লা এবং তার জাহাজ সাদা বরফে আটকে গিয়ে যেন ছবি হয়ে গেল। ক্রেনগুলো মাথা তুলে সাদা একরাশ তুষারপাত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বুড়ো সান্তাক্লজ সারি সারি অর্থাৎ ভোজবাজির জন্য বুড়ো মানুষটা এখন খুব বেশি লম্বা হয়ে গেছে এবং সারি সারি নকল দাড়ি গোঁফ নিয়ে বেশ যেন মজা করছে সমুদ্রের সঙ্গে। জেটিতে দু ফুটের ওপর বরফ পড়েছে। চারপাশে সাদা রঙের খেলা। যেদিকে তাকানো যায় বরফে ধুধু করছে মাঠ ঘাট। পাহাড়, লালনীল কাঠের বাড়িঘর বরফে ঢেকে এক মায়াবী জগৎ সৃষ্টি করে ফেলেছে।

যখন এমনভাবে বরফ সমস্ত পৃথিবীকে ঢেকে দিয়েছে, দূরের পানইগুলো যখন নীল নীল এবং চারপাশে অসীম নিস্তব্ধতা তখন জাহাজীরা শুনতে পেল, ঠিক জাহাজের নিচে কেউ ক্রিং ক্রিং করে বেল বাজাচ্ছে।

ইমাদুল্লা বুঝতে পারল, পুলক আজও বোধহয় একটা সাইকেল কিনার থেকে ভাড়া করে এনেছে। এখন সাইকেল চালানো ভীষণ কঠিন। তেল কালিতে এমন শক্ত হয়ে যায়—প্যাডেলের সঙ্গে চেন এমন এঁটে যায় যে ভীষণ কষ্ট—তবু সে এক-দিন রাস্তাটা খুঁজে বের করার জন্য পুলকের সঙ্গে গেছে। ওরা যেতে যেতে পিয়াদ্রোতে একটা চিহ্ন রেখে এসেছে—যখন পুলক একা যাবে—যাতে সে পথ ভুল

করে সীমাহীন কোন সাহারা অথবা কালাহারির মতো ভূভাগে না হারিয়ে যায়। এ-ভাবে কোন চিহ্ন কিছুটা পর পর রেখে না দিলে পুলক একদিন ঠিক পথ খুঁজে পাবে না। এবং এটাই ছিল ইমাদুল্লার বড় ভয়।

পুলক এখনও বাজাচ্ছে। ইমাদুল্লা বুঝতে পারল, সে জাহাজের কাউকে ডাকছে। যেহেতু জাহাজের মাল খালাস হয়ে গেছে, যেহেতু জাহাজের সিঁড়ি গ্যাঙওয়েতে ভীষণ খাড়া, সে কিছুতেই সাইকেলটা নিয়ে জাহাজে উঠে আসতে পারছে না।

ইমাদুল্লা রেলিঙে ঝুঁকে দেখল পুলক অভিযাত্রীর মতো পোশাক পরেছে। পায়ে গামবুট। হাতে চামড়ার দস্তানা। মাথায় উলের টুপি। গলায় কমফরটার। লম্বা ওভারকোট। নিচে শালদেরাজ। শীত থেকে সে কেবল তার মুখ ঢেকে রাখতে পারছে না। কখন যে জাহাজ থেকে সে নেমে গেছে—

পুলক বলল, যাচ্ছি।

রোজই এমন বলে। আজও সে এমন বলছে। কিন্তু ইমাদুল্লা জানে লায়নরকের সঙ্গে যে বরফের মাঠ আছে তার মাঝখানটাতে কখনও জল জমে বরফ হয় না। কিছুটা বোধ হয় উষ্ণ স্রোত আছে নিচে। ফলে বেশ কিছুটা জায়গা জল, জলের ওপর দিয়ে বড় বরফের খণ্ড ভেসে যায়।

—ও জায়গাটার সম্বন্ধে কিছু খবর নিলি?

—নিয়েছি।

—বরফ কি সেখানে জমবে।

—না।

—তবে আজও একা একা সমুদ্রে সাইকেলে ঘুরে বেড়াবি।

পুলক বলল, না। তুমি এস না নিচে।

ইমাদুল্লা নিচে নামলে বলল, কাল অনেকটা রপ্ত করে ফেলেছি।

—কি রপ্ত করেছিস।

—লাফিয়ে লাফিয়ে পার হওয়া।

—মানে?

—মানে এই তোমার প্রথম সাইকেলটা পাশে রেখে একটু সময় অপেক্ষা করা। দেখা যাবে বেশ নিরন্তর ভেসে যাবার মতো রাশি রাশি বরফের খণ্ড ভেসে আসছে। আর বেশ খেয়াল করে দেখলাম একটা থেকে আর একটার দূরত্ব এক গজ দু গজের বেশি নয়। খুব বেশি দূর হলেও ক্ষতি নেই। একটু সময় একটা বরফের টুকরোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকলে, ঠিক আর একটা কাছে চলে আসবেই। এ ভাবে এক-দুই করে লাফিয়ে লাফিয়ে ঠিক ও-পাশের দ্বীপটায় চলে যাওয়া যাবে।

—হাঁ আল্লা। তুই কি পাগল।

পুলক চুপ করে থাকল।

—লাফ দিয়ে একটা থেকে আর একটাতে না যেতে পারলেই একেবারে নিচে।

—তাহলে সাঁতার কাটব।

—এই শীতে!

পুলক বলল, কি যে ভাল লাগে। তুমি চল না চাচা।

ইমাদুল্লা কি ভাবল, আমাকে যেতে বলছিস?

—না থাক। তুমি বুড়ো মানুষ। কখন শীতে কাঠ হয়ে যাবে। আমি তখন

ঝামেলায় পড়ে যাব।

এবং এ-ভাবে কে জানে, কোথায় কার আকর্ষণ কি ভাবে তৈরি হয়। ইমাদুল্লা জানে পুলক ভীষণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাচ্ছে। সে ইচ্ছা করলেই সব বন্ধ করে দিতে পারে। সারেঙকে বলে কাপ্তানকে বলে সব বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু সে যখন তার সেই যুবতী বিবির কথা মনে করতে পারে, তার চোখ ভেসে ওঠে, কেমন সে দুর্বার হয়ে যায়। এমন নিবিড় সুষমা জীবনে কার কতবার আসে সে জানে না। এ জন্য সে যেখানেই যাক, ইমাদুল্লার সায় আছে ওকে বাধা দিলে খুব স্বার্থ-পরের মতো কাজ হবে। ইমাদুল্লা বলল, আল্লা তোর সহায় হোক। সে আর কিছু বলতে পারল না। কেমন আনমনে সে জাহাজের দিকে হাঁটতে থাকল। সে ফিরে তাকাতে সাহস করল না পর্যন্ত।

তবু যাবার ইচ্ছা ছিল ইমাদুল্লার। কিন্তু ইমাদুল্লা জানে কিছুদূর গেলেই সে হাঁপিয়ে পড়বে। এবং তাকে নিয়ে পুলক ভীষণ অসুবিধায় পড়ে যাবে।

প্রথম দিকে ইমাদুল্লা ভেবেছিল, এ-বন্দরে পুলক প্রথম এসেছে। সুতরাং সে ভালভাবে জানে না, কি ভাবে কোথায় যাওয়া যাবে। কিন্তু এখন সে বুঝতে পেরেছে এই একা একা ঘুরে বরং পুলকই ইমাদুল্লাকে সঠিক রাস্তায় কোন দ্বীপে নিয়ে যেতে পারে। সে এ-বন্দরের কোথায় কি, কি ভাবে বরফের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যেতে হয় এবং কোথায় সমুদ্র কাচের মতো পাতলা বরফে ঢেকে আছে সব টের পায়।

তা সত্ত্বেও ইমাদুল্লা বলেছিল, চারিদিকে বরফ পড়ছে। তুই মরে যাবি পুলক।

এই সব বললেই যেমন পুলক জাদুর খেলা দেখায় তেমনি সে জাদুর খেলা দেখিয়ে ইমাদুল্লাকে বিব্রত করে তুলেছিল। সে বলেছিল, গ্রাউস কি আর বেশি-দিন বাঁচবে মনে হয়?

পুলক হেসেছিল। এমন হাসি ইমাদুল্লা ওর মুখে অনেকদিন দেখে নি।

ইমাদুল্লা ডেকে উঠেই ফের কেমন চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে আফটার পিকের দিকে ছুটে গেল।—তুই পাগল পুলক। বরফের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে গেলে তুই নির্ঘাত মারা পড়বি।

পুলক কিছুটা সান্ত্বনা দেবার মতো বলল, অনেকেই তো সারডিন মাছ ধরতে যাচ্ছে। পুলক এক পা বরফে ঠেকিয়ে অন্য পা প্যাডেলে রেখে একটু ঘাড় ঘুরিয়ে এমন জবাব দিয়েছিল।

ইমাদুল্লা আফটার পিকে এবার ঝুঁকে দাঁড়াল। অনেক নিচে পুলক। জোরে না বললে বুঝি শুনতে পাবে না। সে বলল—ওরা জানে কোথায় পাতলা কাচের মতো বরফ, কোথায় কঠিন। তুই যতই ঘুরে বেড়াস এক সফরে সেটা তোর জানা সম্ভব না।

পুলক ঠিক একই ভাবে হাসল।

তারপর যা হয়—পুলক জাহাজে নেই—একা একা এই জাহাজে সময় কাটে ইমাদুল্লার, সে নামাজ পড়ার পর মাদুরটা পাট করে রাখে, সে খেয়ে পুলকের খাবার ওর লকারে রেখে দেয় এবং মাঝে মাঝে ঝড়ো হাওয়ার দাপট উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে ডেকে—পুলক কখন ফিরছে। সে না ফিরলে জাহাজে সে কেমন দুঃখী মানুষ বনে যায়।

তারপরই একসময় দেখতে পায় গ্যাঙওয়েতে কেউ টলতে টলতে উঠে আসছে। ক্লান্ত, অথচ চোখে মুখে ভীষণ উত্তেজনা। কোন নতুন দ্বীপ আবিষ্কারের মতো চোখ মুখ। ইমাদুল্লাকে সব বলতে না পারলে সে যেন ছটফট করবে এমন ভাব।

ইমাদুল্লা তাড়াতাড়ি লকার থেকে খাবার বের করে দিলে সে বাংকে বসেই খায়। খুব খিদে। সে কতটা পথ পার হয়ে এসেছে, অথবা কতটা সে পরিশ্রম করেছে ওর খাওয়া দেখলে টের পাওয়া যায়। সে ভীষণ গব গব করে খেতে থাকলে ইমাদুল্লা বলে, ব্রাউস খেতে বলে নি।

—বলে নি আবার! এক গাদা খেয়েছি। ওর বাবা ঝিনুকের স্যুপ ভীষণ ভাল রান্না করে।

—কিন্তু যে ভাবে খাচ্ছিস!

—বেশ অনেকটা পথ। এত ঠাণ্ডা অথচ সাইকেল চালালে কিছু মনে হয় না।

তারপর সে রুটির সঙ্গে দু টুকরো ভেড়ার মাংস চিবুতে চিবুতে বলল, ও-কি গ্র্যাণ্ড রাস্তা। আসার সময় জ্যোৎস্না উঠে গেছে। সাদা। সাদা বরফ, সাদা জ্যোৎস্না। সমুদ্রের ওপর দিয়ে ঝড়ো ঠাণ্ডা বাতাস আর আমি তার ভিতর দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছি। সে একটু থেমে বলল, অর্থাৎ সে ঢক ঢক করে জল খেল এক গ্লাস তারপর বলল, জানি না, চাচা এটা কিসের মায়া। আমি ব্রাউসের জন্য যাচ্ছি না এই দ্বীপ, তার বরফ পড়া, সাদা জ্যোৎস্না, সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস আমাকে আকর্ষণ করছে, কোনটা ঠিক বুঝতে পারছি না। এবং মানুষের ভিতর বুঝি চাচা এক আশ্চর্য অহংকার থাকে, সেটা হচ্ছে পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্যকে শুষে নেবার অহঙ্কার। কি যে হয় জানি না, আমি এমন একটা রাস্তা আবিষ্কার করে ফেলেছি যার ভিতর নিয়ে গেলে তুমিও রোজ রোজ তার আকর্ষণে ঘরে থাকতে পারবে না।

পুলক অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে কথা বলে যাওয়ায় ইমাদুল্লা হাসল।

পুলক খুব লজ্জা পেয়েছে এমনভাবে বলল, ব্রাউস এখন আর চাচা বলে না, সে আগামী শীতে অথবা বসন্তে মরে যাবে।

—ওর শরীর ভাল হয়েছে।

—খুব ভালো। ও আর আমি সারাটা পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই।

—তুই থেকে যা না। কেউ তো নেই তোর।

সহসা এমন কথা শুনে পুলক ভীষণ বিষণ্ণ হয়ে গেল। বলল সে হবে'খন।

পাশাপাশি ফোকশালগুলোতে তখন সবাই ঘুমোচ্ছে। পোর্ট হোল বন্ধ বলে বাইরের হাওয়া ঢুকছে না। মাঝে মাঝে স্টিয়ারিঙ এনজিনের শব্দ আসত—কক্ কক্—এখন জাহাজের চারপাশে বরফ পড়ে শক্ত হয়ে গেছে বলে এনজিনটা পর্যন্ত শব্দ করছে না। অদ্ভুত নীল আলোয় ওরা দুজন জাহাজী চুপচাপ মুখোমুখী বসে আছে।

ইমাদুল্লা বলল, তুই থাকলে ব্রাউস বেঁচে যাবে।

পুলক উঠে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল। সে দরজাটা আর একটু টেনে দিয়ে বলল, অনেক রাত হয়েছে চাচা, ঘুমোতে যাও।

ইমাদুল্লার ওঠার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না। সে যেমন বসেছিল, যেন এ-

ভাবেই সে বসে থাকবে এখানে, সে উঠবে না, সে কথা না নিয়ে উঠবে না, এবং পুলকের কেন জানি এই অহেতুক কথাবার্তা ভাল লাগছিল না। সে বলল চাচা তুমি তো প্রাচীন মানুষ। মানুষের ভাললাগা মন্দলাগার ব্যাপারটা তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো। আমার থেকে যাওয়ার ব্যাপারে এত ভাবছ কেন?

ইমাদুল্লা উঠে যাবার সময় শুনল, ধীরে ধীরে কেমন শুকনো গলায় পুলক বলছে, কাছে থাকলে মানুষের দাম থাকে না চাচা। দাম না থাকলে, অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা মরে গেলে—সেই এক বরফের দেশ মানুষের মনে উঁকি মারে। তখন মানুষ বেঁচে থেকেও মরে যায়।

ইমাদুল্লা ওর হেঁয়ালিপূর্ণ কথা বুঝতে না পেরে বলল, জাহাজ আর বেশি দিন থাকছে না। বরফ কাটা কল এসে জাহাজ সমুদ্রে নিয়ে যাবে।

পুলক বলল, বেশ হয়। কবে যে আমরা এখান থেকে যাব!

তারপর ইমাদুল্লা চলে গেলে কেন যে সারারাত পুলক আজ ঘুমোতে পারল না, এত ঠাণ্ডা চারপাশে অথচ ওর কপালে কেমন ঘাম দেখা দিচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি পোর্ট হোলের কাচ খুলে দিল। বরফ পড়ে গেলে যা হয়, শীত তেমন থাকে না, বরফ পড়ার আগে কনকনে শীতটার মতো এ-ঠাণ্ডা তেমন কষ্টকর নয়। পোর্টহোল দিয়ে সে সারারাত জেগে জেগে সেই লাইট-হাউসের দ্বীপটা কেবল দেখে গেল। দ্বীপের বাতিঘরটা সে দেখলে। কণ্ট্রোলিঙ টাওয়ারের আলোটা যখন পুবে ঘুরে যায় তখন মনে হয় ওর মতো সেখানে ব্রাউসও এখন একা জেগে বসে রয়েছে। কাচের জানালায় ওর মুখ। সামনে সমুদ্র। উষ্ণ স্রোত আছে বলে জল নীল, কেবল মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড মুক্তোর মতো নীল বরফের খণ্ড জলের ওপর নানারকম ছবি তৈরি করে চলে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় বুঝি ব্রাউস চোখ বুঝলে টের পায় সেই আশ্চর্য মানুষটা কেবল লাফিয়ে সারা জীবন এক বরফের উপত্যকা থেকে অন্য বরফের উপত্যকায় চলে যাচ্ছে। কখনও সে সেখানে সবুজ ঘাস অথবা গাছপালা বৃক্ষ জন্মালে কেমন লাগে দেখতে, একদণ্ড দাঁড়িয়ে তা দেখছে না।

## আঠারো

এ-ভাবে জাহাজের একজন নাবিক নিশিদিন বরফের ওপর ঘুরে বেড়াতো। জাহাজ থেকে ছুটি পেলেই অথবা কাজ না থাকলে সে তার ভাড়া করা সাইকেলটা নিয়ে বের হয়ে পড়ত। কখনও দেখত, রাস্তার ওপর মানুষেরা কাজ করছে, বরফ সরাচ্ছে। আবার দুদিন পর যা ছিল তাই। কেবল সমুদ্রে শক্ত বরফের ওপর দিয়ে যেন সাইকেল চালিয়ে যাওয়া যায়। কোন কষ্ট হয় না। মসৃণ পিচের রাস্তার মতো প্রায়। সে বেশ অভিযাত্রীর মতো সমুদ্রে নেমে গেলে—নানারকম লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। ওরা সবাই বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছে, এবং ওরা সমুদ্রের চার পাঁচ ক্রোশ ভিতরে ঢুকে যাবে। বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে যাবে। কালো পোশাকে ওদের এক একজনকে দূর থেকে মনে হয় এক একটা পেঙ্গুইন—খুব সংগোপনে সেই ছোট জলের গর্তে যেন আহারের আশায় ঝুঁকে আছে।

এ-ভাবে সে চলে যেত। যেতে যেতে দেখতে পেত, বেশ রসিক একজন বুড়ো মানুষকে। সে পড়ত তার যাবার পথে। পথটায় এসে সে যখন দেখত বুড়ো

মানুষটা খুব নিরিবিলি মাছ ধরছে, তখন সে সাইকেলের বেল বাজাত না। মাছেরা শব্দ পেলে চলে যায়। বুড়ো মানুষটা মাছ গেলে ভীষণ দুঃখ পাবে। তাই পুলক যত তাড়াতাড়িই থাকুক, যখনই দেখবে সে এসে গেছে বুড়ো মানুষটার কাছে, তখন সে আর সাইকেলে থাকবে না। পায়ে হেঁটে পাশ কাটিয়ে যাবে। কখনও মাছ না জমলে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে গল্প করবে। কিন্তু ফেরার পথে তাকে সাইকেল থেকে নামতে হয় না। তখন রাত্রি হয়ে যায়। রাতের প্রথম দিকে তখন জ্যোৎস্না থাকে বলে গ্রাউসকে আর কণ্ট্রোলিঙ টাওয়ার থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বরফের ওপর আলো ফেলতে হয় না। সে বেশ চাঁদের আলোয় পথ চিনে ফিরে আসতে পারে। তখন সে একা। কখনও কখনও নীরবে সেই দিগন্ত বিস্তৃত বরফের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলে এক অত্যাশ্চর্য জীবনের ছবি সে দেখতে পায়। এবং ভালবাসার ব্যাপারটা যেন মহিমময় ঈশ্বরের ভীষণ কৌতুক। এটা মরে গেলে মানুষের আর কিছু থাকে না। সে এ-ভাবে বরফের ওপর সাইকেল চালিয়ে যায়। কণ্ট্রোলিঙ টাওয়ার থেকে গ্রাউস দাঁড়িয়ে যতক্ষণ চোখ যায় দেখে। জ্যোৎস্না রাত বলে বেশি-দূর দেখা যায় না। পুলক আরও অস্পষ্ট হয়ে গেলে জ্যোৎস্না রাতে গ্রাউস একটা বোতাম টিপে উল্টো দিকে আলো ফেলে দেখতে পায়, সে যাচ্ছে, বরফের ওপর দিয়ে সে চলে যাচ্ছে। তার মাথায় ফেল্ট ক্যাপ, পায়ে গামবুট। সারা শরীর ওভারকোটে ঢাকা। হাতে সেই চামড়ার নীল দস্তানা। সে মাঝে মাঝে যাবার সময় হাত তুলে দেয়—আমি আবার আসব। হাত তুলে ইশারা করলে গ্রাউস এমন বুঝতে পারে। টাওয়ারের আলো না পৌঁছালে আকাশের নক্ষত্রেরা তাকে কখনও কখনও আলো দেয়।

এ-ভাবে যখন দিন বেশ কেটে যাচ্ছিল, একরাতে ইমাদুল্লা দেখল জাহাজে পুলক ফেরে নি। সে এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠেছে, সে এ-সময় একবার বাথরুমে যায়। যাবার সময় দেখতে পায় পুলক দুটো মোটা সাদা কম্বলে শরীর ঢেকে ঘুম যাচ্ছে। ওর স্বভাবটা ভাল না। সে কম্বল গায়ে রাখে না। ইমাদুল্লার স্বভাব বাথরুম থেকে নেমে সিঁড়ির ডান দিকে একবার উঁকি দেওয়া। খুব ধীরে ধীরে দরজাটা খোলে। চোরের মতো সন্তর্পণে ঢুকে যাবার স্বভাব ভিতরে। তারপর পুলকের শরীরে কম্বল না থাকলে শরীরটা ভাল করে ঢাকতে ঢাকতে নিজের সঙ্গে নিজে গজগজ করতে থাকে কিছুক্ষণ। কেন যে সে এমন হয়ে যাচ্ছে।

ইমাদুল্লা ভিতরে ঢুকে দেখল, পুলকের লকার বন্ধ, বিছানা খালি। একটা বই খোলা পড়ে আছে। খুব অগোছালো মানুষ সে। বাংকের নিচে নোংরা জামা কাপড়। কবেকার কে জানে। সে ওকে ভাল করে খুঁজতে গিয়ে এসব দেখে ফেলল। তরপর ইমাদুল্লা নিজের ফোকশালে এসে ঘড়ি দেখল। এখন রাত প্রায় একটা বাজে। মাঝ রাত। আর কয়েক ঘণ্টা বাদেই সকাল হয়ে যাবে। সে জাহাজে কেন এল না! ওর বুকটা কেঁপে উঠল। সে যদি থেকেও যায় পালিয়ে থাকতে হবে। এজেন্ট অফিস ওর ওপর সার্চ-ওয়ারেণ্ট বের করবে। কাপ্তান নিজের দায়িত্বে তাকে ক্ষমা করতে পারবেন না। সে নানাভাবে ব্যাপারটাকে ভাবল।

দূরদেশে পাশাপাশি জাহাজীরাই আত্মীয়ের মতো। খোঁজ-খবর সব তারাই করে থাকে। ইমাদুল্লা এই ছেলেটিকে ঠিক জাহাজীর মতো কখনও ভাবে না। পুলক সুখে দুঃখে তার ভীষণ কাছাকাছি মানুষ। ওর মুখ চোখ দেখলেই এখন এটা টের পাওয়া যাচ্ছে। ভীষণ উদ্বিগ্ন চোখমুখ ইমাদুল্লার।

এমন শীতে সহজে কেউ উঠতে চাইবে না। মুখ কান কম্বলে ঢেকে সবাই ঘুম যাচ্ছে। হাত পা ইমাদুল্লার বরফের মতো ঠাণ্ডা। ওকেই একবার ওপরে যেতে হবে। যদি মেসরুমে পুলক শীতের জন্য ঘুমোতে না পেরে চা করতে বসে যায়। এ-ছাড়া যমুনাবাজুতে সে একবার যাবে। যমুনাবাজুর বাথরুমগুলো তার দেখা হয় নি। এই ভেবে ভাল করে গলা মুখ ঢেকে ওপরে উঠে দেখল মেসরুম অন্ধকার। গ্যালিতে কেউ নেই। গ্যালিতে উনুনের আঁচ নিভে গেছে। চার পাশটায় কি যে কনকনে শীত! সে কেমন নুয়ে নুয়ে এবং কিছুটা লাফিয়ে গঙ্গাবাজুর দিকে গেল। বাথ-রুম খোলা। কেউ নেই। কোথায় আর যেতে পারে! কখনও কখনও জাহাজীদের এ-সব অসুখ দেখা দিলে গভীর রাতে ডেকে পায়চারি করতে দেখা যায়। ডেকে আবছামতো অন্ধকার। বয়স হলে যা হয়। ইমাদুল্লার মনে হল সে চোখে কম দেখছে। আর ডেকে বরফ জমেছে বলে সে খুব দ্রুত হেঁটে যেতে পারছে না। বোট ডেকে একটা বড় আলো জ্বলছে। এবং এক নম্বর ফল্কায় গঙ্গাবাজুর ডেরিকেও একটা আলো। এ-সব আলো এই শীতের রাতে তেমন যেন অন্ধকার দূর করতে পারছে না। সে প্রথম ঠিক চিফ্ কুকের গ্যালিতে এসে ফিসফিস গলায় ডাকল, পুলক? পুলক আছিস? আমি তোর ইমাদুল্লা চাচা।

কোন শব্দ নেই কোথাও। কেবল সমুদ্রের সেই কনকনে শীতের বাতাস, এবং বাতাসে ডেরিকের আলো দুলছে। আলো দুললে যা হয়, ক্রমে ইমাদুল্লার ছায়াটা একবার বড় হয়ে যাচ্ছে আবার ছোট হয়ে যাচ্ছে। সে নিজের ছায়া এ-ভাবে বড় হয়ে যায় অথবা ছোট হয়ে যায় অস্পষ্ট রাতে তার বুঝি জানা ছিল না। সে বলল, আমি এখন কি করি! সে যেন নিজের ছায়াগুলোকে লক্ষ্য করে বলছে তুই যে বেইমান থেকে গেলি, এখন বুঝতে পারছি আমার কি কষ্ট। এবং ইমাদুল্লার কেমন যেন একটা আর্তস্বর চারপাশে এ-ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিল। সে বলল, আমি জানতাম, তুই একদিন ঠিক জাহাজে আর আসবি না। অথচ আমার সঙ্গে কি তঞ্চকতা! না আমি থাকব না এখানে, খুব কাছাকাছি থাকলে ভালবাসার সুষমা বেঁচে থাকে না। এবং সেই পুত্রের মুখের মতো মুখ পুলকের ভেসে উঠলে সে ভীষণভাবে আঁতকে উঠল।

—কে!

—আমি ইমাদুল্লা সাব।

—এই রাতে তুমি এখানে কি খুঁজছ?

—কিছু না সাব।

মেজমিস্ত্রি তবু ইমাদুল্লার কাছে এসে টর্চ মারল মুখে। সে দেখল বুড়ো মানুষটা শীতে নীল হয়ে যাচ্ছে। মেজমিস্ত্রি কেমন ধমক দিলেন, তুমি ইমাদুল্লা এ-জামা কাপড়ে ওপরে উঠে এসেছ! তুমি তো মরে যাবে?

ইমাদুল্লার গলার স্বর কেমন বুজে এল বলতে গিয়ে,

—সাব পুলক ফোকশালে নেই। ওকে খুঁজছি।

—বাথরুম দেখেছ?

—সব দেখছি সাব।

—তবে বোধ হয় দ্বীপটায় থেকে গেছে।

—থেকে গেলে আমাকে বলে যেত।

—কোন অসুবিধা আছে।

—কিন্তু সকালে না ফিরলে ভীষণ ঝামেলা হবে।

মেজমিস্ত্রি জানেন ঝামেলাটা কে করবে। তিনি বললেন, সে দেখা যাবে।

অথচ সকাল গেল, দুপুর হয়ে গেল পুলক এল না। এ-ভাবে আর চুপচাপ বসে থাকা যায় না। এনজিন সারেঙ ডেক সারেঙ, ইমাদুল্লা এবং অন্যান্য জাহাজীরা এ-নিয়ে মেসরুমে কি করা যায় সলাপরামর্শের জন্য বসে গেল। কেউ কেউ এটা আদৌ গুরুত্ব দিল না। থেকে গেলে কি আর করার আছে। এজেন্ট অফিস যা করার করবে।

সারেঙ বলল, আরে সেতো তোমাদের সঙ্গে একটা দীর্ঘ সফর কাটিয়ে গেছে, সুখে দুঃখে তোমরা ওর কাছ থেকে অনেক উপকার নিয়েছ, এখন এমন বললে চলবে কেন!

কেউ বলল, কাপ্তানকে খবরটা দিয়ে দেওয়া ভাল।

ইমাদুল্লা ভীষণ বিব্রত বোধ করতে থাকল। কাপ্তানের কাছে রিপোর্ট হওয়া মানেই পুলক ব্ল্যাক লিসটেড্ হয়ে যাবে। যতক্ষণ রিপোর্ট না যায় ততক্ষণই যেন তারা পুলকের জন্য অপেক্ষা করতে পারবে। অথচ এনজিন সারেঙ ভীষণ তাড়াতাড়ি করছে এ-ব্যাপারে। সে না জানিয়ে, দায়িত্ব আর নিজের কাঁধে রাখতে চাইছে না।

এবং এ-ভাবে একসময় কাপ্তানের কাছে খবর গেল, বোট-ডেকে মাস্তার। জাহাজের সবাই সারি সারি ওপরে দাঁড়িয়ে গেছে। কাপ্তান দুপাশে জাহাজীদের রেখে একবার পুবে আবার পশ্চিমে হেঁটে যাচ্ছেন। এই সব নাবিকদের তিনি কলকাতা বন্দর থেকে নিয়ে এসেছেন। এদের আবার নিরাপদে কলকাতায় পৌঁছানো তাঁর দায়িত্ব। কোন কারণে মাঝ-সমুদ্রে অথবা কোন নাবিক হারিয়ে গেলে সব দায়-দায়িত্ব তাঁর। এবং তারও একটা জাহাজিনলি আছে, সেখানে সেও কখনও কখনও ব্ল্যাক লিসটেড্ হয়ে যায়। আর তিনি যেহেতু ধর্মভীরু মানুষ, ঈশ্বরের ঘরে ব্ল্যাক লিসটেড হবার সম্ভাবনা বেশি ভেবে—একটা সঠিক খোঁজের তাঁর দরকার। তিনি বললেন, সে কোথায় রোজ রোজ যায়?

ইমাদুল্লা বলল, সাব ও লায়ন রকে যায়।

কাপ্তান চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, এখন লায়ন রকে কেউ যেতে পারে না।

—সে তবু যায় সাব।

কাপ্তান বললেন, অ্যাবসার্ড।

সেকেন্ড অফিসার বলল, আমিও শুনেছি যায়।

এবার কাপ্তান যেন আরও সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।—তোমরা যা জান না, সেটা বল না।

—সে তো এসে এমন বলেছে সাব। ইমাদুল্লা কাঁচুমাচু মুখে বলল।

—তোমরা জান না এ সময়ে লায়ন রকের সঙ্গে পিয়াদ্রোঁতের কোন যোগাযোগ থাকে না।

—বরফ পড়ে যায় বলে...।

কাপ্তান থামিয়ে দিলেন—বললেন, খুব কঠিন। নানারকমের বরফ, ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। স্রোতে নেমে যাচ্ছে। তুমি যে জলে সাঁতার কাটবে তাও পারবে না। বরফের ধাক্কায় একেবারে গুঁড়িয়ে যাবে। প্রায় ফার্লং এর মতো পথ পার হওয়া দায়। মানুষের অসাধ্য সেই স্রোত পার হয়ে যাওয়া। বলে তিনি কি

ভাবলেন, তারপর কেন জানি মনে হল—হয়তো যেতে পারে, ভালবাসা মানুষের কাছে ঈশ্বরের মতো পবিত্র হয়ে গেলে সে সব পারে। এবং তিনি বললেন, আজ বিকেলেই খোঁজ নিতে হয়। ইমাদুল্লার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তো ওকে নিয়ে মাঝে মাঝে কোথায় যেতে!

ইমাদুল্লা ঠিক বুঝতে পারল না বলে মেজমিস্ত্রি বুঝিয়ে বললেন।

ইমাদুল্লা বলল, ইলিয়া পরিবারের সঙ্গে আমাদের একটা যোগাযোগ ঘটেছিল। আমরা সেখানে যেতাম। কাপ্তানের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ইমাদুল্লা একটু ভাল বাংলা বলার চেষ্টা করে।

কাপ্তান সাক্ষী সাবুদ রেখে সব লগবুকে নোট করে নিলেন। সে কোথায় যেত, কখন যেত, কবে থেকে এমন হয়েছে এবং বিস্তারিত লগবুকে নোট করে নিয়ে তিনি সামান্য সময় চুপ করে থাকলেন। কিছু কিছু খবর তার আগেও এসেছে—তিনি জানেন জাহাজীমানুষের সমুদ্রের ভয়াবহ দিনগুলো এ-ভাবে বন্দরে এলে সহজ হয়ে যায়। কোন কারণেই কাপ্তান বাধা নিষেধের বেড়াজালে কাউকে আটকে রাখতে চান না। যা কিছু সমুদ্রের নিঃসঙ্গতা এভাবে বন্দরে এলে সেরে যায়। সুতরাং তার যে এ-সব ব্যাপারে সায় থাকে না, তা না, তবু একেবারে নিরুদ্দেশে গেলে একটা জবাবদিহির ব্যাপার থাকে। এ-জন্য বোধ হয় কাপ্তানকেও খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

পুলক বিকেলেও ফিরে এল না বলে ইমাদুল্লা একবার ইলিয়াকে ফোন করবে ভাবল। সকালেও সে দু তিনবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুতেই কানেকসান পায় নি। এখন আবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। অথবা সোজা চলে যাওয়া। আবার তুষারপাত আরম্ভ হয়েছে বলে বাস কখন যাচ্ছে কখন যাচ্ছে না কেউ ঠিক বলতে পারছে না। এখন চারপাশে অজস্র পেঁজা তুলোর মতো রাশি রাশি কুচি বরফ উড়ছে অথবা শরতের কাশফুলের মতো এই বন্দর শহর বরফের কুচিতে ছেয়ে আছে। ডেকের ওপর উঠলেই বিন্দু বিন্দু এই সব বরফ কুচি ঝরে পড়বে ওভারকোটে। ইমাদুল্লা এই ঝড় মাথায় করে বের হয়ে পড়ল। সঙ্গে গেল গঙ্গা এবং যমুনাবাজুর দুজন ডেক জাহাজী। সে কিছুতেই কোন কানেকসান পেল না।

ইমাদুল্লা জানে এখন কাপ্তান বন্দরে ডায়েরি করবে। আজ করবে না। আজ রাতটা দেখে সে কাল ভোরে ডায়েরি করবে। জাহাজ আগামী কাল বিকেলে ছাড়ছে। বরফ কাটা কল এসে গেছে। ওপাশে ওটা বরফের ভিতর দাঁড়িয়ে এখন ফুঁসছে।

ইমাদুল্লা বাস পেল না। একটা জীপ যাবে ওয়েলিংটনে। ওরা বাজারের কাছে জীপটার মালিককে ওদের এই ভয়ঙ্কর বিপদের কথা জানালে লিফ্‌ট দিতে রাজী হল। এবং যখন ওরা ইলিয়ার বাড়িতে পেঁছেছে তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। বরফ পড়ছে বলে, সব জানালা দরজা বন্ধ। গোলাপ গাছগুলো চেনা যাচ্ছে না। ক্রিসমাস ট্রির মতো মনে হচ্ছে। বাইরে বড় আলো জ্বালা। ওরা গাড়ি-বারান্দায় উঠে প্রথম কোট খুলে সব বরফের কুচিগুলো ঝেড়ে ফেলে দিল। তারপর দরজার কড়া নাড়তেই খুলে গেল। যেন ইলিয়া এতক্ষণ কারো আসার অপেক্ষায় বসে আছে। দরজার কড়া নাড়ার শব্দে সেই মানুষ তার এসে গেছে এমনি দ্রুত সে দরজা খুলে মুখ বাড়াল। ইমাদুল্লাকে দেখে বলল, আমি তোমাদের অপেক্ষাতেই বসে রয়েছি। কিছুক্ষণ আগে লাইট-হাউস থেকে ফোন এসেছে।

ইমাদুল্লা খুব ব্যস্ত গলায় প্রশ্ন করল, কি বলেছে ফোনে।

পুলক রোজ যেত। গতকালও যাবার কথা। কিন্তু যায় নি।

আমরা তো পুলকের খোঁজে এসেছি। সে গতকাল বের হয়েছে। আজও ফিরে যায় নি জাহাজে। কাপ্তান লগবুকে নাম তুলেছেন।

ইলিয়া বলল, সে রোজ যেত। মিলান বার বার বারণ করেছে, যা রাস্তা বরফের, বিপদ ঘটতে কতক্ষণ! এবার সমুদ্রে বরফের অবস্থা একেবারে ভাল না।

—আমরাও তাই ভাবছি। কিন্তু কাপ্তানের ধারণা সে কারো সঙ্গে পালিয়েছে।

ইলিয়া বলল, সারাটা বিকেল সে হৈ চৈ করত গ্রাউসের সঙ্গে। লাইট-হাউসের নিচে একটা পাথরে বসে ওরা দুজন কেবল বরফ পড়া দেখত।

ইমাদুল্লা নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল। বলল, কি বলেছে ফোনে?

—বলেছে গ্রাউস সারারাত ঘুমায় নি। পাগলের মতো একবার নিচে নেমে এসেছে আবার লাইট-হাউসের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেছে। সারারাত লাইট-হাউসের আলো ফেলে বরফের উপর ওকে খুঁজেছে।

—কিন্তু দেখা যাচ্ছে না?

—না। তবে বিকেলে সামান্য রোদ উঠলে দূরে ওরা একটা কি বিন্দুর মতো দেখতে পেয়েছে। গ্রাউস বার বার বলেছে জাহাজে যেন খোঁজ নিই। সে জাহাজে বার বার কানেকসান চেয়েও পায় নি। তারপর আমাকে ফোন করেছে। যাক ভাবছিলাম: কিন্তু দ্যাখো আবার দিনটা কি খারাপ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে বসে-ছিলাম যদি তোমরা কেউ ওর খোঁজ নিতে আস।

ইমাদুল্লা ভাবল, পুলক নানারকম কৌতুক করতে ভালবাসত। অথবা খেলা, জাদুর খেলা, যা দেখে জাহাজে সবাই বেহুদ্দ। এখন কি পুলক তবে বরফের নিচে জাদুর খেলা দেখাচ্ছে। সে জীবন পণ রেখে খেলা দেখাতে গেল। গ্রাউস তার বিষণ্ণতা নিয়ে বসে থাকত, কখন সেই মানুষ আসবে তার। যে সারাটা বিকেল দ্বীপে ছুটে বেড়াবে এবং ওর সুন্দর চোখ দেখতে দেখতে সে তন্ময় হয়ে যাবে। তুমি পুলক জীবন পণ করে খেলা দেখাতে গেলে! তুমি এক পেনিকে দশ পেনি করে দিতে পারতে জানতাম। তুমি কি শেষ পর্যন্ত আর ওকে খেলা দেখিয়ে খুশি করতে পার নি। একঘেয়ে ঠেকত। শেষ পর্যন্ত ওকে খুশি করার জন্য নতুন খেলার সন্ধানে ছিলে। বরফের নিচে গ্রাউসকে তাই তুমি মাছের খেলা দেখাতে চাইলে।

ইমাদুল্লার এখন আর কিছুই ভাবতে ভাল লাগছে না। সে, গঙ্গা, ডেক জাহাজী দুজন এবং মেজ মালোম সকলে মিলে পা টিপে টিপে হাতে টর্চ নিয়ে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটছে। ওরা সমুদ্রের ওপর হেঁটে যাচ্ছে। পায়ের নিচে শক্ত তিন চার ফুট ঘন বরফ। নিচে নীল জল। আশেপাশে সেই ফোকর বরফের। পুলককে ওদের খুঁজে পেতে কষ্ট হল না। কারণ প্রায় ফার্লংএর মতো পথ আগে পুলক এক ভাঙা বৃত্তের ভিতর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সাইকেলের অধিকাংশ জলের ভিতর। শুধু হ্যান্ডেলটা বরফে আটকে আছে। নতুবা ওটাও তলিয়ে যেত এবং সাইকেলটা দেখেই বুঝল বরফের নিচে পুলক আটকা পড়েছে। একটা তির্যক আলো স্থির হয়ে আছে বৃত্তের ওপর। ইমাদুল্লার শরীরেও আলোটা এসে দুবার পড়ল। ইমাদুল্লা হাত নেড়ে সংকেতে জানাল, পাওয়া গেছে। কি পাওয়া গেছে কিছু বলতে পারল না। ইমাদুল্লা ঠান্ডায় ডুবে বরফের ভিতর থেকে

পুলককে খোঁজার চেষ্টা করলে, মেজ মালোম বাধা দিলেন। বললেন, ইমাদুল্লা তুমি তবে মাছ হয়ে যাবে। অনর্থক খোঁজা। ওর সাইকেলটা বরং তুলে নাও।

লাইট-হাউসের সেই বাতি বড় আশ্চর্য সুন্দর করে রেখেছিল এই সমুদ্রকে—যেন এক বরফের উপত্যকা, এই উপত্যকায় ওরা সকলে দাঁড়িয়ে আছে এবং সকলেই সেই পরশপাথরের সন্ধানে আছে। মনে হল ব্রাউস কণ্ট্রোলিঙ টাওয়ার থেকে ওদের দেখছে। এবং সারা উপত্যকাময় সে বাতিঘরের আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। বোধহয় পুলক এখন জলের তলায় বরফের ছাদে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ব্রাউসকে কি খবর দেওয়া যায় ইমাদুল্লা ভাবছিল। কাল জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। কে আর খবর রাখে, পুলক এক সামান্য জাহাজী বরফের নিচে হারিয়ে গেছে। জাহাজ ছাড়ার আর বেশি দেরি নেই। সকাল হলেই ওরা চলে যাচ্ছে বন্দর ছেড়ে। দেশেও পুলকের কেউ নেই। সুতরাং যতদূর পারা গেল আলোর ভিতর হাঁটতে হাঁটতে ওরা লায়ন রকের সামনে চলে গেল। ইমাদুল্লা হাতে ইশারা করে জানাল, পুলককে পাওয়া গেছে। সে যে সমুদ্রের নিচে জাদুর খেলা দেখাচ্ছে সে কথা ইমাদুল্লা গোপন করে আবার ফিরে আসতে লাগল। আকাশ পরিষ্কার। সামান্য কাক জ্যোৎস্না এখন এই বরফের ওপর। আশ্চর্য নীরব এক প্রশান্তি নেমে এসেছে চারপাশে। ইমাদুল্লার কেন জানি কিছুতেই এই বরফের উপত্যকা ছেড়ে এখন যেতে ইচ্ছা করছে না।

## উপসংহার

কোন ভারতীয় জাহাজ সেই দ্বীপে গেলে, বিশেষ করে সেই শীতকালে এক যুবতী তার স্বামীকে নিয়ে জাহাজ-ডেকে উঠে আসে আজকাল। এবং বড় বড় চোখে তাকায়। সে যেন জাহাজে কাকে খুঁজতে আসে। তাঁকে না পেলে সে একজন ভারতীয়কে রোজ রাতের আহারে নিমন্ত্রণের সময় বড় বড় চোখে সেই এক আশ্চর্য ভারতীয় সম্পর্কে গল্প করতে করতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

এর সঙ্গে কিছু সংস্কারও তার জন্মে গেছে। যেমন তার ঠাকুমা লণ্ঠন হাতে জাহাজ-ডেকে রাতে উঠে যেত, সেও তেমনি যখন জেটিতে আসে লণ্ঠন হাতেই আসে। যেন এটা তাদের পারিবারিক সম্মান দেখানো সেই ভারতীয়টির প্রতি। নিমন্ত্রিত অতিথি এই লণ্ঠন হাতে জাহাজ-ডেকে উঠে আসার মানে জানতে চাইলে যুবতী মৃদু হাসে। কথা বলে না। নিজের এই সংস্কারের কথা, সম্মান দেখানোর কথা কাউকে বলে সেই মানুষটিকে ছোট করতে চায় না। কারণ সে বুঝি বেঁচে আছে তার আসার প্রতীক্ষায়। সে যে বলে গেছে, সে আবার এ দ্বীপে আসবে।

# ধ্বনি প্রতিধ্বনি

# এক

এভাবে ওরা শেষ পর্যন্ত দ্বীপটায় পৌঁছে গেল। ওরা বোট সোজা টেনে তুলে ফেলল ওপরে। তারপর দ্বীপটার দিকে তাকাল। দ্বীপটা খুব একটা মায়াবী কিছু না। আর দশটা দ্বীপে যেমন গাছপালা, অরণ্য পাহাড় আর নির্জনতা থাকে এ-দ্বীপেও তেমনি কিছু রয়েছে। সামনে বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে বালিয়াড়ি। ইতস্তত নানা বর্ণের নুড়ি পাথর ছড়ানো। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। কিছুদূরে ছোট ছোট ঝোপ, কিছুটা ভেতরে উঠে গেলে বাঁ-দিক ঘেঁসে ঘন বনজঙ্গল। পেছনে পাহাড়ের মতো কিছু দেখা যাচ্ছে।

জেনি স্থির থাকতে পারছে না। সে বোট থেকে প্রায় লাফিয়ে নেমেছিল। সে দৌড়ে কিছুটা বালিয়াড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে গেছে। তারপর দূরবীনে যত দূর সামনে দেখা যায় দ্বীপটার, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। মনে হচ্ছে দ্বীপের পশ্চিম দিকে একটা ঘন দীর্ঘ ইউকেলিপটাসের বন আছে। যদিও স্পষ্ট নয়, দিগন্তরেখায় এমন সরল বৃক্ষের বন দেখে ইউকিলিপটাসের কথাই মনে এসেছিল।

থমপ্সন, রিচার্ড, আর্চি বোট ওপরে তুলে ফেলেছে ততক্ষণে। দড়িদড়া, তাঁবু খাটাবার খুঁটি, রিচার্ড পাঁজা করে সব তুলে আনছে। থমপ্সন পাইপে আগুন দিতে দিতে কি যেন দেখল দ্বীপটায়। সে তারপর দৌড়ে গেল। খুঁটিগুলো পুঁতে ফেলা দরকার। কিন্তু কোথায় সুবিধা হবে সে ঠিক করতে পারছে না। হেঁটে হেঁটে একটা ভালো জায়গা খুঁজছিল সে।

ওদের এখন অনেক কাজ। যেমন এরা দুটো তাঁবু সঙ্গে এনেছে। একটাতে থাকবে জেনিফার, একটাতে ওরা তিনজন। এ-অঞ্চলে ঝড় বৃষ্টি লেগেই থাকে, সেজন্য তাঁবুর চারপাশে নালা কেটে দিতে হবে। সকালে একটা জাহাজ ওদের মাঝ দরিয়ায় বোটে নামিয়ে দিয়ে গেল। রোদ বেশ চড়া। সমস্ত আকাশটাতে কাঁচ বাতাবি লেবুর রঙ। এবং সূর্য বেশ ওপরে উঠে এসেছে। ওরা শীতের দেশের মানুষ, এমন গরম আবহাওয়া সহ্য হওয়ার কথা না। সুতরাং প্রথমেই হাত লাগিয়ে তাঁবু খাটিয়ে ফেলা দরকার। অন্তত রোদের ভয়ংকর তাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

থমপ্সন বলল, রিচার্ড এখানে তবে খুঁটি পুঁতে দিচ্ছি।

রিচার্ড পোড়া চুরুট মুখ থেকে ছুড়ে ফেলে দিল দূরে। সে উবু হয়ে বসে দেখল, তারপর বলল, দাও। আর্চি কি বলে? বলে সে আর্চির দিকে তাকাল।

জেনিফার কোথায় যাচ্ছে! অচেনা জায়গায় জেনিফার একা একা এতদূরে হেঁটে যাচ্ছে কেন! মাথাটা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে! আর্চি, রিচার্ডের দিকে না তাকিয়েই বলল, আমার ভাই কিছু বলার নেই। সব কেমন গোলমাল ঠেকছে, শেষে কিছু হলে বলবে, তুমিইতো বলেছিলে! আর্চি এ-সব বলে রিচার্ডকে এড়িয়ে যেতে চাইল।

রিচার্ড বলল, জল এখানে গড়াবে ভালো। বৃষ্টি হলে জল আটকাবে না। এ-অঞ্চলে দ্বীপগুলোতে পোকামাকড়ের খুব উপদ্রব। আরো ওপরে তাঁবু খাটানো যেত। কিন্তু ঝোপ জঙ্গলের ভেতর কীট পতঙ্গের বসবাস বেশি।

থমপ্‌সন কারো কথার ওপর ভরসা না করে ঠাস ঠাস করে খোঁটায় বাড়ি মারতে থাকল। প্রায় দশটা খোঁটার দরকার। মাঝখানে লম্বা খুঁটি, চারপাশে মজবুত দড়ি দিয়ে খোঁটায় তাঁবু বেঁধে ফেলল। যে কোনো সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে বেশ টেকসই মনে হচ্ছে এখন তাঁবু দুটো। এবং রোদে পুড়ে যাচ্ছিল শরীর। আর্চির রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু জেনিফার কেন যে এত দুঃসাহসী হয়ে উঠছে! সে ডাকল, জেনিফার!

জেনিফার বলল, আসছি।

—একা একা অতদূর যাবে না।

—আচ্ছা। বেশ দূর থেকে জেনিফার কথা বলছিল। আশ্চর্য রকমের একটা ধ্বনি উঠছে। প্রতিধ্বনি বাজছে দ্বীপের কোনো গোপন গুহায়। গলার আওয়াজে গোটা দ্বীপটাই গম গম করছে। আর্চি ভয়ে সামান্য আড়ষ্ট হয়ে গেল।

—তুমি আর যাবে না! আর্চি বেশ জোর গলায় বলতে চাইল।

—যাচ্ছি—না—আ।

—ফিরে এ—স—অ।

তখন থমপ্‌সন হাত ঝেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকে গেল। তাড়াতাড়ি ক্যাম্পখাটে জেনিফারের শোবার জায়গা করে ফেলল। ওদের তাঁবুতে তিনটে আরও ক্যাম্পখাট পেতে দেখল ঠিক আছে কিনা। রিচার্ডকে ডেকে বলল, দ্যাখো ঠিক আছে কিনা?

আর্চি দৌড়ে এসে তখন বলল, থমপ্‌সন আপনি কি!

থমপ্‌সন বুঝতে না পেরে বলল, কেন বেশতো হয়েছে।

—জেনির তাঁবুটা এত দূরে করলেন কেন?

—খুব দূর কোথায়! রিচার্ড থমপ্‌সনের হয়ে কথা বলল।

—বেশ দূর। জেনি ভয় পাবে।

—তুমি যে কি আর্চি! এত ভয়ের কি!

তাঁবুর ভেতর আর্চি দাঁড়িয়ে কথা বলতেও স্বস্তি পাচ্ছে না। জেনিফার যদি আরও এগিয়ে যায়, তবে ঠিক ভয়ংকর কিছু একটা ঘটে যাবে। সে বলল, দ্যাখো, যা ভালো মনে করো করবে। বলে, বের হয়ে যাবে এমন সময় রিচার্ড বলল, সেই প্রথম থেকে জালাচ্ছে। কে আসতে বলেছিল, কেউ তো মাথার দিব্যি দেয়নি।

আর্চি বলল, বুঝবে না। বুঝবে না হে ছোকরা। তোমার বোনের মাথা ঠিক থাকলে আসতাম না। এখন দেখছি তোমাদের সবারই মাথা খারাপ। ঠিক আছে, দেখি আবার কোথায় গেল, বলে আর্চি তাঁবুর বাইরে বের হয়ে দেখল, জেনিফার কাছে কোথাও নেই। সামনে কিছু কাটা ঝোপ, তারপর কিছু গাছপালা, যে কোনো সময় যে কেউ হাতে তুলে ভেতরে টেনে নিয়ে যেতে পারে। সে প্রায় দৌড়াতে থাকল। বালিয়াড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যেতে থাকল।

থমপ্‌সন হাসল সামান্য। বলল, বুঝলে!

রিচার্ড একটা চার্ট বের করে দেখছে তখন। আসলে দ্বীপে তারা ঠিক ঠিক মতো আসতে পেরেছে কি না, এটাই সেই দ্বীপ কিনা যদি না হয়, বোটে পাশের কোনো দ্বীপে খুঁজতে হবে ক্যাবটকে। সে খুব নিবিষ্ট মনে ঝুঁকে চার্ট দেখছিল।

থমপ্‌সন বলল, কি বুঝলে?

রিচার্ড বলল, জেনি গেল কোথায়?

—কোথায় আবার যাবে। কখন বোটে নামিয়ে দিয়েছে তুমি, বোঝও না।

—অঃ। বলে রিচার্ড ফের চার্ট দেখতে দেখতে বলল, মনে হয় আমরা ঠিকই এসেছি।

—আমার দেখা আছে। তোমরা এখন দ্যাখো। থমপ্‌সন যেহেতু সব চেয়ে বয়স্ক মানুষ, সেজন্য বেশ ধীর স্থির। এবং প্রায় ওর ওপরই ভার আছে সব দেখে শুনে রাখার। সে আছে বলেই জেনিকে ওর বাবা নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু সেই সুদূর কার্ডিফ থেকে আর্চির ভাবসাব, সেই সব। জেনিফারের জন্য উদ্‌বিগ্ন হবার অধিকার তারই আছে। থমপ্‌সন বাচাল নয় বলে, খুব একটা ধমকও দিতে পারে না। তা ছাড়া কর্তার মেয়ের হবু বর। সুতরাং সে চুপচাপ আর্চির বাড়াবাড়ি সহ্য করে যাচ্ছে।

এই যেমন তাঁবু আর একটু কাছে হলে খুবই লাগোয়া হয়ে যেত। জেনিফার সেটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে না। জেনিফারকে বললে, এমন ধমক লাগাবে, যে থমপ্‌সন না হেসে পারবে না। বেচারা!

রিচার্ড বলল, তা হলে এ-দ্বীপটা থেকেই আমাদের কাজ শুরু হবে বলছেন!

—তাইতো হওয়া উচিত। বলে সে ঝুঁকে চার্টের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। খালি গা। খাকি হাপ-প্যান্ট, সাদা কেড্‌স পরে যতটা পারা যায় হাল্কা হয়ে নিয়েছে থমপ্‌সন। এমনিতেই গোলগাল মানুষ, মাথায় বড় চকচকে টাক ব্যতিরেকে বড় কোনো সম্বল নেই। তার কাজকর্মেও কোনো অবহেলা থাকে না। সে বেশ ধীরে সুস্থে ভেবেই ঠিক করেছে সব। সে বোট থেকে একটা পেটি তুলে আনল। টুকিটাকি সব জিনিসে ভর্তি। পেনসিল, কম্পাস, ব্লেড, রাবার, টুথপেষ্ট; ব্রাস এবং নীলরঙের কাগজ। সে একটা পেনসিল তুলে কমপাসের কাঁটা সেট করে বোঝাল, দেখ না, ফানাফুতি থেকে এ-দ্বীপটার দূরত্ব প্রায় একশ ছ'মাইলের মতো। এই দ্যাখো বলে আবার কমপাসের কাঁটা ঘুরিয়ে বলল, এলিস দ্বীপটাও পড়ছে এর ঠিক সরলরেখার ভেতর। কিছু হেরফের বুঝতে পারছ?

রিচার্ড একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে ভাল করে চার্টটা পেতে দিল। যদি কিছু সংশয় থাকে তবে ভালভাবে তা নিরশন করে নেওয়া ভাল।

থমপ্‌সন বলল, তোমরা দেখছি সবাই খাওয়ার কথা ভুলেই যাচ্ছ। এসব নিয়ে বিকেলের দিকে বসলে ভাল হত না! ওদিকে তো ওনি কপাল থাবড়াচ্ছে বোধ হয়।

রিচার্ড চার্ট-ম্যাপ মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল ওরা ঠিক জায়গাতেই এসে পৌঁছেছে। অস্ট্রেলিয়ার নিউ-ক্যাসেল থেকে উত্তর-পূবে তের দিনের দিন এখানেই কোথাও ঘটনাটা ঘটেছিল। উনিশশো বাহান্ন সালের জুনের মাঝামাঝি সময় সেটা। ক্যাপ্টেনের লগ বুক থেকে আরও জানা যায়, রাত তখন আটটা, ডাইনিং হলে ডিনার সাজানো—সবাই একসঙ্গে খাবার নিয়ম। বিশেষ করে রাতে জাহাজের ক্যাপ্টেন ডিউটি অফিসারদের বাদে অন্য কারো অসময়ে উপস্থিত হতে দেখলে ভীষণ ক্ষেপে যেতেন। প্রথমে খবরটা দিয়েছিল, মেসরুম বয়। স্টুয়ার্ডকে বলেছিল, ওরা নেই। ডাইনিং হলে সবাই হাজির, কেবল সেকেণ্ড-এনজিনিয়ার—চ্যাটার্জী, থার্ড এনজিনিয়ার—এফরাইম ক্যাবট তখনও আসেনি। ক্যাপ্টেন, স্টুয়ার্ডকে খোঁজ করতে বলেছিলেন, স্টুয়ার্ড বলেছিল, ওরা কেবিনে নেই স্যার। ক্যাপ্টেনের মনে হয়েছিল, বোধ হয় এনজিন রুমে বিশেষ কাজে আটকে পড়েছে। তা ছাড়া থার্ডের তো ওয়াচ। কোনো কারণে সেকেণ্ডেরও ওয়াচ শেষ করে উঠে

আসতে দেরি হচ্ছে। সুতরাং খেয়ে দেয়ে নির্ভাবনায় উঠে গিয়েছিলেন ওপরে। তিনি বুঝতেও পারেননি ইতিমধ্যে যা ঘটার ঘটে গেছে।

রাত দশটায় জাহাজ শেষ পর্যন্ত থামিয়ে দিতে হয়েছিল। না নেই, একেবারেই নেই।

সব খুঁজে দেখা হয়েছিল। এনজিন রুম, বয়লার-ঘর, বাংকার, পুপ-ডেক, ফরোয়ার্ড-ডেক, কেবিন এমন কি কুদের আস্তানায়। সবাই ছুটোছুটি লাগিয়েছিল। ওয়াচে নেই, ব্রীজে নেই, তবে কোথায়! ক্যাপ্টেন, অফিসাররা ছুটোছুটি লাগিয়েছে। এবং উদবিগ্ন চোখেমুখে ওরা সর্বত্র খুঁজতে খুঁজতে যখন পেল না, জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হল। ঝড় সাইক্লোন কিছু নেই, শান্ত সমুদ্র নীল আকাশ, এমন নয় ঝড়ের দাপটে সমুদ্রের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! তখন ওরা ঠিক কিছু একটা নিজেরাই করেছে। তবু মাথায় এল না কারো, কেন? জাহাজে এমন সব অসংগতি যে একেবারে কখনও না দেখা গেছে তা না। কিন্তু দু-জন একসঙ্গে—মিলেমিশে, যদিও ক্যাপ্টেন লক্ষ্য করেছে, জাহাজে ওরা দু-জন পরস্পরের খুবই কাছকাছি ছিল। বন্দরে বন্দরে ওরা একসঙ্গে বেড়িয়েছে, একসঙ্গে মাতাল হয়েছে, কোনো কঠিন মেরামতি কাজ দু-জন ভাগাভাগি করে সেরে ফেলেছে. তারপর শিস দিতে দিতে দু-জনই একসঙ্গে বন্দরে বেড়াতে বের হয়েছে।

ক্যাপ্টেন লগবুকে আরও লিখে রেখেছিলেন, শেষবারের মতো রাত আটটা নাগাদ জাহাজে তাদের দু'জনকেই দেখা গেছে, বোটডেকে দাঁড়িয়ে থাকতে। দু'জনই যেন দিগন্তে কিছু দেখছে। জাহাজ আর তাদের তবে কি ভাল লাগছিল না! কিন্তু পাগল না হলে মাঝ দরিয়ায় জাহাজ ছেড়ে কেউ পালায়! অথবা আত্মহত্যা করার বাসনা দু'জনের একসঙ্গে হয় কি করে! ক্যাপ্টেন সারারাত সার্চ-লাইট জ্বালিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিলেন। বোট নামিয়ে দিয়েছিলেন, যতদূর দেখা যায় দিনের বেলায় দূরবীনে, এবং অহোরাত্র সার্চ-লাইট জ্বালিয়েও যখন কিছু করা গেল না, তখন জাহাজীদের সাক্ষী রেখে লগবুকে রহস্যজনক অন্তর্ধানের কথা লিখে রেখেছিলেন। লগবুকে তার অনুসন্ধানের এক বিরাট ফিরিস্তি পর্যন্ত দেওয়া আছে। সে-সব রিচার্ড বোধ হয় আর স্পষ্ট মনেও করতে পারে না। ছ'বছর আগে সেই নিষ্ঠুর রহস্যজনক অন্তর্ধানের খবরের সঙ্গে লগবুক ফিরিস্তির নকল পেয়েছিল একটা। নকলটাও সঙ্গে আছে তাদের। জেনির ব্যক্তিগত সুটকেসে সেটা সে রেখে দিয়েছে। কখন কি কাজে লেগে যাবে ভেবে জেনি কিছুই ফেলে আসেনি।

এ-নিয়ে প্রথমে দু'দেশের কাগজে বিস্তর হৈ চৈ হয়েছিল। তারপর যা হয়ে থাকে ধার্মিক নাগরিকেরা অন্য অনেক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, পুরোনো কথা বেশিদিন মনে থাকে না। রিচার্ড এবং তার বাবা ভেবেই ফেলেছিল ক্যাবট আর ফিরে আসবে না। কেবল জেনি তখন বলত, না বাবা তোমরা এমন বল না। সে আসবে। সে ঠিক আসবে।

পরিবারে, প্রথম দিকে বছর দুই ক্যাবটের কথা কোনো প্রসঙ্গে উঠলেই জেনি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলত। পরিবারে জেনির এই শোকে সান্ত্বনা দেবার মতো কিছু ছিল না। জেনি তখন নানাভাবে খবর নিয়েছে, কখনও জাহাজঘাটায় গিয়ে বসে থেকেছে, কখনও একা কার্ডিফ ক্যাসেলের পাশে বসে ক্যাবটের স্মৃতিতে বিভোর হয়ে গেছে। জেনি ধীরে ধীরে তারপর ভেবেই ফেলেছিল, ক্যাবট আর ফিরে আসবে না। মিঃ আর্চি নামে সঙ্গের ভদ্রলোকটি সেই সুযোগে মেলামেশা করতে পছন্দ

করছে। জেনি মন স্থির করতে পারছিল না। সে আর্চির কাছে আরো সময় চেয়ে নিচ্ছিল। ক্যাবট অথবা ওর বন্ধু, মিঃ চ্যাটার্জীর এমন রহস্যজনক অন্তর্ধান সে প্রথম থেকেই অবিশ্বাস করে আসছিল।

আসলে সে ক্যাবটকে দারুণ ভালবেসে বিয়ে করেছিল। ভালবাসা বললে ঠিক হবে না, সে ক্যাবটকে গীর্জার ছায়ায় যখন দেখেছে, যখন দেখেছে গাছের নিচে অথবা ক্যাবট যখন যে ভাবে হেঁটে গেছে, কি বড় রাস্তায়, কি বড় মাঠে, সর্বত্র ক্যাবেটের ভেতর ছিল রাজার মত একভাব। সে ক্যাবটকে সব কিছুর বিরুদ্ধে হেঁটে হাতের নাগালে পেয়েছিল। একজন সামান্য নাবিককে বিয়ে করবে ভাবতেই যেন ঘটনাটা ভীষণ অহমিকাতে লেগেছিল জেনির বাবার। জেনি তখন বলত, আমি মরে যাব বাবা, তবু ক্যাবটকে না ভালবেসে পারব না।

## দুই

আর্চি তখন বালিয়াড়ির শেষ প্রান্তে এসে গেছে। কিছু ঝোপ ঝাড় সামনে। জেনিফার কাছে কোথাও নেই। সে কেমন ব্যাকুল হয়ে পড়ছিল। ডাকল, জেনিফার তুমি কোথায়?

কেউ সাড়া দিচ্ছে না। ঝোপঝাড় পার হয়ে গেলে সেই বনভূমির গাছপালা। কিছুটা অভ্যন্তরে ঢুকে ডাকল, জেনিফার জবাব দিচ্ছ না কেন।

আর তখনই জেনিফারকে দেখা গেল। কিছুটা বিরক্ত। এক মুহূর্ত কাছ ছাড়া করতে চায় না। কিসের আকর্ষণে আর্চি এমন করে কে জানে। বাইরে এসে বলল, কি হয়েছে!

—কোথায় গেছিলে!

—কোথায় আবার যাব। এখানেই তো ছিলাম।

—ডাকছি, সাড়া দিচ্ছ না।

—আর্চি তুমি এত অবুঝ কেন বলত। আমি মানুষ না!

আর্চি কি ভেবে সামান্য লজ্জা পেল। —ও আচ্ছা। এবং মনে পড়ে গেল, জেনির তাঁবুর কাছাকাছি একটা বাথরুম করা দরকার। একটা বাড়তি তাঁবু আছে। তাঁবু-টাকে বাথরুমের কাজে লাগানো যায় কিনা দেখতে হবে। তা না হলে এতদূরে আসা জেনির পক্ষে খুবই কষ্ট হবে। সে জেনিফারকে বলল, বালি তেতে উঠেছে। সাবধানে এস।

জেনিফার আর্চিকে ফেলেই দৌড় লাগাল। ঠিকমতো দৌড়াতে পারছে না। বালিতে পা ডেবে যাচ্ছে। আর্চি ছুটে এসে হয়ত হাত ধরে সাহায্য করতে চাইল। জেনিফার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, আমি পারব, ধরতে হবে না।

এবং সে আর্চির চেয়েও দ্রুত চলে এল তাঁবুর কাছে। রিচার্ড এবং থমপ্সন বোট থেকে সব পেটি টেনে নামাচ্ছে। অধিকাংশ পেটিতে আছে রান্নার জিনিসপত্র, কর্নড বিফের বড় বড় টিন। আলু টমাটো আপেল, দুটো পেটিতে পুরনো দামি মদ। বাধাকপি, ফুলকপি সামান্য এনেছে। শসা, কমলালেবুর পেটি দুটো জেনিফারের কেবিনেই রেখে দেওয়া হল। থমপ্সন জেনিফারকে ডেকে বলল দেখে নাও। ঠিক আছে কিনা দেখে নাও। অসুবিধা হলে বল।

জেনিফার ওর তাঁবুর ভেতর ঢুকে ভারি খুশি হয়ে উঠল। কত অল্প সময়ে

থমপ্‌সন সব হাতের কাজ সেরে ফেলেছে। হালকা ক্যাম্পখাটে সুন্দর বিছানাটাও পাতা। এ-সব কাজ এসে সেই করবে ভেবেছিল। ঘর সংসার গুছিয়ে বসার দায়িত্বটা তারই থাকা উচিত। কিন্তু থমপ্‌সন পরিবারের পক্ষে কত প্রয়োজনীয়, তার এই কাজটুকু না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ঘেমে নেয়ে গেছে। পিঠে বেশ ঘামাচি উঠে গেছে। দুটো একটি ফোঁড়া পর্যন্ত গরমে বের হয়েছে। জেনিফার এবার কিছুটা শাসনের গলায় বলল, আপনি একটা কিছু গায়ে দিন। গাতো আপনার রোদে পুড়ে যাচ্ছে।

—পারা যাচ্ছে না। সে বলতে চাইল, গরমে জামা শরীরে রাখা যাচ্ছে না। গেঞ্জিও না। এই বেশ। এখন সব চেয়ে জরুরী, স্নান কোথায় করা যাবে? সমুদ্রের জলে আর স্নান হয় না। এবং আরও সব দরকারী কাজটাজ না সেরে সে বিশ্রাম নেবে না। যেহেতু জেনিফার এই প্রৌঢ় মানুষটিকে শিশুবয়স থেকে দেখে আসছে—ভারি বিশ্বস্ত, কিসে অসুবিধা মুখ ফুটে না বললেও টের পায়, সেজন্য সে আর বেশি কিছু বলতে সাহসই পেল না। তার তখন থমপ্‌সনের বিশ্বস্ততা দেখে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আর্চিকে দেখেই রিচার্ড হেঁকে উঠল, হাই!

আর্চিও হাত তুলে দিল।

—পেলে?

ঠাট্টা করছে বুঝতে পেরে কিছু বলল না আর্চি।

— হারিয়ে যায়নি তো?

—ঠাট্টা কর না রিচার্ড। কপালে কি আছে আমরা কেউ যখন কিছু বলতে পারছি না—।

রিচার্ড বলল, হাত লাগাও। অত ঘুরে বেড়ালে চলবে না।

আর্চি বলল, আমাদের আরম্‌স ঠিক আছে তো!

লোকটা কি!

খুব কাছে থেকে রিডার্চ আর্চিকে এই প্রথম লক্ষ্য করছে। আগে মাঝে মাঝে দেখেছে। জেনিফার কখনও আর্চিকে চায়ের টেবিলে নেমতন্ন করেছে। ব্যাস ঐ পর্যন্ত। ঠিক ঠিক কি ধরনের মানুষ আর্চি এই প্রথম টের পেল রিচার্ড। খুব স্বার্থপর মনে হচ্ছে। যেন সে এখানে বেড়াতে এসেছে। অথবা সব সময় জেনিফার কোথায় যায় কি করে, হারিয়ে না যায়, এসবই লক্ষ্য রাখাই কাজ তার। অথচ এমন একটা অভিযানে সব সময় সব কাজ মিলেমিশে না করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এটা কেন যে টের পায় না আর্চি।

আর্চি তখন সত্যি ফায়ার আর্মসের পেটিটা খুঁজছে। সে বোটে উঠে গেছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। না পেয়ে লাফিয়ে নিচে নেমেছে। দৌড়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকে এটা ওটা টেনে সরিয়ে দেখছে। না দেখে কেমন ঘাবড়ে যাচ্ছে। পেটিটা ভুলে জাহাজেই থেকে গেল নাতো আবার! এদের দুঃসাহসিকতা থাকতে পারে, তার নেই। সব সময় সতর্ক থাকা দরকার। যদি এখনই কোনো কিছু ঘটে যায় তখন কি হবে। সে বাইরে এসে দেখল, তাঁবুর ছায়ায় রিচার্ড ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে। চুরুট খাচ্ছে। ওর মুখ চোখ দেখে আর্চি কিছু বলতে সাহস পেল না। গোপনে সে জেনির তাঁবুর পাশে ছুটে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল, জেনি।

—এখন ভেতরে এস না।

—দ্যাখতো তোমার ঘরে ওগুলো আছে কিনা!

—ওগুলো মানে!

—আরে আমার ফায়ার আর্মস। তোমাদের থাকল গেল, আমার আসে যায় না। আমারটা আমাকে দিয়ে দাও।

—এখন ওসব দিয়ে কি হবে?

—কিছু হোক না হোক আমারটা দাও। তোমাদের মতো অবিবেচক হলে আমার একদম চলবে না।

সে বলল, মিঃ থমপ্সনকে বলো! তিনি রেখেছেন।

—ঐ বুড়ো লোকটার জিম্মায় রেখেছ সব! তা হলেই হয়েছে। সে দেখল থমপ্সন উবু হয়ে বোট থেকে আরও কি সব তুলে নিচ্ছে। একটা বড় নোঙর। মোটা হাসিলে বাঁধা। গেরাফিটা সে টেনে এনে বালির ভেতর গেঁথে দিচ্ছে। এবং থমপ্সনকে দেখলেই বোঝা সায় কত সতর্ক সে সব দিকে।

রোদের ভেতর ঘোরাও যাচ্ছে না। সার্ট প্যাণ্ট ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। জুতোর ভেতর বালি ঢুকে কচকচ করছে। এমন একটা বিশ্রী অবস্থায় পড়তে হবে সে সত্যি ভাবতে পারেনি। তাঁবুগুলো আরও ওপরে নিয়ে গেলে কি যে ক্ষতি ছিল! তারপরই মনে হল, না ধন্যবাদ থমপ্সনকে। অত ওপরে যাওয়া ঠিক হবে না। খুব অসুবিধায় পড়লে মুহূর্তে বোট জলে ভাসিয়ে দেওয়া যাবে। কিছুতেই নাগাল পাবে না. বুড়ো থমপ্সনের ওপর সে মনে মনে খুশী হয়ে উঠল। মনে মনেই থমপ্সনের বুদ্ধির তারিফ করল। খুলে বললে পায়া ভারী হতে কতক্ষণ! সে কাছে গিয়ে বলল, মিঃ থমপ্সন, আপনার জানা আছে আর্মসগুলো কোথায়?

—ঐতো। বলে বোটের এক কোনায় কাঠের একটা বাকস দেখিয়ে দিল।

এদের নির্বুদ্ধিতার শেষ নেই। মনে মনে ফের চটে গেল। প্রথমেই যা করা উচিৎ, সযত্নে তুলে রাখা এটা। সব সময় নজর রাখা। অনায়াসে কোনো দুর্বৃত্ত যদি নিয়ে নেয় তখন হাত কামড়ালেও কিছু হবে না। সে না বলে পারল না, না আপনাদের দিয়ে কিছু হবার যো নেই। বলেই লাফিয়ে উঠে পড়ল ওপরে। তারপর টেনে নামাতে গেলে থমপ্সন বলল, একা পারবে না আর্চি। একটু থামো। আমি ধরছি।

সে থমপ্সনের কোনো কথা গ্রাহ্য করল না। ডালা খুলে ৎর নিজেরটা বের করে নিল। কিছু কার্তুজ তুলে নিল। এবং অসভ্যের মতো কার্তুজ পুরে বন্দুক ছুড়তে থাকল হাওয়ায়। রিচার্ড, জেনি দৌড়ে এসে আর্চির পাগলামি দেখে থ! কি বলবে বুঝতে পারছে না। জেনি না পেরে বলল, আর্চি তোমার কি মাথা খারাপ!

—আমার থোড়াই মাথা খারাপ। যদি মাথা খারাপ হয় তোমাদের। খুব গম্ভীর গলায় বলল, বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু আছে! ওটা ওখানে এ-ভাবে ফেলে রেখেছ, তোমরা কি মনে কর না কিছু একটা হয়ে গেলে দায়িত্ব কার ওপর বর্তাবে! তোমার বাবাকে কি বলব তখন!

জেনি তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসায় পায়ে কিছু পরে আসতে পারেনি। বালি তেতে গেছে বলে সে পাও রাখতে পারছে না। লাফিয়ে বোটে উঠে গেল এবং বলল, রাখো সব। তুমিই দেখছি সবার মাথা খারাপ করে দেবে।

রিচার্ড গম্ভীর গলায় বলল, কথা নেই বার্তা নেই দিন দুপুরে ছেলেমানুষের

মতো বন্দুক ছুড়ছ।

আর্চি খুব আত্মবিশ্বাসের গলায় বলল, আরে বোঝো না কেন! গোলাগুলি ছুড়ে বুঝিয়ে দিলাম, আমরা খুব একটা অসহায় নই। বরং বলতে পারো ওয়ার্নিং। ওয়ার্নিং টু দ্যাট বাগার্স।

থমপ্‌সন কিছু বলল না। সে তার মতো কাজ করে যেতে থাকল। রিচার্ড বলল, জেনি তুমি সামলাও। আমরা কিছু জানিনা।

জেনি বলল, আর্চি বন্দুক রেখে দাও। ছেলেমানুষী কর না।

আর্চি অবোধ বালকের মতো তাকিয়ে থাকল।

—বলছি রেখে দাও।

আর্চি গুটিসুটি হয়ে বসল। তারপর রেখে দিল।

—নেমে এস।

আর্চি নেমে গেল।

আর্চি খুব আদুরে ছেলে। অনেক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। এবং বাবার খুব পছন্দ আর্চিকে। এমন বিনয়ী ছেলে আজকাল খুব কম দেখা যায়। ওর চেয়ে বাবার বেশি পছন্দ। ওর যে খুব পছন্দ না, তা নয়, কারণ আর্চি সত্যি বিশ্বস্ত, ভালমানুষ, সামান্য ভীতু স্বভাবের আর যেটা সব চেয়ে বড় দোষ, জেনিকে দেখলে পাগলের মতো আবোল তাবোল বকে। সবই অবশ্য ভালবাসার কথা। একবছর নেহাত কম সময় নয়। এক বছর ধরে আর্চিকে বেঁধে রেখেছে। কিছুই দেয়নি প্রায়, এবং সে শেষবারের মতো তার ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে এসেছে এখানে। জেনির প্রতি কত বিশ্বস্ত তার প্রমাণ রাখতে চায় যেন।

আর্চি বলল, ঠিক আছে রেখে দিলাম। কিছু ঘটলে আমি দায়ী থাকব না বাপু।

রিচার্ড মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে বলল, তোমাকে কেউ দায়ী করবে না। যত সব বাজে ব্যাপার।

আর্চি এবার হেড়ে গলায় চিৎকার করে উঠল, বাজে ব্যাপার কে বলেছে ক্যাবট! এখানে আছে। কোনো জলদস্যুর যে এটা আস্তানা নয় তার প্রমাণ তোমাদের হাতের কাছে আছে? কি জবাব দিচ্ছ না কেন? তোমার ক্যাবট কবে মরে ভূত হয়ে গেছে!

জেনি দু' চোখ ঢেকে বলল, দোহাই আর্চি আর তাকে অসম্মান কর না। এটাই শেষ বারের চেষ্টা। তুমি ভালো হয়ে যাও আর্চি।

ক্যাবটের কথা মনে হলেই জেনি খুব বিষণ্ণ হয়ে যায়। তখন একা একা থাকতে তার খুব ভাল লাগে। অথচ তার পাশে ছায়ায় মতো আর্চি। তাকে কিছুতেই একা থাকতে দিচ্ছে না। অন্ততঃ এখানে আসার আগে আর্চি সঙ্গে আসুক সে মনে মনে চায়নি। বাবাকে বলে, জোর করে আর্চি দলের সঙ্গে এসেছে। আর্চি তাকে কিছুতেই একা থাকতে দিচ্ছে না। একা কোথাও ছেড়ে দিচ্ছে না। সে আর্চির কাছে কেবল সময় চাইছিল।

জেনির আশা ছিল, আরও কিছু দিন পার করে দিতে পারলেই ক্যাবটের কথা ভুলে যাবে। ক্যাবট আর ওর মনপ্রাণ জুড়ে থাকবে না। ইদানীং মনেও হয়েছিল সে ধীরে ধীরে ক্যাবটকে ভুলে যাচ্ছে। ক্যাবটের কথা আর তেমন মনে হচ্ছে না। সে নাচ-ঘরে আর্চির সঙ্গে বেশ দু' চার দিন জোর নেচেছিল পর্যন্ত। সে ফের দ্রুত

গাড়ি ছোটাতে পারছিল। সে কখনও কখনও পাল্লা দিয়ে মদ খেয়েছে ক্যাবটকে ভুলে থাকার জন্য। এখন আর তত খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে কিছুতেই আর হেরে যাচ্ছে না। ঠিক তখনই কিনা কোনো এক বিখ্যাত পত্রিকার সংবাদ-বিচিত্রায় উত্তর-জাভার সংবাদদাতার পর পর কিছু খবর তার নাওয়া খাওয়া সব বন্ধ করে দিল।

পত্রিকার খবর, ফানাফুতির দক্ষিণে যে সব নির্জন দ্বীপ, যেখানে মানুষের কোনো বাস নেই, যেখানে অভিযাত্রীরা বার বার ঘুরে এসেছে এবং দেখেছে—দ্বীপের পর দ্বীপ, নানারকম পাথর, গাছপালা, ফুল ফল, কচ্ছপ শংখ মাছ এবং নানা বর্ণের প্রজাপতি, সেখানে একজন মানুষ কখনও কখনও একটা উঁচু পাথরের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে। আদিগন্ত সমুদ্র, নীল জল, এ্যালবাট্রস পাখি দেখতে দেখতে সে কখনও বুঝি মুগ্ধ হয়ে যায়। তখন খেয়াল থাকে না তার, অনেক দূর থেকে যে সব জাহাজ গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় অথবা যে সব জাহাজ অস্ট্রেলিয়ার উপকূল থেকে, নেরু, কাকাতিয়া ওসানিক দ্বীপপুঞ্জে ফসফেট আনতে যায়, তারা দূরবীনে ওকে দেখে ফেলছে। চুল দাড়িতে মুখ ঢাকা তার। শরীরে তার কখনও কখনও পোশাক থাকে না। আবার কেউ কেউ দেখেছে সে পরে থাকে ষোড়শ শতাব্দীর জলদস্যুদের পোশাক। সে চুপচাপ একটা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। কাছে গেলেই সে সামনের দ্বীপমালার ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়। দেখা যায় না আর এবং খুঁজে বের করা যায় না।

তখনই মনে হল থমপ্সন সবাইকে ডাকছে। —এস কিছু খেয়ে নেয়া যাক। তারপর আমাদের কাজ হবে, কোনো জলার সন্ধান খুঁজে বের করা। এখানে এটাই প্রথম জরুরী কাজ আমাদের।

## তিন

থমপ্সন বন্দুক কাঁধে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল।

রিচার্ড তাঁবুর ভেতর থেকে বলল, সঙ্গে গেলে হত না!

—তোমরা একটু বিশ্রাম কর। বেশিদূর যাচ্ছি না। মনে ন কাছে কোথাও পেয়ে যাব।

এরা আসার আগে দ্বীপগুলির ভূ-প্রকৃতি, গঠন এবং পরিবেশ সম্পর্কিত একটা মোটামুটি ধারণা নিয়ে এসেছে। অধিকাংশ দ্বীপগুলোই মৃত আগ্নেয়গিরির মুখ। কোনো কোনোটা প্রবাল দ্বীপ। এবং কোথাও ঠিক প্রস্রবণ অথবা জলাশয় মিলে যাবে। খাবার জল ট্যাংক ভর্তি আনা হয়েছে। এমন একটা গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায় মাঝে মাঝে শরীর ঠাণ্ডা জলে চুবিয়ে নিতে না পারলে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে সবাই। তার সঙ্গে থমপ্সন চায় দ্বীপের ভেতর ঢুকে এর গাছপালা বন্যতা কি রকম গভীর একবার দেখে নিতে।

তখনই মনে হল ও-পাশের তাঁবুটাও নড়ছে। থমপ্সন দেখল জেনি বের হয়ে আসছে। পাতলা কটনের সার্ট পরেছে। কালো. রঙের ট্রাউজার পরেছে। এবং নীল রঙের চশমা চোখে। খাঁ খাঁ রদ্দুরে জেনির বের হওয়া থমপ্সনের পছন্দ নয়। আর্চি খেয়ে দেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন উষ্ণতায় লোকটার ঘুম আসে কি করে! ঘুমিয়ে আছে না, ঘুমের ভান করে পড়ে আছে! রিচার্ড খেপিয়েছিল, আর্চি খেয়ে

দেয়ে একবার ঘুরে এসতো দ্বীপটার ভেতর থেকে। কোথাও কোনো জলাশয়, ঝরণা আবিষ্কার করতে পার কিনা দ্যাখতো। যেতে হবে ভয়েই হয়তো সে নাক ডাকাচ্ছে। কিন্তু জেনি কেন এ অসময়ে! সে বলল, জেনি এই রুদ্দুরে বের হচ্ছ কেন?

—আপনার সঙ্গে যাব ভাবছি।

আর্চি বলল, কে যাবে?

রিচার্ড বলল, তা হলে ঘুমোওনি!

—বাব্বা যা গরম। মানুষ পাগল না হলে মরতে এখানে আসে! তারপরই বেশ গম্ভীর গলায় বলল, জেনি যাবে না।

খুবই অর্থহীন। রিচার্ডের করুণা হয়। জেনি আদৌ গ্রাহ্যই করবে না। এখন যা হবে, যতই রোদ হোক, জেনি ঠিক রওনা হবে।

জেনি বলল, দাঁড়িয়ে আছেন কেন থমপ্সন, চলুন।

জেনি শিকারের সু পরে নিয়েছে। এবং হিপ-পকেটে জেনি রিভলবারটা নিতে ভোলেনি। থমপ্সন বলল, তুমি গেলে আর্চিও সঙ্গে যেতে চাইবে। আমি চাই না তুমি যাও।

—আর্চি যাবে না।

আর্চি মাথায় হ্যাট পরে ছুটে এসেছিল, কিন্তু জেনির শক্ত মুখ দেখে আর কিছু বলতে সাহস পেল না। দাঁড়িয়ে গেল।

থমপ্সন, জেনি ধীরে ধীরে উঠে যেতে থাকল। থমপ্সন হাফ-প্যাণ্ট হাফ-সার্ট পরেছে। মাথায় একটা তালপাতার টুপি। জেনিও তালপাতার টুপি পরে নিয়েছে। আর্চি তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল। যতক্ষণ না ওরা দ্বীপের গাছ-পালার ভেতর হারিয়ে গেল সে চেয়ে রইল।

থমপ্সন বলল, জেনি তোমার কি সত্যি মনে হয় লোকটা ক্যাবট।

—কে তবে হবে বলুন থমপ্সন!

—তা হলে চ্যাটার্জী বলে ওর বন্ধুকেও দেখা যেত। একজন না হয়ে দু'জন হওয়া উচিৎ ছিল।

—এসব কথা আবার নতুন করে উঠছে কেন?

—নতুন করে উঠছে কেন? আমাদের এখানে বিশ বাইশ দিন থাকতে হবে। দ্বীপটা মনে হচ্ছে বেশ বড়। পাঁচ সাত মাইল তো হবেই। তুমি কি বল!

—ভেতরে না ঢুকলে বোঝা যাবে না।

—নতুন করে উঠছে কেন? কারণ আমরা খুব ভেবে চিন্তেই এখানে এসেছি। অনুসন্ধান করে এটা জানা গেছে, এই দ্বীপগুলোর কাছাকাছি ওরা নিখোঁজ হয়েছিল। কিন্তু নিখোঁজ হয়েছিল কেন? যদি নিখোঁজ হয় তবে দ্বীপে এসেই বা থাকবে কেন? দ্বীপে এলে একজনই বা থাকবে কেন? তারা দ্বীপে পড়ে থাকছে কেন?

জেনি হেঁটে যাচ্ছিল, আর গাছপালার ভেতর ক্রমে যেন জড়িয়ে যাচ্ছিল। কোনো রাস্তা নেই। কোথাও বড় বড় পাথর, আবার মসৃণ ঘাসের মাঠ, আবার লতাগুল্মে ভরা কাটা ঝোপ। থমপ্সন ধারাল ছুরি দিয়ে দরকার মতো ডালপালা কেটে সামনে ঢুকে যাবার পথ করে নিচ্ছে। অদ্ভুত সব পাখি, ছোট, আরও ছোট, কোনোটার রঙ হলুদ নীল সবুজ, কোনোটা বেশ বড় এবং চোখ কাচ পোকার মতো

গভীর। থমপ্সন জেনিকে দেখে কেউ কেউ উড়ে পালাচ্ছে। জেনি তখন বলল, আমি কিছুই ঠিক জানি না। তবু লোকটা কে, কেন এখানে একা পড়ে আছে না দেখা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। ওরা যদি ভাসতে ভাসতে দ্বীপে উঠে আসে আর যদি দ্বীপের মায়ায় জড়িয়ে যায়—।

থমপ্সন বলল, একেবারে হাওয়া নেই দেখছ?

—মনে হয় আমরা ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছি।

—আরে ঐ দ্যাখো?

জেনি দেখল, অদ্ভুত পাথরের একটা দেয়াল খাড়া চার পাঁচ ফুটের মতো, লম্বায় কতটা বোঝা যাচ্ছে না। ঝোপ জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে। ক্রমে রাস্তা কেমন অগম্য হয়ে উঠছে। থমপ্সন বলল, বেশিদূর ঢোকা যাবে না। অন্যদিকে দেখা দরকার। ।

জেনি চারপাশে তাকাল। চারপাশের ঝোপ জঙ্গলের ভেতর দৃষ্টি আটকে গেছে। কোথায় এসে পড়েছে ঠিক বুঝতে পারছে না। সে বলল, চিনে ফিরতে পারবেন তো থমপ্সন!

—দেখা যাক।

—প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হেঁটেছি।

—আমরা কিন্তু খুব একটা দূরে আসিনি!

—কি করে বুঝলেন!

—সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছ না।

—ওর কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছে!

—চল বরং ফেরা যাক।

—কিন্তু বলছিলেন, ঝরণা—জলাশয়—।

—আরে দ্যাখো দ্যাখো!

ওরা তখনই দেখল, পাঁচিলের ও-পাশটাতে পাথরের দেয়াল অনেকটা দূরে চলে গেছে।

থমপ্সন জেনিকে দেয়ালের ওপর টেনে তুলল। একটা ফুট তিনেক চওড়া ফিতার মতো পাঁচিলটা দ্বীপের গভীরে চলে গেছে মনে হচ্ছে।

থমপ্সন বলল, পারবে হেঁটে যেতে?

—হ্যাঁ পারব।

—মনে হয় অনেকটা দূরে যাওয়া যাবে। কেমন লম্বা সাঁকোর মতো মনে হচ্ছে না!

কিছুটা এসেই হঠাৎ জেনি চিৎকার করে উঠল, ঐ দ্যাখুন কি দেখা যাচ্ছে!

অনেক দূরে একটা মানুষের মতো। থমপ্সন বলল, আমরা কি ওপরে উঠছি? দূরবীনটা নিয়ে এলে না কেন? এবং ভাল করে দেখে বুঝল, ওটা আর কেউ নয়, আর্চি।

থমপ্সন বুঝল জেনি ক্যাবটের কথা ভাবতে ভাবতে মাথা গোলমাল করে ফেলছে। সে বলল, জেনি আর্চি তাঁবুতে থাকতে ভরসা পায়নি। পিছু পিছু চলে এসেছে। দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারছ না। ভাল করে লক্ষ্য কর।

জেনি কেমন সত্যি লজ্জা পেল। বলল, বুঝলেন বাবা কত বড় ভুল করেছে!

—এখন বুঝতে পারছি। চল আমরা পাঁচিল থেকে নেমে পড়ি। তবে আর

দেখতে পাবে না।

পাঁচিলের দু-পাশ সাত ফুট গভীর। কোথাও আরও বেশি। থমপ্সন একটা লতা ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর লতাটা ছুড়ে দিয়ে বলল, দ্যাখো, পারো কিনা! আর তখনই মনে হল, একপাল খরগোশ ফর ফর করে পাঁচিল টপকে চলে যাচ্ছে। আশ্চর্য সবই সাদা খরগোশ। এবং দেখল মাথার ওপর সব বড় বড় গাছের ডাল সূর্যালোক ঢুকতে দিচ্ছে না। কেমন ঠান্ডা। এবং গরম আদৌ আর তীব্র নয়।

থমপ্সন বলল, কি দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? পারছ না।

—দাঁড়ান দেখছি। বলে সেও ঝুলে নেমে গেল থমপ্সনের পায়ের কাছে। এবং মনে হচ্ছে কোনো একটা রাস্তার মতো সামনে। কেউ যেন হেঁটে যায়। থমপ্সন নুয়ে কি যেন তুলে দেখল। কতকালের শুকানো পাতা, মরা ডাল, পাখির মল পচে ভারি উর্বরা এবং দেয়ালের খাঁজে খাঁজে সে দেখতে পেল, সমুদ্র পাখিদের ডিম। থমপ্সন বলল, দেখছ, প্রকৃতির কি করুণা। দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে সব ডিম দেখছ।

জেনি কেমন বালিকার মতো দুটো ডিম তুলে দেখল সন্তর্পণে। আবার জায়গা মতো রেখে বলল, থমপ্সন কি সুন্দর দেখতে ডিমগুলো। আর তখনই ফের জেনির চিৎকার। থমপ্সন দ্যাখুন, ওটা কি! বলের মতো। নড়ছে। আঁশ বড় বড়।

থমপ্সন বলল, জেনি ওটা প্যাংগোলিন। বুঝতে পারছ না। ভয় পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। বলেই থমপ্সন, ওটার গায়ে পা দিয়ে সামান্য ঠেলা দিতেই শুয়োর ছানার মতো ছুটে পালাল। তারপর থমপ্সন বলল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সামনে দেখছ, কত বড় একটা টিলা।

—ওটার ওপরে উঠে দেখি না!

—পারবে না ভীষণ খাড়া।

—জেনি কেমন জেদি হয়ে পড়ছে। সে বলল পারব। আপনি আমার সংগে আসুন। যতটা পারা যায় দেখতে ক্ষতি কি।

প্রথমে কিছুটা বেশ ভালভাবেই ওঠা গেল। কতকালের শ্যাওলা পাথরের গায়ে। শ্যাওলায় পা রাখা যাচ্ছে না। পিছলে যাচ্ছে। জেনি, থমপ্সনের কাছ থেকে ছুরিটা চেয়ে নিল, যেখানে একদম পা রাখা যাচ্ছে না চেচে ফেলল। তারপর আরও ওপরে ওঠার জন্য সে কেমন মরিয়া হয়ে গেলে থমপ্সন বাধা না দিয়ে পারল না।—ওঠা যাবে না। কাল আমাদের তৈরী হয়ে আসতে হবে। জেনি পাগলামী করার সময় এটা নয়। ভেবে চিন্তে সব কাজ করতে হবে।

জেনি বলল, টিলার মাথায় উঠে যেতে পারলে অনেকটা দেখা যেত দ্বীপের। তাছাড়া ঐ যে দিগন্তে দেখছেন মেঘের মতো একটা পাহাড়, ওটা কি দ্বীপের ভেতর আছে বলে মনে হয়!

থমপ্সন দেখতে পাচ্ছিল না।

জেনি বলল, এখানে আসুন, দেখতে পাবেন।

পা টিপে টিপে থমপ্সন এগিয়ে গেল। দিগন্তে চোখ তুলে দেখতেই থমপ্সন হেসে ফেলল। ওটা তুমি বুঝতে পারছ না কি! বলে নেমে জায়গা মতো ঠিক হয়ে দাঁড়াল। ওটা সমুদ্র। কখনও সমুদ্র দূরে থেকে নীল পাহাড়ের মতো দেখায়।

জেনি আবার দেখল। বার বার সে এত ভুল করছে কেন! সে চোখ মুছে দেখল, স্থির গম্ভীর সেই উদাস নিরেট নীল শূন্যতা সত্যি সমুদ্র। গাছপালার

ফাঁকে মনে হয় দ্বীপের দিগন্তে পাহাড়। সে বলল, বেরিয়ে পড়লে কত রকমের অভিজ্ঞতা হয় থমপ্সন। না দেখলে তো এ-সব বিশ্বাস করা যায় না। দ্বীপটা কি সত্যি মায়াবী! দ্বীপে ঘুরতে ঘুরতে কি কোনো ঘোরে পড়ে যেতে হয়! সে কেমন সামান্য ভয় পেয়ে বলল, আমি কিন্তু থমপ্সন বুঝতে পারছি না দ্বীপের কোথায় আছি। মাথার ওপর ডালপালা নিয়ে একটা মরা গাছ। যেন এই সেদিন গাছটা মরে গেছে। বজ্রপাতের জন্য হতে পারে। অথবা মনে হয় প্রকৃতির কোনো নিপুণ কারিগর গাছটার পাতা, ছাল সব তুলে নিয়ে গেছে। এটা কি গাছ! বেশ সুন্দর গন্ধ। দারুচিনি গাছটাছ হবে নাতো! সে বলল, থমপ্সন একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন!

থমপ্সন বলল, সামনের গাছটার কথা বলছ!

—হ্যাঁ

—গাছটা কোনো মরা গাছ। তুমি কি ভাবছ?

—দারুচিনি গাছ নয়তো!

—দারুচিনি অত বড় হয় না।

—কিন্তু কি সুন্দর গন্ধ কাঠে।

—চন্দন জাতীয় গাছটাছ হবে। বলে থমপ্সন গাছটা শুঁকে বলল, চল, আর আজ এগুনো ঠিক হবে না। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। কাজের কাজ কিছুই হল না।

ফেরার সময় থমপ্সন ফের সেই জায়গাটায় উবু হয়ে কি দেখল। বনের ভেতর একটা অস্পষ্ট রাস্তার মতো। বলল, কাল, ওদিকে না গিয়ে, দেখছ বলে, মাথা সোজা করে দিল জেনির। মনে হচ্ছে না, কারো চলাচলের এটা পথ।

জেনি বলল, চলুন না একটু এগিয়ে দেখা যাক।

থমপ্সন বলল, সাহস পাচ্ছি না। কোথায় নিয়ে যাবে পথটা কে জানে।

জেনি বলল, আমি তো আছি।

থমপ্সন হাসল জোরে।—সত্যি তুমি যে আছ ভুলেই গেছিলাম। মেয়েটার সোনালী চুল, নীল চোখ, আশ্চর্য মায়াবী মুখের দিকে তাকিয়ে থমপ্সনের ভারি কষ্ট হল। ক্যাবটকে কতটা ভালবাসে জেনিকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না তবু থমপ্সন শেষ পর্যন্ত জেনির কথায় রাজি হতে পারল না। তার বিচার-বুদ্ধিতে এই রাস্তাটার কোনো কূট রহস্য থাকতে পারে, আবার সাধারণ কোনো প্রাণীর এটা যাতায়াতের পথও হতে পারে। সব চেয়ে যা ভয়, ভেতরে ঢুকে গেলে, পাশের ফিতের মতো পাঁচিলটা চোখের ওপর অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। দ্বীপের বাইরে যাবার এখনও একমাত্র ওটাই তার নিশানা।

সে বলল, কাল সকালে দেখা যাবে।

জেনি তাকাল থমপ্সনের দিকে। থমপ্সন বাবার সিনিয়র সেক্রেটারীদের ভেতর একজন। বাড়িতে এ-মানুষটা তাদের আংকেলের মতো। সে এখন অনুনয় করলে তিনি হয়তো রাজি হয়ে যাবেন। কিন্তু বাবা বলে দিয়েছেন, জেনি, থমপ্সন ওখানে গার্জিয়ান মনে রেখ। আর থমপ্সনকে বলে দিয়েছিল, বেশি আসকারা দেবে না। তুমি বিচার বিবেচনা মতো যা ভাল বুঝবে করবে। আমার তো ইচ্ছেই ছিল না। পুলিশ বন্ধুদের বলতে ওরা তো হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। পত্রিকা বিক্রির একটা ধান্দা। তবু জেনি আমার একমাত্র মেয়ে, সে যদি মনে করে শেষ না

দেখে আর্চিকে কথা দেবে না তবে শেষটা দেখে আসাই ভাল।

এবং জেনি সেদিনই সকালে ফোন করেছিল, একুশ বারি স্ট্রীট, লণ্ডনে। ক্যাবটের জাহাজ কোম্পানীর হেড অফিস ওটা।

জেনি ফোন করে বলেছিল, আপনাদের তো অনেক জাহাজ দক্ষিণ সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়।

—বেড়ায় না ঠিক। মাল নিয়ে যাওয়া আসা করে।

—ঐ হল। আচ্ছা মনে আছে ছ-বছর আগে আপনাদের কোম্পানীর দু-জন এনজিনিয়ার হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়!

—বিলক্ষণ মনে আছে।

—মিঃ ক্যাবটকে নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারেন।

—তা অবশ্য পারছি না।

—আপনারা মনে করতে পারছেন না তাকে। তাজ্জব!

—রেকর্ডপত্র দেখলে হয়তো মনে হবে। তবে ফানাফুতি দ্বীপের কাছে আমাদের দু-জন বিশ্বস্ত এনজিনিয়ার জাহাজ থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় সেটা আমাদের অনেকদিন মনে থাকার কথা।

—তাদের একজন একরাইম ক্যাবট, আমার স্বামী।

—অঃ আচ্ছা।

—আপনারা সংবাদ-বিচিত্রায় খবরটা দেখেছেন?

—কিসের খবর বলুন তো!

—বারে! ফানাফুতি থেকে শ-খানেক মাইল দূরে আজকাল একজন মানুষকে দেখা যায়।

—তা হবে। লক্ষ্য করিনি।

—আপনাদের উচিত ছিল লক্ষ্য করা। তা যাক্ এখন যে-জন্য ফোন করছি, আমাদের একটা জাহাজের দরকার। ফানাফুতির কাছে আমরা নেমে যব। আপনাদের জাহাজ নিশ্চয়ই সে-সব রুটে এখনও যাওয়া আসা করে।

—আপনি একটু ধরুন। তারপর জেনি অধীর আগ্রহে কিছুক্ষণ ধরে রেখে-ছিল। এবং একসময় সে ঠিক ফের খবর পেয়ে গেল। বলল, দেখুন ১৪ই মে একটা জাহাজ নিউক্যাসেল থেকে ছাড়ছে। ফানাফুতি, ওসানিকাতে যাচ্ছে। যদি ওটা না ধরতে পারেন আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সেই জাহাজটাই ফিরে আসছে। তবে সেলের তারিখ ঠিক বলতে পারব না। আমাদের এজেণ্ট অফিস বলতে পারবে।

ফোনে হেড-অফিস আরও জানিয়েছিল, ওদের অধিকাংশ জাহাজই এখন দক্ষিণ সমুদ্রে। সাউথ পেসিফিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জেনি ইচ্ছে করলে কার্ডিফের রাউদ এনজিনিয়ার ডক থেকে একটা জাহাজ পেতে পারে। জাহাজটা যাচ্ছে ক্যারিবিয়ান-সি হয়ে। জাহাজটা মিসিসিপিতে ঢুকে নিউ-পোর্টে বাংকার নেবে। পোর্ট অফ সালফার থেকে নেবে গন্ধক। তারপর পানামা ক্যানেল অতিক্রম করে পেসিফিকে দীর্ঘ একমাস এক নাগাড়ে যাত্রা। ডুনেডিনে মাল খালাস।

জেনি সামান্য বাধা দিয়ে বলেছিল, ডুনেডিন কোথায়।

—ওটা নিউজিল্যাণ্ডের একটা পোর্ট। তারপর খালি জাহাজ সোজা যাচ্ছে নিউ-ক্যাসেল। জাহাজে গেলে এ-ভাবে যেতে পারেন। আর বি ও এসির ফ্লাইট ধরলে সোজা সিডনি। সিডনি থেকে থ্রুট্রেন। নিউ ক্যাসেল পৌঁছানোর ঐটাই

সহজ উপায়।

লোকটা আরও বলল, নিউ-ক্যাসেল থেকে ফানাফ্রুতির কাছাকাছি দ্বীপগুলোতে যেতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। সঙ্গে বোট রাখলে ভাল হয়। জাহাজ দ্বীপের কাছে বোট নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যের খাতিরে জেনি আর্চিকেও ফোন করেছিল। এবং বলেছিল, আর্চি দক্ষিণ সমুদ্রে আমি ক্যাবটকে খুঁজতে যাচ্ছি। একটা খবরে খুব বিচলিত বোধ করছি। এই বলে সে পত্রিকার সংবাদ-বিচিত্রার কথা উল্লেখ করে-ছিল। বাবাকে জানিয়েছি। তিনি তো শুনে খুবই ভেঙে পড়েছেন। এমন একটা অভিযানে যাব শুনে তাঁর আহার নিদ্রা গেছে। কিন্তু তুমি ত জানো আর্চি, ক্যাবটকে আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না। নিশিদিন সে আমার পাশে একটা ছায়ার মতো ঘোরে।

বিকেলের দিকে বেশ একটা ঝড়ো হাওয়া উঠেছে। সমুদ্রের তরঙ্গমালা বেশ উত্তাল। সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে এটা এক আলাদা পৃথিবী হয়ে গেল। কেমন অন্য একটা গ্রহের মতো মনে হচ্ছে। সভ্যতার কোনো চিহ্ন নেই। আর্চি কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে বন আর বালিয়াড়ির সীমায় দাঁড়িয়ে পাগলের মতো পায়চারি করছে। মাঝে মাঝে জোরে চিৎকার করছিল, জেনি তোমরা কোথায়।

রিচার্ডও বেশ উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছে। তার কিছু কাজ আছে বলে সে আর্চির মতো নিরর্থক বনের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। সন্ধ্যা হতেই একটা গভীর নীল অন্ধকার দ্বীপটাকে গ্রাস করে ফেলল। কৃষ্ণপক্ষ বলে, আজ অমাবস্যা কিনা, জানার জন্য ডাইরি খুলে দেখল, শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া। তবে কৃষ্ণপক্ষে দ্বীপে থাকতে হয়নি, এই যা রক্ষে। দু-চার দিন গেলে সন্ধ্যার অন্ধকারটা এমন কিম্ভুত কিমাকার হয়ে উঠবে না। সমুদ্র, নক্ষত্র এবং দ্বীপের গাছপালা বাদে দৃশ্যাবলী বলতে প্রায় কিছুই নেই। সে বিকেলের দিকে কিছু শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে রেখেছিল। তাতে আগুন দেওয়ার কাজটা সেরে ফেললেই মোটামুটি আজকের মতো বিশ্রাম। যদি দ্বীপে ওরা পথ হারিয়ে ফেলে, তবে আগুন দেখে ঠিক চিনে আসতে পারবে। সে কিছুটা পেট্রোল ঢেলে বেশ একটা বড় রকমের অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে বসল। আগুনটা সারা রাত তারপর ধিকি ধিকি জ্বলবে।

আগুনটা জেলে ভালই করেছে। থমপ্‌সন সোজা বালিয়াড়িতে নেমে আসতে পারল। থমপ্‌সনকে দেখে আর্চি ভীষণ ক্রুদ্ধ। সঙ্গে জেনি নেই কেন। জেনি যে পেছনে আসছে সে রাগের মাথায় সেটা খেয়ালই করেনি। রেগে গেলে আর্চির স্বভাব বকর বকর করা। এটা কি ভাল হচ্ছে আপনাদের। আপনারা কি ভেবেছেন! আপনারা কি জানেন না, জেনির বিপদ আপদ হলে আমাব আর মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে! তা ছাড়া বুড়ো মানুষটাকে গিয়ে কি বলব! আর জেনি তোমার কাণ্ডজ্ঞানের খুবই অভাব আছে জানি। না থাকলে এখানে মরতে আসতে না। তাই বলে রাত করে ফেরা, অচেনা একটা দ্বীপে এ-ভাবে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আমি একদম পছন্দ করছি না।

থমপ্‌সন এবং জেনি উভয়ে ক্লান্ত। ওরা কিছুই শুনছে না। সোজা হেঁটে চলে আসছে। আর্চি বন্দুক হাতে ওদের সঙ্গে প্রায় ছুটছিল। যত ছুটছিল তত ওর মেসিনটা বেশি ঘুরছে। এক সময় জেনি আর না পেরে বলল, থামো আর্চি।

থামো। তোমাকে কিছু বলতেও খারাপ লাগে। তারপর জেনি সোজা সমুদ্রের ভেতর বড় একটা পাথরে উঠে হাত মুখ ধুল। এবং রিচার্ডের বাস্তববুদ্ধি প্রখর, সে তার ছোট জমজ ভাইটাকে আগে প্রায় আমলই দিত না। কিন্তু এই অভিযানে রিচার্ড সবদিক বিবেচনা করে কাজ করছে। সে জেনির তাঁবুর পাশে বেশ মসৃণ একটা পাথর কোত্থেকে খুঁজে এনে রেখেছে। সে খুব সামান্য জল দিয়ে ফের হাত মুখ ধুয়ে একটা ফোল্ডিং চেয়ার পেতে বসে পড়ল। কোথায় কে কি করছে দেখার সময় নেই। তাঁবুর ভেতর থেকে দুটো বিয়ারের বোতল বের করে গ্লাসে গ্লাসে ঢেলে ডাকল, থমপ্সন আগে খেয়ে নিন। ভীষণ তেষ্টা।

রিচার্ড বলল, কিছু দেখলে!

জেনি গ্লাসটা তুলে সামান্য খেল। তারপর কেমন আরামে চোখ বুজে ফেলল। কিছু বলল না।

খুবই পরিশ্রম গেছে। থমপ্সনের গ্লাসটা তাঁবুর বাইরে এনে ডাকল রিচার্ড, আসুন মিঃ থমপ্সন। আর্চির দিকে তাকিয়ে বলল, যাও, বসে এখন গেলগে।

আর্চি জানে এটা সন্ধ্যার মৌজ। যদিও খুব বেশি মাতাল হওয়ার ব্যাপারে নিষিদ্ধ নিয়মকানুন আছে। ইচ্ছে করলেই খুশিমতো গিলতে পারবে না। সে গ্লাসের সবটা ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে বাকিটা বোতল থেকে উপুড় করে নিল। জেনি হুঁ হাঁ কিছু বলছে না। বনের গভীরে যেমন এক স্তব্ধতা বিরাজ করছিল, জেনির ভেতরেও যেন সেই স্তব্ধতা।

রিচার্ড অগত্যা থমপ্সনকেই জিজ্ঞেস করল, কি দেখলেন?

—বোস, যাচ্ছি। বলে পোশাক ছাড়তে ভেতরে চলে গেল। হাল্কা একটা প্যাণ্ট পরে পুরো খালি গায়ে সে বের হয়ে এল। যদিও পুরো খালি গায়ে থাকার অভ্যাস কোনদিনই নেই, খালি গায়ে থাকা অসভ্যতাও বটে, সে তবু গরমের জ্বালায় কিছু গায়ে দিল না। কিন্তু বাইরে এসে বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করল। সমুদ্র থেকে একটা মিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে।

রিচার্ড ফের বলল, কিছু দেখলেন।

—দেখেছি। তবে কোন ঝরণা কিংবা হ্রদ টদ পাওয়া যায় নি।

—কতটা ভেতরে ঢুকেছিলেন?

—বেশ অনেকটা। আশ্চর্য, জান রিচার্ড, দ্বীপের ভেতর অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ড দেখলাম।

রিচার্ড আর একটা ফোলডিং চেয়ার তাঁবুর ভেতর থেকে টেনে বের করে আনল। বলল, কি দেখলেন!

—আস্তে রিচার্ড। জেনি শুনতে পাবে।

—ভয় টয়ের কিছু!

—ভয় টয় কিনা জানি না। তবে দ্বীপে কেউ আছে এটা বোঝা গেছে।

—সত্যি আছে বলছেন!

—মনে হচ্ছে আছে। একটা গাছে তিনটে অক্ষরের মতো দেখলাম!

—জেনি দেখেছে?

—জেনিকে ইচ্ছে করেই কিছু দেখাইনি।

—অক্ষরগুলো কি?

—বুঝতে পারছি না। তবে ইংরেজি নয়।

রিচার্ড একটা ব্লেক-হার্ড ভাঙ্গছে তখন। পুরোনো দামী মদ।

সে এক পেগের মতো ঢেলে থমপ্সনকে দিল। থমপ্সন সবটাই গলায় ঢেলে সামান্য আমেজ পেল শরীরে। বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এবং সেই অগ্নিকুণ্ডের আলো মাথার টাকে প্রতিবিম্ব ফেলেছে।

থমপ্সন বলল, আর মনে হল মানুষের একটা পায়ে হাঁটা পথও আছে। রিচার্ডের কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বলল, কি করে সম্ভব! কোনো অসভ্য জংলীর পক্ষেও তো থাকা এখানে নিরাপদ নয়। একজন শিক্ষিত সভ্য মানুষ থাকবে ভাবতে পারি না।

—তবু আছে। আমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু আসছে যাচ্ছে না।

—জেনিকে কি বলেছেন?

—জেনিতো আজই পথটা ধরে ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিল। বারণ করলাম। বললাম, দ্বীপের কোন বড় আকারের জীবটিবও যাওয়া আসা করতে পারে। বেলা পড়ে আসছে। বরং কাল ঢুকে দেখা যেতে পারে।

আর্চি তখন জেনির মুখোমুখি বসে আছে। জেনির সামনে একটা ফোলডিং ছোট আকারের এনামেলের টেবিল পাতা। একদিকে জেনি, অপরদিকে আর্চি। জেনি কোন কথা বলছে না। চুপচাপ সন্ন্যাসিনীর মত চোখ বুজে আছে। একটু খাচ্ছে আবার চোখ বুজে পৃথিবীর কোন গোপন গভীরতায় ডুবে যাচ্ছে যেন। আর্চি সুবোধ বালকের মতো জেনির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আগুনটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রিচার্ড ওঠে গিয়ে তাঁবুর ভেতর লণ্ঠন জেলে দিয়ে এল। এ ভাবে সমুদ্রের গর্জন আর আকাশের নক্ষত্রমালার ভেতর এক আশ্চর্য আদিভৌতিক রহস্যময়তায় ডুবে যাচ্ছিল তারা।

থমপ্সন ফের বলল, তবে শেষ পর্যন্ত কি হবে জানি না রিচার্ড। যদি ক্যাবট না হয়, অন্য কেউ হয়, যার ভাষা আমরা জানি না, বুঝি না, যদি সত্যি একদিন দেখা দেয় তখন আমাদের কি হবে জানি না। ভাবতেই খুব ভয় লাগছে। হ্যাঁ, আর মনে রাখবে, পালা করে জেগে থাকা দরকার হবে। যতটা ভেবেছিলাম নিরাপদ জায়গাটা আসলে তা নাও হতে পারে। একটা গাছ দেখলাম, গাছটার সব চেটে পুটে খাওয়া। ছাল পাতা কিছু নেই। এমনিতে মনে হয় শুকনো বাজ পড়া, কিন্তু ছুরি দিয়ে খোঁচা মেরে দেখলাম জ্যান্ত। ফেরার পথে আরও ওরকমের তিন চারটা গাছ দেখেছি। খুব বড় নয়, জলপাই গাছের মতো বড়সড়। কিসে এ-ভাবে খায় বুঝতে পারছি না।

আর্চি এদিকটায় আসছেন না দেখে রিচার্ড নিশ্চিন্ত। সে এলে এত সব কিছু বলা যেত না। রিচার্ড বলল, তা হলে বেশি রাত করা ঠিক হবে না। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিতে হবে।

থমপ্সন দু-হাত কচলে হাত ওপরে তুলে দিল। বড় রকমের হাই উঠছে। রিচার্ড বলল, আজ আর আপনার জাগতে হবে না। পালা করে আমি আর আর্চিই জেগে থাকব।

—দেখছ কত জোনাকি!

রিচার্ড দেখল, যেন দ্বীপটায় আগুন লেগেছে। অজস্র জোনাকি পোকা দল বেঁধে উড়তে উড়তে এদিকে ধেয়ে আসছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল জীবন্ত সব কবরের মানুষ প্রাণ খুলে দ্বীপের মাথায় নাচানাচি করছে। ওরা দেখতে দেখতে

কেমন আবিষ্ট হয়ে গেল। অদ্ভুত প্রাকৃতিক ঘটনাবলী দ্বীপ থেকে ধেয়ে আসছে।

ওরা কিছুক্ষণ বসে থাকার পর দেখল, আর একটাও জোনাকি নেই। উড়ে উড়ে কোথায় ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। বালিয়াড়িতে শুধু ব্রেকারের শব্দ। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। ভাঙছে আবার নেমে যাচ্ছে। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলে শুধু বালিয়াড়িতে দেখল অজস্র ফসফরাস ক্রিমি কীটের মতো কিলবিল করছে।

কোনো নির্জন দ্বীপে রাত কাটাবার অভিজ্ঞতা এদের কারো নেই। সমুদ্রের গর্জন ব্যতিরেকে আর কোনো শব্দ নেই। শো শো আওয়াজ সেই আদি অনন্তকাল থেকেই যেন কেবল বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। রাতের খাবার বলতে, সামান্য আলু-সেদ্ধ করে নিল। গ্রীন পিজ সেদ্দ এবং চিজ। আর ফলের ভেতর একটা করে আপেল। ভেড়ার মাংসের রোষ্ট, যার যেমন খুশি স্লাইস কেটে নিয়েছে। এবং খাবার পর রিচার্ড বাদে যে যার তাঁবুর ভেতব ঢুকে গেল। রিচার্ড বন্দুক কাঁধে বাইরে পাহারায় বসে থাকল। মাঝে মাঝে আগুনে কাঠ ফেলে দিচ্ছে। খুঁচিয়ে আগুনের তেজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। একটা চুরুট মুখে কিছুক্ষণ সে দূরের অস্পষ্ট বনের পাশটায়ও হেঁটে এল। এদিকটায় হেঁটে সে বুঝল, দ্বীপটা যত নির্জন ভাবা যায় ঠিক ততটা নির্জন নয়। বরং জমকালো পোশাকে দ্বীপটা আকাশের নিচে গর্বের সঙ্গেই বেঁচে আছে। এবং এর অভ্যন্তরে সব নানাবর্ণের পাখিদের বাস, তাদের মাঝে মাঝে আর্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। আর একবার তো রিচার্ড থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বিদ্যুতের মতো কোনো একটা জন্তু ছুটে পালাচ্ছে। পেছনে কেউ তাড়া করছে নাতো।

সে নেমে আসার সময় দেখল দূরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রথমে কি করবে ভেবে পেল না। অন্ধকারেরও একটা আলো এই প্রথম সে টের পেল। সবাই তাঁবুতে, একা একজন মানুষের অস্পষ্ট অবয়ব দেখে সে নিজেকে গাছের আড়ালে রেখে কিছুটা এগিয়ে গেল। এবং আরও কিছুদূর সে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে থাকল। তারপর আরও কাছে যেতেই অবাক, জেনি চুপচাপ একা দাঁড়িয়ে আছে। কেমন বাহ্যজ্ঞান শূন্য।

রিচার্ড হিস হিস গলায় ডাকল, জেনি তুমি।

জেনি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। বুকে ক্রস ঝুলছে সোনার। অন্ধকারেও সেটা চকচক করছে।

রিচার্ড জেনিকে এবার ধরে নাড়া দিল, জেনি জেনি!

জেনি চোখ মেলে তাকাল। বলল, রিচার্ড এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে!

—কেন কি হয়েছে!

—কেউ এসেছিল।

—কে আসতে যাবে।

—এসেছিল রিচার্ড। মাত্র ঘুম লেগে এসেছে, কেউ যেন আমাকে ডাকল, জেনিফার যাবে?

—আর্চি নয় তো'

—আর্চির গলাতো আমি চিনি।

—কে ডাকল তবে!

—মনে হয় ক্যাবট। হুবহু ওর গলায় লোকটা কথা বলছিল। তাড়াতাড়ি আলো জ্বালালাম। কেউ নেই। বাইরে এসে দাঁড়ালাম। মনে হল দূরে কেউ হেঁটে

চলে যাচ্ছে। কেমন ঘোরের ভেতর পড়ে এতদূর হেঁটে এসেছি। কিছুই আর দেখতে পেলাম না। কিছু আর মনে করতে পারছি না।

—কোন দিকে গেছে বলতে পার!

—না।

রিচার্ড টর্চ জেবলে বালিয়াড়িতে পায়ের ছাপ পড়েছে কিনা দেখল কেউ হেঁটে গেলে ঠিক পায়ের ছাপ পড়বেই। ওরা জেনির পায়ের ছাপ কেবল দেখতে পাচ্ছে। ছোট ছোট। কোন পুরুষ মানুষের পায়ের ছাপ দেখতে পেল না। কিছু কাকড়া, স্টার ফিস, শংখ এলো-মেলো ছড়ানো। যে কোনো দ্বীপে নামলে প্রথমে যা চোখে পড়ে এদিকটা তার থেকে এতটুকু ব্যতিক্রম নয়।

রিচার্ড বলল, জেনি ধৈর্য ধর। এ-ভাবে ঘোরের ভেতর পড়ে গেলে কাজের কাজ কিছু হবে না।

—তুমি এটা ঘোর বলছ!

—তবে কি! দ্যাখো না, তুমি যে পথে হেঁটে এলে, কিংবা চারপাশে তাকাও, দ্যাখো, পথে সে টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল কোথাও ছাপ আছে! এলে বালিয়াড়িতে পায়ের ছাপ থাকত না!

জেনিফার নির্বাক তখনও। সে রিচার্ডের কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। স্পষ্ট ওর মনে হয়েছে তাঁবুর বাইরে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল প্রথম। একবার কি দু-বার ডেকেছিল। তারপর তাঁবুর ভেতর ঢুকে ওকে নাড়া দিয়েছিল। এতটা কখনও ঘোরের ভেতর হয় না। তবু যখন রিচার্ড বলছে মেনে নেওয়াই ভাল। এবং যখন কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, কেমন একটা আতংক সারা শরীর বেয়ে ওপরে উঠে আসতে থাকল। যদি নিশির ডাকের মতো কিছু হয়! সে যত দ্রুত সম্ভব রিচার্ডের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে চারপাশে আলো ফেলতে থাকল। বালিয়াড়িটা সাদা চাদরের মতো পড়ে আছে, পাশে সব পাথরের ঢিবি গাছ পালা। এবং বড় একটা গাছের ডালে আলো ফেলতেই দেখল, দুটো চোখ। আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। আলোটা স্থির হয়ে আছে।

রিচার্ড ঝুঁকে দেখল। চোখ দুটো জবলছে নাতো। ডালপালার ভেতর কিছু আছে এবং কিছুক্ষণের ভেতরই লাফ দিয়ে জন্তুটা অন্তর্হিত হ স, রিচার্ড অভয় দিয়ে বলল, চল, ওটা একটা বানর। ঘাবড়াবার কিছু নেই।

জেনি ফিরে চলল। মনের ভেতর কেমন একটা আশংকা বার বার পাক খেয়ে উঠছে। রাতে আবার যদি আসে। সে তাঁবুতে ফিরে আর ঘুমোতে পারল না। আলো জেবলে ঠায় বসে থাকল। একবার স্টোভ জেবলে কফি করে নিল। এখন আর্চির পাহারা দেবার কথা। এক কাফ কফি সে আর্চিকেও দিল।

আর আর্চি তাঁবুর ভেতর ঢুকে বেরই হতে চায় না। সে বলল, তোমার চোখ মুখ খুব শুকনো দেখাচ্ছে জেনিফার।

জেনি বলল, ঘুম আসছে না।

আর্চি বলল, এখানে থাকা খুব কী জরুরী মনে করছ।

—না থেকে যাবটা কোথায়! জাহাজ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

—তুমি ঘুমাও। বাইরেতো আমি আছি।

—সেই ভাল। বাইরে থাক। দেখি ঘুম আসে কি না।

আর্চি বাইরে বের হয়ে গেলে সে শুয়ে পড়ল। কোনো সাড়া শব্দ না পায়

আর্চি, সে মটকা মেরে পড়ে থাকল। আর্চিকে সব বলাও যাচ্ছে না। সে তবে ঘোর আপত্তি জুড়ে দেবে। রাতেই চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। কাউকে আর ঘুমোতে দেবে না।

মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব কিট কিট শব্দ কোথাও থেকে ভেসে আসছিল। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের মতো মনে হচ্ছে। রাত কত, সে একবার ঘড়িতে দেখল। ক্যাবট যদি হয়, কেমন টান অনুভব করল ফের। একটা নির্জন দ্বীপে আটকা পড়ে গিয়ে কি-ভাবে বেঁচে আছে কে জানে! সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না, ভাবনা চিন্তায় তার মাথাটাই ঠিক নেই। কেবল ভাবছে সে ঠিকই আছে, আর সব বেঠিক।

রাতটা এ-ভাবে নির্বিঘ্নে কেটে গেল। সকাল হল। চা করে এনে থমপ্‌সন ডাকাডাকি করল। জেনি ঘুম জড়ানো গলায় বলল, আপনারা খান, আমার উঠতে একটু দেরি হবে। সকালের দিকেই চোখ দুটো লেগে এসেছে। এবং নিশ্চিন্তে যখন ঘুমিয়ে আছে, সাদা চাদরে শরীর ঢাকা, ঠান্ডা হাওয়ায় নেশার মতো ঘুম লেগে আছে চোখের পাতায় তখন একটা হুড়োহুড়ির শব্দ। আর্চিকে রিচার্ড ধমকাচ্ছে। বোধ হয় টেনে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। আর্চি কিছুতেই যেতে চাইছে না।

অগত্যা জেনিফারকে উঠতেই হল। বাইরে এসে দেখল মুখ গোমড়া করে আর্চি বসে আছে। জেনিফারকে দেখেই রিচার্ড বলল, কিছুতেই যাবে না আমার সঙ্গে। বলছে, ওকে নাকি আমরা মেরে ফেলার মতলবে আছি।

জেনি খুব আদরের গলায় বলল, কি হয়েছে আর্চি!

—দ্বীপের ভেতর যেতে বলছে। সারারাত একদম ঘুমোতে পারিনি। লম্বা হয়ে ঘুম দেব ভাবছি, না থমপ্‌সনের অর্ডার একবার ঘুরে দেখে এসো। থমপ্‌সন বলছে, পায়ের ছাপ দেখে এসেছে। ওগুলো নাকি আমাদের পায়ের ছাপ নয়।

জেনির বুকটা গুড়গুড় করে উঠল। সে বলল, আমি যাচ্ছি রিচার্ড। আর্চি থাকুক।

রিচার্ড বলল, তা হলে আর্চি আমরা তিনজন আপাতত যাচ্ছি। তুমি পাহারায় থাক। খাবার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ফিরতে সন্ধ্যা হবে।

আর্চি বলল, একা এখানে থাকব!

—আর কি করা যাবে!

—জেনিফার থাকলে থমপ্‌সন থাকবে, আমি থাকলে কেউ বুঝি থাকতে পারে না।

রিচার্ড এত বিরক্ত যে একটা কথা বলতে আর পারল না। থমপ্‌সন সমুদ্র থেকে স্নান সেরে এসেছে। যে সামান্য মিষ্টি জলে শরীরটা ধুয়ে নিল! একজন প্রকৃত অভিযানকারীর মতো তার চলা ফেরা। থমপ্‌সন বলল, আর্চি, জেনিকে একা রেখে যেতে সাহস পাচ্ছে না। তুমি একা থাকলে ভয়ের কি।

—জেনি একা থাকলে ভয়ের, আমি বুঝি একা থাকলে ভয়ের নয়। আমি বুঝি মানুষ না!

থমপ্‌সন গেঞ্জি গলিয়ে দিচ্ছিল শরীরে। সে আর্চির কথা শুনে হেসে ফেলল। বলল, সত্যিতো একা থাকলে তুমি ভয় পাবে। যা লম্বা লম্বা পায়ের ছাপ দেখে এলাম।

জেনিফার বলল, সত্যই কি দেখেছেন!

—ওদিকটায়, তুমি দেখবে?

জেনি থমপ্‌সনের সঙ্গে দৌড়ে গেল। ওরা অনেকটা দূরে এসে দেখছে বালিয়াড়ি থেকে একজন মানুষ যেন ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে—ছাপগুলো সত্যি খুব স্পষ্ট। জেনি পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে থাকল। কিছুটা দূরে গিয়ে বালিয়াড়ি আর নাই, শুধু ঘাস, ঘন কাশ ফুলের একটা পুরো উপত্যকা। দূরে তাঁবুগুলো চোখেই পড়ছে না। এতটা দূরে দু'জনেই নিরস্ত্র অবস্থায় এসে ঠিক করেছে কিনা বুজতে পারছে না। তবু জেনিফার কেমন আকুল হয়ে উঠছে। যেন আর কিছুদূর গেলেই তাকে দেখতে পাবে। সে সে এমন নিরস্ত্র, থমপ্‌সন যে খালি হাতে আছে কিছুই মনে থাকল না। বলল, ঠিক এদিকটায় কোথাও সে গেছে।

এমনভাবে কথা বলল, যেন কাছেই গেছে। সে আমাকে চিনতে পেরেছে। বনের আড়াল থেকে সে কখনও দেখে ফেলেছে। কিন্তু যদি সেই হয়, সোজা ছুটে আসছে না কেন। উদ্ধারকারী দলের মতো ভাবছে না কেন? পালিয়ে পালিয়ে থাকছে কেন! মনটা আবার সহসা ভারি বিমর্ষ হয়ে গেল জেনির। ক্যাবট সবসময়ই একটু লাজুক, গম্ভীর, কোথাও কি সে জেনির কাছে কোন বড়রকমের অপরাধ করে ফেলেছে! দেখা হলেই সব খুলে বলতে হবে। অথবা অনুসন্ধানে সব বের হয়ে যাবে দ্বীপে।

কি এমন হতে পারে যাতে করে সে দ্বীপটায় স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছে! দ্বীপটায় কি কোনো অলৌকিক কিছু আছে, অথবা মায়া। দূর থেকে দ্বীপটা দেখেই কি সে আর তার বন্ধু সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। একঘেয়ে সমুদ্র যাত্রা কখনও কখনও মানুষকে পাগল করে দেয়। সে কি তখন উন্মাদের মতো কি করতে যাচ্ছে জানত না। চ্যাটার্জীতো খুব ধীর স্থির মানুষ। তার পক্ষে দ্বীপের মায়ায় উন্মাদ হয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। যে তার স্ত্রীর প্রতি ভীষণ বিশ্বস্ত ছিল। ক্যাবট তো সব বলেছে। ডোভারে গেলে জেনিফার চ্যাটার্জীকে কতবার বাড়িতে আমন্ত্রণ করে খাইয়েছে। দিনের পর দিন দুই বন্ধু এবং জেনিফার মিলে ইংলন্ডের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখে বেড়িয়েছে। একদিনের জন্যও চ্যাটার্জীকে বেচাল হতে দেখেনি।

সংবাদ বিচিত্রায় দ্বীপে শুধু একজনকেই দেখা গেছে, দুজন মানুষ কখনও একসঙ্গে দেখা যায় নি। ক্যাবট আছে, চ্যাটার্জী নেই ভাবতেও কেমন একটা সংশয়ের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। যদি ওদের কেউ হাঙরের পাল্লায় পড়ে থাকে, কেউ একজন হয়তো আর দ্বীপে উঠেই আসতে পারেনি, আগেই শেষ হয়ে গেছে।

এতসব সংকট একসঙ্গে মাথায় জড় হলে যা হয়, জেনি পাগলের মতো উপত্যকার ভেতর ঢুকে গেল। কাশের জঙ্গল বলে খালি পায়ে থমপ্‌সন ভেতরে যেতে পারছে না। ঘাসের খোঁচা লাগছে। দু একটা জায়গা কেটেও গেছে। থমপ্‌সন বলল, আর যাবে না।

কিন্তু কার কথা কে শুনছে। ওর পায়ে রাবারের সু। সে সহজেই কাশের উপত্যকা পার হয়ে যাচ্ছিল। রিচার্ডের কথা যদি সত্যি হয়, তবে ঠিক কোনো ঘোরে ফের পড়ে গেছে জেনি। না হলে এ-ভাবে কেউ এগিয়ে যায় না। থমপ্‌সন ইচ্ছে করেই বিকট চিৎকার করে উঠল, জেনি যাবে না। ওদিকে কিছু নেই। এইমাত্র যেন কেউ দৌড়ে গেল ঢিবি পার হয়ে।

—কোনদিকে!

—ঐ যে দেখছ, দেখ না।

জোনি লোভে পড়ে ফিরে এলে বলল, এস। আর যাবে না।

—আপনি যে বললেন!

—বলতে পার মিথ্যে কথা বলেছি। না হলে তোমাকে ফেরানো যেত না। তারপর কেমন ধমকের গলায় বলল, অত উতলা হবে না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে, একদিনও যায়নি। তোমরা এমন আরম্ভ করেছ যে কিছু ভেবে উঠতে পারছি না। সে যদি রাতে এসে থাকে, আজও আসবে। বরং আজ আমাদের দিনের বেলাটা তাঁবুতেই থাকা উচিত। রাতে চারজনই জেগে থাকব। কেউ ঘুমোব না।

ফিরে এসে থমপ্সন বলল, যদি জোনির কথাই সত্যি হয় রিচার্ড, তবে বনের ভেতর ঢুকে আর কাজ নেই। বরং সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটো। খাও দাও। ঘুমোও। রাত দশটার পর সবাই একসঙ্গে জেগে থাকা যাক। যদি সে সত্যি আসে।

আর্চি খুব খুশি। বলল, সেই ভাল।

রিচার্ড বলল, যখন বলছেন তাই হোক।

## চার

দ্বীপের সকালটা যথার্থই মনোরম। অনেক দূরে মাঝ সমুদ্রে সব বড় বড় ঢেউ উঠে যাচ্ছে আকাশে। দুটো একটা পাখি উড়ে এসে ঢেউয়ের মাথায় বসে থাকছে। যতক্ষণ না ঢেউটা বালিয়াড়িতে এসে আছড়ে পড়ছে পাখিটা নড়ছে না। কি করে টের পায় এবারে ঢেউটা ভেঙ্গে বালিয়াড়িতে নীল চাদরের মতো ছড়িয়ে পড়বে। তার আগে উড়ে যায় এবং অন্য ধাবমান ঢেউএর মাথায় গিয়ে বসে পড়ে। বেশ খেলাটা জমে উঠেছে পাখিদের। বালিয়াড়িতে শুয়ে আছে জেনিফার। ওর চুলে রিন বাধা। পোষাক খুবই সামান্য। সাদা ব্রেসিয়ার, কারুকাজ করা জাঙ্গিয়া। ক্যাবটের সঙ্গে যে কতবার কত বিচে এ-ভাবে শুয়ে দিন কাটিয়ে দিয়েছে। মাথার ওপর রঙিন ছাতা, নিচে পাতলা টিনের চেয়ার টেবিল, বিয়ার, কিছু কাজু বাদাম। একসঙ্গে সাঁতার কাটতে কাটতে কত গভীরে চলে গেছে দুজন আবার ভেসে উঠেছে। এবং এমন কত বিচিত্র ঘটনা ক্যাবটের সঙ্গে তার জড়িয়ে আছে। কিছুতেই কিছু ভোলা যায় না।

সে বালিয়াড়িতে চিত হয়ে শুয়ে আছে। একটু দূরে রিচার্ড, আর্চি সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটছে। বাঁ দিকে কিছু বড় পাথরের চাঁই। অদ্ভুত গড়ন। ওপরে বেশ আরামে চুপচাপ নিশিদিন বসে থাকা যায়। পর পর এমন সব পাথর সমুদ্রে এবং বালিয়াড়িতে অজস্র। যে কোন পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে পোশাক খুলে ফেলতে পারে। এবং সকলে যে যার মতো সেইসব দূরের পাথরগুলোর আড়ালে চলে গেছিল। থমপ্সন তাঁবুতে দুপুরের খাবার তৈরি করছে। থমপ্সনই ওদের ছুটি মঞ্জুর করেছে। বলে দিয়েছে, ওরা কে কতটা দূর একা একা যেতে পারে।

জোনি চুপচাপ শুয়ে আছে। আকাশের সঙ্গে সে তার ডোভারে ফেলে আসা আকাশটার মিল খুঁজে পায়। সমুদ্রের সঙ্গেও একটা মিল আছে। বালিয়াড়ি এবং ক্রমে সব দ্বীপটাই মনে হল, কোথাও না কোথাও সামান্য মিল রেখে দিয়েছে। কেবল ঢেউয়ের ওপর পাখিদের এই খেলাটা জীবনেও দেখেনি। সে খুব মনোযোগ দিয়ে

দেখছিল। যদি ক্যাবট এসে এক সময় পাশে বসে পড়ে। এমন সব রোমহর্ষক কল্পনা করতেও তার ভাল লাগছে। যদি সমুদ্রে ডুব দিয়ে সহসা ভেসে ওঠায় মুখে দেখতে পায়, দূরে ক্যাবট নেমে আসছে এবং জেনির যে কি হয়েছে, আজগুবি সব ভাবনা ধীরে ধীরে মগজে গেঁথে যাচ্ছে। যত গেঁথে যাচ্ছিল, তত অস্থির হয়ে উঠছে।

অথচ দ্বীপে পেঁছানোর আগে জেনিই ছিল থমপ্সনের এক নম্বরের পরামর্শ-দাতা। এখানে আসার আগে সে এ-ব্যাপারে খুব একটা হৈ চৈ করাও পছন্দ করেনি। ইচ্ছে করলেই কাগজগুলোতে ফলাও করে অভিযানের কথা লিপিবদ্ধ করে আসতে পারত। অভিযানে যারা অংশ গ্রহণ করছে তাদের ছবি ছাপাতে পারত। আর্চির এমন একটা ইচ্ছে খুবই ছিল। শেষ পর্যন্ত জেনির পীড়াপীড়িতে হয়ে ওঠেনি। সে গোপনেই যেতে চায়। সঙ্গে থাকছে বাবার সিনিয়র সেক্রেটারী থমপ্সন, যমজ-ভাই রিচার্ড এবং আর্চি। দু'একটা কাগজ ইতিমধ্যেই কি করে টের পেয়ে ছেঁকে ধরেছিল জেনিকে। জেনি বলেছে, আপাতত আমরা নিউক্যাসেলে বেড়াতে যাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত যাওয়া হবে কিনা দ্বীপে ঠিক নেই। মিথ্যে খবর ছাপিয়ে সোরগোল তুলতে একদম রাজী না।

থমপ্সন জেনির মতে সায় দিয়েছিল। জেনির ইচ্ছানুযায়ী ওরা সোজা প্লেনে সিডনি এসেছে। তারপর রেলে নিউক্যাসল। কোথায় বোট ভাড়া পাওয়া যায়, সিম্যান-হাউসগুলোয় খোঁজখবর, থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত জেনি প্রায় সবটাই দেখে শুনে করেছে। বোট ভাড়া নিয়ে ক্লিপস্যো কোম্পানীর সঙ্গে দর কষাকষি করতেও ছাড়েনি। স্টভেডর রোজারিওর কাছ থেকে ফর্দমতো সব চেক করে তুলেছে জেনি। কিছুতেই কোথাও এতটুকু ভুল করেনি। দ্বীপগুলো সম্পর্কিত কিছু ভূ-বিজ্ঞানের বই সিডনির পিগমিলান হাউজ থেকে কিনেছে। কিছু চার্ট-ম্যাপ সে যোগাড় করেছিল, লণ্ডনের সলেসবেরি থেকে। তারা যখনই সিডনি অথবা নিউ-ক্যাসেলে বিকেলে বেড়াতে বের হয়েছে, আরও কোনো খবর সংগ্রহ করা যায় কিনা ভেবে ক্যাটালগ সব চেয়ে নিয়েছে। নিউ-ক্যাসেলের রেলইয়ার্ডের পাশে মোটর বোট কোম্পানীরও খোঁজ এনেছিল জেনি। জেনির পরামর্শ মতোই, সস্তাদামে বোট ভাড়া করে জাহাজে তুলে ফেলা হল। মাঝ রাস্তায় ওরা বোট থেকে নেমে যাবে ঠিক থাকল। এবং জাহাজ যখন ওসানিক-দ্বীপপুঞ্জমালা থেকে বোঝাই হয়ে ফিরবে, তখন ওরা মাঝ-সমুদ্রে ফের বোট ভাসিয়ে চলে আসবে। তারপরে উঠে যাবে জাহাজে। আসা যাওয়া, মাল বোঝাই-এর ফাঁকে সময় মাত্র বিশ বাইশ দিন। বিশ বাইশ দিনে সব দ্বীপগুলোই ঘুরে ঘুরে দেখা যাবে। জেনি সে মতো থাকার তাঁবু, আহার, কার কতটা দরকার হবে হিসেব করে নিয়েছে। সেই জেনি দ্বীপে আসতে না আসতেই গোলমাল বাধিয়ে বসছে। থমপ্সন যেন সামান্য বিপাকেই পড়ে গেছে জেনিকে নিয়ে। সে তাঁবুর ভেতর খুব নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারছিল না। মাঝে মাঝে বাইরে এসে দেখছে, জেনি আছে কি না। কোথাও আবার না চলে যায় একা একা।

জেনি তখন ধীরে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছিল। অনন্ত উদার আকাশের নিচে সমুদ্রে জেনিকে সত্যি নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। মেয়েটাকে ছোট থেকে বড় হতে দেখেছেন। বালিকা বয়সে কর্তার ভারি ন্যাওটা ছিল। কখনও কর্তা তাকে অফিসে পর্যন্ত নিয়ে আসত। পাখির পালকের টুপি পরতে তখন ভালবাসত মেয়েটা। সব কিছু জানার আগ্রহ ছিল খুব। চেম্বারের দরজা খুলে বলত, মে আই কাম ইন! থমপ্সন উঠে গিয়ে কোলে তুলে নিত, আদর করত। একটু বয়স হতেই আর দেখা যেত না।

কলেজের দিনগুলোতে জেনির সেই চঞ্চলতা আর ছিল না। নিজের ভেতর কেমন মগ্ন হয়ে থাকার স্বভাব গড়ে উঠেছিল। আসলে পালিয়ে পালিয়ে বোধ হয় তখনই চুটিয়ে প্রেম করছিল ক্যাবটের সঙ্গে। মনে আছে অফিসের কি একটা ফাংশানে প্রথম সবার সামনে ক্যাবটকে নিয়ে সে আসে। খুব সুন্দর এবং সুপুরুষ ক্যাবট। জেনির নির্বাচন দেখে থমপ্‌সন খুশিই হয়েছিল। যদিও পরে কর্তার গোসা এই নিয়ে। জেনির এই রুচিকে তিনি পছন্দ করেন নি।

ফ্রাই পেনে অনিয়ন পুড়ে যাচ্ছে। থমপ্‌সন ফের ভেতরে ঢুকে গেল। আর ওরা ফিরে আসতে না আসতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে গেল। আকাশ কত অল্প সময়ে ভার হয়ে যায়, বৃষ্টি আসে, দ্বীপগুলোতে না এলে বিশ্বাস করা যায় না। ঝড়ো বাতাস নেই। কেমন দম বন্ধ ভাব। আর অঝোরে ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে। ওরা তিনজনই বৃষ্টির জলে ভাল করে গা ধুয়ে নিল। এবং আকাশ পরিষ্কার হতেও সময় লাগল না। আর্চি খেয়ে উঠে সিগারেট ধরাতে বাইরে বের হয়ে বলল, আকাশ আবার পরিষ্কার। রোদ উঠে গেছে।

তাঁবুর চারপাশে নালায় জল জমে আছে। বালিতে জল শুষে নেবার কথা। অথচ সবটা জল শুষে যায়নি। একটা ফড়িঙ নালায় জলে পড়ে আর উড়তে পারছে না। আর্চি বেশ মজা উপভোগ করছিল ফড়িঙটার কাণ্ড দেখে।

রিচার্ড বলল, এখন লম্বা ঘুম।

আর্চি বলল, কি আরাম!

বৃষ্টি হওয়ায় গরমটা কমে গেছে। ওরা যে যার তাঁবুতে ঢুকে শুয়ে পড়ল। থমপ্‌সন জলচৌকি বের করে আনল বাইরে। তাঁবুর দাওয়ায় বসে দ্বীপটার কোন দিক থেকে খোঁজা আরম্ভ করা যাবে ভাবনা চিন্তা করতে থাকল।

লম্বা ঘুম দিয়ে রিচার্ড যখন তাঁবুর বাইরে এল, তখন বেলা পড়ে গেছে। দ্বীপের গাছপালা বালিয়াড়িতে লম্বা ছায়া ফেলছে। ঝাঁকে ঝাঁকে সব পাখি উড়ছে দ্বীপটার মাথায়। উড়তে উড়তে গোল হয়ে যাচ্ছে। তারপর সরল রেখার মতো একটা লম্বা ছায়া ফেলে সমুদ্রে, অদৃশ্য হয়ে গেল।

দিনটা সাংঘাতিক বড় মনে হচ্ছে জেনির কাছে। কতক্ষণে রাত হবে, রাত হলে ক্যাবট নিশ্চয়ই আজও আসবে। তারপরই মনে হল, যদি ক্যাবট না হয়, অন্য কেউ হয়, কিন্তু গলার স্বরতো ঠিক ক্যাবটের মতো। সে বালিয়াড়িতে পায়চারি করছিল। থমপ্‌সন যখনকার যা, দিয়ে যাচ্ছে। বিকেলের দিকে সামান্য মদও দেওয়া হল। রাতে নিরামিষ। সজাগ থাকা, সতর্ক থাকা, যতটা সম্ভব মাতলামো পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। সন্ধ্যার সময় ওরা দিগন্তে বড় রকমের একটা নক্ষত্র দেখতে পেল। তারপর নিপুণ এক কারিগর তুলিতে বুলিয়ে দিল সামান্য অন্ধকার। পশ্চিমের সমুদ্রে লাল আভা মরে যেতে না যেতেই তৃতীয়ার চাঁদ দ্বীপের মাথায় উঠে এল। হাল্কা মসলিনের মতো জ্যোৎস্না। এখন যে কোনো পঞ্চম ব্যক্তিই এ-দ্বীপে হটকারী। ওরা চুপচাপ বসে থাকল না। আগুনটা আরও বড় করে জেবলে দিল। যেন দু তিন মাইল পর্যন্ত আলোটা কোনো সভ্য মানুষের হাতছানি। দ্বীপে কেউ যদি সত্যি থেকে থাকে, যদি সভ্যতায় ফিরে যেতে চায়, আলো দেখেই সে ছুটে আসবে।

আর্চির সেই কটু বাক্য আরম্ভ হয়ে গেছে ফের। রাতে মদের পরিমাণ কম দেখেই বোধ হয় মাথা খারাপ। আচ্ছা জেনি তোমার কি কখনও বিশ্বাস হয়?

—হয়।

—দু'দিনতো পার করলে। ক্যাবট থাকলে আসত না!

—জেনি কোনো ভূমিকা বাদেই বলে ফেলল, রাতে এসেছিল।

—কে এসেছিল!

—সে।

—রিচার্ড তোমার বোন পাগল হয়ে যাচ্ছে, আমি কিছু জানি না।

থমপ্‌সনের ভাল লাগল না কথাটা। সে বিরক্ত হয়েই বলে ফেলল, হ্যাঁ এসেছিল।

—এসেছিল আপনারা কেমন আছেন বুঝি জানতে!

থমপ্‌সন বুঝতে পারল আর্চিও ঠাট্টা করছে বাগে পেয়ে।

জেনি বলল, থমপ্‌সন আপনি কিছু মনে করবেন না।

—আরে না না।

কিছুক্ষণ পর আর্চি বিরক্ত হয়ে উঠে যাচ্ছিল। তারপর তাঁবুতে গিয়ে শুয়েও পড়েছিল। রিচার্ড ছুটে গিয়েছিল টেনে তুলবে বলে। থমপ্‌সন বাধা দিল। বলল, কি হবে জাগিয়ে। তোমাদেরও মনে হয় ঘুম পাচ্ছে। গিটারটা নিয়ে এস না বাজাই।

বুড়ো থমপ্‌সন গিটার এনে দিলে সে বেশ কায়দা করে নাচতে থাকল আর গাইতে থাকল। জেনি হেসে ফেলেছিল, থমপ্‌সনের কান্ড কারখানা দেখে। তবে থমপ্‌সন কি বুঝতে পেরেছিল, দিন যত যাচ্ছে জেনি বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। আর্চিতো পায়ের ছাপের কথা বিশ্বাসই করল না। এ-হেন সময়ে আর কি করা যায়। রিচার্ড আর জেনি মিলে ডুয়েট গাইতে থাকল। আর্চি এবার বাইরে এসে হাত জোড় করে বলল, ঘুমোতে দাও, প্লিজ, একটা মানুষ এখনও সুস্থ আছে দ্বীপে, না ঘুমোতে দিয়ে তাকে আর পাগল করে দিও না। দোহাই তোমাদের ঈশ্বরের।

ওরা সবাই আরো জোরে গাইতে থাকল।

আর্চি বলল, চললাম!

—যাও না। রিচার্ড গলা বাড়িয়ে বলল।

—যাব। ঠিকই যাব। বলে সে জেনির দিকে তাকাল। জেনি, তুমিতো ওদের মতো অবুঝ নও। তুমি কেন এখনও না ঘুমিয়ে আছ।

কোনো কথা নেই। ওরা তিনজন নাচছে। যেন এখানে এমন একটা রাতে কেউ সত্যি রাজার মতো চলে আসবে অথবা যাতে ঘুম না পায়, বোধ হয় যে কোনো ভাবে সতর্ক থাকছে।

আর্চি এবারে খুব বুদ্ধিমানের মতো বলল, হল্লা করলে শিকার থোড়াই জুটবে। সে তো তোমাদের মতো আর বুদ্ধু নয়।

রিচার্ড বলল, আর্চি রাত বেশি হয়নি। তুমি অযথা চিল্লাচ্ছ। ঘুমিও না বলছি! ঘুমোলে তোমাকে ফেলে পালাব।

আর যায় কোথায় বাছাধন, যত থমপ্‌সন বলে, এবার আমাদের খুব সতর্ক হয়ে যেতে হবে, কারণ রাত দশটা বেজে গেছে, যদিও দ্বীপে রাতের কোন পরিমাপ নেই, কিন্তু গভীরতা রাতের টের পাওয়া যায় পশুপাখির বিচরণ দেখে, ডাক শুনে। সুতরাং এ-সময়ে হয় তো সে বেড়াতে বের হয়। থমপ্‌সন বলল, আর্চি তোমার তো জেগে থাকার কথা না।

আর্চি আমতা আমতা করে বলল, আপনারা জেগে থাকবেন, আমি কি করে...

এক যাত্রায় পৃথক ফল ভাল না।

রিচার্ড হা হা করে হেসে উঠল।

তৃতীয়ার চাদ ডুবে গেছে। কোনো শব্দ নেই। ওরা সতর্ক হয়ে গেছে খুব। জেনি টিনের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। দুদিনেই কি করে কিছু কীট-পতঙ্গ এসে হাজির হয়েছে এখানে। আলোতে ওরা উড়তে উড়তে জেনির মাথায় শরীরে বসে যাচ্ছে। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আসলে কতটা কি ঠিক, আসলে সত্যি এসেছিলতো, স্বপ্নে এমন কিছু দেখেনিতো! সবার দুর্ভোগের জন্য সেই দায়ী। নিজেকে কখনও খুব স্বার্থপর মনে হচ্ছে। থমপ্সনের আন্তরিকতায় কখনও ভারি লজ্জিত কখনও মুগ্ধ। আর আর্চি ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে।

সারারাত ওরা জেগে শেষ রাতের দিকে প্রথমে রিচার্ড, তারপর থমপ্সন, আর্চি এবং শেষে জেনি ঘুমোতে গেল ভেতরে। কেউ পাহারায় থাকল না। দ্বীপে কেউ থাকলেও এদিকে আসবে না। আসতে সাহস পাবে না। রোদ উঠলে হঠাৎ থমপ্সন জেনির তাঁবুর কাছে ছুটে গিয়েছিল। বলেছিল, জেনি আমরা যখন গতকাল দ্বীপে গেছিলাম তুমি কাউকে দেখেছিলে!

—হ্যাঁ, সে তো আর্চি।

সে এবার আর্চিকে ডেকে তুলে বলল, তুমি ওদিকে যে কাশফুলের উপত্যকা আছে কখনও গেছিলে।

—বারে যাব না। আপনারা বনের ভেতর চলে যাচ্ছেন, কিছু হলে! ওদিকটায় গিয়েছিলাম বৈকি।

থমপ্সন বলল, বৃষ্টি হয়ে গেছে। না হলে দেখা যেত খালি পায়ের ছাপ, না জুতোর ছাপ। জেনির দিকে তাকিয়ে বলল, মনে করতে পারছ?

—যতদূর মনে করতে পারছি জুতোর দাগ।

সুতরাং আর্চির জুতোর ছাপ স্পষ্টই বোঝা পেল। জেনি ঘোরের ভেতরই পড়ে গেছিল। অযথা এত সতর্কতায় খুব দরকার নেই। তা ছাড়া ওরা তো দ্বীপটা সম্পর্কে মোটামুটি সবরকমের খবরই নিয়ে এসেছে। এমন কোথাও দেখিনি যে দ্বীপগুলোতো হিংস্র প্রাণীর বাস আছে। বিষধর সাপ আছে। অথবা আদিবাসীও কিছু নেই। যদি শুধু একজনই হয়, তবে দেখা যাক না খুঁজে, যদি সে থাকে একদিন না একদিন ঠিক দেখা হয়ে যাবে। না দেখা হলেও ভাববার কিছু নেই। আর্চিকে বিয়ে করার আগে জেনির অন্তত কিছুটা সান্ত্বনা থাকবে। দ্বীপে বিশ বাইশ দিন থাকা নিতান্ত বিফলে যাবে না।

সংশয়টা তবু একেবারে গেল না। কারণ দ্বীপের অস্পষ্ট হাঁটা পথ অথবা গাছে গাছে কিছু লিপি মানসিক দিক থেকে থমপ্সনকে এখনও সামান্য বিড়ম্বনার ভেতর রেখেছে। সকালে সে সবাইকে নিয়ে ভেবেছিল বোটে ঘুরে দেখবে দ্বীপটা। দ্বীপটার সংলগ্ন আরও সব ছোট ছোট দ্বীপ আছে, সেখানেও যাওয়া যাবে। কিন্তু যাবার সময় একেবারে তাঁবু খালি রেখে যেতে পারল না। রিচার্ডকে পাহারায় রেখে বোটে ওরা ভেসে গেল। দ্বীপটা সারাদিন ঘুরে ঘুরে দেখল! দক্ষিণ দিকে খুব উঁচু সব পাথরের দেওয়াল, পাহাড়ের মতো একেবেঁকে চলে গেছে। সেখানে উঠে কেউ দাঁড়ালে সমুদ্রের অনেক ভেতর থেকেও স্পষ্ট দেখার কথা। ওরা কিছুই দেখল না। পশ্চিম দিকটাতে বসবাসের জায়গা থাকতে পারে। ওরা একটা ছোট দ্বীপে নেমে দুপুরের আহার সেরে নিল। যেহেতু বালি অথবা পাথরময় জায়গা খুব ঘন

জঙ্গল হতে পারেনি। অনায়াসে ছোট ছোট দ্বীপগুলিতে যাওয়া আসা যায়। একটা দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যেতে সময়ও বেশি লাগে না। বোটেরও খুব দরকার হয় না। জোয়ারের সময় ডুবে যায়, আবার ভাটার সময় জেগে যায় চারধারের জায়গাগুলো।

যত ওরা ঘুরে ঘুরে দেখছে তত সাহস বেড়ে যাচ্ছে। এক ধরনের অতিকায় প্রজাপতি দেখতে পেল একটা দ্বীপে। দুটো একটা প্যাংগোলিন, এক রকমের পাখি দেখল চক্রাবক্রা, ওরা সবুজ বনভূমিতে কুটির নির্মাণ করে থাকে। পাতার তৈরি খুব ছোট্ট ঘর, বিচিত্র ফুল চালে গোঁজা—এমন সব অদ্ভুত পাখিদের খবর ওরা আগেই পড়ে জেনেছে। না হলে, ছোটখাটো কোনো লিলিপুট শ্রেণীর লোক এখানে হয়ত বসবাস করছে এমন ভাবতে পারত।

আর যা আছে, সেই অতিকায় সামুদ্রিক কচ্ছপদের আনাগোনা। ওদের দেখেই ঝুপঝাপ জলে পড়ে যাচ্ছে। গাছের ডালে পাখিদের বাসা। তাদের বিচিত্র কলরব দ্বীপগুলোকে খুব তাজা রেখেছে বোঝা যায়। জেনি ক্রমেই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছে। বড় দ্বীপটাতেই ভাল করে খোঁজা দরকার। আর যেটা সব চেয়ে বেশি ভাবনার কারণ হয়েছে, দ্বীপে ক্যাবট অথবা অন্য যে কেউ থাকুক না কেন, ওদের আগুন দেখে, অথবা আর্চির ছেলেমানুষী বন্দুক ছোঁড়া দেখে টের পাওয়া উচিৎ, লোকগুলো উদ্ধারকারীর ভূমিকা নিতে পারে। কিন্তু তিনদিনের মাথায়ও যখন কিছু ঘটল না, তখন নিশ্চতই জেনি ঘোরে পড়ে ক্যাবটকে দেখেছে। আসলে মাথাটাই গোলমাল করছে তার।

## পাঁচ

তাঁবুতে ওরা ফিরে এল বিকেলের দিকে। দুটো খরগোস শিকার করেছে আর্চি। সে বালিয়াড়িতে নেমেই ছাল চামড়া তুলে লোহার রডে গেঁথে আগুনে সেঁকতে বসে গেল। খুব খুশি আর্চি। মাঝে মাঝে জেনিকে বলেছে—বাকি ক'টা দিন শুধু শিকার, আর জ্যোৎস্নায় বসে মাংসের রোস্ট, দামী মদ, বেশ একটা প্রমোদ বের হওয়ার মতো এবং উপভোগ করার সামিল। বড় লোভী দেখাচ্ছিল আর্চিকে। সে একফাঁকে বিয়ের উৎসবে কি ধরনের মেনু করার দরকার জেনিকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইল।

জেনি খুব উদাস। সে শুনছে না, টিনের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। সমুদ্রে কিছু ডলফিন, বোটের মতো গা ভাসিয়ে রেখেছে। থমপ্সন আগামীকাল দ্বীপটার কোনদিকে যাওয়া হবে তার মোটামুটি একটা চার্ট তৈরি করছে। সে তার গুরুদায়িত্বের কথা ভুলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত দেখা হবে। জেনিকে ম্রিয়মাণ দেখলে খুবই খারাপ লাগে।

সে কথায় কথায় বলছিল, বুঝলে জেনি, আগামীকালই সে-পথটায় যাব। ভেব না।

জেনি বলল, কিন্তু থমপ্সন ক্যাবট যদি সত্যি থাকত, না এসে কিছুতেই পারত না।

—মানুষের স্বভাব কখন কি ভাবে পাল্টে যায় কেউ বলতে পারে না জেনি। দ্বীপে থেকে থেকে সে হয়তো তার পুরনো কথা সবই ভুলে গেছে। সে হয়তো

আসলে বন্য হয়ে গেছে। সভ্যতার লাগাম সে তো শুনেছি কোনদিনই পরতে চাইত না!

জেনি উঠে এসে থমপ্‌সনের সামনে দাঁড়াল।—অবশ্য ক্যাবট প্রায়ই সমুদ্রের আশ্চর্য সব দ্বীপের গল্প করত। একবার মনে আছে, ও বলেছিল— ,

থমপ্‌সন অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে যদি কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু জেনি কিছু না বলে ফিরে যাচ্ছে।

সে ডাকল, জেনি।

জেনি বলল, ওটাতো কথার কথা! ও-কথার কোনো মানে থাকতে পারে আমি বিশ্বাস করি না।

—কি বলেছিল।

জেনির ম্লানমুখে সামান্য হাসি ফুটে উঠল। বড়ই অবুঝ ছিল ক্যাবট, কখনও কখনও ওর ছেলেমানুষিতে আমি খুব অবাক হতাম। ক্যাবট বলত, কত সব দ্বীপ আছে, পৃথিবী ঘুরে ঘুরে সমুদ্রের কোথায় কত রকমের দ্বীপ আছে, সব বর্ণনা দিত! বলত, এখানে আর মানুষ থাকতে পারবে না। ভেবেছি তোমাকে নিয়ে একটা নির্জন দ্বীপে চলে যাব। তারপর...

—তারপর কি?

—তারপর ওর ইচ্ছে ছিল ..

—কি ইচ্ছে ছিল?

—সে সব বলা যায় না।

থমপ্‌সন জানে, ক্যাবট ওধরনেরই মানুষ। নাবিকদের এমনই স্বভাব হওয়ার কথা। সে আর জেনির কথায় বেশি গুরুত্ব দিতে চাইল না। বরং ঢিলেঢালা মেজাজ রোস্টের গন্ধ পেয়ে সহসা তাজা হয়ে গেল। নাক টেনে বলল, গ্র্যান্ড। আর্চিকে আমাদের এ-জন্যই ভাল লাগে। ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি হাজির করার মতো বিষয়-বুদ্ধি একমাত্র আর্চিই রাখে। সে আর্চির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

জেনি বুঝতে পারছে নিয়তিতাড়িত রমণী সে। আর্চি ব্যাতিরেকে কেনো গত্যন্তর নেই। আর্চি এমনিতে ভীষণ সুপুরুষ, যেমন লম্বা তেমনি শক্ত সমর্থ মানুষ। কেবল মুখের আদলে কথায়বার্তায় সামান্য বোকামি আছে। ওটা না থাকলে ক্যাবটের চেয়ে সে খুব একটা ফ্যালনা হোত না।

জেনি এ-রকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে উঠে যেতে থাকল। সে একা একা কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। বনের ছায়ায় কিছু দূর হেঁটে যেতে ওর কষ্ট হল না। থমপ্‌সন অথবা রিচার্ড দেখছে, জেনি ক্রমশ মনমরা হয়ে যাচ্ছে। অযথা উদ্বিগ্ন হয়ে লাভ নেই। আবার ঠিক ফিরে আসবে। ঘুরে ফিরে যদি দেখতে চায় দেখুক।

যখন দ্বীপে আবছা মতো অন্ধকার নেমে এল, দেখা গেল জেনি একা একা ফিরে আসছে। আর্চি বড় চারটা রোস্ট প্লেটে ভাগ ভাগ করে রেখেছে। জেনি এলেই খেতে বসে গেল। জেনি যে অনেকক্ষণ কাছাকাছি ছিল না রোস্টের গন্ধে টেরই পায়নি।

## ছয়

বেশ নির্বিঘ্নে রাতটা কেটে গেল তাদের। খুব খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল রাতে। পর্যাপ্ত মদ গিলেছিল আর্চি। রিচার্ডও সামান্য মাতাল হয়েছিল। থমপ্‌সন পরিমাণ মতোই খাচ্ছে। জেনি প্রায় কিছুই খায়নি। সবাই বেশ ঘুমিয়েছে। অনেক দিন পর গভীর ঘুম। উঠতে উঠতে আর্চির বেলা হয়ে গেছে। থমপ্‌সন দূরে চলে গেছে। রিচার্ড ফিরে আসছে। জেনি কিছু দূর হেঁটে গেল। প্রথমে কাঁটা ঝোপ, পরে ঝোপ ঘন এবং কিছু গাছপালার ভেতরে ঢুকে গেলে কেউ আর জেনিকে দেখতে পাবে না। সে একটা নিরিবিলি গোপন জায়গা চায় এখন। সে ভেতরে ঢুকে বালিয়াড়ির দিকে তাকাল। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। এদিকটায় সে কখনও আসে নি। তার বসে পড়তে এতটুকু সংকোচ হল না। সে ডালপালার ফাঁকে দেখল বোট থেকে রিচার্ড ও আর্চি কি বয়ে আনছে। বোধ হয় জলের পিপে। চারপাশটা ঘুরে দেখার শখ দিন দিন বেড়ে উঠছে। কি প্রবল ঢেউ বালিয়াড়িতে। পাশের বড় বড় পাথরে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। আর তার সাদা ফেনা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে আকাশে উড়ছে। এবং অতীব এক নির্জনতা। ক্যাবট সব সময় এমন নির্জন জায়গা পছন্দ করত। বলত, কি আরাম, তুমি আর আমি। পোশাকের বাহুল্য থাকবে না। সেই প্রথম মানব মানবীর মতো দ্বীপে ঘোরা ফেরা করব। কেউ দেখার নেই, কেউ বলার নেই। ওর ভারতীয় বন্ধুটিও তাই। ক্যাবটের কথায় সায় দিয়ে বলত, সমুদ্র কোথাও ছোট্ট দ্বীপ টিপ দেখলে আপনাদের কথাই মনে হয়। আমরা আছি আপনারা নেই ভাবতে বড় খারাপ লাগে। চ্যাটার্জী ওদের পরিবারে ছিল নিজের মানুষের মতো। ভীষণ লাজুক। স্ত্রীর কথায় মানুষটা ভারি উদাস হয়ে যেত।

জেনির কাছে ওদের দু-জনেরই ছবি আছে। যতই ওরা বন্য হয়ে যাক, ছবি না থাকলেও সে ঠিক ঠিক চিনতে পারবে। কেউ তাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

কিছুটা দূরে এসে জেনি হঠাৎ দেখল দ্বীপটা ক্রমে সিঁড়ির মতো নেমে গেছে। মনে হচ্ছে ভেতরে নীল জলের একটা হ্রদ আছে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে কেমন ঝিলমিল মরীচিকার মতো ভেসে যাচ্ছে, কখনও দলে দলে মানুষের মিছিল ভেসে যাচ্ছে মনে হয়, কখনও মনে হয় ওরা সব সেই প্রাচীন গন্ধ হরিণের পাল কেবল ধেয়ে যাচ্ছে। মরীচিকার বোধ হয় কোনো মায়া থাকে। কেবল ভেতরে ঢুকে যেতে ইচ্ছে করছে। কি সব হলুদ বন! সেদিনের মতো এতটুকু অগম্য নয়। সহজেই পাথর লাফিয়ে ঘাস মাড়িয়ে ভেতরে চলে যাওয়া যায়। সে বুঝতে পারছে না, সেদিন তবে ওরা কোন দিকটায় গিয়েছিল! বোধ হয় এটাই দ্বীপের অভ্যন্তরে ঢুকে যাবার বন। দূরে দূরে ঘন সবুজের ছায়া। সেই প্রাচীন পাথরের ঢিবি একটাও নেই। কেবল মনে হচ্ছে সামনে অসংখ্য দারুচিনি গাছ। এ-ভাবে তার হেঁটে যেতে যেতে কেমন নেশায় পেয়ে গেল। দ্বীপটা সত্যি বড় নিরীহ। কোনো সাপখোপ নিয়ে সে ভয়াবহ হয়ে নেই। সেই অসংখ্য কচ্ছপ, পাথরের ফাঁকে অথবা মাটি পেলেই ডিম পেড়ে সমুদ্রে নেমে যায়। কচ্ছপের ডিম খেয়েই দু-জন মানুষ

এ-দ্বীপে অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারে। দূরে দূরে যে সব বনজঙ্গল আছে সেখানে আছে নানারকমের ফলের গাছ। নারকেল গাছও দুটো একটা যেন দেখতে পেল। পায়ে পায়ে খরগোস। এক রকমের বাঁদর ডালপালাতে, গায়ের রঙ সবুজ। কোথাও ঠিক ঝর্ণা থেকে মিষ্টি জল, খরগোস, কচ্ছপের ডিম, উড়ুক্কু মাছ এবং সে বই পড়ে আরও জেনেছে জোয়ারের সময় বড় বড় গলদা চিংড়ি জলজ ঘাসের সঙ্গে দ্বীপের চারপাশে ভেসে আসে। আর আলো জ্বালবার জন্য শংখ মাছের চর্বি জমিয়ে রাখলেই হয়ে গেল। ওরা তখন পৃথিবীর যে কোন প্রাচীন সম্রাটের চেয়ে ধনী। থমপ্‌সন রিচার্ড যতই নিরাশ হয়ে পড়ুক, সে আশা ছাড়ছে না।

চারদিনের মাথায় সাতসকালে আর্চি আর রিচার্ড জল রাখার পিংপেগুলো বোট থেকে নামিয়ে রেখেছে কেন সে বুঝতে পারছে না। জাহাজ থেকে সঙ্গে প্রচুর জলও এনেছে। যদি দ্বীপে শেষ পর্যন্ত কোথাও জল পাওয়া না যায়। তা ছাড়া কেমন জল, বিষাক্ত কি ভাল, তারা ঠিক জানে না। শুকনো খাবার কম পড়বে বলে মনে হয় না। কর্নড-বিফের টিন পর্যাপ্ত। টিন-ফিস আছে। চিজ্ বাটার, পাউরুটি কি নেই সঙ্গে। এগুলো অবশ্য তার ভাবনার নয়। থমপ্‌সনই দেখছে। কিন্তু থমপ্‌সন এ-ভাবে নিরাশ হযে পড়লে সব কিছুই অর্থহীন। প্রচুর জল, আহার, মদ থাকল কি গেল তার আসে যায় না।

সহসা খস খস শব্দে সে চমকে পেছন ফিরে তাকাল। কিছু নেই। হাওয়ায় গাছে ডালপালায় সামান্য গুলঞ্চ ফুলের লতা দুলছে। সে আবার ফিরে যেতে পারবে কিনা দেখার জন্য কিছুটা পেছনে আসতেই বালিয়াড়ি তেমনি ভেসে উঠল চোখে। সে কিছুদূর ঢুকেই পর পর চিহ্ন রেখে যাচ্ছে। সহজেই সে চিহ্নগুলো দেখে বুঝতে পারবে কোথায় কোন দিকে যাওয়া দরকার।

সকালে থমপ্‌সন কাজ করে যাচ্ছে আর আর্চিকে খেপাচ্ছে। জেনি বনটার ভেতর সেই কখন গেছে, এখনও ফিরছে না। আর্চি গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। এমন মুখ দেখলেই থমপ্‌সনের হা হা করে হাসতে ইচ্ছে করে। আর্চি একেবারে কাজে মন দিতে পারছে না। সে মাঝে মাঝেই বনটার দিকে তাকাচ্ছে। জেনি কেন যে কিছুটা জল ভেঙ্গে দ্বীপের ওদিকের বনটাতে উঠে গেল। সোজা উঠে না গিয়ে অতদূর যাবার কি দরকার! গাছের ফাঁকে ফাঁকে সরে যাচ্ছে জেনি। কখনও জেনির পা দেখা যাচ্ছে, কখনও শরীর আবার শুধু গাছপালার ফাঁকে মুখ। তার পর একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখনই আর্চির মুখ ফ্যাকাশে। এটা যে কি করছে জেনি! থমপ্‌সনের সঙ্গে কাজে হাতও মেলাতে পারছে না আর। তবু করে যেতে হয়। কাজ করছে আর গজ গজ চলছে সারাক্ষণ মুখে। —না এটা ঠিক না। এ-ভাবে একা একা হেঁটে যাওয়া ঠিক না। দ্বীপটায় যতই ভালমানুষী থাকুক, শেষ পর্যন্ত সে আর পারল না। চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে জেনি যে দিকে গেছে ছুটে গেল। —জেনি, ডার্লিং, প্লিজ ওদিকে যাবে না। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে বের হব। তুমি ফিরে এস।

কোন সাড়া নেই। খুব সাহসও নেই ভেতরে ঢোকার। তবু সে কিছুটা ভেতরে ঢুকে ডাকছে, জেনি ফিরে এস। পথ হারিয়ে ফেলতে পার। কি এমন আছে, জেনি দেখে বেড়াচ্ছে! এগুলো খুব বাড়াবাড়ি মনে হয় আর্চির। এর জন্য মাঝে মাঝে সে মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। জেনি সেই যে দ্বীপে অদৃশ্য হয়ে গেছে আর দেখা যাচ্ছে না। বোকার মতো জেনি যে এটা কি করছে! যতই

থমপ্সন বললুক, বিচার বিবেচনায় কিছুই থাকার কথা নয়, কেবল কিছু শব্দ গাছে গাছে, কে কবে এসে গেছিল, আবার চলেও যেতে পারে, চলে যাওয়াই স্বাভাবিক, সুতরাং পুতু পুতু করার কিছু নেই। পুতু পুতু করার কিছু নেই মোটেই যে ঠিক কে বলবে! কেউ যে সত্যি নেই তারই বা ঠিক কি! বোকার মতো জেনি যে এটা কি করছে! জেনির বোধ হয় ঠিক হুঁস নেই। না হলে একা এ-ভাবে কেউ একটা অপরিচিত দ্বীপের ভেতর হারিয়ে যায়! ফিরে আসার পথ গুলিয়ে ফেললে কি হবে! আর বলিহারি থমপ্সন, রিচার্ড, কি বিবেচক মানুষ তোমরা! দুপুরের খাবার হচ্ছে। আমার মাথা হচ্ছে। তাছাড়া ভেতরে কি আছে না আছে, আর যদি সেই মানুষ আদিমতা নিয়ে সত্যি বেঁচে থাকে...তবে...তবে কি হবে! আর্চি শিউরে উঠল। চুল দাড়িতে মানুষটার মুখ ঢাকা। আর জেনি কি সুন্দর, কি লম্বা! সাদা জ্যোৎস্নার মতো নরম শরীর। সোনালী চুলে নীল চোখের মনিতে আশ্চর্য সুষমা তার...জেনি...জেনি, তুমি আমার আকাশে একটা মাত্র নক্ষত্র জেনি। পাগলামী কর না বলে জেনি যে দিকটায় ঢুকে গেছে ছুটে যেতে গিয়ে দেখল, আদৌ ছোটা যায় না। নিবিড় গাছপালার ভেতরটা অরণ্য। দু হাত বাড়িয়ে ওকে আটকে দিয়েছে। সে ভয় পেয়ে অযথা ফের দু-বার শূন্যে গুলি ছুঁড়ে দিল।

সহসা এ-ভাবে আর্চিকে দূরে গুলি ছুঁড়তে দেখে রিচার্ড ঘাবড়ে গেল। থমপ্সন বলল- কি ব্যাপার রিচার্ড, আর্চি দৌড়াচ্ছে, গুলি ছুঁড়ছে?

—বুঝতে পারছি না। সেও কিছুটা দূরে ছুটে গেল। তারপর চিৎকার করে ডাকল, আর্চি! আর্চি!

আর্চি ফিরছে না। তবে জেনির কি কোনো বিপদ! সঙ্গে সঙ্গে সব ফেলে ওরাও ছুটতে থাকল। ওরা দৌড়ে যাচ্ছে বেশ অনেকটা পথ। এদিকটায় এলে ছোট মতো একটা লেগুন পার হতে হয়। লেগুনের জল ভারি পরিষ্কার। পায়ের পাতা ভেজে না। ওরা পার হয়ে গেল লেগুন। এবং অন্য একটা দ্বীপের মতো লাগছে। ওরা দ্বীপের গাছপালার ভেতর ঢুকেই দেখতে পেল জেনি দূরে একটা পাথরে চুপচাপ বসে আছে। সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে জমি নিচে নেমে গেছে। আর ছোট মতো জলাশয়। হ্রদের পারে জেনি বসে জলে বোধ হয় নিজের প্রতিবিম্ব দেখছে। হ্রদের পারে সুন্দর মতো সবুজ উপত্যকা, অনেকটা দূরে সেই পাহাড়-শ্রেণীর পাদদেশে গিয়ে মিশেছে। পাথরে বসে চুপচাপ সকালের রোদে, ঘাস, প্রজাপতি এবং জলে ফড়িঙের ছায়া দেখতে দেখতে কেমন আনমনা হয়ে গেছে জেনি।

রিচার্ড ছুটে গিয়ে আর্চির হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল। বলল, কি হচ্ছে এসব!

—আরে বোঝ না, জেনি একা এত ভেতরে গিয়ে বসে আছে—কোথাও যদি সত্যি সেই শয়তানটা লুকিয়ে থাকে, জেনিকে দেখলে সে কিছু করে ফেলতে পারে। সেজন্য গুলি ছুঁড়ে আবার ভয় দেখালাম। জঙ্গলে থাকতে থাকতে মাথাটা যে জানোয়ারের মতো হয়ে যায়নি কে জানে। বার বার গুলি ছুঁড়ে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার আমরা খালি হাতে নেই।

ওরা ততক্ষণে জেনির কাছাকাছি এসে গেছে। আর্চির দিকে মুখ না তুলেই বলল জেনি, কোন শয়তানটার কথা বলছ!

—আরে ঐ যে দাঁড়ি গোঁফওয়ালা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের একটা দানব না দৈত্যকে মাঝে মাঝে জাহাজী মানুষেরা দেখে ফেলে। আসলে কোনো সভ্য

মানুষ কি কখনও এ-ভাবে নির্জন দ্বীপে বছরের পর বছর থাকতে পারে! ওটা শয়তান! শয়তান না হয়ে যায় না।

—আমি তার খোঁজেই আছি আর্চি। ক্যাবট আমার দৈত্য দানব যা হোক তবু সে আমার ক্যাবট।

—সে ক্যাবট হতেই পারে না। তুমি যে কি না জেনি, তুমি ভীষণ বোকা। বোকা না হলে এ-ভাবে কেউ আসে! ও কি সুন্দর দিন! এখন কার্ডিফ ক্যাসেলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া কি মনোরম। পত্রিকাগুলোর এমন সব গুজব ছড়িয়ে কি লাভ বুঝি না। মানুষকে এরা একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না!

ওরা সবাই জেনির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। আর্চি বকর বকর থামাচ্ছে না। রিচার্ড বুঝতে পারছে হ্রদের জল ভারি নির্মল। দূরে জল পড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কোনো ঝর্ণা থেকে জল পড়ছে। রিচার্ড দৌড়ে চলে গেল। গাছপালা খুব একটা কিছু নেই। সহজেই সে ওপারে ওঠে বলল, কোথা থেকে জল এসে পড়ছে দ্যাখো। এবং সে হেঁটে গিয়ে কিছুটা দূরে একটা উষ্ণ প্রস্রবণের খোঁজ পেয়ে গেল। সামান্য জল তুলে মুখে দিয়ে বুঝল ভারি মিষ্টি জল। দ্বীপে কোনো মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকার জন্য এই জলই যথেষ্ট। বরং সত্যি যদি কেউ থাকে, এদিকটায় দিনরাত নজর রাখলেই মানুষটা ধরা পড়ে যাবে।

থমপ্সনও দেখছিল সব। আগের পথটা ভারি গোলমেলে। এখানে সেটা নেই। ঝোপ জঙ্গল কম। কেবল পাথর আর শ্যাওলা। দূরে দূরে বনরাজিনীলা। কেমন মায়াবী লাগছে সকালের রোদে। কিছু কীট-পতঙ্গের আওয়াজ। কোনো জন্তু জানোয়ারের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কি একটা খরগোসও দেখতে পেল না। কিছু কাকড়া, ছোট ছোট মাছ এবং সবুজ শ্যাওলা দেখতে পেল হ্রদের জলে। সে ঘুরে ঘুরে একটা জায়গায় এসে থমকে গেল। একটা ঘাটের মতো। রোজই কারা আসে। আর্চিকে ডাকতেই বলল, দ্বীপের জন্তু জানোয়ারেরা এদিক-টায় নেমে জল খায়। অবাক হবার কি আছে।

—হতেও পারে। থমপ্সন আর কিছু বলল না।

রিচার্ড ফিরে এসে বলল, সকালে কিছু পেটে পড়েনি। এ-ভাবে চুপচাপ বসে থাকলে আর্চির খুব কষ্ট হবে। রিচার্ড এ-বলে সামান্য উল্লাসের সঙ্গে ঠাট্টা করল আর্চিকে। আর্চি সিগারেট ধরিয়েছে। ঠাট্টা গায়ে মাখছে না। সে কারো দিকে বিশেষভাবে তাকাচ্ছেও না। জেনিকে পাহারা দেওয়া, সব সময় সতর্ক থাকা যেন ওর কাজ। সে একটু খস খস শব্দ হলেই হাঁটু গেড়ে বন্দুক হাতে বসে পড়ছে। জেনি তখন হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারছে না।

আসলে এটা একটা দ্বীপ, কি অনেকগুলো দ্বীপের সমষ্টি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। ওরা ফিরে আসার সময় সামান্য ঘোরাপথে এসে দেখল সমুদ্র ভেতরে ঢুকে দক্ষিণে হারিয়ে গেছে। জল খুবই কম। এবং থমপ্সন বুঝতে পারল জোয়ারের সময় এই দ্বীপটাই অনেকগুলো দ্বীপ হয়ে যায়। জোয়ার নেমে গেলে দ্বীপটা আবার একটা হয়ে যায়। এবং সেদিনেই বিকেলে আবিষ্কার করা গেল জল নেমে যাবার সময় অসংখ্য ছোট ছোট সামুদ্রিক মাছ ডাঙায় আটকে যায়। মাছ সংগ্রহ করার কাজটা খুব সহজ। থমপ্সন ফেরার সময় বেছে বেছে কিছু ভাল জাতের সার্ডিন, এবং দু-গণ্ডা ম্যাকরল নিয়ে এলে আর্চি আনন্দে থমপ্সনকে জড়িয়ে ধরল। রাতে শুধু ফ্রাইপ্যানে মাছ ভাজা, আর জ্যোৎস্নায় বসে মদ্যপান।

জ্যোৎস্না আকাশে রাত নটা দশটা পর্যন্ত থাকবে। জেনিকে নিয়ে একবার বনের অভ্যন্তরেও ঘুরে আসা যাবে। কেমন এক নতুন জীবন, আর্চির মতো মানুষও মাছগুলো দেখে দ্বীপটার পেছনে কিছু ভাল ভাল বিশেষণ জুড়ে দিতে চাইল।

কিন্তু আর্চি, জেনির মুখের দিকে তাকিয়ে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। এমন ভোজের ব্যাপারে জেনির কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। এখানে আসার পর জেনি একবারও হাসেনি, জোরে কথা বলে না। চুপচাপ, নিমগ্ন একভাব। সে তাকিয়ে বুঝল, জেনির মনটা কাছে কোথাও নেই। দ্বীপের অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বুঝি। কেমন অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে কিছুটা। আগের মতো উজ্জ্বল নয়। কথায় কথায় সুন্দর পরিচ্ছন্ন পরিহাসপ্রিয়তা যার স্বভাবে মজ্জায় ছিল, সে চুপচাপ অন্তহীন ভাবনায় ডুবে গেলে খারাপ লাগে বৈকি! যে করেই হোক জেনিকে স্বাভাবিক রাখা দরকার। সে নানাভাবে জেনিকে ইংলণ্ডের সমুদ্র উপকূলের সুন্দর বর্ণনা দিতে থাকল। সেই ডোভার পার হয়ে যে নির্জন একটা গ্রাম আছে, গ্রামের নাম এলফিন, সেখানে মাঝে মাঝে দ্বীপের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল রোদ ওঠে। কেউ খবর রাখে না। কেবল আর্চিই খবর রেখেছে, এ-আর কি রোদ, এ-আর কি সজীবতা, এখানে কি আর ফড়িং, প্রজাপতি, প্রকৃতির বিলাস আছে! সেই গ্রামে, চারপাশে সমুদ্রের জল খেলা করে বেড়ালে, রঙ বেরঙের পোশাক পরে যখন সব সুন্দর সুন্দর শিশুরা বেলাভূমিতে নেমে আসে—তখন সমুদ্রের কি যে আশ্চর্য মহিমা!

রিচার্ড শুনতে শুনতে ভারি বিরক্ত বোধ করছে। বলল, থামতো আর্চি।

থমপ্‌সন বলল, কাল কি-ভাবে কাজ আরম্ভ করব দ্যাখো। থমপ্‌সন তার পরিকল্পনা মতো একটা জায়গা দেখিয়ে বলছে, ঐ যে দেখছ, দ্যাখো না, দূরবীনে দ্যাখো, ডানদিকে লম্বা একটা গাছ সবার ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে না, গোল গোল পাতা, আমি তো দূরবীনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমরা দেখে নাও, কেমন একা দ্বীপে মহামহিম হয়ে আছে, জেনি উঠে দাঁড়াও, না দাঁড়ালে দেখতে পাবে না। ঠিক বুঝতে পারছ, তুমি আর্চি, রিচার্ড কি বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, সেখানে আমরা কাল যাব। কিন্তু থমপ্‌সন যখন দেখল জেনি টিনের চেয়ারে তেমনি মাথা হেলিয়ে বসে আছে, কোনো উৎসাহ নেই তখন কেমন ক্ষেপে গেল। বলল, কি হয়েছে তোমার জেনি! এখানে এসেই দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছ। দেখছো তো চেষ্টা কম করছি না। সব না দেখে আমরা যাব না। হেস্ত নেস্ত কিছু একটা হবেই। ঐ যে দ্যাখো, দেখছো তো! কাল না যেতে পারলে, অন্তত দশদিনের মাথায়ও সেখানে আশা করি যেতে পারব।

আর্চি বলল, তার আগেই জেনি পালাবে। বলবে, হয়েছে। যতো সব গুজব। জেনি কি বলে!

রিচার্ড বলল, জাহাজ না এলে কেউ ফিরতে পারছি না এটা অন্তত সবার মনে রাখা দরকার।

আর্চি তাঁবুর ভেতর থেকে আর একটা টিনের চেয়ার বের করে নিল। তারপর ভারি আরামে বসে পড়ার মতো বলল, ফিরতে না পারি তো কি হয়েছে! দেখছ না কেমন সব কচি খরগোসরা দৌড়াচ্ছে! কিছু মেরে নিলেই হবে। তারপর আগুনে ঝলসে রোস্ট—আহা বিচিত্র সুখ। দ্বীপে না এলে এ-সুখের খবর পেতাম না। কি আরাম—পুরানো মদ, জ্যোৎস্না রাত, সমুদ্রের বাতাস, আকাশের নক্ষত্র, আর জেনি, জেনি...সে ঠোঁট চাটতে থাকল। ভাঙ্গা রেকর্ডের মতো জেনি

শব্দটা গলায় ঘড় ঘড় করতে থাকল তার। থমপ্সন বুঝতে পারল আর্চির ভাঙ্গা রেকর্ড থামবে না। সে এবারে উঠে দাঁড়াল। কিছুটা বক্তৃতার কায়দায় বলে গেল —মানুষ এ-দ্বীপে থাকলে আমরা নানাভাবে বুঝতে পারব। অবশ্য সে ক্যাবট অথবা চ্যাটার্জী নাও হতে পারে। তবু যখন অভিযানে আসা গেল, তখন আপনারা মনে রাখবেন, মানুষ আলো জ্বালবে। আগুন জেলে তার খাবার তৈরি করবে। ধোঁয়া অথবা আগুন দেখে বুঝতে পারব দ্বীপে মানুষের বাস আছে। তিন চার দিন হয়ে গেল কিছুই দেখা যাচ্ছে না। খুঁজতে খুঁজতে কখনও মানুষের মল মূত্রের গন্ধেও আমরা টের পেতে পারি দ্বীপে মানুষ আছে। কাল সকাল থেকেই পুরোদমে কাজ আরম্ভ করব ভাবছি। রাতে সব ঠিকঠাক করে রাখতে হবে। ঝোলা ক্যামেরা, ফ্লাসকে গরম কফি, দূরবীন এবং খুব পরিশ্রান্ত মনে হলে সামান্য মদ। সুতরাং শুধু শুধু রুজা উজির মেরে লাভ নেই। কাজের কাজ কিছু করা দরকার। জেনি তুমি কিছুই আজকাল খাচ্ছ না। ওঠো। মাছগুলো কাটাকুটির ভার তোমার। ওঠো। এসে কি এখানে ভয় পেয়ে গেলে!

আর্চি সুযোগ বুঝে ক্যামেরা বাগিয়ে বলল, দাঁড়াও। একটা ছবি তুলি। আপনারা দাঁড়িয়ে যান। একটু হাসবে জেনি। এই রিচার্ড তুমি ভাই খুব ভাল। আমাদের একটা ছবি তুলে দাও। এমন সুন্দর জায়গা পৃথিবীর কোথাও আর পাওয়া যাবে না। কি সুন্দর শেষ বেলার রোদ!

জেনি কিছু বলল না। যে-ভাবে দাঁড়ালে আর্চি খুশি হয়, ঠিক সে-ভাবে সে দাঁড়িয়ে গেল। রিচার্ড ছবি তুলে দিল দু-জনের।

পরদিন সকালে সেই খুব দূরের গাছটার উদ্দেশ্যে ওরা রওনা হয়ে গেল। গতকাল যে হ্রদটা ওরা আবিষ্কার করেছিল তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় রিচার্ড সহসা থমকে দাঁড়াল। বলল, কি গন্ধ!

আর্চি দৌড়ে এসে বলল, কিসের গন্ধ!

—চর্বি, চর্বি পোড়া গন্ধ!

আর্চি নাক টেনে বলল, কোথায়!

জেনি কেমন ঘাবড়ে গেছে। সে জেনির দিকে তাকিয়ে বলল, ভয় পাচ্ছ কেন। যদি ক্যাবট এখানে থেকে অসভ্য জংলী হয়ে যায় তবে আমরা তাকে ক্ষমা করব না। সে শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

থমপ্সনও বাতাস কোন দিক থেকে আসছে, বাতাসের সঙ্গে যদি সত্যি চর্বি পোড়া গন্ধ ভেসে আছে, অথচ দু-বার নাক টেনে কিছুই টের পেল না—রিচার্ড বাজে বলার লোক নয়। সে বলল, তোমরা সবাই এত গোলমাল করছ কেন। সবাই বসে পড়। আড়াল করে ফেল নিজেদের। জেনি চুপচাপ উঁকি দিয়ে দূরের পাহাড়ে তখন কিছু যেন লক্ষ্য করছে। কেবল আর্চি অবাক। ওরা সবাই মিলে এত কি দেখছে! কিছুইতো দেখা যাচ্ছে না। গাছগুলোর মাথায় রোদ পড়ে এক ধরনের সবুজ সোনালী রঙ। ক্বচিৎ দুটো একটা পাখির আওয়াজ। এবং অনেক দূরে এক অতি দ্রুত ধাবমান জন্তুর ডাক। হরিণ টরিণ হতে পারে। আর কেবল সারি সারি গাছের কাণ্ড, শুকনো ঝরা পাতা, লতাপাতায় ঢাকা শুধু সেই আদি-মতা। আর পেছনে পাথরের পর পাথরের ঢিবি। ভেতরে বোধ হয় সব লম্বা গুহা পথ আছে। মানুষের সেখানে কিছুতেই ঢোকার সাহস থাকার কথা নয়।

আর্চি খুব পাণ্ডিত্য ফলাতে চাইল। বলল, ও কিছু নয়। তোমরা এস।

রিচার্ড বলল, তোমরা কেউ চর্বি পোড়া গন্ধ পাচ্ছ না!

আর্চি নাকটা উঁচু করে দিল। —যততো সব। তোমাদের হয়েছে কি! কোথায় গন্ধ! একেবারে বাজে ব্যাপার। দ্বীপে এসে সবাইকে কেমন তোমাদের ভূতে পেয়ে গেছে।

আর তখনই জেনি উঠে দাঁড়াল। স্থির গলায় বলল, জানো রিচার্ড, আমি তাকে দেখেছি।

—কি বলছ যা তা! আর্চি বাধা দিল কথায়।

রিচার্ড বলল, কোথায়!

ওরা সবাই এবার আড়াল থেকে বের হয়ে এসেছে। একটা বড় পাথরের ওপর সব ক-জন দাঁড়িয়ে। থমপ্সন কোনো গন্ধ পায়নি। রিচার্ড না পেলে কিছু বলার মতো মানুষ না। সে ভীষণ সংশয়ে পড়ে যাচ্ছে।

জেনি ফের বলল, সত্যি সে গাছপালার ভেতর দাঁড়িয়েছিল।

—কখন? থমপ্সন নেমে একটা পা পাথরে রেখে বন্দুকে ভর করে কথাটা বলল।

—কাল। কাল যখন চুপচাপ বসেছিলাম, মনে হল হ্রদটার ও-পাশে গাছ পালার অভ্যন্তরে সে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমাদের সাড়া পেয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

থমপ্সন বুঝল সেই এক ব্যাপার। ঘোরে পড়ে যাচ্ছে। সে আর এ-নিয়ে খুব নিরাশ করল না জেনিকে। কি জানি আবার এমন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মাথাটা বিগড়ে যায় কি না। সে কিছু বলে তাকে দ্বিধায়ও ফেলে দিতে চাইল না। বলল, ক্যাবট হলে ঠিকই আসবে। তুমি চিন্তা কর না জেনি।

আর্চি খুব ক্রুদ্ধ গলায় এগিয়ে গেল। —আপনি কি থমপ্সন! এখানে আপনিই প্রাজ্ঞ মানুষ। কি করে বুঝলেন, ক্যাবট হলে ঠিকই আসবে। আসলেই তাকে আসতে দিচ্ছে কে! সে কি আর আগের মানুষ আছে!

থমপ্সন চোখ টিপে দিল। আর্চি বুঝল ছেলে ভুলানো ব্যাপার চলছে। সে খুব দরাজ গলায় বলল, বেশ তুমি জেনি, যদি মনে কর, আমরা থাকলে ওর আসতে অসুবিধা হয়, তবে একা একাই ভেতরে ঢুকে যাবে। আমরা কেউ থাকবো না। কি-জানি সত্যি হয়তো আছে ক্যাবট।

রিচার্ড ততটা হাল্কা ভাবে ব্যাপারটাকে দেখল না। সে বলল, তুমি তাকে দেখেছ!

—দেখেছি।

আর্চির চোখ আবার ছানাবড়া হয়ে যাচ্ছে। সত্যি নয় তো আবার!

রিচার্ড বলল, কেমন দেখতে?

—স্পষ্ট দেখতে পাইনি।

—জামাটামা গায়ে ছিল?

—বোধ হয় আলখাল্লার মতো কিছু!

—কি করে বুঝলে একটা আলখাল্লার মতো কিছু!

—বাতাসে নড়ছিল। সবটা দেখা যায় নি। কিছুটা দেখেছি।

—গাছের পাতাটাতা নয়তো!

—হতেও পারে। কিছুই স্পষ্ট বলতে পারছি না।

—মুখ কামানো?

—না, চুল দাড়িতে ঢাকা।

আর্চি ততোধিক ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, থমপ্‌সন আমি পাগল হয়ে যাব। কি বলছে শুনছেন! পাগল হলে আপনারা কেউ পার পাবেন না।

থমপ্‌সন খুব শান্ত গলায় বলল, ঘাবড়াবে না আর্চি। তোমরা সবাই এমন করলে কি করি বলত!

—না বলছিলাম পাগল হওয়া কি বিচিত্র কিছু?

রিচার্ড জেনিকে তখনও জেরা করছে। —আগে বলনি কেন?

—দেখে কেমন মায়া!

আর্চি এবার চিৎকার করে উঠল। সব বাজে ব্যাপার। সব হেলোসিনেসান। ও কেন যে আসা! জেনি তুমি স্বাভাবিক হও। এমন আজে বাজে বকলে আমার মাথা সত্যি ঘুরে যাবে।

রিচার্ড আরও পীড়াপীড়ি করতে থাকলে জেনি বলল, দেখছতো আর্চিটা কি লাগিয়েছে। বরং এ-সম্পর্কে আর কোনো কথা না হওয়াই ভাল! বলে জেনি চুপ করে গেল। আর কিছু বলল না।

ওরা চুপচাপ হাঁটতে থাকল। জেনি আর কিছু বলতে রাজী না হওয়ায় আর্চির রক্ত মাথায় উঠে যাচ্ছে। ছেনালিপনার শেষ আছে। কিন্তু জেনি যা করছে তাতে ছেনালিপনাও হার মানে। সে রাগে দুঃখে বলে ফেলল, তোমাকে সব বলতে হবে। আমরা সব শুনব।

জেনি ততোধিক শক্ত হয়ে গেল। বলল, না বলব না।

—একশবার বলবে। না বললে তোমাকেই জ্যান্ত পুঁতে রেখে যাব।

জেনি কিছু বলল না। এতটা অবিবেচক আর্চি সে আগে কখনও টের পায়নি। একটা সত্যাসত্যের মুখোমুখী এসে আর্চির স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সে বলল, আর্চি তোমার যদি সত্যি খুন করার ক্ষমতা থাকত, তবে এতদূরে ক্যাবটকে খুঁজতে আমি আসতাম না।

রিচার্ড খুব বেশি কিছু বলতে পারছে না। বাবা আর্চির পারিবারিক ঐতিহ্য সম্পর্কে খুব সজাগ। আর্চিটা দেশে ফিরে সাতকাহন করে বললে বাবা দুঃখ পাবেন। সে-জন্য সে আর্চির মুখের ওপর কড়া কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

আর্চি ভেতরের উত্তেজনা সামলাতে না পেরে বলল, রিচার্ড তুমি তো পুরুষ মানুষ! তুমি কি করে যে চর্বির গন্ধ পাও বুঝি না। সব বাজে মিথ্যা। কি যে ভুল করেছি তোমাদের সঙ্গে এসে। তারপর জেনির দিকে তাকিয়ে কেমন শীতল হয়ে গেল। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, জেনির এমন বিপদের দিনে আমি পাশে না থাকলে আর কে থাকবে! তবে তুমি জেনি, লক্ষ্মী, একটু স্বাভাবিক না থাকলে ক্যাবটকে আমরা খুঁজে বের করতে পারব না। আচ্ছা রিচার্ড, সে রিচার্ডের দিকে না তাকিয়ে বলল, তুমি সত্যি করে বলত, চর্বির গন্ধ পেয়েছ কিনা।

রিচার্ড কি বলবে! বললেই তিক্ত শোনাবে। সে কিছু বলল না, থমপ্‌সনের সঙ্গে সে আগে আগে হেঁটে যেতে থাকল। আর্চি তবু রিচার্ডকে ছাড়ল না। সে দৌড়ে ওর পাশে হেঁটে গেল কিছুক্ষণ। তাকাল এদিক ওদিক। শেষে ইতঃস্তত গলায় বলল, চর্বির গন্ধ রিচার্ড মনের ভুল। সব সময় এই ধর যখন আমরা দেশ থেকে বের হব বলে ভেবেছি, তখন থেকে জেনি অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ভুগছে।

জেনি কত কিছুর গন্ধ পেতে পারে। তাই বলে তুমি! তুমিও জেনির মতো হয়ে যাচ্ছ!

এত কথা রিচার্ডের ভাল লাগছিল না। ধমক লাগাতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু বয়সে বড় মানুষটা। তা ছাড়া এই জনমানবহীন দ্বীপে কোনো কারণেই মাথা গরম করা চলে না। হাঁটার সময় ওরা কিছুটা অসতর্ক হয়ে পড়ছে। রিচার্ড মনে মনে গন্ধটা সন্দেহজনক নয় কিছুতেই ভাবতে পারছে না। বালিয়াড়িতে নেমে আসতে আসতে সূর্য ডুবে গেল।

জেনি এমন বিস্ময়কর সূর্যাস্ত দেখে কেমন মুগ্ধ হয়ে গেল। যতদূর চোখ যায় আদিগন্ত সমুদ্র আর নীল নেই। কিছুটা রক্তবর্ণ হয়ে গেছে। পাখিদের দ্বীপে ফেরার সময়। ঝাঁকঝাঁক পাখি উড়ে আসছে। কালো নীল সবুজ বিন্দু বিন্দু পাখির ঝাক ক্রমে মাথার ওপর স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল। সমুদ্র তার নীলের ভেতর সেই গাঢ় আগুনের উত্তাপ যেন শুষে নিচ্ছে। ধীরে ধীরে আকাশ এবং দিক দিগন্তের চক্রবাল ধূসর হয়ে উঠছে। দুটো একটা নক্ষত্র দেখা যেতে থাকল। দ্বীপের মাথায় হেলে আছে জ্যোৎস্না একটা অতিকায় করবী গাছের মতো। এটা বোধ হয় পঞ্চমী তিথি, বেশিক্ষণ দ্বীপে জ্যোৎস্না দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। সরে যাবে। যামিনী সামান্য বাড়লেই ফের অন্ধকারে ডুবে যবে দ্বীপে। তখনই দেখা গেল নীল জলে অজস্র ফসফরাস জ্বলছে। বালিয়াড়িতে মনে হয় লক্ষ কোটি মণি-মাণিক্য ছাড়য়ে দিচ্ছে, কেও আবার তুলে নিয়ে যচ্ছে নিমেষে। আশ্চর্য এক বাজিকরের খেলা চলছে দ্বীপটায় নিয়ত।

সমুদ্র শান্ত বলে অনায়াসে বালিয়াড়ির সমুদ্রের ভেতর অনেকটা হেঁটে যাওয়া যায়। পায়ের পাতা ডুবতে বেশ সময় লাগে। সে কিছুটা সমুদ্রেব ভেতর চলে গেল। চারপাশে জল, ছোট ছোট মাছ পায়ের পাতায় ঠোকরাচ্ছে। ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছিল জেনির। সে পরে আছে ট্রাউজার। লতা পাতা আঁকা জ্যাকেট। অথবা তখন জলের রঙের মতো তার নীল চোখে কোনো দূরাগত পাখির ডানার ছায়া—বোধ হয় সেখানে এখনও ক্যাবট জেগে আছে। স্মৃতিতে ক্যাবটের কোনে পুরোনো ছবি যা বার বর ভীষণ নতুন মনে হয়, খেলা করে বেড়ালে সে দেখল আকাশে আর একটা পাখিও নেই। সবাই ভাসতে ভাসতে কখন আকাশে অজস্র নক্ষত্র হয়ে গেছে। জেনিফার কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল এমন সব পাখিদের নক্ষত্র হয়ে যেতে দেখে। সে আর এগোতে পারল না। সমুদ্রের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকল।

আর্চি তখন ডাকল, জেনিফার!

জোরে ডাকলে অনেক দূরের পাহাড়ে প্রতিধ্বনি ওঠে। সেখানেও যেন তখন কেউ ডাকে, জে—নি—ফা—র!

আবার আর্চি ডাকল, জেনিফার এদিকে এস।

সেই দূরের পাহাড়ীশ্রেণী থেকে ফের প্রতিধ্বনি, জে-নি-ফা-র এ-দিকে এ-স।

ঠিক এমন একটা সময়ে ক্যাবটের স্মৃতি, ওর দুষ্টুমী, ছেলেমানুষী সব মনে পড়লে হুহু কান্নায় জেনি কেমন ভেঙে পড়ল। পেছনে দ্বীপের কোথাও ক্যাবট দাঁড়িয়ে তাকে যেন ডাকছে, জেনিফার আমি অ ছ এখানেই আছি। চ্যাটার্জী আর আমি একসঙ্গে থাকি। আমরা এ-দ্বীপের বর্ণমালায় মুগ্ধ হয়ে গেছি জেনি। কোথাও আর যেতে পারিনি।

পরদিন সকালে ওরা ফের বোট নিয়ে বের হয়ে পড়ল। কারণ মোটর বোট দূরের দ্বীপটায় তাড়াতাড়ি যেতে পারবে। চারপাশের দ্বীপগুলোই আগে ভাল করে খুঁজে দেখা দরকার। পরে এই মূল দ্বীপে তন্ন তন্ন করে খুঁজবে। কোনো মানুষকে তার বন্য স্বভাব থেকে উদ্ধার করা খুবই কঠিন কাজ! থাকতে থাকতে বন্য হয়ে গেলে ধরা নাও দিতে পারে। স্মৃতি বিভ্রম ঘটতে পারে! কি যে ঘটে-ছিল স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। কোনো হত্যা খুন, তাও না। তবু থাকলে আগের মতো সভ্যই আছে এটা আর ভাবা যাচ্ছে না। থাকলে এতদিনে সে চলে আসত। তখন মনে হচ্ছে আসলে ক্যাবট আর স্বাভাবিক নেই। সে এতগুলো লোক দেখে নিতান্ত ভয় পেয়েছে বলে আসছে না। সে যাই হোক খোঁজাখুঁজির পর ওরা ফিরে আসবে মূল দ্বীপে। আজকের মতো থমপ্সন তাঁবু পাহারায় আছে। কেউ না থাকলেও ক্ষতি নেই। দু একবার সবাই তাঁবু ছেড়ে দ্বীপের অভ্যন্তরে ঢুকে গেছে, খোঁজাখুঁজি করে ফিরতে রাত হয়েছে, কিছুই এদিক ওদিক হয়নি।

সব দ্বীপগুলোর প্রকৃতি প্রায় একরকমের। সেই পাথর মাটি আর হলুদ রঙের ফুলে ভরা এক রকমের ঘাস। প্রায় দ্বীপের মাঝখানে মিষ্টি জলের হ্রদ। এবং মনে হয় এগুলো অসংখ্য আগ্নেয়গিরির মৃত মুখ। কোনোটা অবশ্য প্রবালের। প্রবালের দ্বীপ দেখলেই চেনা যায়। বড় বড় গাছ প্রবাল দ্বীপে বড় একটা দেখা যায় না। চারপাশে সেই ঘন জঙ্গল আবার উর্বর ভূমিও আছে, নারকেল গাছ দুটো একটা চোখে পড়ছে। এবং এমন সব ফুল ফলের গাছ যা তারা একেবারেই চেনে না। আসলে এগুলো সবই গোলাপ জামের গাছ, চালতা গাছ, বনকরবী, নিশিগন্ধা। ঘুরে ঘুরে ওরা দেখল কোথাও কোনো মানুষের চিহ্ন নেই।

ফেরার পথে দেখল, ঠিক দুটো দ্বীপের মাঝখানে সমতল জায়গা। সমুদ্রের জল উঠে আসছে, নেমে যাচ্ছে। ঢেউগুলো প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়ছে। জল যাবার সঙ্গে মাছগুলো সরে যেতে পারছে না। খলবল করে লাফাচ্ছে। আর একটা ঢেউ না আসা পর্যন্ত ওরা চলে যেতে পারছে না। পাথরের এমন একটা সমতল জায়গায় রুপোলি এমন মাছেদের ছড়াছড়ি দেখে জেনিফার সহসা বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর একটা মাছও ধরতে ইচ্ছে হল না। বরং ওদের দেখে সে বুঝল এরা এখানে সেই প্রাচীনকাল থেকে লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে। তার মাছ ধরার আদৌ উৎসাহ নেই।

কিন্তু আর্চি, আরে আরে দেখেছ, বলেই সে হামাগুড়ি দিয়ে সেই সমুদ্রের উপত্যকাতে মাছ ধরতে আরম্ভ করে দিল। সে যতটা পারল মাছ তুলে নিল বোটে। আর্চির এত লোভ জেনিফারকে সত্যি কেমন ভারি উদাসীন করে ফেলল।

ওরা পর পর আরও সব দ্বীপে ঘুরে বেড়াল।

সেই একরকমের গাছপালা পাহাড় মাটি ফুল। খরগোসেরা দলে দলে ছুটে বেড়ায়। ওরা মানুষ দেখলে ঠিক ভয় পায় না। তার জন্য খুবই সহজে মারা পড়ছে আর্চির হাতে। আর্চি ফেরার সময়, খরগোস, কচ্ছপ যখন যা পায় সামনে মেরে বোটে তুলে নেয়। বেশ আর কটা দিন। মহা আনন্দ। আর আছে সেই সব

পাখিদের ফিরে আসা। অযথা আর্চি বন্দুক ছুড়ে ওদের নামিয়ে আনে। নিষ্ঠুরতার শেষ থাকে না। সে খুশিমতো পাখিদের মেরে ফেলে রাখে জঙ্গলে। কচ্ছপ মেরে কখনও ফেলে দেয় সমুদ্রের জলে। জীব জন্তু হত্যা করার প্রচণ্ড উম্মাদনায় ওকে পেয়ে বসেছে। খরগোসের পালে বন্দুকের ছররায় অজস্র খরগোস মরে থাকে। মরে যাবার আগে ওদের পাগুলো তির তির করে কাঁপে। পাশে দাঁড়িয়ে আর্চি ভীষণ আহ্লাদে চিৎকার করে ওঠে—কিরে কেমন লাগছে মরে যেতে! জেনিফার তখন না বলে পারে না, আর্চি তোমার কষ্ট হয় না!

আর্চি ক্রমে আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। যত দিন যাচ্ছে সে বুঝতে পারছে, জেনি একা একা ঘুরতে পছন্দ করে। কথা বললে কোনো জবাব দেয় না। জেনিফারের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য সে একদম সহ্য করতে পারে না। গলায় গলায় হাত ধরে হাঁটতে ইচ্ছা করে—জেনি কিছুতেই হাঁটবে না। তার ক্ষেপে যাবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

বোধ হয় এ-জন্যেই সে অকারণ সব হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে যাচ্ছে দ্বীপে। এক সকালে সে উঠেই বড় একটা বাঁদর মেরে নিয়ে এল দ্বীপ থেকে। সে দ্বীপের কীট-পতঙ্গ, গাছের ডাল-পালা, ফুল-ফল, লতা-পাতা যখন সামনে যা পাচ্ছে নষ্ট করে ফেলছে। সে বুঝে ফেলেছে, বড়ই নিরাপদ এইসব দ্বীপগুলো। পত্রিকার সংবাদ বিচিত্রা কত অশ্লীল ক'দিনেই টের পেয়ে গেল। জেনি দুটো একটা কথা যা বলেছে সবই ঘোরে পড়ে। সুতরাং বাকি কটা দিন খাও দাও ঘুরে বেড়াও। সে অযথা গুলিগোলা ছুড়ে নিঃশেষ করে দিল। রিচার্ড এ-নিয়ে গজগজ করছিল। থমপ্সন আর কিছু বলে উসকে দিতে চাইছে না। জেনির থাকল কি গেল আসে যায় না।

এবং সে রাতেই!......

চারপাশে তখন শুধু সাদা জ্যোৎস্না। সমস্ত বনভূমি জুড়ে শুধু কীটপতঙ্গের আওয়াজ। স্থির মায়াবী ছবির মতো হয়ে আছে দ্বীপটা। এবং সেই এক মরীচিকার রহস্য। সামনে সমুদ্র, সাদা জ্যোৎস্না নীল জলে খেলা করে বেড়াচ্ছে। তাঁবুর কথাবার্তা কানে আসছে। আর্চি আগুনে খরগোসের মাংস ঝলসে নিচ্ছে। রিচার্ড মাখন বের করছে। আস্ত মাংসের পেটে পিঠে মাখানো হবে। তারপর সামান্য গোলমরিচের গুড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হবে। জেনিকে আর্চি দুবার খেতে ডেকে গেছে। বলে গেছে এমন সুন্দর রাত পৃথিবীতে বড় একটা মানুষের আসে না। একে উপভোগ করা দরকার।

এমন রাত সত্যি উপভোগ করার মতো। আর্চি থমপ্সন এবং রিচার্ড ব্যস্ত সে-জন্য। বেশ চাক চাক করে টমেটো কাটছে রিচার্ড। শসা কেটে রেখেছে লম্বা করে। গোল করে কেটেছে পেঁয়াজ। আস্ত একটা খরগোসের রোস্ট বড় প্লেটে। ওতেই চারজনের পেট ভরে যাবে। কিছু গ্রীনপীজ সেদ্ধ। আর ইচ্ছেমতো মদ।

জেনি সামান্য খেয়ে চলে এসেছে। ওরা তখনও খাচ্ছে। রাত খুব একটা বেশি হয়নি।

ওরা খাচ্ছে দাপটে। চিৎকার চেঁচামেচিও করছে মাঝে মাঝে। আগের মতো কেউ আর একেবারেই সতর্ক নেই। বেশি খেলে, রিচার্ডের ভীষণ চিৎকার করার স্বভাব। থমপ্সন বেশি খেলে ঘুম মেরে যাবে। সে তখন কিল চড় ঘুসি পর্যন্ত হজম করে ফেলতে পারে। আর আর্চি বেশি খেলেই মেয়েলি গলায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মানুষের ভেতরে যে কি আছে! জেনিফার ভেবে পায় না।

ক্যাবটের কথাই ধরা যাক না, যে জাহাজে পাগলের মতো দিন কাটিয়ে দিত, কখন জাহাজ হোমে ফিরবে কখন দেখতে পাবে জেটিতে দাঁড়িয়ে আছে জেনিফার, সেই ক্যাবট কথা নেই বার্তা নেই নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেল! নিরুদ্দিষ্ট না স্বেচ্ছা নির্বাসন। আরতো বেশিদিনও নেই!

জেনিকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে ক্রমে হতাশ হয়ে পড়ছে। আগের মতো আর তার তেমন উদ্যম নেই। চুপচাপ বসে থাকতেও ভাল লাগছে না। সারাদিন কোথাও যাওয়া হয়নি। সবকিছুই একঘেয়ে লাগছে। সামান্য পায়চারি করতে করতে বনটার কাছে চলে এসেছে কখন টেরই পায়নি। আর বনটার কাছে আসতেই কেমন প্রলোভনে পড়ে গেল। সে ক'দিন থেকে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না বলে, সব কিছুই সহজ স্বাভাবিক। আসলে মাথাটা বোধ হয় এখন তেমন ক্যাবটের চিন্তায় অস্থির থাকে না। সে সাহসী হয়ে উঠেছিল। আসলে সে মরীচিকাই দেখেছে। কোনো আলখাল্লা অথবা চুলদাড়িতে ভরা কোনো মুখ সে দেখেনি। তা না হলে এতদিন থাকল, দ্বীপের হেন জায়গা নেই খুঁজে দেখেনি, আর দেখা গেল না কেন! সে এমন সব ভেবে সহজেই দ্বীপের ভেতর একা ঢুকে গেল। আজকাল কাছাকাছি জায়গাগুলো খুব চেনা এবং পরিচিত। তবু রাতে একা কখনও খুব ভেতরে ঢোকেনি। ক্যাবট ওকে একা দেখলে রাতে যদি সাহস পায় কাছে আসতে। এতদিন ওদের গুলি-গোলা ছিল, অবশ্য ক্যাবট কি করে জানবে সব শেষ, নানারকম ভাবনা আবার জেনির মাথায়। কেবল জেনিফার তার রিভলবার ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিল। গাছ-পালার ছায়ায় পাতার খসখস শব্দে হেঁটে বেড়ালে মনে হয় পেছনে কেউ অনুসরণ করছে। সে দুবার পেছন ফিরে দেখেছে। কেউ নেই। কবুতরের মতো সাদা জ্যোৎস্না ডিমে তা দিচ্ছে এখানে সেখানে।

কিছুটা ঘুরতে ফিরতেই মনে হল, এখানে কিছুদিন থাকলে কেউ আর সত্যি ফিরে যেতে চাইবে না। ক্যাবটের সঙ্গে সে মাঝে মাঝে তার প্রিয় গান ডুয়েট গাইত। নিরিবিলি জ্যোৎস্নায় সে বেশ ধীরে ধীরে পায়ে তাল দিয়ে একটা গান গাইল। কত সব তুচ্ছ ঘটনা জীবনের সব এক এক করে মনে পড়ছে। ওর আর কোনো দুঃখ থাকল না। সে ক্যাবটকে যথেষ্ট খুঁজে গেল। আর তখনই মনে হল পেছনে এসে কেউ দাঁড়িয়েছে। আর্চির লোভ ভীষণ। সে হয় তো নেশার ভান করে ছিল। আসলে ওকে বনের ভেতরে ঢুকে যেতে দেখেই সেও পায়ে পায়ে পিছু নিয়েছে। কিন্তু পেছনে ফিরে তাকাতেই জেনির সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। সাদা জ্যোৎস্নায় বনভূমির অন্ধকারে ষোড়শ শতাব্দীর সেই জলদস্যু সত্যি দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের মতো চোখ। ভারি লেনসের চশমা। চুল দাড়িতে মুখ ঢাকা। পায়ে বাদসাহী আমলের নাগরাই জুতো।

সে এতটুকুই দেখতে পেয়েছিল। তারপর মাথা ঝিমঝিম করছিল—পা টলছে, জেনির। সে জানে, হিপ পকেটে ওটা আছে : কিন্তু হাঁটু ভেঙ্গে আসছে ক্রমশ। পা তুলে ছুটতে পারছে না। চিৎকার করে বলতে চাইল, তুমি কে! তুমি কে! কিছুই বলতে পারল না। বোধ হয় টলতে টলতে পড়ে যাচ্ছিল। কেউ ধরে ফেলল। এবং সেই আশ্চর্য সুপ্তির ভেতর সে টের পেল, তাকে কাঁধে ফেলে মানুষটা নিচে নেমে যাচ্ছে। জলের ঝাপটা দিচ্ছে। সে চোখ খুলে তাকালে সেই জলদস্যু ভারি নরম গলায় বলছে, জেনিফার তুমি মূর্ছা গেছিলে।

গলার স্বর ভীষণ ঠাণ্ডা। জেনি বলল, তুমি কে! তুমি ক্যাবট কিনা বল!

তা না হলে চিৎকার করব। কিছুই অস্পষ্ট অন্ধকারে বুঝতে পারছি না।

সে তেমনি শীতল গলায় বলল, জেনিফার!

লোকটা অসভ্য আদিম, অথবা অন্য কোনো গ্রহের লোক! শুধু একটা কথাই ভাঙ্গা রেকর্ডের মতো বলছে, জেনিফার। আর্চির সেই চিৎকার করে জেনিফার ডাকা থেকে কি এই নির্বাসনে থাকা মানুষটা জেনে নিয়েছে তার নাম জেনিফার!

জেনিফার বলল, তুমি কে বল! আমি চিৎকার করব বলছি। তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে!

সে বলল, জেনিফার তুমি আমাকে চিনতে পারছ না!

—ক্যাবট! ক্যাবট তুমি! এস দেখি। এস, কোথাও পাথরের ওপরে উঠে দাঁড়াও, দেখি। টর্চ, টর্চ, আমার একটা টর্চ চাই।

সে বলল, জেনিফার আমি ক্যাবট নই।

—তবে তুমি কে। হা ভগবান! লোকটা আমাকে নিয়ে কি করছে! বলছে সে ক্যাবট নয়!

—জেনিফার ভয় পাবে না। আমি কোনো অনিষ্ট করব না তোমায়। চল তোমাকে দিয়ে আসি।

জেনিফার বলল, যেতে হবে না। নিজেই চিনে যেতে পারব।

—যেতে পারবে না জেনিফার। কোথায় আছ তুমি জান না।

স্বপ্ন বুঝি। জেনিফার নিজের গায়ে চিমটি কেটে দিল। লাগছে। একটা ঢিল তুলে ছুঁড়ে দিল লোকটার দিকে। লোকটা উবু হয়ে বসে পড়ল। বলছে, জেনিফার কি পাগলামী করছ!

—তুমি কে বল! ক্যাবট কোথায় বল! যেসাস আপনি আমাকে আর সামান্য সাহস দিন। লোকটাকে ভাল করে দেখি। লোকটা আমাকে ঠেকাতে চাইছে। মিথ্যে কথা বলছে।

মাথা থেকে এবার টুপি খুলে ফেলল লোকটা। কোঁকড়ানো চুল। ঘাড়ের কাছে প্রাচীন সম্রাটদের মত চুল থাক থাক করা। জ্যোৎস্নার দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে লোকটা। এবং তেমনি সামনে দাঁড়িয়ে জেনিফারকে দেখছে। এতটুকু উত্তেজনা নেই, কোন অধীরতা নেই। পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর মতো যেন সেই সুপুরুষ।

জেনি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, রিচার্ড, থমপ্‌সন, দ্বীপে বলেছিলেন কেউ নেই, এই যে, দেখুন। বলেছিলেন ঘোরে পড়ে গেছি, আসুন দেখে যান। এবারে কিছুতেই ছাড়ছি না। তুমি যেই হও, ভাল করে সব জেনে নেব।

সেই মানুষ তখন খুব রাশভারি গলায় বলছে, তুমি ডাকাডাকি করলে, আমাকে চলে যেতেই হবে। প্লিজ ওদের কাউকে এ-ভাবে ডাকবে না।

—কেন কেন! আপনি যদি সত্যি ক্যাবট না হন, বলুন। আমি চলে যাব। আপনি যদি সত্যি কোনো খবর দিতে পারেন ক্যাবট কোথায়, এখানে সে এসেছিল কিনা? আমরা তার সব খবর চাই। প্রথমে আপনি সত্যি করে বলুন। আপনি বাইরে আসুন। এমন কোনো পাথর নেই, যেখানে দাঁড়ালে আপনাকে স্পষ্ট দেখতে পাই—আপনি যাই ভাবুন, কিছুতেই ছাড়ছি না। বলেই সে তার হিপপকেট থেকে কিছু বের করে একটু দূরে সরে দাঁড়াল।

—আসার সময় ওটা পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল।

জেনির হাত শিথিল হয়ে গেল।—কিছু নেই!

—না তেমনি আছে?

জেনিফার দ্রুত চেম্বার খুলে দেখল, সব ঠিক আছে।

সে এবার কেমন শক্ত গলায় বলল, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

—কোথায়?

—তাঁবুতে। ওখানে রিচার্ড, থমপ্সন, আর্চি আছে।

—আচ্ছা রিচার্ড তো তোমার যমজ ভাই?

—যেসাস আমাকে সাহস দিন। লোকটা আমাকে নিয়ে তামাসা করছে। রিচার্ডকে পর্যন্ত সে চেনে!

—থমপ্সন আগের চেয়ে মোটা হয়েছে। টাকটা ভারি সুন্দর।

জেনি কেমন তার আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে বলল, তুমি যেই হও, যেসাস আমাকে আর সামান্য সাহস দিন। শেষবারের মতো মোকাবেলা করার সাহস দিন। আমি কেমন সব গুলিয়ে ফেলছি। ক্যাবটের মুখ ভুলে যাচ্ছি কেন! ওর স্বর কথাবার্তা সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। আমি কি যে করি!

সে বলল, উতলা হবে না জেনি!

—তবে কেন বলছেন না আপনি কে! আমাকে রক্ষা করুন। কিছু চাই না। যদি কিছু ভুল করে থাকি ক্যাবট......

—আমি ক্যাবট নই। আমাকে চেনা উচিত ছিল তোমার।

—চ্যাটার্জী!

সে চুপ করে গেল।

—সেই চশমা মোটা লেন্সের! চ্যাটার্জী তুমি, চ্যাটার্জী আমার মাথাটা কেমন করছে আবার। সে হাত বাড়িয়ে চ্যাটার্জীকে ছুঁতে চাইল। জেনিফার কেমন স্তব্ধ হতবাক হয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

সুপুরুষ মানুষটি বলল, জেনি বোস।

—না না, আমি বসব না। ক্যাবট কোথায়?

—সব বলব।

—না না, আমার দেরি করার সময় নেই। বল, ক্যাবট কোথায়?

—জেনি যদি অধীর হও, তবে চলে যাব।

—চ্যাটার্জী তুমি ভুল করছ।

—জেনিফার ওটা রেখে দাও। কেন শুধু শুধু ছেলেমানুষী করছ!

কেমন লতা গাছটির মতো নেতিয়ে পড়ল জেনিফার। হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল। সত্যি আর এক বিন্দু ক্ষমতা নেই শরীরে। এমন আকস্মিকতায় পড়ে যাবে, সত্যি একদিন এ-ভাবে মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে একজন প্রিয় জলদস্যুর সামনে, সে ভাবতে পারে নি। মানুষের এ-সব সময়ে কত রকমের গোলমাল হয়। ভুল বকতে থাকে। সে একটা কথাও বেফাস বলেনি। বরং সত্যি আবিষ্কারের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। যখন পাওয়া গেল জোরজোর করা খুব একটা সমীচীন হবে না। সে চ্যাটার্জীকে ফের বলল, তোমরা এত নিষ্ঠুর চ্যাটার্জী!

চ্যাটার্জী পাশে একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসেছে। সে জেনিফারের কথায় সামান্য হাসল। ওর জলদস্যুর পোশাক, মোটা লেন্সের চশমা এবং লম্বা দাড়ি গোঁফ এতটুকু ভয়াবহ লাগছে না। টুপিটা পাশে রেখে দিয়েছে। কিছু বলছে না।

—তোমরা আমাদের এতদিন ভুলে থাকতে পারলে!

চ্যাটার্জী আঙ্গুল তুলে দূরের কি একটা দেখাতে চাইল। ওটায় উঠতেই দেখি নীচুতে দুটো তাঁবু।

—কবে দেখলে!

—যেদিন এলে।

—ক্যাবট সঙ্গে ছিল!

চ্যাটার্জী আবার চুপ মেরে গেল।—দ্বীপটা কেমন লাগছে তোমার!

—ভাল না।

—তোমার সঙ্গে আর একজন কে?

—আর্চি।

—লোকটা ভাল না।

—তোমরা খুব ভাল বুঝি! ক্যাবটের কাছে আমার কি অপরাধ চ্যাটার্জী। তুমিই বল! কি কিছু বলছ না কেন?

চ্যাটার্জী ফের চুপ মেরে গেল!

—আচ্ছা তুমি ক্যাবটের কথায় এলেই চুপ করে থাক কেন! বল আমি তো মানুষ। কিছু না বলে আমাকে টর্চার করছ। তারপর মনে মনে ভাবল, ক্যাবট কি সত্যি দ্বীপে নেই! হতেই পারে না। দু'জনের একজন থাকলে অন্য জনও থাকবে। সে মনে করার চেষ্টা করল ক্যাবটের অনুপস্থিতিতে কখনও কারো কাছে খুব একটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল কিনা! সে এমন কোন ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারছে না। দ্বীপের কিছু কীট পতঙ্গের আওয়াজ, পাতা পড়ার শব্দ, কখনও কোনো পাখির কলরব। তারপর নিঝুম, দূরে কেমন ঝিল্লির মতো জ্যোৎস্না পাহাড়ে বার বার ধাক্কা মারছে। মাথার ওপর অজস্র লতাগুল্ম। আকাশে কিছু মেঘের ভেসে যাওয়াব ছবি।

জলদস্যুর পোশাকে চ্যাটার্জী তার পাশে বসে রয়েছে। নিরীহ, স্বাভাবিক কথাবার্তা। যেন অনেকদিন পর দু'জন নরনারীর দেখা হয়েছে অপরিচিত জায়গায়। এর চেয়ে বেশি কিছু না। চ্যাটার্জীকে দেখে অন্তত তাই মনে হচ্ছে।

চ্যাটার্জী বলল, কি করে খবর পেলে জেনিফার।

—পত্র পত্রিকা থেকে।

—ওরাই বা কি করে জানল!

—মাছ ধরার নৌকা, দূরের জাহাজ তোমাদের কাউকে কখনও দেখতে পেত। নির্জন দ্বীপে কোনো মানুষ না থাকারই কথা। কিন্তু তোমাদের কাউকে না কাউকে দেখে ওরা খুঁজতে আসত। অথচ খুঁজে পেত না।

—বছর খানেক ধরে এই একটা উৎপাত। কিছু জেলে ডিঙ্গি শীতের সময় এখানে থেকে গেছে। মাছ ধরার একটা ভাল জায়গা এটা। ওরাই বুঝি খবর দিয়েছে!

—বোধ হয় তাই। ওরা খুঁজে পেত না।

—পাওয়া কঠিন।

—চ্যাটার্জী তোমরা কোনদিকটায় আছ, কি খাও। বেঁচে আছো কি করে!

চ্যাটার্জী বলল, আছ তো ক'দিন।

—জাহাজ না ফেরা পর্যন্ত আছি। ক্যাবটকে নিয়ে যেতে এসেছি। ওকে

একবার ডাকো না। দেখি। কেমন ছেলেমানুষের মতো আবদার জেনির।

সে বলল, থমপ্সনের সঙ্গে আশালতা অঞ্চলে একবার ঢুকে গেছিলে।

—আশালতা, সে আবার কোথায়!

—দ্বীপেরই একটা অংশের নাম।

—আশালতা, সে আবার কেমন নাম!

—সবই আমাদের দেওয়া। কখনও কোথাও গেলে ক্যাবটকে বলতে হয়, কোথায় গেছিলাম। নামিতে গেছি, না ডিহি-সাতরাগাছি না, আজুঘানিতে বলতে হয় সব। এ-জায়গাটার নাম বেল-ফুলারি। যখন খুব গরম পড়ে, এ-জায়গায় এসে দুপুরে শুয়ে থাকি। বেশ ঠান্ডা থাকে জায়গাটা। খুব গরমেও শীত শীত ভাব থাকে ঠান্ডা পাথরে।

—ক্যাবট কেমন আছে চ্যাটার্জী?

—ভাল আছে। আমার চেয়ে সুখে আছে।

জেনিফার তীব্র দুঃখে কাতর হল। অভিমানে চোখে জল এসে গেল। তাকে সেই সুদূর দেশে ফেলে ক্যাবট এত ভাল থাকতে পারে সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না। —তুমি ঠিক বলছ না চ্যাটার্জী।

—জেনিফার! সেই ঠান্ডা গলা। শীতল বরফের মতো চোখ চ্যাটার্জীর। জেনিফারের ভয় করতে থাকল—চ্যাটার্জী প্লিজ এ-ভাবে আমাকে ডাকবে না।

—জেনিফার আর দেরি করা ঠিক হবে না। চল বাইরে দিয়ে আসি।

—আমি যাব না। ক্যাবটের সঙ্গে দেখা না করে যাব না। সে কতটা ভাল আছে জানতেই এসেছি।

—ওরা ভাববে।

—ভাবুক। ওদের নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।

—তোমার না থাকলেও আমার আছে।

—চ্যাটার্জী! আক্রোশে ফেটে পড়ল জেনিফার। কেন এই স্বেচ্ছা নির্বাসন! আমরা কি করেছি! এখানে আর কে কে আছে? কোনো নারী, কোনো সুন্দরীকে লুকিয়ে রেখে মজা লুটছ তোমরা। তোমরা স্কাউন্ড্রেল।

—জেনিফার!

—দোহাই চ্যাটার্জী, একবার ক্যাবটের কাছে নিয়ে চল, আর কিছু চাই না। স্পষ্ট দুটো কথা বলব তাকে। এক নম্বর তাকে আমি নিতে এসেছি, জীবন সংশয় করে এসেছি, সে যাবে কি না। যদি আমার কোনো বিশ্বস্ততার অভাব থাকে, সে খুলে বলুক। ওর মুখ থেকে সব শুনতে চাই।

—জেনিফার!

—আবার সেই ঠান্ডা গলা।

—বল।

—তুমি খুব স্বার্থপর। একবার তো বললে না আমি কেমন আছি!

জেনিফার সেই আকাশ, ভাসমান মেঘমালা, কিছু নক্ষত্র দেখতে দেখতে মাথা নিচু করে ফেলল। বলল, তুমি ভাল নেই চ্যাটার্জী।

চ্যাটার্জী ভীষণ দ্রুত হা হা করে হেসে উঠল। এমন তীব্র হাসির শব্দে সব পাখিরা জেগে গেল বনের। খরগোসেরা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেল ঘাসের উপত্যকা। আমি খুব ভাল আছি, খুব ভাল আছি। বার বার বলতে বলতে ক্রমে

ধাবমান এক অশ্বের মতো বনের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। জেনি ভয় পেয়ে ডাকল, চ্যাটার্জী, আমি জানি না, তুমি কেমন আছ সত্যি জানি না, চ্যাটার্জী আমি যদি পৃথিবীতে কোন বিশ্বাসী রমণীয় ভূমিকায় জীবন যাপন করে থাকি, তবে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারি এখানে এই গভীর বনাঞ্চলে একা ফেলে গেলে তোমার পাপ হবে। সত্যি বলছি, তোমার পাপ হবে।

চ্যাটার্জী আবার ফিরে আসতে থাকল। ডালপালার শব্দে জেনি টের পাচ্ছিল সে আবার ফিরে আসছে। কাছে এসে বলল। চল, কোনো কথা না আর। আছ তো কিছুদিন। দ্বীপটায় আমি বাদে তোমার আর কিছু ভয়ের নেই। পারতো কাল এস।

—দেখা হবে বলছ!

—দেখা হবে।

—কোথায় আসব?

—যেখানে আজ এসেছিলে।

—ক্যাবট থাকবে!

—অধীর হবে না জেনি।

—ক্যাবটকে বলবে, আমি ওর খোঁজে এসেছি!

—বলব।

—কি বলে ক্যাবট আমাকে বলবে তো!

—সব বলব। সব। এক এক করে সব বলব। এবং কিছু দূর এগিয়ে যেতেই জেনি দেখল চ্যাটার্জী সহসা থমকে দাঁড়িয়েছে। নুয়ে কিছু একটা হাতে তুলে নিলে। দেখেছো! দেখ। বলে সে একটা মরা খরগোস চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, এসব কেন করছে লোকটা! কার ওপর তার এত রাগ!

জেনিফার কিছু বলতে পারল না। কি বলবে বুঝতে পারছে না। বোকার মতো এখনও ভাবছে, সবই মরীচিকা নয়তো! ওর ধীরে ধীরে কথা বলার স্বভাব। সবই মিলে যাচ্ছে। ওর শরীর ছুঁয়ে দেখছি। সেই পুরু লেনসের চশমা! ক্যাবটের একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু। একই সঙ্গে ওরা কতবার সফরে বের হয়েছে। ওর গলার স্বর আগের মতোই আছে। সে মানুষের কিছু খারাপ করতে পারে না। সে অত্যন্ত নিরীহ, নিরপরাধ।

এবারে চ্যাটার্জী কিছু ডালপাতা সাফ করতে থাকল। মাটি খুঁড়ে ফেলল নখ দিয়ে। লম্বা অতিকায় নখে সহজেই অনেকটা গর্ত করে ফেলল। আগে লক্ষ্য করেনি। চুল দাড়ির মতো নোখও বড় বড়। অতি প্রাচীন সবুজ শ্যাওলার মতো নিরেট একটা পাথর। আবেগ নেই। দুঃখ নেই। কিঞ্চিৎ বরং উদাসীন। সে খরগোসটাকে ভীষণ যত্নের সঙ্গে মাটির অভ্যন্তরে নামিয়ে দিল। তারপর থাবড়া দিয়ে সব মাটি চাপিয়ে দিল খরগোসটার ওপর।

জেনিফার দেখল। সুপ্রাচীন একটা দৈত্য হাঁটু গেড়ে সামান্য একটা খরগোসকে ঠিক কোনো প্রিয়জনের মতো কবর দিচ্ছে।

## আট

রিচার্ড হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা দূরে চলে এসেছিল। সাদা জ্যোৎস্নায় নির্জন বালিয়াড়িতে মাতাল হবার মতো বড় আর কিছু নেই। বেশ টলছে শরীর। কতদূরে অস্পষ্ট সেই প্রবহমান সমুদ্র, তার ঢেউ, তার নিচে রয়েছে কত সব বিচিত্র জলজ জন্তু। ইংলণ্ডের উপকূলে কোনো প্রেয়সীর কথা এ-সময় খুব মনে পড়ছে। রিচার্ড এ-সময় কারো কারো মুখ ভেবে সুখ পাচ্ছে। কে কোথায়, আর্চি কি করছে, থমপ্সন কোথায় কিছুই প্রায় খেয়াল নেই। সবাই মর্জিমাফিক কাজ কাম করে যাচ্ছে। খুব একটা শৃঙ্খলাপরায়ণও কেউ নেই। জেনি তো খুশি মতো বনটার ভেতর ঢুকে গেল। কখন ঢুকে গেল, কটা বাজে, ঘড়িতে সময় দেখেই সে কেমন আঁৎকে উঠল। তখন সাতটা বাজে। এখন ঘড়িতে দশটা দশ। এত সময় একা সে কি করছে। ফিরেও আসতে পারে। সে তো আর সব সময় বনটার দিকে চেয়ে নেই। ফিরে না এলে আর্চি কখন হৈ চৈ বাঁধিয়ে দিত।

তবু একটা সংশয়, যতই নিরাপদ ভাবুক, দ্বীপটায় কিছু রহস্যময় ঘটনা যে একেবারেই ঘটে যাবে না কে বলতে পারে। সে জেনির জন্য কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। হাতের গ্লাসটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল সে। কিছুটা হেঁটে মনে হল তাঁবু ঠিক দেখতে পাচ্ছে না। বালিয়াড়ি ক্রমে কেমন সরু হয়ে আসছে। এবং বুঝতে পারল সে উল্টোমুখে হাঁটছিল। ওদিকে গেলে সেই লেগুনটা পড়বে। আর কিছুদূর হেঁটে গেলেই জল নামার শব্দ। জোয়ারের সময় জল দ্বীপেব নিচু ঢলু জায়গায় নেমে যায়। ভাটার সময় সব শুখা। আসলে জল নামাব শব্দেই বোধ হয় সজাগ হয়ে গেছিল সে। বুঝতে পেরেছিল ঘুরে আব কিছুটা না এগোলে তাঁবু দুটো দেখা যাবে না।

জ্যোৎস্নায় সাদা বালিয়াড়ির প্রান্তে তাঁবু, তার লণ্ঠন খুবই ভৌতিক লাগছে। আর জোরে বাতাস বইছে। ' আলো মাঝে মাঝে নিবু নিবু হয়ে আসে—তখন তাঁবু দুটো কোনো বরফের দেশে এস্কিমোদের নিবাস মনে হয়, যেন চারপাশে শুধু বরফ, এবং মাঝে দুটো ইগলু। সে নিজেকে কেমন একজন মেরু দেশের নিবাসী ভেবে হাঁটতে থাকল। লম্বা পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছে। বালিতে পা বসে যাচ্ছে। এত নির্জন যে বাতাসে ঢেউ আছড়ে না পড়লে বালির কিচ কিচ শব্দ অনায়াসে টের পাওয়া যেত। সে টেনে পা তুলে নিচ্ছে। এবং তাঁবুর পাশে এসে দেখল, বালিয়াড়িতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে আর্চি। একেবারে একজন সংজ্ঞাহীন মানুষের মতো। মাতাল লোকটাকে সে টেনে তুলতেই আবার মনে হল থমপ্সন তাঁবু থেকে বের হয়ে আসছে, রিচার্ড! এত জোরে ডাকছিল যে, অনেক দূর থেকে শোনা যাবে। সে বলল, এই তো আমি।

থমপ্সন জোরে ডেকেই চলেছে, রিচার্ড। রি...চা...র্ড!

—কি হচ্ছে এ-সব!

—রিচার্ড! রি...চা. র্ড।

—রিচার্ড বুঝল, একেবারে বেহেড মাতাল।

—সে এবার তাকিয়ে বলল, কি হয়েছে!

—তুমি কে!
—রিচার্ড।
—রিচার্ড বলে আমাদের সঙ্গে কেউ আসে নি।
—রিচার্ড বলল, ভেতরে যান। শুয়ে পড়ুন গে!

আর্চির গলা এতই জড়ানো যে কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। সে আচ্ছা ঝামেলায় পড়ে গেছে। আর্চিকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে, থমপ্সনকে ধরে আনতে যাচ্ছে, তখন আর্চি সমুদ্রের দিকে ছুটে যাচ্ছে। বলছে জেনি কেন ফিরে এল না! জবাব চাই। কর্তাকে সব বলে দেব। তোমরা মাতলামী করার আর জায়গা পেলে না!

রিচার্ড সব ফেলে জেনির তাঁবুর দিকে ছুটে গেল। পর্দা তুলে দেখল, জেনি ফেরেনি। বা ঘুমিয়ে নেই। এত রাতে সে সত্যি ফেরেনি ভাবতেই কেমন কর্কশ গলায় ডাকল, থমপ্সন জেনি আসেনি।

আর্চি সেই জড়ানো গলায় বলল, মজা বের হয়ে যাবে। কর্তাকে সব বলে দেব থমপ্সন। কেউ পার পাবে না।

থমপ্সন যতই মাতাল হোক রিচার্ডের হাঁকাহাঁকির গুরুত্ব বুঝে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। ঠিক মতো পা ফেলতে পারছে না। দুটো আল্গা পা নিয়ে সে ঠেলেঠুলে জেনির তাঁবুর সামনে কোনোরকমে দাঁড়াল। বলল, চল। দেখি। তিন মাতালের এখন অন্বেষণের পালা। ওরা উঠে যাচ্ছে। আর্চি মুখ লম্বা করে ঘোড়ার মতো চিৎকার করছিল। জেনি জেনি, সব সময় মনে হচ্ছে আর্চি জেনি জেনি করছে। গলা কি ভেঙ্গে গেছে আর্চির! আর অতদূর থেকে কেন চিল্লাচ্ছে! বনটার কাছে যাওয়া দরকার। অতদূর থেকে চেঁচালে কে শুনতে বসে আছে!

রিচার্ড বলল, এত পেছনে কেন থমপ্সন?

—যাচ্ছি।

আর্চি আরও পেছনে পড়ে থাকছে। সে দু'পা এগোলে এক পা পিছিয়ে যাচ্ছে। আর কি যে হয়েছিল তার, একেবারে নিদেনপক্ষে বোতলটা শেষ না করে দিলেই বুঝি চলত না। কার যে দিব্যি খেয়ে সে উঠে পড়ে লেগেছিল, যত জেনি ওকে পাত্তা দিচ্ছে না তত সে মরিয়া হয়ে উঠছে। এবং বুঝতে পারে আর্চি তার স্বভাবের জন্যই জেনিকে নিজের করে নিতে পারবে না। অনুকম্পায় বেঁচে থাকার মতো দুঃখ কি আর আছে। এত সব মনে হলেও শংকা দূর হচ্ছে না। বার বারই মনে হচ্ছিল, একটা লম্বা হাত বনের অভ্যন্তর থেকে বের হয়ে আসবে এবং মাল খালাসের মতো তুলে নেবে ভেতরে। রিচার্ড খুব গম্ভীর গলায় ডাকল, আসুন। পা চালিয়ে আসুন। যা মাতাল হয়ে আছে সব। লম্বা হাতটা যদি সত্যি এগিয়ে আসে সে সরে গিয়ে আর্চিকে ধরিয়ে দেবে। তারপর, তারপর থমপ্সন, সে দৌড়াবে সমুদ্রের দিকে। বোট নিয়ে ভেগে পড়বে।

আর তখনই জেনির গলা পাওয়া গেল। সাদা জ্যোৎস্নায় প্রায় আবির্ভাবের মতো মনে হচ্ছে। সে কাছে এসে বলল, কি হচ্ছে এ-সব। ইস্ সব কটা মাতাল। মাতলামি করছ সবাই!

আর্চি অপরাধীর মতো তাকিয়ে থাকল।

রিচার্ড বলল, তুমি এতক্ষণ কি করছিলে ভেতরে!

জেনি জবাব দিল না। হেঁটে নেমে যেতে থাকল।

আর্চি সাহস পেয়ে গেছে। সে জেনিকে ধরার জন্য ছুটতে থাকল। ছুটতে গিয়ে দু'বার পড়ে গেল। বালি ঝেড়ে নিল হাঁটু থেকে। ফের দৌড়ে কাছে গিয়ে বলল,—কি করছিলে এতক্ষণ। বলতে হবে!

জেনি বলল, আর্চি রাত হয়েছে।

রিচার্ড এবং থমপ্সন খুব হাল্কা হয়ে গেল। ভেতরে কোনো আর শংকা নেই। সবার পেছনে ওরা লা লা করে গান গাইতে গাইতে নেমে আসছে। আর্চি জেনির পাশাপাশি হাঁটার চেষ্টা করছিল, একবার এত খাড়া পড়ে গেল যে জেনি ফেলে চলে আসতে পারল না। বলল, ধর। তারপর একজন রুগ্ন মানুষের মতো আর্চিকে তাঁবুতে পোঁছে দিল। বলল, যাও ঘুমোওগে। কোন সাড়া শব্দ যেন না পাই।

রিচার্ড ও থমপ্সন ভেতরে ঢুকে দেখল, আর্চি ভালো মতো ক্যাম্প খাটে শুয়ে আছে। চোখ দুটো খোলা। রিচার্ড কথা বলতে গেলে, মুখে আঙ্গুল দিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে। এতটা ভালমানুষ হয়ে গেছে দেখে রিচার্ড হেসে ফেলল। থমপ্সন বলল, বেশি খাওয়া হয়ে গেল। বেশি খেলে আমার আবার ঘুম আসে না। কেবল বক বক করতে ইচ্ছে করে।

আর্চি থমপ্সনকে বলল, চুপ। ঘুমোচ্ছে।

থমপ্সন খুব গরম অনুভব করছে। সে ক্যাম্প খাটটা বাইরে টেনে বের করে আনল। এবং সোজা হাত পা মেলে দিল খাটে।

লণ্ঠন নিভিয়ে রিচার্ডও শুয়ে পড়েছে।

আর্চি পাশ ফিরল। বলল, রিচার্ড দেখছ তোমাব বোনের কাণ্ড!

রিচার্ড বলল, ঘুমোও। সকালে বোল।

—কি সাহস দেখেছ! তুমি এত করে বললে কেন এত দেবি- কিছু বলল তোমাকে!

রিচার্ড বলল, বকবক করতে হয় বাইরে যাও।

আর্চি সটান উঠে পড়ল। বলল, সেই ভাল। ক্যাম্প খাটটা টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। থমপ্সনের পাশে খাট রেখে শুতে যাবার সময়ই শুনল ঘড় ঘড় শব্দ। নাক ডাকছে থমপ্সনের। এত বড় আকাশের নিচে একা! ওরে বাপস! সে ফের ক্যাম্প খাটটা টেনে নিয়ে গেল ভেতরে। রিচার্ড চিৎকার করে উঠল কি হচ্ছে এসব। একবার বাইরে আবার ভেতরে।

আর্চি অন্ধকারে কি ফেলে দিল। হুড়মুড় করে কিছু গড়িয়ে পড়ছে।

রিচার্ড টর্চ জেবলে উঠে বসল। কি হচ্ছে আর্চি!

—আর হবে না এই যে শুয়ে পড়লাম।

একটা ডিস এবং দুটো কাপ উল্টে পড়েছে। কাঠের পেটি থেকে পড়ে গিয়ে ভাঙ্গেনি। বালির জন্য বেশ সব কটা আস্তই আছে। রিচার্ড ওগুলো তুলে বেখে শুয়ে পড়ার সময় মনে হল, খুব গরম। থমপ্সন বাইরে শুয়ে ভালই কবেছে। সে ক্যাম্প খাট টেনে নিয়ে গেল বাইরে। তারপর সোজা সেও পা ছড়িয়ে দিল খোলা আকাশের নিচে।

অন্ধকারে আর্চির ভয় করতে থাকল। অন্ধকারে কারা সুড়সুড়ি দিতে আসছে আর্চিকে। আর্চি আবার খাটসহ বাইরে এসে ওদের পাশে শুয়ে পড়ল। ওরা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মনে হল মাথার ওপরের আকাশটা নেমে আসছে! সমুদ্রটা এগিয়ে আসছে! সে ফের গা ঢাকা দেবার জন্য তাঁবুর নিচে খাট নিয়ে চলে

গেল। আবার ভয়, সুড়সুড়ি, আবার বাইরে। সারারাত আর্চি এ-ভাবে ঘর বার হল। জেনি ব্যতিরেকে কেউ জানল না এটা। একমাত্র জেনি তাঁবুর বাইরে টিনের চেয়ারে ওপাশের আড়ালে বসে রয়েছে। তার ঘুম আসছে না। দ্বীপটা তার সব কেড়ে নিয়েছে।

## নয়

সকালে সবাই আবার অভিযানে বের হবে বলে ঠিকঠাক হয়ে নিচ্ছিল। ব্রেকফাস্ট করে নিল তাড়াতাড়ি। পোশাক পরে নিচ্ছে। অভিযানে যাবার আগে সবাই গামবুট পরে নেয়। আর্চি বাইরে গামবুট পায়ে গলিয়ে দিচ্ছিল, আর ডাকাডাকি করছিল, জেনি তোমার হল! আমাদের কিন্তু হয়ে গেছে। দেরি হলে ফেলে চলে যাব।

জেনির তখনও ঘুমই ভাঙছে না। রোদ উঠে গেছে কত। চা ঠান্ডা হচ্ছে। ব্রেকফাস্ট তেমনি পড়ে আছে। আর্চি তাঁবুতে ঢুকে বলল, একি! তুমি এখনও শুয়ে আছ! ওঠো।

জেনি পাশ ফিরে শুল।

—রিচার্ড! জেনি উঠছে না।

—উঠছে না তা আমি কি করব!

—জেনিকে তবে ফেলে যাবে? জেনি আমাদের সঙ্গে যাবে না?

আসলে সকালে উঠেই রিচার্ডের মনে হয়েছিল এমন একটা নির্জন দ্বীপে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। কি গরম। তবু রক্ষা বিকেল পড়তেই সমুদ্র থেকে ঠান্ডা বাতাস উঠে আসে। গায়ে জামা রাখা যাচ্ছে না। থমপ্সনের পিঠে দুটো একটা ফোস্কা ইতিমধ্যেই দেখা গেছে। আর ক'টা দিন। এখন মানে মানে দ্বীপটা ছেড়ে যেতে পারলে হয়! সব কিছুর মূলে জেনি। ওর জেদ প্রবলভাবে তাড়া না করলে ওদের আসতে হত না। সে জেনির ওপর সকালেই ভারি অপ্রসন্ন বোধ করছিল।

আর্চি বলল, জেনি শুনছ?

জেনি একবার খেঁকিয়ে উঠল, কি ঘুমোতে দেবে না :-!

—সারারাত ঘুমোওনি!

—আমি যাব না। বলে দাও।

—একা থাকবে!

—কি হবে থাকলে! তুমি যাও আর্চি। একটা আর কথা না।

—ঠিক আছে, যাচ্ছি। ভেবে দ্যাখো, আমাদের ফিরতে কিন্তু রাত হবে।

কিন্তু যখন রিচার্ড শুনল, জেনি সত্যি যাবে না, সে তাঁবুতে পড়ে পড়ে সারাদিন ঘুমোবে তখন আর কিছু ভেবে লাভ নেই। সে থমপ্সনের দিকে তাকিয়ে বলল, হল।

থমপ্সন বুঝতে না পেরে বলল, কি হল?

—জেনির কৌতূহল মিটে গেছে।

আর্চি অবোধ বালকের মতো হেসে উঠল।—আগেই বলেছিলাম, যত সব গুজব। আদরে আদরে মেয়েটার মাথা খেয়েছে কর্তা। কেউ আসে! লোকে শুনলে পাগল

বলত আমাদের। থমপ্সন আপনার প্রশ্রয়েই এত হয়েছে।

থমপ্সন বলল, ওর শরীর ভাল নাও থাকতে পারে!

আর্চি দৌড়ে চলে গেল। তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, জোনি তোমার কি শরীর খারাপ?

—উঁহো!! কি জ্বালাচ্ছে। চোখের পাতা এক করতে দিচ্ছে না।

—আমি কি বলছি শুনতে পাচ্ছ!

জোনি এবার উঠে বাইরে বের হয়ে এল।—আর্চি দোহাই তোমার! আমার জন্য এত না ভাবলেও চলবে।

কিন্তু থমপ্সনকে এগিয়ে আসতে দেখেই বলল, শরীরটা ভাল নেই। আপনারা যান। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

আর্চি গজ গজ করছিল! সারাদিন ঘুমোবে। সন্ধ্যা হলেই বনে ঢুকে যাবে। কি যে আছে বুঝি না।

রিচার্ড কিছু না বলে একা একা উঠে যেতে থাকল। থমপ্সন বলল, তা হলে আর্চি তুমি থাক। আমরা যাচ্ছি।

জোনি তাঁবুর বাইরে মুখ বাড়িয়ে বলল, থমপ্সন ওকে প্লিজ নিযে যান।

আর্চি কেমন দোটানায় পড়ে গেছে জোনির যখন ইচ্ছে সে চলে যাবে মনস্থ করল। যেদিকে দু'চোখ যায়। দ্বীপটায় সে হারিয়ে যাবে ভাবল। সারাজীবন সে কেবল জোনির জন্য ভেবেছে, জোনি তার জন্য কিছু অন্তত ভাবুক। সত্যি সে হারিয়ে যাবে। জোনির ঘুমের প্রাবল্য বের করে না দিচ্ছে তো তাব নাম আর্চি নয়!

এবং সন্ধ্যায় সত্যি দেখা গেল, থমপ্সন বিচার্ড ফিরছে, আর্চিব পাত্তা নেই।

কোন কিছুই লক্ষ্য করেনি। সারাটা দিন সে কেবল শুয়ে বসে কাটিয়েছে। ভেতরে কত রকমের শংকা, উদ্বেগ। কখন সন্ধ্যা হবে। কখন দ্বীপটায জ্যোৎস্না উঠবে। এবং ক্যাবটের কথা, ক্যাবট এ-দ্বীপেই আছে, কোথায় কিভাবে আছে সব জানতে পারবে আজ। সে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না। চোখে মুখে আশ্চর্য অধীরতা। প্রবল এক আকর্ষণ এই দ্বীপটার অভ্যন্তরে রযে গেছে. সে কাউকে টের পেতে দেয়নি। আর্চি ফিরল কি না, আর্চি কোথায অথবা আর্চি বলে কোনো হবু বর তাব সঙ্গে এসেছে সে মনেই করতে পাবল না। কেবল মস্তিষ্কের কোষে কোষে ক্যাবটের সব মধুর স্মৃতি, অকপট ভালবাসা জোনিকে এতদূব নিয়ে এসেছে। জোনি নিমগ্ন হয়ে আছে নিজের ভেতর।

থমপ্সনও লক্ষ্য কবল না! আর্চি এতক্ষণ সঙ্গেই ছিল। বনের শেষাশেষি আসতেই সে আর তাকে দেখতে পায়নি।

রিচার্ড ফিরে এসেই ঝোলাঝুলি ফেলে ক্যাম্পখাটে বসে পড়ল। আর্চির জন্য তারও ভাবনা কম।

বেচারা আর্চি কিছুক্ষণ একা বসে থাকল। কিন্তু রাত সামান্য গভীর হতেই সর সর করে উঠল কিছু। সে তাকাল। না কিছু না। হুড়মুড় করে কি সব ভেঙ্গে পড়ছে। সে চারপাশে ফের তাকাল। অথচ কিছুই দেখতে পেল না। একটা প্রবল অন্ধকার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল! কি ওটা, ভাবতেই দেখল গাছপালা ভারি নিঝুম, ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। আকাশে খণ্ড মেঘ কোথা থেকে অতিকায় ছেঁড়া ঘুড়ির মতো ভেসে যাচ্ছে! গাটা কাঁটা দিয়ে উঠল। বনের গাছপালা খুবই ভুতুড়ে

দেখাচ্ছে।

জ্যোৎস্না ঢেকে গেল মেঘে। আর বেশি রিস্‌ক নেওয়া যাচ্ছে না। মান অভিমান এমন একটা বিশ্রী দ্বীপে ঠিক জমবে না। দেশে ফেরা না পর্যন্ত সমুচিত শাস্তি সে জেনিকে দিতে পারছে না। তা ছাড়া কর্তব্যবোধের খাতিরেও সে এতটা করতে পারে না। জেনির মতো তারও রাগে দুঃখে মাথা খারাপ হলে চলবে কেন! মাথা ঠাণ্ডা রাখতেই হবে। এত সবের পর আর থাকা ঠিক সমীচীন মনে করল না সে। চো দৌড়। বালিয়াড়িতে কিছুটা এসে একটু জিরিয়ে নিল। তারপর এই যেন ঘুরে বেড়িয়ে এল, সে ওদের মতো আদৌ ভীতু নয়, এমন কৃতিত্ব নেয়ার জন্য হেলে দুলে হাটতে থাকল। কে দেখল, কে দেখল না দেখবার সময় নেই।

আর্চি এসে দেখল ওরা তিনজন গোল হয়ে খেতে বসেছে। আর্চি নেই অথচ ওরা বেশ খাচ্ছে। আর্চিকে দেখেই রিচার্ড বলল, হাত মুখ ধুয়ে বসে পড়। সে এতক্ষণ কোথায় ছিল একবার কেউ জিজ্ঞেসও করল না।

টেবিলে সবাই খাচ্ছে! থমপ্‌সন বলে দিল, মাত্রাতিরিক্ত কেউ খাবে না। কাল যা দেখালে সবাই! থমপ্‌সন পরিমাণ মতো দিতে থাকল। জেনি পেগ খানেক খেয়ে বলল, আর না। আমি উঠছি।

রিচার্ড লক্ষ্য করছে জেনিকে। সারাদিনে জেনির সঙ্গে আজ ওর একটা কথাও হয়নি। এমন কি থমপ্‌সনের সঙ্গেও বোধ হয় খুব কম। আর্চিকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল।

সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস ভারি মনোরম। তাবুর ভেতরে বাতাস বেশ সজোরে বইছে। তাঁবুর ভেতরে জেনি আজ প্রথম ট্রানজিসটার সেটে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের খবরাখবর নিল। এবং খবর শুনল। কিছু গান। কতদিন পর থমপ্‌সন দেশের মানুষদের গান, কথিকা, সংবাদ শুনে খুবই মনমরা হয়ে গেল। দেশের জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠল তার।

জেনি তাঁবুর ভেতর কান খাড়া করে রাখল। তখনও আর্চিটা বকবক করছে। রিচার্ডের গলা পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মাঝে। থমপ্‌সন বোধ হয় শুয়ে পড়েছে। জেনি একবার উঁকি মেরে দেখল। রিচার্ড থমপ্‌সন আর্চি ক্যাম্পখাট বাইরে টেনে এনেছে। থমপ্‌সন ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়। আর্চি পায়চারি করছে। রিচার্ড বসে রয়েছে এখনও। ওরা না শুলে বের হতে পারছে না। ঘড়িতে দশটা দশের মতো। সে থাকবে তো? রিচার্ড এবং আর্চির ওপর সে ক্রমে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। কিছু বলতে পারছে না। তাঁবুর ভেতরে উসখুস করছে কেবল।

এক সময় মনে হল সব নিঝুম হয়ে গেছে। সমুদ্রের শোঁ শোঁ গর্জন শোনা যাচ্ছিল কেবল। কিছু জেলি ফিস ইতঃস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কেউ ওদের অনেকটা ওপরে তুলে দিয়ে গেছে আর নিয়ে যায় নি। রোদে সকালে শুকিয় মরে পড়ে থাকবে। সে এইসব দেখতে দেখতে যখন বুঝল সবাই সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে, তাঁবুর পর্দা ফেলে উঠে গেল। খুব সন্তর্পণে, কেউ টের না পায়। জেগে গেলেও বুঝতে পারবে না ভেতরে জেনি আছে কি নেই। ভাববে জেনি ঘুমিয়ে আছে।

বনটার কাছাকাছি আসতে সময় লেগে গেল। ঝুঁকে ঘড়ি দেখল। এগারোটা বেজে গেছে। সে যদি ফিরে গিয়ে থাকে, যদি মনে করে থাকে কিছুই আর গোপন নেই, থমপ্‌সন রিচার্ড সব জানতে পেরেছে এবং একটা কুমতলব আছে—তাহলে সে আর এখানে নাও আসতে পারে। এতসব ভাবতে ভাবতে ভেতরে ঢুকে গেল। কোনো

সাড়া শব্দ নেই। সে গামবুট পরে থাকে বলে পায়ের নিচে কি পড়ছে না পড়ছে খুবঁ একটা খেয়াল করছে না। কেবল দ্রুত হে'টে যাচ্ছে।

একটা গাছের আড়ালে থেকে কেউ বলল, ওদিকে না। এদিকটায়।

সে পেছন ফিরে দেখল কিছু দেখতে পেল না! সামনে, আশেপাশে সব জায়গায়, কেউ নেই। কোথা থেকে বলছে বুঝতে পারছে না। আবার গলা পাওয়া গেল, পাথরটা টপকে এস।

পাথর উঁচু মতো। সে কোনোরকমে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে গেলেই বুঝল যতই চেনা জগত মনে হোক, আসলে চেনা নয়। সব হিজিবিজি ব্যাপার আছে এই বনটাতে। কিছুটা গোলোক ধাঁধার মতো। এক চালেই অনেক কাছে চলে যাওয়া যায় বালিয়াড়ির। আবার ঠিকমতো চাল পড়লে, সোজা অনেক গভীরে দ্বীপের বুকে যাওয়া যেতে পারে। সে পাথরটার মাথায় উঠে দেখল নিচে মানুষটা ঘাসের উপত্যকায় বসে আছে। এই উপত্যকায় ওরা আরও একদিন এসেছিল যেন। সময় লেগেছিল অনেকটা। আজ কত সহজে, সে কত কাছে পেয়ে গেল উপত্যকাটা।

জেনি নিচে লাফ দিয়ে নেমে গেল! মানুষটা সত্যি রূপবান হয়ে গেছে দ্বীপে থাকতে থাকতে। সে পরে আছে সুন্দর নীলরঙের প্যাণ্ট আর হাওয়াইন সার্ট! পায়ে কেডস্ জুতো ঠিক আগের মানুষ যেন চ্যাটার্জী! নোখগুলো বড় করে তবে রাখা কেন! চুল দাড়ি এত বড় রাখা কেন! অথবা এত সুন্দর নীলরঙের পোশাক মানুষটা পায়ই বা কোথায়! সে কাছে যেতে একটা বন্য গন্ধও পেয়ে গেল শরীরে! কেমন বেমানান! সে কিছুক্ষণ চ্যাটার্জীকে কেবল দেখল! কথা বলতে ভীষণ আড়ষ্ট বোধ করছে। ভেবেছিল ক্যাবট না এসে পারবে না! অথচ ক্যাবট নেই! সে একা এসেছে! চ্যাটার্জীর কোনো দুরভিসন্ধি নেই তো! দ্বীপে থাকতে থাকতে কতরকমের বন্যস্বভাব গড়ে উঠতে পারে!

সে ভেতরে ঢোকার আগেও দেখে নিয়েছে, হিপপকেটে ঠিকঠাক আছে ওটা। এবং এ-জন্যই সে অনায়াসে চলে আসতে পারে। চ্যাটার্জীকে সে পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। অথচ গতরাতে সে চ্যাটার্জীকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে ফেলেছিল। কিন্তু তাঁবুতে ফিরে তার মনে হয়েছে, খুবই দুঃসাহসের কাজ এটা তার। এতটা নিরাপদ ভাবা ঠিক না। সে আজ স্থির করে এসেছে, চ্যাটার্জীর সংগে ক্যাবট সম্পর্কিত কথাগুলির ফয়সালা করবে। যদি না হয় পরদিন সে চ্যাটার্জীকে বাধ্য করবে তাঁবুতে নিয়ে যেতে। এবং তারপর যা হয়, যে কোনোভাবে শেষ খবর জেনে নেবে ওর কাছ থেকে। সারারাত সারাদিন সেজন্য এতটুকু তার ঘুম হয়নি। বিকেলের দিকে মাথাও ধরেছিল। ট্যাবলেট খেয়ে এখন ভাল আছে।

চ্যাটার্জীও জেনিকে দেখেই এগিয়ে গেল। বলল, কি ব্যাপার অত দূরে দূরে কেন? ভয় টয় পাচ্ছ নাতো।

—না।

—এমন সুন্দর দ্বীপে কোন ভয় নেই জেনিফার! এখানে কেউ অবিশ্বাসের কাজ করে না। অবিশ্বাসের কাজ করলে এ দ্বীপে ভয় পেতে হয়। তুমি দ্বীপে ঘুরে বেড়ালেই বুঝতে পারবে।

লোকটা অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলে। এবং ওর কথা শুনলে সহজেই যেন নির্ভর করা যায়। সে বলল, তুমি জান আমরা ক্যাবটকে খুঁজতে এসেছি। আজ তোমার সংগে ওর কাছে যাব।

কোথা থেকে হাত বাড়িয়ে সে টুপি টেনে দিল মাথায়। সেঁটে দিল টুপিটা! ওর লম্বা চুল এবং দাড়ি সন্ত মানুষের মতো। শরীরের রঙ আশ্চর্যভাবে সবুজ ঘাসের মতো হয়ে গেছে। গতকাল উত্তেজনার মাথায় এতসব সে লক্ষ্য করেনি। সে টর্চ নিয়ে এসেছে। টর্চ জেবলে একবার অনুনয় করল জেনি, তোমার মুখটা ভাল করে দেখতে চাই চ্যাটার্জী। বলে টর্চের আলো ফেলতেই মনে হল বড় শান্ত মুখ। কোনো বড় জায়গায় যখন মানুষ পেঁাছে যায় তখন মানুষের মুখ এমন থাকে। গীর্জায় কোনো বয়স্ক ফাদারের মতো মনে হচ্ছে তাকে। চুল দাড়ি নীল রঙের হয়ে গেছে। অথবা জ্যোৎস্নায় এমনও দেখাতে পারে। তাছাড়া সমুদ্র আকাশ হ্রদের সর্বত্র যখন নীল রঙের ছড়াছড়ি তখন এমন একটা পৃথিবীতে বসবাস করতে করতে যে মানুষটাও আশ্চর্য সুষমা নিয়ে বেড়ে উঠবে বিচিত্র কি! জেনিফার মুখ নীচু করে বলল, ওর কাছে নিয়ে চল। তুমি যা চাইবে দেব।

চ্যাটার্জীও যেন কিছুটা ইতঃস্তত করল। তারপর বলল, যাবে, চল।

জেনি কত কিছু যে বলতে চাইছে। অথচ আবেগে একটা কথাও স্পষ্ট হল না তার। অঝোরে কান্না আসছে। সে যাচ্ছে। তার কাছে যাচ্ছে! দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা—দীর্ঘদিনের এক স্বপ্ন লালন করে রেখেছে। আসলে পৃথিবীতে কিছু অকস্মাৎ হারিয়ে গেলে বুঝি তার মূল্য বেড়ে যায়! ক্যাবট হারিয়ে গিয়ে আরও বেশি নিজের হয়ে গেছে। ক্যাবটের সামনে সে কি ভাবে দাঁড়াবে, ক্যাবট তাকে দেখলে আগের মতো ছুটে আসবে তো! সেই জাহাজঘাটায় বহু দূর থেকে হাত তুলে দেওয়া, জাহাজ ভিড়লে ছুটে যাওয়া তারপর পরস্পর কিছুক্ষণ সংলগ্ন হয়ে যেন বোঝা তুমি আগের মতোই আছতো কি না কোথাও কোনো কষ্ট গোপন করে যাচ্ছ। আরও কত সব ঘটনা ঘটতে পারে। সে কি তার বন্ধুর মতো দাড়ি গোঁফ রেখেছে, তার হাতের নখও কি পাশের মানুষটির মতো বড় বড়, অথবা সে যদি কোন জলদস্যুর পোশাক পরে থাকে তবে কেমন দেখাবে! সে কত যে এমন প্রশ্ন করতে চাইছে মানুষটিকে। অথচ মানুষটি চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছে– কেবল যেন অনুসরণের কথা, আর কিছু না। সে একবার তবু বলে ফেলল, চ্যাটার্জী, ক্যাবট কি তোমার মতো চুল দাড়ি রেখেছে, তোমরা কি সত্যি বন্য হয়ে গেছ!

সে শুধু বলল, দ্যাখো হোঁচট খাবে! পথ দেখে চল। এদিকটায় তোমরা একবার দূরে একটা গাছ দেখেছিলে। ঐ যে পাঁচিলের মতো পাথরটা, ও জায়গায় তোমরা একবার এসেছিলে। এখানে সেই পথটা। কিছুটা হেঁটে গেলে তোমার আর কোন অসুবিধা হবে না।

—তুমি সেদিনে এখানে ছিলে!

—ছিলাম।

—গাছগুলো কি রকম শুকনো!

—এ-সময় গাছগুলোর পাতা ঝরে যায়। ছাল খেয়ে ফেলে জন্তুতে।

—কি জন্তু।

—দেখতে প্যাংগোলিনের মতো। আসলে ওগুলো প্যাংগোলিন নয়। গাছের ছাল খেয়ে বেঁচে থাকে।

—আচ্ছা, গাছে গাছে কিছু নাম লেখা!

মানুষটা এবার কেমন তিক্ত গলায় বলল, এতসবও দেখে ফেলেছ!

সে বলল, কেন কোনো অন্যায় হয়েছে! তোমরা লিখে রাখবে, আমরা দেখতে

পারব না।

চ্যাটার্জী তাকাল জেনির দিকে। যেন ভেতরটা দেখার চেষ্টা করছে। এবং মনে হয় সে মেয়েদের এমন প্রশ্নে অভ্যস্ত নেই। অথবা এরা সব পারে। সব রকমের দুঃসাধ্য কাজ। একজন পুরুষ মানুষের পক্ষে যতটা কঠিন, তাদের কাছে তত সহজ!

এখানে গাছপালা বড় নয়, জঙ্গল গভীর নয়। গাছগুলো ওক্ গাছের মতো। ওরা ক্রমে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। কীট পতঙ্গের আওয়াজ সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে উঠে আসছে এবং আরও ভেতরে ঢুকে গেলে মনেই হল না, এটা দ্বীপ। গাছপালার ভেতর ওরা দু'জন, চারপাশে মায়াবী জ্যোৎস্না। কে বলবে দ্বীপে এমন সব সুন্দর জায়গা আছে। যেমন মানুষেরা ইচ্ছা করলেই এখানে আবাস তৈরী করে ফেলতে পারে। জেনিফার জানে না, এইসব লতাগুল্মের এক মনোরম ঘ্রাণ আছে। ঘ্রাণ মোহ তৈরী করতে পারে—পৃথিবীর যে কোনো মানুষের পক্ষে দ্বীপে বেঁচে থাকা কত জরুরী হয়ে পড়তে পারে সামান্য এই বন্য ঘ্রাণ তার সাক্ষী। জেনিফার নাক টেনে বলছে, কি সুন্দর গন্ধ। তোমার শরীরের, না গাছের?

চ্যাটার্জী সামান্য হাসল।

এ ভাবেই সেই প্রথম থেকে উত্তর অথবা দক্ষিণ সমুদ্রে আবাস তৈরী করেছে মানুষেরা। জেনিফার বোধ হয় সে খবর রাখে না। জায়গাটাকে খুব অকিঞ্চিৎকর ভাবা জেনিফারের খুব বোকামি হচ্ছে। বিশেষ করে সে এই দ্বীপটার এতটুকু নিন্দা সহ্য করতে পারে না। যদিও জেনিফার এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু বলেনি।

পায়ের নিচে কত পুরানো সব ঘাস পাতা, নুড়ি পাথর, মরা ডাল মাড়িয়ে ওরা যাচ্ছিল। যেন শেষ হচ্ছে না। জেনিফার বার বার বলছে, আর কতদূর!

চ্যাটার্জী বলল, পা চালিয়ে হাঁটো।

কিছুদূর এসে সোনালী লতার বন পার হল একটা। তারপর জেনিফার দেখল, সামনে উঁচু মতো হলুদ রঙের একটা পাহাড়। সেখানে সাদা সাদা কি দেখা যাচ্ছে! কাছে গেলে বুঝল থোকা থোকা সব সাদা ফুল। ঝুপড়ির মতো উঁচু নিচু অনেকটা দূর পর্যন্ত। ফাঁকে ফাঁকে অতিকায় সব ক্যাকটাস দাঁড়িয়ে আছে। আর সমুদ্রের নিচে ঝিনুকের ভেতর যেমন নির্জনতা থাকে, তেমনি নির্জনতা।

জেনিফার বলল, আমি আর হাঁটতে পারছি না। কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বুঝতে পারছি না।

চ্যাটার্জী বলল, কোথাও নিয়ে যাচ্ছি।

—চ্যাটার্জী কিছু হলে আমি কিন্তু তোমাকে খুন করব।

হাসতে হাসতে বলল চ্যাটার্জী, কোরো।

জেনিফার একটা পাথরে বিশ্রাম নেবার সময় বলল, চ্যাটার্জী তোমরা সত্যি নিষ্ঠুর। ছ'বছর কি করে একটা দ্বীপে থাকলে!

—থেকে দেখ না। ছটা বছর কত কম সময় মনে হয়।

—তুমি থাক। ক্যাবটকে নিয়ে...তারপর কেমন একটা দীর্ঘনিশ্বাস টের পেল কারো। জেনি তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকল এবার। দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বুকে তার কেমন ভয় ধরে গেল।

তারপরও ওরা হাঁটছিল।

চ্যাটার্জী কোনো কথা বলছিল না। কথা বলার অভ্যাস কমে গেছে। জেনি

লক্ষ্য করেছে কখনও কখনও মানুষটা কথা বলতে গিয়ে আটকে যাচ্ছে। ভাষা খুঁজে পায় না। সেই প্রাণবন্ত মানুষ আর নেই। অজস্র কথাবার্তা, ঠাট্টা তামাসা একেবারেই যেন ভুলে গেছে। যতটুকু কথা বলার দরকার সেইটুকু গুছিয়ে বলছে। এমন গভীর বনে কোনো নারী সংসর্গ এতটুকু চঞ্চল করছে না তাকে। আগের মতো আর ছেলেমানুষীটাও নেই। গম্ভীর প্রকৃতির আলাদা মানুষ।

অথচ জেনি জানে না গভীর রাতে যখন সমুদ্রে ঝড় উঠে, এই মানুষটা জেগে যায়, তখন শোনা যায় সে অজস্র কথা বলে যাচ্ছে তার বন্ধুকে। বোধ হয় কথাবার্তার অভ্যাসটা এ-ভাবেই রক্ষা করছে তারা।

সুন্দরী জেনিফার বলল, তোমার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে না! দেশের কথা!

চ্যাটার্জী স্রেফ বলল, না।

—কিছুই মনে পড়ে না!

—না না।

বিরক্ত এবং বিচলিত হয়ে পড়ছে কেন! জেনিফার ফের বলল, বৌ-এর কথা মনে হলে তো খুব মুখ গোমড়া করে রাখতে। বলতে, আর ভাল লাগছে না, কবে যে দেশে ফিরব!

তখন জেনিফার কত রকমের হাসি ঠাট্টা করত তার স্ত্রীকে নিয়ে। ক্যাবট দেশে গেলেই চ্যাটার্জী তার অতিথি। ক্যাবট বোধ হয় বুঝতে পারত—কষ্টটা কোথায় জাহাজী মানুষের। ঠিক সেও যখন কলকাতায় যেত, চ্যাটার্জীর বাড়িতে হৈ চৈ দুই বন্ধুতে। চ্যাটার্জীর স্ত্রী দু'হাতে একজন বিদেশী মানুষকে সেবা যত্ন করত।

বন্য মানুষটা মাঝে মাঝে দেখছিল জেনিফারকে। সুন্দরী জেনিফার, ক্যাবটের বিশ্বস্ত স্ত্রী। ক্যাবটও মনে প্রাণে স্ত্রীর প্রতি ভারি বিশ্বাসী ছিল। জাহাজী জীবনে যা স্বাভাবিক, একটুকুতেই বেচাল হওয়া, ক্যাবটের তা ছিল না। ভারী ধীর স্থির মানুষ ক্যাবট। চ্যাটার্জী তার বন্ধুকে নিজের মতো করে নিতে পেরেছিল। লম্বা সমুদ্র সফরেও সে আর ক্যাবট জাহাজে, সাধারণ ডাঙগাব মানুষের মতো। সংসারী মানুষ। তবু কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল!

জেনিফার বলল, তুমি কথা বল চ্যাটার্জী। কথা না বললে কেমন ভুতুড়ে মনে হচ্ছে সব।

তবু তখন মানুষটা হেঁটে যাচ্ছে, ঝোপঝাড় পার হয়ে যাচ্ছে, বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে যাওয়া যায়, কেবল মসৃণ পাথরের ওপর দিয়েই অনেকটা হেঁটে যাওয়া যায়, কোনো গোপন জায়গা ওরা বেছে নিয়েছে, সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই অগম্য, অথবা এমন কোন চিহ্ন সব আছে, কিংবা সংকেত যা দেখে—সে সহজেই তার আস্তানায় ফিরে যেতে পারছে, কারণ জেনি এখন বুঝতেই পারছে না কোনটা পূর্ব-পশ্চিম, কোনটা উত্তর-দক্ষিণ—সে কেবল পেছনে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে—তখন ফের না বলে পারল না, তোমার বৌ-এর কি যেন নাম!

সে বলল সরমা।

—এই বললে কিছু মনে নেই! তারপর ঘড়ি দেখে বলল, বারটা পাঁচ। প্রায় এক ঘণ্টার মত হেঁটেছি। সরমার জন্য তোমার কষ্ট হয় না।

সে বলল, হয়। আবার ভুলে যাই।

—তবে চল আমাদের সঙ্গে। কথা দাও।

কথা বললে কথা বাড়ে। এ সব প্রসঙ্গ উঠুক সে চায় না। ধীরে ধীরে বলল,

থাক না এসব কথা। ক্যাবটের খোঁজে এসেছ, তাকে দ্যাখো পাও কিনা।

—পাব না কেন বলছ!

চ্যাটাজী গুন গুন করে কি গাইছে এখন। পাগল নাকি! একেবারে যখন তখন মতি গতি পাল্টে ফেলছে। বোঝাই যায় না কিছু। সে বলল, তাকে আমার পেতেই হবে চ্যাটাজী। তাকে না নিয়ে যাব না।

বেচারা! ওর মুখ থেকে ফসকে বের হয়ে গেল কথাটা।

—কে বেচারা! কাকে বলছ!

চ্যাটাজী শুধু বলল, এস।

—আমি আর যাব না। তুমি কিছু করতে চাও!

—জেনিফার! সেই ঠাণ্ডা গলা। অন্য মানুষ। একেবারে স্থির অবিচল পাথরের মতো। আর এক পা নড়ছে না! কিছুটা সংলগ্ন হয়ে বলল, এসে গেছি। ভয় পেও না। ক্যাবট আমাদের খুব কাছে কোথাও আছে। ডাকলেই সাড়া দেবে। সে এবার ক্যাবট বলে চীৎকার করতে থাকল। ক্যাবট তোমার বউ জেনিফার তোমাকে খুঁজতে এসেছে। তুমি কোথায়!

—আমি এখানে! চ্যাটাজী নিজেই তার হয়ে জবাব দিল। তারপর জেনিফারের দিকে তাকিয়ে বলল, শুনলে কি বলছে!

জেনিফার ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল এমন ভণ্ডামীতে। সে ছুটে এসে মানুষটার সামনে দুহাত ছড়িয়ে দিল। তারপর ওর জামা ধরে যেন ওর চুল দাড়ি যা আছে ছিঁড়ে ফেলবে এমনভাবে ঝাঁকাতে থাকল। চীৎকার করে বলল, দোহাই চ্যাটাজী তুমি রসিকতা কর না। সব সহ্য হয় তোমার.. ...

সে তখন তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বলল, সে তোমাকে ভুলে গেছে।

জেনিফার পাগলেব মতো বলল, না না, মিথ্যে কথা। মিথ্যা কথা বলছ। সে আমাকে ভুলে যেতে পারে না। সে অসহায় রমণীর মতো হুঁ হুঁ করে চ্যাটাজীর বুকের ওপর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

চ্যাটাজী এখন যে কি করে! কিছুটা সান্ত্বনা ব্যতিরেকে কোনো উপায় নেই। সে মাথায় হাত রেখে বলল, ঠিক ঠিক কিছু মনে করতে পারি না। মনে কবতে ভালও লাগে না।

—ক্যাবটও ঠিক তোমার মতো!

—সে আরও বেশি জেনিফার। দেখলে তো ডাকলাম, সাড়া দিল না। সে তোমাকে চিনতেই পারবে না। এস। আর সামান্য সাহস সঞ্চয় কর।

জেনিফার এখন কি করবে বুঝতে পারছে না। কি বলবে বুঝতে পারছে না। সে এত অধীর যে দু হাঁটু ভেঙে আসছে। মানুষটা একটা দেয়াল থেকে পাথর সরাতেই ভয়ংকর গুহাপথের মতো কি ভেসে উঠল। তারপর আর তার জ্ঞান ছিল না। সকালের দিকে মনে হল কেউ তাকে ডাকছে—রিচার্ডের গলা—জেনি কত আর ঘুমোবে! কখন উঠবে, মুখ ধোবে, ব্রেকফাস্ট করবে! সে এখানে আছে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। কোনটা জীবনের সত্যাসত্য, মুহূর্তে গুলিয়ে ফেলল। সংজ্ঞা হারাবার পর মানুষটা তার এতটুকু ক্ষতি করেনি। কাঁধে ফেলে এতটা পথ হেঁটে এসেছে ফের। রেখে-গেছে। তার দু চোখ জলে ভরে গেল।

## দশ

সকাল থেকেই ভীষণ ঝড়ো বাতাস বইছিল। আকাশ ঘোলা। জোয়ারের সময় তাঁবুর কাছাকাছি জল এসে যায়। ঝড়ো বাতাসের জন্য ঢেউগুলো প্রবল হয়ে উঠছে। বাতাসে ভীষণ জলকণা উড়ছিল। থমপ্সনের মনে হল তাঁবু আরও ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া দরকার। প্রচণ্ড ঝড়ের ভেতর ঢেউগুলো তাঁবুর ওপর এসে আছড়ে পড়তে পারে। জোয়ার এবং ঝড়ের প্রাবল্য এই প্রথম একসঙ্গে আরম্ভ হয়েছে।

শত ডাকাডাকিতে জেনি উঠছে না। বাতাসের গতি ক্রমে বাড়ছে। তাঁবুতে পত পত শব্দ হচ্ছে। এবং গুমগুম আওয়াজ। রিচার্ড শংকা বোধ করছে। তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে ফেলতে হবে। তাঁবু আরও ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া দরকার। স্টোভ জ্বালানো যাচ্ছিল না। তবু থমপ্সন কোনোরকমে তাঁবুর ভেতর গরম জল করে রেখেছে। আলুতে সামান্য চিজ মিশিয়ে নিয়েছে। একটা করে আপেল প্রত্যেকের ভাগে। সবারই খাওয়া শেষ। জেনি তবু উঠছে না।

অগত্যা রিচার্ড বলল, জেনি আকাশের অবস্থা ভাল না। ওঠো। তাঁবু ওপরে তুলে নিয়ে যেতে হবে।

ওরা প্রথমে নিজেদের তাঁবু খুলে ফেলল। তাঁবু এবং দড়িদড়া যা কিছু আছে, অবশিষ্ট খাবারের পেটি সব টেনে নিয়ে যেতে থাকল। তখন জেনি উঠে বাইরে এল। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাসের সঙ্গে সফেন ঢেউ আকাশ ঢেকে সামনে এসে আছড়ে পড়ছে। জল কেবল ফুলে ফেঁপে উঠছে ক্রমশঃ। এই সাত সকালে এমন একটা অবস্থা হবে দ্বীপে কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। এবং প্রবল সাইক্লোন ওঠার আগে যা যা করা দরকার থমপ্সন বিচার বিবেচনা মতো করে যাচ্ছে। কিছু শুকনো কাঠ পর্যন্ত সংগ্রহ করে এনেছে। কারণ প্রচণ্ড শীত পড়ে যেতে পারে। চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া দ্বীপটাতে। সহজেই প্রবল ঠাণ্ডা নেমে আসতে পারে। হাতের কাছে সব কিছুই ঠিকঠাক রাখা দরকার। ওরা টেনে টেনে উঠে যাচ্ছে, যতটা পারা যায়, যতটা ওপরে উঠে যাওয়া যায়। ওদের আগেই এ-টা ভাবা উচিত ছিল। আর্চি থমপ্সনের একটা বড় রকমের ত্রুটি আবিষ্কার করতে পেরে খুশি। সবই বলা যাবে কর্তাকে। বিশ্বাসী লোকের বুদ্ধিসুদ্ধির তারিফ করা যাবে তখন।

আর্চি খুব খাটছে। রিচার্ডের চুল উসকো খুসকো। সেও দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে। তাঁবুর খোঁটা পোতা হয়ে যাচ্ছে। যতটা পারা যায় ভেতরে শক্ত করে পুঁতে দিচ্ছে। দিয়েও আশ্বস্ত হতে পারছে না। ঝড় কতটা প্রবল হয়ে উঠবে বোঝা যাচ্ছে না। তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে না যায়! এটা হয়ে গেলেই জেনির তাঁবু ভেঙ্গে ফেলতে হবে। যতটা সম্ভব দৌড়ে কাজ করছিল সবাই। এতসব দেখে জেনিও কাজে লেগে গেল। ওর সোনালী চুল হাওয়ায় উড়ছে। গাউন সামলাতে পারছে না। উড়ে ছিঁড়ে ফিরে যেতে চাইছে। সে কোনরকমে সব সামলে, কাপড়িসগুলো সন্তর্পণে পা টিপে টিপে নিয়ে যাচ্ছে। ঝড় তাকে জ্বালা আকুল করছে না। বরং সে বেশ খুশি। ভিজে ভিজে বালিকার মতো ছুটোছুটি লাগিয়েছে। রাতের সব ঘটনা কখনও কখনও স্বপ্ন মনে হচ্ছে তার।

তুমুল হুলুস্থুল চলেছে আকাশে বাতাসে সমুদ্রে। দ্বীপের গাছপালা জীব-

জন্তু সব আঝোর বর্ষণে ভিজছে। ঝড়ের দাপটে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে ডালপালা। শেকড় বাকড়ের মতো ছড়িয়ে পড়ছে বিদ্যুৎপ্রবাহ। বজ্রপাত হচ্ছে কোথাও। প্রকৃতি-রসেবসে উত্তাল প্রেমিকের গোপন খেলা দেখে মুগ্ধ। শেষে বোটটাও ভাসিয়ে নিয়ে এল ওরা সবাই। জলে ঝড়ে সহজেই চারজন মিলে অনেকটা ওপরে তুলে ফেলতে পারল। শেষমেস ঢেউ ওদেরও কিছুক্ষণের জন্য বালিয়াড়িতে চিৎপাত করে ফেলে দিয়ে সরে গেল। গেরাফি অনেক ওপরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে থমপ্সন। সেটা মাটিতে পুঁতে দিতেই মনে হল শেষ। সবাই তাঁবুর ভেতরে তখন। জেনি নিজের তাঁবুতে সব খুলে ফেলল। এবং দিনটা কতক্ষণে শেষ হবে, ঝড় ঝঞ্ঝা সে গ্রাহ্য করে না। দুপুরে খেতে বসেই রিচার্ড লক্ষ্য করল, জেনি খুব কৃশকায় হয়ে গেছে যেন। চোখ টানছে। ক্লান্ত চোখ মুখ। যেন কোনো এক অতীব পীড়ন চলছে অভ্যন্তরে। অথচ এই যে সারা সকাল হাত মিলিয়ে ওরা কাজ করেছে, জেনিকে এতটুকু দুঃখী মনে হয় নি। রিচার্ড এক চামচ সুপ মুখে দিয়ে হাতটা মুছে নিল ন্যাপকিনে। তারপর ফের তাকাল আর্চির দিকে। খাবার সময় আর্চি ভীষণ মনোযোগী মানুষ। সে লক্ষ্যই করল না—জেনির কিছু একটা হয়েছে। এবং যেন হঠাৎই হয়েছে। সে বলল, জেনি তুমি কি রাতে ঘুমোও না!

জেনির ভেতরটা চমকে উঠল। কিন্তু স্বাভাবিক গলায় বলল, ঘুমোই তো।

—তবে চোখ এত টানছে কেন! যেন কত রাত না ঘুমিয়ে আছ।

আর্চি তাড়াতাড়ি ঠোঁট ন্যাপকিনে সামান্য মুছে নিল। তাকাল ভাল করে। শেষে আবিষ্কারের ভঙ্গীতে বলল, ঠিক ঘুম হচ্ছে না। হবে কি করে! নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত। তাই বলে না ঘুমিয়ে থাকা আমার একদম পছন্দ হচ্ছে না। ভুল ত মানুষেরই হয়। থমপ্সন কি বলেন!

—ভুল মানুষেরই হয়। থমপ্সন দু'টুকরো আলুভাজা মুখে পুরে দিল।

জেনি অল্পস্বল্প খাচ্ছে।

আর্চি বলল, একবার আমরা বুঝলে জেনি, তুমি ভেব না ; মেয়েদের কোনো গৌরব পাঁথা এটা, আসলে মেয়েরা এমনিতেই পুরুষের চেয়ে জেদী হয়। সেটি ভাল। জেদ কখনও কখনও মানুষকে খুব বড় করে দেয়।

রিচার্ড এতটুকু শুনছে না। আগের কথার সঙ্গে পরের কথার কোনো মিল নেই। ফাঁকা সব দার্শনিক কথাবার্তা আরম্ভ করলেই রিচার্ড বুঝাতে পারে লোকটা কত বড় অহাম্মক। এমনিতে তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু যে-ভাবে কথাবার্তা শুরু করেছে, একেবারে বাইবেলের পাতায় গিয়ে না ফেলে দেয়। নোয়ার প্লাবনে ওর কোনো চৌদ্দপুরুষ একটা বেড়া নিয়ে গেছিল, বাইবেলের পাতায় তাও খুঁজে বের করে ফেলতে পারে। সে বলল, জেনি তোমার কি মনে হয় ঝড় আরও বাড়বে?

আর্চি বলল, ওহে যুবক আমার নিবাস সমুদ্রের কাছাকাছি। আমাকে জিজ্ঞেস না করে জেনিকে জিজ্ঞেস করার মানে?

জেনি বলল, রিচার্ড আমি উঠছি!

তারপর রেনকোট জড়িয়ে সে বালিয়াড়িতে বের হয়ে গেল। আর্চি কোনো মেরু-দেশের তুষার ঝড় আরম্ভ হয়েছে ভাবল। তুষার ঝড়ে কোন রমণীর একা বের হওয়া কতটা উচিৎ একবার থমপ্সনের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করে নিল। থমপ্সন নির্বিকার। তাঁবুর ভেতর জল ঢুকে যাচ্ছে। সে পা উঠিয়ে বসল। তারপর এই ঝড় বাদলায় খাওয়াটা বেশ জমে উঠেছে। এক কাপ কফি করে দেওয়া হয়েছে

সবাইকে। জেনি কফিটা না খেয়েই উঠে গেল।

ঝড় বাদলায় দ্বীপের চেহারা পাল্টে গেছে। ঘোলা জলের মতো অন্ধকার—তাঁবুর ভেতর লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিতে হয়েছে। থমপ্‌সন চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। তাস দাবা খেলার এটা বেশ প্রকৃষ্ট সময়। কিছুই সঙ্গে আনেনি। সে ছেলেবেলাতে স্কুলে আঁককাঠি খেলত। অনেক দিন পর মনে হল ছেলেবেলার খেলাটা খেলা যায়। সে কাপ ডিস নামিয়ে রাখার সময় রিচার্ডের দিকে তাকাল। —রিচার্ড খেলবে নাকি?

রিচার্ড থমপ্‌সনের কথায় বিস্মিত হল। সে চুরুট জ্বালিয়ে বেশ জুতসই হয়ে মাত্র ক্যাম্পখাটে বসেছে তখনই খেলার কথা। কি খেলা যায়—খেলার জন্য তাস অথবা দাবা কিছুই আনা হয়নি। এমনকি লুডো, ক্যারাম। এমনভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে কখনও কল্পনাই করতে পারেনি। থমপ্‌সন বাসন কুসন ধুয়ে রেখেছে। রিচার্ড কিছু বলছে না। আর্চি একটা বই-এর পাতা ওল্টাচ্ছিল। জেনি ঝড় বাদলে বের হয়ে গেল। একবার তাঁবু ফাঁক করে দেখেছে। জেনিকে দেখা যায় নি। তাঁবুতে ঢুকে গেছে বোধ হয়। একা একা থাকতেও পারে! বেশ চারজনে গোল হয়ে বসে থাকা, গল্পগুজব করা মনোরম ভারি। জেনিটা জীবনকে উপভোগ করতে জানে না। সে খাটে শরীর এলিয়ে দিয়ে বলল, কি খেলবেন ভেবেছেন! বরং রেডিও শুনবেন।

ঝড়ের দাপটে রেডিও খুব গড় গড় করছে। স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আর্চি রেডিওটা ফের বন্ধ করে দিল। এখন তিনজন মানুষ আর প্রকৃতি যদৃশ মাতাল। বেলা পড়ে আসতেই দ্বীপটা ঘন ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেল। ঝড়ের বেগ বেড়েছে মনে হল।

জেনি রেনকোট ঝুলিয়ে রেখেছে তাঁবুতে। গাম বুট জোড়া খাটের নিচে। আসলে রেনকোট রাতে দরকার হতে পারে। ওদের তাঁবু থেকে সন্ধ্যার পর চেয়ে নেয়া ঠিক হবে না। তার চেয়ে এখন পরে আসা ভাল হয়েছে। নিজের জিম্মায় রেখে দেওয়া। টর্চটা জ্বালিয়ে দেখল, সব ঠিক আছে। তবু একবার তাঁবুর বাইরে মুখ বাড়িয়ে আকাশের অবস্থা দেখে নিল! এত ঘন বর্ষণ যে পাশের তাঁবুটা স্পষ্ট নয়। যতটুকু সময় হাতে পাওয়া যায়—শুয়ে থাকা দরকার। ঘুম আসছে না। ভোর রাতের দিকে সামান্য ঘুম এসে গেছিল! এতেই সে অবাক হয়েছে! কত বড় উদ্বেগের ভেতর সময় কাটছে, কি যে উত্তেজনা, এবং এ-জন্যই বোধ হয় সে টের পাচ্ছে না, ভেতরে ভেতরে কত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে সে। থমপ্‌সন বোধ হয় গিটার বাজাচ্ছে। বেশ লাগছিল। এবং কোনো কাউ-বয় বড় মাঠে তার ছাগল ভেড়া নিয়ে ঝড়ে পড়ে গেছে, গিটারে তেমনি একটা সুর বাজাচ্ছিল থমপ্‌সন। সে কান পেতে শুনতে গিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি। একটা লণ্ঠন হাতে ভিজতে ভিজতে আর্চি এসে ডেকেছিল, জেনি রাতের খাবার রেডি। এস।

সে ওদের তাঁবুর ভেতরে গিয়ে অবাক। এই রাতে থমপ্‌সন কত রকমের খাবার তৈরি করেছে। গরম ভাপ উঠছে। সব প্লেটে ঢাকা। একটা নতুন বোতল ভাঙ্গা হয়েছে। সবারই প্রচণ্ড খিদে। জেনিরও বেশ খিদে পেয়েছে। এবং খাবারের গন্ধটা ওর খিদে আরও বাড়িয়ে দিল।

আর্চি বলল, ভারি মজা। আ! বলে সে দু' হাত ওপরে তুলে দ্বীপটার সুখটুকু অনুভব করতে চাইছে। আর মাত্র সাত আট দিন, তারপরই সুইট হোম।

সে বেশ ঢক ঢক করে গলায় বোতল থেকে কিছুটা ঢেলে মুখ চোখ তেরিয়া করে ফেলল।

জেনি বলল, এত খাবার কে খাবে!

আর্চি বলল, যা খাবার একাই খেতে পারি।

থমপ্সন বলল, বাদলার দিনে আর তো কিছু করার নেই।

জেনি ভাবল, সত্যি! থমপ্সনের কিছু না কিছু করা চাই। সারা বিকেল সে তবে নানারকমের মেনু তৈরি করেছে। এবং ভীষণ আন্তরিকতার সঙ্গে এখন সব সাজিয়ে রেখেছে টেবিলে। জেনি বলল, আপনি পারেনও। তারপরই সহসা খুব চিন্তান্বিত মুখে বলল, যা আছে বাকি কটা দিন চলবে তো!

—খুব খুব। সোল্লাসে আর্চি লাফিয়ে উঠল।

রিচার্ড বলল, হয়ে যাবে।

আর্চি দাঁড়িয়ে সে তার প্লেটে যতটা পারল তুলে নিল। চাক চাক খরগোসের মাংস ভাজা। খরগোসের কিড্নির চচ্চড়ি। একটা ডিসে অল্প পরিমাণ গ্রীন পিজ সেদ্ধ। মাংস খেয়ে খেয়ে খুব একটা জিভে স্বাদ না থাকলে দুটো একটা গ্রীন পিজ মুখে ফেলে দেওয়া।

জেনি বলল, আমাকে অল্প দিন। এত খেতে পারব না।

আর্চি বলল, খাও খাও। জীবনে সুযোগ মানুষের খুব কমই আসে। ভাগ্যিস এসেছিলাম।

জেনি নিজের প্লেটে কিছুটা রেখে বাকিটা আর্চির প্লেটে তুলে দিল। সে তার গ্লাসে সামান্য মদ ঢেলে বোতলটা সরিয়ে দিল। কে কতটা খাচ্ছে, কি খাচ্ছে না দেখার সময় যেন নেই। আর্চি বলল, খুব ঘুম পাচ্ছে!

জেনি বলল, খুব।

থমপ্সন বলল, তোমরা খাও। আমি আসছি। বলে সে একবার তাবুর বাইরে ভিজতে ভিজতে চলে গেল।

একটাই রেনকোট। থমপ্সন ভিজে ভিজেই পায়চারি করল বালিয়াড়িতে। সমুদ্রের দিকে যাওয়া যাচ্ছে না। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে টাকটা সম্পূর্ণই ভিজে গেল। ভেতরে এসে গা মুছে বলল, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে!

আর্চি বলল, কিছু দেখলেন?

থমপ্সন বলল, না। আর কটা দিন! তোমাদের সবাইকে নিয়ে মানে মানে ভেসে পড়তে পারলে হয়।

রিচার্ড বুঝতে পারল, থমপ্সন আবার কোন সংশয়ে পড়ে গেছে। সে বলল, কি দেখতে গেছিলেন!

—এমনি গেছিলাম।

জেনি থাকায় কি কিছু বলছেন না! জেনি খেয়ে উঠে গেলে রিচার্ড ফের বলল, আপনি আমাকে গোপন করছেন কেন!

থমপ্সন হেসে ফেলল।—আরে তেমন কিছু নয়। জলটা বাড়ছিল। দেখে এলাম কতদূর উঠে এসেছে।

আর্চি বলল, দ্বীপটা ডুবে যাবেনাতো!

রিচার্ড অন্য সময় হলে হয়তো বলত, যেতেও পারে। কিন্তু আবহাওয়া ক্রমে

খারাপের দিকে যাচ্ছে। জোয়ার প্রবল হলে কতটা কি হয় তারা জানে না। আর জোয়ারের বছরের কোনো কোনো সময় দ্বীপটা ডুবেও যায় কি না জানা নেই। সে তাই আর্চির প্রতি খুব রুষ্ট হয়ে কথা বলতে পারল না। বরং থমপ্‌সনকেই ফের বলল, কতটা উঠে এসেছে।

আর্চি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, সকালে দেখবনাতো সমুদ্রে ভেসে গেছি। ঘুমিয়ে থাকলে মানুষ মরা!

থমপ্‌সন বলল, আর্চি তুমি এত ভীতু কেন বলত!

—আমি ভীতু! সত্যি কথা বললে মানুষ ভীতু হয়। বরং আপনাদের প্রশংসা করা উচিত। আগে থেকেই এলার্মিং বেল বাজিয়ে দিচ্ছি।

—জোয়ার কতক্ষণ থাকে! বলে থমপ্‌সন দেখল তাঁবুর নিচে কি একটা গলা বাড়িয়েছে। বালিয়াড়িতে আগেই দেখে এসেছিল কাণ্ডটা। অসংখ্য কচ্ছপ দ্বীপটায় উঠে যাচ্ছে। কচ্ছপের গলা দেখে সে বলল, ঐ দেখ। এবং আর্চি সহসা দেখেই লাফিয়ে খাটে উঠে পড়ল। থমপ্‌সন বলল, কচ্ছপ। এবং মানুষের কোলাহল পেয়ে কচ্ছপটা দৌড় লাগাল। থমপ্‌সন তাঁবুর দড়িদড়া ফের টেনে দেখল একবার। কিছু ছোট ছোট পাথর তুলে আনল। রিচার্ডও বের হয়ে গেল। ওরা জেনির তাঁবুর পাশেও বড় বড় পাথর তাঁবুর তলানিতে জমিয়ে দিল। ঝড় বাদলায় কখন কি তাঁবুর ভেতর ঢুকে যাবে—অথবা কোনো অকটোপাস, সমুদ্র থেকে জলচর জন্তুরা ঢেউয়ের আঘাতে সহজেই ওপরে উঠে আসতে পারে। সতর্ক থাকা দরকার।

থমপ্‌সন বাইরে থেকেই বুঝেছে, জেনি লণ্ঠন জ্বালিয়ে কিছু পড়ছে। বোধ হয় দ্বীপের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কিত সেই সব বই। থমপ্‌সন একবার হেসে বলল, ভয়ের কিছু নেই জেনি।

জেনি ভেতর থেকেই বলল, বৃষ্টিতে আর ভিজবেন না। খাওয়া হয়েছে?

—এবার গিয়ে বসব।

—তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। বেশি রাত জাগবেন না। অসুখে পড়ে যাবেন।

—আচ্ছা।

বেশ চড়া গলায় কথা বলতে হচ্ছিল উভয়কে। সমুদ্রের প্রবল গর্জনে না হলে শোনা যাচ্ছিল না। ওরা চলে গেলে জেনি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। কাল রাতে সে দ্বিতীয়বার মূর্চ্ছা গেছে। এমন কি দেখেছিল মূর্চ্ছা যাবার মতো! কোন ভয়ঙ্কর কিছু সে মনে করতে পারছে না। সারাটা দিনই সে কেবল ভেবেছে তবে সে মূর্চ্ছা গেল কেন! প্রথমবার, মূর্চ্ছা যাবার মত ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বার! অনেক করেও দৃশ্যটা সে মনে করতে পারছে না। একটা গুহামুখের সামনে ভুবন চ্যাটার্জী তাকে নিয়ে হাজির করেছিল। ভুবন, কথাটা তার এই প্রথম মনে পড়ল। চ্যাটার্জী বলেই সে ডাকত। কিন্তু ওর নাম ভুবন। পদবী চ্যাটার্জী। ক্যাবট প্রথম পরিচয়ের সময় সব খুলে বলেছিল। ভুবন কথাটা সে ভুলেও গেছিল কবে। আবার মনে পড়ায় কেমন নিজের কাছেই অবাক হয়ে গেল। এবং এই ভুবন ভাবতে ভাবতে তার মনে পড়ল, ভুবন তাকে একটা গুহামুখের সামনে বলেছিল, দেখতে পাচ্ছ?

সে দেখেছিল, ঠিক যেমন একজন যাদুকর বায়োস্কোপের বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ভুবনও তেমনি বাক্সটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাক্সের ডালা খুলে ওর

শরীরটা কালো কাপড়ে ঢেকে দিয়ে বলেছিল, দ্যাখো। একটা ছিদ্রপথে চোখ রেখেছিল জেনি। সেই গুহামুখের ওপরে অদ্ভুত সুন্দর একটা ফুলের উপত্যকা। দেখেই মূর্চ্ছা গেছিল সে। সুন্দর ফুলের উপত্যকা দেখে কেউ মূর্চ্ছা যায় সে কেমন ব্যাপার! তবু এর চেয়ে বেশি কিছু সে মনে করতে পারছে না। না আরও কিছু যা একেবারেই অবচেতন মনে ডুবে আছে। ওর মনে পড়ছে একটা পাথর তুলতেই কোথাও যেন ঢুকে গেছিল তারা। বাইরে থেকে সহজেই পাথর অথবা পাহাড়ের গা মনে হয়, সামান্য সমান্তরালভাবে এগিয়ে দেখলে বোঝা যায়, সরু একটা গোপন পথ আছে। ভেতরে ঢুকে গেলেই সেই সুন্দর উপত্যকা। ফসলের জমি, ফুলের গাছ, ফলের বাগিচা সব আছে। আসলে ওটা গুহামুখ মনে হলেও এখন বুঝতে পারছে ভেতরে ঢুকে যাবার গোপন রাস্তা। ভুবনের সুন্দর নিবাস অলক্ষ্যে কিছু উলটপালট করে দিচ্ছে না তো!

তারপরই মনে হল জ্যোৎস্নায় অত সব স্পষ্ট দেখা যায় না। তবে কি ভুবন কিছু জানে। ভুবন রহস্যময় পুরুষ! ভুবন কি অলৌকিক কিছু করতে পারে। ইচ্ছেমতো কারো সংজ্ঞালোপ করে দিতে পারে। যত ভাবছে, তত সে আকর্ষণ বোধ করছে। ক্যাবট কতদূরে থাকে! ক্যাবট কেন দেখা দিচ্ছে না! ভারি গণ্ডগোলে পড়ে গিয়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। একসময় এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, সে ডাকাডাকি শুরু করে দিত, থম্পসন আপনারা দ্বীপটাকে যত নিরীহ ভাবছেন, আসলে দ্বীপটা তেমন নিরীহ নয়। এর ভেতরে এক গোপন খেলা চলছে। সেটা কি আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না।

আর মানুষের কি যে হয়, মানুষ কি কখনও নির্জনতায় নিজের অতীত সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন হয়ে যেতে পারে! কি ঘটনা ঘটেছিল, কিছুই ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। এবং সে স্থির করে নিচ্ছে কি ভাবে আজ ভুবনের মুখোমুখী হবে। সে কিছুতেই সংজ্ঞা হারাবে না। ক্যাবট নিশ্চয়ই ছায়ার মতো দূরে থাকে। তার প্রিয় বন্ধুকে দিয়ে সব বোধ হয় জেনে নিচ্ছে। ছ-বছরে জেনি কতটা কি ঠিক আছে না জেনে ক্যাবট দেখা করবে না ভেবেছে।

তারপর ভাবল যদি এই ঝড় বাদলার রাতে সে ওদের ডেকে বলে, এখানে একজন মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সে ভুবন। ভুবন চ্যাটার্জী। ক্যাবটের ভারী বিশ্বস্ত বন্ধু। বিশ্বস্ত কথাটা মানুষ কত দিন নির্বিচারে মেনে চলতে পারে! আর সে যে এতদূরে এসেছে, ক্যাবট যে তার প্রিয়তম পুরুষ সেটাই বা কতটা ঠিক। জেনি নিজের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে দেখছে, আসলে সে নিজেও খুব একটা ভাল চেনে না নিজেকে। ক্যাবটের চেয়ে নিজের অভ্যন্তর আরও জটিল।

সে একসময় বুঝল, পাশের তাঁবুতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সে আজ প্যাণ্ট সার্ট পরল না। ঠিক রমণীর মতো তার সবচেয়ে দামী গাউন পরে নিয়েছে। রেনকোট চাপিয়ে, মাথায় টুপি সেটে নিল। টর্চ নিয়েছে। পকেটে সেই লোড করা আটত্রিশ বোরের রিভলবার। বাইরে এসে বুঝল বৃষ্টি গুড়ি গুড়ি, এবং হাওয়ার জোর প্রবল তেমনি। সে চেপে চুপে ধীরে ধীরে উঠে যেতে থাকল। এমন ঝড়ের ভেতর ভুবন আসবে তো। সে কিছুদূর গিয়েই সহসা থমকে দাঁড়াল। ভুবন বালিয়াড়ির কাছেই অপেক্ষা করছে চোরের মতো। একটা চামড়ার বর্ষাতি গায়ে। গোড়ালী পর্যন্ত লুটাচ্ছে। মাথায় চামড়ার লম্বা টুপি। টর্চ মেরে একবার দেখে নিল, সত্যি ভুবন কিনা। মুখে অল্প অল্প বৃষ্টির ছাট।

ভুবন বলল, কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

জোনি হাঁটতে হাঁটতে বলল, না ঘুমোলে বের হই কি করে!

ভুবন বলল, ওদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। জলে ডুবে গেছে। পূর্ণিমার জোয়ারে দ্বীপের অনেকটা ডুবে যায়। তোমাকে আজ একটু কষ্ট করতে হবে।

জোনি বলল, ভুবন।

ভুবন বলল, তুমি মেয়ে ভারি ভীতু।

সমুদ্রে প্রবল ঝড়, উত্তাল হাওয়া, দশ বিশ গজ দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। জোনি বুঝতে পেরেছিল বালিয়াড়ির ওপর দিয়েই ওরা হেঁটে যাচ্ছে। সে বলল, ভুবন আজ ক্যাবটের সঙ্গে দেখা না করে যাচ্ছি না।

ভুবন খুব সহজ ভাবেই বলল, সে হবে।

এত সহজ কথাটা ভুবন এ-দুদিন বলেনি কেন! কাছে থেকে ভুবন কি নিঃসংশয় হয়েছে, জোনি আগের জোনিই আছে। আচ্ছা বাবা তোমরা কি বোকা বলত! আগের জোনি না থাকলে কি দায় এখানে আসার! সে বলল, কিছুইতো দেখা যাচ্ছে না।

ভুবন বলল, ঝড় বাদলায় দ্বীপটার চেহারা পাল্টে যায়। পৃথিবীর কোথায় একটা দ্বীপ, কোথায় একটা সমুদ্র চারপাশে ফুঁসছে, দ্যাখো দ্বীপটা তেমনি অবিচল—কিছুই যায় আসে না, কি প্রবল ঢেউ, আকাশ সমান উঁচু হয়ে আসছে। দ্বীপের কাছে মাথা কুটে মরছে। দ্বীপটার এতটুকু যদি আবেগ থাকে।

জোনি ভুবনের গা ঘেসে হাঁটছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, আর কুয়াশার মতো জলকণা বাতাসে—কিছুই দেখা যাচ্ছে না. টর্চ জ্বেলেও কোনো সুবিধা হচ্ছে না, বরং ভুবনের কাছে লেগে থাকা অনেক বেশি নিরাপদ মনে হচ্ছে তার। সে ভুবনের কথা খুব মন দিয়ে শুনছিল। ধীরে ধীরে ভুবন খুব স্বাভাবিক গলায় কথা বলতে আরম্ভ করেছে। আগের মতো হঠাৎ হঠাৎ গলা ঠাণ্ডা করে ফেলছে না।

ওরা সেই কাশের উপত্যকায় এসে গেছে। এবং ভেতরে ঢুকেই মনে হল প্রচণ্ড খাদ সামনে। ভুবন হাত ধরল জোনির। বলল, পা রাখো নিচে।

—আমরা কোথায় নামছি ভুবন।

—আঃ কি চিৎকার করছ! হড়কে গেলে দুজনেই পড়ে যাব অতলে।

—আশ্চর্য তো, একটু হাওয়া লাগছে না।

—ডানদিকে বড় একটা পাথরের দেয়াল আছে।

—আচ্ছা ভুবন...

—কথা বলবে না! অন্যমনস্ক হলে বিপদ হতে পারে।

—তুমিত ধরে রেখেছ!

—তবু ভয় আছে।

পূর্ণিমা বলেই অন্ধকার তত গভীর নয়। আকাশে মেঘের তোলপাড় তেমনি চলছে। ওরা ক্রমে নেমে যেতে থাকল। এটা দ্বীপের কোথায়, কি ভাবে আছে স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। এবং ভুবন খুব সন্তর্পনে পা বাড়াচ্ছে, কিছুটা নেমে যাচ্ছে, তারপর টর্চের আলোতে সিঁড়ির মতো জায়গাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে। কোথায় কি ধরবে, পা রাখবে, সব। ভুবন কিছুতেই নিচে টর্চ ফেলছে না। কোনো খাদের ভেতর নেমে যাচ্ছে স্পষ্টই বুঝতে পারছিল। যেন ওপরের আকাশটাই ধীরে ধীরে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে।

কিছুটা নেমে ভুবন টর্চ ফেলতেই দেখল, জল নেমে যাচ্ছে। বৃষ্টির জল। বলল, জুতো খুলে নাও।

—কিছু হবে না। বলে জেনি নেমে গেল। বেশ জোরে জল নামছে। কোথাও কোনো উপত্যকা থেকে জলের ধারা নেমে আসছে এখানে।

একটা ডাল সরিয়ে দিল ভুবন। তারপর গাছ থেকে একটা লতা কেটে নামল। নালার ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, ধর। একপ্রান্তে জেনি অন্যপ্রান্তে ভুবন। লতা ধরে নালাটা পার হয়ে গেলে ভুবন বলল, তোমার কিছু হলে ক্যাবটকে মুখ দেখাব কি করে!

জেনির বুকটা ছাঁত করে উঠল। এত যে কষ্ট, এত যে পরীক্ষা, কিসের জন্য! এতই মহানুভব যখন, আগে দেখা হলে কি ক্ষতি ছিল! আর তখনই সে দূরে ল্যাম্পের আলো দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল, আলো আলো।

ভুবন নির্বিকার। সে বলল, খুব পিছল জয়গা। সতর্ক থেকো। ঝোপজঙ্গলের ভেতর যদি এ-ভাবে কোন নির্জন দ্বীপে আলো দেখা যায় যে কোনো অভিযানকারী মানুষের বুক অধীর হয়ে ওঠে। অন্ধকারে আলোর কি মহিমা! জেনি নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না। আবার মূর্চ্ছা যাবে না তো। এত কাছে সেই নিরুদ্দিষ্ট মানুষটি! অথচ কোনো ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। সে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, ক্যাবট তুমি কোথায়। ক্যাবট! ক্যাবট!

—জেনি অধীর হবে না।

জেনি আর কোনো কথা শুনছে না। সে ঝোপজঙ্গল মাড়িয়ে ছুটতে চাইছে। ঝড় বাদল, এবং প্রাকৃতিক কোনো সংকট তাকে বাধা দিতে পারছে না।

ভুবন দৌড়ে গেল। তারপর জেনির হাত ধরে ফেলল।—জেনি শান্ত হও। প্লিজ।

—আমার হাত ছাড় বলছি!

ভুবন হাত ছেড়ে দিল। আর তখন জেনি দেখছে সেই আলো অদৃশ্য হয়ে গেছে নিমিষে! ভুবন! বলে চিৎকার করে উঠল। তুমি কে। তুমি মানুষ না অন্য কিছু জানি না। ভুবন আমাকে এমন মায়ার খেলায় ফেলে দিচ্ছ কেন!

ভুবন বলল, এদিকে এস। আবার যেই না ভুবনের পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছে, আলোটা সুদূরে নীহারিকার মতো ফুটে উঠেছে। জেনি বলল, ঐ তো! বলেই যখন ছুটবে, ভুবন অতি কষ্টে বলল, এটা বোধ হয় পৃথিবীর সবচেয়ে নির্জনতম জায়গা। মানুষের বসবাসের পক্ষে এমন নিরিবিলি নির্জন জায়গা আর কোথায় আছে জানি না। এবং বড় বড় গাছের ভেতর প্রাচীন কোনো নগরীর ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন ফুটে উঠেছে বুঝি। কোনো প্রাচীন সভ্যতা ছিল কিনা এটা কে জানে। পাথরের এক বিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষের ওপর দিয়ে ওরা হেঁটে যাচ্ছিল। সামনে কিছুটা গেলেই একটা বড় গুহামুখ। দেয়ালে লম্প রাখার কুলঙ্গি। জেনি ক্যাবটকে কাছাকাছি কোথাও দেখতে পচ্ছে না। —ক্যাবট কোথায়? ক্যাবটকে ডাকো!

ক্যাবটও কোথা থেকে ছুটে আসছে না। প্রতিমুহূর্তে আশা করছে, ক্যাবট গুহার অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসবে। অথবা ক্যাবট পেছনে এসে দাঁড়াবে। বলবে, জেনি, জেনিফার।

ভুবন এবার বলল, ভিতরে এসো।

জেনিফার গুহার ভেতরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে।

সে বলল, কোনো ভয় নেই। এসো। ভিতরে ঢুকে দ্যাখো আমরা দু-জনে কিভাবে বেঁচে আছি। জেনিফার ভেতরে ঢুকলে ভুবন বলল, এখানে আমি থাকি। এই আমার রান্নার জায়গা।...বড় লম্বা মসৃণ ঘরের মতো মনে হচ্ছে ভেতরটা। বোঝাই যায় না পাহাড়ের গুহামুখ মানুষের জন্য এমন নিরিবিলি একটা আবাস তৈরি করে রাখতে পারে।

ভুবন বলল, আগে এত মসৃন ছিল না। পাথর ঘসে ঘসে মসৃন করেছি। একজন সভ্য মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার, সব আছে। কেরোসিনের স্টোভ, চিনেমাটির প্লেট, নরম পাতার বিছানা।

জেনি এত কথা শুনতে চায় না। কিছু শুনতে চায় না। সে শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

ভুবন ল্যাম্প হাতে নিয়ে ঘুরছে। জেনিকে সব দেখাচ্ছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। পাথরের কিলে লম্বা সেই জলদস্যুর পোশাক ঝুলছে।

জেনি নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখে যাচ্ছে সব। যা আছে শুধু একজনার। ক্যাবটের কিছু আছে কিনা বলছে না।

—এই যে কাঠের বাক্সটা দেখছ, ওটায় বসতে পার। ফানাফুতি থেকে এটা এনেছি। জিরিয়ে নাও।

ক্যাবটের এমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না যাতে দুদণ্ড আরও বেশি অপেক্ষা করতে পারে। জেনিফার ভুবনের এমন নিস্পৃহ কথাবার্তা আর সহ্য করতে পারছে না। সে আর ধৈর্য ধরতে না পেরে বলল, ভুবন তোমার খোঁজে আমি এত বড় অভিযানে আসিনি।

ভুবনের চোখে বিষণ্নতা নেমে এল। সে বলল, জানি।

জেনি বলল, তোমার বন্ধুকে ডাকো। বিশ্বাসঘাতক সে। দেখুক, আমার জীবন কত অতিষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভুবন লম্ফের আলোটা আরও সামনে নিয়ে গেল জেনির। তুলে ধরল। জেনির মুখ এই প্রথম আলোতে ভালো করে দেখে নিতে চাইল। জেনি আলোটা সহ্য করতে না পেরে মুখ ঢেকে দিল।

ভুবন বলল, জেনি তুমি এত ভালবাস ক্যাবটকে! ছ-বছর পরও কেউ একজনের অপেক্ষায় এ-ভাবে থাকতে পারে!

—ভুবন আমি আর পারছি না। তুমি সত্যি কথা বল ভুবন। আমি পাগল হয়ে যাব। ক্যাবট! ক্যা...ব...ট! সে পাগলের মতো সেই দেয়ালের ভেতর ছুটে বেড়াতে থাকল। দেয়ালে দুহাতে দুম দুম কিল লাথি মারতে থাকল। যেন ক্যাবট এই দেয়ালের কোথাও গোপন ঘরে লুকিয়ে আছে। সে মাথা ঠুকলে ঠিক বের হয়ে আসবে। গলা ছেড়ে ডাকতে থাকল, আমি জেনিফার, ক্যাবট।

ভুবন তাড়াতাড়ি লম্প রেখে ছুটে গেল। জোর করে ধরে তুলে আনল।

—আমি মরে যাব ভুবন! মাথায় কোথাও লেগেছে। রক্তপাত সামান্য হচ্ছে। ভুবন বলল, জেনি, বুঝতে পারি তোমার কি কষ্ট! ঠিক একদিন এমন কষ্টই কেমন আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। সে কপালে সামান্য কোথা থেকে পাতা এনে রস লাগিয়ে দিচ্ছে।—তুমি বস। কফি করছি। খাও।

ভুবন খুব যত্ন নিয়ে কফি করছে। আর অজস্র কথা বলে যাচ্ছে। যেন সব কথা ওর না শুনলে সে ভোজবাজির মতো ক্যাবটকে বের করে দেবে না।—এই দ্যাখো না, বলে সে একটা লম্বা পোশাক দেখাল। সে নিজের পোশাক যা পরে

আছে তাও দেখাল। বলল, এমন পোশাকে দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে।

সে অনবরত কথা বলে যাচ্ছে। যেন কতদিন সে কথা না বলে আছে। জেনিফারকে পেয়ে একজন কথা বলার লোক কতদিন পর পেয়ে গেছে যেন। ক্যাবট সম্পর্কে সে স্পষ্ট কিছু বলছে না।—ওঃ আমরা যখন এখানে প্রথম এলাম! সে কি ভীষণ কষ্ট! ক্যাবটের কাছে কেবল একটা লাইটার ছিল। সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে আর কিছু সঙ্গে আনতে পারি নি। কি করি! আগুন ক'বার জ্বাললেই লাইটারের আয়ু ফুরিয়ে যাবে। না না, আর একটা ছিল। ছোট্ট ছুরি। তুমি তো জানো এটা ক্যাবটের চাবির গোছাতে থাকত। বলেই সে ক্যাবটের লাইটার এবং ছুরিটা কুলুঙ্গি থেকে তুলে আনল। বলল, চিনতে পারছ।—তুমি ঘেমে যাচ্ছ জেনিফার। গরম লাগছে। রেন-কোটটা খুলে ফেল! দাও আমাকে। সে রেন-কোটটা ঝুলিয়ে ফেব কাছে এসে বলল, কি দুটোই ক্যাবটের মনে হচ্ছে তো!

জেনিফার সব চিনতে পারছে। কাঠের বাক্সটায় সে একজন তীর্থযাত্রীর মতো বসে আছে। অভিব্যক্তিশূন্য মুখ। দামী লাইটারটা সে ক্যাবটকে ইয়র্ক থেকে কিনে দিয়েছিল। ছুরিটা ক্যাবটের খুব প্রিয়। সে এটা কিনেছিল এডেন থেকে। ভুবন নিজেও খুব যত্ন নিয়ে দেখছে অনেকদিন পর। জেনিফারের দিকে ভাল করে তাকাচ্ছে না। এ-দুটো জিনিসই ছিল তার সেই প্রথম দিকের সহোদর। অনেক দিন পর জেনিকে দেখানোর জন্য বের করেছে।

জেনিফার ঠিক বুঝতে পারছে না রেন-কোট খুলে ফেলার পর ভুবন কেন আর তারদিকে একেবারেই তাকাল না। সে নিজের দিকে তাকিয়েই ঘাবড়ে গেল। পাতলা গাউন, এবং এত মিহি যে শরীরের রঙ ফুটে বের হচ্ছে। ঠিক আব্রু রক্ষা হচ্ছে না। ভুবনের এটা ছিল চিরদিনের স্বভাব। একটুকুতেই ভারি সে লজ্জা বোধ কবত। ভুবন নিরাময় ঈশ্বরের মতো সব অবহেলা করে যাচ্ছে। যেন কি প্রচন্ড অহংকার তার—লোভ লালসা সে অবহেলায় জয় কবেছে। জেনি আব কোনোরকমেই লোকটাকে সহ্য করতে পারছে না। সে দুহাত তুলে বলল, ভুবন গল্প থামাও। আমাকে তুমি কি পেয়েছ! সে কোথায় বল! বল বলছি। এক দুই তিন দশ গুনব এ-ভাবে। না বললে সব শেষ কবে দেব তোমার। ভণ্ডামীর শেষ থাকা উচিৎ ভুবন!

লোকটা কি! সে কি বিশ্বাস করছে না, কিছু করতে পারে তাব বিশ্বস্ত বন্ধুস্ত্রী। সে কি জেনেছে, সবটা না জানা পর্যন্ত কিছু করতে পারবে না এই বিদেশিনী। অথবা সে কি জানে এমন সুপুরুষ একাকী মানুষকে কোনো নারী কখনও এত নির্জনতায় খুন করতে পারে না! কেমন সাধুপুরুষেব মতো বলে যাচ্ছে —জেনিফার তখনকার দিনগুলো সত্যি ভীষণ কষ্টের ছিল আমাদের। তোমার সব শোনা উচিত। আগুন জেবলে রাখার জন্য সমুদ্রে ডুবে শংখ মাছ ধরে আনতাম। সে ভীষণ এক অহংকারী খেলা। একটা মাছ আর আমি। জলের নীচে সেই মাছ আর আমি। তার পেট চিরে চর্বি সংগ্রহ করতাম। জলের নিচে খেলাটা বেশ জমে উঠত। মাঝে মাঝে জীবন সংশয় করে খেলা। চর্বিতে শুকনো লতা জ্বালিয়ে রাখা নিশি-দিন। এখনতো সে-সব কিছু লাগেনা। দেখলে তো দেশলাই জেবলে স্টোভ ধরালাম। একটা জেলে-ডিঙ্গি ভেসে চলে এসেছিল এদিকে। তাতে দু'জন মানুষ শুকিয়ে কাঠ। আমার যা ধারণা, ওরা পথ ভুল করে গভীর সমুদ্রে পথ হারিয়ে ফেলেছিল।

হয়তো বা এটাই ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছা। যখন একটা নতুন দ্বীপ মানুষের অহংকারী খেলায় মেতে উঠেছে তখন দুটো একটা মানুষ ঝড়ে পড়ে পথ ভুল করবে সে আর বিচিত্র কি!

কফির জলটা ফুটছে। কথা বলতে বলতে সে ভুলে যাচ্ছে কেতলিটা নামানো দরকার। সে তার গল্প খুব নিবিষ্টভাবে বলে যাচ্ছে।—বুঝলে ডিঙিটা হ্রদের জলে ডুবিয়ে রাখি। ছোট ডিঙি। হালকা। মাসে ছ'মাসে ডিঙিতে পাল তুলে চলে যাই। উত্তরে শ' খানেক মাইলের মতো গেলে ফানাফুতি দ্বীপ, এলিস দ্বীপ। দ্বীপ থেকে মধু, শস্য বলতে ধান যব নিয়ে যাই। বিনিময়ে শীতের পোশাক, তেল, মশলা, সাবান, দরকারী যা কিছু নিয়ে আসি। এলিস দ্বীপে ফসফেটের খাদ আছে। সেখানে জাহাজ যাওয়া আসা করে। তোমরা তো তেমন একটা জাহাজেই এসেছ দেখলাম।

জেনিফার বলল, ভুবন, আমার কিছু শুনতে ভাল লাগছে না। কফি আমি কিছুতেই খেতে পারব না। তুমি তো জানো ক্যাবট আমার সব। আমার অহংকার সে! তুমি আমাকে রক্ষা কর, প্লিজ!

ভুবন ভারি লেন্সের চশমাটা খুলে জামায় মুছল। তারপর আবার পরল। চশমা ব্যতিরেকে ভুবন প্রায় কিছুই দেখতে পায় না। সে এবার চশমাটা কেড়ে নেবে ভাবল। কিন্তু ভুবনের চোখের দিকে তাকিয়ে সে কেমন বেদনা বোধ করল।

ভুবন এবার সহজ গলায় বলল, ওর গলা এতটুকু কাঁপল না, জেনি, ওকে আমি খুন করেছি।

সঙ্গে সঙ্গে জেনিফার শক্ত হয়ে গেল। ওর মনে হল মানুষটা অধার্মিক। ক্রমে নিষ্ঠুরতার এক কঠিন ইচ্ছা ওর সারা অবয়বে জড়িয়ে যেতে থাকল। সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। পেছন ফিরে বসে আছে ভুবন। কাপে কফি ঢালছে। নাড়ছে। সে কি করতে পারে একবার চোখ ফিরিয়ে দেখছে না পর্যন্ত! এক নিষ্ঠুর প্রতিশোধ স্পৃহায় উঠে দাঁড়াল সে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে পকেট থেকে বের করে নিল রিভলবারটা। তারপর সে সোজা তাকিয়ে মাথা বরাবর গুলি ছুঁড়তে গিয়েই থেমে গেল। চোখ থেকে কি করে চশমাটা খুলে পড়েছে মেঝেতে। সে চশমাটা হাতড়াচ্ছে। বলছে, দ্যাখোতো জেনি, চশমাটা কোথায় ছিটকে পড়ল। এ-সময় মাথায় গুলি করলে সেও অধার্মিক হয়ে যাবে। একজন অন্ধ মানুষকে কিছুতেই খুন করা যায় না। জেনি চশমাটা বাঁ হাতে তুলে দিয়েই সরে দাঁড়াল! তখন ভুবন ভীষণ কাতর গলায় বলছে, ক্যাবট, তোমার আমার প্রতি খুব অবিশ্বাসের কাজ করেছে। ওকে খুন করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না জেনি।

## এগার

তখন কড়াত করে দুটো বাজ পড়ল দ্বীপের কোথাও। লম্পের আলোটা কেঁপে গেল। এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস ঝাপটা মারল গুহামুখে। গাছ থেকে অবিরাম বৃষ্টি ঝরার শব্দ টুপটাপ। ওরা কেউ আর কোনো কথা বলছে না। জেনিফার কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো বসে থাকল। চোখ টাটাচ্ছে। সে কিছুতেই ভুবনকে বিশ্বাস করতে

পারছে না। ক্যাবট কোনো অবিশ্বাসের কাজ করতে পারে না। ওকে আমি শৈশব থেকে জানি ভুবন, বলতে ইচ্ছে হল। কিন্তু বলতে পারল না। সে সরল বালিকার মতো ভুবনকে শুধু দেখতে থাকল।

জেনিফার উঠে দাঁড়াল। বলল, ভুবন আর কিছু বলছ না কেন!

—জাহাজেই টের পেলাম, সে আর আগের ক্যাবট নেই। তুমি তো জানো জেনি, দুর্ভাগ্য বল, সৌভাগ্য বল, সব সফরে সে আর আমি একসঙ্গে জাহাজে উঠতে পারতাম না। আবার এও তো ঠিক অধিকাংশ সফরে সে আর আমি একই জাহাজের সেকেন্ড, থার্ড। আমি যখন সুদূর মিসিসিপিসিতে সে তখন হয়তো কলিকাতায়। সরমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক আর সুস্থ ছিল না।

—তোমার বউ সরমা!

—সরমা—

—ক্যাবট সরমাকে.... .।

—জেনি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না! নেটিভ একটা মেয়েকে, কিন্তু সরমাকে তুমি দ্যাখোনি। সরমার মতো মেয়ে হয় না। তার কেন যে এমন দুর্মতি হল বুঝি না! আমি দেশে ফিরে কিছু টের পাইনি। কেবল বলেছিল, ক্যাবট এসেছিল। একদিন ওকে ডেকে এনে খাইয়েছে। আমার ভাল লেগেছিল শুনে। তোমাদের সবারই খবর নিয়েছি। ক্যাবটকে চিঠি লিখেছিলাম, এবারকার জাহাজে যাতে দু'জনে একসঙ্গে উঠতে পারি। ক্যাবট না থাকলে জাহাজটা আমার কাছে ভাবি নিষ্প্রাণ হয়ে যেত! সফল শেষ হতে চাইত না।

ভুবন কফি এগিয়ে দিল—খাও।

কফি হাতে নিয়ে জেনিফার বসে থাকল। ক্যাবট নেই, শোক প্রবল হচ্ছে না কেন। সে চিৎকার করে বিলাপ করতে পারছে না কেন। চোখ জলে ভার হয়ে আসছে না কেন! পৃথিবীতে যে মানুষটা তার এত প্রিয়জন, সহসা সে কেন এত সাধারণ মানুষ হয়ে যাচ্ছে! বুকের ভেতর তবে এতদিন কি এমন প্রবল দুঃখ পাথরের মতো ভার হয়ে ছিল—দুঃখটা কি! সে নিজের সঙ্গে যখন এ-ভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিয়েছে তখনই ভুবন আবাব বলল, জাহাজেই টের পেলাম! নিউ-ক্যাসেলের ঘাট থেকে জাহাজ ছেড়েছে। সারাদিন কাজ ছিল। সামান্য মেরামতের কাজের দরুণ ক্যাবট নিচ থেকে দুপুরে উঠতে পারেনি। এজেন্ট অফিস থেকে শেষ ডাক এসেছে। ক্যাপ্টেন ডেকে আমার চিঠি দিলেন, তারপর কি-ভেবে বললেন, ক্যাবটের একটা চিঠি আছে। ওকে দিয়ে দিও। ওপরে হাতের লেখাটা মনে হল সরমার। তাহলে সরমা ক্যাবটকে চিঠি দিয়েছে! সংশয় করার কোনো কারণ নেই। দিতেই পারে। নিজের চিঠিটা খুলে পড়লাম। কিছু সাংসারিক কথাবার্তা! সে ক্যাবটকে যে চিঠি দিয়েছে, কোনো উল্লেখই করেনি। কেমন ভেতরটা মোচর দিয়ে উঠল।

জেনি চুপ করে শুনছে। অভিযানে এসে সব খুঁটিনাটি তার জানা উচিত। ক্যাবটের এই রহস্যময় অন্তর্ধানের পেছনে সঠিক ব্যাখ্যা তার হাতে থাকা দরকার। সে ভুবনকে বাধা দিচ্ছে না।

—চিঠিটা পড়ে মাথা গরম হয়ে গেল জেনি। সরমা ক্যাবটকে তার শরীর সম্পর্কে এত খোলামেলা চিঠি দিতে পারে দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। চিঠিটা পড়েই মনে হল সরমা আর আমার কথা ভাবে না। সরমা আর একজনকে সবই দিয়ে দিয়েছে।—জেনি! সে এই বলে জেনির দিকে তাকাল। মানুষের সব চেয়ে প্রিয় বস্তু কিছু

আছে, থাকতে পারে এখন আর বিশ্বাস করি না। সব শুনে এ-মুহূর্তে ক্যাবট তোমার কতটা প্রিয়জন মনে হয়!

—কিছুই ভাবতে পারছি না ভুবন। তুমি বলে যাও। ক্যাবট আমার প্রিয়জন, কত প্রিয় তোমাকে কি বলে বোঝাব! তোমার বিদ্রূপ আর সহ্য করতে পারছি না ভুবন!

—আমি বুঝি! তোমার কষ্টটা বুঝি! বিশ্বাসের ভিত ধ্বসে গেলে মানুষকে কতটা সংকটে পড়তে হয় জানি। তোমার সব কিছুর জন্য আমি দায়ী।

—ভুবন তারপর কি করলে!

—শুনলে খারাপ লাগে।

—বল। চুপ করে থাকলে কেন?

—ক্যাবটকে বুঝতে দিইনি। কিছুই বুঝতে দিইনি। চিঠিটা রেখে দিলাম। জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। আমি কতটা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না। ক্যাবটকে আট-দশটা দিন আরও বেশি কাছে কাছে রাখলাম। মাঝে মাঝে তোমার কথা ওকে বলেছি। কেমন উদাসীন থাকত। সরমা প্রসঙ্গে এলেই ওর হয়ে পঞ্চমুখে প্রশংসা। সে বলত, ভুবন মধ্যযুগের মানুষ হলে সরমার জন্য ডুয়েল লড়া যেত। খুব জোরে হাসতাম। সে বুঝতেই পারত না, ভেতরে ভেতরে কতটা নৃসংশ হয়ে গেছি। এতটুকু আঁচ করতে পারলে, সেও রক্ষা পেত, আমিও রক্ষা পেতাম। এই নির্জন দ্বীপে বনবাসী হয়ে থাকতে হত না।

জেনি বলতে পারত, তুমি দেশে ফিরে গেলে কে আর ধরছে! কিন্তু সে ভুবনকে বাধা দিতে চায় না। ভুবন বলুক। ক্যাবট কতটা খারাপ সে জানতে চায়। ক্যাবটের প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহা ভুবন কিভাবে মিটিয়েছে জানতে চায়। ভেতরে ভেতরে সেও কেমন নৃসংশ।

ভুবন বলল, কি কফিটা খাও! ঠান্ডা হচ্ছে। জেনি কফিতে চুমুক দিল।

—ফাঁক খুঁজছিলাম। ক্যাবটও থাকবে না, আমিও থাকব না। তারপর মনে হল বোকামি। শুধু ক্যাবটই থাকবে না। সরমার ছেনালীপনা রক্তে এমন হুল ফোটাতে পারে, খারাপ কথা বলে ফেললাম, আমার যে কি হয় জেনি, ছ'বছরেও সেই যুবতীর কথা মনে হলে মুখ শক্ত হয়ে যায়। মানুষের এটা যে কি রোগ! সরমার জন্য আমার কোনো টান নেই। অথচ চিঠিটার সেই সব অক্ষরগুলো এখনও মাথার ভেতর পাথরের হরফ হয়ে গেঁথে গেছে। তুমি বর্শার ফলকে কখনও কখনও হরিণ-শিশুকে বিদ্ধ করেছ। অথবা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছ! সরমার চিঠিটা আমার কাছে ছিল তেমনি। অথচ একটু সহজভাবে মেনে নিলে, কিছুই ক্ষতি ছিল না আমার। একজন নারী একজন পুরুষকে ভালবাসতেই পারে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কেন যে মনে হয়েছিল, ক্যাবট দুশ্চরিত্র, সরমা আরও বেশি। যেন ভুবন যাত্রার আসরে নায়ক। জেনি দূর থেকে দেখতে এসেছে।

—সময় পেলেই ক্যাবটের ঘরে পড়ে থাকি। সরমার সব চিঠি ওর লকার থেকে খুলে বের করলাম। তারপর আমার ছুটি। তখন শুধু কোনো গোপন জায়গায় নিয়ে যাওয়া। রাতের দিকেই বোটডেক খালি থাকে। ঠেলে ফেলে দিলে কেউ টের পাবে না। এনজিনের কর্কশ শব্দে, সে পড়ে যাবার সময় চিৎকার করলেও ব্রিজে যারা আছে জানতে পারবে না। লাইফ বোটের পেছনটাই উৎকৃষ্ট জায়গা। এবং জায়গাটা নির্বাচন করতেই আমার দু'দিন সময় লেগেছিল। তারপর পকেটে সবকটা

চিঠি, ওর চাবি, এবং দু গ্লাসে সামান্য মদ নিয়ে দুই বন্ধুতে সমুদ্রে পা ঝুলিয়ে গল্প করা। নক্ষত্রলোকের খবরাখবর নিতে ক্যাবট ভারি ভালবাসত। সে পৃথিবীর সঙ্গে ঐ সব নক্ষত্রলোকের পারস্পরিক সম্পর্ক, জলবায়ু, আর, এন. এ' এবং ডি. এন. এ. বিষয়ক কথাবার্তায় এত বেশী মসগুল হয়ে যেত যে মনেই হত না, সে জাহাজের একজন নাবিক। তাকে প্রাণের উৎস সম্পর্ক নতুন কিছু তথ্য জানাব বললাম। বই পড়ার নেশা জাহাজে উঠেই হয়েছে। জাহাজের এই নিঃসঙ্গতা বই পড়ে সহজেই সরিয়ে রাখতাম তুমি জানো। বেশ একটা তর্কযুদ্ধে দু'জনে যখন মসগুল, তখনই জলে ফেলে দিলাম। সে পড়ে যাবার সময় আমায় ধরে ফেলল। একসঙ্গে সমুদ্রে ভেসে গেলাম। কেউ টের পেল না। একটা কাক পক্ষী জানতে পারল না। মানুষ তার সব হারিয়ে না ফেললে এত নিষ্ঠুর হতে পারে না। আমার বিশ্বাসী বন্ধু ক্যাবট, সতীসাধ্বী স্ত্রী সরমা মুহূর্তে পোকার সামিল হয়ে গেল। ক্যাবটকে চুবিয়ে খুন করার সময় একবার যদি নাড়িতে এতটুকু টান বোধ করতাম জেনি, কিছুতেই এত বড় নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড তবে ঘটত না। আমাকে তুমি ক্ষমা কর। যদি ক্ষমা করতে না চাও, ধরিয়ে দিতে পার। সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। সব খুলে বলব। দোষ স্বীকার করব। তারপর আর একটা কথা বলল না ভুবন। মাথা গুঁজে বসে থাকল। ভুবন কি কাঁদছে!

জেনি বলল, ভুবন কফিটা ফের গরম করে নিচ্ছি। দেশলাই কোথায় রেখেছ। তোমার কফিটাও দেখছি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। জেনি উঠে দাঁড়াল। তারপর স্টোভ জেবলে সসপেনে সামান্য গরম করে নিল কফি। দুটো কাপে ঢেলে ভুবনকে একটা কাপ এগিয়ে দিল। ঘড়ি দেখল। রাত একটা। নিশীথে জেগে থাকা এবং খুন খারাবির খবর কেমন রোমাঞ্চকর। জেনি কিছুতেই ক্যাবটের শোকে বিহ্বল হতে পারছে না আর। ওর শীত করছে।

—ভীষণ শীত করছে ভুবন!

ভুবন শুকনো কাঠ উনুনে ফেলে দিল। তারপর আগুন ধরাতেই উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল শীতল ঘরটায়। জেনি বলল, বাঁচালে!

ওরা দু'জনই আগুনে হাত সেঁকতে থাকল!

অবিরাম বর্ষণ বাইরে। ঠাণ্ডা বাতাস। ঝড় এবং বিদ্যুতের প্রচণ্ড হট্টগোল। ভুবন অনায়াসে বলল, সমুদ্রে ওকে চুবিয়ে মেরেছি জেনি।

—আঃ। জেনি একটা আর্ত চিৎকার করে উঠল।

—জেনি জেনি!

—বল।

—ভয় পেলে!

—না। তুমি বলে যাও।

ভুবন কাঠ এনে আবার ফেলে দিল।

—খুব ধোঁয়া হচ্ছে ভুবন।

ভুবন ফুঁ দিয়ে আগুনটা জ্বালিয়ে দিল।

—এত শীত করছে কেন!

—বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। তুমি কিছু গায়ে দাও। বলে সে কাঠের বাক্স থেকে একটা লম্বা জলদস্যুর পোশাক খুলে দিল।

জেনি সুন্দর মতো পোশাকটা পরল। বলল, এগুলো তুমি পাও কোথায়?

—বানিয়েছি।

—কি সুখ।

—বেঁচে থাকার জন্য মানুষ নিজেই কিছু করে নেয় জেনি। এমন একটা দ্বীপে আমার কেন জানি রাজার মতো বাঁচতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু পোশাক পরার পর মনে হল ফনাফুতির দর্জিটা রাজার পোশাক বানায়নি। সে আমাকে জলদস্যুর পোশাক তৈরি করে দিয়েছে। তোমাকে বেশ লাগছে দেখতে।

জেনি বলল, ভাল লাগছে বলছ!

—খুব।

জেনির চোখ দুটো কড় কড় করছে। ধোঁয়ায় নয়, অথবা কোন প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠেছে কিনা বুঝতে পারছে না। প্রতিশোধ কার ওপর! কে সেই মানুষ! ভুবন না ক্যাবট! সে বলল, ভুবন তুমি পারলে!

—মানুষ সব পারে জেনি। দ্বীপে থেকে এটা আরো ভাল করে বুঝেছি। আমার কোনো কষ্টই হয় না। বরং দ্বীপের গাছপালা, পাখাপাখালি, খরগোস আর নিত্যদিন ফুল ফুটে থাকা, এই সব কিছুর জন্যই মায়া। একটা গাছ মরে গেলে পর্যন্ত দুঃখ পাই।

জেনি বলল, ভুবন তোমার বন্ধুকে ক্ষমা করেছ নিশ্চয়ই।

—এখন আর কিছু ভাবি না। কেবল সরমার কথা মনে হলেই মাথাটা গোলমাল হয়ে যায়। তখনই ছুটে বেড়াই চারিদিকে। জলদস্যুর পোশাক পরে ফেলি। কোনো টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখি সমুদ্রে। ধীরে ধীরে মাথার গোলমালটা সেরে যায় তখন।

—আমাকে দেখাবে।

ভুবন কিছু বলল না।

—কি কিছু বলছ না কেন!

অনেক দূর থেকে কোথাও যেন ড্রাম বাদকেরা প্যারেড করে যাচ্ছে। গুম গুম আওয়াজ। জেনি বলল, দ্বীপটা ডুবে যাবে না তো!

—না।

—আমরা তাঁবু ফেলেছি যেখানটায়!

—না।

—কিসের শব্দ।

—উপত্যকার জল ছাদের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। জল পড়ার শব্দ!

—এতক্ষণ শুনতে পাইনি কেন?

- ক্যাবট তোমার মন-প্রাণ জুড়ে ছিল।

—এখনও আছে?

—না নেই। থাকলে শুনতে পেতে না।

—ভুবন!

—বল।

—তুমি দ্বীপে তবে সত্যি—

—খুবই একা।

—কেন তবে বললে, আমরা দু'জন ভালই আছি। কেন বললে ক্যাবটের সঙ্গে দেখা হবে।

ভুবন তাকাল জেনিফারের দিকে। বলল, সে আছে।

—মরে গেলে মানুষ থাকে কি করে।

—তবু আছে।

—তোমার মাথায় গোলমাল নেই তো ভুবন!

ভুবনের মুখে সেই ছেলেমানুষী হাসি। দুষ্টু বালক ধরা পড়ে গেলে ঠিক যে ভাবে হাসে। সে বলল, না গোলমাল নেই। থাকলে সব তোমাকে বলতে পারতাম না। সমুদ্রে যখন ওকে চুবিয়ে মারি তখন কেবল সাক্ষী কিছু আকাশের নক্ষত্র। নীল জল এবং ছোট ছোট কিছু মাছ। হাঙ্গরেরা তেড়ে আসতে পারে। কিন্তু কিছুই মাথায় ছিল না। সে আমাকে, আমি তাকে ধরার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম জেনি। ক্যাবট ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। তুমি জান সহজেই তাকে কাবু করা আমার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু যখন সত্যি মরে গেল, জলে ভেসে যাচ্ছিলাম, দেখি সে আমাকে জড়িয়ে রেখেছে। আমিও ডুবে যাচ্ছিলাম। ডুবে গেছিলাম। সকালে সংজ্ঞা ফিরলে দেখি একটা দ্বীপের মতো বালিয়াড়িতে পড়ে আছি। পাশে ক্যাবট, ঠিক বন্ধুর মতো আমাকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে যেন। মাথা গোলমাল থাকলে এত সব হুবহু কথা বলতে পারতাম না।

শীত কি দ্বীপে আরও প্রবল হয়ে উঠছে! কিছুক্ষণ আগেও তো ঘাম ছিল। তবে দ্বীপের প্রকৃতি কি এই রকমের। জেনি বলল, এত ঠাণ্ডা কোত্থেকে আসছে। হাড় ফুটো করে বরফের কুচি ভেতরে কেউ ঢুকিয়ে দিচ্ছে ভুবন।

ভুবন বলল, ঠাণ্ডা পড়েছে। আগুনটা ভাল লাগারই কথা। তুমি ঘামছিলে, এখন শীতে হা হা করে কাঁপছ। রক্তের নষ্ট প্রভাব এটা। সংজ্ঞা ফিরে এলে ক্যাবটকে খুন করেছি ভাবতেই এমন একটা প্রবল শীত ভেতর থেকে নাড়ী বেয়ে উঠেছিল জেনি। এটা কি করলাম! এমন নির্জন দ্বীপে আমি একা। কেউ নেই। শুধু ক্যাবট। মরা মানুষটাও আমার তখন সহকারী ফের। তাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে পারিনি। মানুষের পক্ষে একা থাকা কত কঠিন সেদিন টের পেয়েছিলাম। সে আমার সঙ্গেই থাকুক। শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে দুজনেই থেকে গেলাম। সে মাটির নিচে, আমি মাটির ওপরে। মরে গিয়েও সে আমাকে ছেড়ে দিল না।

ভুবন বলল, যখনই ভয় লাগে, ঝড় ওঠে, অথবা কোনো সমস্যায় পড়ে যাই, ডাকি, ক্যাবট কি করব! সে উত্তর দেয়। সে সব বলে দেয়। সাহস ফিরে পাই। বেঁচে থাকার জন্য যা যা করনীয় করে ফেলি। কখন ফসল বুনব, কোথায় কি গাছ লাগাব, পরামর্শ করে নি। দুই বন্ধুতে মুখোমুখি বসে তখন আমাদের কত কথা হয়।

জেনি কিছুটা তিক্ত গলায় বলে উঠল, সরমাকে নিয়ে তোমাদের কথা হয় না।

ভুবন বলল, না। কথা হয় না।

—আমাকে নিয়ে?

—না। তাও হয় না।

—তোমাদের কি কথা থাকে এত!

—কত কথা থাকে! কথা বলতে বলতে দু'জনেই আবার কখনও চুপ হয়ে যাই। কিছুই কথা থাকে না তখন। সারাদিন চুপচাপ বসে থাকি। সমুদ্র দেখি। পাখিদের ফিরে আসা দেখি। ক্যাবট বলে তখন, কি খাবে রাতে! কি রান্না করলে! সবই তাকে বলতে হয়। না বললে ভীষণ রাগ করে।

জেনি বলল, মাথা তোমার সত্যি ঠিক নেই ভুবন!

ভুবন বলল, বারে ঠিক থাকবে না কেন! বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর কথা হবে না! সে নেই বলে কি তার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না। সে কি বলবে তাও তো জানি।

জেনির ভেতরটা কেমন নড়ে যাচ্ছে। সে বলল, তা হলে আমি যে এসেছি সে ঠিকই বুঝেছে।

—বুঝতে পারবে না! মানুষ মরলেই কি শেষ হয়ে যায়। তারপর বলল, এসো দেখবে। গুঁড়ি মেরে দু'জনই বের হয়ে এল ভেতর থেকে। বাঁ দিকে পাথরের পর পাথর সাজানো। বেশ নেমে যাবার মতো ধাপ! কিছুটা এগিয়ে গেলে লেবু বন। বনের শেষ প্রান্তে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। ভুবন দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, এখানে সে আছে। বলে দুটো পাথরের ফাঁকে সবুজ গালিচার মতো এক টুকরো জমি দেখিয়ে বলল, এই তার সমাধি। কথা বলার সময় এদিকের পাথরটায় আমি বসি, ওই পাথরটায় ক্যাবট। মাঝখানের চিলতে জমিতে তখন ঘাস, ঘাসে ফুল, কত প্রজাপতি উড়ে আসে। দিনের বেলায় এস, সব দেখতে পাবে। ঝড় বাদলায় ঠিক বোঝা যায় না।

জেনি বলল, তুমি ভিজে যাচ্ছ ভুবন। টুপিটা ভাল করে টেনে দাও।

ভুবন বলল, আগে সমাধির ঠিক নিচেই ছিল সমুদ্র। দু'বছরে ক্রমে দ্বীপটা অনেক বড় হয়ে গেছে। দ্বীপটা ক্যাবটকে আরও ভালভাবে মুড়ে নিচ্ছে। দ্বীপটা যেন ক্যাবটকেই বেশি ভালবাসছে। খুব হিংসে হয়।

মাথার উপর মেঘলা আকাশ। জেনিফার সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে। ভুবন বলল, রাতে যখন শুয়ে থাকি, সমুদ্রের গর্জন শুনি, তখন ডেকে বলি, ক্যাবট কেমন আছ?

জেনিফার চোখ বুজে আছে তখন। আকাশ সমুদ্র এবং প্রকৃতির কূট খেলা শিরা উপশিরায় কোনো ড্রাম বাদকের মতো মার্চ করে যাচ্ছে। জেনি চোখ বুজেই বলল, সে কিছু বলে না?

—বলে।

—কি বলে?

—ভাল আছি!

জেনিফার বলল, তোমাকে সে কিছু বলে না?

—বলে।

—কি বলে?

—ভুবন কেমন আছ?

—তুমি কি বল ভুবন?

—ভাল আছি।

জেনিফার তেমনি চোখ বুজেই বলল, না ভুবন তুমি ভাল নেই। ভাল থাকতে পার না। তোমাদের মাঝখানে আর কেউ না থাকলে তোমরা ভাল থাকতে পার না। জোর করে ভাল থাকার কথা আমায় শুনিয়ে লাভ নেই। প্রকৃতির কূট খেলা শরীরে ড্রাম বাদকের মতো দ্রুত মার্চ করে যাচ্ছে। শীত অথবা ঠান্ডা প্রায়ই ধীরে ধীরে জেনিকে কাহিল করে ফেলছে। সে ভুবনের পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর অস্ফুট গলায় বলল, আমরা ভাল আছি ক্যাবট।—আমার খুব শীত করছে ভুবন। দুহাতে সে ভুবনের গলা জড়িয়ে ধরল সহসা।—কি শীত! সে ভুবনের ভেতর যেন ঢুকে যেতে চাইছে।

ভুবন কেমন অসহায় বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছে না জেনি কি চায়! ঠিক কি চায়! তবু কেন যে মনে হল জেনি ওর সব অহংকার মুছে দিতে চায়। সে ভীষণ একটা পাপ কাজ করেছে—পৃথিবীতে হত্যার মতো পাপ আর কি আছে! দ্বিতীয়বার সে আর কিছু করতে চায় না। ভয় পেয়ে গিয়ে সরে দাঁড়াল।—জেনিফার!

জেনি পাগলের মতো সেই সমাধির পাশে ভুবনের গায়ে লতার মতো জড়িয়ে গেল।

—জেনিফার তুমি কি করছ! তুমি ফিরে যাও। ক্যাবটের কাছে আমাকে ছোট করে দিও না। সে পোকামাকড়ের মতো গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল জেনিকে। তারপর সেই গুহার দিকে যেতে থাকল।

জেনিফার ফুঁসছে। সে দৌড়ে গেল। সামনে দাঁড়াল! অসতর্ক মুহূর্তে ভুবনের চশমাটা কেড়ে নিল। ভুবন চারপাশে ঘোলা ঘোলা দেখছিল। এখন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

জেনি বলল, হাত ধর।

ভুবন জেনির হাত ধরল।

একজন অন্ধ মানুষের মতো ভুবনকে গুহামুখে পেঁছে দিয়ে বলল, তোমাদের কাউকে আমি ক্ষমা করব না।

ভুবন বলল, জানি।

জেনিফার এবার ভাল করে চশমাটা মুছে নিল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। সে ভিতরে ঢুকে বলল, এস।

ভুবন অন্ধমানুষের মতো হাতড়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

—নাও। বলে চশমাটা পরিয়ে দিল।

ভুবন চশমা পরে জেনিকে দেখল। জেনি বলল, ভুবন তুমি কিছুই দেখতে পাও না। —না।

—কেউ নেই, বাকি জীবনটা চলবে কি করে? —জানি না।

জেনিফার আর কিছু বলল না। শুধু বলল, কাল আসব। চল আমাকে দিয়ে আসবে।

### বার

সকালে রোদ উঠলে আর্চি দেখল, জেনি ঠিক আগের জেনি। বেশ বেলা করে তার আজকাল ঘুম ভাঙে। সবার ব্রেকফাস্ট হয়ে যায়, জেনি তবু তাঁবু থেকে বের হয় না! মাঝে মাঝে ডেকে সারা হয়! কখনও উত্তর পায়, কখনও পায় না। কেউ ও-জন্য আর কিছু বলে না।

জেনি খেতে বসে অজস্র কথা বলে যাচ্ছে। ভারি স্বাভাবিক। যাক্ শেষ পর্যন্ত কাঁধ থেকে ওর ভূত নেমেছে। জেনি যখন তখন দ্বীপে একা একা নির্ভাবনায় ঘুরে বেড়ায়। সে দ্বীপ থেকে সব ছোট ছোট রঙবেরঙের পাখি ধরে আনে। অথবা যেন পাখিরা এই দ্বীপে জেনিকে চিনে ফেলেছে। সে হাতে তালি বাজালে দ্বীপ থেকে সব পাখিরা উড়ে চলে আসে। মাথার ওপরে ওরা খেলা করে।

কখনও সে পাখিদের সূর্যাস্তে সমুদ্রে উড়িয়ে দেয়। অথবা সে যখন সমুদ্রে ঠিক যেন মাছের মতো নেমে যায়। সব রুপোলী মাছেরা তখন জলে, পায়ে পায়ে

গন্ধ শুঁকে বেড়ায় জেনির। এমন উর্বরা ভূমিতে একজন নারীর কত যে দরকার ওরা বুঝি তখন টের পায়। কেউ তাকে ভয় পায় না। ওর ভেতরে কি যে হয়েছে! মাঝে মাঝে বালিয়াড়িতে ছেলেমানুষের মতো ছুটে বেড়ায়। মানুষের ভেতরে কি যে এক ক্ষ্যাপা বাস করে! সমুদ্রের ঢেউ পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে তার। জেনিকে তখন সত্যি রহস্যময়ী নারীর মতো লাগে।

দু একদিনের ভেতরই জাহাজটা চলে আসবে। ওরা সকাল থেকেই দূরবীন নিয়ে বসে থাকে। জাহাজটা দূরে এগিয়ে আসছে দেখতে পেলেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে নেবে সব। এবং বোট জলে ভাসিয়ে দিয়ে দেখেছে, সব ঠিকঠাক আছে কি না। পাঁচ সাত মাইলের মতো দূরে জাহাজটা নোঙর ফেলে দাঁড়াবে। সুতরাং এখন শুধু খাওয়া, রেডিও শোনা, আর দেখা, কখন আসছে জাহাজটা।

সময় যখন আর ফুরোয় না. গীটার বাজায় থমপ্‌সন। ওরা নাচে। হল্লা করে। দেশে ফিরে গিয়ে খবর হয়ে যাবে তারা। যদিও থমপ্‌সন খুব প্রচার চায় না। কাগজগুলোতো মুখিয়ে আছে।

এক সকালে ওরা সত্যি সত্যি দেখল, আসছে। এগিয়ে আসছে একটা সাদা রঙের জাহাজ। ওরা তাড়াতাড়ি হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করে দিল! আর্চি তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল, জেনি তুমি কি! এখনও ঘুমোচ্ছ। জেনি, জেনি!

সকালের খাবার তাড়াতাড়ি তিনজনে মিলেই করে নিয়েছে! জাহাজে উঠে কখন খেতে যাবে কে জানে। আর যা যা বেশি সবই এদিক-ওদিক ফেলে রাখল। নেবার মধ্যে পোশাক আসাক, তাঁবু এবং কাঠের পেটি। জলের সব পাত্রগুলো পড়ে থাকল। এ-সব নিয়ে আর কি হবে। জেনি উঠছে না কেন!

আর্চি বলল, কান্ডটা দেখছ রিচার্ড!

থমপ্‌সন তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল, জেনি কি করছ! এত ঘুমোয়। জাহাজ এসে কখন নোঙর ফেলেছে। কিন্তু সাড়া না পেয়ে হতবাক হয়ে গেল।

রিচার্ড এসে দাঁড়ালো। ডাকল। না কোনো সাড়া নেই। সে ভেতরে ঢুকে দেখল তাঁবু ফাঁকা। জেনি নেই। সে বাইরে এসে বলল, জেনি বোধ হয় ওদিকটায় গেছে। বলে বনটার দিকে আঙ্গুল দেখাল।

ওদিকটায় যেতেই পারে। সকালে বিকেলে একবার না একবার যেতেই হয়। কিন্তু আর্চি বলল, কোন সকালে উঠেছি। গেলে দেখতে পেতাম না। ওরা এবার ঘড়ি দেখল। এবং ঘণ্টাখানেকের মতো পার হয়ে গেলেও যখন দেখা গেল না, আর্চি দৌড়ে গেল বনটার দিকে। ডাকল, জেনিফার!

থমপ্‌সন বলল, কি যে মুশকিলে পড়া গেল!

রিচার্ড বিরক্তিতে মুখ ভার করে আছে। সে বলল, চলুন দেখি ভেতরটায়। কিন্তু অনেকটা হেঁটেও হদিস পাওয়া গেল না। এমন বিড়ম্বনার ভেতর পড়ে রিচার্ড কি করবে বুঝতে পারছে না। সে বলল, থমপ্‌সন, জাহাজে খবর পাঠানো দরকার!

থমপ্‌সন বলল, জাহাজতো দেরি করবে না। —তবে কি করবেন!

থমপ্‌সনের মুখ শুকিয়ে গেল। কাল বেশ রাতেও গুন গুন করে গান গাইছিল জেনি। সে যখন রাতে বের হয়েছিল, আলো জ্বলছিল জেনির তাঁবুতে। সহসা এ-ভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া! কর্তাকে গিয়ে কি বলবে। এবং এভাবে আর্চি জেনির সব আঁতিপাতি করে খুঁজতে গিয়ে দেখল, একটা সামান্য চিরকুট। লেখা

আছে, ক্যাবট এ-দ্বীপমালায় কোথাও থাকে। ওর কাছে যাচ্ছি। খুঁজে নিজেদের এবং আমার বিড়ম্বনা আর বাড়াবেন না।

আর্চি চিৎকার করে উঠল, মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা! রিচার্ড, দ্যাখো তোমার বোনের কাণ্ড! রিচার্ড এখন আমি কি করব!

থমপ্সন চিরকুটটা দেখল। গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছে জেনি। এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। জেনিফার শেষ পর্যন্ত ক্যাবটকে খুঁজে পেয়েছে। ক্যাবট তা হলে দ্বীপগুলোর কোথাও থাকে! সে কি ঠিক জেনির সঙ্গে কখনও দেখা করেছে। সভ্য সমাজের প্রতি তার এত বিরাগ! সে ফিরে যাবে না, জেনিও সেজন্য এই দ্বীপে থেকে গেল! এমন অর্বাচীন পৃথিবীতে কেউ থাকতে পারে! জেনি কি পাগল হয়ে গেল!

থমপ্সন বলল, রিচার্ড আমার কি করণীয় বল!

—কি বলব। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে থমপ্সন।

—মুখ দেখাব কি করে!

আর্চি গালাগালি সুরু করে দিয়েছে। থমপ্সন আপনি পার পাবেন না। আমি এর একটা হেস্ত নেস্ত না করে যাব না। আপনারা যান। যা খুশী করুন।

জাহাজ থেকে দুবার সাইরেন বেজে উঠল। ওদের তাড়াতাড়ি করতে বলছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অনেক দূরে একটা টিলার ওপরে দেখল, কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ওরা একা নয়। দুজন। রিচার্ড বলল, দেখুন। দেখুন ঘুরে।

আর্চি পাগলের মতো দৌড়াচ্ছে। কিন্তু পাহাড়গুলোর এমনই গোপনতম শ্রেণী বিন্যাস, কার ক্ষমতা আছে যায়। যেন জেনিফার দেখা দিল একবার। পাশে কেউ। সুস্পষ্ট নয়। জেনি সত্যি তবে ক্যাবটকে খুঁজে পেয়েছে।

রিচার্ড বলল, আর দেরি না! এখানে পড়ে থাকতে পারে জেনি, মাথা ঠিক নেই। দুটোই পাগল। দেশে না ফিরে কিছু করা যাবে না।

আর্চি দেখল ভোজবাজির মতো ওরা অন্তর্হিত হয়ে গেছে চোখের ওপর থেকে। জেনি বোধ হয় দূরতম কোনো গভীর অরণ্যে ঢুকে যাবার আগে একবার সবাইকে দেখা দিয়ে গেল।

ওরা এবার শেষবারের মতো বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে ডাকল, জেনি, জেনিফার। পাগলামী করনা, ফিরে এস।

তখন দূরে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি।—জেনিফার ফিরে এস।

আর্চি ডাকল, জেনি! প্রতিধ্বনি, জে......নি!

রিচার্ড ডাকল, জেনিফার......। প্রতিধ্বনি· জে...নি...ফার!

এ-ভাবে শুধু বার বার এই বালিয়াড়িতে, সমুদ্রে, পাহাড়ে এবং ঘন বনাঞ্চলে এক অমোঘ ধ্বনি প্রতিধ্বনি। জেনিফারকে ওরা আর কোথাও খুঁজে পাবে না। খুঁজে পেলেও বুঝি আর চেনা যাবে না। লতাগুল্মে ঢাকা সে আর একটা নতুন দ্বীপ হয়তো। দ্বীপের চারাগাছে কথা আছে ফুল ফুটবে।

অরণ্যের ভেতর তখন ভুবনকে গাছের মতো দাঁড় করিয়ে দিয়েছে জেনি। জেনিফার গাছটায় কেমন লতার মতো বড় হয়ে যাচ্ছে। ক্রমে বড় হতে হতে সারা শরীরে সবুজ এক ঘ্রাণের জন্ম। ক্রমে ওরা দুজনে মিলে নতুন একটা অরণ্য। ভুবন বুঝতে পারছে সে আর জেনিকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। সমুদ্রে নতুন দ্বীপ অথবা অরণ্য এ-ভাবেই জন্ম নেয়। ভুবন এবার ডাকল, জেনি...ফা...র।

জেনিফার সাড়া দিল, ভু...ব...ন!

দূরে জাহাজটা ক্রমে বিন্দুবৎ হয়ে যাচ্ছে। বালিয়াড়িটা খাঁ খাঁ করছে বড্ড।

---

# প্রতিপক্ষ

সকাল থেকেই উপরের ঘরে খুটখাট আওয়াজ পাচ্ছিল অমিতা। বাবু অফিসে যাবেন কিনা সে বুঝতে পারছে না। এত সকালে মানুষটার ওঠারও অভ্যাস নেই। আটটার আগে অন্যদিন বাবুর ঘুমই ভাঙে না। আজ যে কি হল!

সে সিঁড়ির নিচ থেকেই ডাকল, 'শুনছ!'

আসলে বছরখানেক ধরে সে কোমরের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। নিচে নামলে সহজে ওপরে ওঠে না। জরুরী কোনো কাজ থাকলে বড় মেয়ে রনিতাকে পাঠিয়ে দেয়। অথবা কাজের মেয়েটাকে। সকাল বেলায় হাতে এত কাজ থাকে! সে একবার সিঁড়ির গোড়ায় এসে যে ডাকবে, তাও হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

তাতার-তমালের আজ হোস্টেল থেকে আসার কথা। তারা বাড়ি এলে দোতলার ও-ঘরটায় থাকে। পাশের করিডোর ধরে দুটো বেডরুম। একটাতে তারা থাকে। অন্য ঘরটায় রনিতা। সে সকালে নিচে নেমে এলে উপরটা প্রায় ফাঁকাই থাকে। ওপরে রনিতা থাকলে তার অন্তত সাড়া পাওয়া যেত। বাবার হয়ে সে অন্তত বলত, বাবা, মা তোমাকে ডাকছে।

কিছু টানাটানির শব্দ হচ্ছে। হুড়মুড় করে কি সব পড়ল! সে আর পারল না। ধরা কোমর নিয়েই কাঠের রেলিং-এ হাত রেখে উঠতে উঠতে চেঁচামেচি শুরু করে দিল, 'সব ভাঙবে। কী হল! কী পড়ল!'

সাড়া নেই।

অদ্ভুত তো!

'এই শুনছ!'

না সাড়া নেই। বুকটা ধক করে উঠল। পড়ে-টড়ে গেল না তো। তাতার-তমাল আসবে বলে কি ঘর সাফসোফ করছে! ঘরে তো তেমন কিছু নেই। একটা রঙিন টিভি। একটা টেবিল, আর একটা ডাবল খাট। দু-পাশের দেয়ালে কাচের আলমারি—সানমাইকার। আলমারি ভর্তি দুর্লভ সব বই। এই একটা আমিরী চাল আছে বাবুর। বাবুর সিফট ডিউটি। এ-সপ্তাহে সকাল দশটায় বের হন—আজ কি যে হল!

সে উপরে উঠে অবাক। বাপ মেয়ে মিলে টি ভি-র জায়গা বদল করেছে। খাটটা জানালার দিকে নিয়ে গেছে। দরজার পাশে ইজি-চেয়ার টেনে এনেছে। জানালার পাশে সেন্টার টেবিল রেখেছে। বাগান থেকে ফুলদানিতে এনে রেখেছে কিছু রজনীগন্ধার গুচ্ছ।

'কি তুমি অফিস যাবে না! চানে গেলে না! সকাল থেকে কী হচ্ছে সব। কখন থেকে ডাকছি! সাড়া পাচ্ছি না।'

সুকোমল তাকাল স্ত্রীর দিকে। ফুল স্পিডে ফ্যান চলছে। ফ্যানটার আওয়াজ একটু বেশি জোরে হয়। ফুল স্পিডে চালালে নিচের কথাবার্তা উপরে ভেসে

আসে না। হয়তো সে-জন্যই অমিতার খোঁজাখুঁজির খবর সে টের পায়নি!

রনিতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর মা আমাকে ডাকছিল!'

'কি জানি!'

আসলে দু'জনেই আজ ঘরটা একটু বেশি করে যেন সাজাতে চাইছে। আজ বিশ্বকাপ শুরু। আরজেন্টিনা-ক্যামেরুনের খেলা। বাবাকে ঘুম থেকে উঠেই দেখেছে, কাচের আলমারি থেকে সব বই টেনে নামিয়েছে। বইগুলো ঝাড়ন দিয়ে সাফ করে ফের সাজিয়ে রাখছে তাকে। ঘরের এখানে সেখানে সামান্য ঝুলকালি লেগেছিল। লম্বা ঝাড়ন দিয়ে তা সাফ করছে একা। গরমে ঘামছে বাবা। বিশ্ব-কাপের সময় বাবা তার কিছুটা খেলা পাগল মানুষ হয়ে যায়। গত বিশ্বকাপে দেখেছে, বাবার কী উৎসাহ। আরজেন্টিনার খেলা থাকলে, যত রাতই হোক, কিংবা পরদিন সকালে কিংবা বিকালে দেখালেও বাবা অফিস কামাই করতেন। এই দেশটার উপর কেন যে বাবার এত দুর্বলতা সে বোঝে না। খেলা চলার সময় আগাগোড়াই বাবা আরজেন্টিনার সমর্থক। আর দেশ পেল না। তবে বাবা তার জাহাজে সারা পৃথিবী ঘুরেছে সে জানে। দেশটার উপর তার এত প্রীতি কেন বললে, চুপ মেরে যেত। কথা বলত না। মাঝে মাঝে বাবাকে বড় অন্যমনস্ক দেখাত। মা-র বাঁকা ঠোঁটে সামান্য বিদ্রুপের হাসি লেগে থাকত। বাবা সারা বিকাল সন্ধ্যা চুপচাপ ব্যালকনিতে কি যে খুঁজে বেড়াত আকাশে, সে জানে না।

বাবাকে কিছু বললেই এক কথা। 'আমার আর কি আছে বল! রঙ সাইড অফ ফিফটি—বয়সটা ভাল না। সব হারিয়ে যাচ্ছে।'

'বাবা তুমি উরুগুয়ে গেছ!'

'মনে হয় গেছি। কবেকার কথা। তখন তো সব ভাল বুঝতাম না। পোর্ট মন্টিভিডিও তো মনে হয় উরুগুয়েরই বন্দর।'

'ব্রাজিলে গেছ?'

ব্রাজিলে সে গেছে। এটা তার স্পষ্ট মনে আছে। বুয়েনসএয়ার্স থেকে খালি জাহাজ নিয়ে বের হয়ে পড়েছিল। ভিকটোরিয়া পোর্টে আকরিক লৌহ বোঝাই করে সোজা ক্যারেবিয়ান সমুদ্র পার হয়ে ওয়েলসে গিয়েছিল।

'গেছি।'

'লোকগুলো দেখতে কি রকম!'

'ল্যাটিন আমেরিকার লোকজন দেখতে যেমন হয়। তামাটে রঙ, কোঁকড়ানো চুল, নাক থ্যাবড়া, ঠোঁট ভারি।'

'পেলে তো ব্ল্যাক। ওকে ব্ল্যাক পার্ল বলা হয় না!'

'পেলের মতো এত কালো কোনো মানুষ আমি কিন্তু ভিকটোরিয়া পোর্টে দেখিনি। আসলে দেশটা তো খুব বড়। আর আমাদের মতো গরিব দেশ। কত জায়গা, কত শহর—কত মানুষ। কালো মানুষ থাকবে না কেন, তবে ভিকটোরিয়া পোর্টে দেখিনি।'

'শহরটার সব জায়গায় ঘুরেছ!'

'না। তাও ঘুরিনি। খাড়া পাহাড়ের বুকে তোর জেটি। সমুদ্র থেকে বেশ ভেতরে। প্রায় মনে হয় চার-পাঁচ ঘণ্টা লেগেছিল। এতকাল পরে আমার সব ঠিকঠাক মনেও নেই।'

'নদী ধরে জাহাজ ভিতরে ঢুকেছিল? আমাজান নদী ধরে।'

'না না। সমুদ্রের খাড়ি। অনেক ভেতরে ঢুকে গেছে। দু-পাশে খাড়া পাহাড়। আর গভীর বনজঙ্গল। ওগুলো কি গাছ তাও জানি না, কি ফুল তাও বুঝিনি। সারা সকাল ডেকে চুপচাপ বসেছিলাম। ইনজিন-রুমে চারটা-আটটার ওয়াচ সেরে ওপরে উঠেছিলাম। দেখছি জাহাজ, দুটো পাহাড়ের ভিতর ঢুকে গেছে। সমুদ্র অদৃশ্য। ও কি যে মজা লাগছিল।'

এই হয়।

গত বিশ্বকাপে, সে তাতার, তমাল, বাবাকে খেলা দেখার সময় এমন অজস্র প্রশ্ন করে প্রায় অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এবারেও বাবা তেজি ঘোড়া হয়ে গেছেন— কবে খেলা শুরু হবে এই উত্তেজনায় বাবার বোধ হয় ইদানিং ভাল ঘুমও হত না।

'তাহলে অফিস যাচ্ছ না!'

'না।'

বাবা কাজে ব্যস্ত। মা-র দিকে মুখ তোলারও সময় নেই যেন। মা চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে হতেই বলল, 'আলমারির চাবিটা দিয়ে যাও।'

কি হবে চাবি দিয়ে রনিতা বুঝতে পারল না। মা আঁচল থেকে চাবির গোছাটা প্রায় ছুঁড়েই দিল। বাবার ভ্রূক্ষেপ নেই। চাবিটা রনিতা বাবাকে দিতে গেলে বলল, 'আলমারিটা খোল তো।' আলমারি খুললে, সাদা পাটভাঙা বেডসিট বের করল বাবা। বেড কভার বের করল। রঙিন বেড কভার। লতাপাতা ফুল ফল আঁকা। বাবা বললেন, বিছানার চাদরগুলো পাল্টে দে। বাবা আরও কি যেন খুঁজছে। আলমারিটা মা-র একান্ত নিজস্ব। গোদরেজের সাদা আলমারি সামনে বড় আয়না ফিট করা। মা বাবার ঘরে এই আলমারি। তারা কেউ সাধরণত হাত দিতে পারে না। অথচ আজ বাবা সহজেই তাকে আলমারি খোলার অনুমতি দিয়ে ফেলল। যেন কত গোপন রহস্য এই আলমারিতে তোলা আছে— অন্তত বাবা মা-র হাবভাবে এটা মনে হত তাদের।

রনিতা অবাক। বাবা আলমারির লকার খুলে কি যেন উঁকি দিয়ে দেখছে! বাবার মুখ বিমর্ষ হয়ে গেল। তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই, তোর মাকে ডাক তো।'

কি খুঁজছে বাবা।

তারা দেখছে, বাবার একপ্রস্ত কালো রঙের সুট আছে। বাবা কখনও পরেছে বলে তারা মনে করতে পারছে না। ভাদ্রমাসে সব বের করে রোদে দেওয়া হয়। পুরানো, কত দীর্ঘকালের পরিত্যক্ত সুট। মাপে ছোট হয়ে গেছে। একবার বাবা কেন যে সুট পরে ঘরে পায়চারি করেছিল, তারা জানে না। জোকারের মতো মনে হচ্ছিল। খাটো হয়ে গেছে সব। রঙ জ্বলে গেছে। তবু বাবা ওগুলি বাতিল করেনি। আলমারির ভেতরে সযত্নে হ্যাঙগারে তুলে রেখেছে মা।

'কি খুঁজছ?'

'না কিছু না।'

সুকোমল বলতে পারল না, চিঠিগুলো খুঁজছি।

সে গতবারও চিঠিগুলো দেখেছে, আছে। সে গোপনে চিঠিগুলো পড়েছেও। কতকাল আগেকার স্মৃতি। অথচ এবারে নেই। অমিতা যদি আরও যত্ন করে রেখে দেয়! সে সোজা সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে এল। তারপর ডাইনিং স্পেসে ঢুকে গেল। কেউ নেই। অমিতা কিচেনে একা। কলপাড়ে কাজের মেয়েটা কাচাকাচি নিয়ে ব্যস্ত। সে খুবই সংগোপনে ফিস ফিস করে বলল, চিঠিগুলো কোথায় রেখেছ!

অমিতা জানে, বাবুর ভিতরে একটা বড় ক্ষত আছে। বিয়ের পর সমুদ্রের কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলেছে। তখন তো তারা একটা ছোট্ট বাসায় থাকে। মানুষটি সৎ এবং আন্তরিক। কিছুটা খোলামেলা। কিছুই গোপন করতে শেখেনি। অভাব-অনটনের মধ্যে তারা তখন কিছুটা বিপর্যস্তও। তবু এই মানুষটির দিকে ভাল করে তাকালে, মনে হত, স্বপ্নের শেষ নেই।

অমিতা বলল, 'কার চিঠির কথা বলছ।'

'এলসার।'

'ওগুলো তো তোমার কাছে। বললে না, ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, এগুলো আর লকারে রাখা ঠিক হবে না।'

তা ঠিক। গত বিশ্বকাপে সে চিঠিগুলো চেয়ে নিয়েছিল। তার নিজস্ব একটা আলমারি আছে। ওতে কিছু ফাইল আছে। তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, পাসবই, এন এস সি, ইউনিট ট্রাস্ট ফাইলে যত্ন করে রাখা। এমনকি বাড়ির ট্যাকসের বই, টেলিফোনের বিল, বাড়ির প্ল্যান, জমির দলিল সব সে আলমারিতে নিজের মতো করে তুলে রেখেছে। ওখানে যদি থাকে! তারই ভুল। নিজস্ব আলমারি খুলেও পেল না। সব খুলে দেখেছে। সব তাক। কোথাও নেই।

সে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কোথায় রাখল!

রনিতা বলল, 'কি খুঁজছ!'

ও কিছু না। বলে বাবা তাকে এড়িয়ে গেল। দুর্ভাবনা, চিঠিগুলো ছেলে-মেয়েদের হাতে না পড়ে যায়! দুর্ভাবনা, চিঠিগুলো হাতের কাছে না থাকলে কোনো বিপর্যয় যদি ঘটে যায়! এলসার চিঠিগুলো সবই বড় বেশি জীবনে ফুল ফোটার কথা বলত। এক একটা লাইন আশ্চর্যভাবে তাকে হন্ট করত জাহাজে। দেশে ফিরেও। অল দ্য সেইন্টস মে কাম হিয়ার টু লাভ ইয়ু। এলসাই এমন সুন্দর কথা লিখতে পারে। বলতে পারে। আর কোনো নারী পারে কিনা সে জানে না।

একজন আঠারো-উনিশ বছরের নাবিকের কাছে ষোল-সতেরো বয়সের নারীর এই চিঠি কত অমূল্য সে এ-বয়সে এসে এটা যেন আরও বেশি টের পাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই মনটা দমে যাবার কথা। চিঠিগুলো সে বিয়ের পর অমিতার হাতে তুলে দিয়েছিল। অমিতার ভালবাসার অহঙ্কারকে চূর্ণ করার জন্যই যেন দেওয়া, দ্যাখো তুমিই শুধু এই মানুষটির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করনি। আরও কেউ রাজি ছিল। আমি পারিনি। আমার ঐ বয়েসটাই কাল। বাবা মা ভাই বোনের কথা মনে হলে স্থির থাকতে পারতাম না। ভালবাসা মানে থেকে যাওয়া। পৃথিবীর এক পিঠে আমার বাবা-মা। অন্য পিঠে আমি আর এলসা। দু দুটো মহাসমুদ্র পার হলে আমার দেশ। ভাবতে পারতাম না—আমার বাড়িঘর, গাছপালা, আমার প্রিয় সাইকেল—বড় সড়কে উঠে উধাও হয়ে যাওয়া, কখন নিরন্তর শস্যক্ষেত্র পার হয়ে দিগন্তের কাছাকাছি কোনো গাছের ছায়ায় বসে থাকা ছিল জীবনের আশ্চর্য অভ্যাস।

এলসার চিঠি, ওর ফটো নেই। দেখতে কেমন, আমার হিংসে হয় না! চিঠি-গুলো দিলে, ওর একটা ফটো থাকবে না!

সে তখনও খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারেনি, না নেই। ফটো নেই।

এত কাছের, আর তার কোনো ফটো নেই।

ছিল, বলতে পারত। সে আর এলসা সমুদ্রের বালুবেলায়, ল্যান্দ্রোঅ্যালেনের পার্কে, কিংবা এভিতায় ইভা পেরুনের সমাধিস্থলে তার আর এলসার ফটো—এলসার গায়ে নীল জ্যাকেট, নীলাভ চুল বব করা, কালো চোখ আর তার আপেলের মতো গায়ের রঙ ফটোতে আদৌ ধরা পড়েনি। ফটোগুলো সঙ্গেই ছিল—তার সঙ্গ, তার খোলামেলা হাসি, তার নিপুণ নিজস্ব চাঞ্চল্য ফটোগুলিতে ঠিক ধরা পড়েনি। ফটোতে বিমর্ষভাবটা এলসা কখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি কেন জানে না। পানামা ক্যানেল পার হবার সময় সে টের পেল ঘোরে পড়ে যাচ্ছে। ফটোগুলি তাকে বড় অন্যমনস্ক করে দেয়। সে কাজে মন দিতে পারে না। ডেকে হেঁটে যায়, ইনজিন-রুমে নেমে যায়, আর তার কথা কেবল কানে ভেসে আসে, ডোন্ট ফরগেট মি। ফটোগুলি এক গভীর নিশীথে কেন যে সমুদ্রে বিসর্জন দিয়েছিল জানে না। অহরহ অস্থিরতা থেকে মুক্ত হবার জন্যই সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করেছে কিনা তাও সে বুঝতে পারে না।

এলসার ফটোগুলি কোথায়। চিঠিগুলি দিলে ফটোগুলি দিচ্ছ না কেন। সে তো উর্বশী! আমি না হয় তাড়কা রাক্ষুসী। তাকে খেয়ে ফেলব না। কথা দিচ্ছি।'

'নেই।'

'নেই মানে! চিঠিগুলি আছে, ফটোগুলি নেই। তুমি যে বললে, অনেক ছবি ছিল। গেল কোথায়!

'সব ফেলে দিয়েছি!'

'অ্যাঁ! বল কি। আসল মানুষটাকে দেখতে পেলাম না। চিঠি দিয়ে আমার কি হবে।'

'চিঠিগুলি তাকে আরও বেশি বুঝতে সাহায্য করবে।'

অমিতা যৌবনে, সেই চিঠি পড়েছে।

পড়েই বলত, বড় বেশি গম্ভীর। ভালবাসার চিঠি, একটু হাল্কা না হলে জমে না।

আজ আরজেন্টিনার খেলা।

চিঠিগুলি কেন যে পড়ার ইচ্ছে হয়েছিল! এটা তার হয়। যেন দেশটা তার নিজের। তার হারজিতের সঙ্গে এলসার মান অসম্মান জড়িয়ে আছে। এলসার মান অপমানের সঙ্গে সে জড়িয়ে আছে। চিঠিগুলির ভিতর কোনো শুভ ইঙ্গিত আছে। যেন চিঠিগুলি হাতের কাছে ছিল বলেই গত বিশ্বকাপে আরজেন্টিনাকে জেতাতে পেরেছে। সে তো তখন জানতই না, দেশটা এত ফুটবল-পাগল। এমনকি মাস দুই বন্দরে কাটিয়েও, এলসার সঙ্গে, কিংবা তার মা স্যালেস দ্য কেলির সঙ্গে নানা পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েও সে জানত না, এ-দেশে ফুটবল খেলার বাজিতে বেট ধরে লোকে নিঃস্ব হয়ে যায়।

রনিতা এসে দেখল, বাবা জানালায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

সে ডাকল, 'বাবা।'

সুকোমল বলল, 'তোর হয়ে গেছে!'

'তুমি এসে দ্যাখ, ঠিক হয়েছে কিনা।'

'চল, যাচ্ছি।'

সে উপরে উঠে বলল, 'পর্দাগুলো পাল্টানো দরকার।'

রনিতা বলল, 'আগে বলবে তো! তোমার যে মাথায় কখন কি বাই ওঠে বুঝি

না! সে ঘরে সুগন্ধ স্প্রে করে দেবার সময় বলল, 'তুমি আজ কাকে সাপোর্ট করবে?'

'তোরা কাকে করবি!'

'ক্যামেরুন।'

'হারবে। হেরো পার্টিকে কেউ সমর্থন করে!'

'হারুক। তবু করব।'

ইজিচেয়ারে ধোয়া বড় একটা তোয়ালে টেনে দেবার সময় রনিতা বাবার দিকে তাকাল। বাবা এই ইজিচেয়ারটায় বসে খেলা দেখবে। পাশে টিপয় রেখে দিল। আলিগড় থেকে আনা একটা নতুন ছাইদানি। ঝকঝক করছে। পরে ঘরটা বন্ধ করার সময় বলল, 'তৃতীয় বিশ্বের টিম। আমরা না, ভারতবর্ষের সবাই দেখবে ক্যামেরুনকে সাপোর্ট করবে।'

বিকেলেই তাতার-তমাল হোস্টেল থেকে এসে গেল। বাড়িতে উৎসবের মেজাজ। কিন্তু রনিতা লক্ষ করল, বাবার মেজাজ প্রসন্ন নয়। কেমন দুশ্চিন্তায় মুখ ছেয়ে আছে।

সবাই এক পক্ষে।

তাতার তমাল রনিতা অমিতা এক পক্ষে।

তাতারও বলেছিল, 'বাবা তুমি কাকে সাপোর্ট করবে।'

'দেখি।'

'দেখি!' বলে মা কেমন কিছুটা অসহিষ্ণু গলায় বলে ফেলল, 'তোমার বাবা কাকে করবে আমি জানি।'

সুকোমল বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি তো সব জান।'

'জানিই তো।'

রনিতা দেখেছে, আজকাল বাবা মা-র মধ্যে সামান্য কারণে খিটিমিটি শুরু হয়ে যায়। বয়সটারই বোধ হয় দোষ। এ-বয়সে কি কেউ কাউকে ঠিক সহ্য করতে পারে না। টি ভি কেনা নিয়ে ক'বছর আগে কি ধস্তাধস্তি গেছে! মা-র এক কথা, 'ছেলেমেয়েরা হায়ার সেকেন্ডারি পাশ না করলে এ-বাড়িতে টি ভি ঢুকতে দিচ্ছি না।'

বাবার গোঁ, 'না কেনা হবে। পড়াশোনা যে করে ঠিকই করে। টিভি গিলে খেতে পারে না। কি না অশান্তি গেছে!' মা-র জেদই শেষ পর্যন্ত বহাল থাকল।

ছিয়াশির বিশ্বকাপ দেখার জন্য বাবা সারা মাসটাই প্রায় ছুটি নিয়ে বসে থাকল। একজন মানুষ অত্যন্ত সংবেদনশীল হলে যা হয়, বাবা সবার পছন্দমতো বাড়ির কেনাকাটা করে, পছন্দমতো বাজার করে। কে কোন মাছ খেতে পছন্দ করে না, কিংবা কেউ মুরগি পছন্দ করে, কেউ ডিম, কারু চাটনি চাই শেষ পাতে— জামাকাপড়ও বাবা নিজে না কিনে সবার হাতে টাকা ধরে দেয়, কিনে নাও, আমাদের পছন্দ, তোমাদের পছন্দ এক রকমের হবে কেন— এই মানুষটাই সেই ছিয়াশির বিশ্বকাপে কেমন গোঁড়া এবং ধর্মান্ধ হয়ে গেল। বাংলাদেশ মারফত খেলা দেখার জন্য বুস্টার কিনে ফেলল। টিভি-র ঘরটাকে মন্দির টন্দির বানিয়ে ফেলতে চাইল। কেউ জুতো পরে ঘরে ঢুকলে রে রে করে তেড়ে যেত। বাসি ফুল ফুলদানিতে রাখতে দিত না। এমনকি বাবা বিকেলেই পাট-ভাঙা পাজামা পাঞ্জাবি পরে ব্যালকনিতে পায়চারি করতে থাকত। কে আবার না বাসি কাপড়ে ঘরে ঢুকে

যায়। সারা সকাল দুপুর দরজা লক করে রাখত। খেলা দেখতে দেখতে কেউ বাথরুমে গেলে, আর রক্ষা ছিল না। তাকে ফের কাপড় জামা পাল্টে ঘরে ঢুকতে হত।

মা মাঝে মাঝে সহ্য করতে না পারলে বলত, 'তোমার বাবাকে ভীমরতিতে পেয়েছে।'

রনিতারও এমন মনে হত।

তমাল-তাতার বাবাকে তখন যমের মতো ভয় পেত। রনিতা দেখেছে সেবারে বাবার যা পছন্দ, তাদেরও তাই। আরজেন্টিনার খেলা হলে আরও কড়াকাড়ি।

আরজেন্টিনার খেলা হলে বাবা কেমন সন্ত্রাসে পড়ে যেত। সেদিন খেলা দেখার সময় বাবা সিগারেট খেত না। ইজিচেয়ারটা ছেড়ে উঠত না। চা খেত না। এমনকি কেউ জরুরী প্রয়োজনে দেখা করতে এলেও কথা বলত না। আর আরজেন্টিনার গোলের মুখে বল নিয়ে গেলেই বাবা অস্থির হয়ে উঠত। কাগজে লেখালেখি হচ্ছে খুব, বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা ফেবারিট। বাবা সে-দেশটার পক্ষ সমর্থন করতেই পারে। এবারেও বাবা যা আরম্ভ করেছে, তাতে ক্যামেরুনের পক্ষ সমর্থন করা কতটা সমীচিন হবে বুঝতে পারছে না।

অবশ্য বাবা তাদের মুখে কিছু বলে না। গতবারের মতোই হয়ত বাবা তাদের আরজেন্টিনার সমর্থক।

'কাকে সাপোর্ট করবে!'

এক কথা, 'দেখি।'

সুকোমল ব্যালকনিতে বসেছিল। বিকেল থেকেই বসে আছে চুপচাপ। খেলা আরম্ভ হতে আরও ঘণ্টাখানেক বাকি। সে চুপচাপ বসেই আছে। চিঠিগুলি পাওয়া গেল না। এলসার শেষ স্মৃতি— অথচ সে বোঝে না, এতকাল পর, এলসার কথা এত বেশি মনে পড়ছে কেন। চিঠিগুলি হাতের কাছে না রাখলে কত যে বিপদ অমিতা বুঝছে না।

কি মাস ছিল সেটা?

সেপ্টেম্বর! না আগস্ট! তারা তো জাহাজ নিয়ে কলকাতা বন্দর থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি বার হয়ে পড়েছিল। পাটের গাঁট, কিছু কাঠ, আর কিছু হেরন পাখি—আর তারা জাহাজিরা। কলম্বো বন্দরে রসদ নিয়েছিল—তারপর ইস্ট আফ্রিকার উপকূল বরাবর জাহাজ চালিয়ে নিয়েছে লরেঞ্জো মরকুইসে। কিছু মাল খালাস করে ডারবান কেপ-টাউন হয়ে সোজা দক্ষিণ আমেরিকা। রাস্তায় মন্টিভিডিও এবং স্যান্টিসে কিছু মাল খালাস করে, সোজা বুয়েনসএয়ার্স। দু আড়াই মাসের বেশি লাগার কথা না।

একটা মুখ ভেসে উঠল। সাদা দাড়ি, সাদা চুল— পরনে সাদা বয়লার সুট। সকালবেলা, বন্দরের শেষ প্রান্তে জাহাজ বাঁধাছাঁদার কাজ শেষ। সে ফোকসাল থেকে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। দুটো কম্বলে শীত যাচ্ছে না। উপরে উঠে দেখল, সামনে কিছু বড় বড় গাছ। জেটি পার হলেই গাছগুলি দেখা যায়। খুবই কাছে। গাছের নিচে কিছু মানুষের জটলা। তারা শুকনো পাতা জেবলে আগুন পোহাচ্ছে। কিনারার মানুষ—হয়তো জাহাজেই এরা উঠে আসবে, মাল খালাসের জন্য। শহরটা যেন রহস্যময় হয়ে আছে কুয়াশার ভিতর। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ডেকে দাঁড়ানো যাচ্ছে না।

আগস্ট মাসই হবে। এমন মনে হল তার। কোনো দূরবর্তী নীহারিকার মতো অস্পষ্ট মায়াবী এক খেলা শুরু হয়ে যায় এ-ভাবে। বিশবকাপের সময়ই বড় বেশি মনে পড়ে তাকে। কেন সে জানে না—। জাহাজ থেকে ফিরে কোথাও কোন নির্জনে একটা ফুল ফুটে থাকলে তার এলসার কথা মনে পড়ত। ইদানিং সংসারের চাপে তাকে প্রায় ভুলেও গিয়েছিল। চিঠিগুলি যে জয়ের প্রতীক অমিতা বোঝে না।

ইনজিন সারেঙ বুড়ো মানুষ। তিনি এত সকালে শীতের কুয়াশায় সেদিন কেন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন, সে জানে না। হয়তো এই ডাঙা মানুষের বড় প্রিয়। তারও। সেও সারারাত ডেকে জেগেছিল— কনকনে ঠান্ডায় তার হাত পা টাল হয়ে গিয়েছিল— সহ্য হয়নি। না পেরে ফোকসালে ঢুকে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

সকালে এক কাপ চা হাতে নিয়ে সে উঠে গেছে উপরে। তাকে দেখে সারেঙসাব বলেছিলেন, সুকোমল, রাস্তায় একা বের হস না। শহরের ভুলভালাইয়ায় হারিয়ে যাস না। কেউ তোর কথা বুঝবে না। ফিরে আসতে চাইলেও ফিরে আসতে পারবি না।

রোদ উঠলে শহরটা স্পষ্ট দেখা গেল। আশ্চর্য, কোনো বিধিনিষেধ নেই। জেটিতে নেমে গেলেই শহর, ঘরবাড়ি, বড় বড় রাস্তা— ছিমছাম এবং ফুলের বাগান কোথাও। আর আশ্চর্য সব নরনারীর মুখ। যেন দেবদেবীর দেশ। এটাই মনে হয়েছিল তার। গায়ের রঙ, মুখের গড়ন, নীলাভ চুলে, শীতের কুয়াশা এবং সমুদ্রের হাওয়ায় যেন শহরটার ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে।

'এরা কথা বোঝে না কেন?'

'না বোঝে না। ইংরাজি কেউ জানে না। হাতের ইশারায় মুখের রেখাতে তোমাকে সব বোঝাতে হবে।'

তার পয়লা সফর। কতদিন হয়ে গেল, শুধু নীল জল, নীল আকাশ, কখনও প্রবল ঝড় সমুদ্রে, সারাদিন পিচিং জাহাজে, মাতালের মতো টলে টলে হাঁটা। বন্দর এলে শান্তি। জাহাজে দুলুনি থাকে না। মাতালের মতো পা ফাঁক করে সিঁড়ি ধরে উঠতে হয় না। রেলিং ধরে হাঁটতে হয় না। সোজা হেঁটে যাওয়া যায়। এমন-কি জাহাজঘাটায় তেমন কোনো কোলাহলও ছিল না। সে চা খাচ্ছিল।— আর শহরটা দেখছিল। পেছনে তাকায়নি—তাকালে সেই সমুদ্র, আর নীল জলরাশি। বরং গাছপালার মধ্যে শীতের আগুন তাকে বেশি আবিষ্ট করে রেখেছিল।

কোম্পানি থেকে টাকা তোলার দরকার। যে যার মতো টাকা তুলছে। সেও একশ প্যাঁসু তুলেছিল এবং বিকেলে জাহাজি বন্ধুদের সঙ্গে বের হয়েছিল। নেভি ব্লু সার্জের প্যান্ট। আর সাদা রঙের কাট। গলায় মাফলার। মাথায় টুপি। বাটলার সোলেমান প্যান্ট কোট কিনে দিয়েছিল। সোলেমানের বরাত খুলে গেছিল। ছিল কাপ্তান-বয়। জাহাজের বাটলার ডারবানের ঘাটে অসুস্থ— তাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল—বরাত খুলে গেল সোলেমানের। আধখ্যাঁচড়া ইংরেজি বলতে পারে লিখতে পারে না। সে ছিল পড়াশোনায়ালা আদমি—তাকে এসে ধরেছিল, রসদের জমা খরচের হিসাবটা যদি সে করে দেয়। বিনিময়ে ডারবান বন্দরে গরম প্যান্ট, গরম কোট উপহার। না হলে ঠান্ডায় সে জাহাজ থেকে বেরও হতে পারত না।

সে ছিল সামান্য একজন কোল-বয় জাহাজের। জাহাজি পোশাক ছাড়া গরম

জামা প্যান্ট বলতে কিছু ছিল না। বাড়ির জন্য মন খারাপ। বাবা মা ভাই বোনেরা অপেক্ষায় আছে দাদা টাকা পাঠাবে। শীতের পোশাক কেনারও তার ক্ষমতা ছিল না। বের হলে কোম্পানির দেওয়া নীল কম্বলের প্যান্ট আর নীল সোয়েটার— ঢলঢলে— জোকার ছাড়া এমন পোশাক পরে কেউ বের হতে পারে না।

কত কথা মনে পড়ছে।

ভাগ্যিস সোলেমান তাকে গরম প্যান্ট কোট দিয়েছিল। সেকেন্ট-হ্যান্ড মার্কেট থেকে সে একটা ফেল্ট ক্যাপও কিনে ফেলেছিল। ডারবানের ঠান্ডায় সে কষ্ট পাচ্ছে দেখেই সোলেমান যেন সুযোগ পেয়ে গেল।

সুকোমল, এই নও। এটা তোমার। বাটলার সোলেমানের কাছে তার সেই থেকে কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। সামান্য প্যান্ট কোট দিয়ে সারা সফর তাকে প্রায় কিনে রেখেছিল। বয়স কম, মানুষের সামান্য অনুগ্রহ তাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিত। সে খুব খুশি। হাসি মুখে বাটলারের জমাখরচের খাতা লিখে গেছে।

কোট প্যান্টের যত্ন নিত খুব। কিনারা থেকে ফিরে লকারে ঝুলিয়ে রাখত। কোনো ভাঁজটাজ না পড়ে, ময়লা না লেগে যায়। এমনকি জাহাজঘাটায় নেমে ধুলোবালির উপর দিয়ে হাঁটত না। পার্কের কোনো বেঞ্চিতে বসত না। ডারবানে ট্রলিবাসের সিটে বসার সময় রুমাল দিয়ে জায়গাটা সাফ করে নিত।

প্রথম দু'দিন বুয়েনস-এয়ার্সের ঘাটে সে একা বের হয়নি। জেটি থেকে বড় রাস্তা চলে গেছে। কিছুটা হেঁটে গেলেই কার্নিভেল। নানা কিসিমের মজা। সুন্দরী মেয়েরা জুয়ার পসরার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লাল নীল বল এগিয়ে দিচ্ছে। মৈত্রদা, সে, সুজয়দা একসঙ্গে ঐ কার্নিভেল পর্যন্ত। সাদা রঙের স্কার্ট পরনে। লাল রঙের জ্যাকেট—আর দেখতে সব যেন অপ্সরা— ভুল করে কার্নিভেলে ঢুকে গেছে। কার্নিভেল ছেড়ে তার আসতে ইচ্ছে হত না। দোকানের সামনে গেলেই রহস্যময়ী হয়ে উঠত নারীরা। এক প্যাঁসু দু প্যাঁসু করে দান লাগাত। আর হারত। মৈত্রদা ক্ষেপে গেলে বলত, বেটা মরবি। তোকে ফতুর করে ছাড়বে।

ঠিক ফতুর করেই ছাড়ল। তিন দিনের মাথায় সব শেষ।

কি করে! কোম্পানির কাছে টাকা চাইলেই মিলবে কেন। যার যেমন রোজগার, তার তেমন বরাদ্দ। হাতে একটা প্যাঁসু নেই— সোলেমানকে বলতে পারত। কিন্তু সোলেমান সব জেনে গেছে। সে সোজাসুজি বলল, গোটা জাহাজ বিক্রি করে দিলেও এদের তুমি জব্দ করতে পারবে না। কে মরতে তোমাকে কার্নিভেলে নিয়ে গেল!

জাহাজ থেকে সবাই নেমে যাচ্ছে। বিকেল হলেই কাজ কাম শেষ। ছুটি। কোথায় যাচ্ছ, থাকছ, কেউ দেখবার নেই। সকালে জাহাজে হাজির হলেই হল। তার হাতে পয়সা নেই। সে আর কি করে— একা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো। সারেঙসাবের হুঁশিয়ারিও মাথায় আছে। রাস্তাটা কত দূর গেছে দেখা যাক। সোজা যাবে। সোজা ফিরে আসবে। সে দেখত, দুপাশের বাড়িগুলো এক রকমের। দোতলা বাড়ি তো সবই দোতলা। সামনে ফুলের বাগান, কোথাও একটা ঝাউ কিংবা দেবদারু গাছ, কোথাও গোলমোহরের গাছ। আকাশমণি গাছও আছে। সব গাছগুলি চিনে রাখার সে চেষ্টা করত। এই করে সে আর কত দূর যেতে পারে। একজন বিদেশী নাবিক, সে। দেখলে বোধ হয় টের পেত। অথচ কোথাও দোকানপাট নেই, সাইনবোর্ড নেই—রাস্তার কি নাম, কাকে জিজ্ঞেস করবে।

কিনারার লোকদের সঙ্গে কথা বলা বৃথা। সে কি জানতে চায় ওরা বুঝতেই পারত না। কেবল হেসে গড়িয়ে পড়ে। মেয়েরাও। পার্কে সব যেন দেবশিশুরা নেমে এসেছে— কিশোরীরা কোথাও টেনিস খেলছে। সে মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখত। বল বাইরে এলে কুড়িয়ে দিত। তারা বাউ করত তাকে। সেও বাউ করত। দেখে দেখে শিখে ফেলা। মানুষজনের ভিড় কম। ভিড় নেই বললেই হয়। মেয়েরা তাকে ইস্তে ওস্তে বলে কি বোঝাতো সে বুঝত না— তবু সাদা স্কার্ট পরা, অনাবৃত জানুদেশ নারীদের, তার সেই জানুদেশের প্রলোভনও ছিল গভীর।

সে বলত, তোমার নাম কি!

তারা হাসত।

রাস্তার নাম কি!

তারা হাসত। সে বোকা বনে যেত। সমুদ্রের হাওয়ায় সেও ক্রমে এক সুপুরুষ। গালে নরম উলের মতো দাড়ি। তাকে দেখে মেয়েরা চারপাশে জড়ো হত। লাফা-লাফি করত। সেও লাফাত তাদের সঙ্গে।

তার হাতে পয়সা নেই। সে কার্নিভেলে যেতে পারে না। তার হাতে পয়সা নেই, কিছু কেনা কাটাও করতে পারে না। হেঁটে হেঁটে শহর ঘুরেও দেখতে ভয় পায়। কেবল মনে হয় ফিরে এসে দেখবে জাহাজটা নেই। তাকে ফেলে চলে গেছে। ভীতু স্বভাবের মানুষ। গায়ে বড় হয়েছে। গাঁয়ের স্কুলে পড়াশোনা— কলেজে পড়া হয়নি। সেই মানুষের পক্ষে কোনো ঝুঁকি নেওয়া কঠিন। পার্কেই বসে থাকত। বসে থাকতে থাকতে ভিড় জমে যেত। সবার কৌতূহল তাকে নিয়ে। তারাও কথা বলে, সেও কথা বলে। কেউ কারো কথা এক বর্ণ বোঝে না। তবু অনর্গল কথা। তাকে নিয়ে সবাই মজা করছে, সে বুঝত না। ওরা লাফালে সেও লাফাত। ওরা ডিগবাজি খেলে সেও ডিগবাজি খেত। হাতে র‍্যাকেট দিলে সে বল নেটে মারত। একদিকে বল, একদিকে র‍্যাকেট। দুটোই ছিটকে যেত হাত থেকে। সাদা স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ-পরা বালিকারা খিলখিল করে হাসত। সেও তদের সঙ্গে খিলখিল করে হাসত। দুঃখটা তারপর বাড়ত। শহরের আলো জ্বলে উঠলে ওরা ঘরে ফিরে যেত। সে বেঞ্চিতে বসে থাকত একা। মা বাবা ভাই বোনের কথা মনে হলে সে চোখের জলে ভেসে যেত। কবে দেশে ফিরতে পারবে জানে না। রুজি রোজগারের আশায়, হাতের কাছে যে কাজ পেত ধরে ফেলত। ধরতে গিয়ে শেষে এই জাহাজ, জাহাজের নাবিক।

সে জানে সোজা রাস্তায় ফিরে গেলে তার জাহাজ। ভুলেও অন্য রাস্তায় ঢুকত না। জাহাজে ফিরতে ইচ্ছে হত না। বেঞ্চিতে শুয়ে থাকত। যেন চলে গেলেই বালিকারা এসে দেখবে পার্কটা ফাঁকা। সেই মজার মানুষটা কোথায় গেল যদি খুঁজতে শুরু করে! খুঁজে যদি না পায়! রাত বাড়ত। শহরের রাস্তা ফাঁকা হয়ে যেত। তারপর কি ভেবে একা একা জাহাজে ফিরে আসত। তার ভাল লাগত না কিছু।

এ-ভাবে সে জাহাজ থেকে নামলেই বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত। তার সব আবছা মনে পড়ে। এক বিকেলে পার্কটায় গিয়ে দেখল, কেউ নেই। সে কেমন ঘাবড়ে গেল। ঠিক এসেছে তো। ভুল করে অন্য কোনো পার্কে যদি চলে আসে। দেখল, সত্যি ভুল করে ফেলেছে। গাছগুলো ফুলগুলো এক, কিন্তু বেঞ্চিগুলো

সাদা রঙের। আশ্চর্য শহর। সব বাড়িঘর এক রকমের—রাস্তা এক রকমের। মানুষগুলো এক রকমের। এমনকি সে একটা মেয়ের সঙ্গে মজা করেছে, পরে সেই মেয়েটিকে ভেবে মজা করতে গিয়ে বুঝেছে, সে ভুল করেছে। এ অন্য মেয়ে। মেয়েটি তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলে সে এক লাফে ছুটে পালিয়েছে। জাহাজে উঠে এসেছে হাঁপাতে হাঁপাতে।

সে কিছু বুঝতে পারছে না। কোথায় এল বুঝতে পারছে না। পার্কটার দু আড়াইশ গজের মধ্যে কার্নিভেল। বেঞ্চিগুলোর রঙ কেউ যদি পাল্টে দিয়ে যায়। দিলে আঙুলে ঘসলে রঙ উঠে আসবে। কাঁচা রঙ আঙুলে লেগে থাকবে। আঙুলে ঘসে দেখল—রঙ উঠছে না। সে বেশ ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে এতটা অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি। বিদেশ জায়গা কিছুই চেনে না। কেউ তার কথা বোঝে না। আর কিছুটা হেঁটে দেখা যাক। সে যে-রাস্তায় হেঁটে এসেছে, সে-রাস্তায় ফিরে যেতে থাকল। এ কি! রাস্তা শেষ হচ্ছে না। রাত হয়ে গেছে। কাউকে কিছু বলাও যাচ্ছে না। কি মনে করবে! তারস্বরে চেঁচামেচি শুরু করলে আর এক বিপদ। সে বুঝল জায়গাটা ভাল না। বিশাল একটা এলাকায় ঢুকে গেছে। বড় বড় শো-কেস। রকমারি পোশাক, ফলের দোকান, ফুলের দোকান— সব শো-কেসে সাজানো। বিশাল একটা হোর্ডিং মাথার উপর, এক নারী সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি কে সে বুঝতে পারছে না। ভয়ে তার হাত পা অবশ হয়ে আসছিল। রাস্তায় মানুষ জনবিরল হয়ে আসছে। পাঁচমাথার মোড়। না আরও বেশি তার এখন আর মনে পড়ছে না। সে হাঁটছিল। সে পাগলের মতো জাহাজে ফেরার রাস্তাটা খুঁজছিল। পাচ্ছে না। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সে বুঝল, সারা রাত খুঁজেও সেই পার্ক আর সেই রাস্তা খুঁজে পাবে না। সত্যি সে শহরের ভুলভালাইয়ায় হারিয়ে গেছে। টলছিল। আর কিছু দূর হাঁটলে সে পড়ে যেতে পারে। অগত্যা সকাল হলে দেখা যাবে। মাঝে মাঝে পুলিশের গাড়ি হর্ন বাজিয়ে চলে যাচ্ছে। ভয়ে সে দেয়াল অথবা রাস্তার গলিঘুঁজি যেখানে পারছে নিজেকে আড়াল করে ফেলছে। সত্যি আর সে শেষে পারছিল না। বুঝল দু-পা বাড়ালেই মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। হাত পা অবশ। কোনোরকমে একটা পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। সে হাঁপাচ্ছে। মাথার টুপিটা টেনে দিল।

আর তখনই মনে হল একটা গাড়ি ঢুকছে। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে কেউ তাকে দেখল। বাড়ির পাঁচিলে ঠেস দিয়ে কে দাঁড়িয়ে! সামনে এসে ঝুঁকে তাকে দেখছে। তার মাথায় কালো টুপি। মুখ কালো ঝালরে কিছুটা আবৃত। তাকে দেখে ভদ্রমহিলা কি বুঝল সে জানে না। তবে বুঝল, সে যে এ-শহরের মানুষ না ঠিক ধরে ফেলেছে। না হলে ইংরাজিতে বলত না, সে ইয়াংকি কিনা? সে বিদেশী কিনা?

তিনি ঠিক তার মায়ের বয়সী। তার চোখে জল এসে গেল। সে বলল, ইয়েস মি সেলর মাদার। আমি রাস্তা হারিয়েছি।

তারপর তাকে দেখতে দেখতে বোধ হয় তিনি কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। বুঝি ভেবেছিলেন ভারি নিরুপায় সে। এমন বাচ্চা বয়সের নাবিক। গালে যীশুর মতো দাড়ি। চোখে মুখে হতাশা।

তার আর ভয় নেই। তিনি তার কথা বোঝেন। ঠিক সে জাহাজে ফিরে যেতে

পারবে। তিনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন কোন রাস্তায় গেলে জাহাজঘাটায় যাওয়া যায়।

কিন্তু আশ্চর্য, তিনি কিছু না বলে, গাড়িতে গিয়ে বসে পড়লেন। সে দৌড়ে গিয়েছিল তাঁর নাগাল পেতে— কিছু বলার আগেই মহিলাটি গাড়ির দরজা খুলে দিলেন। বসতে বললেন। তারপর বললেন, জাহাজঘাটার পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাব। তুমি জাহাজ চিনে নেমে যাবে।

ইস তখন তার কি তোলপাড় ভিতরে। সে তার জাহাজ ঠিক চিনতে পারবে। তার জাহাজের চিমনি হলুদ রঙের। উপরে কালো বর্ডার। কোন কোম্পানির জাহাজ, সে ফানেল দেখে টের পাবে।

গাড়িতে বসলে, তিনি তাকে বেশ বকাঝকা শুরু করে দিলেন। তোমার দেখছি খোকা কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। এ-বয়সে তোমার মা-বাবাই বা কেমন! ছেড়ে দিয়েছে। কোথাকার লোক তুমি?

ইণ্ডিয়ান।

গ্যাণ্ডি ম্যান? মাই গড। তুমি ইয়াঙ্কি নও।

ইয়াঙ্কি আবার কারা।

সে ঠিক বুঝতে না পেরে চুপ করে ছিল। সে তো ভারতীয়। ভারতীয়রা গান্ধীর দেশের মানুষ তো হবেই।

সে খুব সরল কথাবার্তা শুরু করে দিল। তার মা বাবা আছে বলল। ভাই বোন আছে বলল। গাঁয়ের নাম, নদীর নাম, কিছু বাদ রাখল না। সে কোনোদিন গাড়ি চড়েনি বলল। গাড়ি চড়ে কোথাও যায়নি বলল। এও বেশ মজা। হুস করে সে হাজির তাও সে বলে দিল। নামার সময় বলল, শহরটা ভারি সুন্দর। কী যে ভাল লাগে ঘুরতে। ঘুরব কি, ভয়, যদি হারিয়ে যাই। ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, জাহাজে একদম ভাল লাগে না।

পরদিন বিকেলে সে ইনজিন রুম থেকে উঠে আসছিল। স্মোক বক্স সাফ করতে গিয়ে কালো ভূত হয়ে গেছে। টোকা দিলে জামা প্যান্ট থেকে ভুসো কালি পর্যন্ত উড়াউড়ি শুরু হয়ে যায়। কোথাও বসতে পারে না, দেয়াল বাঁচিয়ে হাঁটতে হয়। লেগে গেলেই কালো ছোপ পড়ে যায়। সোজা বাথরুমে ঢুকে স্নান-টান না করা পর্যন্ত কেউ কাছে ঘেঁষে না। কালো ভূত, মুখ মাথা সব ভুসো কালিতে মাখা। কাশলে কফের সঙ্গে ভুসো কালি উঠে আসে। হাঁচি পেলে দলা দলা কালো সর্দি। কয়লার জাহাজ, ঘাটে জাহাজ লাগলেই, বয়লারের ছাই তুলতে হয়, স্মোক বক্স পরিষ্কার করতে হয়, কয়লার বাংকার লেভেল করতে হয়। ভুসো কালির অন্ধকার ছাড়া চোখে সে কিছু দেখতে পায় না—আর তখনই কিনা মৈত্রদা ইনজিন রুমের সিঁড়িতে খবর দিল, শিগগির যা। ডেকে পরী দাঁড়িয়ে আছে। খুঁজছে তোকে।

আমাকে! সে বুকে হাত রেখে বলল।

আজ্ঞে আপনাকে। কাল রাতে কি কাণ্ড বাধিয়ে ফিরেছ কে জানে।

সত্যি দাদা, আমি কিছু করিনি। কেউ আমাকে তাড়া করেনি। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল। কী সুন্দর ইংরাজি বলে।

ধুস, এত কথা তোর কে শুনতে চাইছে। শিগগির যা। দেখবি মাস্তুলের নিচে পরী হাজির। কেবল সাকামাল, সাকামাল করছে।

কখনও অন্ধকার রাতে একা দাঁড়িয়ে থাকতাম ফরোয়ার্ড পিকে, ঝোড়ো হাওয়ায় চুল উড়ত, বৃষ্টিপাতে শরীর ভিজত, আমি কিছুই ভ্রূক্ষেপ করতাম না। দামাল হয়ে উঠছি। বন্দর ধরলে, সেজেগুজে বের হয়ে গেছি, যুবতীরা অপলক দেখত। কোনো কার্নিভেলে ঢুকে রিঙের পাশে দাঁড়িয়ে জুয়া খেলায় অংশ নিতাম। হাতে পয়সা কম। তবু সময় কাটাবার একটা সুযোগ এমন বাতিকগ্রস্ত করে দিয়েছিল যে রিঙের সুন্দরী যুবতীকে ছেড়ে জাহাজে ফিরে আসতে ইচ্ছে করত না। বন্দর ধরলে হাতে গোনাগুনতি টাকা—যে দেশের যেমন। বুয়েন্স-এয়ার্সে পুরো তিন হপ্তা জাহাজ জেটিতে—সাঁজ লাগলেই বের হয়ে পড়ার নেশা। ডাঙা মানুষের কাছে এত প্রিয়, জাহাজে না উঠলে বোঝা যায় না। সব পেসু শেষ। তবু যেতাম কার্নিভেলে। অজস্র সুন্দরীদের ভিড়, নীলাভ চুল, আপেলের মতো পুষ্ট শরীর নিয়ে জুয়ার রিঙে কেউ দাঁড়িয়ে—খেলতাম না আর। পয়সা নেই হাতে। শেষ সব। তবু দাঁড়িয়ে সেই যুবতীকে লাল নীল বল এগিয়ে দিয়েছি। খদ্দের সামলেছি যুবতীর হয়ে। অপরিচিত এক ভিনদেশী যুবার এই আগ্রহ কেন, সে টের পেত। মাঝে মাঝে মিষ্টি করে হাসত। ব্যাস, ওতেই অনেক। কখনও তার সঙ্গে হেঁটে গেছি, হাত তুলে টা টা করত—কেমন তখন এক অপার্থিব টান বোধ করেছি তার জন্য। কিছু ভাল লাগত না। জাহাজে ফিরতে ইচ্ছে হত না। জেটির সামনে পার্ক। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। জাহাজে না উঠে পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। ডাঙায় শুয়ে আছি এইটুকু সান্ত্বনা খুঁজে পাবার জন্য শুধু গাছের হাওয়ায় কিংবা ঘাসের উপর নীরবে রাত কাটিয়ে দিয়েছি কতবার।

সুতরাং জাহাজটা সম্পর্কে যত গুজব ছড়ায় তত আমি মনকে শক্ত করি। যত শুনি, এই যে কোল্ড স্টোরেজ দেখছিস, ইমাদুল্লা গোস্তের মধ্যে মরে পড়েছিল। কোন ইমাদুল্লা, কোথাকার সে, দেখতে কেমন জানি না। বড় বড় সব ষাঁড়, গরু, ভেড়া, শুয়োর, ছাল ছাড়ানো, বরফ ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তিন চার মাসের গোস্ত। প্রায় শয়ের কাছাকাছি আমাদের নাবিকের সংখ্যা—ডেক জাহাজির সংখ্যাই ত্রিশের উপর। যেখানে হাত দেওয়া যায় খসে পড়ে, রঙ চটে যায়। দিনরাত চিপিং চলছে বালকেডে, জাহাজ সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে, ফলণ্ডা বেঁধে এরই মধ্যে জাহাজের রঙের কাজ। মাস্তুলে উঠে রঙ করছে। ডেরিক রঙ করছে। কেবিন রঙ করছে। হোস পাইপে ডেক ধোওয়া হচ্ছে রোজ—যেন নিরন্তর জাহাজটা সবাইকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে চায়। যে যার মত কাজ করে যাচ্ছে। দিনে রাতে সবার দুটো ওয়াচ, এনজিন জাহাজিদের ভাগ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে ওয়াচে। চিফ অফিসার, সেকেন্ড অফিসার, থার্ড অফিসার ডেকে কিংবা ব্রিজে অথবা চার্টরুমে, জাহাজ ঠিকমতো চলছে কি না—কোন সমুদ্রে জাহাজ, বন্দর কত দূর, ট্রান্সমিশন। রুমে রেডিও অফিসার, কানে হেড ফোন লাগিয়ে ঝুঁকে আছেন—কেউ যেন গোপনে তার সঙ্গে কথা বলছে। ওয়াচ নেই শুধু মেসরুম গ্যালির ভান্ডারীদের, অফিসার্স গ্যালির চিফ কুক, সেকেন্ড কুকের, বাটলারের। তাদের কেউ রাতে জাগিয়ে দিয়ে বলে না, টান্টু। ডেক জাহাজির মাত্র একজন ফরোয়ার্ড পিকে অন্ধকার রাতে দাঁড়িয়ে থাকে। রাতের অন্ধকারে কোনো বিপদ সংকেতের জন্য সে জেগে থাকে। যদি কোনো চোরা পাহাড় জেগে থাকে সমুদ্রে, কিংবা কোনো জাহাজ সমুদ্রে মুখোমুখি পড়ে যায়, কত রকমের উপদ্রব আছে, এই বিশাল সমুদ্রে, তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অথবা কোনো দূরবর্তী বাতিঘরের সংকেত সে

যদি পায়, জাহাজে ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। বাতিঘরে অনেক দূরে এক সরু জল রেখার মতো, আকাশ আর সমুদ্রের মাঝে উঁকি দিয়ে থাকলে টের পাওয়া যায়—জাহাজ ঠিকই যাচ্ছে, জাহাজের রুটে কোনো গণ্ডগোল নেই।

অবশ্য এ-সব আমার ধারণা। একজন কোলবয়ের পক্ষে এর চেয়ে বেশি কিছু জানাও সম্ভব নয়। যারা আমার সহকর্মী, তারা প্রায় সবাই সন্দীপ, নোয়াখালির লোক। গাঁয়ের মানুষ। বাপ দাদার আমল থেকে এই পেশা তারা জীবনে বেছে নিয়েছে। তারা জানেও না, কেন এই ফরোয়ার্ড-পিকে ওয়াচ, নিরক্ষর এই সব মানুষ শুধু নীরবে আদেশ পালন করতে অভ্যস্ত।

জাহাজটার গত সফরে শুনেছি ফরোয়ার্ড পিকে কে একজন ওয়াচ দিতে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিল—তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ক্রমে গুজব ডালপালা মেলে দিলে যা হয়—কেবল বাড়ে। কেন জানি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, কাপ্তান থেকে জাহাজের কোলবয় সবাই জাহাজটার নাটবল্টু। সিওল ব্যাংক তার মর্জি মতোই চলে। যাকে খুশি রাখে, যাকে অপছন্দ তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। চার্ট ভুল করে একবার কাপ্তানের মাথায় হাত, কোথায় জাহাজ যাচ্ছে! টের পাচ্ছে না। কেমন সব ভুতুড়ে কাণ্ড! চার্টরুমের টেবিলে কাপ্তান চিফ-অফিসার সেকেণ্ড অফিসার যতবার চার্ট করতে যাচ্ছে, কে যেন তাদের মাথা বিগড়ে দিচ্ছে। একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন— কাপ্তান সারাদিন সাবারাত জেগে বসেছিলেন, মাথা সবার পাক খাচ্ছে, জাহাজ ঠিক রুটে যাচ্ছে না, এমন ধন্দ লেগে গেলে অবাক তারা। না, জাহাজ তার গতিপথ নিজেই ঠিক করে নিয়েছে—বিশাল এক হিমশৈল ধাওয়া করছিল, তার হাত থেকে জাহাজটা বেঁচে গিয়েছিল, নিজেরই গুণে। আমি সারেঙকে বলেছিলাম, ধুস বাজে কথা। ও হয় না কি।

সারেঙ শুধু বলেছিল, হয়। বলে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গিয়েছিল।

জাহাজের ফল্কাগুলি সালফারে বোঝাই। পোর্ট অফ সালফার ছেড়ে জাহাজ মিসিসিপির খাড়ি ধরে আবার সমুদ্রে। পাঁচ-সাতদিন বাদে, পানামা ক্যানেল অতিক্রম করে জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছে। এক টানা জাহাজ চলবে মাসখানেক। ডাঙায় নামতে পারলে, মন মেজাজ হাল্কা হয়ে যায়। কিন্তু সেই যে কার্ডিফ ছেড়ে বের হয়েছি, আর ডাঙায় নামতে পারিনি। পোর্ট অফ সালফারেও নিষেধ ছিল নামার। কেন যে এটা হয় জানি না। সারেঙসাব শুধু বলেছিলেন, বাড়িওয়ালার (কাপ্তান) বারণ আছে। অবসর সময়ে শুধু বোট-ডেকে চুপচাপ বসে থেকেছি। কখনও একা, কখনও মনু সত্যেন পাশে এসে বসত। মানুষের ঘরবাড়ি, গাছপালা, শস্যক্ষেত্র জীবনে কত আগ্রহ তৈরি করে, আমাদের হতাশা দেখলে তা টের পাওয়া যেত।

সেই একঘেয়ে কাজ, ওয়াচ শেষ করে স্নান আহার, বাংকে শুয়ে থাকা, অথবা বোট-ডেকে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকা। দূরে কোনো দ্বীপ চোখে ভেসে উঠলে পাগলের মতো ছোটাছুটি। ডাঙা ডাঙা বলে চিৎকার। মেঘের ছায়া মনে হত, পরে সেই দ্বীপে নারকেল গাছ কিংবা মানুষের আবাস টের পেলে, বাবার কথা মনে হত, মার কথা ভাবতাম। ভাইবোনদের ছবি ভেসে উঠলে চোখ ঝাপসা হয়ে যেত। ডাঙা অদৃশ্য হয়ে গেলে ফোকসালে ছুটে আসতাম, একই চিঠি বারবার পড়তাম। শিয়রে বালিশের নিচে চিঠিগুলি ছিল প্রাণের চেয়ে প্রবল এক অমোঘ নাড়ির টান। রাত জেগে চিঠি লিখতাম, মা আমাদের জাহাজ মাটি টানার কাজ নিয়েছে।

আমরা দক্ষিণ সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছি। মা আমার জানে না, তার পুত্রটি কি কাজ করে—কোথায় সেই দক্ষিণ সমুদ্র। আমার মা হয়তো চিঠি পড়ে শুধু একটা কথাই ভাবে, কবে দেশে ফিরবি বাবা। যেন আমি ক্রমে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। সমুদ্রে ভেসে গেলে কেউ কখনও ফিরে আসতে পারে, মা আমার হয়তো বিশ্বাস করে না। কেবল একটা কথাই চিঠিতে বার বার উল্লেখ করতেন, শীতে কষ্ট পাস না বাবা। গরম জামাকাপড় কিনে নিস। এই উষ্ণতা টের পেলে বাড়ির জন্য মন খারাপ হয়ে যেত।

বাড়ি থেকে চিঠি পেলেই ভাল করে খেতে পারতাম না, ঘুমোতে পারতাম না। অবসাদে কেমন ভেঙে পড়তাম। মাস্তুলের নিচে কত রাতে একা হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থেকেছি। সারেংসাব কেমন ভয় পেয়ে গেলেন টের পেয়ে। এবারে কি তবে আমার পালা!

এই, কি রে, আবার বসে আছিস! ঘুমালি না? কখনও বলতেন, কি রে খাচ্ছিস না কেন? কি হয়েছে তোর! কেমন তিনি ঘাবড়ে যেতেন আমার চোখ মুখ দেখে। চুপচাপ উঠে পড়তাম, ডেক ধরে হেঁটে গেছি। কোথায় যে কার মধ্যে স্নেহ প্রবল হয়ে ওঠে বোঝা যায় না। আমাকে নিয়ে সারেঙসাব যেন অস্ব-স্তিতে পড়ে গেলেন। বোঝাবার চেষ্টা করতেন, প্রবোধ দিতেন। বলতেন, জাহাজে এলি কেন মরতে! কি করে বোঝাই ছিন্নমূল জীবনে চার-পাঁচ বছরে আমরা কত নিরুপায়। তিনি আমার মধ্যে বেঁচে থাকার আগ্রহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেন। যে-সব আগ্রহ আমি নিজে তৈরি করে নিয়েছিলাম, তাও একঘেয়ে হয়ে গেছে। তিনি একদিন বললেন, আয় মজা দেখবি।

আমাকে নিয়ে তিনি ডেকের উপরে এসে বললেন, চেয়ে দেখ!

দেখলাম, দুটো অতিকায় অ্যালবাট্রস পাখি জাহাজটার পিছনে উড়ে আসছে। প্রপেলার জল ভেঙে প্রবল ঘূর্ণি সৃষ্টি করছে। ঠিক জাহাজের পেছনে অনেক দূরে সেই জলের ঘূর্ণিতে পাখি দুটো বসছে, আবার উড়ে আসছে। একদিন দেখলাম, তারা আমার মাথার উপরে মাস্তুলে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। বিশাল ডানা মেলে তারা যেন রোদ পোহাচ্ছে। জাহাজ বন্দর ছাড়লে এরা অনুসরণ করে থাকে। হাজার হাজার মাইল জাহাজের পেছনে খাবারের লোভে উড়ে আসারই কথা। জাহাজের উচ্ছিষ্ট খাবার জলে ফেলে দিলে, তারা ডুবে ডুবে খায়—কিংবা বন্দরে তারা জাহাজের উপর চক্রাকারে পাক খায়। কবুতরের মতো, আকারে বড়, কিন্তু এমন বিশাল ডানাওয়ালা অ্যালবাট্রস সেই প্রথম দেখলাম। কিছু মাংসের টুকরো এনে অবসর সময়ে আমরা এদের খাওয়াতাম। ছুঁড়ে দিলে, ওরা সাঁ করে নেমে আসত। ঠোঁটে নিয়ে উড়ে পালাত—তারপর সমুদ্রের অসীমে হারিয়ে যেত। কখনও দূরে দেখেছি ঢেউয়ের উপর ভেসে যাচ্ছে তারা। প্রবল ঝড়ের মুখে দুশ্চিন্তায় পড়ে যেতাম। কোথায় গেল পাখি দুটো! জাহাজ টালমটাল, আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। প্রবল বাতাসে সমুদ্র ফুঁসছে। ঝড় উঠে গেছে। ডেকে হিবিং লাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ক্রমে ঝড়ের গতি বাড়ছে। ঢেউ ডেকের উপর দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে। দু-পাঁচটা উড়ুক্কু মাছ পাওয়া গেল। এই একটা লোভ আছে জাহাজি-দের। উড়ুক্কু মাছেরা প্রবল বেগে ধেয়ে আসে ঠিক পারশে মাছের মতো, খেতে ভারি সুস্বাদু। ওরা ঝড়ের মুখে ডেকে এসে লাফিয়ে পড়লে জাহাজিরা ছুটে যায়। সবাই ওয়াচের ফাঁকে ফাঁকে খুঁজে বেড়ায় কোথাও যদি পড়ে থাকে। কেউ পায়,

কেউ পায় না।

ঝড় আরও প্রবল হতে থাকল। কাপ্তানের মুখ গম্ভীর। সারেঙসাব ছুটে এসে হাঁকছেন, ডেকে কেউ আর উঠবে না। টানেল-পথ খুলে দিতে চলেছেন, কাপ্তান। জাহাজে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড ওঠানামা শুরু হয়ে গেছে। প্রপেলার ভেসে উঠছে হাওয়ায়। যেন জাহাজটা নিঃশ্বাস নিতে পারছে না আর। জাহাজি-দের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। এনজিন রুমে ফায়ারম্যান, টিণ্ডাল, সেকেণ্ড ইনজিনিয়ার ছোটাছুটি করছেন, স্টিম, স্টিম মাংতা—হাঁকছেন। ব্রিজ থেকে সংকেত আসছে, অ্যাস্টার্ন, অ্যাহেড। আমি একবার সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠার চেষ্টা করলাম। সারাদিন পাখি দুটোকে দেখিনি, ঝড়ে পড়ে গেলে কি যে হবে! ক'দিনে কেমন ওদের জন্য ভিতরে মায়া গড়ে উঠেছে। একে ওকে বলেছি, কেউ দেখেছে কিনা, যদি মাস্তুলে এসে বসে থাকে—এই ভেবে সিঁড়ি ধরে উপরে চুপি চুপি উঠে দেখলাম না নেই! আর তখনই দেখলাম, বিশাল এক নিকষ কালো পাহাড় যেন এগিয়ে আসছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি—কেমন কুহকে পড়ে গেছি সমুদ্রের। নড়তে পারছি না, হিবিং লাইন শক্ত করে ধরে আছি। ঝড়ে যে কোনো মুহূর্তে উড়িয়ে নিতে পারে। ডেকে উঠে এসেছিলাম পাখি দুটোর খোঁজে। এখন দেখছি, চারপাশে হুল্লোড় চলছে ঢেউয়ের। এবং সেই কালো পাহাড় সারা দিগন্ত জুড়ে ধেয়ে আসছে। সমুদ্রে বজ্রপাত—আলোর ছড় ছড়ি—আবার নিকষ কালো অন্ধকার। ঢেউ এগিয়ে আসছে, কেমন মোহে পড়ে গেছি সেই অপার্থিব দৃশ্যের কাছে। কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছি আমি—সমুদ্রের এই তাণ্ডবের মধ্যে কে এ-ভাবে দিগন্ত ঢেকে দিয়ে আকাশের দিকে উঠে যেতে পারে! আমার দৃষ্টিভ্রম ভেবে নিজেকে কঠিন নিয়তির সামনে ছুঁড়ে দিচ্ছিলাম টের পাইনি। অবাক, বিস্ময়ে থ। মুহূর্ত মাত্র, ছেঁড়া তারের মতো আকাশে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে গেল। দেখলাম জীবনের এক অপূর্ব অদৃশ্য ছবি। অ্যালবাট্রস দুটো পাহাড় সদৃশ ঢেউয়ের মাথায় ভেসে আছে। আর তখনই গভীর নীল জলরাশির মধ্যে জাহাজ ঢুকে গেল। আমি হিবিং লাইন ধরেছিলাম মনে আছে। পরে কি হয়েছিল জানি না। যখন জ্ঞান ফিরল, দেখছি বাংকে শুয়ে আছি। কাপ্তান সেকেণ্ড অফিসার সারেঙ সবাই ঘিরে আছেন আমাকে।

পরে ভেবে দেখেছি, হিবিং লাইন ধরে না থাকলে ঢেউ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যেত। কি বিশাল আর ভয়ংকর কাণ্ড ভেবে শিউরে উঠতাম মাঝে মাঝে। আসলে, ঢেউটার পরিসর ছিল এত ব্যাপ্ত যে দু-তিন সেকেণ্ডের মতো জাহাজটা সমুদ্রের নিচে হারিয়ে গিয়েছিল। আমি দম রাখতে পারিনি, ছিটকে গেছি, উইনচ্ ম্যাসিন আর ডেরিকের ফাঁকে আটকে গেছিলাম বলে বেঁচে গেছি। ঢেউ অতিক্রম করে সিওল ব্যাংক আবার ভুস করে ভেসে উঠেছে। যেন অতিকায় তিমিমাছের সঙ্গে সমুদ্রের লুকোচুরি খেলা। বুকে একটা বিশাল ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ক'দিন জাহাজে আলোচনার বস্তু হয়ে থাকলাম। কেউ বলল, সিওল ব্যাংকের উপদ্রব শুরু হয়ে গেছে। এখন দেখ, এবারে তিনি কার উপর ভর করেন।

কেউ বলল, তোকে দিয়ে শুরু।

কেউ বলল, তোর ফাঁড়া কেটে গেল।

ঝড়ের পরে সমুদ্র আবার শান্ত। বড় নিরীহ, গোবেচারা স্বভাব তার। পাখি দুটো আবার জাহাজের পেছনে উড়ে আসছে। হাজার হাজার মাইল ওরা উড়ে আসছে, অথচ ক্লান্ত হচ্ছে না। কখনও ওয়াচ শেষ করে রাতে বোট-ডেকে উঠে দেখেছি,

মাস্তুলের ক্রোজ-নেস্টের কাছে পরম নিশ্চিন্তে ঠোঁট গুঁজে ঘুমোচ্ছে। সমুদ্রের ব্যাপ্ত হাহাকারের মধ্যে জীবনের এই মহিমায় অভিভূত হয়ে যেতাম। সিওল ব্যাংক যে আসলে একটা সি-ডেভিল বিশ্বাস করতে কষ্ট হত। আসলে সেই যেন আমাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রেখেছিল। সে না থাকলে আমি সমুদ্রে ভেসে যেতাম। নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম।

এরপর যা হয়, বাড়ি ফেরার আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে যায়। জানি না পরবর্তী সমুদ্রযাত্রায় কী ঘটবে! নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরে জাহাজ ঢুকলে আবার কেমন মানসিক অবসাদ গ্রাস করতে থাকল। পাখি দুটো নেই। তারা ডাঙা পেয়ে কোথায় আবার উড়ে গেছে। সকালে এনজিন রুমে কাজ, স্মোক বক্স সাফসোফ করা, উইনচম্যাসিনে কাজ, এমন হরেকরকম কাজ সেরে বিকেলে জাহাজেই বসে থাকতাম। কোথাও বের হতে ভাল লাগত না। বাড়ির চিঠি পেলে কেমন ভেতরে ভেতরে ভেঙেই পড়ি। জানি না জাহাজ এবার আমাদের কোন সুদূরে সমুদ্রে নিয়ে যাবে। মায়ের সেই এক চিঠি, সাবধানে থাকিস বাবা। সময় আমাদের বড় খারাপ যাচ্ছে।

সারেঙসাব বললেন একদিন, কিরে কিনারায় যাস না কেন। ডেকে চুপচাপ বসে থাকিস?

কেন যে যাই না বোঝাতে পারি না। গাছপালার মধ্যে বাড়িঘর দেখলে মনে হাহাকার তৈরি হয়। জেটি পার হয়ে সি-ম্যান মিসান, মিসানের পর পাহাড়ের চড়াই উৎরাই ভেঙে শহরের ভিতরে ঢুকতে হয়। এক বগি ট্রামে করে একদিন ঘুরেও এলাম। কৌরি পাইনের বনভূমি, পিকাকোরা পার্ক, কিছু দূরে গেলে—সুবিশাল এগমন্ড হিল, বরফের উপত্যকা, আর শীতের মরসুমে অজস্র গোলাপ ফুলের বাগান, কিংবা কোনো উপত্যকায় আপেলের বাগান পার হয়ে গেলে জাহাজে আর ফিরতে ইচ্ছে করে না। ভয় আমি না এ-ভাবে কোনোদিন, কোথাও আবার হারিয়ে যাই। সিওল ব্যাঙক আমাকে নিয়ে আশ্চর্য এক গোপন খেলায় যেন মেতে উঠেছে। আমি মাঝে মাঝে জেটিতে নেমে কি যেন আবিষ্কার করার চেষ্টা করি। সেই দীর্ঘশ্বাস কার?

শহরে বড়দিনের উৎসব। কিছু দিন আগে পাইন ফেস্টিভাল শেষ হয়েছে। শহরেব সর্বত্র আলোর মালা, রঙিন কাগজের ফুল ফল পাখি। লাল নীল বেলুন উড়ছে। গির্জায় গির্জায় থেকে থেকে ঘণ্টাধ্বনি উঠছে। জাহাজেও সাজ সাজ রব। রঙিন কাগজের ওড়াউড়ি। বড়দিনের ছুটি আমাদের। শুয়ে আছি বাঙ্কে। কিনারায় বের হইনি। তখনই সিঁড়ি ভেঙে দ্রুত কেউ নেমে আসছে টের পেলাম। সারেঙসাব তাকালেন, এই ওঠ তো। কি কেবল শুয়ে থাকিস! আমার সঙ্গে আয়।

উপরে উঠে গ্যালির মুখে দেখলাম, এক বৃদ্ধা আর তার পাশে আমার বয়সী একটি মেয়ে। নীল স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ, হাতে সাদা দস্তানা, লাল জ্যাকেট গায়। চোখ দুটো গভীর নীল। বুক কেঁপে উঠল। সারেঙসাব বললেন, ওরা কী বলছে দ্যাখ—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

বৃদ্ধার কথা শুনে অবাক। বড়দিনের উৎসবে সে আমাদের ওর বাড়িতে খেতে বলছে। আর যা বলল, শোনার পর নাও করতে পারি না। ভারত থেকে তারা চলে এসেছে দেশ স্বাধীন হবার পর। চার-পাঁচ বছর ধরে তারা বড়দিনের উৎসবে কোনো ভারতীয় নাবিককে এই দিনটিতে খাওয়ায়। কারণ বৃদ্ধার কাছে সেই দেশ এখনও স্বপ্নের মতো। গোয়ার কোথায় যেন ঘরবাড়ি ছিল তাদের। সেখানে কোনো সমাধি-

ক্ষেত্রে তাঁর প্রিয়জনেরা শুয়ে আছে। এ-দিনে তাদের বড় মনে পড়ে। কোনো ভারতীয়কে এ দিনটিতে কাছে পেলে সান্ত্বনা থাকে তাঁর। অগত্যা রাজি হতে হল। মনুকে বললাম যেতে, সে রাজি হল না। হালাল করা ভেড়া মুরগি না হলে খায় না সে। অগত্যা আমি আর সত্যেনই গেলাম। সকালে মেয়েটি এল একা, গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল। কথায় কথায় সে হাসল। তার সাবলীল বাহু, পুষ্ট স্তন সম্পর্কে এত উদাসীন যে আমি কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। নাম টিনা বুচার। টিনা বড় মিষ্টি নাম। সারাদিন ওদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে কখন, টিনা আমার ভেতরে এক পাগলা ঘোড়া ছুটিয়ে দিল বুঝতে পারিনি। সে গির্জায় নিয়ে গেল। বাইবেলের পাতা উল্টে দিল, ফাদার পড়ে যাচ্ছেন মঞ্চে। পিয়ানো বাজছে। সুর ধরে সংগীত। তারপর পিকাসোরা পার্কে কিছুক্ষণ কাটল, দু-তিন হাজার বছরের পুরনো সব গাছ আমাকে দেখাল। আমি শুয়ে থাকলাম ঘাসে। সে আমার মাথার কাছে বসে থাকল। জাহাজে ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। আমি ইচ্ছে করলেই যেন হারিয়ে যেতে পারি। হারিয়ে গেলেই গুজব, একজন ফিরে এল না। শুরু হয়ে গেল।

রাতে জাহাজঘাটায় ফিরছি। টিনা আমাকে আবার কাল বিকেলে নিতে আসবে। বলল, আমি যেন তৈরি থাকি। মিসান পার হয়ে জেটিতে নেমে অবাক। দূর থেকে সিওল ব্যাঙ্কের ফরোয়ার্ড পিকে এ কি দেখছি! মুহূর্তের মধ্যে দৃশ্যটা দেখে ফেললাম। নোঙর ফেলার আই-হোল যেন আর আই-হোল নেই। আলোর মায়াজালে, সেখানে জাহাজের দুটো বিশাল চোখ দেখে ফেললাম—সমুদ্রের ঝড়ঝঞ্ঝা পার হয়ে অতিকায় প্রাচীন তিমি মাছের মতো সে জলের উপর ভেসে আছে। চোখে ক্লান্তির চিহ্ন। ঠিক দেখছি তো! ঠিক ঠিক, ঐ তো, সিওল ব্যাঙ্ক! তবে জাহাজ নয়—কোনো প্রাগৈতিহাসিক জীব। কেমন ঘোরে পড়ে যাচ্ছিলাম, সহসা টিনা আমায় ঠেলা মেরে বলল, এই দাঁড়িয়ে থাকলে কেন, চল! টিনাকে বলতে পারলাম না, জাহাজটা আসলে জাহাজ নয়। কোনো প্রাগৈতিহাসিক জীব। মাঝে মাঝে তার দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাই বাঙ্কারে। জাহাজের না লুকেনারের প্রেতাত্মার আমি সঠিক কিছু জানি না।

নিউপ্লাইমাউথে সালফার খালাস করে আবার আমরা বের হয়ে পড়েছি। সামোয়া হয়ে অস্ট্রেলিয়া। এস এস সিওল ব্যাংক এবার আসল কার্গো পাবে। মাটি টানার কাজ। ফসফেট বোঝাই হবে। এ-কাজেই জাহাজটাকে দক্ষিণ সমুদ্রে বছরের পর বছর ফেলে রাখা হয়। আপাতত আরও আট মাসের মতো আমরা আছি জাহাজে।

জাহাজিদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। দেশে ফেরার জন্য সবাই উন্মুখ। নিউপ্লাইমাউথ থেকে কদিন জাহাজ চালিয়ে গভীর সমুদ্রে ঢুকে গেছি। দিনের পর দিন শুধু নীল জল, নীল আকাশ। আশ্চর্য, একদিন দেখলাম সেই অতিকায় অ্যালবাট্রস দুটো আবার জাহাজের পেছনে উড়ছে। মাস্তুলে এসেও দুদিন বসল। ওদের নীল গভীর চোখে এই প্রথম কেমন আতঙ্ক আবিষ্কার করলাম। কেমন অস্থির হয়ে উঠছে তারা। মাস্তুল থেকে উড়ছে না। এমন কি সমুদ্রে উড়েও যাচ্ছে না। আমরাই খাবার দিচ্ছি। আমাদের পায়ের কাছে এসে পোষা পাখির মতো খাবার খেয়ে আবার মাস্তুলের উপর বসে থাকছে। আর ঘাড় তুলে দেখছে—কি দেখছে, কেন চক্রাকারে শুধু জাহাজের চারপাশে উড়ছে আর আর্ত চিৎকার যেন—মাঝে মাঝেই আর্তনাদ করছে পাখিদুটো। কেন এমন হচ্ছে বুঝতে পারছি না।

কাপ্তান নিজেও যেন ভাল নেই। তিনি মাঝে মাঝে চার্ট-রুমের দিকে ছুটে যাচ্ছেন। একদিন তিনি আর সেকেণ্ড অফিসার সারাদিন চার্ট-রুমেই বসে থাকলেন। বোধ হয় জরিপ করে বুঝতে পারছেন, জাহাজ ঠিক রুটে চলছে না। সমুদ্রের কোনো অপদেবতার পাল্লায় পড়ে গেছেন। জাহাজ আর কাপ্তানের নিয়ন্ত্রণে নেই। আমরা সাধারণ জাহাজি। ঠিক বুঝতে পারছি না। তবু কী করে যে খবর রটে গেল, জাহাজ আর বাড়িওয়ালার নিয়ন্ত্রণে নেই। বড় রকমের দুর্যোগের সামনে পড়ে গেছে জাহাজ।

গুজব নানাভাবে জাহাজে ছড়ায়। কাপ্তান চিফ অফিসার সেকেণ্ড অফিসার খুবই ঘাবড়ে গেছেন এমনও খবর রটে গেল। আর সে-রাতেই দেখলাম সামনে সমুদ্রে বিশাল অগ্নিকাণ্ড। এলার্ম বেল বাজিয়ে দেওয়া হল। মাস্তার দিতে বলা হল। রেডিও অফিসার ট্রান্সমিসান রুমে বসে আছেন। কি খবর আসছে জানি না। জাহাজ ডেকে সবাই উঠে গেছে। কোনো জাহাজ যেন দূরে জ্বলছে। আর্ত চিৎকার পর্যন্ত শোনা গেছে। আমরা বোট-ডেকে মাস্তার দিলে কাপ্তান বললেন, এক্ষুনি বোট নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই বিশাল অগ্নিকাণ্ডের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

জাহাজে আগুন। কোন জাহাজ, কি নাম—কিছুই জানানো হল না। শুধু সমুদ্র থেকে আমরা অন্তত কিছু লোককে যদি উদ্ধার করতে পারি!

দু নম্বর বোটে আমি, সুখানি, সেকেণ্ড অফিসার, বড় টিণ্ডাল, এনজিন-সারেঙ। চারটে বোটই নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাগ ভাগ হয়ে বের হয়ে পড়েছি। সমুদ্রে কোনো ঢেউ নেই। সম্পূর্ণ নিস্তরঙ্গ। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আর আশ্চর্য যত এগিয়ে যাচ্ছি, তত সেই অগ্নিকাণ্ড দূরে সরে যাচ্ছে। আর সহসা একসময় দেখলাম, কোথাও কিছু নেই। সব অদৃশ্য। সকাল হয়ে গেছে।

সেকেণ্ড অফিসার হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। মোটরবোট। ভয়ের তেমন কিছু নেই—কিন্তু যা আরও বিস্ময়ের ব্যাপার, পিছনে তাকিয়ে দেখি এস এস সিওল ব্যাঙ্কের চিহ্নমাত্র নেই। যত দূরেই হোক জাহাজটা চোখে পড়ার কথা। কিছু নেই। কেবল কিছু পারপয়েজ মাছ জলে ভেসে যাচ্ছে দেখতে পেলাম। সমুদ্রের ব্যস্ত হাহাকারে আমরা কটা প্রাণী বাদে আর কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নেই।

দু দিন এ-ভাবে তন্ন তন্ন করে সমুদ্রে খুঁজে বেড়িয়েছি--কিন্তু এস এস সিওল ব্যাঙ্ক যেন যাদুমন্ত্রে সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে গেল। এমন কি আমাদের সঙ্গে যে তিনটি বোট ছিল—তারাও। আমরা ক্রমে সবাই ভেঙে পড়ছি। বোটে শুকনো খাবার জল যা আছে দশ পনেরো দিন চলতে পারে—যেন নিশ্চিত মৃত্যু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। অন্য তিনটি বোটই-বা গেল কোথায়! আমাদের ঘুম নেই, খাওয়া নেই। দুশ্চিন্তা এবং মৃত্যুভয় আমাদের যখন ক্রমে অবসন্ন করে দিচ্ছিল তখনই দেখলাম, সেই অতিকায় অ্যালবাট্রস দুটো বোটের দিকে উড়ে আসছে। সহসা চিৎকার করে উঠলাম—স্যার—বলে আঙুল তুলে দেখালে তিনিও যেন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। এখন আমাদের শুধু কাজ পাখিদুটোকে অনুসরণ করা এবং শেষ পর্যন্ত সেই পাখি-দুটোকেই অনুসরণ করেই আমরা জাহাজে উঠে যেতে পেরেছিলাম। সমুদ্রের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র থেকে কোনো এক অলৌকিক উপায়ে আমরা যেন বেঁচে গেলাম। জাহাজে উঠে আর যা শুনলাম তাতে বিস্ময়ের শেষ থাকল না। ট্রান্সমিসান রুমে খবর আসছে, ওটা ভুতুড়ে জাহাজ ভুতুড়ে অগ্নিকাণ্ড। যত সত্বর সম্ভব এ সমুদ্র ছেড়ে চলে যান।

পাঁচ-সাত সাল আগে একটা অয়েল ট্যাঙ্কার আগুন লেগে ডুবে যায়। যারা জানে তারা এগোয় না। যারা জানে না তারা এগোয়। এবং নিষ্ঠুর কুহকে পড়ে গেলে আর জাহাজে ফেরা যায় না।

পর দিন পাখিদুটোর জন্য খাবার নিয়ে মাস্তুলের দিকে যাচ্ছি আমরা। আশ্চর্য দেখলাম পাখি দুটো নেই। কোথায় তারা উড়ে চলে গেছে। আশা, আবার তারা ফিরে আসবে। রোজই বোট-ডেকে অপেক্ষা করতাম। সকালে বিকেলে—যখনই যে যার মতো অবসর সময়ে পাখিদুটোকে খুঁজেছি। না, তারা আর ফিরে আসেনি। কেউ তাদের আর কখনও দেখতে পায়নি। সিওল ব্যাঙ্কের আবার যাত্রা শুরু। পাখি দুটো একবার সমুদ্রের ঝড় থেকে বাঁচিয়েছে, এবারে সমুদ্রের আগুন থেকে অ্যালব্রাটস দুটো সিওল ব্যাঙ্ক এবং লুকেনারের পোষা পাখি কি না কে জানে!

# আশ্চর্য দূরদর্শন

জাহাজ বাঁধাছাঁদার কাজ শেষ হয়ে গেলে সেদিনটায় সাধারণত ছুটি থাকে। ছুটি না দিলেও কিছু বলার থাকে না। কাপ্তানের মর্জি, সেকেন্ড-অফিসারের মর্জি। বন্দরে বাঁধাছাঁদার কাজ সারতে দেড় দু-ঘণ্টা, কখনও বেশি—জেটি বুঝে বন্দর বুঝে সব। ডেক-জাহাজি, এনজিন-জাহাজিদের বন্দরে কাজ সুরু আটটায়। বারোটায় এক ঘণ্টার ছুটি। তখন খাওয়া গল্পগুজব, পরে আবার পাঁচটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে কাজ।

কিন্তু এবারের সেকেন্ড-অফিসারটি বেশ আমুদে। কাজে তুখোড়, যে কোনো কাজ সেরে ফেলতে পারলেই ছুটি। কাপ্তান কিংবা চিফ-অফিসারের মর্জির তোয়াক্কা করে না। কাপ্তান নিজেও খুব পছন্দ করেন তাকে।

বন্দর ধরলেই ছুটি—ভাবা যায় না।

জাহাজ এবার ভিক্টোরিয়া পোর্টে ঢুকছে। বুয়েনসএয়ার্স থেকে জাহাজিরা খালি জাহাজ নিয়ে রওনা হয়েছিল। খালি জাহাজ নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া খুবই বিরক্তিকর। সমুদ্র শান্ত থাকলেও জাহাজ এদিক ওদিক টাল খায়। একটা গাছের গুঁড়ির মতো লাগে জাহাজটাকে। যেন সবাই বিশাল একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসে আছে—ভেসে যাচ্ছে নিরন্তর। সামান্য ঝড় বৃষ্টিতে জাহাজ টালমাটাল। জীবন অতিষ্ঠ।

সেই খালি জাহাজ নিয়ে জাহাজিরা ঢুকছে বন্দরে। সামনেই বন্দর।। কিন্তু দু-পাশে সব আজগুবি দৃশ্য। বন্দর নেই, শূন্য মাঠের মতো নির্জন পাহাড় দু-পাশে—কিংবা বনভূমিও বলা যায়। খাঁড়ির ভিতরে ঢুকে এতটা পথ, যেন শেষ হতে চায় না—খাঁড়ি এত দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ডাঙ্গার ভিতর ঢুকে গেছে, অন্তত বিনয় আজ পর্যন্ত দেখেনি। নানা বন্দরে গেছে জাহাজ নিয়ে—চার পাঁচ সফরের অভিজ্ঞতা, অথচ তাজ্জব বনে গেছিল জাহাজ নিয়ে বন্দরে ঢোকার পথে। যেন তারা ক্রমে দু-পাশের সমতল ভূমি পার হয়ে দুটো পাহাড়ের ফাঁকে ঢুকে যাচ্ছে। পাহাড় ক্রমে আরও খাড়াই, আরও গভীর বনাঞ্চল, কোথাও কাঁটাঝোপ, কোথাও বিশাল সব গাছ গভীর অন্ধকার সৃষ্টি করে রেখেছে। ডেকে দাঁড়িয়ে যত দূরেই চোখ যাক, পাহাড়ের শীর্ষদেশ চোখে পড়ছে না। অথচ পাহাড়ের কোলে কোথাও মানুষের বসবাস আছে টের পেল। খাঁড়ির জল কখনও গভীর নীল সবুজ খয়েরি আবার আবছা ধূসর হয়ে উঠছে। নিচের দিকটায় নানা রঙের শ্লেট পাথরের মতো মসৃণ দেয়াল—সবুজ, নীল, কালো, খয়েরি—যখন যে রঙ প্রতিবিম্ব ফেলছে, জলে সেই রঙ ফুটে উঠছে।

সারাটা দিন লেগে গেল অথচ খাঁড়ি-পথ ক্রমেই যেন দীর্ঘ হয়ে উঠছে। দু-পাশের পাহাড় আর শেষ হচ্ছে না। এত বিশ্রী এবং একঘেয়ে লাগছিল যে কখন বন্দর ধরবে সেই আশায় সবাই রেলিং-এ ঝুঁকে আছে। সেকেন্ড অফিসারটিকে আজ বিনয়ের কেন জানি খচ্চর মনে হল। সারেঙকে পর্যন্ত।

কেউ বলছে না, ঠিক কটায় জাহাজ বন্দর ধরবে! এ কী রে বাবা! এটা কি তামাশা! বন্দর ধরছে বলে তাতিয়ে দিয়ে হাওয়া। সেকেন্ড-অফিসার কেবিনের দরজা লক করে শুয়ে আছে—সেদিকটায় জাহাজিরা হুকুম না হলে যেতে পারে না!

হারামি সারেঙ, টিণ্ডাল পর্যন্ত রা খসাচ্ছে না। বললেই এক কথা, বন্দরে ধরলে তো দেখতেই পাবি।

এও হতে পারে সারেঙ, টিণ্ডাল জানেই না, খাঁড়িপথ কতটা ডাঙ্গার ভিতর ঢুকে গেছে। এ-বন্দরে তারা কেউ আগে নাও আসতে পারে।

ব্যাঙ্ক লাইনের কাজ কারবারই আলাদা। যাত্রাপথের কোনো মাথামুণ্ডু নেই। যেখানে খুশি ঢুকে মাল তুলে নাও। জাহাজের খোল খালি রেখ না। খালি জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ালে—এমনিতেই কোম্পানির লোকসান, তার উপর ব্যাঙ্ক লাইনের জাহাজগুলি সমুদ্র চষে বেড়ায় মালের খোঁজে।

এ-সব কারণেই কাপ্তান জাহাজটা খালি নিয়ে হোমের দিকে উঠে যেতে পারছেন না। কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারে—যেখানে যা পাও তুলে নিয়ে এস। কয়লা, ফসফেট, সালফার যা পাওয়া যায়। ভিক্টোরিয়া পোর্ট থেকে ঠেসে আকরিক লোহা নেওয়া হবে তেমনই কথা আছে। বুয়েনস এয়ার্সের এজেন্ট অফিস থেকে কাপ্তান হয়তো এমনই নির্দেশ পেয়েছেন, না হলে, জাহাজিদের জীবন বিপন্ন করে এত সরু পথে জাহাজ নিয়ে কে ঢোকে! যা ভাঙা লজঝরে জাহাজ, পাহাড়ের দেয়ালে ঠেস খেলেই গেল। ভেঙে চুরমার। একেবারে সলিল সমাধি। পাথরের দেয়াল এত খাড়া আর মসৃণ—পাড়ে উঠতে পারে সাধ্য কার!

এখন বন্দর ধরলে বাঁচা যায়। মাঝে মাঝে খাঁড়ি এত সরু যে পাহড়ের দেয়াল ডেক থেকে ছুঁয়ে দেয়া যায়। ধীর গতি জাহাজ যেন নড়ে না। পাহাড়ের গা বাঁচিয়ে জাহাজকে এগুতে হচ্ছে সন্তর্পণে।

জাহাজিদের আরও ক্ষোভ, পাহাড়ের মাথায় বেশ বনজঙ্গল, গভীর বনভূমি সবই আছে—মানুষের বসতিও থাকতে পারে—অথচ দু-পাশের নিরেট পাথর ছাড়া কিছুই আর দৃশ্যমান নয়। এ তো হারামির বাচ্চারা আর এক গ্যাঁড়াকলে ফেলে দিল—বিনয় অধৈর্য হয়ে শুধু এ-সবই ভারছে। আর ছটফট করছে। সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে যাচ্ছে, সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে আসছে। প্রায় সব জাহাজিরা, বিশেষ করে যারা যুবা ডাঙায় নামার জন্য যারা অধীর, তাদের ক্ষোভ আরও বেশি।

সকালে পাহাড়ের ভিতরে ঢোকার সময় সেকেণ্ড-অফিসার এমন হাবভাব দেখল, যেন রেডি হয়ে থাক—বন্দরে ঢুকছি। বন্দরে ঢুকছি বললে, জাহাজিরা টান টান হয়ে যায়। টান টান হতে পারার মজাই আলাদা। সমুদ্রের একঘেয়ে নীল জল, নীল আকাশ অথবা জ্যোৎস্না রাতে অনন্ত মহাকাশের মতো অদৃশ্য রহস্য—স্টিয়ারিঙ এনজিনের কক শব্দ অথবা দূরাগত কোনো নক্ষত্রের ইশারা জাহাজিদের ডাঙার জন্য বিহ্বল করে রাখে।

ডাঙায় নামতে পারলেই জাহাজিদের পরমায়ু বেড়ে যায়। তারা শুধু হাঁটে আর হাঁটে। শিস দিতে দিতে জেটি পার হয়ে দু-হাত তুলে দেয়। দু-পাশের বাড়িঘর, দোকানপাট, আর আছে নারী রহস্যময়ী, যেন হাতের মুঠোয় গোপন করে রেখেছে জাহাজি মানুষের পরমায়ু—কখনও গভীর কোনো বনভূমিতে ঢুকে গেলে নিজের ছোট্ট গৃহটির কথা মনে পড়ে যায়। ভেতরে হাহাকার বাজে।

এত ভালমানুষ সেকেণ্ড-অফিসার, এতটা খচরামি না করলেই পারত। সাঁজ লেগে গেল। পাহাড় গাছপালা বনভূমি অদৃশ্য। বিনয় ক্ষোভে ফেটে পড়ছে।

পাইলট-বোট আগে আগে যাচ্ছে। পাইলট ব্রীজে বসে কাপ্তানের সঙ্গে খোস-গল্পে মেতে গেছেন! এরা কি ভেবেছে, জাহাজের নিয়তি এই, তাড়াহুড়ো করে

কোনো লাভ নেই। এত সন্তর্পণে জাহাজটাকে আর কতকাল চালানো হবে।

এখনও ডেক-সারেঙ এসে 'টাণ্টু' বলছে না।

'টাণ্টু' না বললে বোঝা যাবে না জাহাজ বন্দরে ঢুকে যাচ্ছে। এমন কি দূরে অদূরে কোথাও আলোর বিন্দু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না, সামনে পেছনে যতদূর চোখ যায় শুধু গভীর অন্ধকার। জাহাজের আলো, প্রপেলারের গোঙানি ছাড়া সব কিছুই বিস্ময়করভাবে অবাস্তব।

কে জানে তারা জাহাজ নিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে আমাজন নদীর মোহনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কি না!

বিনয় কেবল ভাবছিল, এই খাঁড়িপথ গিয়ে হয়তো আমাজন নদীর মোহনায় পড়েছে। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে আর কিছুটা গেলেই আমাজন নদীর মোহনা সে দেখতে পাবে।

আসলে যে কোনো অচেনা দেশে গেলেই এটা তার মনে হয়। সে দেশের সব চেয়ে আশ্চর্য বস্তুটি যেন তার দেখা দরকার। একবার অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে ঘুরতে ঘুরতে একদিন জঙ্গলের মধ্যে ক্যাঙ্গারু আবিষ্কার করে ফেলেছিল—গিরিমাটি রঙের প্রাণীগুলি তার চোখের উপর দিয়ে দ্রুত কোথাও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। জিলেঙ থেকে মেলবোর্ন যাচ্ছিল। বেশি দূর না। ষাট সত্তর কিলোমিটার রাস্তা সমুদ্রের ধারে ধারে—বনজঙ্গল। কিন্তু তার সঙ্গীটি বলেছিল, কোথায় ক্যাঙ্গারু! আমি তো দেখছি না।

—কেন দেখছিস না, মাঠের উপর দিয়ে দৌড়চ্ছে। ঐ তো হারিয়ে গেল। দাঁড়া। বলে বিনয় গাড়ি থেকে নেমেও গেছিল। কিন্তু সব অদৃশ্য। শুধু বনজঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নেই। তবু সে দেখে থাকে। এই দেখাটাই কে জানে আবার কোনো নদীর মোহনায় পৌঁছে দেবে কি না তাকে।—বিশাল সব পদ্মপাতা—সে বসে আছে। যতদূর চোখ যায় ঘোলা জল—কত বিচিত্র সব পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। ছোঁ মেরে মাছ তুলে নিচ্ছে।

কিংবা কখনও সে আমাজনের উৎসমুখে হেঁটে যায়। গভীর অরণ্য অথবা পাহাড়ের গুহায় আদিম মানুষের ছায়া—কখনও তারা নদীতে সাঁতার কাটছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই বিনয় টের পেল প্রপেলার ঘুরছে না। জাহাজ থেমে আছে। খাড়া পাহাড়ের নিচে নোঙর ফেলা। জেটি নেই। পাহাড়ের ভেতর থেকে চোঙের মতো কি একটা বের হয়ে আছে।

ইতস্তত আরও সব জাহাজ এ-ধার ও-ধার নোঙর করা। সমুদ্রের খাঁড়ি এ দিক-টায় বেশ প্রশস্ত। জেটি নেই। অথচ আট দশটা জাহাজ নোঙর ফেলে আছে। জেটি ক্রেন কুলি কিছুরই দেখা নেই। এ কেমনতর বন্দরে তারা হাজির! দূরে সমুদ্রের খাঁড়ির উপরে সেতু এবং ওদিকটায় শহর বাড়িঘর, গীর্জার চূড়ো।

বিনয় কেতলি নিয়ে সিঁড়ি ধরে গ্যালিতে ঢুকে গেল। ভাণ্ডারি নেই, না থাকারই কথা। উনুনে আঁচ গন গন করছে। ভাণ্ডারির হুঁশ নেই। রেলিঙে ঝুঁকে আছে। ডাঙা দেখার আশ্চর্য মোহ সবাইকে তাড়া করছে।

রবিবার। ছুটির দিন। কাজকর্মের ব্যস্ততা নেই। কেউ 'ফলঞ্চা' বাঁধছে না। রঙের টব নিয়ে কেউ ছুটছে না। 'হাসিল' নিয়ে কেউ টানাটানিও করছে না। ছুটির এমন সুন্দর আমেজ—অথচ বন্দরে নামার কোনো রাস্তা নেই। এমনকি কাছে পিঠে কোনো বোটও দেখা যাচ্ছে না। আশ্চর্য।

সকালে চা করার ভার পালা করা থাকে সবার। সব 'বিশ্রেই' এই নিয়ম। বিনয়দের 'বিশ্রতে' তারা চারজন। এক ফোকসালে থাকে। একসঙ্গে টোবাকো চা চিনির রেশন—সুজয়দা থাকে তার ঠিক উপরের বাংকে। দাদা এত কুঁড়ে যে ছুটির দিনে ঘুমই ভাঙতে চায় না।

জাহাজ নোঙর ফেলা—মেজাজ এমনিতেই খারাপ। সারাটা দিন ডেকে দাঁড়িয়ে থাকতে কাঁহাতক ভাল লাগবে। এমন মনোরম সকাল, চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য কত সব আগ্রহ সঞ্চার করছে ভিতরে—অথচ নেমে যাবার কোনো রাস্তা নেই। মেজাজ খারাপ। ধ্বংস খাবি তো খাবি, নালে ফেলে দেব। অত ডাকাডাকি করে ঘুম থেকে তুলতে আমার দায় পড়েছে।

এরা একই 'ফোকসালে' থাকে। একই সঙ্গে রেশন তোলা হয়। একই সঙ্গে আড্ডা তাস সব। বেড়াতেও বের হয় একসঙ্গে।

জাহাজ বন্দরে ঢুকে গেছে ভেবে ভিতরে সাড়া অনুভব করেছিল, এখন সব কিছু কেমন বিস্বাদ। ছুটির দিন, অথচ ডাঙায় নামতে পারছে না। সকালে চা চাপাটি খেয়ে শহরে ঘুরে বেড়ানো হল না। কোনো বোটেরও দেখা মিলছে না।

বন্দরে ঢুকে জাহাজ এ-ভাবে কখনও সখনও বয়াতে বাঁধা থাকে ঠিক—কিন্তু এত-গুলি জাহাজ—সে দু একজনকে প্রশ্ন করেও সাড়া পায়নি। কেউ বলতে পারছে না। ব্যাটা সেকেণ্ড-অফিসার পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়েছে। ডেকে বের হচ্ছে না।

সিঁড়ি ধরে নামার সময় একবার ভাবল, সারেঙের ফোকসালে উঁকি মেরে যাবে।

সে নেমে দেখল, সারেঙের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে লক করা। কোথাও গেছে। সেকেণ্ড কিংবা চিফ অফিসারের কেবিনে দেখা করতে যেতে পারে। বাথরুমেও যেতে পারে। ডংকিম্যানের সঙ্গে দেখা।

সে বলল, তাজ্জব রসিদ চাচা, জেটি নেই, ক্রেন নেই। মানুষজনও নেই কোথাও। কি ব্যাপার! সামনের পাহাড়ে পাথর আর গাছপালা। উপরে বসতি। কিন্তু মানুষ-জন যায় কি করে। এ কেমনতর বন্দর।

রসিদ উপরে যাচ্ছে, হাতে কেতলি। এ-সময়টায় যে যার ফোকসালে বসে চা খায়। সকালের সূর্য দূরে পাহাড়ের গাছপালার ফাঁকে উঠে আসছে। পোর্টহোলে রোদের ছায়া খেলা করে বেড়াচ্ছে। সিঁড়িতে ওঠা নামার শব্দ। কেমন এক নিঝুম নির্জনতা চারপাশে। স্টিয়ারিং এনজিন কিংবা প্রপেলারের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেলে—বড় খালি খালি লাগে সব কিছু।

বিনয় দেরিও করতে পারছে না। ফোকসালে সবাই মুখিয়ে আছে। আর কেউ না হলেও ত্রিদিব—তার সকাল সকাল ওঠার অভ্যাস। সে উঠেই ঠেলাঠেলি শুরু করে দেয়—এই ওঠ—কারণ বিনয় জানে, দেরি করে উঠলে, চা-এর পিপাসা বেটা'দের আরও বেশি তাতিয়ে তুলবে।

গোলমাল যত টিণ্ডালকে নিয়ে। স্টোকহোলডে কয়লা মারার সময় যত রোয়াবি। ফোকসালে ব্যাটা কুঁড়ের হদ্দ। কে জানে ব্যাটা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে কি না। না ওঠারই কথা। চা নিয়ে বাংকে ডাকাডাকি না করলে, বাংক থেকে নামতেই চায় না।

পোর্ট-সাইডের ঠিক সিঁড়ির নিচে বাঁ-দিকের ফোকসালে তারা থাকে। সে ঢুকেই বলল, মাইরি কিচ্ছু নেইরে। জাহাজ নোঙর ফেলে আছে।

সুজয় বলল, এতক্ষণে টের পেলে বাবা বিনয় কিনারায় নামতে পারবে না।

আহা রে বেচারী। মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে। তারপর আড়মোড়া ভাঙল, হাত উপরে তুলে দিল—হাই উঠছে। দে বাবা চা দে। দেখি তারপর তোকে কিনারায় পেঁছে দিতে পারি কি না।

আমাকে নিয়ে একদম মজা করবে না। কিনারায় নামলেই তো ছুক ছুক বাই। বিনয় লকারের দরজা টেনে খুলতে গিয়ে দেখল বন্ধ।

অঞ্জন বলল, বন্ধ।

—চাবি কার কাছে।

—কী জানি। চাবিটা এত রহস্যময় কেন বলত। কে যে লুকিয়ে রাখে। খুঁজে পাচ্ছি না।

অঞ্জনের লকারে কাপ প্লেট থাকে। চাবিও তার কাছে। চাবিটা খুঁজে পাচ্ছে না। মেজাজ খারাপ। মেয়েমানুষের আশ্চর্য সব সহবাসের রঙিন ছবি থরে থরে টাঙানো আছে। কে যে মেরে দেয়। দুটো অ্যালবাম হাপিজ। সেই থেকে সে সতর্ক হয়ে গেছে। জাহাজে টাকা পয়সা সোনাদানার চেয়ে নগ্ন ছবি চুরি যায় বেশি। অ্যালবাম দুটোয় দামি ছবি সব লুকিয়ে রেখেছিল। হাপিজ হয়ে যাবার পর সতর্ক হয়ে গেছে। চাবিটা এক জায়গায় রাখে না। এখানে সেখানে লুকিয়ে রাখার অভ্যাস। অথচ কেউ ঠিক টের পেয়ে যায়। পছন্দমতো ছবি মেরে জায়গারটা জায়গায় রেখে দেয়।

সুজন উপরের বাংক থেকে লাফিয়ে নিচে নামল। সে সিঁড়ি ভেঙে উপরে বাথরুমে চলে গেল। চাবি কোথাও আছে, পাওয়া যাবে। হারামি অঞ্জনের ন্যাকড়ামি ফিরে এসে না পেলে বের করে দেবে! সেই বলতে গেলে অভিভাবক ওদের। দশ বারো সফর সমুদ্রে। ফোকসালে, ডেকে, কিনারায় ফাতরামির চূড়ান্ত কিন্তু ওয়াচের সময় কাঠখোট্টা টিণ্ডাল সাব। বেমাফিক কাজ কাম করলেই পাছায় ধাঁই করে লাথি।

অঞ্জন ক্ষোভের সঙ্গে বলল, না মাইরি আমি কিচ্ছু জানি না। চাবিটা এই থাকে, এই হারায়। চাবির কি শেষ পর্যন্ত হাত পা গজিয়ে গেল! যায় কোথায়! তারপর কি মনে হতেই বলল, চাবিটা যে তুই নিলি, ফেরত দিয়েছিস?

বিনয় হাতে কেতলি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি তো অঞ্জন সকালে বালিশের নিচ থেকে চাবিটা বের করে হাত বাড়িয়ে তাকে দিয়েছিল। ঘুমের আমেজ ভাঙেনি। চটকা লেগে যেমনটা হয়—তার মধ্যেই চাবিটা বের করে দিয়েছে। চা চিনি কনডেনসড মিল্কের কৌটা বের করেছে লকার থেকে। জাহাজ বন্দর ধরেছে, অথচ কিনারায় নামতে পারবে না, মন মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে—কিছু মনে রাখতে পারছে না।

পকেট হাতড়ে চাবিটা পেল না।

টিণ্ডাল নেমেই হম্বিতম্বি শুরু করে দেবে। চা রেডি নেই! তোরা কি সব গাঁজাগুলি খেয়ে বসে আছিস! কাজের সময় হাতের কাছে চাবি পাস না!

সে কেতলিটা অঞ্জনকে দিয়ে সিঁড়ি ধরে দৌড়ে গ্যালিতে ঢুকে গেল। যদি ফেলে আসে।

না নেই। গ্যালিতে নেই। ডেকে যদি পড়ে থাকে—না নেই। তন্নতন্ন করে খুঁজছে।

সিঁড়ি ধরে ফের নামার সময় খুঁজল।

চাবিটা লক করে রাখল কোথায়! সে পকেট হাতড়াচ্ছে আবার। কোথায় রাখল!

মুখ ব্যাজার করে ফোকসালে ঢুকতেই দেখল, কাপ ডিশ বের করে অঞ্জন চা ঢালছে।

—এই শুয়োর, বললি চাবি আমার কাছে।

—তোর কাছেই তো। চাবি বালিশের তলায় গুঁজে দিয়ে গেলি—শুয়োর ডাঙ্গা দেখলেই মাথা খারাপ! তোর কপালে দুর্গতি আছে।

—তোমাদের বাবা নেই?

—না নেই। ডাঙা দেখলে নেশা ধরে না। মাতাল হই না। খালি চোখে কত কিছু দেখতে পাস! সুজয়দার দূরবীনটা চোখে দিলে আরও কী না দেখতিস! দাদা তো জাহাজ থেকে না নেমেই সব দেখে। নারী, গাছের ছায়া, শহরের বাড়িঘরে রমণের ছবি, পার্কের বেঞ্চিতে প্রেম, সাদা পায়রার ঝাঁক, নীল সবুজ নক্ষত্ররা পর্যন্ত টুপটাপ ঝরে পড়তে থাকে। দাদার কাছ থেকে দ্যাখ হাতড়াতে পারিস কি না। ডাঙায় না নামলেও আসল কাজ হয়ে যাবে। কিনারায় না গেলেও চলবে।

সুজয় নেমে এসে বলল, হয়ে গেল। বন্দরে কাজকর্ম নেই। ধর্মঘট। এখন পচে মরতে হবে। সেকেন্ড-ইঞ্জিনিয়ার বলে গেলেন, কবে ধর্মঘট মিটবে কেউ জানে না।

—ধুস ধর্মঘট! ধর্মঘট না হলেই কি হত! জেটি কোথায়! সারা ডেকে ঘুরে এসেছি, নামার কোনো রাস্তা নেই। খাড়া পাহাড়। মাল বোঝাই হবে কি করে!

—কেন দেখছ না 'সুট' বের হয়ে আছে!

—কোথায়!

ঐ যে চোঙের মতো। আয়। সুজয় পোর্টহোলে মুখ গলিয়ে দেখাল—ওটা চালু হলে চব্বিশ ঘণ্টায় জাহাজ বোঝাই। সুটের মুখ থেকে গল গল করে তোমার মাল নেমে আসবে।

ত্রিদিব বলল, নেমে আসবে না বলে ওগলাবে বল। মনে নেই জিলঙের বন্দরে গম বোঝাই হল—কতক্ষণ লাগল।

—তবে কি জাহাজিরা নামতে পারবে না কিন রায়। বিনয় হতাশ গলায় কথাটা বলল।

—নামতে পারবে না কেন! ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়—যে করে হোক নামতে হবে। কবে জাহাজ মাল বোঝাই হবে, আর আমরা সারাদিন পচে মরব! হয় না। তুই বরং উপরে চলে যা। পাহাড়ের মাথায় দু একটা করে বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

সস্তায় কেনা একটা বাইনোকুলার আছে সুজয়ের। কার্ডিফের হ্যান্ড মার্কেট থেকে কেনা। সুজয় প্রথম সফরেই এটা কিনে বেশ বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। হাবেভাবে বুঝিয়ে দিতে কসুর করে না। আসলে দূরবীনটা না থাকলে পরে আর সফর দিত কিনা তাও বলা যেত না। দূরবীনে মেয়েমানুষের ছবি কখনও কখনও অলৌকিক রহস্য তৈরি করে।

সুজয় দূরবীনটা কখনই হাতছাড়া করে না। কাউকে দেয়ও না। যেমন পানামা ক্যানেল পার হবার সময় জলজঙ্গল পার হয়ে রাতের দিকে নির্জন শহর চোখে পড়েছিল। আসলে গভীর রাত বলে, শহরটা দূরের মনে হয়েছে। কিংবা মৃত শহর—শহরটায় মানুষ থাকে বলে মনে হয়নি। স্বপ্নের শহর হতে পারে—কিংবা মানুষজন এক অজানা ভয়ে শহর ছেড়ে পালালে যেমনটা হয়ে থাকে খালি চোখে সবাই অন্তত তাই দেখেছে।

সুজয় ফরোয়ার্ড পিকে গোপনে উঠে গেছিল শহরের খবর পেয়ে। সে নোঙরের নিচে সবার অজান্তে বসেছিল দূরবীন চোখে। কে বলে মৃত শহর! আসলে আবছা বলে মানুষজন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সে পার্ক, স্কুলবাড়ি এবং রাস্তায় মজাদার দোকানের হোর্ডিংসহ সহসা কার্নিভেলের দরজায় এক রমণীকে বের হয়ে আসতে দেখেছিল। পাশে একজন পুরুষ—কুকুরের মতো পিছু নিয়েছে। ওরা হাঁটছিল। বড় কোনো গাছের ছায়ায় তারা হারিয়ে গেল। আশ্চর্য সেই পুরুষের মুখ দেখার যতবার সে চেষ্টা করেছে, ততবারই দূরবীনে এক বড় গাছ তার ছায়া, ছায়ার নীচে অন্ধকার। অন্ধকার এবং নারী কি এক! সে বুঝল, পুরুষমানুষটির মুখ দেখার চেষ্টা করা উচিত নয়। দেখতে গেলেই দূরবীন থেকে সেই রহস্যময়ী নারী হারিয়ে যাচ্ছে।

জাহাজ আবার সমুদ্রে পড়লে ভেবেছিল, পুরুষটি আসলে আর কেউ নয়, সে নিজে। বন্দরে কোনো যুবতী নারী দেখলেই মনে হয়, সে সফর করে যাচ্ছে, এরা হেঁটে যায় বলে। দোকান সাজিয়ে বসে থাকে বলে—কখনও কার্নিভেলের জুয়ার রিঙে. সে কি সব রূপসীরা! তাদের লাল নীল রঙের জ্যাকেটে গোলাপ ফুল, পায়ে নাইলনের মোজা এবং এত টান টান শরীর যে মনে হয় অন্তত ছুঁয়ে দিতে পারার মধ্যেও বেঁচে থাকার সার্থকতা থাকে।

সুজয় দূরবীনে আরও সব ছবি দেখতে পায়। সহসা সহসা তারা ফুটে ওঠে। একবার মনে আছে, দুটো তিমি মাছ সমুদ্র তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিল। সে দূরবীনে দেখতে পেয়ে ডেক ধরে ছুটে গেছে—তিমি তিমি। সাধারণত জাহাজে সফর যত দীর্ঘই হোক সমুদ্রে তিমি মাছের দেখা পাওয়া যায় না। খুব কম জাহাজিই বলতে পারে সমুদ্র সফরে তারা তিমি মাছ দেখেছে। গভীর সমুদ্রে নীল জলরাশি, আর কখনও অ্যালবাট্রস পাখি—মাঝে মাঝে অবশ্য ডলফিনের ঝাঁক ভেসে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু তিমি মাছ অথবা সমুদ্রের কোনো মনস্টার পাঁচ সাত সফরেও সুজয় দেখতে পায়নি। কাজেই বিশাল তিমি মাছের মেটিং হচ্ছে—এ-বড় দুর্লভ অভিজ্ঞতা, তিমি মাছের মেটিং সম্পর্কে তার কিছু পড়াশোনা আছে। মাছ দুটোর আচরণ দেখে মনে হয়েছিল সমুদ্রে পুরুষ ও নারীর এই সহবাস—তাকে অধীর করে তুলেছিল। সে দূরবীনটা সেদিন একা ব্যবহারের অভিজ্ঞতা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিল। প্রথমে সেকেন্ড-ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়েছে, দেখুন স্যার। দূরে ইস্ট-ইস্ট-সাউথে তাকান।

ধুস। কিচ্ছু নেই।

দূরবীনটা ফেরত দিয়ে দিয়েছে।

সে এ-ভাবে সবাইকে দিয়েছে, সারেঙ, টিন্ডাল, স্টুয়ার্টকে—কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কেবল সে চোখে দিলেই দেখতে পায়। কী ভয়ংকর দৃশ্য—তিমি মাছ দুটো দ্রুত ছুটে যাচ্ছে, ভেসে উঠছে, লাফিয়ে মাথা তুলে দিচ্ছে আকাশের দিকে—এবং এত নিকটবর্তী তারা যে একে অপরের উপর আক্রমণ করছে বোঝা যায়! কিছুক্ষণ সমুদ্রের নিচে। উপরে সমুদ্রের সরল রেখা দেখে বুঝতে পারে তারা আছে জলেরই নিচে। তারা আসঙ্গ লিপ্সায় কামার্ত হয়ে উঠেছে। কে যেন বলেছিল, এ-সময় তিমি মাছেরা এক রকমের শব্দ করে—মানুষের সহবাসের সময় শিৎকার শব্দ যেমনটা হয়ে থাকে আর কি! সেই সব শব্দমালাও সে শুনতে পেয়েছে। এটা তো হওয়ার কথা না! এনজিনের শব্দ, কিংবা স্টিয়ারিঙ এনজিনের শব্দ ছাপিয়ে এমন গোপন শব্দমালা ভেসে আসবে কি করে! আর মনে হয়েছে, দোকানি ঠিকই বলেছে, এটা কিনে নেয়া

ঠিক, আবার কেন যে এটা তারা ফেরতও দিয়ে যায়। তুমি ইণ্ডিয়ান, আমি ইণ্ডিয়ান —তোমার কোনো ক্ষতি হয় চাই না।

সুজয়ের জেদ, সে কিনবেই। এবং কিনে ভেবেছিল তার না কোনো আবার বিপদ হয়। প্রথম প্রথম দূরবীনটা নাড়া চাড়া করত। দেখত বসে বসে। চোখে দিত না। চোখে দিলেই কি আবার দেখে ফেলার ভয়। কিন্তু সফরে যারা যায় তারা জানে কী ক্লান্তিকর আর একঘেয়ে এই সমুদ্রযাত্রা। ডারবান থেকে বুয়েনস-এয়ার্সের দীর্ঘ যাত্রায় সে প্রায় পাগলা হয়ে যাবার উপক্রম। কিছু নেই—শুধু অসীম অনন্ত নীল জলরাশি। আর কিছু না। এমন কি কোনো অ্যালবাট্রস পাখিও জাহাজটার পিছু নেয়নি। শুধু ওয়াচে কাজ—বয়লারে স্টিম ঠিক রাখা, ঝড়ের দরিয়ায় মার মার কাট কাট, কাঁহাতক সহ্য হয়। আর পচা গোস্ত ভাত, সকালে চর্বিভাজা রুটি—কতদিন ভাল্লাগে! সে ভেবেছিল, দেখাই যাক না দূরবীনটা চোখে দিয়ে। সে যেমন গোপনে কিনেছিল তেমনি গোপনে রাতের বেলায় বোট ডেকে দাঁড়িয়ে প্রথমে দূরবীনে চোখ রেখেছিল। ধুস, যত এসব বাজে কথা। কিছুই নেই। সমুদ্র এবং অন্ধকার ছাড়া অলৌকিক কিছু দূরবীনের কাচে লেগে নেই। আসলে দূরবীন যেমন হয়ে থাকে তাই। বন্দরের কাছাকাছি গেলে দেখা যাবে—কিংবা কোনো দ্বীপ-টিপ চোখে পড়লে দেখা যাবে। যাই হোক এক বিকেলে সবাই সোরগোল তুলেছিল, মাটি মাটি। অর্থাৎ ডাঙ্গা। দীর্ঘ সফরে এই ভাঙা জাহাজিদের পাগল করে রাখে। ডেকে সবই উঠে এসেছে। সে-ও। দেখছে একটি সোনালি বালির ছোট্ট দ্বীপ। নাক জাগিয়ে রাখার মতো সমুদ্রে ভেসে আছে। আর দুটো ফার্ন গাছ ছাড়া কিছু নেই। এমন কি কোনো কচ্ছপের খোল মৃত স্টারফিশ এবং শামুক-টামুকও চোখে পড়েনি। সে গোপনে, একেবারে ফরোয়ার্ড-পিকের মাথায় দাঁড়িয়ে দেখছে। আশা, যদি কোনো কচ্ছপ কিংবা পাখি দেখতে পায়। কিন্তু আশ্চর্য, দূরবীনে ফার্ন গাছ সে দেখল না। দুই নরনারী—নির্বাসিত হলে যা হয়, হাত তুলে তাদের ইশারা করছে। সে ভেবেছিল, সত্যি। সোরগোল তুলে ছুটে গেছে। কাপ্তান শুনে খুবই বিরক্ত-দূরবীনে, তাঁরা কিছু দেখতে পাচ্ছে না, দুটো ফার্নগাছ ছাড়া কিছু নেই। আর সে দেখছে দুই নির্বাসিত নরনারী। দূরবীনটায় তবে অলৌকিক কিছু আছে।

দূরবীনের মজা সুজয় একাই ভোগ করত। কি দরকার, কেউ বিশ্বাস করে না, সে যা দেখে, অন্য কেউ তা দেখতে পায় না। মাথায় তার ছিট আছে ভাবে। তার চেয়ে নিজে উপভোগ করা যাক—এবং এ-ভাবেই সে দূরবীনটা নিয়ে জাহাজ ডেকে গোপনে উঠে যেত। গোপনে দূরবীনের মজা ভোগ করত। এ-ভাবে সে তার নিজের মতো দূরবীনে মজার দৃশ্য দেখে দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার একঘেয়েমি থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে। গত সফরে লসঅ্যাঞ্জেলেস্ থেকে জাহাজ নিয়ে ভ্যাংকুভার যাচ্ছিল। মাঝ সমুদ্রে ঝড়। তালগাছ প্রমাণ সব ঢেউ জাহাজটার সঙ্গে যেন মারদাঙ্গা শুরু করেছিল। ঝড়ের সময় ডেক ধরে যাবার নিয়ম না। যদিও হিবিং লাইন বেঁধে দেওয়া হয়। ঝড়ে ঝাপটায় কোথায় কি ভেঙে পড়বে, উড়ে যাবে ঠিক থাকে না। ডেকে কাজ থাকেই—তখন হিবিং ধরে যাওয়াআসা। সে ঝড়ের মধ্যে বোট-ডেকে উঠে ঢেউএর তাণ্ডব দেখবে বলে দাঁড়িয়েছিল। এক হাতে হিবিং লাইন শক্ত করে ধরে ঢেউ-এর মাথায় প্রথমে আগুন জ্বলতে দেখেছিল। সে জানে—আগুন নয়, ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাস জ্বলছে—এবং অবলীলায় তাকে নেশার মধ্যে ফেলে দেবে কে জানত! সে টলছিল! সে দু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে

আছে। জাহাজ কাত হয়ে যাচ্ছে, আবার সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে—সে বুঝেছিল বোট-ডেক, খুব নিরাপদ নয়। রাত আটটা-বারোটার ওয়াচ। মধ্য রাতে সব ধূসর। লক্ষ লক্ষ যোজন দূরেও ফরফরাসের আলো সে যেন দূরবীনে দেখতে পাচ্ছে। আর মনে হল, মনে হল না, একেবারে তাজা টাটকা দুই জলকন্যা, ঢেউয়ের মাথায় ভেসে যাচ্ছে। নাচানাচি করছে। সে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি। নিচে নেমে গ্যাংওয়ের পাশে কেবিনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। ডান পা-টা খোঁটার মতো উইন্ডসহোলে রেখে দাঁড়িয়েছে। যেন সে পড়ে না যায় কিংবা ঢেউয়ের ঝাপটা এসে তাকে ঠেলে ফেলে না দেয়—আত্মরক্ষা আগে, তবু নেশার আছে এক গভীর আগ্রহ—ভাল মন্দের কথা বোধ হয় তখন মনে থাকে না। দুই জলকন্যা ভেসে যাচ্ছে। তারা ঢেউয়ের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। কোমর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, সে তাদের স্তন এবং গ্রীবা দেখেছে। সোনালী চুল দেখেছে। কিন্তু কোমরের নিচেটা জল আড়াল করে রেখেছে। ইস, কি আফসোস!

মুহূর্তের মধ্যে তারা এল, ভেসে থাকল জলে, হাত তুলে নাচানাচি করল—তারপর হারিয়ে গেল। সারা রাত জেগে থেকেও আর একবার জলকন্যা দেখতে পায়নি। সে বেহুঁস হয়ে কতভাবে আবার দেখার চেষ্টা করেছে, চোখে পড়েনি। তাকে আবিষ্কার করা গেল উইনচ ম্যাসিনের তলায়। হুঁশ নেই। সবাই জানত, টিন্ডালের মাথায় ছিট আছে। ঝড় দেখতে গিয়ে জান নিয়ে টানাটানি। সে যে জলকন্যা দেখার জন্য সারা ডেক ফরোয়ার্ড পিক ছোটাছুটি করেছে রাতে কেউ জানে না। আর আশ্চর্য দূরবীনটা সে দু-হাতে সাপ্টে ধরে রেখেছিল। ঝড় জল হাত থেকে তার ওটা আলগা করে দিতে পারেনি।

গত সফরের দুই জলকন্যার কথা ভাবলে, এখনও তার হৃদকম্প উপস্থিত হয়। সে যে বেঁচে গেছে গত জন্মের পুণ্যফল। ঢেউয়ের ঝাপটায় তার উড়ে যাবারই কথা। আসলে দূরবীনটা এমন সব অলৌকিক জগৎ তৈরি করে ফেলে যে সেখানে সে এক নিরুপায় মানুষ। অলৌকিক না সত্যি ঘটনা, কে জানে। সাধারণত ওটা তোলাই থাকে। যত দিন যাচ্ছে তত দূরবীনটা সম্পর্কে তার নিজেরও সংশয় জাগছে। মন ভাল না। কবে দেশে ফিরতে পারবে জানে না। মুক্তার চিঠি বুয়েনস্ এয়ার্সে পায়নি। আজ সকালে পাইলট বোট এসেছে। কিন্তু কোনো চিঠি আসেনি। জাহাজ থেকে নামাও যাচ্ছে না। অন্য সময় হলে, সে দূরবীন চোখে দিয়ে বসে থাকতে পারত। পর পর দু বন্দরে স্ত্রীর চিঠি না পেয়ে সুজয় ভিতরে ক্ষেপে আছে ঠিক, কিন্তু আচরণে বুঝতে দিচ্ছে না, তার মন ভাল নেই। সে প্রায় প্রাচীন নাবিকের মতোই সমুদ্রযাত্রায় সুখ পায়—সে তার আচরণে এমন প্রমাণ দিচ্ছে। যেন দূরবীনটা চোখে দিলেই এবারে দেখবে, মুক্তা নদীর পাড়ে বসে আছে। অথবা কোনো ট্রেনের কামরায় উঠে মুক্তা তার সেই দূর সম্পর্কের দাদার সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে। সুজয় বিয়ে করার পরই টের পেয়েছিল, মুক্তাকে একা সামলানো দায়। সে যখন থাকে না তখন মুক্তা তার অবিশ্বাস্য যৌবন নিয়ে কি করবে। কিংবা এতদিন কি করেছে। তার দুই উরুর গভীরে এক অজ্ঞাত সমুদ্র বসবাস করে। সে ভেসে গিয়ে দেখেছে, ঝড়ের দরিয়ায় নিরুপায় জাহাজের মতোই তার যেন অস্তিত্ব। তবু কেন সে সমুদ্র সফর শেষ করে যখন গায়ে নাবিকের ঘ্রাণ নিয়ে তার নারীর কাছে যায়, সে মনে করে মুক্তা তার একার।

কিন্তু সে দূরবীনে মুক্তাকে—মাঝে মাঝে দেখে ফেলে। সমুদ্রে কয়েকবারই

দেখেছে। বিবস্ত্র নারী। মুক্তা দাঁড়িয়ে আছে কিংবা শুয়ে আছে উলঙ্গ হয়ে। কোনো নির্দিষ্ট পুরুষের ভূমিকা সেই দাবদাহে জ্বলছে না। অরণ্য এক, কিংবা গভীর অরণ্য, জ্বলছে, অথবা দাঁড়িয়ে আছে নিজের মতো আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। নারী এ-ভাবেই জীবনে চুপচাপ গাছের ছায়া হয়ে থাকে। পথিক বিশ্রাম নেয়। পথিকের জল কষ্ট সে দূর করে মাত্র।

এবারে মনে হয় দূরবীনটা চোখে রাখলে সাংঘাতিক সব ছবি দেখে ফেলবে।

এবং একবার মুক্তা তার বাক্স হাঁটকাতে গিয়ে দূরবীনটা পেয়ে গেছিল। আর দূরবীনে চোখ রেখে সে যা বলে গেল, সব তাজ্জব ঘটনা।

—তুমি জুয়ার রিঙে দাঁড়িয়ে আছ।

—কোথায়!

—কোথায় জানি না। ওর লাল নীল বল এগিয়ে দিচ্ছ।

—আরে কোথায় বলবে তো?

—জানি না। হাতের ইশারায় দরদাম করছ। সে তোমার ভাষা বোঝে না, তুমিও না। ডান হাতের পাঁচ আঙুলে কি দেখাচ্ছ! পরে দু-হাতের দশ আঙুল। নীল চোখ মেয়েটির, নীল, চুল। আপেলের মতো গায়ের রঙ। তুমি ওকে জাপটে ধরেছ। সে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে। পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসলে। ঠিক পার্কের পাশেই সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি।

—ধুস। বলে দূরবীনটা কেড়ে নিয়েছিল। এবং রাতে কেন মুক্তাকে গোপনে খুন করার চেষ্টায় উঠে বসেছিল জানে না। মিছে কথা নয়। বানানো নয়। হুবহু মিলে যাচ্ছে। সে বেহুঁশ তখন। এবং সব মনে পড়ে যেতেই সংকোচে বলেছিল, দূরবীনটার মাথা খারাপ আছে। তারপর সে ফের সঙ্গ দেবার আগে ওটা এমন জায়গায় লুকিয়ে ফেলেছিল যে মুক্তা খুঁজে বার করতে পারেনি। প্রায় সব ঘটনা দূরবীনের কাচে কি চালচিত্রের মতো ভেসে থাকে। সেবারই সে ভেবেছিল, কখনও ফের কার্ডিফে গেলে দূরবীনটা ফেরত দিয়ে দেবে। ফেলেও দিতে পারে। কিন্তু ভয় করে। যদি কিছু হয়। এবারে কার্ডিফ যাবার কথা।

জাহাজ বোঝাই হলেই সোজা কার্ডিফে জাহাজ পাড়ি দেবে। সে বিনয়কে বলল, তুই দূরবীনটা নিবি! ওটা চোখে দিলে, বন্দরে নামার আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। মনে মনে যা চাস তাই পাবি।

কী যে বলিস।

—সত্যি বলছি। সুজয় বেশ গম্ভীর গলায় বলল। তারপর কি ভেবে বলল, তুই নিয়েও নিতে পারিস। ফেলে দিতেও পারিস। আবার কি ভেবে বলল, না, না, ফেলে দিবি না। ফেরত দিবি।

বিনয় দূরবীনটা নিয়ে উপরে উঠে বসেছিল। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। ত্রিদিবও গেল দেখতে। অঞ্জন বলল, দে তো দেখি, কি এমন আছে, ব্যাটার মাথা খারাপ। বৌয়ের চিঠি না পেলে আরও মাথা খারাপ। মুখে যা আসে বলে!

তারা দেখেছে, গাছপালা, পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় ঘর বাড়ি। এ-ছাড়া নারী পুরুষ, বালক বালিকা, খেলার মাঠ। সাধারণত যা দেখা যায় তাই দেখেছে। আর কিছু না। তবু দূরবীনে চোখ রাখার মধ্যে বোধহয় কোনো নেশা থাকে। জাহাজ বয়াতে বাঁধা। ডাঙ্গায় নামতে পারছে না। তারা ফাঁক পেলেই এখন সুজয়ের দূরবীনটা নিয়ে বোট-ডেকে গিয়ে বসে থাকে। আশ্চর্য সুজয় কোনো আর আগ্রহ

দেখাচ্ছে না দূরবীনটা নিয়ে। তবে একদিন বিনয় হঠাৎ অবাক হয়ে গেল—দূরবীনের ভেতর দিয়ে বিশাল নদীর মোহনা দেখতে পেল। ঘোলা জল দেখতে পেল। অজস্র কুমীর ভেসে আছে দেখতে পেল। কোনো উপজাতি এলাকায় মানুষ কাঁচা মাংস পুড়িয়ে খাচ্ছে দেখতে পেল। গভীর অরণ্য, এবং এক গোপন শুঁড়িখানাও চোখের উপর ভেসে উঠল।

কিন্তু এ-সব তো দেখার কথা না। শুঁড়িখানা অবশ্য পাহাড়ের মাথায় থাকতেই পারে—কিন্তু নদীর মোহনা আসবে কি করে! সে দেখল, দেখে কিন্তু বলতে পারল না, সে আমাজন নদীর মোহনা দেখে ফেলেছে। সে বলতে পারল না, বিশাল ব্যাপ্ত দিগন্ত জুড়ে পাহাড় ভেঙে নদী নিচে নেমে আসছে। জলপ্রপাতে উড়ছে অজস্র অতিকায় পাখি—তারা কক্ কক্ করে ডাকছে—আর ছোঁ মেরে বড় বড় মাছ তুলে নিয়ে গভীর অরণ্যের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

আর একদিন সে দেখল, পাহাড়ের মাথায় এক নারী দাঁড়িয়ে আছে। ঢিল ছুঁড়ছে নিচে। ঢিলটা গড়িয়ে পড়ছে। পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে ঢিলটা ঠিক জাহাজের নিচে জলের মধ্যে টুপ করে ডুবে গেল।

আর এক বিকেলে দেখল—কোনো নারী, না সেই একই নারী এসে দাঁড়িয়েছে পাহাড়ের মাথায়। মুখ কিছুতেই স্পষ্ট নয়। শুধু সে তার জ্যাকেট খুলে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। লাল জ্যাকেট নিচে গড়িয়ে পড়ল না। গাছের ডালে আটকে থাকল। হাওয়ায় উড়তে থাকল।

একদিন দেখল, সে তার স্কার্ট খুলে উড়িয়ে দিচ্ছে। ওটা আরও উপরে ঝুলে আছে। যেন সে পুরুষের প্রতি কোনো প্রতিযোগিতা ছুঁড়ে দিয়েছে। বিনয় একবার ভাবল, সবাইকে বলে, আবার কি ভাবল কে জানে। নিজের মধ্যেই গোপন করে রাখল, নারীর এই প্রতিযোগিতার আহ্বানের কথা।

তবু যা হয়ে থাকে, কারণ ভেবেছে, প্রতিযোগিতার আহ্বানে সে সাড়া দেবেই। কিন্তু অবিশ্বাস্য এই প্রতিযোগিতার কথা বন্ধুদের বলবে কিনা ঠিক করতে পারছে না। এই খাঁড়ি নদীতে হাঙর এবং কুমীরের উপদ্রব আছে। একদিন তারা ছোটোমতো একটা কুমীরের বাচ্চাকে রোদ পোহাতেও দেখেছে। খাঁড়িতে যে বিশেষ নৌকা কিংবা অন্য জলযান কিংবা সাঁতার কাটা—কত কিছুই তো হতে পারে—এমন সুন্দর সমুদ্রের খাঁড়িতে কেউ সাঁতার কাটে না ভাবতেই তারা অবাক হয়েছিল- রে বুঝেছে এই খাঁড়ির মধ্যে নামা খুবই বিপজ্জনক খেলা।

কিন্তু সে কী করবে। সে-ও এক বিপজ্জনক খেলার শিকার।

নারী একদিন তার জাঙিয়া খুলে ফেলল। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই নারী পর পর একই সংকেত পাঠাচ্ছে। তারও কি আছে আশ্চর্য দূরবীন। যা চোখে দিয়ে বুঝতে পারছে, জাহাজের আগিলে যে বসে আছে সে আসলে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে, সে কি চায়! নারী টের পেয়ে গেছে।

একদিন সে সুজয়কে বলল, এই দেখ তো, উপরে, ঐ যে লালমতো বড় একটা পাথর আছে, আরে ওদিকে না—ঐ যে দেখছিস না। খাড়া পাহাড়, তার নিচে জলপাই রঙের একটা জঙ্গল, কোমর সমান উঁচু ঝোপ জঙ্গল, মনে হবে এক পাল হলুদ রঙের ভেড়া ঘাস খাচ্ছে—দেখতে পাচ্ছিস?

—হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি।

—গাছটায় জ্যাকেট উড়ছে লাল মতো।

—কোথায়!

—দেখ না। ভাল করে দেখ।

—না আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

—তুমি শালা কিছু দেখতে পাবে কিছু দেখতে পাবে না। সর। বলে কনুইতে ঠেলা মেরে এগিয়ে গেল। দূরবীনে সে দেখল—ঐ তো সেই লাল জ্যাকেট, নীল রঙের স্কার্ট, সাদা রঙের জাঙিয়া গাছে ঝোপে জঙ্গলে অটকে আছে। সুজয় দেখতে পাচ্ছে না, সে পাচ্ছে।

আশ্চর্য!

বিনয় বিকেল হলেই সাফ সুতরো হয়ে ফরোয়ার্ড-পিকে গিয়ে বসে থাকে। জাহাজ বন্দরে ধরলে কিছু মেরামতির কাজ থাকে। এ-ছাড়া কয়লার বাংকারেও কাজ থাকে—বিশেষ করে ক্রস বাংকারে। কয়লা লেবেল করার কাজ, স্মোক বক্স পরিষ্কার করার কাজ, এবং এমন নানাবিধ কাজ যেমন ইঞ্জিন রুমের রেলিং, পাটাতন শিরিষ কাগজ মেরে, ঝকঝকে করে রাখতে হয়। তেল কালিতে নীল প্যান্ট শার্ট ধূসর হয়ে ওঠে। বিকেলে কাজ সেরে আফটার-পিকে উঠে বিনয় এক দণ্ড দেরি করে না। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আজ আবার কি সংকেত পাঠাবে কে জানে! সে সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে নিচে নেমে যায়। তোয়ালে সাবান বালতি মগ নিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকে যায়। রা রা করে গান গায়। এবং নিচে নেমে বাবু সেজে দূরবীনটা গোপনে পকেটে নিয়ে উঠে যাবার সময় অর্ডার—এই ত্রিদিব, আমার চা-টা দিয়ে আসবি।

ত্রিদিব দিয়েও আসে। কারণ বিনয় এ-সময় জাহাজের সামান্য ফায়ারম্যান নিজেকে ভাবতে পারে না। মেজাজ মর্জি কাপ্তানের মতো একেবারে। ত্রিদিব অঞ্জন শুনেই বলবে, যে আজ্ঞে। আপনি যান। দিয়ে আসব। কারণ তারা জানে, ঐ সামান্য এক কাপ চা ফরোযার্ড-পিকে দিয়ে এলে, সকালের দিকে আর কাউকে না উঠলেও চলবে। বিনয় তখন, চা করে, কাপ সাজিয়ে সবাইকে ডেকে তুলবে, কিংবা বারটার মেসরুমে থালা ধুয়ে ভাত ডাল সব্জি সাজিয়ে বসে থাকবে—মাত্র এক কাপ চা দিয়ে আসতে পারলে গোলামের মতো বিনয় সকালে দুপুরে সবার ফাইফরমাস খাটে।

বিনয় ফরোয়ার্ড পিকে উঠে রুমাল দিয়ে পাটাতন সাফ করে নিল। সকাল থেকে জাহাজে মাল বোঝাই হচ্ছে। ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়েছে। ফল্কায় সুট থেকে গল গল করে লাল পাথর নেমে আসছে। সারা ডেক ধুলো বালিতে ধূসর হয়ে উঠছে। হাওয়ায় উড়ছে তেমনি সেই দূরের জ্যাকেট। এবং বিনয় আজ এ কি দেখছে—একেবারে নিবাররণ নারী।

বিনয় কেমন পাগলের মতো উঠে দাঁড়াল। নিচে দেখল দু-একটা বোট লেগে আছে, কিনার থেকে শাকসব্জি মাছ নিয়ে আসছে বিক্রি করার জন্য। সবাই ল্যাটিন আমেরিকান—নাক থ্যাবড়া, চুল কোঁকড়ানো, তামাটে রঙ মানুষগুলির এবং সেই নারী যে অপেক্ষা করছে উপরে ঠোঁট পুরু, নাক থ্যাবড়া চুল কোঁকড়ানো—আর স্তন এবং জংঘাস্থলে নীল মাছি—সে দেখেছে নীল মাছিরা ওড়াউড়ি করছে। এবং এইসব নীল মাছিরা তাকে যে ভিতরে ভিতর পাগল করে দিয়েছে বোঝা যায়—কারণ, সে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে বোটে নেমে যাচ্ছে। টিণ্ডাল বলছে, এই তুই একা কোথায় যাচ্ছিস! আরে তুই যাবি কোথা! দূরবীনটা দিয়ে যা। ওটা নিবি না।

সারেঙও বলল, আরে তুই ফিরবি কি করে। কাছে ভিতে সব জঙ্গল। খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠা যায় না।

—আসছি চাচা, বেশি দেরি করব না।

ত্রিদিব বলল, কোথায় যাচ্ছে!

ওরা রেলিং-এ ঝুঁকে দেখল, সে বোট থেকে দূরে লাফিয়ে নেমে গেল। ইশারায় কি বলতেই বোট লাগিয়ে দিয়েছে খাড়া পাহাড়ের নিচে। বিনয় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে উঠে যাবার চেষ্টা করছে। লোকগুলি কিছুক্ষণ দেখল—মাথা খারাপ আছে ভাবতে পারে। রাতে ফেরার বোট পাবে কোথায়। সকালে জাহাজ ছেড়ে দেবে।

ত্রিদিব বলল, কেন যে তুমি দূরবীনটা দিলে বুঝি না দাদা! এখন বোঝো!

সুজয় বলল, চল্ তো, বেটাকে ধরে আনি।

এবং সুজয়ের অনুমান দূরবীনের ভূতুড়ে দৃশ্য বেটার মাথা খারাপ করে দিতে পারে। সে নিজেও একবার মরতে মরতে বেঁচে গেছে। সে তার স্ত্রীকে খুন করবে ভেবেছিল। নেশা। নেশা মানুষকে পাগল করে দিতেই পারে। এবারে জাহাজ কার্ডিফ যাচ্ছে—দূরবীনটা ভেবেছে দোকানিকে দিয়ে দেবে। যা ফেরত দেয় তাই নেবে। এটা সঙ্গে রেখে জীবন বিপন্ন করার কোনো মানে হয় না।

ওরা দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল। বোটের লোকজন এক বর্ণ ইংরাজি বোঝে না। ইশারায় সব বলতে হচ্ছে। সারেঙ উপর থেকে বলল, কোথায় যাচ্ছিস তোরা?

—বেটাকে ধরে আনতে।

কিনারায় নেমে ওরা হতবাক। একেবারে এত খাড়া পাহাড় যে কিছুটা উঠেই মাথা পাক খেতে শুরু করেছে। ত্রিদিব বলল, আমার দ্বারা হবে না। সে গাছের গুঁড়ি ধরে খুব সতর্ক পায়ে নিচে নেমে এল।

ত্রিবিদ জোরে ডাকল, এই বিনয়...বি—ন—য়।

পাহাড়ে শুধু প্রতিধ্বনি ওঠে...বি—ন—য়, বি—ন—য়।

এমন কি ঢিল ছুঁড়লেও পাথরে, প্রতিধ্বনি ওঠে। আশ্চর্য প্রতিধ্বনি।

সাঁঝ লেগে গেল। অনেক উপরে শহর—ওখানে ওঠার এদিক থেকে কোনো রাস্তাই নেই—পাঁচ সাত ক্রোশ দূর থেকে লোকজন সব বোটে এসেছে। তারা কাজ-কর্ম করে বোটেই ফিরে যাবে। পাহাড়ের ভেতর থেকে জাহাজের উপর সার্চ-লাইটের মতো আলো। এখন বিনয় কি করে যে ফিরবে। কিংবা গেল কোথায়! কতটা উঠতে পারবে! যতই সাহসী হোক, নিচের দিকে তাকালেই মাথা ঘুরে যাবে। কিংবা গাছের গুঁড়ি আলগা হয়ে গেলে নিচে গড়িয়ে পড়বে—কি যে করা! সুজয়ের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। পাহাড় ক্রমে ধূসর হয়ে উঠছে। জাহাজ থেকে পাহাড়ের মাথায় ঘর বাড়ি দেখা গেলেও, কিনার থেকে তারা কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সামনের গাছপালা, ঝোপজঙ্গল সব আড়াল করে রেখেছে।

বোটের মাঝিরাও আর থাকতে রাজি না। তাবা ফিরে যাবে। অগত্যা কি করা, নিরুপায় তিন নাবিকের জাহাজে ফিরে আসা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না।

সারা রাত তারা জেগে থাকল। ডেকের রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকল। মাল বোঝাই শেষ। ধুলোবালির মধ্যেই দাঁড়িয়ে দেখল, কেউ জাহাজে উঠে আসে কি না। সারেঙকে খবর দিল। সেকেন্ড অফিসারকে। কিন্তু কোথায় খোঁজ করা হবে, কে খুঁজবে! যে যার দায়িত্বে জাহাজে আসে! সকালে কাপ্তান লগ বুকে লিখলেন, একজন জাহাজি নিখোঁজ। কিনার থেকে ফিরে আসেনি। জাহাজ ছাড়ার সময় ত্রিদিবের চোখ সজল হয়ে উঠল। কাপ্তান ওদের ডেকে পাঠিয়েছেন। লগ বুকে

সাথী হিসাবে ওদের সই করতে হবে। কটায় গেছে, কিসে গেছে। স্থানীয় থানায় বেতার সংকেতে একজন জাহাজি এবং তার নাম পরিচয়, আকৃতি, পরনে কি ছিল, কোন দেশের—সব বিবরণ দিয়ে ডাইরি করে রাখা হল।

আর তখন দেখা যাচ্ছে সুজয় ডেকে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো দূরবীনে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। যদি পাহাড়ের মাথায় কেউ হাত তুলে দেয়, আমি আছি দাদা, বেঁচে আছি।

কেউ কোথাও থেকে বেঁচে থাকার সংকেত পাঠাল না।

—হঠাৎ মনে হল, দূরবীনের কাচ স্থির হয়ে গেছে।

মানুষের মৃতদেহ!

—মরে পড়ে আছে।

—অঞ্জন, অঞ্জন। সে দৌড়ে এল ডেক ধরে। অঞ্জন ইঞ্জিনরুমে। সারেঙ বলল, টিণ্ডাল কি হয়েছে। এ-ভাবে ছুটছ কেন?

—দেখুন, দেখুন। হাঁকডাকে ত্রিদিব উপরে উঠে এসেছে। সে বলল, কৈ দেখি! সে দেখল, পাহাড়ে উঠতে গিয়ে গড়িয়ে পড়লে যে-ভাবে কোনো মানুষ, পাথরে মরে পড়ে থাকে, তেমনি কোনো মানুষের ছবি। জাহাজ ভেসে যাচ্ছে। সে বলল, সারেঙসাব দেখুন। সারেঙসাব বললেন, কৈ কোথায়!

কেউ বিস্ময়কর কিছু দেখতে পেল না। কেবল, গাছপালা, পাথর আর পাহাড়। শুধু ওরা তিনজন দেখল, কেউ যেন পাহাড়ে উঠতে গিয়ে পড়ে গেছে। আর উঠতে পারেনি। জাহাজ ভেসে যাচ্ছে। কোনো এক মধ্যরাতে দেখা গেল গভীর সমুদ্রে সুজয় দাঁড়িয়ে আছে। সে দূরবীনটা সমুদ্রের জলে ফেলে দিচ্ছে।

# বর্ণপরিচয়

লিয়ানার বাবা আরিতুসের ঘুম ভাঙে খুব সকালে। এটা তার অভ্যাস। সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠতে না পারলেই তার খুব খারাপ লাগে। শুধু যে কাজ-কামে দেরি হয়ে যায় বলে নয়, এমনিতেই স্বভাব তার আগে ওঠার। আসলে সূর্য ওঠার আগে এইসব দ্বীপ পাহাড় সমুদ্রের কোনো গভীর সৌন্দর্য এবং বিষণ্ণতা সে তখন আশ্চর্যভাবে টের পায়। এটা তার নেশা।

যেমন সে খুব সকালে পাহাড়ের টিলায় উঠে গেলে দেখতে পায় দূর সমুদ্রে কুয়াশার মতো মেঘ ঝুলে আছে। অথবা গভীর নীল আকাশের নিচে শুকতারাটি জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। একটি মাত্র তারা বিশাল সমুদ্র পার হয়ে আকাশের গায়ে কী যে রহস্যময়তা সৃষ্টি করে ফেলে—যতক্ষণ না নক্ষত্রটি হারিয়ে যায়, দিনের আলো ফুটে ওঠে সে টিলায় বসে থাকে কোনো অবোধ বালকের মতো।

দূরবর্তী কোনো দ্বীপে তার প্রিয় সেই নারী চলে গেছে।

কোনোদিন দেখতে পায় সমুদ্র থেকে লাল সূর্যটা যেন লাফিয়ে উঠে যায় আকাশে। অ্যালবাট্রস পাখিরা উড়ে যায় সাদা ডানা মেলে। সে শুধু দেখে।

আবার কোনোদিন গভীর কুয়াশার ভিতর সে হেঁটে যায়। দ্বীপের বাড়িঘর টিলা সব কেমন যাদুবলে অদৃশ্য। নারকেল গাছের ছায়ায় সে চুপচাপ বসে থাকে, কুয়াশা কেটে গেলে টিলার উপর বসে ভোরের সমুদ্র দেখবে বলে। কখনও ঝড়ের হাওয়া বয়ে যায় দ্বীপটির উপর দিয়ে। বৃষ্টিপাত হয়। সেই ঝড়ো হাওয়া কিংবা বৃষ্টির মধ্যেও আরিতুস ভালবাসে সকালের সূর্য ওঠার আগে টিলার মাথায় উঠে যেতে।

অথচ আজ তার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেল। সে টেরই পায়নি সূর্য কখন জেটির ও-পাশে উঠে গেছে। কখন নিচের রাস্তায় মাহিমের ঘোড়াটা পাথরের সবুজ ঘাস, সাদা ফুল চেটে খাবার জন্য লাফিয়ে লাফিয়ে বনজঙ্গল পার হয়ে যাচ্ছে।

আসলে ভোররাতের দিকে আজ টের পেয়েছিল, কেউ কাঁদে।

কে কাঁদে সে জানে।

কারণ সেও ভিতরে ভিতরে কোনো গভীর ভালবাসায় চোখ বুজে থাকলে টের পায় তার দু-গাল বেয়ে গোপনে অশ্রুপাত হচ্ছে। সে গোপনে অশ্রুপাত করে। যেন লিয়ানা টের না পায়, বাবা কাঁদছে। সে তো লিয়ানাকে প্রবোধ দিচ্ছে, সান্ত্বনা দিচ্ছে, হাতে টাকা-পয়সা হলেই তারা দুজন সেই দ্বীপে চলে যাবে। জাহাজে পাঁচ-সাতদিন লাগে। কোনো যাত্রীজাহাজ এখানে আসে না। মালবাহী জাহাজে যাওয়া যায়। পাঁচ-সাতটা কেবিন খালি পড়ে থাকে সব জাহাজেই। তবে যে-জাহাজ ফিজি অঞ্চলে যাবার কথা কেবলমাত্র সেই জাহাজেই তারা যেতে পারবে।

আজ হঠাৎ মাঝরাতে লিয়ানা কান্না জুড়ে দিয়েছিল। তার টিলার উপর জাম-পাতার কুটিরে ঝড়-বাদলা কিংবা কুয়াশা না থাকলে নক্ষত্রের কিংবা চাঁদের আলো ঢুকে যায়। চোখ মেলে তাকালে অস্পষ্ট আলোর আভাসে দেখা যায় সব কিছু। দু-পাশে দুটো ঝুলন-খাটিয়া। দড়ি দিয়ে খাটিয়া দুটো চালের কাঠের সঙ্গে বাঁধা। বসে থাকলে ঝোলে, সমুদ্রের হাওয়ায় দোলে।

সে মেয়ের শিয়রে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বালিশে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আরিতুস কিছু বলতে পারে না। সে জানে, মা'র কথা মনে পড়লেই লিয়ানা কেমন স্থির থাকতে পারে না। দশ-বারো বছরের বালিকার কান্না এমনিতেই পীড়াদায়ক। আর সে-কান্না যদি মা'র কথা মনে পড়লে হয় তবে অসীম কষ্ট। বুকটা ভার হয়ে যায়। চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে।

সে শিয়রে গিয়ে মেয়ের মাথায় হাত রাখতেই লিয়ানা যেন আরও ভেঙে পড়েছিল। হাউ হাউ করে কাঁদছিল।—তুমি মিছে কথা বলছ। তুমি আমাকে কোনোদিন আর মায়ের কাছে নিয়ে যেতে পারবে না। আমি বুঝি না ভাব!

আরিতুস জানে, লিয়ানা একবর্ণ মিছে কথা বলছে না। সে ফসফেট খাদের সামান্য একজন শ্রমিক। সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়েও সে সমুদ্রযাত্রার পয়সাকড়ি জমাতে পারবে না।

আরিতুস তবু নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়েছে লিয়ানাকে।

যেমন বলেছে, সকালে উঠে লিয়ানাকে আজ বাজারের দিকে নিয়ে যাবে। তাকে নতুন ফ্রক কিনে দেবে।

যেমন বলেছে, টিলার মাথায় নারকেল পাড়তে গেলেও একা যাবে না। সঙ্গে লিয়ানা থাকবে। কী মজা না হবে, উঁচু-নিচু রাস্তা খোয়াই ধরে দু'জনে লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড়ের কোনো টিলায় উঠে যাবে। যদি মাহিমের ঘোড়াটা রাস্তায় থাকে তবে লিয়ানা ঘোড়ায় চড়েও উপরে উঠতে পারবে।

লিয়ানা কোনো কথাই শোনেনি। কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

শেষে আরিতুস না পেরে বলেছিল, ঠিক আছে আজ আর কাজে যাব না। সকালেই আমরা ডিঙি ভাসিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাব। যাবি দেখবি কী ঢেউ! কী সাদা ফেনা! তুই হালে বসে থাকবি। আমি সব শিখিয়ে দেব।

—সত্যি নিয়ে যাবে?

—হ্যাঁ, বলছি তো।

—না, তুমি মিছে কথা বলছ।

—আরে না না, যাবি। সঙ্গে যাবি। না হয় আজ আমরা সারাটা দিন সমুদ্রেই ভেসে থাকব। খাবার করে নেব। চিংড়ি মাছ পোড়া, সরষে বাটা আর ভাত। কী মজা হবে বল।

তারপরই হতাশ গলায় লিয়ানা কেমন বলে ফেলল, আমি সাঁতার জানি না যে। সাঁতার না জানলে যাব কী করে?

এটা ঠিক, লিয়ানা জলে নামতে বড় ভয় পায়। বাবা তাকে বালিয়াড়িতে কতদিন নিয়ে গেছে। হাত ধরে নিয়ে গেছে জলে। কিন্তু হাঁটুজলে নেমেই পালিয়েছে।

লিয়ানা জলে নামতে চায় না।

এ সমুদ্রে প্রায় বছরই কেউ নিখোঁজ হয়ে যায়। এমন কি বাবা কাজ থেকে ফিরে ডিঙি ভাসিয়ে দিলে সে জেটির পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। মহিম দাদুর ঘরে গিয়ে বসে

থাকে। তখন তার টিলার উপর জাম-পাতার ঘরে একা বসে থাকতেও খারাপ লাগে। বাবা গেছে সমুদ্রে মাছ ধরতে। না ফেরা পর্যন্ত দুশ্চিন্তা থাকে। নৌকায় থাকে লাল লম্ফ। তার আলো অনেক দূর থেকেও দেখা যায়। মাঝে মাঝে আলোর সংকেত পাঠায় বাবা। রাত হয়ে গেলে আলোর সংকেতে টের পায় বাবা তার ফিরছে। সে তখন দৌড়াতে থাকে। কী মাছ পেল! এক রাতে তো বাবা ফিরেই এল না! ফিরে যে রোজই আসে তা না। তবে দূর সমুদ্রে গেলে বলে যায়। বলে যায় ফিরতে দেরি হবে। ইস সেদিন কী কান্নাকাটি। মাহিম দাদু বলেছে, কাঁদিস না। বড় মাছ গেঁথে গেলে হয়। আমার তো একবার তিনদিন তিনরাত লেগে গেছিল মাছটাকে কব্জা করতে। ব্যাটা কিছুতেই জলে ভাসবে না। আরে আমার নাম মাহিম, আমি ঘোড়ায় চড়ে ডাব বিক্রি করে খাই, তুই সামান্য সীস জলের নিচে, কোথায় আমাকে কতদূর আর নিয়ে যেতে পারিস।

সত্যি বাবা ফিরে এল পরদিন সকালে। ক্লান্ত। ডিঙিটা উপরে তুলে, শুধু লিয়ানাকে বলেছিল, বেটা হারমাদ। শেষে ডিঙি উল্টে দিয়ে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। কী আর করা! জলের মাছ, জলেই থাক। বলেই টলতে টলতে উঠে বাজারের রাস্তা ধরেছিল। কত লোক, কত প্রশ্ন, বাবা কারো কথার জবাব দেয়নি। কতক্ষণে গিয়ে টিলার জাম-পাতার কুটিরে বাবার ঝুলনখাটে গড়িয়ে পড়বে!

লিয়ানা হতাশ গলায় বলেছিল, আমি কবে সাঁতার শিখব!

—সে তো তোর ইচ্ছে। তোকে তো জলেই নামানো যায় না।

—আমি আজ সাঁতার শিখতে যাব। কেমন!

—যাবি। ঠিক আছে যাবি। আরিতুস জানে সকালে কোনো কথাই লিয়ানার মনে থাকবে না। সে তখন বাবার জন্য শাক তুলে আনবে পাহাড়ের বনজংগল থেকে। বাবা কী খাবে না খাবে সেই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। দৌড়ে নামবে টিলা থেকে। জল নিয়ে আসবে নিচের কল থেকে। তারপর বাবা খদে চলে গেলে সে এই ঘরে কিংবা সাগুনের কাছে চলে যাবে। লেসের কাজ শিখছে। লেসের সুন্দর সুন্দর কারুকাজ সে নিবিষ্ট মনে দেখতে ভালবাসে। শিখতে ভালবাসে।

আরিতুসের শেষরাতের দিকে ঘুম আসছিল না। মেয়েটা আবার শুয়ে পড়েছে। সে পাশের মোড়ায় বসে ঝুলন খাটিয়ায় দোল দিতেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল লিয়ানা। সেও নিজের খাটে শুয়ে চোখ বুজেছিল। আর একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। সারা দিন খাদে অমানুষিক খাটুনি। বড় বড় পিপের মধ্যে ফসফেট ভরে নিচ থেকে তাকে হারিয়া হাপিজ করতে হয়। যখন খাদ থেকে উঠে আসে তাকে চেনা যায় না। ফসফেটের হলুদ রঙের গুঁড়ো জামা প্যান্ট ঝাড়লে বাতাসে উড়তে থাকে। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল থাকে। মাথার টুপি ঝেড়ে সোজা সে সমুদ্রে যায় স্নান করতে। তারপর ঘরে ফিরে এক বালতি মিষ্টি জলে গা ধুয়ে নেয়।

আর একটু ঘুমিয়ে নিলে ভাল হত। তার হাই উঠছে। আর এ-সময় চারপাশে শুধু সমুদ্রগর্জন। দিনরাত এই পাহাড়টায় এসে সমুদ্র আছড়ে পড়ছে। সমুদ্র গর্জনের মধ্যে থাকে আশ্চর্য এক নেশা। তার ঘুম না এলে নিবিষ্ট মনে সেই গর্জন শুনলে কখন ঘুমিয়ে পড়ে টের পায় না। আজও সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এবং ঘুম ভাঙলে দেখল, বেশ বেলা হয়ে গেছে। রোদ এসে জানালায় পড়েছে। সামনের সবুজ লন, এটা সে অনেক কষ্টে দিনরাত খেটে, খুঁটি পুঁতে পাহাড় থেকে

নুড়িপাথর এনে সামনের কিছুটা জায়গা উঠোনের মতো করে নিয়েছে। এখন সেখানে সবুজ ঘাস গজিয়েছে। শীতকাল এলে সবুজ ঘাসে সুন্দর সব সাদা ফুল ফুটে থাকে।

এত দেরি করে ঘুম থেকে ওঠায় মনটা খচখচ করছিল আরিতুসের। আজ টিলায় যেতে পারল না। সমুদ্রে কোনো নক্ষত্র টুপ করে ডুবে যেতে দেখল না, অথবা কোনো পালের ডিঙি দ্বীপে ফিরে আসছে তার দৃশ্য, অথবা চারপাশের গভীর বনজঙ্গলে শিশির পড়ে থাকে, ঘাসে শিশির পড়ে থাকে। সূর্যদয়ের আগে ঘাসের শিশির মাড়িয়ে হেঁটে যাওয়ার আনন্দই আলাদা।

দ্বীপের লোকজন সব যে-যার কাজে বের হয়ে যাচ্ছে। আজ রবিবার। ছুটির দিন, তাই রক্ষে। দূরে সে দেখল খাদের চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে না। সাইরেন বাজছে না। দ্বীপটার ওদিকে আছে সমতলভূমি। সেখানে খাদের বড়কর্তাদের ঘরবাড়ি, শহর, রাতে বিজলি বাতি পর্যন্ত জ্বলে।

সকালেই দেখতে পায় কোনো কোনো জাহাজ দূরের বয়ায় বাঁধা। কোনো জাহাজ জেটিতে। একটাই জেটি। জাহাজ ফসফেটে ভর্তি হলে চলে যায়। বয়ায় বাঁধা জাহাজটা তখন জেটিতে এসে লাগে। সিজন টাইমে, তিন-চারটা জাহাজও ভিড়ে থাকে। এখন ঠিক সিজন টাইম নয়। ঝড়-বাদলার দিন। ফসফেটের খাদে এত জল জমে থাকে, জল সরিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়াই কঠিন।

ছুটির দিনে আরিতুস সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। সকাল সকাল বের হয়ে পড়ে। তার আগে বাপ-বেটিতে হাতের কাজ সব সেরে ফেলে। কিন্তু আজ ঘুম থেকে উঠেই দেখল, লিয়ানা, দরজায় চুপচাপ বসে আছে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। লিয়ানা মাঝে মা-র কথা ভুলেই গেছিল। কিন্তু আবার কেন যে তার মা-র জন্য এত মন খারাপ বুঝে উঠতে পারছে না। অবশ্য শীতকাল এলেই এটা হয়। কারণ এক শীতকালের সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেছিল, তার মা ঘরে নেই।

এক কথা, মা কোথায়।

আরিতুস ঝুলেন খাটে চোখ বুজে শুয়েছিল। কোনো জবাব দেয়নি।

—আমার মা কোথায় গেল!

আরিতুস বলেছিল, তোমার মা কাকাতিয়া দ্বীপে গেছে বেড়াতে।

—কেন বেড়াতে গেল!

আরিতুস কি জবাব দেবে ভেবে পায়নি।

—আমাকে নিয়ে গেল না কেন? আমি মা-র কাছে যাব।

—যাবে। বড় হও। তোমাকে নিয়ে যাব।

—আমি কবে বড় হব?

সেই তো কবে বড় হবে, আরিতুস কীভাবে বলতে পাবে! আর সেই অনিশ্চিত বড় হওয়ার দিন আদৌ লিয়ানার জীবনে আর আসবে কি না সে জানত না। সে তার মেয়ের সামনে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করত। যেন এটা এমন কোনো গুরুত্ব দেবার মতো বিষয় নয়।। বেড়াতে যেতেই পারে। এক জায়গায় কেউ বন্দী হয়ে থাকতে চায় না। সে গোপনে যে কষ্ট এবং হতাশা পুষে রেখেছিল, লিয়ানাকে তা কখনও বুঝতে দেয়নি।

আজও বলল, এই রে আবার চুপচাপ বসে থাকলি! চিনি আছে! চা করছি। খা।

সে নিজেই খড়কুটো জেবলে চা বানায়। নারকেলের সেদ্ধ মালাই, দুধ চিনি তেজপাতা, আখরুট বাদাম এবং আনারস দিয়ে তৈরি খাবার কৌটো থেকে বের করে মাটির পাত্রে ঢেলে লিয়ানাকে দেয়। সে খায়। খেতে খেতে দুজনে গল্প শুরু করে দেয়।

—কী রে একটা জাহাজও আসেনি!

—তুমি যে বাবা বলেছিলে ক্ল্যান লাইনের জাহাজ আসবে।

—আসবে, ঠিক আসবে।

কারণ আরিতুস সময় পেলেই তার পূর্বপুরুষের দেশ, সেটা কোথায়, কারা সে জাহাজে আসে তার গল্প করত। ক্ল্যান লাইন, ব্যাংক লাইন, ব্রুক লাইনের জাহাজ জেটিতে এসে ভিড়লেই আরিতুসের মন প্রসন্ন হয়ে যায়। লিয়না এটা অনেকবার টের পেয়েছে।

## ॥দুই ॥

সুদূর ফিজি থেকে এসেছিল ইলিয়া। ইলিয়া আরিতুসকে বলত, তার পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষের মানুষ ছিল।

আরিতুস বলত, আমার ঠাকুরদার বাপের ঠাকুরদা এসেছিল বাংলাদেশ থেকে। ঠিক এই দ্বীপটার মতোই সেখানে আম-জামের গাছ আছে শুনেছি। বর্ষা-শীত-বসন্ত-গ্রীষ্ম সব ঋতুই দ্বীপটার মতো।

অবশ্য আরিতুস বাঙালী নাবিক এলেই বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলে। আসলে সে যখন সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ফেরে তখন তার একমাত্র লক্ষ্য সিটি কিংবা ক্ল্যান লাইনের জাহাজ এল কি না। চিমনি দেখে কোন লাইনের জাহাজ সে চিনতে পারে। এ-সবও তার নাবিকদের কাছ থেকেই শেখা।

আরিতুস ইলিয়াকে বলত, আমার ঠাকুরদার বাবার ঠাকুরদার ওসানিকা দ্বীপে কাঠের ব্যবসা ছিল।

আসলে এই অঞ্চলে অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপ। অধিকাংশ দ্বীপেই ফসফেট পাওয়া যায়। এ-জন্য দ্বীপগুলিতে মানুষের বসবাস গড়ে উঠেছে। যেমন এই নেরু দ্বীপটায় পঞ্চাশ ষাট বছর আগে কোনো মানুষেরই বাস ছিল না। ব্রিটিশ ফসফেট কোম্পানি খাদের কাজে, বাড়িঘর বানাবার কাজে দূর ফিজি কিংবা ওসানিকা দ্বীপ থেকে মানুষজন আমদানি করেছে। তারাই এখন দ্বীপের বাসিন্দা। দ্বীপটা নিয়ে তাদের গর্বেরও শেষ নেই।

আরিতুস জানে না, তার পূর্বপুরুষ কি ভাষায় কথা বলত। তবে বাঙালী নাবিকদের কাছে শুনেছে, ভাষাটার নাম বাংলা ভাষা। সে দুটো একটা কাজ চালাবার মতো বাংলা ভাষা জেনে নিয়েছে। বাঙালী নাবিক জানতে পারলেই বলবে, নমস্কার। এবং হাত জোড় করে সে ঠিক বাঙালী কায়দায় তার দেশের মানুষদের স্বাগত জানায়। তারপর বলবে, ভাল আছেন! আরও সে দুটো একটা কথা জেনে নিয়েছিল, জাহাজ কোথায় যাবে? কতদিন আছেন। এমন সব কথা আর কি।

আরিতুস নিজে ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে কথা বলে। কাজ চালিয়ে নেবার

মতো— আসলে তার ভাষা যে কী সে নিজেও ঠিক জানে না। মাউরি ভাষায় সে ভাল কথা বলতে পারে— কারণ সে একজন মাউরি উপজাতির বর্তমান বংশধর। তার ঠাকুরদা বিয়ে করেছিল মাউরি মেয়েকে। তার বাবাও। ফলে রক্তে নানা দেশের নানা উপজাতিব রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে তার। কারণ সে তো জানে না তার ঠাকুরদার বাবার ঠাকুরদা কাকে বিয়ে করেছিল।

আরিতুস ঐ দুটো একটা বাংলা ছাড়া কিছুই জানে না। তার এটা একটা দুঃখ। সে একবার একজন বাঙালী নাবিককে বিনে পয়সায় মাছ দিত— শুধু এই কারণে তাকে সে বলেছিল, বাংলা ভাষা শেখাবে। সে আবার যখন এ-বন্দরে আসবে তখন বর্ণপরিচয় নামে একটা বই নিয়েও আসবে বলেছিল। বর্ণপরিচয়! এই নামটা সে বার বার মুখস্থ করত তখন। অবশ্য উচ্চারণ করতে পারত না ঠিকঠাক। অর্ন অরিচায় হয়ে যেত উচ্চারণে।

আসলে তার ভাষায় "ব"-এর কোনো ব্যবহার নেই। নাবিকটি অবাক হয়ে গিয়ে বলেছিল, আরে অর্ন-অরিচায় নয়। বর্ণপরিচয়। তারপর ইংরাজিতে লিখে দিয়েছিল শব্দটা। সে এটা নিয়ে বার বার মুখস্থ করত। ইংরাজি বর্ণমালাও সে জানে না। এ-ব্যাপারে তাকে খুব সাহায্য করত মাহিম জ্যাঠা। মাহিম জ্যাঠাই এখানে একটা পাঠশালা খুলেছে সেই কবে থেকে। সকালে ঘোড়ার পিঠে ডাব বিক্রি করতে বের হয়। বিকালে পাঠশালা। তার কাছ থেকেই সে "ব"-এর উচ্চারণ শিখেছে। সে এখন বাংলাদেশ বলতে পারে। সে এখন বর্ণপরিচয় বলতে পারে। আগে সে বাংলাদেশকে বলত, "আংলাদেশ"। বাট-কে বলত আট। তর এমনই উচ্চারণ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশের সেই নাবিক বন্ধুটি কতদিন হয়ে গেল এ-বন্দরে আর এলই না, পরিচিত জাহাজ দেখলেই সে এখনও তাকে খুঁজতে যায়।

ইলিয়ার চেয়েও বেশি আগ্রহ যেন তার সেই নাবিকটির জন্য। তরপবই ওর মনে হয়, সে নিজের সঙ্গে ছলনা করছে। কত বাতে সে উঠোনে এসে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িযে থাকে। এই বাড়িঘরের সঙ্গে ইলিয়ার স্মৃতি বড় বেশি জড়িত। সামনের কদমফুল গাছটা ইলিয়া লাগিয়েছিল। কত বড় হয়ে গেছে গাছটা। বর্ষাকলে ঝেপে ফুল আসে। এত ফুল যে তখন সবুজ পাতা পর্যন্ত আড়ালে পড়ে যায়। যেন গাছটা সাদা হলুদ লাল কাগজের ছোট ছোট বলের থোকা নিয়ে ঝুলছে।

ইলিয়া একটু একটু হিন্দি বলতে পারত। কারণ হিন্দি ভাষাটা ভাঙা ভঙা ভাবে এমন মধুর শোনাত ইলিয়ার মুখে যে প্রথমেই কেমন মোহের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল আরিতুস। ইলিয়া বলত, এটা ভারতবর্ষের ভাষা। আমার সেই পূর্ব-জন্মের লেকেরা এ-ভাষার কথা বলত। ইলিয়া এসেছিল ফিজি দ্বীপ থেকে। সেখানে ভাষাটার কতটা চল আছে জনে না। তবে ইলিয়ার কাছ থেকে ভাঙা ভাঙা হিন্দি শুনে বলতে পারত, বহুত আচ্ছা। খুবসুরত আদমি। তাকে দেখে ইলিয়া প্রথমে এ-কথাগুলিই উচ্চাবণ করেছিল। সে থ মেরে গেছিল শুনে। তারপর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল ইলিয়া। গায়ে তার সবুজ ব্লাউজ, পরনে নীলরঙের স্কার্ট। মাথায় লালরঙের রুমাল। চুল খুব বড় না কিন্তু খুব ঘন। সে যে ইলিয়ার কথা বুঝতে পারেনি সে-জন্যই হাসছিল। কারণ সে বলেছিল, নো মি ওসানিকান। অর্থাৎ সে বলতে চেয়েছিল, আমি খুবসুরত আদমি নই, আমি ওসানিকান।

তখন ইলিয়া ইংরাজিতে বলেছিল, বিউটিফুল। ভেরি বিউটিফুল। তোমার

দেশ বলছ বাংলাদেশ, আমার পূর্বপুরুষদের দেশ ভারতবর্ষ। তুমি খুব সুন্দর ঃ তারও কথাটাতে কম হাসি পায়নি। সে আদৌ সুন্দর নয়। বরং দেখতে খারাপই।

জাহাজ থেকে নেমে এ-জন্যই বোধ হয় সহজেই ইলিয়া আরিতুসের বউ হয়ে যেতে পারল। ইলিয়াকে খুশি করার জন্য বাড়িতে একটা জবাফুলের গাছও এনে লাগিয়েছিল।

ফসফেট কোম্পানি নতুন নতুন খাদ খোলার দরকার হলে ফিজি কিংবা পাশাপাশি দ্বীপগুলো থেকে লোক নিয়ে আসে। পাঁচ-সাত বছরের চুক্তি। কেউ অবশ্য ইচ্ছে করলে থেকেও যেতে পারে। অনেকেই থেকেও যায়। কারণ দেশে ফিরে আবার কোথায় রুজিরোজগারের ধান্ধা কববে ভেবেই থেকে যায়। অবশ্য সবার মেজাজমর্জি তো একরকমের নয়— কেউ আবার, দু-পাঁচ মাসেই দেশে ফেরার জন্য পাগল হয়ে ওঠে।

ইলিয়া এসেছিল চুক্তিতে। মাটি খোঁড়ার কাজ। উপরের বালিপাথর মাটি সরিয়ে দশ বিশ কিংবা পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত গর্ত করে খাদ তৈরি করতে হয়। আসলে তাদের কাজই হল সারফেসের মাটি তুলে ফসফেটের সন্ধান দিয়ে জাহাজে উঠে যাওয়া। অবশ্য এদের অনেকেই থেকে যায়। বিয়ে করে ঘর বাঁধে। আর নিজের দ্বীপে ফেরার ইচ্ছে থাকে না। মানুষ তো এমনিতেই যাযাবর, মনের মতো নারী পেলে, সে যত দুর্গম অঞ্চল হোক, সে বসবাস গড়ে তুলবেই।

কারণ ইলিয়া এ-দ্বীপে এসে থেকে যাবে এমনই যেন ঠিক ছিল। এবং সে আর ইলিয়া কত যত্ন নিয়ে, কত পরিশ্রম করে বাড়িটা গড়ে তুলেছে। পাহাড়ের টিলায় বাড়ি করা কত কষ্ট দ্বীপবাসীবা জানে। দ্বীপটায় অসংখ্য টিলা এবং কোথাও সমতলভূমি— টিলার ঢালুতেও বাড়ি করা যায়। বড় বড় গাছের নিচে কাঠের বাড়ি ছবির মতো লাগে দেখতে। এবং যারা শ্রমিকের কাজ করে— তারা থাকে জেটির এ-পারে, জেটির ও-পাশে ছোট্ট শহব কর্তাব্যক্তিদের, ক্লাবঘর এবং দোকানপাট, নানা ফ্যাসানের জামাকাপড়ও পাওয়া যায় সেখানটায়। ডিঙিতে ভেসে ও-পাবে গেলেই হয়।

ইলিয়া এ-দ্বীপে হয়তো চিরদিনের মতো থেকে যাবে ভেবেছিল— কারণ এমন দ্বীপ হয় না— দশ-বারো মাইলের বৃত্তাকার এই দ্বীপ— একটা জেটি আছে— আর চারপাশে দিগন্ত বিস্তৃত নীল সমুদ্র। টিলার মাথায় উঠে গেলে দ্বীপের সবটাই দেখা যায়— কেবল জেটি পাব হয়ে ওদিকের পাহাড়টা বিশাল পাঁচিলের মতো। তার ও-পাশে কী হয় না হয় এখান থেকে জানা যায় না। তবে আরিতুসরা সমুদ্রের ধারে এই বিজলিবাতিয়ালা গঞ্জের মতো জায়গায় বাজার করতে যেতে পারে। বেশি মাছ পেলে, জাহাজঘাটার জাহাজ না থাকলে মাছও বিক্রি করে আসতে পারে। তাদের পক্ষে আর কিছু জানার উপায় নেই। শহরেব আইন-কানুন দেখেন পুলিশের এক কর্তা। কোনো বে-আইনি কাজ কিংবা কোনো নারীধর্ষণ—সব বিচারের ভারই তার।

এই দ্বীপে যেমন জেটি আছে, জাহাজ আছে— ক্রেন আছে, নারী-পুরুষের উদ্দাম নৃত্য আছে তেমনি আছে আশ্চর্য সুন্দর একটা বালিয়াড়ি।

ইলিয়া সেখানে গিয়ে বসে থাকত।

ইলিয়া অপেক্ষা করত কখন ফিরবে আরিতুস। কখনও লণ্ঠন হাতে নেমে যেত। আরিতুস বিয়ে করার পরই বউকে আর খাদে যেতে দেয়নি। কারণ আরিতুস

নিজেকে খুব পরিশ্রমী মানুষ ভাবতে ভালবাসত।

সে খাদ থেকে উঠে এসে দুটো খেত। সিফট ডিউটি তার। কখনও রাতে ডিউটি। কখনও দিনে।

খাওয়া সেরে সে পাল তুলে দিত ডিঙিতে। এবং ডিঙ্গি ভেসে গেলে সমুদ্রে, সে কিছুক্ষণ তাতে ঘুমিয়ে নিত। এতেই চাঙ্গা হয়ে যেত শরীর তার। সে তারপর আবার মোষের মতো খাটতে পারত। যেমন বিশাল ঢেউয়ের মাথায় ডিঙি তুলে নিয়ে যেতে পারত এক হাতে। বৈঠা এক হাতে। কখনও পালের দড়িদড়া আর সুতো ছেড়ে সে সমুদ্র স্রোতের উজানে উঠে যেত— খুব পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ, কিন্তু তাঁর উচ্চাশা বলতে— ইলিয়াকে অবাক করে দেওয়া, সে যেভাবে হোক— যদি কখনও ইলিয়া দেশের জন্য মন খারাপ করত— তখন আরিতুস হাত টেনে তুলে বলত, এই ইলিয়া মা-বাবার জন্য মন খারাপ করছে, চল। ওঠো। ডিঙিতে তুমি থাকলে মজা হবে। তোমাকে আমি পালের দড়িদড়া বাঁধার কাজটা শিখিয়ে দেব।

ইলিয়াকে নিয়ে সমুদ্রে চলে যেত।

ইলিয়ার মন খারাপ হলেই আরিতুস তাকে নিয়ে সমুদ্রে চলে যেত।

সন্ধ্যা হলে তারা লম্ফ জ্বালত ডিঙিতে। সাঁঝ লাগালে নিয়ম কোনো লাল আলোর সংকেত রাখা। যদি কোথাও কখনও ডিঙি অজানা সমুদ্রে ঢুকে যায় এই ভয়। তবে আরিতুস পঞ্চাশ ষাট কিংবা একশ মাইলের ভিতর কোনো না কোনো দ্বীপ পেয়ে যাবে জানে। সে একবার ভুলক্রমে অন্য দ্বীপে গিয়ে উঠেছিল। তাতে খুব ক্ষতি হয় না। সে-সব দ্বীপেও ফসফেটের কারখানা আছে, এবং সে আবার ঠিকঠাক বাতাসের গতিবিধি দেখে, সিন্ধু সারসদের ওড়া দেখে বুঝতে পারে কোথায় তার প্রিয় দ্বীপ। এবং জলের রঙ দেখেও টের পায়, কোনো গভীর খাত আছে কাছাকাছি— জলের রঙ, গভীর নীল নয়, ফ্যাকাশে নীল নয় কিংবা সবুজও নয়, একেবারে কালো রঙ। এইসব ইংগিত তাকে বুঝিয়ে দেয় দ্বীপের দক্ষিণে আছে, না উত্তরে আছে। কারণ পালে হাওয়া লাগলে সে ঘণ্টায় বিশ পঁচিশ মাইল বেগে পর্যন্ত সমুদ্রের ভিতর উড়ে যেতে পারে। দ্বীপটা সহসা কখনও চোখের উপর অদৃশ্য হয়ে গেলেও ভয় পায় না।

ইলিয়া সংগে থাকলে ভারি মজা হত।

ইলিয়াকে ভয় দেখিয়ে মজা পেত।

প্রথম প্রথম ইলিয়াও বিশ্বাস করে ফেলত, দ্বীপে আর তারা ফিরতে পারবে না। অজানা সমুদ্রে ঢুকে গেছে। পরে অবশ্য সবই মজা করার জন্য বলা, ইলিয়ার বুঝতে কষ্ট হত না।

আরিতুস বলত, কী হবে?

ইলিয়া ঠোঁট উল্টে বলত, সত্যি কী হবে।

কিছুই হবে না। একটাই হবে। কারণ নির্জন সমুদ্রে আরিতুস ইলিয়াকে কখনও জড়িয়ে চুমু খেত। তারপর ইলিয়া পাগলের মতো আরিতুসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে আনত পাটাতনের মাঝখানে।

আরিতুস কপট ভয়ের ভঙ্গী করত, আ রে করছ কি!

—দেখ না কী করি! বলেই পাশে শুয়ে জড়িয়ে ধরত আরিতুসকে।

আজ কেন যে আরিতুস সারাটা সকাল সেইসব মধুর স্মৃতির কথা ভাবতে

ভাবতে বিভোর হয়ে গেল। লিয়ানাকে সে খেতে দিয়েছে। তার আজ ছুটির দিন বলেই, বাপ-বেটিতে বেশ আয়েশ করে খেতে পারছে। লিয়ানা মা-র জন্য চোখের জল ফেললে সে আরও অন্ধকার দেখে চোখে। নিজের গোপন অশ্রুপাত এক রকমের, সঙ্গে লিয়ানার অশ্রুপাত তাকে কেমন জীবন সম্পর্কে হতাশ করে দেয়। তার তখন কোনো কাজ করতে ভাল লাগে না।

সে তখন কদম ফুলগাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। লিয়ানা বোধ হয় বুঝতে পারে বাপের কষ্ট। সেও বাবার পিছু পিছু গিয়ে ডাকে, বাবা।

বল। আরিতুস পেছন ফিরে তাকায়।

আমি আর কাঁদব না।

তখনই হেসে ফেলে আরিতুস। পাগলের মতো আদর করতে থাকে। আর দু-চার বছর বাদে সে জানে লিয়ানা মা-র জন্য তেমন কষ্ট পাবে না। তার বুকে তখনই বোধ হয় নতুন আর এক কষ্ট তিল তিল করে জমা হচ্ছে। সেই কষ্টই তাকে তার মা-র কথা ভুলিয়ে দেবে সে জানে।

## ॥ তিন ॥

মাঝে মাঝে আরিতুসের মনে হয়, কেন যে ইলিয়া তার মতো হতকুচ্ছিত লোকটিকে বলেছিল, তুমি ভারি সুন্দর। এই একটা কথাই যে-কোনো পুরুষ কিংবা নারীর পক্ষে যথেষ্ট। অথচ সে থাকল না। দ্বীপে থাকল না। ইলিয়ার মুখে সামান্য হাসি ফোটাবার জন্য সে কী না করেছে। মাছ নিয়ে জাহাজঘাটায় গেছে। তার দেশ থেকে নাবিকেরা এলে তাদের সে খুব সস্তায় মাছ দিয়েছে। বলেছে, তোমরা আমার দেশের লোক। সে তাদের বাড়ি এনে, ইলিয়ার হাতের তৈরি খাবার খাইয়ে বলেছে, এমন সুস্বাদু খাবার আর কোথায় পাবে! তারাও ইলিয়াকে উপহার দিয়েছে, জ্যাকেট, রুমাল, ফারের কোট।

সে দুপুরে লিয়ানাকে বলল, আমি বের হব। বড়শিটা দে।

সমুদ্রের ধারে ধারে অজস্র পাহাড়ের খাঁজ, কোথাও সবুজ জঙ্গজ ঘাস। ঘাসে চিংড়ি মাছেরা উঠে আসে। সে ছোট্ট একটা তেকোণা জাল নেয় সঙ্গে। বড়শি ফেলে রাখলে কখনও বড় চিংড়ি মাছ গেঁথে যায়। কুচো চিংড়ি দিয়ে সে সমুদ্রে যাবার আগে মাছের টোপ বানায়। পাউরুটির সঙ্গে কুচো চিংড়ি বেটে নানাকরমের মশলা মিশিয়ে একটা হাড়িতে রেখে দেয়।

লিয়ানা একদিন বলল, আমি তোমার সঙ্গে মাছ ধরতে যাব বাবা।

তুই তো সাঁতার জানিস না।

জানি।

কী বলে মেয়েটা! সে তো অবাক। কবে তুই সাঁতার শিখলি। তা শিখতে পারে। সকালে খাদে বের হয়ে গেলে পাহাড়ের উপত্যকায় লিয়ানা একা। ভাল লাগবে কেন! সে টিলার ঢালু ধরে নিচে আসে, যেখানে সব ঘনবসতি আছে। মাহিম জেঠার নাতনির সঙ্গে বন্ধুত্ব খুব। সে হয়তো তারই সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতে গেছে। বালিয়াড়িতে বসে থেকেছে। হাঁটুজলে নেমে সমুদ্রের জল ছিটিয়ে দিয়েছে— কারণ বয়স বাড়ার সময়। দ্বীপের ফুল ফল গাছপালার মধ্যে সে হয়ত

অন্য অর্থ খুঁজে পেয়েছে। এবং জেনে ফেলেছে, সাঁতার না জানলে জলে ভেসে যাওয়া যায় না। কিংবা জলে ডুবে স্নান করে হয়তো বালিয়াড়িতে শুয়ে থেকে কোনো নতুন স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করছে।

লিয়ানা সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতে একসময় সত্যি সে তার বাবার কাছ থেকে একটা মাছ ধরার ছিপ পেয়ে গেল। ছোট্ট একটা সোনালি রঙের ছিপ পেয়ে কী খুশী লিয়ানা! সুতোর রঙ রুপোলি রঙের। সিসার নিচে দুটো ছোট ছোট রুবি মাছের চোখের মতো কালো বড়শি।

সেদিন খাদ থেকে ফিরে শরীরটা ভাল লাগছিল না আরিতুসের। মনে হয় গা গরম হয়েছে। অসুখ-বিসুখ হলে সে সাধারণত মেয়ের কাছে গোপন করে যায়। কারণ লিয়ানা বাবার জন্য অযথা দুশ্চিন্তা করতে ভালবাসে।

লিয়ানা কিন্তু টের পেয়ে গেল। সে ছুটে গেল মাহিম দাদুর কাছে। বলল, বাবার গা গরম। চোখ লাল। খেতে পারছে না।

মাহিম এই দ্বীপে আছে পঞ্চাশ ষাট বছরের উপর। সে প্রায় তরুণ বয়সে দ্বীপে আসে। দ্বীপের গাছপালার গুণাগুণ সে যত ভাল জানে, আর কেউ জানে না। এ-জন্য দ্বীপে তার একটা আলাদা খাতির আছে।

মাহিম আসতেই আরিতুস হেসে দিল। বলল, তোমার নাতনি ডেকে এনেছে! কিছু হয়নি।

মাহিম তবু মুখ দেখল। চোখ টেনে দেখল। গায়ের তাপ দেখল হাত দিয়ে। তারপর লিয়ানার দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু হয়নি। তা গা গরম হয়েছে। অসুখ-বিসুখ মানুষেরই হবে। সেরে যাবে।

কিন্তু এ কি লিয়ানা ভ্যাক করে কেঁদে দিল!

আরিতুস বুঝতে পারে, মেয়েটা বোঝে বাবার কিছু হলে তাকে দেখার কেউ থাকবে না।

সে লিয়ানাকে ডেকে আদর করল। বলল, বোস। তুই তো বড় হয়ে গেছিস। দেখিস ভাল হয়ে গেলে আরও বেশি মাছ ধরব। টাকা জমাব। তোকে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসব। একদিন আমরা ঠিক তোর মায়ের কাছে ফিরে যাবই দেখবি।

আরিতুস ভাল হয়ে একদিন লিয়ানাকে সত্যি সঙ্গে নিল। মাছ ধরতে যাচ্ছে। কারণ আরিতুসের কেন জানি মনে হয় আসলে সে মেয়েটাকে কোনোদিনই তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে না। দ্বীপের যুবক ছোঁড়াগুলিও খুব ভাল নয়। কাজের চেয়ে নেশাভাঙ করতে বেশি ভালবাসে। বৌকে ধরে পেটায়। এবং যখন মনে হয়, তার মেয়ের গায়ে কেউ হাত তুলতে পারে—ভেবেই যেন সঙ্গে নেওয়া। যদি সমুদ্র থেকে মাছ ধরে খেতে শেখে তবে ভবিষ্যতের ভাবনা থাকবে না।

লিয়ানা বাপের সঙ্গে মাছ ধরতে যাচ্ছে, এটা কত বড় গর্ব, যেন লিয়ানা এখন বড় হয়ে গেছে, বাপকে সে সমুদ্রেও সাহায্য করতে পারে— সে আর ছোট নেই। লায়েক হয়ে গেছে। সমুদ্রে যাওয়া কত বড় জীবনের ছাড়পত্র দ্বীপবাসীরা তা জানে।

লিয়ানা পরেছে লতাপাতা আঁকা ফ্রক। পায়ে কাঠের জুতো নীলরঙের। হাতে সোনালি ছিপ। এবং তার সুন্দর স্তনে আশ্চর্য গরিমা ফুটে উঠছে। এই বয়সেই লিয়ানার মা ইলিয়া এসেছিল। আরিতুস এখন মেয়ের দিকে সোজা তাকাতে পারে না। মাঝে মাঝে কেমন বিভ্রমে পড়ে যায়। যেন ইলিয়া সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ইলিয়াকে নিয়ে যে-ভাবে সে মাছ ধরতে যেত— এবং নিচে নামলে বুঝতে পারত দ্বীপের সবচেয়ে ওস্তাদ মাছ শিকারির সঙ্গে ইলিয়া যাচ্ছে, তেমনি সে লিয়ানাকে নিয়ে আজ যাচ্ছে।

করাতকলের কাছে সোজা একটা পথ গীর্জার দিকে চলে গেছে। সে সমুদ্রে যাবার সময় গীর্জার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যায়। গীর্জার নিচে ঢালু জমি। বড় বড় তিতান গাছ। বিশাল তিতান গাছগুলি শীত আসছে বলে পাতা ঝরার কাজ শুরু করে দিয়েছে। গীর্জা পার হয়ে পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য সে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে যায়। গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে হয়।

লিয়ানা বাপের পেছনে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। বাবা তাকে কুচো মাছ ধরতে হয় কীভাবে শিখিয়েছে। কোন মাছ কি টোপ ভাল খায় বুঝিয়ে দিয়েছে। কারণ সমুদ্রে মাছ সবসময় একরকমের থাকে না। জোয়ারের সঙ্গে, কিংবা ঋতুবদলের সঙ্গে মাছের আনাগোনাও বদলে যায়।

তা ছাড়া আরিতুস মাঝে মাঝে কুচো মাছ শিকারের সময়ও সঙ্গে নিয়ে গেছে লিয়ানাকে। দ্বীপের কোনদিকটায় পাথরের কোন খাঁজে কিংবা কোথায় কম জলে চিংড়ি, সারডিন মাছের ঝাঁক উঠে আসে কোন ঋতুতে তাও বুঝিয়ে দিয়েছে সঙ্গে নিযে গিয়ে।

আরিতুস প্রায়ই সঙ্গে নিয়ে গিয়ে নীল মতো একটা সমুদ্রের লেগুন দেখাত লিয়ানাকে। ছোট ছোট নীল ঢেউ লাল পাথরে আছড়ে পড়ছে। গভীর জল। পাহাড়ের উপর থেকে সামান্য প্রস্রবণের জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। কিছু শামুক গুগলি, রুমি মাছ দেখাত। সারডিন মাছের ঝাঁকও পাক খেয়ে ঘুরে যায়। কীভাবে বড়শি ফেলতে হবে নাচাতে হবে শেখাত। আরিতুস চায়, লিয়ানাও বাপের মতো ওস্তাদ মাছ শিকারী হয়ে উঠুক একদিন। তারপর নানা রকম মশলার পাতা চেনাত। পাতার উগ্র গন্ধে, জলের নিচে মাছ নাকি পাগলা হয়ে যায়। পাতাগুলির গন্ধ আবার সব মাছ একরকমভাবে টের পায় না। কুচো চিংড়ির পাউরুটি আর পাতা বাটা মিশিয়ে টোপ।

এভাবেই লিয়ানা দ্বীপে বাপের পাশে বড় হয়ে যাচ্ছিল।

লিয়ানা এখন নিজেই সংসারের সব কাজ করে রাখে। সকালে সে আজকাল বের হতে পারে না। বাবার এ-মাসটা দশটা-ছটা ডিউটি। অনেকটা রাস্তা হেঁটে যেতে হয়। তারপর লঞ্চে ওপারের পাহাড়ে চলে যায়।

সকালে তার বাবাকে সে এখন রুটি আর মটর সেদ্ধ করে দেয়। বাবার টিফিন যত্ন করে একটা টিনের বাক্সে ভরে দেয়।

সে দুই বেণী বাঁধে। সে ঠিক তার মা-র মতো বেলফুলের গাছগুলির যত্ন করে। বেলফুল ফুটলে এই জাম-পাতার কুটির এবং আশপাশের অঞ্চলে সুঘ্রাণে ভরে যায়। লতানে গোলাপ গাছগুলিতে সে সকালে জল দেয়। বাড়ির গাছপালার পরিচর্যা করলে, বাবা খুব খুশি হয়। তার আর এখন মা-র কথা মনে পড়ে না। কিংবা সে আর তার মায়ের জন্য চোখের জলও ফেলে না। এই গাছপালা ঘরবাড়ি, দ্বীপের বনজঙ্গল এখন তার সবচেয়ে প্রিয়। সে কোনোদিন কোথাও এই দ্বীপ ছেড়ে গিয়ে বাঁচতে পারবে না।

আর কোনো কোনো বিকেলে দেখা যায় চুলে পাথরের ক্লিপ এঁটে একটা সাদা রঙের ফ্রক গায়ে সোনালি রঙের ছিপ হাতে লিয়ানা উপত্যকার ঢাল বেয়ে নামছে।

কোনোদিন লিয়ানা সমুদ্রে যায় না। আরিতুস এখনও কোনোদিন গভীর সমুদ্রে তাকে মাছ ধরতে নিয়ে যায়নি। একটু গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে দু-তিনদিন হাতে না রাখলে চলে না। পরবে, কিংবা রানীর জন্মদিন অথবা আরও যেসব ছুটিছাটা সে পেয়ে থাকে, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে সে-সময় সে যায়। তখন লিয়ানাকে বলে যায় তিনদিন, কি চারদিন, কারণ বড় সুরমাই মাছ দ্বীপের কাছাকাছি পাওয়া যায় না। বিশাল মাছ ধরার আলাদা নেশা আছে তার। বড় মাছ পেলে বেশি টাকা। ট্রাউট মাছ কিংবা ম্যাকরল মাছের দাম কম। একটা সুরমাই মাছ ছিপে গেঁথে তুলতে পারলে, এবং ঘাটে টেনে নিয়ে আসতে পারলে মানুষজন জমে যায় দেখার জন্য মাছের দামও পায়। বাবা বলেছে, এবার তার পাওনা ছুটি থেকে মাসখানেক ছুটি নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবে। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার আনন্দই নাকি আলাদা। লিয়ানা যখন ছোট ছিল, তখন তার মা-ও জাম-পাতার ঘরে কুশের আসন বিছিয়ে কুরুশ কাঁটায় লেস বুনত, আর নাকি বাবার জন্য অপেক্ষা করত। কারণ বাবা তো মাকে অবাক করে দেবার জন্যই গভীর সমুদ্রে দু-একবার ছোট থাকতে মাছ ধরতে গেছে। আজকাল বাবা কেন যে আবার বলছে ঠিক পেয়ে যাব। দু-পাঁচদিন ঘুরে বেড়ালেই হবে সমুদ্রে। এবং বাবার আশা মজুরি বাঁচিয়ে এবং মাছের টাকায় ঠিক লিয়ানাকে নিয়ে তার মায়ের কাছে চলে যেতে পারবে। সে তো আজকাল বাবার কষ্ট হবে ভেবে ঘুণাক্ষরেও মা-র নাম করে না। তবে কেন বাবা প্রায়ই বলছে, আমি যাবই। মায়ের কাছে যাবে শুনলে কার না আনন্দ হয়।

করাতকল পার হয়ে যেতেই মাহিম দাদুর সঙ্গে দেখা। দেখা হতেই বলল, লিয়ানা, কোথায় যাচ্ছিস?

কুচো মাছ ধরতে। বাবা সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবে।

—ঝড় বাদলায় বের হবে! এত সাহস!

লিয়ানা জানে বাবার কাছে ঝড়ের সমুদ্র কোনো বিড়ম্বনাই নয়। এটা ঠিক ক'দিন থেকে বড় বেশি ঝড়বাদলা শুরু হয়েছে। এ-সময় সমুদ্র খুব বেশি পাগল হয়ে থাকে। বালিয়াড়িতে কিংবা যেখানেই টিলার উপর দাঁড়িয়ে থাকুক, সোঁ সোঁ গর্জন আরা গায়ের জামাকাপড় সব উড়িয়ে নিতে চায়। সে বারবার লক্ষ্য করছে তার ফ্রক বাতাসে কোমরের উপর উঠে যাচ্ছে। সে চেপে চুপে কোন রকমে করাতকল পার হয়ে গেল। বাবার কাল থেকে ছুটি। পরশু বাবা বের হবে। দু'দিনে যা কুচো মাছ পাওয়া যাবে এবং বনজঙ্গল থেকে সেই মশলাপাতা তুলে এনে বেশি করে টোপ এবং মাছের চার তৈরি করতে না পারলে বাবার এবারকার অভিযান জমবে না।

সেজন্য সে গত দু-দিন থেকেই সব কুচো মাছ ধরে পচিয়ে রাখছে। আজ এবং কাল। তারপর তার বাবা যাবে মাছ ধরতে। তার তো আর কেউ নেই। বাবা ছাড়া তার আর কেউ নেই। তবে মাঝে মাঝে কে যেন সামনে দাঁড়িয়ে যায়। সে সবচেয়ে সুন্দর কোনো নাবিকের স্বপ্ন দেখে। সে দেখেছে বাবার সঙ্গে জাহাজ থেকে নাবিকরা তাদের বাড়িতেও এসেছে। গল্পগুজব করেছে। বাবা তাদের ব্যাগ ভর্তি লেবু দিয়েছে। ওরা এলেই কত রকমের শাক যে তুলে নেয়। লিয়ানা নিজেও মাতু শাক তুলে দিয়েছে। খেতে নাকি খুব সুস্বাদু। শাকের খোঁজেই বেশি আসে বাংলাদেশের নাবিকরা। শাক আরা লেবু। জাহাজে বাসি গোস্ত চপাটি, ভাত, ডাল, ফুলকপি, বাঁধাকপি ছাড়া আর কিছু খাবার দেওয়া হয় না। তাও নাকি টাটকা নয়। কতদিনের

বাসি। বিস্বাদ খেতে। শরীরে চর্মরোগ হয়—এ জন্য বাঙালী নাবিকরা জঙ্গলের মধ্যে কতবার বাবাকে নিয়ে ঢুকে গেছে লেবু আর শাকের খোঁজে।

বিকালবেলা থেকেই মেঘ জমছে আকাশে। আর জলো নোনা হাওয়া। গরমের সময় নোনা হাওয়া। গা বড্ড কড় কড় করে।

মাহিম দাদুকে দেখলেই লিয়ানা বড় প্রসন্ন বোধ করে। সে দাঁড়িয়ে যায়। মাহিম দাদুর কেবল এক কথা—তোকে আমি বিয়ে করব। বলেই ফোকলা মুখে হাসতে থাকে।—কেন আমি খারাপ দেখতে। পছন্দ হচ্ছে না! আমার কি নেই! দুটো গাধা আছে, একটা ঘোড়া আছে। ঘরে মিষ্টি আলু আছে। ওতে তোর পেট ভরবে না!

তা ঠিক মাহিম দাদুর দুটো গাধা আছে, একটা ঘোড়া আছে, ঘরে মিষ্টি আলু আছে। পাহাড়ের উপত্যকায় মাহিম দাদু মিষ্টি আলুর চাষ করে। জাভা থেকে লতা নিয়ে এসেছিল। তার দেখাদেখি এখন দ্বীপের অনেকেই মিষ্টি আলুর চাষ করছে, আনারসের চাষ করছে।

মাহিম দাদুর দাঁত নেই বলে নরম মিষ্টি আলু সেদ্ধ আর গাধার দুধ খায়। সে অনেকদিন দেখেছে দাদু তার জন্য বাবার জন্য মিষ্টি আলু সেদ্ধ নিয়ে যেত। বাবার একমাত্র জ্যাঠা। দাদুর আর আছে একমাত্র নাতিনি। যে তার খুবই বন্ধু।

ওর মা চলে যাবার পর, বাবাকে তাকে সবচেয়ে বেশি দেখাশোনা করত মাহিম দাদু। লিয়ানা মাহিম দাদুকে দেখলেই আনন্দে হাততালি দেয়। এখনও দিত। কিন্তু হাতে ছিপ বলেই সে হাততালি দিতে পারেনি। তা ছাড়া সে তো বড় হয়ে গেছে। তবে তার বউ হতে রাজি হয়েছে। কী খুশি বুড়ো!

মাহিম দাদু বলল, কি রে আমাকে ফেলে মাছ ধরতে চললি!

—বারে বাবা যে বলে গেছে। আচ্ছা তুমি জান, বড় ঝড় আসছে!

—লোকে তো তাই বলাবলি করছে।

ঝড়ে বাবা ভয় পায় না। বাবা তো বলে, কত ঝড় দেখলাম। ডিঙি আর পাল ঠিক থাকলে, হাল ঠিক থাকলে ঝড়ের সাধ্য কী কিছু করে!

এবং লিয়ানা বাবার কাছে শুনেছে—ওতেই মজা। হাওয়ায় যেন ভেসে যায় ডিঙি। সে বসে থাকে পালের দড়িদড়া গলুইতে বেঁধে। আর হাল সম্পর্কে সজাগ থাকে, এগুলি থাকলেই যত বড় ঝড়ই হোক, কোনো ডিঙিকে কাবু করতে পারে না।

তবু কেন যে লিয়ানার মনটা দমে গেল। সে কুচো চিংড়ি জল থেকে ছেঁচে তুলেছে, বড়শিতে রুবি মাছ গেঁথেছে কয়েকটা, তবু কেন যে মনটা তার ভার হয়ে থাকল।

ফেরার সময়ও দেখল মাহিম দাদু ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে। একটা নলের ডগায় মাটির পাত্র, আর ঝুনো নারকেলের মালা ফুটো করা। ওতে একটা কাঠের সরু নল ঢোকানো। বড় বেশি আত্মমগ্ন হয়ে তামাক খাচ্ছে। সামনে দিয়ে চলে যাবে, কথা বলবে না তা হয় না। কারণ মাহিম দাদু আজকাল দূর থেকে ভাল দেখতে পায় না। মাহিম দাদুর সাদা দাড়ি। চুল সব সাদা হয়ে গেছে। সাদা জামা লুঙ্গি পরলে বরফের দেশের মানুষ মনে হয় মাহিম দাদুকে।

সে যাচ্ছে টের পেলে ঠিক ডাকত। বলত, দেখি কী মাছ পেলি! তাছাড়া বাবার খবরও নেয়। কারণ বুড়ো হয়ে গেছে বলে এখন আর টিলায় উঠতে পারে না।

দম পায় না।

ছুটির দিনে মাঝে মাঝে বাবা এসে দেখা করে যায়। মন খারাপ হলেই বাবা মাহিম দাদুর কাছে আসে। তামাকের নেশায়ও আসতে পারে। বাবা এলে মাহিম দাদু সুগন্ধী তামাক সাজিয়ে দেয়। সেই কোন মুলুক থেকে দাদু আনিয়েছে তার খবর দেয়। এ-দ্বীপে এত সুগন্ধী তামাক আর কারো ঘরে পাওয়া যায় না।

## ॥ চার ॥

খাদ থেকে ফিরে আরিতুস দেখল লিয়ানা চুপচাপ কদমফুল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন অন্যমনস্ক।

আকাশে মেঘের দাপাদাপি। মেঘ গুড় গুড় করছে। দূরে একটা জাহাজ— বয়াতে বাঁধা।

বাবা খুব খুশির গলায় বলল, কলকাতা থেকে আবার জাহাজ এসেছে।

আরিতুস জানে কলকাতা খুব বড় বন্দর। ওখানে গঙ্গা নামে কী আছে শুনেছে। বন্দরে অনেক জাহাজ। কলকাতা থেকে নাবিকেরা এলে এমন গল্প করত। আরিতুস জানেই না, বন্দর কত বড় হয়। কলকাতা বন্দরে ত্রিশ-চল্লিশটা জাহাজ সবসময় ভিড়ে থাকে। তার একটিই আফসোস, সেই বাঙালী নাবিকটি আর এল না। এলে তার ঘরে নিশ্চয়ই আসত। সে কথা দিয়ে গেছিল, তার জন্য বর্ণপরিচয় নিয়ে আসবে। তকে বর্ণমালা শেখাবে। বাংলা ভাষা শেখাবে।

আরিতুস অবশ্য জানে, নাবিকরা আজ এ-বন্দরে কাল ও-বন্দরে, কোনো বন্দরে হয়তো একবারই যাওয়া হয়। পরে আর জীবনে সে বন্দরে যাওয়া হয় না। সে এ-জন্য নাবিকটিকে দোষ দেয় না। তার জাহাজ এ-বন্দরে না এলে কী করবে। তবু জাহাজের চিমনি দেখে বুঝে ফেলেছে, সে যদি সমুদ্র থেকে ভাল মাছটাকে শিকার করে আনতে পারে তবে বেশ দাম পাবে।

বাঙালী নাবিকেরা মাছ খেতে খুব ভালবাসে। জাহাজে মাছ ওরা খেতেই পায় না। বন্দরে গেলেও সব জায়গায় যে মাছ পাওয়া যাবে তেমন কথা নেই। আর তাজা টাটকা মাছের কথা তারা ভাবতেই পারে না।

কিন্তু লিয়ানা চুপচাপ কেন কদমফুল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে বুঝল না। সে ফেরার সময় সমুদ্রে ডুব দিয়ে আসে। বাড়িতে এসে মিষ্টি জলে শরীর ধুয়ে নেয়। সে যে এসেছে, টের পাবার পরও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকায় আরিতুস বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেল। আবার কি তার মায়ের কথা মনে পড়েছে। দাঁড়িয়ে আছে গাছের নিচে। গোপনে কাঁদতে পারে। কারণ কদমগাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়ালেই সামনের বিশাল সমুদ্র টিলার নিচে এসে যেন ঝপাৎ করে নেমে পড়ে।

সে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে যেতে সাহস পেল না। যদি লিয়ানা ধরা পড়ে যায়। লজ্জা পাবে। মেয়েরা বড় হয়ে গেলে গোপনে অশ্রুপাত করতে ভালবাসে আরিতুস তা জানে। ইলিয়ারও দেশের জন্য মা-বাবার জন্য যখন মন খারাপ করত, কদমফুল গাছটার নিচে এসে দাঁড়াত। একবার ধরা পড়ে গিয়ে কেমন ক্ষেপেই গেল— আমি কখন কাঁদছিলাম। তুমি আমাকে কেবল কাঁদতেই দেখ।

সেই ইলিয়া ওসানিকা দ্বীপে পালিয়ে চলে গেল। কেন যে সে আর তাকে

মনে রাখল না, মেয়েটার কথা ভাবল না, জানে না। একজন অন্য পুরুষের সঙ্গ কি তার নিজের মেয়ের চেয়েও বেশি! তার মুখে বিষণ্ণতার ছায়া।

সে ডাকল, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস! কী হয়েছে?

বাবা!

এ-ভাবে মেয়েটা তাকে বাবা ডাকে না।

কী হল!

বাবা!

বল কী হয়েছে!

সমুদ্রে যাবে না।

কেন?

সমুদ্রে বড় ঝড় আসছে।

ধুস। তুই যে কি না! ঠিক মাহিম জ্যাঠার কাজ। মাহিম জ্যাঠা বলেছে!

সবাই বলছে।

আরে মাহিম জ্যাঠা বললে, সবাই তো বলবেই। বুড়ো মানুষের কথা কে অগ্রাহ্য করতে পারে। ও কিছু না। কত বড় ঝড় সামলেছি। তোর মা থাকলে বলতে পারত।

বাবার কথায় লিয়ানার মন পলকে হালকা হয়ে যায়। বাবা তো ওস্তাদ মাছ-শিকারী। মাহিম জ্যাঠাও বলে, তোর বাবা সমুদ্রে গেলে মাছের ঝাঁকের গন্ধ পায়। কোন সমুদ্রে কী মাছ আছে তোর বাবার চেয়ে কেউ ভাল বলতে পারে না।

সুতরাং পরদিন সকালে আরিতুস ডিঙি ভাসিয়ে দিল। গলুইয়ে বালতি, জল সেঁচার ডোঙা, ছোট্ট লালরঙের পাল। আর আট দশটা হুইল। দুটো ছিপও সঙ্গে নিয়েছে। হালের কাঠে মবিল দিতে দিতে বলল, সাবধানে থাকিস। বড় মাছ নিয়ে আসব। সেই তোর মা একবার দেখেছিল, কত বড় মাছ! টেনে তোলা যায় না। হুকে জলে ভাসিয়ে রাখতে হয়। লোক জমে যাবে মাছের খবর পেলে।

লিয়ানা দেখল বাবার ডিঙি ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। সকালে ঝোড়ো হাওয়া ছিল না। মেঘও কেটে গেছে। আকাশ ফর্সা। আর সব লালরঙের ডিঙি পাল তুলে ভেসে যাচ্ছে।

লিয়ানা তারপর ফিরে আসতে থাকল। মাহিম দাদুর দাওয়ায় চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ। দাদু গাধা দুটো নিয়ে ঘোড়াটা নিয়ে করাতকলের ও-পাশে উঠে গেছে। বুড়ো দাদুর নাতনি তার সই। সই দেখল, লিয়নার মুখ ব্যাজার। সে বলল, এখানেই খেয়ে যাস।

বিকেলে বাড়ি ফিরেও লিয়ানার ভাল লাগছিল না। একা। দেখল আকাশে আবার কালো মেঘ জমে উঠেছে। এবং সাঁঝবেলাতেই সেই ঝড়। সাইক্লোন। আকাশ দামাল হয়ে উঠেছে মেঘে। বৃষ্টিপাত। আর মেঘের কড় কড় বজ্রপাত। লিয়ানা চুপচাপ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে বসে আছে। ঘরে লম্ফ জ্বালা। তার কিছুই ভাল লাগছে না। আর ঝড়ের রাতেই দরজায় খুট খুট শব্দ। বাবা বুঝি ফিরে এল, ঝড় দেখে বেশিদূর যেতে সাহস পায়নি। সে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। আর আশ্চর্য ভিজে নেয়ে গেছে এক তরুণ। পরনে নীল রঙের প্যান্ট-শার্ট। নাবিকদের পোশাক। লিয়ানা যুবককে দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু বড় সরল এবং মায়া মাখানো চোখ-মুখ। সে পকেট থেকে একটা কী বের করে দেখাল।

লিয়ানা দেখল, একটা বই। সে জানে না, বোঝে না বই-এ কী লেখা আছে।

—নাবিকটি বলল, আরিতুস কোহেন নেই?

—সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছে।

—তুমি একা।

লিয়ানা ঘাড় নাড়ল।

বইটা সমসের মিঞা দিয়েছে। আমার জাহাজ নেরু দ্বীপে যাবে জানতে পেরেই বইটা দিয়ে বলেছে, এটা আরিতুস কোহেনকে দেবে। কথা দিয়ে এসেছিলাম। জাহাজ না গেলে কী করা! তোমার জাহাজ যখন যাচ্ছে, অবশ্যই এটা তাকে পেঁাছে দেবে। তাকে বইটা দেব, কথা দিয়েছিলাম।

তারপর কী ভেবে বলল, চলি। এটা রেখে দাও যত্ন করে। এলে দিও।

বাইরে প্রচণ্ড ঝড় । সাইক্লোন সমুদ্রে। কড় কড় করে বজ্রপাত।

একজন সরল যুবা বিপদসংকুল পথে এমন ঝড়ের রাতে নেমে যাবে ভাবতেই লিয়ানা বলল, যেতে পারবে না। গড়িয়ে পড়ে যাবে। তোমার তো রাস্তাঘাট ভাল চেনা নয়। বলে সে তার বাবার ধোওয়া জামা লুঙ্গি বের করে দিয়ে আগুন জেলে দিল। ঠাণ্ডায় সরল যুবার চোখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এই যুবক, যেন কথা ছিল, এমনই কোনো সুন্দর তরুণ যুব তার দরজায় আজ হোক কাল হোক করাঘাত করবে। নাবিকের ক্লান্তি দূর করার জন্য ঝড়ের রাতে সে দিতে পারে না এমন কিছু অমূল্য ধন তার কাছে গচ্ছিত নেই। সে সহজেই তাকে রাতের জন্য আহার উত্তাপ এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিল।

# মানুষের ধর্ম

শেষ রাতে ভীষণ ঝড়ের ভিতর জাহাজ বন্দর ধরছে।

দীর্ঘ দিন সমুদ্র পরিক্রমণের পর জাহাজ এবং জাহাজীরা লেগুনের মুখে বন্দরের আলো দেখতে পেল।

আর তুষার-ঝড়ের জন্য জাহাজীরা রেনকোট গায়ে ডেকের উপর ছুটোছুটি করছে, ওরা দড়িদড়া ফেলে দিচ্ছে নিচে। জেটিবয় সেই সব দড়িদড়া অথবা হাসিলের সাহায্যে জাহাজ বন্দরে বাঁধছে। মেজ মালোমকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে না—তিনি দু' হাত তুলে বিচিত্র এক ভঙ্গীতে ডেক-জাহাজীদের দড়িদড়া হাপিজ অথবা হাড়িয়া করতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

তখন জাহাজের পাঁচ নম্বর সাব অবনীভূষণ পোর্টহোলে উঁকি দিল। শেষরাতে জাহাজ বন্দর ধরছে, জাহাজ সেই কবে পূর্ব আফ্রিকার উপকূল থেকে নোঙর তুলে সমুদ্রে ভেসেছিল, কবে কোন্ এক দীর্ঘ অতীতে যেন। তারা বন্দর ফেলে শুধু সমুদ্র এবং সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপমালা অথবা পাথরের জনমানবহীন দ্বীপ দেখেছে। ওরা সেই দ্বীপের ঝাউগাছ এবং অপরিচিত গাছগাছালি দেখে চিৎকার করার সময় মনে করত—জাহাজ বুঝি আর কোন দিন বন্দর ধরবে না। শুধু সমুদ্র, এবং নীল জল, নীল আকাশ আর হয়তো ক্কচিৎ কোথাও সমুদ্রের চিড়িয়াপাখি—দূরে কখনও ডলফিনের ঝাঁক...। পাঁচ নম্বর সাবের মনে হত জাহাজ ওদের নিয়ে অন্তহীন এক সমুদ্রে যাত্রা করেছে। ওরা বন্দরে কোন দিন পৌঁছাতে পারবে না, জাহাজ ওদের সঙ্গে তঞ্চকতা করছে।

সুতরাং এই তুষার-ঝড়ের ভিতরও জাহাজীদের প্রাণে উল্লাসের অন্ত ছিল না। মেজ মালোম প্রায় ছুটে ছুটে কাজ করতে জাহাজীদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন। সামনে পাহাড়, আলো, মাটি এবং মানুষের বসতি। ওখানে কোথাও রমণীদের গৃহ আছে। মেজ মালোম উত্তেজনায় রা রা করে গান গাইতে থাকলেন। তুষার-ঝড়ের জন্য ওঁর কণ্ঠ ভয়ঙ্কর কঠিন মনে হচ্ছিল আর তুষার-ঝড়ের জন্য সব পোর্টহোল বন্ধ। কাঁচের ভেতর থেকে এখন অন্যান্য জাহাজীরা বন্দর দেখছে। বন্দরটা ছোট অথচ খুব মসৃণ মনে হচ্ছিল। ক্রমশ আলো ফুটছে, ক্রমশ তুষার-ঝড় কমে আসছিল। আর এক এক করে সব আলো, পথের এবং জেটীর এক সময় নিবে যেতে থাকল। দূরের গীর্জায় তখন ঘণ্টা বাজছে, তখন জাহাজীরা ডেকের উপর উঠে এলো এবং সকলে রেলিঙে ঝুঁকে পড়ছে। আবেগে উত্তেজনায় জাহাজীরা বন্দরের সকল ঘাস মাটি ফুলকে ভালোবাসার কথা জানাল।

বন্দরের প্রথম দিন এবং রবিবার। জাহাজীদের ছুটির দিন। ওরা হই হই করে

আকাশ পরিষ্কার হলেই নেমে যাবে। শুধু তুষার-ঝড়ের জন্য ওরা বিরক্ত। জাহাজের পাঁচ নম্বর সাব অবনীভূষণ পোর্টহোলে বারংবার হাত রেখে ঝড়ের সঙ্গে তুষারকণা পরখ করছিল। মনে হচ্ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র থেকে উঠে আসা ঠাণ্ডা বাতাস ক্রমশ কমে যাবে, যেন ওর ইচ্ছা এই ঠাণ্ডা বাতাস থেমে গেলেই সে তাঁর প্রিয় তামাকের পাইপটি মুখে পুরে যুবতীর সন্ধানে বের হয়ে পড়বে। এইটুকু ভেবে অবনীভূষণ আয়নায় মুখ দেখল। ভয়ংকর মুখ অবনীভূষণের, কালো নিগ্রো-সুলভ চেহারা। চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু-জাহাজে অবনীভূষণকে বাঙালী বলে চেনাই যায় না। অবনীভূষণ শক্ত মানুষ। অবনীভূষণ লম্বা আর অবনীভূষণের জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে। অবনীভূষণ মাকে দেখেছে, বাবাকে দেখে নি। 'অবনীভূষণ জারজ'—আয়নায় মুখ দেখার সময় পাঁচ নম্বর সাব কথাটা আয়নার প্রতিবিম্বকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারণ করল। এত দীর্ঘ ঋজু চেহারা অবনীভূষণের, আর এত বড় চোখ এবং মুখ অবনীভূষণের আর এত লম্বা থাবা অবনীভূষণের যে যুবতীরা কোন বন্দরেই অবনীভূষণকে পছন্দ করে না।

ডেকে সামান্য কাজ অবনীভূষণের। ফরোয়ার্ড ডেকে দু' নম্বর মাস্টের নীচে উইন্‌চ মেসিনের লিভার প্লেট আল্গা হয়ে গেছে—ওটা সারতে হবে। রবিবার তবু ওকে এই সামান্য কাজটুকু করতে হবে। বয়লার স্যুট পরে অবনীভূষণ ডেকে বের হয়ে গেল। চারিদিকে পাহাড়। তুষার-ঝড় কমে গেছে বলে আকাশ পরিচ্ছন্ন, লেগুনের জল সামান্য সবুজ রঙের, আর দূরে দূরে সব পাহাড় ক্রমশ উপরে উঠে গেছে। পাহাড়ের কোলে সব পরিচ্ছন্ন লাল নীল কাঠের রঙবেরঙের বাড়ি, ইতস্তত বড় বড় প্রাসাদ এবং ঠিক সেতুর অন্য পাড়ে বড় বড় কিছু স্কাইস্ক্র্যাপার। লেগুনের দু' পারেই শহর। ঠিক লোহ আকরিকের গুদামখানার বিপরীত দিকের সেতুর ব্যালকনীতে অবনীভূষণ মানুষের ভিড় দেখল। সূর্য আলো দিচ্ছে সামান্য—খুব নিষ্প্রভ এই আলো, কোন উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারছে না। অবনীভূষণ লেদার জ্যাকেটের ভিতরেও হু হু করে শীতে কাঁপছিল—সামান্য উত্তাপের জন্য পাঁচ নম্বরকে খুব দুঃখিত মনে হচ্ছে।

অবনীভূষণ হাতের কাজ খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলল। তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্নের আহার শেষ করে নিজের বাংকে শুয়ে প্রতিদিনের অভ্যাসমতো কিছু নগ্ন ছবির উপর চোখ রাখতেই শুনতে পেল এলওয়েতে কে বা কারা যেন পায়চারি করছে। মেজ মালোমের গলার স্বর পাওয়া যাচ্ছে। তিনি খুব দ্রুত এবং জোরে হাসছেন। বোধ হয় খুব সকাল সকাল তিনি যুবতী সন্ধানের জন্য বের হয়ে পড়ছেন। অবনী-ভূষণেরও ইচ্ছা হচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে, যখন পোর্টহোল দিয়ে অন্য তীরে তিমি শিকারের জাহাজ ভিড়তে দেখা যাচ্ছে, যখন দূরে কোথাও এক তৈলবাহী জাহাজ বাঁধা হচ্ছিল, যখন আর কিছু হাতের সামনে করণীয় নেই অথবা 'ট্যানি টরেণ্টো' 'ট্যানি টরেণ্টো' এই এক বিশ্রী শব্দ কানের কাছে ক্রমাগত বেজে যাচ্ছে তখন মেজ মালোমের মতো টিউলিপ গাছের নীচে যুবতী সন্ধানে বের হয়ে পড়াই ভালো। এত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অবনীভূষণ জাহাজ থেকে সকাল সকাল নেমে যেতে পারল না। সে রাতের জন্য অপেক্ষা করল। কারণ দিনের বেলায় এই চেহারা বড় ভয়ংকর। রাতের বেলায় অস্পষ্ট অন্ধকারে অথবা নিয়ন আলোর ভিতর, ফেল্ট ক্যাপের ভিতর আর বৃহৎ ওভারকোটের জন্য সামান্য মানুষের মতো মনে হয় ওকে। সুতরাং হাত পা শক্ত করে সে বাংকেই পড়ে থাকল। শরীরের ভিতর ভয়ংকর কষ্ট এবং উত্তেজনা। বন্দরে

এলেই কষ্টটা বাড়ে। বন্দর ধরলেই এই সব জাহাজীরা অমানুষের মতো চোখ-মুখ করে ঘোরাফেরা করতে থাকে—কি যেন এক সোনার আপেল ওদের হারিয়ে গেছে—সেই আপেলের জন্য, সেই সোনার হরিণের জন্য ওরা সব সময় মাটি পেলেই দ্রুত ছুটতে চায়। অবনীভূষণ দ্রুত ছুটতে চাইল।

সন্ধ্যার সময় জাহাজের স্টারবোর্ড-সাইডের কেবিনগুলোর দিকে হেঁটে গেল সে। সেখানে প্রিয় বন্ধু ডেক-এপ্রেন্টিস উইলিয়াম উড থাকেন। সে দরজায় কড়া নেড়ে ভিতরে ঢুকে বলল, একি, তুমি এখনও চুপচাপ বসে রয়েছ! বের হবে না?

উড বলল, ভয়ঙ্কর ঠান্ডা।

অবনীভূষণ বলল, অন্তত সিম্যান মিশানে চল। সেখানে জুটে যেতে পারে।

সুতরাং ওরা উভয়ে সাজগোজ করে বের হয়ে পড়ল। সেই লম্বা ওভারকোট গায়ে অবনীভূষণ, লম্বা তামাকের পাইপ মুখে এবং ভয়ঙ্কর বড় বেঢপ জুতো পায়ে অবনীভূষণ গ্যাঙওয়ে ধরে নেমে গেল। আর নেমে যাবার মুখেই দেখল মেজ মালোম বন্দর থেকে ফিরছে। মেজ মালোম বেশ সুন্দরী এক যুবতীকে (বয়সে চল্লিশের মুখোমুখি) নিয়ে এসেছেন। যুবতীর পাতলা গড়ন, ছিমছাম চেহারা আর কালো গাউন, সোনালী ব্লাউজের উপর ফারের লম্বা মতো কোট গায়ে...। ওর কোমরে মেজ মালোমের হাত। যেন চুরি করে তিনি এক যুবতীকে জাহাজে নিয়ে যাচ্ছেন। সমুদ্র থেকে তেমনি ঠান্ডা বাতাস উঠে আসছে। তীক্ষ্ম শীতের ভিতর এই সামান্য উত্তাপটুকু অবনীভূষণকে অস্থির করে তুলল। মেজ মালোমকে সে 'গুড-ইভনিং সেকেন্ড' বলতে পর্যন্ত ভুলে গেল। সে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছে। জেটির উপর দিয়ে ক্রেনের নীচে লম্বা লম্বা পা ফেলে উডের সঙ্গে হাঁটছে।

গাছের সব পাতা ঝরে গেছে, আর কিছু দিন গেলে এখানে হয়তো তুষারপাত হবে। অথবা তুষার পড়ার আগে শীত মাটিতে শেষ কামড় বসাচ্ছে। বাগানের আপেল গাছগুলোকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল, চেরীফলের গাছগুলো মৃতবৎ দাঁড়িয়ে আছে। ওরা সব অপরিচিত গাছগাছালির ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। গাছগুলোর পাতা ঝরে গেছে বলে কোন গাছই চেনা যাচ্ছে না, ওরা বৃদ্ধ পপ্‌লার হতে পারে, পাইন হতে পারে, এমন কি বার্চ গাছও হতে পারে। এই শীতে পথের দু'পাশে কাঠের বাড়ি এবং লাল নীল রঙের শার্সির জানালা এবং বড় বড় কাঁচের জানলার ভিতর পরিবারের যুবক যুবতীদের মুখ, এ্যাকর্ডিয়ানের সুর, গ্রাম্য কোন লোকসঙ্গীত অবনীভূষণকে ক্রমশ উত্তেজিত করছে। ইতস্তত দু'পাশে বার এবং পাব্‌-এর পর সেই বড় কার্নিভল। সদর দরজার উপর একটা লোক হাঙরের মুখোস পরে নানা ভাবে জাহাজীদের প্রলুব্ধ করতে চাইছে। ওরা কার্নিভালে ঢুকল না। ওরা ক্রমশ পাহাড়ের উতরাইয়ে নেমে যাচ্ছে। আর ওরা দেখল, হরেক রকমের রমণীরা মুখে ফুঁ দিতে দিতে চলে যাচ্ছে—স্থানীয় কোন উৎসব হবে হয়তো—মেয়েরা মাথায় রুমাল বেঁধে শহরের বড় কবরখানার দিকে হাঁটছে। অবনীভূষণের এ-সময় ইচ্ছা হচ্ছিল ওর বড় থাবা দিয়ে ঠিক ছোট পাখি ধরার মতো কোন যুবতীকে ওভারকোটের পকেটে লুকিয়ে ফেলতে।

ভোরের তুষার-ঝড়ের চিহ্ন এখনও এই সব পাহাড়ে এবং ছবির মতো বাড়িগুলোর মাথায় লেগে আছে। কোথাও দেখল, কাঁচের ঘরে সুন্দরী যুবতী পিয়ানো বাজাচ্ছে, আর দু'পাশে হরেক রকমের দৃশ্য এবং অবনীভূষণ এখন উন্মাদ—সে হন্যে হয়ে যুবতী সন্ধান করছে। এই সব জাহাজীদের আনন্দ দানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অশালীন পোশাকে নানা বয়সের যুবতীরা ঘোরাফেরা করছে। ওরা এক এক করে সকলে

নাচের আসরে নেমে পড়ছে। স্টেজের উপর একদল লোক কালো পোশাক পরে ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে। ঈগল পাখির মতো মুখওয়ালা বাঁশির-শব্দ বীভৎস এবং উৎকট মনে হচ্ছিল। পাশের কাউন্টার কাঁচ দিয়ে মোড়া-সেখানে মেয়েরা মদ বিক্রি করছে। জাহাজীরা কিউ দিয়ে মদ গিলছিল। অবনীভূষণ এবং উড উভয়ে মদ খেল এক গ্লাস করে। ওদের পার্টনার নেই, বিশেষ করে অবনীভূষণ এই সব নাচ এতদিনেও রপ্ত করতে পারে নি। সুতরাং অবনীভূষণ আর এক গ্লাস মদ নিয়ে পাশের সোফাতে বসে মাংসের পুরের সঙ্গে মদটুকু খেয়ে ফেলল। বাকি মাংসের পুরটকু সে চেখে চেখে চেটে চেটে খাচ্ছিল আর রমণীরা এই যে নেচে চলেছে, এই যে সুন্দর শরীর এবং উটের মতো মুখটি তুলে নেচে বেড়াচ্ছে, এই যে রমণীরা ঘোড়ার মতো পা ফেলে এক দুই করে সামনে পিছনে পিছনে সামনে—যাচ্ছে আসছে—তা দেখে অস্থির হয়ে পড়ছিল। ফলে অবনীভূষণ ল্যালা ফ্যালার মতো চারিদিকে তাকাচ্ছিল। তারপর সে সহসা আবিষ্কারের মতো দেখে ফেলল দুই সুন্দরী যুবতী যেখানে মদের কাউন্টার ঠিক তার বিপরীত দিকের টেবিলে বসে উল বুনছে। অবনীভূষণ মুখ নীচু করে চুপি চুপি উডের হাত ধরে ওদের দিকে গিয়ে সরে বসল। তারপর চোখ-মুখ টান টান করে বলল, গুড ইভনিং ম্যাডাম এবং পাশে বসে পরিচিত হবার ভঙ্গীতে বলল, এম. ভি সিটি অফ গ্লাসগো। সে তার জাহাজের নাম বলল ওদের।

মেয়ে দুজন ওকে স্বাগত জানালে সে কাউন্টারে আবার মদের অর্ডার দিয়ে বলল, ছবির মতো এই শহর। মেয়ে দুজনকে ভিন্ন ভিন্ন অলীক স্বপ্নের কথা বলে অথবা সমুদ্রের গল্প বলে ভেজাতে চাইল।

অবনীভূষণ দামী সিগারেট বের করে ওদের একটি করে দিতেই ওরা এসে ওর ঘাড়ের উপর পড়ার মতো ভান করল—সো নাইস! কোন অলৌকিক ঘটনার মতো অবনীভূষণের সিগার কেস ; সিগারেট কেসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ওরা।

অবনীভূষণ চুল-সোনা মেয়েটিকে বলল, ইউ লাইক ইট? বলে সে ওর সম্মতির অপেক্ষা করল না ; সে চুল-সোনা মেয়েব হাতে যৌতুকের মতো সিগারেট কেস তুলে ধরার সময়ই কাঁচের জানালায় মুখ বাব কবে পাহাড়েব উতবাইয়ের ভিন্ন ভিন্ন আলো দেখল। আকাশ পরিচ্ছন্ন বলে, পথঘাট শুকনো বলে পার্কের টেবিল বেঞ্চে এখন সব যুবক-যুবতীরা বসে নিশ্চয়ই গল্প করছে। অবনীভূষণ এবার উডের দিকে তাকাল, উড তন্ময় হয়ে নাচ দেখছে। সে অবনীভূষণ অথবা চুল-সোনা মেয়েকে লক্ষ্য করছে না। সুতরাং অবনীভূষণ উডকে কনুই দিয়ে ঠেলা দিয়ে বলল, চল এবার উঠি। প্রায় ঠিক করে এনেছি।

এবার অবনীভূষণ যুবতী দুজনকে উদ্দেশ্য করে বলল, চলুন অন্য কোথাও।

যুবতী দুজন পরস্পর মুখ দেখল। তখন ব্যাণ্ড বাজছে উঁচু পর্দায়, তখন সার্কাসের ঘোড়ার মতো পা ফেলে এই নাচের ভিতরই কেউ কেউ বেলেল্লাপনা করছিল। নাচতে নাচতে কোন এক ফাঁকে দেয়ালের পাশে অথবা সামান্য অন্ধকারের ভিতর পরস্পর পরস্পরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তারপর সব ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গির ছবি। অবনীভূষণ কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারছে না। যুবতীরা সব উটের মতো মুখ তুলে কেবল চুমু খাচ্ছে, কেবল সার্কাসের হাতীর মতো পা মুড়ে বসে পড়তে চাইছে। অবনীভূষণ আবার বলল, চলুন কোথাও। অবনীভূষণ চুল-সোনা মেয়ের হাতে নরম চাপ দিল।

ব্যাণ্ড বাজছে, হরদম বাজছে। সামনের কাউন্টারে ফের দু-একজন করে ভিন্ন

ভিন্ন দেশের নাবিক এসে ভিড় করছে। ওরা কেউ কেউ মাথায় টুপি খুলে তিমি শিকারের গল্প আরম্ভ করল। উত্তর সাগরে ওরা গর্ভিণী তিমি শিকার করতে গিয়ে দুজন নাবিককে হারিয়েছে, এমন গল্পও করল। ওরা গল্প করার সময় পাশের হিটার থেকে উত্তাপ নিচ্ছিল এবং গর্ভিণী তিমির প্রসব সম্পর্কে রসিকতা করছিল।

ভিড় কাঁচঘরে ক্রমশ বাড়ছে। মিশনের ডানদিকে মসৃণ ঘাসের চত্বর এবং মৃত বৃক্ষের মতো কিছু পাইন গাছ—তার নীচে বড় বড় টেবিল্স আর ফাঁকা মাঠে হেই উঁচু লম্বা এক হারপুনার হেঁটে এদিকে আসছে। হারপুনার কাঁচঘর অতিক্রম করে কাউণ্টারের সামনের লোকটির সঙ্গে ফিস ফিস করে কি বলছে। অবনীভূষণ সব লক্ষ্য করছিল। আগের দলটা এতক্ষণ হইচই করছিল মদ খেতে খেতে, কিন্তু হেই উঁচু লম্বা হারপুনারকে দেখে ওরা শিশু-সন্তানের মতো হয়ে গেল। আর তখন কে বা কারা যেন সেই যুবতী দুটিকে উদ্দেশ্য করে লম্বা গলায় বড় রাস্তায় হেঁকে হেঁকে বলে যাচ্ছে—ট্যানি টরেণ্টো...ট্যানি টরেণ্টো...আমাদের বন্ধুবর হারপুনার এবার উত্তর সাগর থেকে গর্ভিণী তিমি শিকার করে ফিরেছে।

উঁচু লম্বা লোকটার টেবিলে সকলে এক এক করে গোল হয়ে বসে গেল। সেই যুবতী দুজন পর্যন্ত উঠে যেতে চাইল। অবনীভূষণ কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারছে না। সে এবার বিদ্রূপ করে বলতে চাইল হ্যাঁগো সতীর দল তোমরা আমাদের ফেলে যাচ্ছ! সে বিরক্ত হয়ে এবার উডকে বলল, উড, তুমি তো বলতে পারো বুঝিয়ে। তোমার সুন্দর মুখ দেখে...।

উডের কথা যুবতী দুজন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে শুনল। ওরা চুল ঘাড়ে যে ভেলের কাঁটা ব্যাগের ভিতর ভরে সেই চৌকোমুখ এবং গামবুট-পরা ভদ্রলোক—গর্ভিণী তিমি শিকার করে এইমাত্র উত্তর সাগর থেকে ফিরেছে—তার টেবিলের দি হাঁটতে থাকল। অবনীভূষণ মদ খেয়েছে। ওর শরীর সামান্য টলছিল। অব ভূষণের ভিতরে ভিতরে এক অপরিসীম তৃষ্ণা—সে পাগলের মতো চুল-সোনা মে হাত ধরে ফেলল। কারণ সে যেন সেই চৌকোমুখ হারপুনার, মাথায় যার হাঙ হাড়ের টুপি যে বিশ্রী এবং যে ওখানে বসে কটু গন্ধের তামাক টানছে, যার চেহ দেখলে মনে হয় মেয়েমানুষ সামান্য বস্তু—তার দৃষ্টি একবারেই সহ্য করতে পারি না। সে রাগে-দুঃখে চুল-সোনা মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যে চাইলে—হারপুনার ব্যক্তিটি ও তার দলবল লম্বা লম্বা পা ফেলে দরজার সাম পথ আগলে দিলে। অবনীভূষণ ক্ষিপ্ত এক জানোয়ারের মতো গর গর করে উঠ মনে হল সেই দলবল অবনীভূষণকে এলোপাথাড়ি মেরে গেছে।

বাইরে সাদা আলোর ভিতর নাক মুছতে গিয়ে অবনীভূষণ দেখল সামান্য নাকের ডগায় জমাট বেঁধে আছে। ভিতরে তখন সেই যুবতী হারপুনারের সা রসিকতা করছিল এবং হাসছিল।—কাঁচের ভিতরে সব স্পষ্ট। সুতরাং অবনীভূ আর সহ্য করতে পারছে না। সে ফের দরজা অতিক্রম করে ভিতরে ঢোকবার চে করলে উড হাত চেপে ধরে বলল, অবনী, তুমি বেশ জোরে হারপুনারকে মেরে লোকটা পেটে লাথি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গল গল করে মদ বমি করছে।

অবণীভূষণের ঝুট-ঝামেলা করার আর ইচ্ছা থাকল না। এবং এখানে য যুবতী অনুসন্ধান করা নিরর্থক ভেবে ওরা পাহাড়ের গায়ে গায়ে অথবা সেতুর পাশে, লোহালক্কড়ের কারখানার দেওয়ালের ছায়ায় এবং যেখানে সব তিমি মাছের চ সংরক্ষণ করার জন্য বড় বড় পিপের সারি সেই সব অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে এক স

শহরের মাঝামাঝি অঞ্চলে এসে গেল।

অবনীভূষণ চড়াই-উতরাইয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় উডকে উদ্দেশ্য করে বলল, আজ এই শীতে সতীর দল গেল কোথায়?

তখন উড সহসা আবিষ্কারের ভঙ্গীতে বলল, ঐ দেখ অবনী, লাইট-পোস্টের নিচে যেন দুজন মেয়ে শিস দিচ্ছে। বলে উড দূরের লাইট-পোস্টের দিকে হাত তুলে নির্দেশ করল।

অবনীভূষণ বলল, চল তবে।

শীতের রাত। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবনীভূষণের মনে হল ওরা শীতে জমে যাবে ক্রমশ। মনে হল ওরা যুবতী দুজনকে বেশি দূর আর অনুসরণ করতে পারবে না। অথবা মেয়ে দুজন এই শীতের রাতে ওদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। পথের ভিড় ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে, দূরে দূরে সব পুলিসের বুটের শব্দ এবং ট্রলি বাসের আলো আর পথে পড়ছে না, শহর ক্রমশ যেন নির্জন নিঃসঙ্গ হয়ে আসছে। উড পর্যন্ত আর জোরে হাঁটতে পারছিল না।

এক সময় ওরা এবং যুবতী দুজন শোকেসের সামনে মুখোমুখি পড়ে যেতেই উড ঝুঁকে বলল, আস্তানা কত দূর?

দুজন বলল, সরি। বোধ হয় অবনীভূষণের লম্বা চেহারা এবং হাতের বড় বড় থাবা, ওদের আতঙ্কিত করেছে।

অবনীভূষণ বলল, সামান্য সময়।

যুবতীরা শক্ত হয়ে গেল। বলল, না। ওরা বরং উডকে সঙ্গে নিতে চাইল।

উড বলল, আমরা দুজন। একা যেতে পারি না।

অবনীভূষণ এবার মরীয়া হয়ে বলল, মেয়ে, এই লম্বা কোটের পকেটে করে নিয়ে যাব তবে—কেউ টেরটি পাবে না। তারপর অবনীভূষণ চারিদিকে তাকাল যেন যথার্থই সে এই দুই যুবতীকে পকেটে পুরে শহর ত্যাগ করে চলে যাবে।

এবার যথার্থই ভয় পেয়ে গেল ওরা। তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় পড়ার জন্য ছোট সরু গলি অতিক্রম করে নেমে যেতে চাইল। পথ আগলে অবনীভূষণ তার দুই হাতের বড় থাবা দেখাল। সে হাত দুটো অঞ্জলির মতো করে রাখল—তৃষ্ণার জল আর কে দেবে? সে যেন বলতে চাইল কথাটা। এবং সে এই নিঃসঙ্গ রাতের আঁধারে উচ্চ-স্বরে সেই ট্যানি টরেণ্টো, ট্যানি টরেণ্টো শব্দের মতো চিৎকার করে নগরীর দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে বলতে চাইল, হায় অবনীভূষণ, এই তৃষ্ণার জল তোমাকে আর কে দেবে!

তারপর অবনীভূষণ সেই যুবতী দুজনকে উদ্দেশ্য করে যেন বলল, আমি তোমাদের সব দেব, তোমরা আমাকে সামান্য স্পর্শ দাও। সামান্য উত্তাপ দাও।

ওরা উত্তর করল না। বড় রাস্তার উজ্জ্বল আলোর নীচ দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে। আর অবনীভূষণ শুনতে পেল সেই আগের মতো দূরে কারা যেন হেঁকে যাচ্ছে—ট্যানি টরেণ্টো...ট্যানি টরেণ্টো...উত্তর সাগর থেকে এক হারপুনার এক গর্ভিণী তিমি শিকার করে ফিরেছে। অবনীভূষণ দুর্গের পাশে পাশে হেঁটে গেল। সর্বত্র যেন সেই একই ট্যানি টরেণ্টো ট্যানি টরেণ্টো শব্দ। সে দু' কান চেপে শীতের ঠাণ্ডায় ট্যাক্সির ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল এবং ট্যাক্সিওয়ালাকে নিজের জাহাজের নাম, ডকের নাম বলে শরীর এলিয়ে দিল। মনে হচ্ছিল হাতে পায়ে বড় ব্যথা, সে ঘাড় নাড়তে পারছে না—পরাজিত এক সৈনিকের মতো আত্মগ্লানিতে ডুবে

গেল।

গ্যাঙওয়েতে কোয়ার্টার মাস্টার পাহারা দিচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন পাঁচ নম্বর সাব এবং ডেক-এপ্রেন্টিস উড হামাগুড়ি দিতে দিতে সিঁড়ি ভাঙছে। ওরা ফেরার পথে প্রচুর মদ গিলেছে ; ওরা সিঁড়ি ধরে সোজা হেঁটে আসতে সাহস পাচ্ছে না। সুতরাং কোয়ার্টার মাস্টার ওদের দুজনকে উঠে আসতে সাহায্য করলেন।

উড স্টারবোর্ড সাইডের কেবিনগুলোর দিকে হেঁটে হেঁটে চলে গেল।

অবনীভূষণ বালকেডে ভর করে নিজের কেবিনের দিকে হাঁটতে থাকল। স্তিমিত আলো এলওয়েতে। সে বড় মিস্ত্রি এবং মেজ মিস্ত্রির কেবিন পিছনে ফেলে যেতেই মনে হল পায়ের সঙ্গে কি যেন জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে। সে যত পা আলগা করতে চাইছে ততই পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাচ্ছিল। সে এবার নুয়ে পায়ের নীচে হাত দিয়ে দেখল একটা কালো রঙের গাউন। সে আলোর ভিতর নাকের কাছে সেটাকে নিয়ে কিছুক্ষণ আলগা করে ঘ্রাণ নেবার সময় দেখল সামনে মেজ মালোমের কেবিন, কেবিনের দরজা খোলা, মেজ মালোম বাংকে উপুড় হয়ে মৃতবৎ পড়ে আছেন। ঘরে সেই বিকেলের যুবতী নেই। মেজ মালোম এক হাতে কোন রকমে প্যান্টটা কোমর পর্যন্ত তুলে রেখে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করছেন। অবনীভূষণ বলল, শালা মদ খেয়েছে। বলে, গাউনটা দরজা দিয়ে মেজ মালোমের মুখের ওপর ফেলে দিল। মেজ মালোমের এখন মুখ ঢাকা এবং শরীর প্রায় উলঙ্গ। সে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল মেজ মালোমের কেবিন। তারপর এনজিন ঘরের সিঁড়ির মুখে নিজের কেবিনের দরজা খুলতে গিয়ে মনে হল ভিতর থেকে কে যেন বন্ধ করে রেখেছে। সে রাগে দুঃখে অপমানে দরজার উপর ভীষণ জোরে লাথি মারল। দরজা খুলছে না। সে তার অবসন্ন শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে এবার দরজার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সে বলল, বাস্টার্ড! সে গাল দিল, সোয়াইন! সে তারপর বাংলা ভাষায় খিস্তি করে ভিতরে ঢুকে বিস্মিত—সে চোখ গোল গোল করে দেখল, সেই বিকেলের যুবতী ওর বাংকে আশ্রয় নিয়েছে। এবং অসহায় বালিকার মতো চোখ। যুবতীকে এখন বুনো কাকের মতো শীর্ণ মনে হচ্ছে অথবা গর্ভিণী শালিখের মতো রোঁয়া ওঠা। সে কী করবে ভেবে পেল না। তারপর বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে সে বলল, কি গো, একেবারে বাঘের মুখে!

যুবতী কিছু বলল না। চোখে মুখে ভয়ের এতটুকু চিহ্ন নেই। যেন এক্ষেত্রে কিছু করণীয় নেই, সব হয়ে গেছে, হয়ে যাবে ভাব। ঝড় এবং জীবনের আর্তনাদ কোথাও থেমে থাকছে না। যুবতী তবু ধীরে ধীরে বাংক ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল। বলল, সরি মিস্টার। সে তার শীর্ণ হাত বালিশের উপর রেখে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেল।

অবনীভূষণ যুবতীটিকে পড়ে যেতে দেখেই বুঝল—সেই বিকেল থেকে বাঁদরের হাড় চুষে চুষে যুবতীর এক কঠিন অসুখ, এক কঠিন স্থবির অসুখ—যা এতক্ষণ অবনীভূষণকে এই শহরময়, নগরময় এবং দুর্ভেদ্য অন্ধকারে বারংবার ঘুরিয়ে মারছে—। অবনীভূষণ তাড়াতাড়ি যুবতীকে ধরে ফেলল। না হলে বাংক থেকে যেন পড়ে যেত মেয়েটি হাত পা কেটে মাথায় আঘাত লাগতে পারত। যুবতীর পড়ে যাবার মুখে কম্বলটা শরীর থেকে সরে গিয়েছিল। অবনীভূষণ দেখল আঁচড়ে কামড়ে যুবতীর শরীর মেজ মালোম ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। লজ্জা নিবারণের জন্য অবনী-ভূষণ তাড়াতাড়ি ফের কম্বলটা শরীরে তুলে দিল এবং শুয়ে পড়তে বলে ঘড়িতে সময়

দেখল—একটা বেজে গেছে, এখন ওকে সামান্য শুশ্রূষা করলে সামান্য সময়ের জন্য এই বন্দর শুভ-বার্তা বহন করবে। এইটুকু ভেবে অবনীভূষণ দরজা ভেজিয়ে চীফ কুকের গ্যালী পর্যন্ত হেঁটে গেল। নেশার ঘোর কি করে যেন একেবারে কেটে গেছে এবং ভিতরের সব দুঃখ ক্রমশ নিরাময় হচ্ছিল। সমুদ্র থেকে তেমনি ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। সে গরম জল করে যুবতীর শরীর ভালো করে ধুয়ে সামান্য শুশ্রূষার পর বলল, আমার জন্য সামান্য খাবার আছে। ইচ্ছা করলে আমরা দুজনে ভাগ করে খেতে পারি।

যুবতী কষ্ট করে হাসল। —আপনি আমাকে বরং একটু সাহায্য করুন।

অবনীভূষণ বলল, কি করতে হবে?

সেকেণ্ড অফিসারের ঘর থেকে দয়া করে আমার পোশাকটা এনে দিন।

অবনীভূষণ মেজ মালোমের ঘর থেকে পোশাকটা এনে দিলে মেয়েটি বলল, আমাকে দয়া করে বন্দরে নামিয়ে দিন। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলে আমি ঘরে চলে যেতে পারব।

বেশ চলুন। বলে তুলে ধরতেই মনে হল যুবতীর মাথা ঘুরে গেছে। সে বসে পড়ল।

আপনি বন্দরের রাস্তাটুকু হেঁটে পার হতে পারবেন না। বরং এখানেই রাতটা কাটিয়ে দিন।

আমার ভয় করছে মিস্টার, সে আবার আসতে পারে। অত্যন্ত কাতর চোখে অবনীভূষণের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

আপনি ঘুমোন, আমি বরং দরজায় পাহারা দিচ্ছি।

যুবতী আর কথা বলতে পারল না। চোখ জলে ভার হয়ে গেছে।

আর অবনীভূষণের মনে হল দীর্ঘ দিন পর সে এক অসামান্য কাজ করে ফেলেছে। সে বলল, আমি বাইরে বসে থাকছি, আপনি নির্ভয়ে ঘুমোন—বলে অবনীভূষণ দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিল এবং ঠিক দরজার সামনে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডার ভিতর পা মুড়ে বসে থাকল এবং জেগে জেগে এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখল—দ্বীপের স্বপ্ন, বড় এক বাতিঘর দ্বীপে—সব বড় বড় জাহাজ সমুদ্রগামী। অবনীভূষণ নিঃশব্দে হাঁটু মুড়ে মাথা গুঁজে বসে থাকল—তার এতটুকু নড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না, যেন জীবনের সাত রাজার ধন এক মাণিক, খুবই হাতের কাছে রয়েছে। তাকে গলা টিপে মারতে নেই। সুতরাং সে উঠল না এবং এই দু

আলো'র পথ বলে মনে হল অবনীভূষণের।

# বিজন

সমুদ্রে বৃষ্টি পড়ছে। প্রথমে ইলশে-গুঁড়ি, তারপরে জোরে। জোরে বৃষ্টি নামল। মাস্তুলের গা বেয়ে বৃষ্টি ডেক ভিজাল। এখন ফল্কা ভিজছে। গ্যালীর ছাদ থেকে ব্রিজের ছাদ, চার্টরুমের ছাদ সব ভিজছে। কুয়াশা-মন ভাব বৃষ্টির। সেলিম ফোকসালে কাশছে। বৃষ্টি, সমুদ্র এবং জাহাজ সেলিমের বুকের যন্ত্রণায় কাতর হল না। বৃষ্টি পড়ছে—পড়ছে। সমুদ্রে তরঙ্গ। জাহাজ নীল জলে নোনা রঙে সাঁতার কাটছে। ফোকসাল যখন খালি, বাংকে যখন কেউ নেই, জাহাজীরা যখন ডেকে দড়িদড়া টানছে তখন কম্বলের নীচে শুয়ে বিড়ি ধরানো যাক। সে বিড়ি ধরালো এবং কম্বলের নীচে বিড়ির ধোঁয়াকে ফুঁ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। তারপর কম্বলটা দিয়ে গোটা ধোঁয়াকে চেপে ধরে দরজার দিকে তাকাল। কেউ নেই। কেউ সিঁড়ি ধরে নামছে না। সে নিশ্চিন্ত হল। অথচ পোর্টহোলের কাঁচে সমুদ্র এবং আকাশের প্রতিবিম্ব। সেলিম কাঁচে নিজের প্রতিবিম্বও দেখল। চোখ দুটো ওর পালক ওঠা মুরগীর মতো। চোখ দুটো পোর্টহোলের কাঁচে আকাশ এবং সমুদ্রের মতো নীল হতে পারে নি। সাদাটে অথবা বরফ-ঘরের চার-পাঁচ মাসের বাসি গোস্তের মতো। সেলিম কাশির সংগে রক্তের দলাটা কোঁত করে করে গিলে ফেলল এবার।

দুপুর থেকে শুনে আসছে-উপকূল দেখা যাচ্ছে। সকলে ডেকে চিৎকার করছে-কিনারা দেখা যাচ্ছে। সকলে উপরে হল্লা করছে। সেলিম কোন রকমে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছিল, সেও মাটি দেখবে, মাটি দেখে উত্তেজিত হবে, কিন্তু সিঁড়ির মুখেই সারেঙের ধমক, কোথায় যাচ্ছ মিঞা! মরণের দাওয়াই কানে বাঁধতে চাও? সেলিম ভয়ে ফের ফোকসালে নেমে এসেছিল। শুধু বাংকে শুয়ে সব যেন ধরতে পারছে—যেন কিছু সমুদ্রপাখি ফল্কায় বসে ভিজছে। পাখিরা ফল্কায় একদা বসতের মতো আশ্রয় নিয়েছে। উপকূল দেখে অথবা দ্বীপ দেখে ওরা উড়ছে। এমত ভেবে সেলিম কাশল। সমুদ্রপাখিরা হয়তো এতক্ষণে উড়ে গেছে। ওর জানার ইচ্ছা হল ওরা আকাশে উড়ছে, না দ্বীপের পাশাপাশি কোথাও উড়ছে। আর কেন জানি এই সময় বারবার ওর বিবির কথা মনে হচ্ছে। বিবির মুখে সুখের ইচ্ছা, সখের ইচ্ছা। সেলিমের শরীরে যন্ত্রণা, বুকে যন্ত্রণা। সে যেন বলতে চাইল—এবার আমরা ফিরব, বিবি। ছোট ঘরে তুই তোর খসমের মুখ দেখবি। জাহাজ এবং সমুদ্র উভয়ই আমাদের বিনাশ করতে পারে নি। আমি ফিরব, ফিরব। আমরা ফিরব। খতে এমন একটা প্রত্যয়ের কথা লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে সেলিমের।

দীর্ঘ সফর, নোনা পানীর অশ্লীল একঘেয়েমি এত দিন ওকে দেশে ফেরার জন্য মাতাল করতে পারে নি। সেলিম ওয়াচ করেছে, ফোকসালে এসে শুয়েছে, হাত পা ছড়িয়ে, অশ্লীল চিন্তা করতে করতে সমুদ্রের বুকে ঘুম দিয়েছে; অথবা

হিসাবের কাড়ি গুণে—সফর শেষ হতে কত দেরী—এই সব ভেবে স্থান-কাল পাত্রের কিংবা বন্দরের বেশ্যামেয়ের হিসাবের কাড়ি গুণেছে। গুণতে গুণতে ওর একদিন কাশি উঠল। এবং এই করে জ্বর। বন্দর থেকে বন্দর ঘুরে জ্বর বেড়েছে। শরীর ভেঙেছে। এক বন্দরে কাপ্তানের কাছে আর্জি পেশ করেছে—সাব, একবার হাসপাতালে যাব। কাশির দেমাকে আর বাঁচিছি না। মনে হচ্ছে, মরে যাব।

এই নিয়ে অন্য ফোকসালে কথা হচ্ছিল। কথা হচ্ছিল, এ বন্দর নিয়ে পাঁচ বন্দর হবে অথচ সেলিম এখনও জাহাজেই আছে। সেই কবে ফ্রি-ম্যান্টেল বন্দরে ওকে ডাক্তার দেখানো হয়েছিল ডাক্তার বলেছিল, আর নয়, আর জাহাজে রাখা চলবে না। বন্দরে নামিয়ে দিতে হবে। হাসপাতালে পাঠাতে হবে। এ-অবস্থায় জাহাজে রাখা নিরাপদ নয়।

সেলিম এখনও জাহাজেই আছে। সে কাশছে। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠলেই কোঁত করে ঢোক গিলছে। কিছু দিন থেকে এটা ওর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সে সকলকে বলছে কাশির ব্যামোটা তেমন নয়। ওটা ছেড়ে যাবে। কোম্পানি দামী দামী ওষুধ দিচ্ছে। দিচ্ছে বলেই এবং বাড়িয়ালা গা করছে না দেখে সেও বুঝেছে ওটা ধীরে ধীরে সেরে যাবে। কাশি যখন বেশি হয় তখন সেলিম অপরাধের কথা ভাবে। নিজের অপরাধের কথা। বিবিকে নিয়ে অথবা বন্দরে দেখা কোনো মেয়েকে নিয়ে বিছানায় পড়ে থেকে অশ্লীল ধারণায় অথবা অশ্লীল আবেগ মেখে শরীরে উত্তাপ সঞ্চয়ের বৃথা চেষ্টা না করলেই হত। অথচ রক্ত কম উঠলে ওষুধে কাজ করছে এমত ভেবে সে খুশি হয়। ওর ইচ্ছা ওর দুরূহ রোগের কথা কেউ না জানুক, কেউ না ভাবুক সে দুরূহ রোগে ভুগে মরে যাবে। অথচ প্রত্যয়ের ঘোরে এই ভেবে খুশি—সে ঘরে ফিরবেই। বিবি তার খসমের মুখ দেখে উজ্জ্বল হবেই। এ-শরীর সে কিছুতেই সমুদ্রে অথবা বিদেশ বন্দরে রেখে যেতে চাইছে না। সে সকলকে শুধু জিজ্ঞেস করছে—জাহাজ কবে ফিরবে? কবে আমরা ঘরের বন্দর পাব?

জাহাজীরা কেউ বলেছে, সিডনী থেকে পুরানো লোহা নিয়ে জাহাজ যাবে জাপানে।

কেউ বলেছে, গম নিয়ে তেলবাড়ি।

সেলিম এই সব খবরে বিষণ্ণ হয়েছে। খুব অসহায় ভঙ্গীতে পোর্টহোলে মুখ রেখে দিগন্তরেখায় নিজের দেশকে খুঁজেছে। কখনও অপলক সমুদ্র দেখেছে। জলের নীল বিস্তৃতি দেখেছে।

সেলিম স্থির করল কাপ্তানকে শেষবারের মতো বলবে, আমায় দেশে পাঠিয়ে দিন, মাস্টার। ঘরে ফিরে আমি বিবির কোলে মাথা রেখে মরব। জাহাজে আমি মরব না। সমুদ্রে আমি মরব না। বিদেশ-বন্দরে আমি মরব না। শুয়ে শুয়ে সেলিম এই সব ভেবে উত্তেজিত হতে থাকল।

তখন সিঁড়িতে শিস দিচ্ছে বিজন। সেলিম শুয়ে শুয়ে শুনছে। এ-কেবিন সে-কেবিন সে উঁকি মারল। এনজিন-পরীদাররা ঘুমোচ্ছে। এনজিন-পরীদাররা (যারা চারটা-আটটার পরীদার) গল্প করছে। বিজন লক্ষ্য করল শিস দিতে দিতে, সতেরো মাস সফর ওদের ক্লান্ত করতে পারে নি। বিষণ্ণ করতে পারে নি। জাহাজটা আরও যদি সতেরো মাস সমুদ্রের নোনা জল ভাঙে, যদি আরও সতেরো মাস বন্দরে না ভিড়ায় তবু নিশ্চিন্ত নির্ভরে জাহাজ চালিয়ে যাবে। বিজন

দ্বিতীয় সিঁড়ির মুখেই শুনল—সেলিম কাশছে। কাশির জন্য দম নিতে পারছে না। বিজন আর শিস দিল না। প্রতি দিনের মতো সে ফের সেলিমের জন্য কষ্ট পেতে থাকল। সে ফোকসালে ঢুকে বলল, একবার কাপ্তান সাহেবকে বল্ হাস-পাতালে দিতে। এ-ভাবে আর কত দিন বাংকে পড়ে থাকবি। রাতে জাহাজ বন্দর ধরবে।

সেলিম মুখের ওপর থেকে কম্বলটা সরাল। চোখ দুটোতে সোনা পানী অথবা আকাশের রঙ নয়, কালো রঙ নয়, অথবা বেতফলের মতো রঙও ধরতে পারে নি—অথচ আশ্চর্য এক রঙ ধরেছে যা দেখলে সকলের ভয় হবে। অথচ মায়া হবে। সকলের মনে হবে, সেলিম রহমনে রহিম হওয়ার জন্য শরীর স্থির করতে চাইছে। এবং বাংকের সঙ্গে মিশে গিয়ে অদৃশ্য হতে চাইছে।

বিজন বলল, বলিস তো আমরা সকলে মাস্তার দি'। সারেঙকে বলি মাস্তার দিতে। এভাবে আর কত দিন ভুগবি। জ্বর কাশি দেখে-শুনে তো ব্যাপারটা ভালো লাগছে না।

সেলিম সহসা উঠে বসল। তারপর আশ্চর্য রকমের স্নিগ্ধ এবং করুণাঘন মুখ করে হাসল। তারপর ফের দুঃখময় প্রকাশে বলল, বিজন রে, তোর মতো যদি একটু ইংরেজী বুলি জানতাম, তবে আমার সব হত। সারেঙ আর কাপ্তান কি বুদ্ধিই করেছে খোদাই জানে। তুই সকলকে বলে কয়ে মাস্তার দে। আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিতে বল। দেশে ফিরে বাঁচি।

বিজন এই বাংকে বসে কি করে যেন বুঝল সেলিমের এই দুরূহ রোগ নিয়ে জাহাজে ষড়যন্ত্র চলেছে। সে ভেবে অবাক হল, কেন সে সারেঙকে বলল না, ওকে এবার অন্য ঘরে রাখতে হবে আর অন্য উপায় নেই, অথবা কেন সে মেজ মালোমকে ডেকে একবার চিকিৎসার সুব্যবস্থার কথা বলতে পারে নি এত দিন! সেও আজ পোর্টহোল দিয়ে সমুদ্র দেখল। তারপর উপকূল। উপকূলে পাখিরা ফিরে যাচ্ছে। সেলিমের মুখ পাণ্ডুর। জাহাজটা চলছে এবং সেলিমের শরীর নড়ছে। সেলিমকে দেখলে আত্মহননের কথা মনে হয়। বিজন বাংক থেকে ওঠার সময় সেলিমকে ফের লক্ষ্য করল। ওর কম্বলের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সে হাসল। সেলিমও হাসল। ওরা পরস্পর দুঃখটুকু ধরতে পেরে ফের দুজনই অন্যমনস্ক হতে চাইল। বিজন দরজা ধরে বের হচ্ছে। সারেঙের ঘরে উঁকি মেরে সে দেখল, তিনি নেই। ফোকসালে নেই। নিশ্চয়ই মেজ মালোমের কেবিনে অথবা ফরোয়ার্ডপিকে আছেন। বিজন ডেকের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকল।

বন্দরে জাহাজ ভিড়বে বলে সারেঙ ডেক-কসপের নিকট দাঁড়িদড়া সব বুঝে নিচ্ছে। বিজন ডেক অতিক্রম করে কসপের ঘরের দিকে যাচ্ছে। সে একবার দাঁড়াল। বড় মালোমের পোর্টহোলে উঁকি দিল। বড় মালোম কেবিনে নেই। বিজনের ইচ্ছা হল বড় মালোমকে বলতে—আপনার জাহাজে এমন একটা দুরূহ রোগ পুষে রাখছেন, সেলিমকে হাসপাতালে দেওয়া হবে না, দেশে পাঠানো হবে না, কোম্পানির টাকা বাঁচানো হবে, অন্যান্য জাহাজীরা পর্যন্ত নিরাপদ নয়—এমতাবস্থায়ও আপনারা চুরি করে মদ গিলতে পারছেন!—আশ্চর্য! সে ভেবে আশ্চর্য হল। সে হাঁটল।

সে সারেঙকে বলল, চাচা, চোখ বুজে আর কত দিন থাকবেন?

সারেঙ ফিসফিস করে বলল, তোমার এত মাথাব্যথা কেন? বেশ তো আছ।

সফর করছ। তোমার তো কোন অসুবিধা করছে না কোম্পানি।

সেলিমের মুখ দিয়ে কফের সংগে রক্ত উঠছে। আপনি জানেন এটা অন্যান্য জাহাজীদের পক্ষে কত ক্ষতিকর। তাছাড়া দেখছি সেলিম বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। এ নিয়ে পাঁচ বন্দর হল অথচ কোন বন্দরেই ওকে হাসপাতালে দেবার ব্যবস্থা করছেন না।

সব জানি বাপু। সব বুঝি বাপু। অথচ জেনে শুনেও চুপ করে আছি। বাড়িয়ালার ইচ্ছা নয় সেলিম হাসপাতালে থাকুক। কোম্পানির অযথা এত খরচ করাতে বাড়িয়ালা রাজী হচ্ছে না।

তবে ওকে দেশে পাঠিয়ে দিন। দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

দু-একজন করে তখন অন্য জাহাজীরাও ওর চারপাশে জড়ো হচ্ছে। ওরা শুনছে। ওরা সারেঙের মুখ দেখছে। বিজনকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। সেই লঘু পরিহাসজনিত অথবা হালকা সুরের শিস দেওয়া মুখ কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। সমুদ্রের উদার নীল বিস্তৃতিতে ওরা কয়েকজন কেমন অসহায়ের ভংগীতে ডেকে পদচারণা করছে। এনজিনের শব্দ, সমুদ্রের তরল ঠাণ্ডা হাওয়া ওদের নিঃশব্দ এই ভাবটুকুকে নিদারুণ দুঃখময় করে তুলছে।

রাত্রিতে সব জাহাজীরা যখন একত্রিত হল, একমাত্র আটটা-বারোটার পরীদাররা যখন নিচে বয়লারে কাজ করছে, যখন ওরা সকলে শুনল, জাহাজ বন্দর ধরবে সকাল দশটায়—রাতে আর পাইলট-বোট আসছে না, ডেক-জাহাজীরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে, তখন ওরা বিজনের ঘরে জড়ো হয়ে বলল, আমরা সকলে একযোগে বিদ্রোহ করব। আমরা সকলে জাহাজ চালাব না। কাপ্তান আসুক, ডেক-সারেঙ, এনজিন-সারেঙ আসুক—কেউ আমাদের নড়াতে পারবে না। আমাদের কথা শুনলে আমরা ওদের কথা শুনব। সেলিমকে হাসপাতালে পাঠালে অথবা দেশে পাঠালে আমরা কাজে যাব। জাহাজ চালাব।

একজন বলল, জাহাজী বলে আমরা গরু-ভেড়া নই।

অন্যজন বলল, জাহাজী বলে আমরা বিনা নোটিশে মরব তেমন দাসখত দেওয়া নেই।

অথচ দেবনাথ বলল, বিজন, এটা নিয়ে তোমার ক'সফর জাহাজে?

বিজন বিস্মিত হল। দেবনাথ ভালো ভাবেই জানে এটা ওর ক-নম্বর সফর। ভালো ভাবেই জানে প্রথম সফরে সে কোন্ কোম্পানির কোন্ জাহাজে কাজ করেছে। তবু দেবনাথ যখন এমন একটা প্রশ্ন করল এবং দেবনাথ যখন খুব জরুরী ভেবে ওকে প্রশ্নটা করেছে তখন একটা যথোচিত উত্তর দেওয়াই যুক্তিসংগত। সে বলল, তুমি তো জানো দেবনাথ—এটা আমার দু-নম্বর সফর।

এখনও তুমি ঠিক জাহাজী হও নি। তারপর কি ভেবে বিজনকে দেবনাথ অন্য ফোকসালে নিয়ে গেল। এখানে কেউ নেই, কেউ থাকে না। জাহাজীরা এখানে কাজে যাওয়ার আগে জামা-কাপড় ছাড়ে। ঘরটা একেবারেই খালি। দেবনাথ ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। এবং বলল, তুমি এর মধ্যে থেকো না। শেষে সকলে বেঁচে যাবে, কেবল তুমি মারা পড়বে। কাপ্তান তোমার নলী খারাপ করে দেবে। তখন তোমার পিছনে ওরা কেউ দাঁড়াবে না। আমি ওদের ভালোভাবে চিনি।

বিজন কথা বলল না। চুপ করে দেবনাথের পরামর্শ শুনল। শেষে জবাব

দিল, কিন্তু সেলিম যে মরে যাবে?

মরে যাবে তো তুমি কি করবে? তোমার উপর ট্যান্ডল আছে, সারেঙ আছে—ওরা দেখছে না, তুমি দেখে কি উপকারটা সেলিমের করবে? এটা মাত্র তোমার দু'সফর। অনেক দেখবে কিন্তু জাহাজে বিদ্রোহ করলে চলবে না।

তার জন্য কোন প্রতিকারের দাবী আমরা তুলব না!

দেবনাথ খুব অভিজ্ঞ লোকের মতো বলল, বম্বের নৌবিদ্রোহের আমি আসামী। তাই তোমাকে এতগুলো কথা বললাম। তোমাকে মাস্তার দিতে বারণ করলাম। তা ছাড়া আমি এই সব জাতভাইদের চিনি। ওরা শেষ পর্যন্ত তোমার কথা কেউ বলবে না। ওরা ওদের জাতভাইদের কথা বলবে, সারেঙের কথাই শুনবে। মাঝখান থেকে তুমি ব্ল্যাক-লিস্টেড হবে।

বিজন আর কোন কথা না বলে দরজা ঠেলে বের হয়ে এলো। সে দেখল, সকলে ওর ঘরে তখনও পরামর্শ করছে। সকলে উদ্গ্রীব হয়ে আছে। বিজনকে দেখে ওরা বলল, চল, মাস্তার দি বোট ডেক-এ।

বিজন দেবনাথের কথাগুলো আর একবারের জন্য ভেবে নিল। আর একবারের জন্য সকলের মুখ দেখল। সকলের মুখ ভয়ানক হয়ে উঠেছে। বিজন বুঝতে পারল—এই সমস্ত মুখের ছবি মিথ্যা হবার নয়। ওরা কখনই ওকে অন্ধকার পৃথিবীতে ঠেলে দেবে না। বিজন দৃঢ় গলায় কিছু বলতে যাচ্ছিল, তখন সারেঙ নিচে নেমে এল ডাকল-ইসকান্দার, সামসুদ্দিন, রহমান, শোভান। ওরা ধীরে ধীরে ঘর থেকে একান্ত বশংবদের মতো বের হয়ে যাচ্ছে। সারেঙ বলল, কাপ্তান তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

এই ঘটনায় বিজন খুব ভেঙে পড়ল। এবং অসহ্য উত্তেজনায় ভুগতে থাকল। প্রচন্ড শীতের ভিতর সে ওর নিজের ঘরে পায়চারি করছে। দেবনাথ উপরের বাংকে শুয়ে নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে। পোর্টহোল দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছে বলে বিজন কাঁচটা বন্ধ করে দিল। সারেঙের সেই রক্তচক্ষুর কথা মনে হল এবং ভাবল কত সহজে সব নাবিকদের নিয়ে সে উপরে উঠে গেল। সে এই ফোকসালে, এই ঠান্ডায় পায়চারি করতে করতে ধরতে পারছে। ধরতে পারছে সারেঙ ওদের কি বলছে এবং কি বলে ওদের ভয়ানক প্রত্যয়কে ভেঙে দিচ্ছে। সেলিম এখনও কাশছে তার ফোকসালে—ফোকসালের অন্য বাসিন্দা কোরাণ-শরীফ পাঠ করছে বাংকে। সে পায়চারি করতে করতে সব শুনল। জাহাজটা নোঙর ফেলে আছে বলে স্টীয়ারিং এনজিনে কোন শব্দ নেই। সব কেমন নিঃসঙ্গ, সব কেমন নিঃশব্দ যেন। ডেক থেকে সারেঙের কথা ভেসে আসছে। সকলকে সারেঙ জোর গলায় কথাগুলো বলল। বলে ওদের ভয়ানক বিদ্রোহের প্রতিবিম্ব মুছে দিল। সারেঙ ওদের বলল, তোরা তো জানিস কলকাতা বন্দরে চাল্লিশ হাজার নাবিক খোদা হাফেজ বলত, এখন কিছু কিছু লোক ঈশ্বর, ভগবান বলতে শুরু করেছে। তোরা যদি বাঙালীবাবুদের কথায় মাতিস, তোরা যদি জাহাজে বিদ্রোহ করিস তবে তোদের চাল্লিশ হাজার চাল্লিশে নামতে আর বেশি দেরী নেই।

এক সময় কাপ্তান সারেঙকে ডেকে পাঠালেন।

ব্রিজ থেকে কাপ্তান বললেন, কি বলছে সব?

ভাঙা ভাঙা ইংরেজী এবং হিন্দিতে ডেক-সারেঙ বলতে থাকল, সব গুড, সাব। সব ঠিক হ্যায়। জাহাজী লোক ভেরী গুড, সাব। বাঙালী বাবুলোক নো

গুড, সাব। বাঙালী বাবুলোক গিভস্ ট্রাবল্। বাঙালী বিজন, ইয়েস বিজন তেইশ রুপায়াকা খালাসী, ও তো সাব রিংলীডার আছে। দুটো-চারঠু ইংলিশ স্পীকিং আছে, সাব। প্যাসেন্ট্কে লিয়ে কুচ ফাইট দেনে মাংতা। লেকিন নাও অলরাইট, সাব। বিগ বিগ টক লেকিন নো জব। ভেরী লেজী বাগার। সারেঙ এই পর্যন্ত বলে পায়ের কাছে থুথু ফেলল। ফের মুখ তুলতেই দেখল বাড়িয়ালা নিজের কেবিনে ঢুকে গেছেন। কেবিনে পেয়ালা-পীরিচের শব্দ। নিচে অফিসার-গ্যালারীতে চীফ কুক আগুন পোহাচ্ছে। সিঁড়ি ধরে নামবার সময় সে এখানেও থুথু ফেলল।

সমুদ্রে সূর্য উঠছে। একদল পাখি উড়ছে আকাশে। দূরে ইতস্তত জাহাজ নোঙর করা। অনেকগুলো বয়া অতিক্রম করে পাইলট-শিপ। অনেকগুলো জেলেডিঙি এই শীতের ভোরেও মাছ ধরতে বের হয়ে পড়েছে। আকাশ নীল, সমুদ্র নীল। জাহাজের চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বের হয়ে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। ওরা সমুদ্র ধরে উপকূলে উঠে যাচ্ছে। উপকূলের স্কাই-স্ক্র্যাপারগুলো ম্যাচবাক্সের মতো মনে হচ্ছে। এই সব দেখার জন্য জাহাজীরা ডেকে দাঁড়াল। অথবা দড়ি-দড়া টানার জন্য ডেক থেকে টুইন-ডেকে নেমে যাচ্ছে। এখন ওরা দাঁড়িদড়া টানছে। হাসিল নীচে নামিয়ে দিতে চাইছে। মেজ মালোম গলুইয়ে চলে এসেছেন। বড় মালোম ফরোয়ার্ড-পিকে চলে গেছেন। বিজন হাসিল কাঁধে বড় মালোমের পিছনে ছুটছে। তিনটে টাগবোট এসেছে, পাইলট এসেছেন। পাইলট ডেক থেকে বোট-ডেকে এবং ব্রিজে উঠে গেলেন।

বড় মালোম বললেন, গতকাল তুমি জাহাজীদের উত্তেজিত করেছিলে?

বিজন হাসিল পায়ের নীচে রেখে বলল, হ্যাঁ, স্যার। করেছিলাম।

আমি খুশি হয়েছি শুনে। বড় মালোম কসপকে স্টোর-রুমে যেতে বলে এ-কথাগুলো বিজনকে বললেন।

ওদের ভিতর আর কোন কথা হল না। একদল জাহাজী ফরোয়ার্ড-পিকে উঠে গেছে। ওরা ওয়ারপিন্ ড্রাম ঘুরাচ্ছে, ওরা উইঞ্চ চালাচ্ছে। তারপর হাপিজ-হাড়িয়া এই ধরণের কিছু শব্দ। বিজন এবং অন্যান্য জাহাজীরা প্রায় আধঘণ্টা ধরে ফরোয়ার্ড-পিকে কাজ করল, কিছু কাঁচা খিস্তি করল। কাজ শেষ হলে নীল উর্দি ছেড়ে ওরা দাঁড়িয়ে থাকল ডেকে। কেউ নীচে নামল না। খাড়ি ধরে জাহাজ বন্দরে ঢুকছে। ওরা দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দৃশ্য দেখল। সমুদ্রের খাড়ি ধরে জাহাজ বন্দরে ঢুকছে। দু-পাশে পাথরের পাহাড়; অতিকায় তিমি মাছের মতো কালো কালো সব পাথর। পাথরের পাহাড়। কুৎসিত এই সব পাথরের পাশে ছোট ছোট অনেক রকমের ফার-জাতীয় গাছ। পাতাগুলো শীতের হাওয়ায় কাঁপছে। নীচে সব নৌকো-বাইচ হচ্ছে। দু-পাশের জনতা চিৎকার করছে। এই সব দৃশ্যে ওরা সকলে মাটির গন্ধ নিতে চাইল এবং এই জনতার মতো উন্মত্ত হতে চাইল। এই সব দৃশ্য দেখে বিজন জাহাজী যন্ত্রণার উপশম খুঁজছে।

অথচ বিজন দীর্ঘ দু-সফরে প্রকৃত জাহাজীর মতো বাঁচতে গিয়ে মাঝে মাঝে খুব বিব্রত হয়ে পড়ছে। পরিবারের কিছু সংস্কার, বিশেষত ধর্মের—সে কিছুতেই ছাড়তে পারছে না। এখনও বীফ্ গ্যালারীতে এলে সে ভালো ভাবে খেতে পারে না। মেথনাথের মতো গোমাংস-ভক্ষণে তৃপ্তি নেই। জাহাজীদের প্রচণ্ড রকমের ইতর জীবনকে সে গ্রহণ করতে পারছে না। অথচ এই সব ইচ্ছাগুলো তাকে মাঝে

মাঝে টানে। তখন সে কাঁচা খিস্তি করে, শিষ দেয়, অযথা ফোকসালে বসে রঙের টব বাজায় এবং কাপ্তান ও তাঁর পারিষদদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করে।

বিজন একদা কিছু লেখাপড়া করেছিল অর্থাৎ গ্রামের বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করেছিল। অন্য দশটা অসামাজিক ছেলে-ছোকরার মতো বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজের খালাসিতে নাম লেখায় নি। বেঁচে থাকার জন্য এবং এই জীবনকে আরও দীর্ঘ করার জন্য এই জাহাজের কাজ, জাহাজী হওয়া। 'হালিসহর' এবং 'ভদ্রা'র ট্রেনিং শেষ করেছে একদা, জাহাজের প্রথম সফরে দুনিয়া ঘুরেছে এবং ইংরেজী বুলিতে রপ্ত হয়েছে। জাহাজী হয়ে উপরি পাওনা হিসাবে চটপট পরিবেশকে মানিয়ে চলার স্বভাব এবং দেহজ আবেগধর্মিতার জন্য মানুষের ভালো করার সুকোমল বৃত্তির কিছু অধিকার সহজে পেয়ে গেছে। সেজন্য সেলিমকে কেন্দ্র করে একটি অশেষ দুঃখ ওকে এখনও মাঝে মাঝে উত্তেজিত করছে। খাড়ির সঙ্কীর্ণতা এবং মানুষের এই আনন্দ সেই অশেষ দুঃখকে যেন আরো বাড়িয়ে দিল। সে বড় মালোমকে বলল, কত দিন থাকব এখানে স্যার? যেন তার জাহাজ ভালো লাগছে না।

বড় মালোম বললেন, বলতে পারছি না। এনজিন রুমে ইন্সপেকশান্ আছে।

সারেঙ বলল, সরফাই হবে জাহাজে। জাহাজ বন্দরে বসবে। ঠিক তখনই বিজন দেখল দুজন জাহাজী সেলিমকে ধরে ধরে বোট-ডেকে তুলছে।

কাপ্তানের সামনে দাঁড়িয়ে সেলিম বলল, সাব, আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেন। সারেঙ ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কথাটা অনুবাদ করে শোনাল।

কাপ্তান বললেন, আমিও তাই চাইছি। হাসপাতালে দিলে তোমাকে ওরা সহজে ছাড়বে না। জাহাজ এখান থেকে তোমার দেশেই যাচ্ছে। এই বলতে গিয়েই দেখলেন কাশির সঙ্গে সেলিমের মুখে রক্ত। সকলের সামনে ধরা পড়ে যাবে ভয়ে সে এখানেও কফটা গিলে ফেলল। কাপ্তান ব্যাপারটা উপলব্ধি করলেন। তাহলে অসুখটা অনেক দূর গড়িয়েছে। কোম্পানির ওষুধ এবং ইনজকশন কোন কাজে আসে নি। তিনি সারেঙকে ডেকে বললেন, ওকে সকলের সঙ্গে রাখা চলবে না। ওকে ওপরে তুলে আনো এবং কোন খালি কেবিনে ফেলে রাখ। ওর ভাতের থালা এবং মগ ভিন্ন করে দাও। তোমরা কেউ ওর জিনিসপত্র ব্যবহার করবে না। কাপ্তান সারেঙকে অন্যত্র নিয়ে কথাগুলো বললেন। বললেন, সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে সেলিম দুরূহ রোগে ভুগছে। যে ক-টা দিন বাঁচে এ-জাহাজেই বাঁচুক।

তারপর তিনি সেলিমের সামনে এসে বললেন, জাহাজ বন্দরে ভিড়লেই তোমাকে কোম্পানির ভালো ডাক্তার দেখানো হবে। আশা করছি তুমি শীগগিরই ভালো হয়ে উঠবে। 'ঈশ্বর তোমায় করুণা করুন' এই বক্তব্যে তিনি স্বয়ং যেসাস-এর মতো চোখ বুজলেন।

বাড়িয়ালার এই পাদ্রীসুলভ চেহারাতে সারেঙ বিমুগ্ধ হল। পীর-পয়গম্বরের মতো তিনি হয়তো কোন ওক্তে সারেঙকেও দোয়া জানাবেন। সে এবারে বলল, সাব, ইউ ফাদার। ইউর শিপ, ইউর ম্যান, ইউ সি সাব এভরিথিং। সারেঙ এই সব বলে এই মুহূর্তে দোয়া ভিক্ষা করছে। অর্থাৎ সেলিমের প্রতি বিগলিত করুণার অংশীদার হতে চাইছে।

বিজন ডেকে কাজ করতে করতে সব দেখল। সে জাহাজ জেটিতে বাঁধতে

দেখল। বন্দরের পথ ধরে সব শহরবাসীরা সামনের ঝুলন্ত ব্রিজের দিকে যাচ্ছে। কিছু টিনের শেড অতিক্রম করে মাঠ। সে দেখল সেলিমকে ডেকের উপর দিয়ে দুজন লোক সেই নিঃসঙ্গ কেবিনটায় নিয়ে যাচ্ছে। সেলিম সেখানে থাকবে, সেখানে খাবে, সেখানে শোবে। বিজন এও বুঝল যেন সেলিম আর বেশী দিন বাঁচবে না। জাহাজের ওই ঘরটাতেই অন্য দিন বিজন এবং অন্যান্য কয়েকজন জাহাজী মিলে কিছু পাথর, দুটো বড় গানী-ব্যাগ যত্ন করে এক কোণায় রেখে দিয়েছিল। জাহাজে মৃত্যু হলে সমুদ্রে এই সব পাথর এবং গানী-ব্যাগ দিয়ে সলিল-সমাধি দেওয়া হবে। দেহজ আবেগ-ধর্ম তার জন্য ওর সুকোমল বৃত্তিরা ওকে ফের অশেষ দুঃখময় যন্ত্রণাতে আচ্ছন্ন করে দিছে। কাপ্তানের নিষেধ আছে বলে সে আর ঘরে ঢুকল না। পোর্টহোলের কাঁচ ফাঁক করে দেখল, সেলিম বাংকে শুয়ে সেই পাথর এবং গানী-ব্যাগগুলো দেখছে। শরীরটা ওর স্থির। সে এখন কফ চুরি করে গিলে খাচ্ছে না। এখন সে নীচের পাত্রে কফ ফেলছে। এবং সঙ্গে কিছু রক্ত পুঁজ ফেলছে। পোর্টহোল দিয়েই বিজন কথা বলল, বিকেলে ভাবাছ কিনারায় যাব। তোর জন্য কিছু আনব কি?

কি আর আনবি। মুখে আমার বিস্বাদ শুধু।

কিছু কমলা, কিছু আপেল?

সে অনেক দাম। অত দামের ফল আনবি না। আমার টাকার বড় দরকার, বিজন। দেশে ফিরব। শরীরের চিকিৎসা আছে, বিবি আছে, বাচ্চা আছে। ওদের জন্য ঘর করতে হবে। জমি করতে হবে। ঘর জমি হলে জাহাজে আর সফর দেব না। জমি-জিরাত দেখে, বিবি বাচ্চা দেখে আল্লার ঘরে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেব।

বিজনের মুখে বিষণ্ণ হাসি। পোর্টহোলের কাঁচ বন্ধ করে দেবার সময় সে ইচ্ছে করেই সেলিমের শরীর থেকে জোর করে চোখ তুলে নিল। ওর খোঁচা খোচা দাড়ির ভিতর যে মুখ, যে মুখে একদা বসন্ত হয়েছিল, যে শরীর বাচ্চার জন্ম দিয়েছে—সেই মুখ, শরীর এবং দাড়ি ওর চোখের সামনে মৃত অক্টোপাসের মতো পচা দুর্গন্ধময় ফুলো ফুলো শব হয়ে যাচ্ছে। সে জোর করে পোর্টহোলের কাচ বন্ধ করে দিল এবং ভয়ে চোখ বুজে ফেলল।

ভোর থেকেই সমুদ্র থেকে হাওয়া উঠে আসছে। ঠাণ্ডা হাওয়া। বিকেলে সে-হাওয়ার গতি আরো বাড়ল। প্রচণ্ড শীতে বিজন ওভারকোটের পকেটে হাত ঢোকাল এবং কোন রকমে ম্যাচটা বের করে সিগারেট ধরাল। এখানে হয়তো দুদিন পর বরফ পড়বে, সে ভাবল। প্রচণ্ড শীত মাটির শেষ উত্তাপটুকু যেন শুষে নিচ্ছে। দূরে পাইন গাছগুলো থেকে পাতা ঝরছে। গাছগুলো ক্রমশ হালকা করছে শরীর। তারপর একদিন এই শীতের দৃশ্য প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রস্তরীভূত হবে যেন পাইন গাছগুলো। পাখিরা এদেশে থাকবে না। ওরা অন্য দেশে পালাবে। ওরা অন্য দেশে ঘর বাঁধবে। আর্শির মতো আকাশ। রোদের উত্তাপশূন্য হলদে রঙ জাহাজের উপর ছায়া ফেলে অনেক দূরে চলে গেছে। পাইনের শাখা-প্রশাখায় পাখির বাসাগুলো ঝুলেছে। রোদ সেখানেও যেন চুরি করে উত্তাপ দিচ্ছে। তারপর জেটি অতিক্রম করে পথ। সে পথের মেয়েপুরুষদের দেখতে দেখতে নিচে নেমে গেল। একটি বাদাম গাছের নিচে দাঁড়াল। এখানে দুটো পথ। সে কোন্ পথে যাবে চিন্তা করল দাঁড়িয়ে।

দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর বন্দর ধরলে এক অনন্য সুখের সন্ধান সে পায় এই মাটির স্পর্শে। বাদাম গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ মাটির স্পর্শ নিল। সামনে শুধু শহর। ইট কাঠ। মাটির কোন গন্ধ নেই সেখানে। সেখানে শুধু যানবাহন, কিছু কোরীপাইনের ছায়া, পথের দু-পাশে অথবা এভিন্যুর মোড়ে মোড়ে আলো জ্বলছে—কাঁচের ঘর, মাংসের দোকান, রেস্তোরাঁ, কাফে, পাব্। কোথাও ডেইজী ফুলের প্রদর্শনী অথবা আরো পিছনে সমুদ্রের খাড়ির অভ্যন্তরে নৌকা-বাইচ। এই সব ভালো লাগলেও মাটির স্পর্শের মতো সুখপ্রদ নয় যেন এরা। সে হাঁটছে। এই মানুষের ভীড়ে মাটির গন্ধের জন্যে হারিয়ে যেতে ভালো লাগছে। সে দেবনাথের সঙ্গে বের হয় নি। দেবনাথ জাহাজ থেকে নেমে প্রথমেই কোন পাব্ অনুসন্ধান করবে, প্রথমে পেট ভরে অন্তত বিয়ার খাবে এবং মাতলামো করে সমুদ্রের নীল যন্ত্রণা কিছু সময়ের জন্যে ভুলে থাকবে। কোন পাব্ অথবা কুকুরের রেসে না গিয়ে এখন শুধু এই সব সুন্দরী রমণীদের ভীড়ে বিজনের হারিয়ে যাওয়া। সে এই ভীড়ে হারিয়ে যেতে চায়। কেমন এক অশ্লীল শরীরী চিন্তায় দু-দণ্ড সে ওদের সঙ্গে কথা বলে সুখ পায়। অথচ সে ওর দেহজ কামনাকে রূপ দেবার ভঙ্গিটুকু এখনও ইচ্ছা করে আবিষ্কার করে নি। মূলত সে ভালো ভাবের জাহাজী হয়ে বাঁচতে চায়।

সে একটা দোকানে ঢুকে কিছু ফল কিনল সেলিমের জন্যে। মেয়েটি ওর হাতে ফলের প্যাকেট দিয়ে মাথা নোয়াল এবং হাসল। বিজন একগুচ্ছ মিমোসা ফুল দেখেছিল মিসিসিপি নদীর তীরে—কোন যুবতী ওকে ফুলের গুচ্ছটি দিয়েছিল. এ-মেয়ের হাসি সে-যুবতীকে স্মৃতির কোঠায় এনে দিল।

সে ফলের দাম দিয়ে প্যাকেট হাতে রাস্তায় নেমে এলো। ফেল্ট-হ্যাটটা আর একটু টেনে দিল কপালের উপর। এবং ওভারকোট টেনে পথের ভীড়, বিশেষ করে পথের সব সুন্দরী রমণীদের দেখতে দেখতে ঝুলন্ত ব্রিজের রেলিঙে এসে দাঁড়ল। সমুদ্র থেকে এখন তেমন জোরে হাওয় উঠে আসছে না। সে এখানে দাঁড়িয়ে তা টের পেল। দুটো খোলা গাড়িতে পুরুষ-রমণীরা হাসতে হাসতে বন্দর থেকে শহরে উঠে যাচ্ছে। দুজন যুবক-যুবতী পরস্পর কোমর ধরে হাঁটছে। সে দেখল—ওরা দুজন নেমে যাচ্ছে এবং নিচে নেমে ব্রিজের থামের আড়ালে দাঁড়াল। সে স্পষ্ট দেখল ওরা দুঃসহ যন্ত্রণার ফলভোগে পীড়িত হচ্ছে। এই সব দেখে বিজন হাঁটতে পারছে না। সস্তায় কিছু মদ এবং সস্তায় যৌন সংযোগের তাড়নায় সে বিব্রত হয়ে পড়ল। নাইটিঙ্গেল ধরে রাত যাপনের ইচ্ছায় সে পীড়িত হতে থাকল। অথচ যেমন করে প্রতি বন্দরে এ-ইচ্ছার জন্ম হয়েছে এবং যেমন করে প্রতি বন্দরে এ-ইচ্ছার মৃত্যু কামনা করেছে আজও তেমন ধারণার বশবর্তী হয়ে সে হাঁটতে থাকল। ভালো ভাবের জাহাজী হতে গিয়ে সে গোলাপী নেশা করে জাহাজে ফিরবে ভাবল।

সে জাহাজের সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে এলো। সেলিমের ফোকসালে দরজা বন্ধ। দরজার সামনে সে দাঁড়াল। ডাকল—সেলিম, ঘুমিয়ে পড়েছিস?

সেলিম উঠে দরজা খুলছে। সে বাইরে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছে দরজা খুলতে সেলিমের খুব কষ্ট। তবু সেলিম দরজা খুলবে এবং ওকে একটু ওর পাশে বসতে বলবে। দু-দণ্ড গল্প করতে চাইবে। দেশের গল্প, জোত-জমির গল্প। বিবি-বাচ্চার গল্প। অথবা মাছ এবং বনমুরগী ধরার গল্প। অথবা বর্ষাকালে

কোড়া পাখি ধরবার সময় ধানক্ষেতের আলে কেমন করে নৌকোয় ঘাপটি মেরে পড়ে থাকতে হয় তার গল্প। তখন দেখলে মনে হবে সেলিম যেন এ-জাহাজে কোড়া ধরছে। কোড়া শিকার করছে।

দরজা খুললে সে ফলগুলো সেলিমের হাতে দিয়ে বলল, তোর জন্যে এনেছি।

এতগুলো!

বিজন একটু হেসে বলল, ভয় নেই। এবারেও তোর কাছে টাকা চাইব না। আমি তোকে খেতে দিলাম।

বিজন বাইরে এসে দাঁড়ালে সেলিম বলল, কোন খবর পেলি? জাহাজ কোথায় যাচ্ছে, কবে ছাড়ছে?

ঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না। এজেণ্ট-অফিস থেকেও কোন খবর আসে নি। বড় মালোম শুধু বললেন, জাহাজে সরফাই হবে। কাল সব সাহেব-সুবোরা আসবেন। এনজিন-রুমে মেরামতের কাজ আছে অনেক। জাহাজ এখানে কত দিন বসবে কাপ্তান নিজেও বলতে পারেন না।

এবার চুপি চুপি সেলিম বলল, জানিস, কাপ্তানকে আমি বললাম, সাব আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেন। দেশে গেলেই আমি ভাল হয়ে উঠব। কাপ্তান বললেন, সেজন্যেই তো তোমাকে হাসপাতালে দিচ্ছি না। একবার হাসপাতালে গেলে তোমাকে ওরা সহজে ছাড়তে চাইবে না। তার অনেক আগে তুমি দেশে পেঁছে যাবে।

বিজনের বলতে ইচ্ছা হল, তা ঠিকই যাবি। তার অনেক আগেই যাবি। সে বিরক্তিতে ফেটে পড়ল। সারেঙ এবং কাপ্তান মিলে সেলিমকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সে আর কোন কথা বলতে পারল না সেলিমের সঙ্গে। সেলিমের বিষণ্ণ দৃষ্টি ওকে অত্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সে ডেকে এসে নামল। কী মানুষটা কী মানুষ হয়ে গেল, ভাবল। সে সিঁড়ি ধরে ফের উপরে উঠছে। সমস্ত জাহাজে অদ্ভুত এক নিঃসঙ্গতা। জাহাজের উপরে এখন যেন কেউ জেগে নেই। কিছু কিছু জাহাজী বন্দরে নাইটিঙ্গেল ধরতে বের হয়ে গেছে—তাদের ফিরতে দেরী হবে। যারা শুধু নেশা করে ফিরবে তারা একটু বাদেই ফিরবে। বিজন গলুই ধরে হাঁটল। সে এখানে রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে একটি সিগারেট ধরাল। অন্য জেটিতে কাজ হচ্ছে বলে তার কিছু শব্দ। নীল আর্শির মতো আকাশ। আকাশে নক্ষত্র জ্বলছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ, নক্ষত্র, সমুদ্রগামী জাহাজের আলো দেখল। কাল ভোরে এ-জাহাজের মাল নামতে শুরু করবে। অন্ধকার রাত থেকে সব লোক উঠে আসবে ডেকে। ওরা কাজ করবে, গ্যালীর আগুনে ওরা হাত-শরীর গরম করবে। আর তখন বাংকে পড়ে পড়ে দেশের কথা ভাবতে ভাবতে কাশবে সেলিম।

ভোরবেলায় বিজন এনজিন ঘরে নেমে গেল। তখন সমস্ত ফল্কায় কাজ হচ্ছে। উইঞ্চ-ড্রাইভাররা সিগারেট ধরাবার ফুরসত পাচ্ছে না। ক্রেন-মেশিন চালকের টুপি মাথায় নিচের ফল্কায় উঁকি মারছে। ফল্কায় ফল্কায় সব কুলিদের কোলাহল। এজেণ্ট-অফিস থেকে ক্লার্ক এসেছেন। তিনি ঘুরে ঘুরে দেখছেন। মেজ মালোম দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন এক ফল্কা থেকে অন্য ফল্কায়। পাঁচ ফল্কায় পাঁচজন লোকের মুখে হাড়িয়া-হাপিজ শব্দ। মাল জাহাজ থেকে উঠছে, ফের বন্দরে নেমে যাচ্ছে।

এই সব দৃশ্যগুলো এখন জাহাজের ডেকে ঝুলছে।

গ্যালীতে ভাণ্ডারী নেই। বাটলারের ঘরে সে ক্রু-দের রসদ আনতে গেছে। ব্রিজে কাপ্তান পায়চারি করছেন। মেজ মিস্ত্রী নিচে নেমে গেছেন। বড় মিস্ত্রী এই-মাত্র হাই তুলতে তুলতে টর্চ হাতে নিচে নামছেন। বন্দর থেকে সব কিনারার লোক উঠে আসছে। ওরা ডেক অতিক্রম করে এনজিন-রুমে নেমে গেল। বড় মিস্ত্রী ওদের নিয়ে সব এনজিন-রুমটা ঘুরলেন। বয়লারের ঘর দেখালেন। ছ-টা বয়লারের ট্যাঙ্ক-টপ, চক, টানেল পথ, কনডেনসার, এমন কি স্মোক-বক্সগুলো পর্যন্ত। তারপর ওরা বাংকারে বাংকারে ঘুরল। বিজন অন্ধকারে কোণে দাঁড়িয়ে সব দেখল। ওরা উপরে উঠে যাচ্ছে। সে ওদের দেশীয় ইংরেজী কথাগুলো কিছু কিছু ধরতে পারছে। জাহাজ এখানে বসবে অনেক দিন—এমনই ওরা যেন বলল। যেন বলল, জাহাজে অনেক কাজ, জাহাজডুবি হয় নি—জাহাজীদের সৌভাগ্য।

বিজন যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেটা পোর্টসাইডের বয়লারের নিচু অংশ। হাঁটু পর্যন্ত ছাই জমে আছে এখানে। নিচে কিছু পুরনো বেলচে, শাবল, র‍্যাগ, স্লাইশ। কিছু ফায়ার-ব্রিজের প্লেট। ওপরের আলোটা নেই। এখানে অন্ধকার। সে এখান থেকে এনজিন-কসপের ঘরে উঠে গেল। ডেক-কসপের জন্য দুটো তামার প্লেট চাইল। তারপর সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতেই বন্দরের একজন শ্রমিক বলল, গুড মর্নিং, মিস্টার।

ইয়েস, গুড মর্নিং।

বিজন বুঝল লোকটি কাজের ফাঁকে ওর সঙ্গে একটু গল্প করতে চায়। লোকটি হয়তো সস্তায় সিগারেট কিনতে চায়।

লোকটি ফের বলল, ইয়ু গ্যান্ডিম্যান?

বিজন বলল, ইয়েস।

দেবনাথ গ্যান্ডিম্যান?

বিজন বলল, ইয়েস।

দেবনাথের সঙ্গেও ওর আলাপ হয়েছে দেখে বিজন বিস্মিত হল।

লোকটি ফের বলল, অল ড্যাড়িওয়ালা পাকিস্তানী?

লোকটি তবে এই সব খবরও রাখে। সে বলল, ইয়েস।

বিজন হেঁটে যাচ্ছে ডেক ধরে। শ্রমিকটি ওর পিছু পিছু এলো। এবং পকেট থেকে একটি ইউক্যালিপটাসের বোতল বের করে বলল, ইট্স ফর ইউ।

বিজন এবারেও আশ্চর্য হল। দামী এই অয়েলটুকু পেয়ে বিজন খুব খুশি হল। বলল, কাম অন। কত দাম দিতে হবে?

কোন দাম নেই। আমাকে এক শিশি সরষের তেল দেবে। দেবনাথও দেবে বলেছে। তেলটা আমি মাথায় দিচ্ছি। ইন্ডিয়া থেকে জাহাজ এলেই আমি এ-তেলের জন্য ডেকে কাজ নিয়ে উঠে আসি। তেল সংগ্রহ করি এবং তেলটা মাথায় দি। রাতে আমার ভালো ঘুম হয়।

ওরা সেলিমের কেবিন অতিক্রম করার সময় সেলিম পোর্টহোলের ভিতর থেকে কয়েদীর মতো উঁকি দিল। সেলিম বাংকে বসে পোর্টহোল দিয়ে এই সব মানুষদের কাজ দেখছে। হাড়িয়া-হাপিজের শব্দ শুনছে। ড্যারিক উঠতে নামতে দেখছে। এইমাত্র এই পথ দিয়ে বড় মালোম গেলেন। দুটো মেয়ে গেল—বোধ হয় বড় মিস্ত্রীর ঘরে অথবা ছোট মিস্ত্রীর বাংকে। সে এখানে বসে দূরের পাইন গাছ দেখতে পেল। এবং পোর্টহোলের কাঁচ দিয়ে বিজনকেও চলে যেতে দেখল।

শ্রমিকটি বলল, ম্যান ইজ সিক?

সে বলল, ইয়েস, সিক। টিবিতে ভুগছে।

টিবিতে ভুগছে! হাসপাতালে দিচ্ছে না! বড় আশ্চর্য। যেন শ্রমিকটি ঝুপ করে আকাশ থেকে পড়ল।

বড় আশ্চর্য!! বিজন হাঁটতে থাকল। লোকটি ওর পাশাপাশি হাঁটছে। সে বলল ফের, এ নিয়ে পাঁচ বন্দর ঘোরা হল। কাপ্তান এত দিন হাসপাতালে দেবেন দেবেন করছিলেন, এখন শুনতে পাচ্ছি দেওয়া হবে না। জাহাজ দেশে ফিরবে। সেও দেশে ফিরবে।

এ সব দেখেও তোমরা চুপ করে আছ!

বিজন দেখল লোকটি যেন এই মুহূর্তে বিদ্রোহ করে সকলকে জানাতে চাইছে—জাহাজে একজন জাহাজী টিবিতে ভুগছে অথচ ওকে হাসপাতালে দেওয়া হচ্ছে না, কাপ্তান কোম্পানির টাকা বাঁচাচ্ছে। আপনারা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র পেশ করুন।

শ্রমিকটিকে বেশ চিন্তিত দেখাল। পাশের অন্যান্য কুলীদের সে ঘটনাটা খুলে বলল। ওরা সকলে একত্র জমা হচ্ছে। ওরা এই নিয়ে জটলা পাকাতে চাইছে যেন। ওরা যেন বলতে চাইছে—তোমরা সেলর, তোমরা এই সব সমুদ্রগামী জাহাজগুলোকে বন্দর থেকে বন্দরে নিয়ে যাও, ঝড়ের দরিয়া পার করে জাহাজের কোম্পানির প্রতি-পত্তি বাড়াও—আর তোমাদের চিকিৎসা হবে না, তোমাদের জন্য হাসপাতালের বন্দোবস্ত থাকবে না, কোম্পানি বেইমানী করবে, তোমরা ভেড়ার মতো ঘাস খাবে-সে ঠিক কথা নয়। তেমর বিদ্রোহ কর। সে বিদ্রোহে আমরা যোগদান করব। তোমাদের একতার অভাব, আমাদের একতা ইচ্ছা করলে ধার নিতে পারো। দেউলিয়া হবার ভয় নেই।

ভিতর থেকে লম্বা লোকটি বের হয়ে বিজনকে বলল, ইউ বেটার গো টু মিস্টার ট্রেয়। তিনি সিম্যান ইউনিয়নের সেক্রেটারী। ঠিকানা—পাঁচ কলিন স্ট্রীট : স্টেশনের পাশ দিয়ে যে বড় এভিন্যুট পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে সেখানে গিয়ে খোঁজ করবে। তাঁকে পেলে, ঘটনাটা খুলে বলবে। তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন।

বিজন ওদের ধন্যবাদ জানাল। এবং কেবিনে ঢুকে লোকটিকে এক বোতল সরষের তেল দিয়ে বলল, ইউ হ্যাভ ডান এনাফ। আমি আজই মিঃ ট্রেয়ের কাছে যব।

অথচ সে দেবনাথের মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিল—এই সব আবেগধর্মিতার লক্ষণগুলো ভালো নয়। সেলিমের উপকার করে তোর কি আখের হবে এমত ভাব দেবনাথের মুখে। সুতরাং স্পষ্টতই দেবনাথ যেতে রাজী হল না।

বিকেল। শীতের বিকেল। চারটে না বাজতেই শীতের সমুদ্রে অলস সূর্য ডুব দিচ্ছে। গাছগুলো নেড়া নেড়া। ইউক্যালিপটাসের পাতা খসে পড়ছে। আকাশ থেকে যেন শীতের তুষার ঝরছে। ঠান্ডা ঠান্ডা-হাত-পা জমে যাবে ভাব। বিজন হাতের দস্তানা টেনে দিল। টুপিতে কপাল ঢেকে দিল। তারপর ধীরে ধীরে গ্যাংওয়ে ধরে নেমে গেল। সমুদ্র থেকে শীতের হাওয়া ফের উঠে আসছে।

ইচ্ছা হল বন্দরে নেমে ট্যাক্সি করার। ইচ্ছা হল দু শিলিং আপেল কেনার। এবং ইচ্ছা হল এভিন্যুর টিন-কাঠের ঘরের ভিতর ঢুকে দু দণ্ড জুয়াখেলার। তবু সেলিমের জন্য আপাতত হাঁটতে থাকল সে। ধীরে ধীরে হেঁটে গেলে ঝুলন্ত ব্রিজ অতিক্রম করতে পনেরো মিনিট, সিম্যান-মিশান বাঁয়ে ফেলে রেলওয়ে স্টেশন অতিক্রম

করতে অনধিক পনেরো মিনিট—তারপরই চড়াই পথে উঠতে গিয়ে কলিন স্ট্রীট মিলবে। নাম্বার ফাইভ কলিন স্ট্রীট। মনে মনে নম্বর মুখস্থ করার মতো উচ্চারণ করল কথাটা এবং দুটো সুন্দরী মেয়েকে রমণীয় হতে দেখে শিস দিয়েও ফেলল। এবং যদি ওরা প্রশ্ন করে ওর শিস শুনে, তুমি সিম্যান?

সে বলবে, ইয়েস।

যদি বলে, ইণ্ডিয়া থেকে এলে?

সে বলবে, ইয়েস।

যদি বলে, তুমি গান জানো?

সে বলবে, ইয়েস।

তুমি ক্রিকেট খেলতে পারো?

সে বলবে, ইয়েস।

সুতরাং ওর গান, খেলা এবং এই শঠতা সবই ইয়েসের কোঠায় পড়বে।

বিজন নিজের মনেই হেসে ফেললে। সুন্দরী রমণীরা এখন ঝুলন্ত ব্রিজের উপরে উঠে যাচ্ছে। ব্রিজের রেলিং ধরে কিছু মেয়েপুরুষ গুঞ্জনে মশগুল। অথচ সুন্দরী রমণীরা ওকে দেখেও প্রশ্ন করল না। ওর শিস দেওয়ার অর্থকে ব্যতিক্রম বলে ভাবল না। সুতরাং সে জোরে জোরে হেঁটে ওদের পিছনে ফেলে নীচে নেমে একটি চলন্ত ফ্লাবর দোকান থেকে দু' শিলিং-এর আপেল কিনল। তারপর বুল-ফাইটের বিজয়ী মাটাডরের মতো এই সব সুন্দরী রমণীদের এবং সুন্দর পুরুষদের ভীড় ঠেলে বের হয়ে গেল। বের হয়ে যাচ্ছে। সে হাঁটছে। এখন যেন সহসা মনে হল সেলিম পীড়িত। সে বাংকে শুয়ে রক্ত তুলছে মুখে। দেশে একমাত্র পিসিমা বেঁচে আছেন, তাঁকে টাকা পাঠাতে হবে। আজও বয়স্কা সুন্দরী রমণীদের দেখলে সে তার মাকে স্মৃতির কোঠায় সংগ্রহ করতে পারে। সে সামনের বয়স্কা সুন্দরী রমণীকে প্রশ্ন করলে উড ইউ হেল্প মি? আপনি কি আমাকে কলিন স্ট্রীটে যেতে সাহায্য করবেন?

বয়স্কা সুন্দরী রমণী বলল, তুমি কি স্ট্রেঞ্জার?

সে বলল, ইয়েস। আমি সেলর।

এ বন্দরে প্রথম এলে?

ইয়েস, এই প্রথম এসেছি।

ইওর কানট্রি?

বিজন দেশের নাম করল।

অল রাইট। তুমি এসো। তুমি গ্যাণ্ডিম্যান। তুমি ভালো লোক আছ এমন ভাব যেন বয়স্কা সুন্দরী রমণীর চোখে।

বিজন শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে গেল। সে দীর্ঘস্থায়ী আলাপে রাজী হল না। নতুবা এদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের সংশয় আর দুঃসহ রকমের প্রশ্নের মুখে পড়ত—এখনও দুর্ভিক্ষ আছে? এখনও মহামারী হয়? এখনও সন্ন্যাসীরা গাঁজা খেতে খেতে ধর্মালোচনা করে? এখনও হিমালয়ের বুকে নাক জাগিয়ে সাধু মহান্তরা বরফের নিচে ঈশ্বর-উপাসনা করছেন?

প্রায়ই সে এই সব ক্ষেত্রে চটপট উত্তর দেবার ভঙ্গীতে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এবং কিছু বলে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করে। সত্য-মিথ্যা—যে কোন প্রকারে। এ সব ক্ষেত্রে সে কখনও নিজেকে ছোট করবে না। নিজেকে, নিজের দেশকে ছোট করার ইচ্ছা তার

কোন দিন হয় নি।

একদা ভিক্টোরিয়া বন্দরে একজন ব্রেজিলিয়ান-গার্ল বলেছিল, তোমার চোখ বড় গভীর, তোমার চোখ কবিতার মতো।

সে বলেছিল, আমি যে কবিতা লিখি।

একদা একটি চিলি-কন্যা বলেছিল, তোমার কোমর খুব সরু। তোমার এই দীর্ঘ কোমল চেহারা নাচিয়ের মতো।

সে বলেছিল, একদা আমি ব্যালেতে নাচতুম।

বিজন এই সব ভাবনার ভিতর এভিন্যু ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে। রেল-স্টেশন অতিক্রম করে সে ডাইনে মোড় ঘুরল। এখানে সে কিছু ফুলের গাছ দেখল। মিমোসা-ফুলের গুচ্ছের মতো এই সব ফুলেরা গাছে ঝুলছে। যারা পথ ধরে যাচ্ছে, ফুলেরা তাদের শরীরের উপর ঝরে পড়ছে। বিজনের ব্লু-ব্ল্যাক কোটের রঙে জাফরী রঙ ধরাল। সে অনেকক্ষণ এই সব গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। চারিদিকে নিয়ন আলো, কাঁচের ঘরে আলো জ্বলছে। এই আলোর ভীড়ে এই সব শ্বেতাঙ্গ রমণীদের বিজনের বড় ভালো লাগল। ওর আর ইচ্ছে হচ্ছে না এক পা নড়তে। ওর ইচ্ছে নেই এখন কলিন স্ট্রীটের পাঁচ নম্বর বাড়িতে ঢুকে নীরস আলোচনায় ডুবে যেতে। তার চেয়ে বরং এই ভালো। বিদেশী এই সব ফুলের ভীড়ে দাঁড়িয়ে দু' দণ্ড সাগরের দুঃখকে ভুলে এই সুখ-দুঃখে ডুবে যাওয়া।

অথচ সে দাঁড়াতে পারল না। বন্দরে সেলিম, ওর কাশি, ওর নিরীহ মাছের মতো চোখ বিজনকে তাড়া দিচ্ছে। বিজন ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা অতিক্রম করে বড় হলঘরটায় ঢুকে গেল। গায়ে পেতলের প্লেটে লেখা—পাচ, কলিন স্ট্রীট। পাথরের উপর খোদাই করা সাইনবোর্ড। লেখ আছে—ন্যাশনাল সিম্যান ইউনিয়ন। নিচে লেখা রয়েছে—জাহাজীরাও আপনার আমার মতো মানুষ।

এই সব বড় বড় হরফে বড় বড় কথা পড়তে পড়তে বিজন হলঘরে ঢুকে গেল। পাথরের দেয়ালে বড় বড় সব ছবি ঝুলছে। পায়ের নিচে মসৃণ পাথরে ওর প্রতিবিম্ব সচল। মসৃণ পাথরে ওর চেহারা আয়নার মতো ধরা পড়ছে। বিজন সন্তর্পণে হাঁটল। সন্তর্পণে পাথরের আর্শিতে নিজের মুখ দেখল, কারণ অন্য কোন মুখ অথবা অন্য কোন শব্দ এ-হলঘরে ভেসে উঠছে না। সে বিস্মিত হল। পাথরের দেয়ালে কিছু তৈলচিত্র। কিছু দামী আলো এবং এইমাত্র পালিশ-করা জুতোর রঙে এই সব দেয়াল, এই সব ছবি। সে একবার ভাবল বরং চলে যাওয়া যাক। বরং কাল দেবনাথকে বলে কয়ে একসঙ্গে আসা যাবে। এই নিঃসঙ্গ পুরীতে বিজন ভীত এবং বিহ্বল হয়ে পড়ল। অথচ সে এখন দেয়ালের কিছু কিছু তৈলচিত্র চিনতে পারছে—ওরা সেক্সপীয়ার, টলস্টয় এবং আরও সব মনীষীদের পাশে ট্যাগোর—জন্ম ১৮৬১... মৃত্যু...কি একটা সালের নাম। ট্যাগোর...তারপর জন্ম-মৃত্যুর কথা ভেবে ওর কিঞ্চিৎ সাহস জন্মাল। সে চারিদিকে চোখ তুলে একবার তাকাল। উত্তরের দিকে পাথরের দেয়ালের একটা দরজা স্বয়ং খুলে যাচ্ছে। এবং একজন প্রৌঢ় বের হয়ে আসছেন। তিনি যেন কোন যক্ষপুরী থেকে উঠে আসছেন। সে তাঁকেই কোন রকমে প্রশ্ন করল, মিঃ ট্রয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই। প্রশ্ন করে ট্যাগোরের ছবির প্রতি ফের নজর ফেলে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গৌরব বোধ করল।

ভদ্রলোক বললেন, দরজা ঠেলে ভিতরে যান। ওঁর স্টেনো এলবি আছেন। তাঁকে প্রশ্ন করুন। শেষে ভদ্রলোক ওকে গুডবাই ভঙ্গীতে বিদায় জানালেন।

বিজন একান্ত বশংবদের মতো দরজা ঠেলতেই ভিতর থেকে জবাব এলো, কাম ইন, কাম ইন!

বিজন এই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কোন মুখ দেখতে পাচ্ছে না অথচ অপ্রত্যাশিত মেহমানের মতো ডাক ওকে বিচলিত করছে। যেন সে দেয়াল-ঘেরা কোন যক্ষপুরীতে এসে ঢুকেছে। সেখানে দেয়ালের ভিতর থেকে একটি নারীকণ্ঠের জবাব, কাম ইন, কাম ইন। এবং সে ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে গেছে বলেই দেখতে পেল মেয়েটি টেবিলের উপর ঝুঁকে কাজে ব্যস্ত। সে একবার চোখ তুলে দেখছে না। দেখল না। কে এলো কে গেল সে দেখল না। সে হাত তুলে ইশারায় ওকে সামনের চেয়ারে বসতে বলছে। ছোট চিল্‌তে করিডরের মতো এই এক ফালি ঘরে একটি টেবিল সহ মেয়েটিকে খুব ভিন্নধর্মী বলে মনে হচ্ছে।

সে চেয়ারে বসে ইতস্তত দেয়ালে নজর দিতেই দেখল মেয়েটির দেয়ালের কীলকেও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং-যেন উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্মিত হাসিতে এই সব অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করছেন। ছবিটি হাতে আঁকা বলেই বিজনের মনে হল। কোন ছবির যেন নকল। এইটুকু দেখে এবং ভেবে বিজনের বিচলিত ভাবটুকু কেটে গেল। সে বলল, মিঃ ট্রয় থাকলে দেখা করতাম।

এল্‌বি চোখ তুলে বিজনকে দেখল। একজন সুপুরুষ বিদেশী যুবাকে দেখল। যুবকে দেখে চোখে ওর নির্লজ্জ ভাব। চোখের পাতা পড়ছে না। বিজনকে দেখে লেজারে হিসাব কষছে এমন ভাব চোখে। চোখের পাতা পড়ছে না—দৃষ্টি এমন দৃঢ়, আত্মপ্রত্যয়ে গভীর। এই নির্লজ্জ ভাবটুকু বিজনের ভালো লাগল না। বস্তুত বিজন খুব আড়ষ্ট বোধ করছে।

তিনি তো নেই। তোমার কি দরকার আমাকে বলে যাও। তিনি এলে বলব।

বিজন বলল, প্রয়োজন আমার অনেক। তোমাকে আমার প্রয়োজনের কথা অনেকক্ষণ ধরে শুনতে হবে।

শুনব।

সব ঘটনাই মিঃ ট্রয়কে কিন্তু বলতে হবে।

এল্‌বি হাসল। এল্‌বি বিদেশী যুবাকে ফের কৌতূহলের চোখ নিয়ে দেখছে। এবং সেই পুরুষের মতো দৃষ্টি—যা বিজন সহ্য করতে পারছে না। সে এল্‌বিকে সাধারণ যুবতীর মতো দেখে, খুশি হতে চাইল।

এল্‌বি বলল, তুমি বল, আমি নোট করছি।

নিজের ভুলটুকু বুঝতে পেরে বিজনও হাসল। —তোমাকে নোট নিতে হবে না। মুখে বললেও চলবে। ঘটনাটা হচ্ছে পার্থ বন্দরে...

এল্‌বি এ-সময়ে বাধা দিল বিজনকে, জাহাজটার নাম বল। তোমরা কোন্ ক্রু, কোন্ দেশ থেকে এসেছ সব বলতে হবে।

জাহাজের নাম 'এস/এস টিবিড্ ব্যাংক্'। আমরা ইন্ডিয়া থেকে এসেছি।

তারপর?

বিজন জাহাজের সব ঘটনা, সেলিমের বর্ত্তমান অবস্থা, এমন কি সারেঙ এবং কাপ্তানের গোটা ষড়যন্ত্রের কথাও খুলে বলল। বিশেষ করে মেয়েটির স্বাভাবিক আগ্রহে সব খুলে বলতে পারল। এখন সে আর কোন আড়ষ্টতায় ভুগছে না। এখন সে রবীন্দ্রনাথকে দেখে রীতিমত উত্তেজিত হতে পারছে। সে এবার একটু ঝুঁকে বলল, এর একটা বিহিত করতেই হবে দয়া করে। নতুবা বেচারা বিনা

চিকিৎসায় মারা পড়বে। বেচারার ঘরে বিবি আছে। ছোট একটি মেয়ে আছে। ওরা সব ওরই পথ চেয়ে বসে আছে।

এখন বিজনকে দেখলে কে বলবে, এ জাহাজী বিজন! কে বলবে এ বিজন কথায় কথায় শিস দেয়! কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলে বিদেশী রমণীকুলে বাহবা নিতে চায়! বিজনের চোখ-মুখ মানুষের ভালো করার প্রবৃত্তিতে বস্তুতই সজল হয়ে উঠছে এখন।

এল্‌বি বলল, নিশ্চিন্ত থাক। মিঃ ট্রয় এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না। জাহাজীদের ভালো করাই আমাদের কাজ।

বিজন ওঠবার সময় ফের রবীন্দ্রনাথকে দেখল এবং অদম্য কৌতূহলকে চাপতে না পেরে বলল, আমরা ট্যাগোরের দেশ থেকে এসেছি। তোমরা ট্যাগোরের ভক্ত দেখছি। দেখি তোমরা এখন আমাদের জন্য কতটা করতে পারো।

তুমি ভারতবর্ষের লোক? কিন্তু ভারতবর্ষ তো বিরাট দেশ। এখানে পাঁচ বছর আছি। ভারতবর্ষ থেকে আসা কিছু কিছু জাহাজীদের সংগে আমার আলাপ হয়েছে। অথচ দুর্ভাগ্য ওরা কবির ছবি দেখেও কোন কৌতূহল প্রকাশ করে নি। বিশ্রী ধরনের পোশাক পরে ওরা এখানে এসেছে। চেয়ারে না বসে মেঝেতে বসে পড়েছে। শীতে দেখেছি ওরা ভয়ানক ভাবে কাঁপত।

বিজন বলল, ওরা এখনও আছে। জাহাজে গেলে তুমি ওদের এখনও দেখতে পাবে।

এল্‌বি বলল, ভারতবর্ষের লোক ভাবতে তোমাকে কষ্ট হয়।

বিজন বলল, মাপ করবে। যারা তখন ছিল এখনও আছে। তাদের জাহাজী জীবনের এক বিচিত্র অধ্যায় আছে। ওরা আসছে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সন্দীপ অঞ্চল থেকে। ওরা অজ্ঞ। চাষী পরিবার থেকে আসছে।

বিজন ভাবল—এই সব জাহাজীদের জাতীয় পোশাকের প্রতি এল্‌বির তীব্র ঘৃণা। বস্তুত লুংগি এবং কাঁধে গামছা ফেলে এই সব জাহাজীদের বড় বড় এভিন্যু ধরে হাঁটা এবং নিজেদের ভারতবাসী বলে পরিচয় দেওয়া এল্‌বির কাছে বিশ্বকবিরই যেন অবমাননা। সেজন্য বিজনের দুর্লভ ইংরেজী বলার কায়দা এবং উজ্জ্বল বিদেশী পোশাক, উপরন্তু কবির প্রতি শ্রদ্ধাটুকু এল্‌বিকে বিজন সম্বন্ধে অভিভূত করেছে। বস্তুত এল্‌বি ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে সহ্য করতে পারে না। আজও পারছে না। ওর চোখে মুখে এই সব যেন ধরা পড়ছে।

বিজন বলল, ওরা অজ্ঞ নিরক্ষর বলেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ওদের কোন কৌতূহল নেই।

এল্‌বি সহসা বলল, বাবা কবিকে ইউরোপে দেখেছেন। তুমিও কবির দেশের লোক। তুমি কবিকে দেখেছ?

সহসা এই প্রশ্নে বিজন কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে পড়ল। ওর জাহাজী মনটা ধীরে ধীরে ওর অস্তিত্বকে গ্রাস করছে। সে বলল, নিশ্চয়ই। নিমতলা থেকে বটতলা বেশি দূরে নয়। নিমতলার কাছেই জোড়াসাঁকো। আমার ছেলেবেলায় ও-পাড়ায় কত খেলতে গেছি। কতদিন আমরা কবিকে দেখে প্রণাম করেছি। তিনি তখন প্রায় অচল।

তুমি ওঁকে প্রণাম করেছ! তুমি ও'কে স্পর্শ করতে পেরেছ!

বিজন বিনয়ের অবতার হয়ে গেল। বিজন বলল, কবি আমাদের আশীর্বাদ

করতেন। বলতেন, ভালো ছেলে হবে, দেশের দুঃখ দূর করবে।

এল্‌বি ফের আশ্চর্য এক শ্রদ্ধার ভঙ্গীতে বলল, তুমি ওঁকে স্পর্শ করতে পেরেছ, প্রণাম করতে পেরেছ!

বিজন দেখল এল্‌বির চোখ দুটো শ্রদ্ধায় গভীর হয়ে উঠছে। এল্‌বি একবার ঘাড় ফিরিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখল, একবার বিজনকে দেখল। কবির খুব নিকটের একজন যুবাকে স্পর্শ করার প্রকট ইচ্ছায় সে হাত বাড়িয়ে দিল। যেন বলতে চাইছে—তুমি বি-জন, তুমি কবিকে স্পর্শ করেছ, তুমি কবির দেশের, ঘরের লোক। এল্‌বির মনে এই সব ভাবগুলো কাজ করছে।

এল্‌বি বলল, বাবা তখন ইউরোপে ছিলেন। বাবা কবিকে ইউরোপে দেখেছেন। বাবা মাকে এবং আমাকে বলতেন, হি ইজ এ সেণ্ট, জাস্ট অ্যাজ পিটার অর পল। বিজন সেই ঋষিপুরুষদের অশীর্বাদ পেয়েছে। এল্‌বি বিজনের আরো ঘনিষ্ঠ হতে চাইল।

এল্‌বি বলল, তোমরা আর কত দিন থাকবে এ-বন্দরে?

প্রায় মাস দুই। জাহাজ এখানে মাস দুই বসবে। ড্রাইডক হবে। মেরামত হবে।

সহসা এল্‌বি বলে বসল, আমার একটা অনুরোধ তোমায় রক্ষা করতে হবে।

বিজন একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তবু সে বলল, বল; রাখব। যদি ক্ষমতায় কুলোয় নিশ্চয়ই রাখব।

তোমার কাছে আমি ট্যাগোরের কবিতা কবির-ভাষায় শুনতে চাই। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা। যখন থেকে ট্যাগোরের কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই তখন থেকে ইচ্ছা—তোমার দেশে যাব, ভারতবর্ষকে দেখব। কবির শান্তিনিকেতন দেখব। আমি এইজন্য প্রথম থেকেই টাকা জমিয়ে আসছি। কবির কবিতা তাঁর ভাষার শুনব—কত দিনের ইচ্ছা আমার!

তার জন্য কি আছে—সেলিমের ঝামেলাটা চুকে যাক। তারপর একদিন তোমায় শোনানো যাবে।

এল্‌বি চোখ বুজল। যেন রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর দেশকে, বিজনকে অনুভব করার জন্যই চোখ বুজল। বিজন এই আবেগধর্মিতায় বিমুগ্ধ হল না। বরং পীড়িত হল। সাহিত্যের অ-আ-ক-খ সম্বন্ধে যার কোন স্পৃহা নেই, তাকেই এই নিদারুণ সত্যে টেনে আনার কী যে অর্থ, বিজন বুঝতে পারল না। তবু সে ভাবল, হাতে অনেক দিন, পরে ভেবে যা হয় কিছু একটা বলা যাবে।

বিজন এবার উঠতে চাইল এবং বলল, তোমার নামটা জানা হল না।

এল্‌বি বলল, আমাকে সকলে এখানে এল্‌বি বলেই জানে। পুরো নাম সিসিল এলবার্টি। মিস এলবার্টি বলেও ডাকতে পারো।

এল্‌বি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিল, আমি তোমায় কবিতা শোনাব। ট্যাগোরের কবিতা।

বিজন ভাবল, আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল।

এ সময় এল্‌বি ওর সামনে এসে দাঁড়াল এবং হ্যাণ্ডশেক করল। তারপর প্রশ্ন করল, জাহাজ তোমার কোন্ ডকে নোঙর ফেলেছে?

সাউথ-ওয়ার্ফে। বিজন এবার দৌড়ে পালাবার মতোই হলঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে গেল এবং দুঃসহ ভার থেকে যেন মুক্ত হল।

ডেকে তখন পুরোদমে কাজ চলছে। এনজিন রুমেও। এনজিন-রুমে বড় বড় প্লেট সব স্ক্র্যাপ করা হচ্ছে। বড় বড় সব অক্সিজেনের বোতল নামানো হচ্ছে। ফল্কায় ফল্কায় কাজ : জাহাজীরা রঙ করছে ফানেলে, বোট-ডেকে। একজন দুজন করে সকলে উঁকি মেরে যাচ্ছে সেলিমের কেবিনে। বিজন গতকালের ঘটনার কথা কাউকে বলে নি, সে এ ব্যাপারে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করতে চায়। শুধু আজ সে কিনারার লোকদের ডেকে সেলিমের অবস্থা দেখাচ্ছে। দেখ ল—এইখানে সেই লোকটি থাকে, তাকে তোমরা দেখে যাও।

প্রচণ্ড শীত এবং হাওয়ার জন্য জাহাজীদের হাতে কাজ তেমন জমছে না। ওরা ফানেলের উপর ঝুলে অথবা বোটের উপর দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছিল। মাঝে মাঝে গ্যালীতে গিয়ে আগুনের উত্তাপ নিয়েছে। শক্ত হয়েছে ওরা এবং রাত্রির কোন আকস্মিক যৌন ঘটনার কথা ফলাও করে বলে কোন জাহাজী বাহবা নিতে চাইছে।

বিজন নিচে দাঁড়িয়ে ফানেলে যে রঙ করতে উঠে গেছে তার দড়িদড়া ঢিল দিয়ে অথবা শক্ত করে বেঁধে রেখে কাজে সাহায্য করছে। আকাশ তেমনি আর্শির মতো। বন্দরের পাইন গাছ থেকে তেমনি পাতা ঝরছে। এ শীতেও এনজিন-ট্যান্ডল পুরনো কোট গায়ে লুঙ্গি পরে নিচে নেমে গেল। জেটি ধরে হাঁটতে থাকল। গতরাতেও এনজিন-ট্যান্ডল শীতে কাঁপতে কাঁপতে বন্দরে নেমে গেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে বন্দরের পথ ধরে শহরে উঠে গেছে। পুরনো বাজারে গিয়ে দু-শিলিং দাম দিয়ে পুরনো জামা-কাপড় কিনেছে। জাহাজীরা আফ্রিকার বন্দরে অথবা ফিজি দ্বীপে ওগুলো বিক্রি করবে। গতরাতে ফেরার পথে ট্যান্ডল শীতে যখন আর হাঁটতে পারছিল না, যখন সস্তায় যৌন সংসর্গের দায়িত্ব পালন করে আর হাঁটতে পারছিল না, তখন বুড়ি মেমসাব গাড়ি থেকে এই বুড়ো ট্যান্ডলকে একটা দামী ওভারকোট দয়াপরবশ হয়ে ছুড়ে দিয়েছিল। ভোরে সে দামী ওভার-কোটটা জাহাজীদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। বলেছে—শীতে রাস্তায় কাঁপছিলাম, বুড়ি মেমসাব দিয়ে দিল। গতকাল এই সব ভারতীয় নাবিকদের কথাই দুঃখ করে বলছিল এলবি। বিজন ফানেলের নিচে দাঁড়িয়ে এনজিন-ট্যান্ডলকে শহরে উঠে যেতে দেখছে আর বিরক্তিতে ফেটে পড়ছে।

বিজন ফানেলের পাশ থেকে অন্য জাহাজীকে উদ্দেশ করে বলল, মকবুল, দেখলি এনজিন-ট্যান্ডলের কাণ্ড! আজও এই ভোরে শীতের ভিতর লুঙ্গি পরে বন্দরে নেমে গেল। দেশের জাত-মান সব ডুবাচ্ছে। তোরা কিছু বলতে পারিস না ওকে?

বিজন দেখল মকবুলের মুখেও এমত ইচ্ছা—শীতের রাতে নীলরঙের পায়জামা পরে ছেঁড়া কোট গায়ে বের হয়ে যাওয়া, পথে দাঁড়িয়ে শীতে কষ্ট পাওয়া এবং কোন পুরুষ অথবা মহিলার দাক্ষিণ্য গ্রহণ করা। বিজন ভবল, শীতের রাত, রাস্তায় বরফ পড়ছে, তবু নীল মার্কিন কাপড়ের জামা পায়জামা শরীরে এঁটে এই সব জাহাজীদের ভীড় কিনারায়। এই সব জাহাজীরা ভারতবর্ষ থেকে আসে। বড় গরীব, বড় নিঃস্ব। এই সব জাহাজীদের ইংরেজ কোম্পানির মালিকেরা কলকাতা বন্দর থেকে ধরে নিয়ে আসে। তাদের খেতে দেওয়া হয় বাসি গরুর মাংস, ডাল ভাত। মাঝে মাঝে বাঁধাকপির তরকারি দিয়ে কোম্পানি বদান্যতা দেখায়। এই সব জাহাজীরা বন্দরে লুঙ্গি পরে, ছেঁড়া ওভারকোট গায়ে শীতের রাতে ঘন আঁধারে

বুড়ি মেমসাবদের খুঁজে বেড়ায়। দাম যত কমে হয়, জিনিস যত নীরস হয় ক্ষতি নেই, তবু যৌন সংসর্গটুকু রক্ষা করতেই হবে। তখন বিদেশে এলাবির মতো রমণীরা ভাবে ওরা অসভ্য, ওরা বর্বর। একদা পৃথিবীর সব বন্দরগুলোতে কলকাতা বন্দরের এই সব নাবিকেরা ঘুরে বেড়িয়েছে। পৃথিবীর সব বন্দরে বন্দরে ভারতবর্ষকে ওরা নোংরা নিঃস্ব প্রতিপন্ন করেছে। আজও করছে। অথচ বিজন ভাবল এর বিরুদ্ধে নালিশ নেই। যত দিন এরা থাকবে—এনজিন-ট্যান্ডলের মতো এই সব লোকগুলোও থাকবে।

বিজন এই সব ভেবে এত বিরক্ত এবং অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে কখন মকবুল ফলগুর দড়িতে ঢিল দিতে বলেছে, কখন ইটন এসে ওর পাশে দাঁড়িয়েছে এবং ওর অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে হাসছে—বিজন তার কিছুই ধরতে পারে নি।

ইটন বলল, গুড মর্নিং।

বিজন বলল, ইয়েস, গুড মর্নিং।

তারপর ওরা লক্ষ্য করল জাহাজে কেমন একটা চাপা উত্তেজনা—অনেকগুলো মোটরগাড়ি এসে বন্দরে থেমেছে। সব লম্বা চৌকো মুখওয়ালা লোকেরা জাহাজে উঠে আসছে। ডেকের উপর সব জাহাজীরা, কিনারার লোকগুলো হাত তুলে আকাশ দেখছে। ইটনও আকাশ দেখল, বিজনও আকাশ দেখল। দেখে বিস্মিত হচ্ছে। ইটনের মুখ রহস্যময় হয়ে উঠেছে, ইটন বলছে—কেমন, কাজ হল তো।

ফানেলের চূড়ায় ঝুলে মকবুল প্রশ্ন করল, আকাশে এরোপ্লেনটা কি লিখছে রে?

বিজন দেখল একটা এরোপ্লেন আকাশটাকে স্লেটের মতো ব্যবহার করছে। গ্যাস দিয়ে বড় বড় হরফে ভোরের খবর দিচ্ছে। 'দি ডেইলি হেরাল্ড'এর খবর। হয়তো উড়োজাহাজটা ভাড়া করা—কিংবা ওদেরই। বিজন দুটো বড় খবরের পর পড়লঃ দি শিপ এস/এস টিবিড ব্যাংক উইল বি ব্ল্যাক ব্যান্ড, ইফ্ সেলিম...

মকবুল ফানেল থেকে বিরক্ত করছে। মকবুল বার বার প্রশ্ন করছে—আকাশে জাহাজটা কি লিখছে রে? বিজন এই সব পড়ে অধীর হয়ে উঠছে। সে মকবুলকে বলল, সেলিমকে এক্ষুনি হাসপাতালে না দিলে জাহাজের সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। সিম্যান-ইউনিয়নের সেক্রেটারি এই হুমকি দিয়েছেন।

ইটন বলল, কাল রাতে এখান থেকে যারা কাজ করে ঘরে ফিরেছে তারাই ইউনিয়নে খবরটা পৌঁছে দিয়ে গেছে।

বিজন ভাবল, সব যেন মন্ত্রের মতো কাজ করল। এখন জাহাজে খুবই লোকের ভীড়। সকলে কাজ থামিয়ে দিয়ে ব্যাপারটা দেখছে। কোম্পানির এজেন্ট পর্যন্ত জাহাজে উঠে এসেছেন। মিঃ ট্রয় এবং আরো অনেক সব লোক। ক্লার্করা এসেছেন। ওরা প্রথমে ব্রীজে উঠে গেল। কাপ্তানের ঘরে ঢুকে গেল অনেকে। কাপ্তানকে খুবই বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। তিনি এই খবরে প্রথমে খুবই অধীর এবং উত্তেজিত হয়েছিলেন। দুই সারেঙকে ডেকে প্রশ্ন করেছিলেন, কে এ-খবর ইউনিয়নে পৌঁছে দিয়েছে? কার এমন হিম্মত? সেলিমের দরজা কে খুলেছিল? ওর পোর্টহোল কেন বন্ধ ছিল না? এই সব প্রশ্নের শেষে তিনি দেখলেন স্বয়ং এজেন্ট এবং অন্যান্য সব দায়িত্বশীল কর্মচারীরা ওঁর কেবিনে ঢুকে যাচ্ছেন। তিনি কথা বলতে পারছিলেন না—এত উত্তেজিত। তবু এই সব দায়িত্বশীল কর্মচারীদের দেখে কেমন বিব্রত হয়ে পড়লেন। মিঃ ট্রয় নানা রকম প্রশ্ন করে ওঁকে আরো বিব্রত করে তুলেছেন। বিজন,

ইটন এবং মকবুল, পরে দেবনাথ পর্যন্ত ফানেলের গুঁড়িতে এসে সন্তর্পণে কাপ্তানের কেবিনের সব খবরগুলো শুনছিল। ওরা শুনে বলল, শালা ঠিক জব্দ হয়েছে এত দিনে।

বিজন মনে মনে এলবিকে ধন্যবাদ জানাল। এলবির লম্বা চোখ এবং ডিমের মতো মুখের গঠন ওর চোখে এখন প্রীতির জোয়ারে ভাসছে। ওর কালো চুলে মনোরম গন্ধ, বিজন গতকাল তা টের পেয়েছে। গতকালের অসহিষ্ণু ভাবটুকু আর ওর ভিতর নেই। এলবিকে সে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারলে খুশি হবে এমত ধারণায় বোট-ডেকে এবং নিচে ভীড়ের ভিতর এলবিকে খুঁজল। এবং খুঁজতে থাকল। অথচ এলবিকে যেই বোট-ডেকে উঠে আসতে দেখল, বিজন তাড়াতাড়ি মাস্টের আড়ালে আত্মগোপন করল।

এলবি, মিস এলবার্টি এবং সিসিল এলবার্টি—যে কোন নামেই ওকে ডাকা চলে। সে এই ছায়া ছায়া অঞ্চলে যদি এই নামে ডকে নিশ্চয়ই এলবির সাড়া পাবে। এলবি এখন দু-নম্বর বোটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে কাপ্তানের ঘরের দিকে উঠে যাচ্ছে। বিজন সব দেখেও এলবিকে গুড মর্নিং বলতে পারল না, কৃতজ্ঞতা জানাতে পারল না। এলবির সঙ্গে যে কোন পরিচয়ই এ-মুহূর্তে এ-জাহাজে মারাত্মক। কাপ্তান তাঁর বিরক্তি ভাবটুকু কলকাতা বন্দর পর্যন্ত পুষে রাখবেন। সারেঙ সেই ভাবটুকু কলকাতা পর্যন্ত জিইয়ে রাখবেন। তারপর এক শুভদিনে বিজনের নলীতে লাল দুটো দাগ পড়বে। বিজন ব্ল্যাক-লিস্টেড হবে।

সুতরাং সে এলবিকে দেখে আত্মগোপন না করে পারল না। এলবিকে দেখেই মাস্টের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। এলবি সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেল। সে যেন কোন জাহাজীকে প্রশ্ন করছে, বি-জন, বি-জন কোথায় কাজ করছে?

বিজন আঁতকে উঠল। সে ধীরে ধীরে টুইন ডেকে নেমে গেল এবং দু-লাফে ফল্কা পার হয়ে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে নিজের ফোকসালে ঢুকে দরজা বন্ধ করার আগে অন্য জাহাজীদের বলে দিল, কেউ ওকে যদি খোঁজ করে তবে যেন বলা হয় সে জাহাজে নেই। বন্দরে নেমে গেছে। তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাংকে বসে হাঁপাতে থাকল।

কি সর্বনাশ—বিজন ভাবল। বিজন নিজের ভুলের জন্য নিজেই ক্ষেপে গেল। গতকাল যা ওর সবচেয়ে বেশি বলা দরকার ছিল, এলবিকে তাই বলা হয় নি। ওর উচিত ছিল বলা, এ খবর তোমাদের আমি পেঁছে দিলাম এ কথা যেন জাহাজের কেউ না জানে। তবে আর গরীবের চাকরিটা থাকবে না। সেলিমের সঙ্গে তবে আমিও মরব। অথচ সেই কথাটাই এলবিকে বলা হয় নি।

এলবি এদিকে এসে দেবনাথকেও প্রশ্ন করল, বিজন কোথায়?

দেবনাথ ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বলল, বিজন তো এখানেই ছিল। বলে ইতস্তত এদিক-ওদিক চোখ তুলে তাকাল। তারপর বলল, চল কেবিনে। বোধ হয় সে সেখানেই আছে।

নীচে নামবার আগে এলবিকে নিয়ে দেবনাথ একবার গ্যালিতে বিজনকে খুঁজে দেখল। তাকে ওরা সেখানে পেল না।

সেলিম স্ট্রেচারে শুয়ে আছে। সেলিম কাঁদছে। সারেঙ বুঝ-প্রবোধ দিচ্ছে। বলছে, ভালো হয়ে গেলেই কোম্পানি তোকে দেশে পাঠিয়ে দেবে। কাঁদছিস কেন? ভালোর জন্যই তোকে হাসপাতালে দিচ্ছে।

বিজন এই বাংকে বসেও যেন টের পাচ্ছে—এইমাত্র সেলিমকে ধরাধরি করে নীচে জেটিতে নামানো হল। সেলিম কাঁদছে। সে বলেছিল, বিবির কোলে মাথা রেখে মরবে। সে বলেছিল, আমার দেশের মাটিতে আমার কবর হবে। সে কথাগুলো বিজনকে বলেছিল। ওর খুব দুঃখ হচ্ছে এ সময়—সে কাছে থাকতে পারল না, বলতে পারল না—রোজ আমি যাচ্ছি। বিকেলে যাব। তুই ভয় পাবি না। তুই ভালো হয়ে উঠবি—বলতে পারল না...তখন দরজাটা কে যেন ঠেলছে। সে এই বাংকে বসে দেবনাথের গলার শব্দ পেল। দেবনাথ বলছে—এই, দরজা খোল। দরজা বন্ধ করে ভিতরে কি করছিস?

বিজন দরজা খুলতেই এলবিকে দেখতে পেল। এলবি দেবনাথের একপাশে দাঁড়িয়ে হাসছে।

বিজন বলল, গুড মর্নিং।

তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।

কেন, এখানেই তো ছিলাম।

এখানেও খুঁজেছি।

বিজন বিব্রত হয়ে পড়ল।

এলবি ভিতরে ঢুকে বলল, ট্রয়কে কিন্তু সব কথাই খুলে বলতে পেরেছি।

বিজন ধন্যবাদ জানাল। তারপর বলল, বোসো।

ছোট ঘর, সোফা নেই। একটা ইজিচেয়ার আছে, কিন্তু পাতবার জায়গা নেই। ওরা তিনজন এমত কথায় হাসল।

এলবি বলল, আমি বেশিক্ষণ বসব না। হাতে অনেক কাজ। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য দেরী হয়ে গেল। ওরা হয়তো এতক্ষণে চলে গেছে। সেলিমকে রয়েল হাসপাতালে রাখা হচ্ছে। আশা করছি বিকেলে ওকে দেখতে যাবে। যেতে অসুবিধা হলে, আমার ওখানে চলে যেও, সেখান থেকে আমি তোমায় নিয়ে যাব। বলে সে আর বসল না। তরতর করে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল।

ওরা দুজন ফোকসালে বসে এলবির পায়ের শেষ শব্দটুকু পর্যন্ত মিলিয়ে যেতে শুনল। দেবনাথ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল বিজনের। বলল, কি করে এ-মেয়েকে ধরলি?

বিজন গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং সে এ-ব্যাপারে আদৌ উচ্ছল হল না। আদৌ মুখর হল না। সে জবাবে শুধু বলল, পথে আলাপ।

তারপর ওরা দুজনে চুপচাপ। গ্যালীতে মাংস সিদ্ধ হচ্ছে। ওরা সেই গন্ধ নিচে বসে পেল। ওরা দুজনে কথা বলল না, তখন এক এক করে সকলে এসে নিচে নামছে। যে যার হাত-মুখ ধুলো। থালা-মগ ধুলো। এবং ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেল। ওরা ভোরের এই আকস্মিক ঘটনায় বিস্মিত হয়েছে, খেতে বসে সকলে এমত ভাব প্রকাশ করতে চাইল।

বিজন এই শীতের বিকেলে ডেকে এসে দাঁড়াল। ওর পোশাক এবং মুখের কমনীয়তায় শীতের রঙ অথবা সমুদ্রের রঙ। ওর শরীরের রঙে আশ্চর্য স্নিগ্ধতা। শীতের দেশে ঘুরে এবং সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় শরীরের রঙ কমনীয় হতে হতে কোন্ এক ভোরে বিজন যেন বিদেশীর মতো কথা বলতে শিখল।

সে রেলিঙে দাঁড়িয়ে দেখল দুটো সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দরে এসে নোঙর

করেছে। সে ফানেলের রঙ দেখেই বুঝল আমেরিকান জাহাজ। এবং হয়তো কোন বিকেলে ভেড়ার মাংস অথবা ফলের রসদে বোঝাই হয়ে অন্য বন্দরে পাড়ি দেবে।

শেষে অন্যান্য অনেক জাহাজীর মতো সেও সেলিমের রুগ্ন ফোকসাল অতিক্রম করে গ্যাংওয়ে ধরে বন্দরে নেমে গেল। অন্যান্য দিনের মতো সে আজ সাধারণ জাহাজী হয়ে পথ ধরল না। সব কিছু দেখেই সে চোখ ফেরাল না। সে চলতে থাকল। একজন স্থায়ী বাসিন্দার মতো সে এই ঝরা পাইনের পথ ধরে শহরে উঠে যাচ্ছে। ঝুলন্ত সেতু অতিক্রম করে বন্দরের সিম্যান-মিশান বাঁয়ে ফেলে সে উঠে যাচ্ছে। সেই পাঁচ কলিন স্ট্রীট ও সেই মেয়ে এলবি। সে নির্দিষ্ট আস্তানায় উঠে যাওয়ার জন্য একটা ট্যাক্সি ডাকল। মোটরে বসে এলবি এবং ওর ইউনিয়নের হলঘর, ওর চিলতে ঘরটুকু...এলবি সুন্দরী, সে সুখে আছে...এলবির চোখ গভীর, আত্মপ্রত্যয় দৃঢ়.. এলবিকে মনে মনে সুন্দরী বিদেশী রমণী অথচ আপনার মতো করে দেখার এক সবিশেষ কৌতূহলে সে পীড়িত হতে থাকল। এবং সহসাই স্মরণ করতে পারল—এলবি যদি বাতিকগ্রস্ত রুগীর মতো ফের বলতে থাকে—তুমি ট্যাগো-রের কান্ট্রি থেকে এসেছ, তুমি কবির কাছের লোক, তুমি কবিকে দেখেছ সুতরাং তুমি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও। তুমি আমাকে বাংলা ভাষা শেখাও। আমি মূল কবিতার রস পেতে চাই। তা হলে ..তা হলে! সে শরীরের আড়ষ্টতায় এমত উচ্চারণ করে কেমন জড়বৎ বসে থাকল, সে ড্রাইভারকে বলতে পারল না তুমি বন্দরে চল, পাঁচ কলিন স্ট্রীট গিয়ে আমার দরকার নেই।

হলঘরের দরজায় বিজন এলবিকে দেখতে পেল। বিজন ট্যাক্সি থেকে নামল ফুটপাথে। এলবি সিঁড়ি ধরে নেমে আসছে। ওরা পরস্পর অভিবাদন জানাল। তারপর উভয়ে মোটরে চড়ে সেলিমকে দেখতে রয়েল হাসপাতালে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। শীতের সন্ধ্যা। এলবির হাতের দস্তানা লাল রঙের। মোজা বেগুনি রঙের। বব-করা ব্লন্ডচুলে দুটো প্রজাপতি-ক্লিপ। গলায় সরু সোনার চেনে পাথর বসানো। হলদে স্কার্ট, লাল জ্যাকেট শরীরে। শীতের সন্ধ্যায় এলবিকে এই সব পোশাকে অতীব তীক্ষ্ম মনে হল।

শহরের বড় রাস্তা ধরে ওরা চলেছে। আপাতত ওরা কোন কথা বলছে না। এলবি স্টীয়ারিং করছে। বিজন শহর দেখছে। বড় রাস্তা, সুতরাং বড় বড় সব কাঁচ-মোড়া আসবাবপত্রের, কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের, পোশাকের অথবা মোটরের দোকান। ভিন্ন ভিন্ন সব বিজ্ঞাপন ঝুলছে। এলবি দুটো-একটা কথা বলছে এখন। শহরের এই সব দোকানের এবং কোন্ মুল্লুক ধরে কি ভাবে রয়েল হাসপাতালে যাচ্ছে এই সব খবর দিয়ে নিঃশব্দ ভাবটুকু অতিক্রম করছে।

এলবি বলল, জাহাজ তবে অনেক দিন থাকল।

তা থাকল।

প্রায় দু-মাসের মতো হবে।

তা হবে।

পাশের পত্রিকাটা তুলে বিজনকে দেখাল। সামনে মোড় ঘুরতে হবে। নীল বাতি জ্বলছে না। সুতরাং এলবি দু-হাতেই পত্রিকাটা বিজনের হাতে তুলে দিল। —খবরটা পড়েছ?

আকাশে দেখেছি এবং পড়েছি। আচ্ছা এলবি...বিজন একটা প্রশ্ন তুলে ধরার ইচ্ছায় ঘাড়টা বাঁকাল।—আচ্ছা এলবি...তোমাদের ভিতর থেকে কেউ তো বলে নি

এ-ঘটনার সঙ্গে আমি যুক্ত? পত্রিকায় তেমন খবর নেই তো! বিজন পত্রিকাটা ধীরে ধীরে নিজের কোলের কাছে নিয়ে এলো। সে খুঁটিয়ে সবটুকু পড়ল। এবং এলবির মুখ দেখে যেন বুঝতে পারছে বিজনের এই দুঃসহ জড়তায় এলবি পীড়িত হচ্ছে।

এলবির কঠিন মুখ সহসা নানা রঙে ক্রমশ নরম হচ্ছে। —বিজন, তুমি পাকা জাহাজী হও নি। তুমি দেখছি মিঃ ট্রয়কে খুব কাঁচা লোক ভেবেছ। পত্রিকা পড়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে এ-ব্যাপারে আমরা কিনারার কুলী লোকদের উপর বেশি নির্ভর করেছি। কথা কি জানো, এখানকার মতো এত জোরালো ইউনিয়ন পৃথিবীর কম বন্দরেই আছে। পাঁচ কলিন স্ট্রীটে পাঁচ বছর থেকে আছি। এ-ব্যাপারে আমি অভিজ্ঞ। তোমাকে জড়ালে কাপ্তান অন্য বন্দরে তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে ভেবেছ?

ওদের মোটর হাসপাতালের দরজায় এসে থামল। মোটর পার্ক করে পার্ক-বোর্ডে নাম লিখে ওরা সদর দরজা অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

বিজন দেখল, দুটোর বৃত্তের মতো বাগান দু-পাশে রেখে উঠে যাচ্ছে। এলবি ব্যাগ থেকে ডায়েরী বের করে সিটনম্বর এবং ব্লক-নম্বর দেখে নিল। তারপর নম্বর মিলিয়ে ওরা এক সময় সেলিমের বিছানার পাশে পৌঁছে গেল।

এলবি বলল, গুড ইভনিং। তোমাকে এখন ভালো দেখাচ্ছে।

বিজন সেলিমের বিছানার পাশে বসে ওর চুলে হাত দিয়ে বলল, এমন ভেঙে পড়েছিস কেন. আমি রোজ বিকেলে তোকে দেখতে আসব। জাহাজ এখানে অনেক দিন থাকবে। আশা করি তত দিনে তুই ভালো হয়ে উঠবি।

সেলিম পাশ ফিরে শুল। ওর খুব যেন কষ্ট হচ্ছে। বুকে কষ্ট, হাতে পায়ে যন্ত্রণা। সেলিম বড় বড় চোখে এলবিকে দেখছে। এলবি কিছু ফল এনেছিল সঙ্গে। সেলিমের টেবিলে ফলগুলো রাখল। সেলিম বড় বড় চোখে এলবিকে দেখছে। সেলিম কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়েছে এমন ভাব ওর চোখে মুখে। অথচ এই সব যন্ত্রণার ভিতরও সেলিম হাসল। একজন ডক্টার, দুজন নার্স ওর পাশে এসে এখন দাঁড়িয়েছে। ওরা ওর শরীরে ওষুধ প্রয়োগ করল। ওরা সেলিমকে বাঁচবার জন্য উৎসাহিত করল।

এলবি একজন সিস্টারকে প্রশ্ন করল, কাল নিশ্চয়ই প্লেট নেওয়া হচ্ছে?

আজ রাতেই হবে। মিঃ ট্রয় সব ব্যবস্থা করে গেছেন।

এলবি সিস্টারের প্রতি ধন্যবাদসূচক অব্যয়ে মাথা নোয়াল।

বস্তুত বিজন এই অসুস্থ পরিবেশে সহজ হতে পারল না। এই অসুস্থ পরিবেশের ভিতর সেলিমকে দেখে সে আহত। সব যুবতী নার্সরা শরীরে এপ্রন জড়িয়ে ধীরে ধীরে অথচ সত্বর পা ফেলে শরীরে সংযমী ভাবটুকু রক্ষা করে ঘোরাফেরা করছে। ওরা মহীয়সী রমণী হওয়ার ইচ্ছায় দীর্ঘ দিন ধরে অভ্যাসে রত। অথচ হতে পারছে না অথবা বিজন ওদের মহীয়সী রমণীরূপে দেখার চেষ্টা করছে না। সে এলবির মতো একজন নার্সের সঙ্গে আলাপ করতে চাইল। আলাপ করে জানতে ইচ্ছা হল—এই যে তোমরা তোমাদের মুখ মোমের মতো সাদা নিষ্পাপ করে রেখেছ, এমত তোমরা নিষ্পাপ অথবা করুণাঘন কি না।

ওরা উঠে পড়ল। সব ভিজিটারের শেষে ওরা প্রশস্ত পথ ধরে বড় বড় সব চত্বর পার হয়ে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে, ফের সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে হাসপাতালের সদর দরজায় এসে হাজির হল। এলবি বলল, চল, একটু ঘুরে আসি। একটু

ইউনিভার্সিটির সামনের পার্কটায় বসব। একটু গল্প করব। রাত ঘন হলে তোমাকে জাহাজে পেঁছে দিয়ে বাড়িতে ফিরে যাব।

মোটরের ভিতর বসে বিজন প্রশ্ন করল, সেলিম শীগগিরই ভালো হয়ে উঠবে— কি বল?,

নিশ্চয়ই। খুব জোর দিয়েই যেন এলবি কথাটা বলল। সেলিম ভালো হয়ে উঠলে, তুমি আমি সেলিম জীলণ্ডে যাব। সেখানে আমার বাবা মা থাকেন। বাবা তোমাকে পেলে কিছুতেই ছাড়তে চাইবেন না। তোমাকে পাশে বসিয়ে কেবল ট্যাগোরের কবিতা শুনতে চাইবেন। আমাদের পরিবারের সকলে 'গীতাঞ্জলী'র কবিতা মুখস্থ। বলে এলবি মোটরে স্টার্ট দিল এবং জোরে জোরে বিশুদ্ধ সংগীতের মতো কবিতা উচ্চারণ করলঃ

> "When the warriors came out first from their master's hall, where had they hid their power? Where were their armour and their arms?
>
> They looked poor and helpless, and the arrows were showered upon them on the day they came out from their master's hall.
>
> When the warriors marched back again to their master's hall where did they hide their power?
>
> They had dropped the sword and dropped the bow and the arrow; peace was on their foreheads, and they had left the fruits of their life behind them on the day they marched back again to their master's hell.

কবিতা আবৃত্তি করার সময় আবার সেই ভাবটুকু এলবির মুখে—তুমি কবির দেশের ছেলে, তুমি কবিকে দেখেছ, প্রণাম করেছ, তোমার ঘনিষ্ঠ হয়ে কবিতা আবৃত্তিতে অশেষ আনন্দ। তখন মোটর চলছে। তখনো এলবি কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে মোটর চালাচ্ছে। শহরের সব ছোট-বড় দোকান, রোশনাই আলো, থিয়েটার-হল অতিক্রম করে ওরা পশ্চিমের দিকে চলেছে। এলবি ফের বিশুদ্ধ জগতের বাসিন্দা হয়ে যেন প্রতিধ্বনি করল—পিস ওয়াজ অন দেয়ার ফোরহেডস্। অথচ বিজনের কপালে এখন নিষ্ঠুরতার চিহ্ন। সে এলবির এই সাহিত্য-প্রীতিতে পীড়িত হচ্ছে। যেন বলার ইচ্ছা—আমি বাপু জাহাজী মানুষ, আমার ইতস্তত মিথ্যা বলার নিদারুণ অভ্যাস আছে। সাহিত্য-প্রীতি কোন কালে ছিল না আমার, এখনও নেই।

এলবি বিজনের দিকে মুখ না তুলেই বলল, আমরা এসে গেছি। আমরা এখানে বেশিক্ষণ বসব না। 'জলপাই' গাছের নিচে বসে তুমি কবির কবিতা বল। আমি শুনি।

বিজন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। সে বলতে চাইল—আমি কবির কবিতা আবৃত্তি করতে পারব না। জাহাজী মানুষের কবিতা কণ্ঠস্থ করে লাভ নেই। এই নীরস জীবনে সততার আশ্রয়ে বাঁচা নিরর্থক। তবু এলবি ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এলবিকে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনুসরণ করছে। এলবি যেখানে বসল, সে সেখানেই বসে পড়ল। এলবির প্রতি বিদ্রূপের ইচ্ছায় অথবা মাতাল হওয়ার ইচ্ছায় নিরন্তর সে কঠিন। এলবি এখন কোন কথা বলছে না। এলবি ঘন হয়ে বসল। এলবি বস্তুত বিজনকে কবির প্রতীকীতে অনন্য করে রাখতে চাইল।

বিজন মরিয়া হয়ে শিশু-বয়সের পড়া কোন কবিতার কথা মনে করতে পারল। (দশম শ্রেণীতে কবির কবিতা সে কিছু পড়েছে।—কিন্তু এখন বিধির বিধানে তাও মনে করতে পারছে না। তা ছাড়া ঘটনাটা এমত শীঘ্র ঘটবে সে তাও ভাবতে পারে নি।) সে আবৃত্তি করল। ওর কণ্ঠ মসৃণ বলে কবিতা আবৃত্তির বিশুদ্ধ ভংগীটুকু এলবিকে আপ্লুত করল।

বিজন টেনে টেনে আবৃত্তি করছে—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল।
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।"

ওরা পরস্পর কথা বলতে পারছে না। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে ওরা উভয়ে যেন গম্ভীর এবং ঘন। উভয়ে যেন রবীন্দ্রনাথের মতো বিশুদ্ধ ইচ্ছার পরস্পর মহৎ ভাবটুকু রক্ষা করছে।

বিজন এলবির কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রতীকীতে বাঁচবার ইচ্ছায় এও বলল, মোটরে যে কবিতা আমাকে শোনালে এ-কবিতা তারই মূল ভাষা।

বিজন ভাবল—বন্দরে আমি এলবির চোখে রবীন্দ্রনাথ হয়ে বাঁচব।

তারপর এলবির মোটর থেকে এক সময় বিজন জাহাজে উঠে ফোকসালে ঢুকে দেখল, দেবনাথ বাংকে ঘুমিয়ে আছে। অন্যান্য কেবিনেও বিশেষ সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ভয়ানক শীতে সব জাহাজীরা কম্বল মুড়ি দিয়ে জাহাজে ঘুমোচ্ছে। সে ফোকসালে দাঁড়িয়ে কিছু কাশির শব্দ শুনল। দু-একজন জাহাজীর আলাপ শুনল। এই শীতে উপরে উঠে হাত-মুখ ধুতে ইচ্ছা হল না। কোন রকমে লকার থেকে খাবারটা বের করে খেয়ে নিল। তারপর ঠাণ্ডা জলে কুলকুচা করে পোর্টহোলে মুখ ধুলো এবং বাংকে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ইচ্ছায় হাত-পা সটান করে দিল। অথচ ঘুম এলো না। ঘুম আসছে না। বিজন অন্য ফোকসালে ফের কিছু জাহাজীর আলাপ শুনছে। এখন হয়তো এলবি ঘরে ফিরে অন্য কবিতা আবৃত্তি করছে। এই বাংকেও সে এলবির কাছে মিথ্যার মুখোসের জন্য ছটফট করছে। অথচ সে স্পষ্ট হলে সাময়িক যন্ত্রণা, দুঃখ এবং নিষ্ঠুরতার গ্লানিকে ধৈর্য ধরে লালন করতে হত ন : এই করে সে এক মিথ্যার জন্য হাজার মিথ্যায় জড়িয়ে পড়ছে।

ওর ইচ্ছা হল একবার দেবনাথকে ঘটনাটা খুলে বলে। সাহিত্য-প্রীতি এবং স্পৃহা দেবনাথের যথেষ্ট আছে। বরং সে দেবনাথকেই সঙ্গে নেবে। অথবা দেবনাথকে প্রশ্ন করে জানবে—ওর কাছে কবির কোন বই অথবা কোন কবিতা কণ্ঠস্থ...যদি থাকে তবে...তবে...সে নিঃসংশয় হতে পারছে না তবু। দেবনাথ! দেবনাথ! সে যেন ডেকেই উঠল। মনে মনে ওর এই ডাক এবং এলবির সরল

বিশ্বাস, দুটো চোখের ঘনিষ্ঠতা—সব মিলিয়ে ওর চোখে জ্বালা। ওর ঘুম আসছে না। এলবি 'পাখীসব করে রব' ইংরেজী হরফে লিখে নিতে চেয়েছিল। সে হয়তো এই সব মুখস্থ করে অন্য কোথাও আবৃত্তি...কিংবা বাহবা...কিন্তু বিজন বলেছে তখন শরীরটা ভালো নেই। আবার কাল হবে। আবার সে ছলনাকে কেন্দ্র করে বাঁচতে চাইল। এলবির ঘনিষ্ঠতা, সঙ্গ এবং দু'দণ্ডের আলাপ থেকে বিচ্ছেদের নিঃসঙ্গতায় সে বাঁচতে চাইল না। বিশেষত এই বিদেশিনীর কাছে স্পষ্ট হওয়ার দরুন কোন পরাভবকে স্বীকার করার দরুণ কোন গ্লানিকে সহ্য করতে পারত না। অপমানবোধটুকু বিজনের অসামান্য। সেজন্য এই মিথ্যার মুখোসে আপাতত জাহাজী ভাবটুকু রক্ষা করতে পেরেছে ভেবে সে খুশি।

ভোরবেলায় জাহাজে অনেক কাজ। সালফেট নামানো হচ্ছে। হাড়িয়া-হাপিজ হচ্ছে ফল্কায় ফল্কায়। ভোরে আজ সূর্য উঠল না। আকাশ মুখ গোমড়া করে আছে। সমুদ্রের বাতাস পর্যন্ত। বন্দরের পাইন গাছে কোন পাখি বসে নেই। শীতের জন্য ওরা কোথাও চলে যাচ্ছে। শীতের জন্য এই সব জাহাজীরা হি হি করে কাঁপছে। ওরা সাবান-জল নিয়ে আজ ছুটে ছুটে কাজ করতে পারছে না, ওরা স্থাণুর মতো নীল উর্দির ভিতর গুটিয়ে আসছে। ওরা পুরানো জামা-কাপড় সব আফ্রিকার বন্দরে বিক্রি করে এখন পস্তাচ্ছে। শীতের কষ্ট ভয়ানক কষ্ট।

পাশের জাহাজে কিসের যেন সোরগোল। পাশের জাহাজের নাবিকেরা পোর্ট-সাইডের ডেকে জড়ো হয়েছে। ওরা রেলিঙের উপর ঝুঁকেছে। ওদের সকলের চোখ বন্দরের জলের উপর। এই জাহাজের নাবিকেরা ঘটনাটা ধরতে না পেরে গলুই-এ জড়ো হয়েছে। মেজ মালোম অন্য জাহাজীদের ডেকে ঘটনার কথা জানতে চাইলেন। ওরা সকলে এখন খবরটা শুনছে। পাশের জাহাজের তিন নম্বর মিস্ত্রী জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনাটা তারপর আরও বিস্তৃত হল। বন্দরের সব লোক জমেছে।. এ-শীতেও কিছু লোক জলে নেমে অনুসন্ধান করছে তিন নম্বর মিস্ত্রীকে অথচ মিস্ত্রীকে পাওয়া যাচ্ছে না। ইংলণ্ডে ওর স্ত্রী এডাল্ট্রি কেসে জড়িয়ে পড়েছে—এই খবরটা এখন জাহাজীদের মুখে মুখে।

ভোরের এই সব সাত-পাঁচ ঘটনায় বিজন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ওর মনে নেই এবং মনে পড়ছে না—গতকাল এক রমণীয় পরিবেশে কোন এক সুন্দরী যুবতীর পাশে মরিয়া হয়ে মিথ্যার পসরা খুলেছিল। মনে পড়ছে না আজও এমত ঘটতে পারে। একজন জাহাজীর আত্মহত্যা এবং সালফেটের গন্ধ আর এই প্রচণ্ড শীত ওকে ওর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিলকুল বিপরীত ধারণার বশবর্তী করেছে। সে ভাবল মৃত্যুই শ্রেয়, মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ। পিস্ ওয়াজ অন দেয়ার ফোরহেডস্—সে এ-কথাও ভাবল। সেলিমের কপালে শান্তির রেখা ফুটে উঠেছে হয়তো। এলবির সেই মুখ—সেখানেও একদিন শান্তির রেখা নামবে—কবিতা আবৃত্তির সময় এলবির সেই গভীর দৃষ্টি, সেই দৃঢ় অথচ প্রীতিপূর্ণ চোখ সে রেলিঙে দাঁড়িয়ে নিঃস্ব পাইনের আঁধারে সহসা যেন দেখল। এলবি তাকে ভালোবাসতে চায়। রবীন্দ্রনাথের মতো করে ভালোবাসতে চায়। বিজন যেন এখন কবির প্রতীকীতে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে ডাকল—দেবনাথ, দেবনাথ, নীচে এসো কথা আছে। বিকেলের কথা রাখার জন্য সে নীচে সিঁড়ি ধরে ফোকসালে ঢুকে গেল। —তুমি তো অনেক বই এনেছ সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের কোন বই আছে তোমার কাছে? এই সব বলার ইচ্ছা হল।

সে দেবনাথের কাছেই একটা খাতা পেয়ে গেল। সে তিক্ত বিস্বাদে খাতার পাতা উল্টাচ্ছে। সে বার বার করে একই কবিতা পড়ল। পড়ে মুখস্থ করল। সে পড়ল—

"জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে"

বিকেলে মোটর নিয়ে এলবি বন্দরে হাজির। বন্দরে সে বিজনের জন্য অপেক্ষা করছে। কিনারার শ্রমিকরা এখন জাহাজের কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরছে। ওরা সকলে এলবিকে অভিবাদন জানাল। কোয়ার্টার মাস্টার তখন খবর দিয়ে পাঠিয়েছেন বিজনকে। বিজন একবার গলুই-এ উঠে উঁকি দিয়ে এলবিকে দেখল। সে একবার আবৃত্তি করল সিঁড়ি ধরে নামার সময়। সে একবার সেলিমের হাসপাতালের দৃশ্যে, পরে এই কবিতার সুরে এবং আরও পরে পোশাকের ভিতর ঢুকে গিয়ে অম্লান থাকার ইচ্ছায় শিস দিতে থাকল।

নীচে নেমে ওরা উভয়ে পরস্পরকে অভিবাদন জানাল। বিজন মনে মনে কবিতা আবৃত্তি করল—সেই নির্দিষ্ট কবিতা, সেই সুরে, সেই নিঃস্ব অথচ ভরা কোটালের মতো আবেগধর্মিতায়। অথচ এলবিকে জানতে দিল না মনে মনে সে এখন কবিতা আওড়াচ্ছে। মনে মনে সে এখন কবিতার মতোই বিশুদ্ধ ভাব নিয়ে বেঁচে আছে। সে সেলিমের পাশে বিশুদ্ধ ভাব নিয়ে বসবে। সে সেলিমের মাথায় হাত বুলিয়ে বিশুদ্ধ শান্তি দেবে। বলবে, তুই ভালো হয়ে উঠবি। বলবে নার্সকে প্লেট কি বলছে? আর কত দিন সেলিমকে এখানে থাকতে হবে?

মোটরে ওরা ভিন্ন ভিন্ন রকমের কথা বলল। রাজনীতি থেকে খেলাধুলো, এমন কি রয়েল হাসপাতালে দুজন ভারতীয় মেয়ে নার্স ট্রেনিং-এ আসছে এ-খবরও দিল এলবি। ওর বাবা পার্থে যাচ্ছেন। মা এবং বাবা হয়তো যাওয়ার পথে একবার এখানে এসেও যেতে পারেন। কারণ এলবি বিজন সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখে দিয়েছে। সুতরাং বাবা আসছেন, মা আসছেন।

এলবি মোটর চালাবার সময় একবার হাতের ঘড়ি দেখল। যেন আজ হাতে কিছুট সময় বেশী আছে। খুব বিশেষ তাড়া নেই কাজের। মোটরের গতি সাধারণ। এলবি খুব খুশি খুশি হয়ে কথা বলছিল। বলছিল, আশা করি সেলিমের ভালো খবরই আমরা পাব।

ওরা হাসপাতালে কিন্তু শুনল অন্য কথা। মিঃ ট্রয় সেলিমের কাছে এলবির নামে একটা চিঠি রেখে গেছেন। এলবি চিঠিটা পড়ল। এলবিকে এখন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। বিষণ্ণতা বিজনেও সংক্রমিত হল।

এলবি বলল, সেলিমের মেজর অপারেশন হবে। বাঁদিকের ফুসফুসটা বাদ যাবে। এলবি এই সব কথা হাসপাতালের সিঁড়ি ধরে নামার সময় বিজনকে শোনাল।

বিজন বিছানায় বসে সেলিমের সঙ্গে রঙ্গতামাসা করেছিল। দেশে ফিরলে সেলিম বিবিকে প্রথম কোন্ জাহাজী বন্ধুর গল্প শোনাবে, প্রশ্ন করে বিজন জানতে চেয়েছিল আরও অনেক সব কথা—বিজন সব যেন মনে করতে পারছে না।

অন্যান্য দু-একজন জাহাজীও ওর পাশে বসেছিল। সারেঙ বলে পাঠিয়েছেন তিনি কাল এসে দেখে যাবেন। বিজন সেলিমের বিছানায় শেষ সময়টুকু পর্যন্ত

কাটাতে পেরে খুশি। তারপর ভিজিটারদের শেষ ঘণ্টা পড়ল। সিঁড়ি ধরে নামবার সময় সেলিমের অস্ত্রোপচারের কথা শুনল। এবং এই শুনে বিজনের কেমন অন্যমনস্কতা বাড়ছে। এলবি মোটরে বসে লক্ষ্য করছে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় বিজন খুব ভেঙে পড়ছে। এলবির এখন বিজনকে উত্তেজিত করার ইচ্ছা। জাহাজী বিজন কেমন মফস্বলের মেয়েমানুষ বনে যাচ্ছে।

ওরা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কটায় ঢুকে গেল, যেখানে মিমোসা-ফুলেরা ঝরে গেছে, যেখানে রেস্ট-রুমে বসে যুবক যুবতীরা সব শরীরী যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, যেখানে বাটারকাপ ফুল ফুটে একদা সুন্দরী রমণীর টুপির পালকের মতো উন্মত হতে হতে শীতের তাড়নায় মলিন হয়ে গেছে—তার ভিতর দিয়ে জলপাইয়ের ঘন বন পার হয়ে ইউক্যালিপটাসের ঘন আলো-আঁধারে ওরা বসে পড়ল। পাতার আড়ালে আড়ালে সব স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ আলো। আলোর ছায়া। জাফরী-কাটা রঙ ওদের শরীরে, মুখে। ওরা এ সময় পরস্পর মুখ তুলে তাকাল।

বিজন বলল, সেলিম আমার সঙ্গে দু'সফর ধরে কাজ করছে। দু'সফর ধরে ওর সঙ্গে উঠে বসে কখন যে আমরা একে অপরকে ভালোবেসে ফেলেছি জানি না। এখন বুঝতে পারছি ওর অভাবটা জাহাজে আমার কত বড় হয়ে বাজছে।

তারপর ওরা এই সব স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ আলোয় অথবা মনের আরও সব নীল ইচ্ছায় প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে—তারপর সেই কবিতার জগতে ফিরে আসা কবিতার জগতে ডুবে যাওয়া, ইতিহাসের মৃত নায়কের মুখের মতো ছবি হয়ে বসে থাকা এবং অবশেষে নিজেদের প্রাপ্য হিসাবে মনে মনে অচঞ্চল থাকার বাসনা—এমন একদিন হয় নি, অনেক দিন হয়েছে। ওরা পরস্পরকে কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছে। এলবি বিজনকে বাড়ি নিয়ে গেছে। ওর হাতের আঁকা ছবি দেখিয়েছে। তারপর কোন রেস্টুরেণ্টে অথবা নীল আকাশের নীচে বসে সেলিমের অস্ত্রোপচারের দিনের কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়েছে।

একদিন এলবি বলল, বাবা মা কাল আসছেন।

জীলণ্ড এখান থেকে কত দূর? প্রশ্ন করেছিল বিজন।

খুব বেশি দূর নয়। পুরো তিনশো আটচল্লিশ মাইল।

কিসে ওঁরা আসবেন?

ট্রেনে আসা যায়। বাবা মোটরে আসছেন। খুব প্লেজাণ্ট জার্নি। তারপর একটু থেমে এলবি আবার বলল, ওঁদের সঙ্গে আলাপে তুমি খুশি হবে।

আমার সঙ্গে আলাপে ওঁরা খুশি হবেন তো?

এলবি হাসল।

দু'দিন পর এলবি ওর বাবা-মার সঙ্গে বিজনকে পরিচয় করিয়ে দিল। ওঁরা বিজনকে বললেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য-তোমাকে আমাদের ভিতর পেয়েছি। পরম সৌভাগ্য, এলবি এ সময় খবর দিয়ে তোমার কথা জানিয়েছে। আমরা সকলেই কবির ভয়ানক ভক্ত। তুমি তাঁর পাশের লোক। তুমি ওঁর স্পর্শলাভ করেছ—এবং আমরা তোমার সঙ্গলাভ করেছি ভেবে খুশি।

এলবির বাবার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে বিজন সত্যি খুশি। ভদ্রলোক অমায়িক। ভদ্রলোক প্রাণ-উচ্ছল অথচ কথাবার্তায় খুব সংযত। বিজনের মুখ থেকে কবির কবিতা শোনার একান্ত ইচ্ছা ওঁদের। বিজন পর পর কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করল।

ওঁরা খুশি হয়ে বললেন, তুমি আমাদের কথা দাও ডিনারে একদিন উপস্থিত থাকবে। আমরা খুব আনন্দিত হব তোমার উপস্থিতিতে।

দিন স্থির করুন, আসব।

কিন্তু একটা কথা, মিঃ চার্লটন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। একটা সিগারেট ধরালেন এবং টেবিল ঘুরে এসে বিজনের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা তোমাকে চাইনিজ ডিস দেব। খুব মনোরম খেতে। কিন্তু...।

এলবি এবার আর একটু প্রকাশ করল। —বাবা চায়নাতে অনেক দিন ছিলেন। এমব্যাসিতে কাজ করতেন। সুতরাং বাবা কোন ভদ্রলোককে ডিনার-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলেই তাঁকে চাইনীজ ডিস দিতে ভালোবাসেন।

চার্লটন আবার আরাম্ভ করলেন, কিন্তু কথা হচ্ছে ট্যাগোরের দেশের ছেলে তুমি —বলতে গেলে ঘরের ছেলে। সুতরাং ট্যাগোর কি খেতেন এবং খেতে ভালবাসতেন নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে। মেনুতে ট্যাগোর-ডিশও একটা থাকবে—কি বল। তার প্রিপারেশনের ভার তোমার উপর। কি কি লাগবে বলে দাও, আমি সব সংগ্রহ করে রখব। আগামী শনিবার ছুটির দিনে আমরা এখানে ফের আসব। এবার তিনি থামলেন। পাশে মিসেস চার্লটন উল বুনতে বুনতে লাফিয়ে উঠলেন, বড় চমৎকার হবে। এলবির পিসিকে বললে হয়। তারপর আরও দু-একজনের নাম তিনি বলে গেলেন।

বিজন বলল, রান্নাতে আমি অভ্যস্ত নই। দেবনাথ বলে একজন জাহাজী আছে—সেও বাঙালী, সে ভলো রাঁধতে জানে। ওকে নিয়ে আসব।

এলবি টেবিলের উপর খাতা রেখে বলল, কি কি সংগ্রহ করতে হবে বল।

কিছুই দরকার হবে না। কারণ মশলাপাতি তুমি এখানে কোথাও খুঁজে পাবে না। সরষের তেলও বোধ হয় নেই। দেবনাথকেই বলব সব সংগ্রহ করতে, পরো তো কিছু ডিম, মাংস এবং ভেজিটেবল সংগ্রহ করে রেখ—তাতেই চলবে।

এলবি দীর্ঘ দিন পর আজ সকলকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাল। বিজন দেখল আগুনের মতো রঙ এলবির, সাদা স্কার্ট এবং হলুদ জ্যাকেট থেকে সে-রঙ যেন চুঁইয়ে পড়ছে। বাইরে শীতের ঠান্ডায় যেন তুষার ঝরছে। ওরা তিনজন আগুনের পাশে বসে উত্তাপ নিচ্ছে। মাঝে মাঝে মিসেস চার্লটন উনুনে কাঠ গুঁজে দিচ্ছেন। মিঃ চার্লটন চীনদেশের গল্প করছেন এখন। সে-দেশের রীতিনীতির গল্প করছেন। এলবি এখন আর পিয়ানো বাজাচ্ছে না। চেয়ারে বসে সেও বিদেশের গল্প শুনছে। সহসা এই সব কথার ভিতর বিজন যেন দেখল ওরা সকলে একই পরিবারভুক্ত লোক হয়ে শীতের রাতে উনুনের পাশে আগুন পোহাচ্ছে। মনে হল বাংলাদেশেরই কোন পরিবারের ভিতর বসে বসে যেন ঠাকুমার গল্প শুনছে।

দেবনাথ এবং বিজন সকাল-সকাল জাহাজ থেকে নেমে গেল। ছুটির দিন। এই শীতের ভিতরও শহরের সব যুবক-যুবতী ছুটি ভোগ করতে দলে দলে বের হয়ে পড়েছে। ওরা সব রেস্তোরাঁয়, পাব-এ অথবা পার্কে কিংবা শহরতলীতে ছড়িয়ে পড়ছে। দেবনাথ এবং বিজন হেঁটে যেতে যেতে সব টের পাচ্ছে। ওদের হাতে ছোট ছোট নীল ব্যাগ—ট্যাগোর ডিশের জন্য যাবতীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা ওতে। ওরা গল্প করতে করতে অথবা অযথা উচ্ছল হতে হতে হাঁটছে।

ওরা বন্দর ফেলে, জনসন রোড ধরে ছোট্ট পাহাড়টায় উঠে গেল। এখানে ছোট ছোট কাঠের ঘর-নীল অথবা হলুদ রঙের। দরজায় নীল রঙের পালিশ। বাড়ির সংলগ্ন ছোট ফুলের বাগান, সবজির বাগান। প্রচণ্ড শীতের জন্য বাগানে কোন ফুল অথবা সবজির চিহ্ন নেই। গোলাপেরা শুধু কুঁড়ি মেলার চেষ্টা করছে। ওরা দ-এর মতো পথে, কখনও সিঁড়ি ভেঙে, কখনও ঘুরে ঘুরে এলবির ছোট নীল আস্তানায় গিয়ে হাজির হল। প্রথমেই ছোট কাঠের দরজা। সংকীর্ণ ফুটপাতের বাঁপাশের থামটায় লেখা 'শান্তির নীড়' অমার প্লেটে খুব চকচক করছে। সদর দরজার উপর আইভিলতার গুচ্ছ। পাতা নেই—শুধু লতাগুলো দুলছে। ভিতরে বাঁপাশে মুরগীর ঘর। ডানপাশে ফুলের বাগান। 'এল' অক্ষরে পথ। পথের দু'পাশে নানা রকমের সামুদ্রিক পাথর। অন্য পাশে কোমর-সামন কাঠের রেলিঙে কিছু নীল প্রজাপতি বসে আছে ; মিঃ চার্লটন এবং মিসেস চার্লটন বের হয়ে এসে ওদের অভিবাদন জানালেন। বললেন, গতকালই আমরা এসে গেছি।

এলবিও সেজেগুজে বের হল। যেন ফুলের মতো এই শীতের হালকা রোদে ফুটে উঠল। এলবি ওদের ভিতরে নিয়ে গেল। বিজন দেবনাথের সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিল। এলবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেবনাথকে সমস্ত বাড়িটা দেখাল। এই ওর বাড়ি—এখানে সে থাকে, এই ওর ঘর—এখানে সে রাঁধে, এই ওর ঈজেল—এখানে সে ছবি আঁকে। দেবনাথ সব ঘুরে ঘুরে দেখল। এলবির একটি বিশেষ রুচি আছে এ-বোধ ওর এখন জন্মচ্ছে। ঘরে সব বড় বড় ক্যানভাস। নানা রঙের ছবি।

ওরা এসে পাশের ঘরটায় বসল। মিঃ চার্লটন কতকগুলো ছোট ছোট কাঠি এনে পাশে রাখলেন। মসৃণ করার জন্য কিছু শিরিষ কাগজ। তিনি সকলকে কাঠি-গুলো দেখালেন—এগুলো রাইস-স্টিক। তারপর দু-আঙুলের ফাঁকে কাঠি চেপে ধরার কায়দা-কানুন শেখাতে থাকলেন দেবনাথ এবং বিজনকে। দেখালেন, কি করে স্টিক ধরতে হয়, কি করে মুখে ভাত তুলতে হয়। একটা খালি চিনেমাটির বাসনও রাখলেন সামনে। ছোটখাটো একটা ডেমনস্ট্রেশন দিলেন।

দেবনাথ এই সব দেখে বিরক্ত হচ্ছিল। সে ঘড়ি দেখল। এখন দশটা বাজে। এখনও এলবি টেবিল সাজাচ্ছে। কখন রান্না হবে এবং কখন খাওয়া হবে এই ভেবে সে উষ্মা প্রকাশ করল।

একটি ঘরকেই এলবি কাঠের পার্টিশন দিয়ে দু'ভাগ করে নিয়েছে। এ-ঘর থেকে সে-ঘরে যাওয়ার একটি মাত্র খোলা পথ। একটি মাত্র দরজা। দরজায় পাল্লা নেই। দরজায় চাইনীজ সিল্কের দামী পর্দা। পর্দা সরালেই ঘরটা স্পষ্ট। পর্দা সরালেই ধবধবে বিছানা স্পষ্ট। দেবনাথ পর্দা সরিয়ে সব দেখল। বারান্দার দক্ষিণদিকে চিলতে রান্নার জায়গা। পরে বাথরুম, পাশে ছোট একটি লনের মতো জায়গা। সেখানে গরমের দিনে ইজিচেয়ার নিয়ে বসা যায়। সেখানে একটি ভাঙা ঈজেল এখনও রেলিঙের সংলগ্ন হয়ে পড়ে আছে। ছুটির দিনে এলবি সেখানে ছবি আঁকে।

ওরা উঁচু জায়গায় বসে বন্দর দেখল। বন্দরের জাহাজ দেখল। এখানে বসে অসীম সমুদ্রের বিস্তৃতি চোখে পড়ছে। পাহাড়ের নিচে সারি সারি ছবির মতো ঘর, ছবির মতো মানুষেরা হাঁটছে। দেবনাথ চারপাশটা চোখ মেলে দেখল।

দেবনাথ ফের ঘড়ি দেখে বাংলাতে বিজনকে বলল, ওরা কি আমাদের নিমন্ত্রণ করে খালি-পেটে রাখার ব্যবস্থা করছে নাকি! এখন বাজে সাড়ে দশটা—অথচ রান্নার

কোন আয়োজনই করছে না।

বিজন বলল এলবিকে, সব যোগাড় আছে তো? অর্থাৎ এই কথা বলে বিজন রান্নার প্রসঙ্গে আসতে চাইল।

এলবি ফুলদানিতে কিছু সংগ্রহ-করা ফুল ভরে দিল। তারপর বিবাহিত রমণী-সুলভ চোখে বিজনকে দেখল এবং বলল, সবই এনেছি। তোমাকে ভাবতে হবে না। রান্নাঘরে ঠিক আমরা এগারোটায় ঢুকব। এবং আশা করছি ঠিক বারোটায় রান্না শেষ করতে পারব। ট্যাগোর-ডিশের কি কি মেনু হবে?—এলবি দেবনাথকে প্রশ্ন করল।

দেবনাথ বলল, মেনু বেশি করতে হলে অনেক সময়ের দরকার হবে। বস্তুত দেবনাথ ডিমের ঝোল অথবা মাংসের ঝোলই ভালো রান্না করতে পারে। মাংসের ঝোল করতে বেশি দেরী হবে বলে সে বলল, রাইস এবং এগ-কারী।

এলবি বলল, রাইস তো চাইনীজ ডিশেও থাকবে। সুতরাং একমাত্র এগকারী।

এক সময় দেবনাথ এবং মিঃ চার্লটন রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। দেবনাথ সঙ্গে করে গুঁড়ো মশলা এনেছে। এলবি দেবনাথকে সিদ্ধ ডিমের কৌটা খুলে বড় বড় কিছু ডিম বের করে দিল। মিসেস চার্লটন এবং বিজন ওঁদের সকলকে কাজে সাহায্য করলেন। গ্যাসের উনুনে আতপ চালের ভাত হল। এই ভাত রান্নার কৌশলটুকু আয়ত্ত করে মিঃ চার্লটন এখন গৌরব বোধ করছেন। তিনি ভাত রান্নার সময় গল্প করছিলেন—কোথায়, কখন এবং কি কৌশলে তিনি এই দুর্লভ বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন। অন্তত হাজারবার সেই নির্দিষ্ট চাইনীজ মহিলাটিকে তিনি ধন্যবাদ জানালেন। জানালেন ভদ্রমহিলা খুব হৃদয় দিয়ে তাঁকে এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে সাহায্য করেছেন।

এলবি কৌটা থেকে কিছু কর্ণ-বীফ বের করে দিল। মিসেস চার্লটন ময়দার ডেলা গোল করে সেই কর্ণ-বীফ ভিতরে ভরে দিচ্ছেন। সেগুলো জলে সিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। এ-সময় ভয়ানক উৎকট গন্ধে বিজন ঘরে থাকতে না পেরে বাগানে চলে এলো এবং অনেকক্ষণ ধরে একা একা পায়চারী করল।

এক ঘণ্টার ভিতরেই প্রায় সব হয়ে গেল। রাতে ছোট একটা ভেড়ার বাচ্চা রোস্ট করে রাখা হয়েছিল। এখন শুধু ওটাকে ফের চর্বি মাখিয়ে গরম করে নেওয়া হল। গ্রীন পীজ সিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। কিছু স্যালাড, স্যাণ্ডউইচ। ইতিমধ্যে মিঃ ট্রয় এসে গেছেন, টনি এসে গেছে, এলবির পিসিও এসে পড়লেন। এবং অন্যান্য আরও দু-একজন অপরিচিত ব্যক্তি, যাঁরা সকলেই মিঃ চার্লটন অথবা মিসেস চার্ল-টনের বন্ধু পর্যায়ের। ওঁরা ঘরে ঢুকে সকলকে অভিবাদন জানালেন এবং পরিচিত হলেন।

খাবার টেবিলে ওঁরা সকলে সকলকে সাহায্য করলেন। খেতে বসার আগে এলবি বলল, আমরা ভগবানের পৃথিবীতে নিত্য দুটো আহার্য গ্রহণের সময় সকলে প্রার্থনা করব—বেচারী সেলিম আরোগ্য লাভ করুক। সকলে দাঁড়ালেন এবং মিনিট দুই কাল সেলিমের নিরাময়ের জন্য অধোবদনে থাকলেন। তাঁরা সকলে প্রার্থনা করছেন। এলবিকে যথার্থই এখন কোন বাঙালী আটপৌরে গৃহিণীর মতো মনে হচ্ছে।

খেতে বসেই খুব উৎসাহের সঙ্গে চার্লটন ভোজ্যদ্রব্যের ফিরিস্তি দিলেন প্রথম। কিছু রাইস-স্টিক পরস্পর পরস্পরকে দিলেন। প্রথমেই চীনেমাটির বাসনে কিছু

ভাত এবং আধসিদ্ধ মাংসপুর, একটু গোলমরিচের গুঁড়ো চার্লটন সকলকে পরিবেশন করলেন। এবং কাঠির সাহায্যে সকলকে খেতে অনুরোধ জানালেন। এই সব আধ-সিদ্ধ মাংসপুর, ভাত কাঠির সাহায্যে মুখে তুলতে গিয়ে বিজন ওয়াক্ তুলতে তুলতে বলে ফেলল, যথার্থই চমৎকার আপনার এই চাইনীজ ভোজ্যদ্রব্য। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ চার্লটন মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন, বলেছি না, ওরা তারিফ করবে। চীন ভারতবর্ষ পাশাপাশি দেশ। সংস্কৃতিতে সভ্যতায় ওরা প্রায় এক।

দেবনাথ ছোট ছোট চোখে মিঃ চার্লটনকে দেখল। ইচ্ছে হল ডিশের সবগুলো ভোজ্যদ্রব্য চার্লটনের মুখে ছুঁড়ে দেয়। অথচ সেও বলল, ভেরী নাইস।

দেবনাথ এবার ট্যাগোর-ডিশের এগ-কারী সকলকে পরিবেশন করল। সে জানতো লঙ্কার গুঁড়েটা একটু বেশীই পড়েছে। সে জানতো ঝাল খেয়ে ওঁদের জিভ টাটাবে। সে বিদ্রূপ করে বলল, ট্যাগোর ঝাল একটু বেশি খেতেন।

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাল চার্লটনের মাথায় উঠে গেল। চার্লটনের মাথায় টাক—তিনি তালুতে ঠাণ্ডা হাত রাখলেন। ঝাল খেয়ে অন্য সকলের ঠোঁট কুঞ্চিত হচ্ছে প্রসারিত হচ্ছে। সকলে মাথায় ঠাণ্ডা হাত রাখলেন। সকলে জল খেলেন প্রচুর। এবং গাদা গাদা চিনি খেলেন। চোখ সকলের ভারী হয়ে উঠেছে, লাল হয়ে উঠেছে। ওঁরা তবু কোন রকমে উচ্চারণ করলেন, গ্র্যাণ্ড! ট্যাগোর-ডিশ গ্র্যাণ্ড!

দেবনাথ এবং বিজন ভাতের সঙ্গে ডিমের ঝোল বেশ তৃপ্তি করেই খেল। ওরাও বলল, ট্যাগোর-ডিশ গ্র্যাণ্ড। তারপর ওরা কাঠি দিয়ে ভাত খাওয়ার চেষ্টা করল। কিছু খেল, কিছু নষ্ট হল। তারপর স্যাণ্ডউইচ, গ্রীন পীজ এবং ল্যাম্ব-রোস্ট খেয়ে ওরা খুশি হতে পারছে। ওদের এখন সেই ত্রাহি-ত্রাহি ভাবটুকু নেই। শেষে কফি খেয়ে ওরা সকলে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল। সকলের মুখ দেখে মনে হবে এখন এইমাত্র টেবিলে বড় রকমের একটা ঝড় বয়ে গেছে।

বিকেলে স্টেশন-ওয়াগনে মিঃ এবং মিসেস চার্লটন জীলণ্ডের উদ্দেশে রওনা হলেন। মিঃ ট্রেয় ও অন্যান্য দু-একজন আগেই চলে গেছেন। এলবির পিসি গেলেন এইমাত্র। যাওয়ার আগে দেবনাথ এবং বিজনকে ওঁর ঘরে একদিন নিমন্ত্রণ করে গেলেন।

এরপর এলবি বিজন এবং দেবনাথকে নিয়ে হাসপাতালে গেল। হাসপাতাল থেকে বের হয়ে ওরা তিনজন যখন গাড়িতে উঠতে যাবে তখন দেবনাথ বলল, এবার আমি যাই। জাহাজে আমার একটু দরকার আছে।

গাড়ির ভিতর এলবিকে আজ একটু উচ্ছল বলে মনে হল। এলবি বলল, দেখবে, সেলিম ভালো হয়ে উঠবে। ওকে আজকে খুব ভালো দেখাচ্ছিল। সে নিজে এখন উঠতে নামতে পারছে। এখন অপারেশন হলে বাঁচি।

বিজন বলল, আমিও আশা করছি। আমরা একসঙ্গে দেশে ফিরতে পারব। একসঙ্গে ফিরতে পারলে খুবই আনন্দের ব্যাপার ঘটবে।

এলবি কথা বলল না। এলবি সন্তর্পণে ওর মুখ দেখল। বিজনের মুখে যেন এখন আর কোন যন্ত্রণার ছবি নেই। যেন সে এমত ঘটনায় যথার্থই আনন্দিত হবে। এলবি স্টীয়ারিং-এ বসে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

ওরা আবার জাফরী-কাটা আলো এবং পাতার ছায়ায় এসে বসল। বিকেল থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে না। ওরা আজ পাশাপাশি বসল না। ওরা মুখো-মুখি বসল। এলবি আজ ইচ্ছা করেই পর পর চার-পাঁচটি কবিতা শোনালো

বিজনকে। আর বিজনকে বাংলো কবিতা আবৃত্তি করার জন্য কোন অনুরোধ করল না, এমন কি বিজন কতটা আগ্রহ নিয়ে শুনছে, তাও লক্ষ্য করল না। এবং এই কবিতা-আবৃত্তির সময়েই এলবির একটু মদ খেতে ইচ্ছে হল। বলল, তুমি একটু মদ খাবে, বিজন?

সে রাতে উভয়ে মদ খেয়েছিল। অথচ পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয় নি। পরস্পর গোলাপী নেশায় উন্মত্ত হয় নি। তবু কেন জানি বিজন ঘাস থেকে উঠতে পারছিল না। সে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ওর দস্তানা খুলে যাচ্ছে। পেটের ভিতর এক দুরন্ত যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে উঠছে। সে বলল, এলবি, আমি আর পারছি না।

এলবি সমস্ত শক্তি দিয়ে বিজনকে তুলে ধরল এবং ধীরে ধীরে মোটরের ভিতর এনে শুইয়ে দিল। তারপর বাড়ি ফিরে বিজনকে নিজের খাটে শুইয়ে দিল এবং ফোন তুলে ডায়াল করল ; বলল, ক্যারল আছেন? ডঃ ক্যারল। প্লীজ ফাইভ বাই এইট নাটংহিল। পেশেণ্ট সিরিয়াস।

ডাক্তার বিজনকে দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, কন্‌স্টিপেশনের জন্য এমন হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। দু'দিনেই ভালো হয়ে উঠবে। দু'রকমের পিল থাকল। এখন একটা খাইয়ে দিলেই ব্যথাটা কমে আসবে। পেটে একটু গরম জলের সেঁক দিতে পারেন।

ডাক্তারবাবু চলে গেছেন। এলবি বিজনকে বলে দু'মিনিটের জন্য বাইরে গেছে। বিজন যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে দেয়ালের সব ছবি দেখল। বড় বড় সব ক্যানভাসে নানা রঙের ছবি। কবির ছবি দেয়ালে। হলুদ রঙের দেয়াল। এলবির হাতে আঁকা কবির এই ছবি যেন বিজনকে বিদ্রূপ করছে। যেন বলছে—বাপুরা, যাহোক তোমরা আমাকে নিয়ে তামাসা করলে! বিজন এই যন্ত্রণার ভিতরও প্রথম দিনের কথা ভেবে অনুতপ্ত। বস্তুত সে দুঃসহ যন্ত্রণায় অধীর হয়ে ওর প্রথম দিনের ইচ্ছাকৃত তামাসার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিল।

এলবি ঘরে ফিরেই বিজনের কপালে হাত রেখে উত্তাপ দেখল। তারপর জল এনে পিল খাইয়ে দিয়ে হট-ওয়াটার ব্যাগে পেটে সেঁক দিতে থাকল। অধীর আগ্রহে সারারাত জেগে ওর পাশে বসে থাকল। ভোর রাতের দিকে দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে বিজন যেন মুক্তি পেল। বিজন পাশ ফিরে এলবির সেই আন্তরিক এবং প্রীতিপূর্ণ চোখের দিকে চেয়ে বলল, এলবি, তোমাকে খুব কষ্ট দিলাম।

এলবি ওর কপালে হাত রাখল শুধু। কোন কথা বলল না। বিজন ওর চোখ দেখেই বুঝল, বুঝতে পারছে এ-মুহূর্তে ওকে নিরাময় করে তোলার কী আকুল ইচ্ছা এলবির চোখে।

ভোরের দিকে বিজন ঘুমিয়ে পড়েছে। সুতরাং ঘুম ভাঙতে ওর দেরী হল। জানালার রোদ ওর বিছানায় এসে নেমেছে। এলবি বাইরের ঘরে আছে। কাকে যেন ফোন করল এইমাত্র। বিজন বিছানায় শুয়ে সব ধরতে পারছে—এলবি জাহাজে ফোন করে কাপ্তানের সঙ্গে কথা বলছে, ওর অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর দিচ্ছে এবং সঙ্গে চার পাঁচদিনের ছুটি মঞ্জুর করার জন্য আবেদন পেশ করছে।

এলবি এ-ঘরে এসে দাঁড়ালে বিজন ভাবল, কি দরকার আর থেকে। শরীর আমার ভালো হয়ে গেছে। বেশ সুস্থ বোধ করছি। বরং আজ জাহাজে চলি। কিন্তু এলবির মুখের দিকে চেয়ে বলতে পারল না কথাগুলো। চোখে ওর সারারাত

অনিদ্রার অবসাদ। শরীরে ক্লান্তি। এলবি ওর কপালে হাত রেখে বলল, খুব ভ
ধরিয়ে দিয়েছিলে যাহোক।

তাই নাকি!

তা নয়তো কি! একটু মদ খেলে তো, অমনি ঘাসে লুটিয়ে পড়লে!

তুমি তো জানো এলবি, ওটা মদের জন্য হয় নি। ওটা জাহাজে কাজ কর
পর থেকেই হচ্ছে। মাঝে মাঝেই হত, কিন্তু এমন কঠিন হত না।

একটু থেমে বিজন বলল, বরং এখন জাহাজে চলি।

তুমি কি পাগল, বিজন! ক্যারল তোমাকে পুরো পাঁচদিন বিশ্রাম নি
বলেছেন। কাপ্তানকে এইমাত্র খবর দিলাম। তিনি খুব ভালো ম্যানুষের মে
বললেন, সেজন্য কি আছে। নিশ্চয়ই ও চার-পাঁচদিন ছুটি পাবে।

তুমি তো ছুটি নিলে। কিন্তু এখানে থাকার অর্থই হচ্ছে তোমাকে অসুবিধ
ফেলা।

আমার কোন অসুবিধা হবে না। পাশের ঘরে আমি থাকব। যখন যা দরকা
আমাকে বলবে।

বিজন পুরো পাঁচ রাতই ওর ঘরে থাকল।

পাঁচ রাতে ওরা পাশাপাশি ভিন্ন ঘরে শুয়ে জানালায় রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে
দেখতে অথবা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত। অথবা ঘুমিয়ে পড়া
ভান করত। এলবি বালিশের নীচে দুটো হাত সন্তর্পণে ঢুকিয়ে কি যেন বার বা
খুঁজত। কি যেন বালিশের নীচে ওর হারিয়ে গেছে। কখনও এলবি রাতে
প্রজাপতিদের বিছানার চারপাশে দেখত। ওর প্রতীক্ষার জগতে সেই সব প্রজাপতি
উড়ে উড়ে একদা অবসন্ন হত এবং সকালের দিকে ওরা ঘুমিয়ে পড়ত। কোন কো
রাতে এলবি এই শীতেও জানালা খুলে রাতের প্রজাপতিদের শরীর থেকে উড়ি
দেবার চেষ্টা করেছে। এই ঘন রাতে এবং শীতের রাতেও ওর শরীর মধুর এ
উত্তেজনায় অধীর হয়েছে। বাঙালী এক নাবিকের শরীরে কবির যুবা শরীর
বৃত্তিকে স্পর্শ করার ইচ্ছায় সে সহসা কাতর হত। আর বিজন নিজেকে রবীন্
নাথের অনুগামী ভেবে সহজ ইচ্ছার বৃত্তিতে কঠিন তাড়নায়ও ডুব দিতে পারল না
পর্দার আড়ালটুকু ওদের দুজনকে সেজন্য পরস্পর মহৎ করে রাখল।

জাহাজে ফিরে এসে বিজন প্রথম রাতে অনিদ্রায়, দ্বিতীয় রাতে অসহিষ্ণুতায় ভুগে
সারাদিন কাজ করার অজুহাতে ডেক-এ পড়ে থাকল। দু'দিন এলবি ইউনিয়নে
কাজে শহর ছেড়ে অন্যত্র থাকছে মিঃ ট্রয়ের সঙ্গে। দু'দিন দেখা-সাক্ষাতের কো
সুযোগ নেই। বিকেল কাটছে হাসপাতালে। পরবর্তী সময়টুকু আর কিছুতে
কাটতে চাইছে না। খুব নিঃসঙ্গ ভাব জাহাজে। কেউ থাকছে না। বন্দরে নে
সকলে গলির আঁধারে হারিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এই সব দেখে সে আর পার
না, সহজ ভাবটুকু রক্ষা করতে পারছে না।

বস্তুত বিজন এক অহেতুক ঈর্ষায় পীড়িত হচ্ছে। মিঃ ট্রয়কে কেন্দ্র করে এ
ঈর্ষার জন্ম। বিজন প্রতি মুহূর্তে নিঃসঙ্গ জাহাজী যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল
এলবির অনুপস্থিতি যন্ত্রণার গ্রাসকে কঠোর করে তুলল। নিদারুণ জাহাজী যন্ত্রণা
সে দেবনাথের সঙ্গে গোপনে সস্তায় একটু মদ এবং সস্তার একটু যৌনসংযোগ
রক্ষার্থে সেজন্য বদ্ধপরিকর হল। কিন্তু মুখের ভাবটুকু সকল সময়ের জন্য সর
নিঃস্বার্থ এবং যৌন জীবনে নিষ্পাপ, যেন এই মহৎ পৃথিবীতে অশ্লীল হবার মতে

কিছুই নেই। বিজন দেবনাথের সঙ্গে হেঁটে যেতে যেতে বলল, আর কত দূরে তোমার রাতের আস্তানা?

অথচ বিজন রাতের আস্তানায় দর করতে গিয়ে দেখল যুবতী সব সময়ের জন্য চোখ দুটো কোটরগত করে রেখেছে। প্রতিদিনের যৌন অত্যাচারে গালে অশ্লীল টোল। নগ্ন চেহারাতে যাদুকরের লাঠির মতো ভেল্কি। এবং সমস্ত শরীরে কিসের যেন দাগ—যেন অত্যাচারের অশ্লীল উল্কি পরে নিত্য জাহাজী যন্ত্রণার সাক্ষী থেকেছে। পাশাপাশি দুটো চোখ—এলবির চোখ, এলবির প্রীতিপূর্ণ চোখ...সে পারল না। সে নগ্ন হয়ে নাচতে পারল না রাতের আস্তানায়। মদের গোলাপী নেশা ছুটে গেলে সে যথাসম্ভব সত্বর ছুটে পালাল।

সে জাহাজে ফিরে দেখল ডেক খালি। কোন জাহাজীর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ডেকের উপর ইতস্তত কিছু আলো জ্বলছে। একটা বেড়াল এ-শীতেও অফিসার-গ্যালীতে খাবার খুঁজছে। বিড়লটা শীতে কষ্ট পাচ্ছে এবং ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদছে। সে আরও এগিয়ে গেল। সে শুনল ডেক-ভাণ্ডারী মদ খেয়ে নীচে হল্লা করছে। নীচে নেমে দেখল সকল জাহাজীদের দরজা বন্ধ। যে দু-একজন জাহাজী এখনও ফেরে নি তারা আর এ-রাতে ফিরবে না। সে ধীরে ধীরে নিজের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেবনাথ আগে ফিরে এসেছে। ফোকসালের ভিতরে লকারের শব্দ। বুঝি দেবনাথ লকার খুলছে। বুঝি দেবনাথ বাংকে বসে খাচ্ছে। বিজন দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে বলল, আমি পারি নি, দেবনাথ—আমি পারি নি। মেয়েটির শরীর দেখে আমার করুণা হল।

এই করুণার কথা ভেবে যখন সে ক্ষতবিক্ষত তখন দেবনাথ খেতে খেতে বলছে—এলবি এসে এই বাংকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে গেছে তোমার জন্য।

তুমি কি বললে।

বললুম, রাতের আস্তানায় গেছে।

দেবনাথ! সে চিৎকার করে উঠল। ইচ্ছা হল দেবনাথের গলা টিপে ধরতে। বিজন লক্ষ্য করল, দেবনাথ দুজনের ভাত একাই গিলছে। ওর নেশা এখনও প্রকট। সেজন্য দেবনাথের হাত কাঁপছে। এবং গোল গোল চোখে সে বিজনকে দেখছে।

বললাম তুমি এলবিকে ঠকিয়েছ। তুমি রবীন্দ্রনাথের নামে 'পাখীসব করে রব' শুনিয়েছ। বললাম তুমি পূর্ববঙ্গের ছেলে, বললাম দেশ-বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসেছ। কেন এক কলোনীতে পিসিমার ঘরে থাক। তোমার বাড়ি বটতলায় নয়। সুতরাং বটতলা থেকে নিমতলা কাছেও নয়। আর কিছু বলল না দেবনাথ। ফের ভাত খাচ্ছে। অথবা বললে যেন এ রকম শোনাত—বিজন, আমি ঈর্ষার তাড়নায় ভুগছি। তুমি এমন প্রীতিপূর্ণ চোখের স্নেহচ্ছায়ায় বন্দরের দিনগুলো কাটাবে, তুমি বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মতো বাঁচতে চাইবে, সে আমার সহ্য নয়। সে বলল, কবির প্রতীকী হয়ে তুমি এলবির কাছে বেঁচে আছে, আর আমি কোটরাগত চোখে জাহাজী হয়ে বেঁচে আছি, আমি ঈর্ষার তাড়নায় ভুগছি—আমি পারি নি, আমি পারি নি। ঈর্ষার তাড়নায় আমি একটু বেফাঁস হয়েছি।

বিজন বাংকে শুয়ে পড়ল। কোট-প্যান্ট পরেই শুয়ে পড়ল। এ-মুহূর্তে সে আর কিছু ভাবতে পারছে না। সে এলবির কাছে ধরা পড়ে গিয়ে বাংকে শুয়ে আজ যথার্থ জাহাজী কায়দায় রাত যাপন করল।

সকালে জাহাজের কিছু কাজ—দেয়ালে রঙ করা, দেয়াল সাবান-জলে পরিষ্কার

করা—সে সব কাজগুলো আজ নিখুঁতভাবে করল। সে ইচ্ছা করেই এলবিকে ভাবল না। সে ইচ্ছা করেই কাঁচা খিস্তি করল আজ। ভোরবেলায় দেবনাথ ওর পাশে সুস্থ হয়ে দাঁড়ালে, বলল, আমাকে ছোট করে কি লাভ হল, দেবনাথ?

দেবনাথ ওর দুটো হাত ধরে বলল, বিজন, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। গত রাতে আমার বড় ভুল হয়েছে। গত রাতে টাকার অভাবে আমার রাতের ইচ্ছাটুকু পূরণ হয় নি। বাধ্য হয়ে সস্তায় গলা পর্যন্ত মদ গিলে নেশা করেছি। মাতাল হয়ে জাহাজে ফিরেছি। ফিরে তোমার বাংকে এলবিকে দেখেই ধৈর্য ধরতে পারি নি। আমি ওকে টেনে তুলেছিলুম। এলবি বিরক্ত হয়ে তাকাতেই তোমাকে দুশমন বলে ভেবেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, বিজন। বলে দেবনাথ যথার্থই ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে ওর পাশে দাঁড়াল।

বিকেলে বিজন হাসপাতালে গেল। সেলিমের অস্ত্রোপচার হয়ে গেছে। সেলিম ভালো হয়ে উঠছে। সেলিম ফের জাহাজী হয়ে একই সঙ্গে হয়তো ঘরে ফিরতে পারবে। এই সব ভাবনায় দেবনাথ এবং বিজন পথ চলছিল। দেবনাথ বলল, এলবির কাছে তোর একবার যাওয়া উচিত।

কোন্ মুখে যাব, বল।

আমার বড় ভুল হয়ে গেল, বিজন।

ওরা পরস্পর তাকাল। ওরা পরস্পর হাত ধরে হাসপাতালে উঠে গেল।

সিঁড়ি ধরে উঠবার সময় ভাবল, এলবি যদি আসে, এই হাসপাতালে এলবি যদি ওর জন্য অপেক্ষা করে, যদি বলে—বিজন, তুমি কি যথার্থই রবীন্দ্রনাথের নামে 'পাখীসব করে রব' শুনিয়েছ, তুমি কি যথার্থই কবিকে তামাসা করেছ—তখন, তখন সে কী উত্তর দেবে! এই সব ভেবে বিজন, হাসপাতালে ভয়ে ভয়ে, সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকল। এবং যখন দেখল সেলিমের বিছানার পাশে কেউ বসে নেই তখন সে এক অহেতুক আনন্দে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেল।

সেলিমের শরীরে এখনও রক্ত দেওয়া হচ্ছে। সেলিম এমত দুর্বল যে, কথা বলতে পারছে না। ওরা ওর পাশে বসল এবং বেঁচে থাকার জন্য উৎসাহিত করল।

বন্দরে বিজন এলবিকে এড়িয়ে বাচতে চাইল। সামনে পড়লেই ধরা পড়বে অথবা কলিন স্ট্রীট ধরে হাঁটলেই সাক্ষাতের সম্ভাবনা। সে সেজন্য জাহাজ থেকে কম নামল, বন্দর ধরে শহরে উঠল না এবং বড় বড় পথ ধরে পায়চারী করল না। সে শুধু বিকেলে হাসপাতালে গেল। এবং একদিন সেলিম বলল, সেলিম তখন ভালো হয়ে উঠছে, সেলিম তখন কথা বলতে পারছে—বলল, এলবি রোজ ভোরে আসেন।

জাহাজে সারাদিন কাজের পর যখন ক্লান্ত হয়ে বিজন রেলিঙে এসে ভর করে দাঁড়াত তখন ওর মনে পড়ত নটিংহিলের সেই ছোট্ট কাঠের ঘর, সেই ছোট অক্ষরে লেখা 'শান্তির নীড়', সেই ইজিচেয়ারটা এবং পাশের ভাঙা ঈজেলটার কথা। মনে পড়ত ওর কবিতা-আবৃত্তির কথা। এলবি 'গীতাঞ্জলি'র সব কবিতা যেন ওকে বার বার শুনিয়েছে। সে যেন এখন এই রেলিঙে দাঁড়িয়ে সব কবিতাই স্পষ্ট মনে করতে পারছে। ওর একান্ত ইচ্ছা—এলবি যদি আসত, যদি সে ওর সামনে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করত, যদি বলত, তুমি কবিতার মতো না বেঁচে, জাহাজীর মতো বাঁচলে!

অথচ সে এলো না। একদিন গেল, দু'দিন গেল, দু'সপ্তাহ গেল, অথচ সে এলো না। পাইন গাছগুলো তখন পাতা মেলতে শুরু করেছে। পাখিরা সব আবার ফিরে এসেছে, গাছে গাছে তারা কোলাহল করছে। বসন্তের আগমনে এই ধরণী যেন উচ্ছল যুবার মতো অথবা গর্ভবতী তরুণীর মতো বয়সী হতে চাইছে। অথচ এলবির আর দেখা নেই।

বন্দরে যত দিন যেতে থাকল তত বিজন এলবির কাছে নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করল। তত সে ভেঙে পড়ল। তত সে নিঃসঙ্গবোধে পীড়িত হতে থাকল। জাহাজ ছেড়ে দেবে ক'দিন পর। সেলিম ভালো হয়ে উঠছে। যে সেতুবন্ধটি গড়ে উঠেছিল সেলিমকে কেন্দ্র করে, সেলিম জাহাজে ফিরে এলে সেটুকুও শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু কোন এক ভোরে জাহাজে খবর এলো—কাপ্তান হাসপাতালের সঙ্গে সংযোগ-রক্ষা করছেন—ডেক-এ ফের উদ্বেগ উত্তেজনা, সারেঙ ব্রিজের নীচে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যান্য জাহাজীরাও ব্রিজের নীচে অপেক্ষা করছে—ওদের চোখে পরস্পরের প্রতি সংশয়ের দৃষ্টি, তখন কাপ্তান বলছেন ব্রিজ থেকে—সেলিম ইজ ডেড্—সেলিম মৃত।

বিকালে সব জাহাজীরা জাহাজ থেকে নেমে গেল। ঘন কুয়াশায় শীতের রঙ ফ্যাকাশে। শীতের শেষে ওরা কোন তুষারঝড়ের মতো ভোরের রোদে ডুবে গেল, গলে গেল। ওরা হাসপাতালের দরজায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মৃত নাবিকের শরীর নিয়ে যাত্রার ইচ্ছায় উন্মুখ হয়ে থাকল। ওদের অবয়বের ইচ্ছা যেন এই—আমরা এই সন্ধ্যার সকলে কবরভূমিতে নেমে যাচ্ছি। আমরা নেমে যাচ্ছি, আমরা নেমে যাব। আমরা মরে যাচ্ছি। আমরা মরে যাব।

শহরবাসীরা নাবিকের শবযাত্রার পথে ভীড় করল। একদল বিদেশী লোক জাহাজী পোশাকে কোন নাবিকের মৃতদেহ নিয়ে সৈনিকের মতো পা ফেলে হাঁটছে। জানালায় যুবতী আর্শির আলোতে সেই শবযাত্রীদের দেখে মুখ ঘোরাল। কিছু স্বজাতীয় দেখল সেই শবানুগমন—এলবি কফিনের বাঁপাশে পথ দেখিয়ে চলছে। মিঃ ট্রয় এবং কিছু জাহাজী শ্রমিক কফিনের আগে আগে চলছে। ভারতীয় নাবিকেরা পিছনে। বিজন সকলের পিছনে। ওরা নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করছে। ওরা সকলে শহর অতিক্রম করে ক্রমে পাহাড়ের উৎরাইয়ে নেমে গেল। ওরা সকলে আজ কোন কথা বলল না। কত নিঃসঙ্গ, কত নিঃশব্দ এই যাত্রা! ওরা পরস্পর অপরিচিতের মতো ব্যবহার করল যেন, অথবা এই শোকাবহ ঘটনায় ওরা পরস্পর সাময়িক বেদনায় আত্মনিষ্ঠ। এলবি পর্যন্ত কোন কথা বলে বিজনকে কিংবা অন্যান্য জাহাজীদের সমবেদনা জানাল না। এলবি চোখ তুলে বিজনকে দেখল না। অথবা না-দেখার ইচ্ছায় সর্বদা কফিনের আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে। অথবা এলবির প্রত্যয় এমনভাবে ভেঙে গেছে যে, সে বিজনকে ফের উৎসাহ দিয়ে বলতে পারল না, সেলিম দেখবে ভালো হয়ে উঠবে।

কবরভূমির সদর দরজা দিয়ে ওরা ভিতরে ঢুকে গেল। বিজন ছোট-বড় সব বেদী দেখতে পেল। গীর্জার মতো ছোট-বড় কবরের দেয়াল দেখতে পেল। অনেক সুখ-দুঃখের এপিটাফ চোখে পড়ল। সেলিম এখন কফিনে শুয়ে আছে। সেলিমের স্ত্রী এখন হয়তো দরজায় বসে মেয়েটাকে আদর করছে। অথবা মেয়েকে খসমের খবর দিয়ে সুখ পাচ্ছে। সেলিমের কবর এখানেই হল। সে বিবির কোলে মাথা রেখে মরতে

পারল না। এই সব ভেবে বিজনের অশেষ দুঃখ। তবু একবার এলবিকে বলার ইচ্ছা—কিছু বলার ইচ্ছা—শোকাবহ ঘটনার কথা বলে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করার ইচ্ছা—ওর সেই কবিতা-আবৃত্তির ইচ্ছা—পিস্ ওয়াজ অন হিজ ফিয়রহেড।

সেলিমের কবরের উপর প্রথম এলবিই মাটি দিল। সকলের শেষে বিজন মাটি দিতে গিয়ে অসহায় মানুষের মতো কেঁদে উঠল। এই মাটিটুকু দিয়ে সে আজ কত অসহায়, কত নিঃসঙ্গ এমন ভাব প্রকাশ করল। এলবি পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বিজন শেষ মাটিটুকু কবরের উপর চাপড়ে চাপড়ে দিচ্ছে এবং কাঁদছে। সে যেন এই মাটির স্পর্শ ছেড়ে উঠতে পারছে না। উপরে আলো জ্বলছে। শীতের কুয়াশা আলোর ডুমটাকে অস্পষ্ট করে রেখেছে। সকলে একে একে কবর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সকলেই যেন এই মৃত্যুতে দুঃসহ এক যাতনায় পরস্পর কথা বলতে পারছে না। পরস্পর সান্ত্বনা দিতে পারছে না। সকলেই মাথা নীচু করে পাহাড়ের ঢাল ধরে চড়াইয়ে উঠে যাচ্ছে।

এলবি ডাকল, বিজন, ওঠ। সেলিমকে বহু চেষ্টায়ও বাঁচানো গেল না। মৃত্যুরই জয় হল। প্রভুকে ওর কথা বল। ওর আত্মার শান্তি কামনা করি।

এলবি বিজনকে টেনে তুলল। ওরা পরস্পর তাকাল। তারপর হাত ধরে কবরভূমি ফেলে পাহাড়ের চড়াই ভেঙে সমুদ্রের ধারে এসে বসল। এলবিই বিজনকে এই অসীম সমুদ্রের আঁধারে বসতে অনুরোধ করল।

অন্য তীরে সব বড় সমুদ্রগামী জাহাজ। ওরা এপারে নির্জন জায়গায় বসে শোকটুকু ভুলতে চাইল। এলবি বিজনকে এই মৃত্যুশোক ভুলে যেতে অনুরোধ করল। এলবি ভিন্ন ভিন্ন রকমের কথা বলে বিজনের শেষ দুঃখটুকু মুছে দিতে চাইল—মুছে দেবার ইচ্ছায় ওকে শেষ পর্যন্ত নটিংহিলের ছোট কাঠের ঘরে নিয়ে এসে বলল, এ-ঘর তোমার। তুমি এখানে থেকে যাও। যেন আরও বলতে চাইল—তোমার জাহাজী নিঃসঙ্গতাটুকু আমি, আমি—সব দিয়ে ভরে তুলব।

বিজন মনে মনে ভাবল—মূলত আমি নষ্টচরিত্রের মানুষ। ফলত তুমি আমায় এ-ঘরে রেখে শান্তি পাবে না।· বিশেষত কবির প্রতীকী হয়ে দীর্ঘ দিন আমি বাঁচতে পারব না। আমার জাহাজী চরিত্র আমাকে সমুদ্রের মতো অশান্ত করে রেখেছে। বন্দরে বন্দরে চরিত্র নষ্ট করে বেড়াতে না পারলে আমার জাহাজী চরিত্রের শান্তি নেই।

বিজন বলল, আশা করেছিলাম তুমি একদিন অন্তত অভিযোগ করতেও জাহাজে আসবে।

এলবি বলল, ভোরে সেলিমকে দেখে, সারাদিন অফিসে কাজ করে বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত পার্কে তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি।

বস্তুত উভয়ে এক দুর্বিনীত অভিমানে পরস্পরের নিকট ঘনিষ্ঠ হয়ে অভিযোগ করতে পারে নি। এলবি জলপাইগাছের নিচে বসে যত আশাহত হয়েছে তত এক ক্ষুব্ধ আক্রোশে ঘরে ফিরে মাতাল হওয়ার ইচ্ছায় জানালায় প্রজাপতি গুনেছে। যখন একান্ত উত্তেজনায় স্থির থাকতে পারে নি তখন রবীন্দ্রনাথের ছবির নিচে বসে একের পর এক কবিতা উচ্চারণ করে এক অশেষ আনন্দে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অথবা ঈশ্বরের মতো ইচ্ছায় বিজনকে কবিতার মতো সুস্থ করে তোলার প্রবৃত্তিতে এলবি প্রতি দিন ছটফট করত। রবীন্দ্রনাথের নামে 'পাখী সব করে রব' এবং জাহাজীদের রাতের আস্তানা উভয়ই নষ্টচরিত্রের লক্ষণ জেনেও সে ঠিক থাকতে

পারে নি। বিজনকে রমণীয় স্মৃতির অন্তরে বাঁচিয়ে রাখার প্রেরণায় সে গর্ভবতী হতে চাইল।

এলবি বলল, তিনমাস ধরে তোমাকে পেয়ে কোন নাচঘরে যেতে ভুলে গেছি। তুমি এমত আমায় আপনার করে রেখেছ।

এলবি যেন মনে মনে বিজনকে অনুরোধ জানাল, বিজন, তুমি যদি নষ্ট চরিত্রের মানুষ হতে চাও তবে আমায়ও নষ্ট চরিত্রের করে রেখে যাও। আমি আর এমত ভাবে বাঁচতে পারছি না। দেয়ালে কবির ছবি, আমরা নিচে বসে এমত ভাবছি—আমরা পরস্পর প্রীতির সম্পর্কে বাঁচছি—তুমি আমার আরও ঘন হয়ে বসো', আমার এতদিনের যৌন আদর্শকে ভেঙে দাও : তোমার হাতে আমি নষ্ট চরিত্রের হয়ে বাঁচি। তোমার স্পর্শে কবির স্পর্শ এমত ভাব নিয়ে বাঁচি। এলবি ফের বলল, তুমি থেকে যাও, বিজন। বাকিটুকু বলতে পারল না। বাকিটুকু এলবির চোখে ধরা পড়ল—এ পৃথিবীতে বিজন ব্যতীত এলবি নিঃসঙ্গ যন্ত্রণায় দীর্ঘ দিন ভুগবে। এ পৃথিবীতে ভারতবর্ষের এক রূপকথার মতো যুবকের ঘন গভীর প্রীতির সম্পর্ক এলবিকে দীর্ঘ-কাল আচ্ছন্ন করে রাখবে।

বিজন ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকল। সে কোন কথা বলল না। এলবি দাঁড়াল। ওর পাশে এসে দাঁড়াল। ঘন হয়ে দাঁড়াল এবং বিজনের শীর্ণ ঠোঁটে ধীরে ধীরে নুয়ে চুমু খেল। বিজন এই ঘটনায় এতটুকু উত্তেজিত হল না, বরং সে কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হতে হতে একসময় ইজিচেয়ারেব সঙ্গে যেন মিশে গেল। বস্তুত বিজন কবির প্রতীকীতে বাঁচতে গিয়ে মৃত্যুর মতো শিথিলতায় অথবা কবির প্রতি ঠাণ্ডা ঈর্ষায় এই ঘন চুম্বনে কোন যৌন সংযোগের উত্তেজনা পেল না। বরং সে এলবির প্রতি করুণাঘন হল। এলবির মাথায় হাত বুলিয়ে ঈশ্বরের মতো বলল, আবার যদি এ বন্দরে আসি, তোমার ঘরে আসব। জাহাজী মানুষের মতো আসব। বস্তুত বিজন নিজেব সহজ সত্তায় এলবির ঘরে বাঁচবার ইচ্ছায় উঠে দাঁড়াল।

বিজন বলল, কাল ভোরে আমাদের জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। তুমি ভোরে যেও।

এলবি উত্তর দিতে পারল না। সে খাটে পড়ে বালিকাসুলভ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

বিজন বুঝল এ-সময় কোন কথা বলে এই আশাহত বিদেশিনীকে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে না। সে সেজন্য অনেকক্ষণ ওর পাশে বসে থাকল এবং ওকে কাঁদতে দিল।

অনেকক্ষণ পর যখন বিজন দেখছে এলবি আর কাঁদছে না, বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে, তখন ওর হাত ধরে টেনে তুলল এবং বলল, চল, জাহাজে তুমি আমায় পৌঁছে দেবে।

মোটরে বসে বিজন ভাবল—সেলিম এবং তুমি উভয়ে আমার আত্মার আত্মীয়। দুজনকেই আমি এ বন্দরে ফেলে যাচ্ছি। হয়তো পৃথিবীর অন্য কোন এক বন্দরে আমার জাহাজ ভিড়বে। সেখানে সেলিমের মতো কোন পাইনের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ব। তুমি তোমার জানালায় সেদিন আত্মার গভীরে যে অজ্ঞাত দুঃখের স্পর্শ-টুকু পাবে—সে আমারই। তখন তুমি জানালায় বসে এই সমুদ্রকে দেখে কবির কবিতা আবৃত্তি কোরো। সে কবিতার ভিতর আমরা, এই সব মৃত নাবিকেরা ঈশ্বরকে খুঁজব।

বিজন বলল, এলবি, তুমি আমার সঙ্গে কথা বল। এভাবে চুপচাপ মোটর চালালে আমার খুব কষ্ট হয়।

এলবি কথা বলার পরিবর্তে ধীরে ধীরে কবিতা আবৃত্তির সময় দেখল—এই শহরের পথের সব আলোগুলো এখনও জেগে আছে। ইতস্তত দুটো-একটা মোটর ওদের অতিক্রম করে বের হয়ে যাচ্ছে। পথের মোড়ে মোড়ে পুলিশের বুটের শব্দ—পুলিশ টহল দিচ্ছে। দোকানের শো-কেসে আলো জ্বলছে না। এলবি এই ঘন রাতে বিজনকে কোন কথাই বলতে পারল না—সে ভেঙে পড়ছে। তাই ধীরে ধীরে শেষ প্রিয় কবিতাটি সে আবৃত্তি করে বিজনকে বিদায় জানালো—

'Art thou aborad on this stormy night
on thy journey of love, my friend? The
sky groans like one in despair.

I have no sleep to-night, Ever and
again I open my door and look out on
the darkness, my friend!

I can see nothing before me. I
wonder where lies thy path.

By what dim shore of the ink-black
river. by what far edge of the frowning
forest, through what mazy depth of
gloom art thou threading thy course
to come to me. my friend?'

# টুপাভি চেরী

কাকাতিয়া দ্বীপ থেকে ফসফেট নিয়েছে জাহাজটা। জাহাজ আগামী দশ দিন পাশাপাশি ওসানিক দ্বীপপুঞ্জ সকল অতিক্রম করে অনবরত জল ভাঙবে। দশ দিন জাহাজীরা মাটি দেখতে পাবে না, তেরো মাস সফরে যেমন এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে গিয়েছে, সমুদ্রের নোনা জল ভেঙে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে, তেমনি এ-দশ দিনও শুধু জলই দেখবে অথবা অসংখ্য নক্ষত্র এবং রাতের আঁধারে অন্য জাহাজের আলো।

তখন বিকেলের ঘন রোদের রঙ জেটিতে, ফসফেট-কারখানার প্রার্থনা-হলের গম্বুজে এবং দূরে, দূরে নারকেল গাছের ছায়াঘন চত্বরে অথবা শ্রমিকদের ভাঙা কুটিরে, আকাশ অথবা নীলের গভীরতায় মগ্ন। সমুদ্র জলের নীল অথবা সবুজ ঘন রঙের ছায়া সাহেবদের বাংলোগুলো উজ্জ্বল করে রেখেছে। কিছু কিছু শ্রমিক বিকেলের আনন্দ হিসেবে ছোট ছোট স্কীপ নিয়ে বঁড়শী নিয়ে সমুদ্রে ভেসে গেল। এবং তারা এই জাহাজের পাশ দিয়ে গেল। গলুইতে জাহাজীরা ভীড় করে আছে। যেখানে দ্বীপের পাথর সমুদ্রে বাতিঘরের মতো, যেখানে ফার্ণ জাতীয় গাছ সমুদ্রের হাওয়ায় নড়ছে, সেখানে দ্বীপের সব শিশুরা অযথা লাফাল, নাচল, গাইল। কখনও সমুদ্রের জলে নেমে স্নান করল অথবা সাঁতার কাটল। এই সব দৃশ্যের ভিতর জাহাজটা ছাড়বে। গলুইতে জাহাজীরা ভীড় করে থাকল। মাস্টে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর জাহাজ ছাড়ছে এমত ভাবের কালো বর্ডার দেওয়া নিশান উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রীজে কাপ্তান, বড় মালোম। গ্যাঙওয়েতে কোয়ার্টার মাস্টার এখনও পাহারা দিচ্ছে। সিঁড়ি এখনও জেটি থেকে তোলা হয় নি, অথচ সকল কাজ শেষ। ডেক, ফল্কা সব জল মেরে সাফ করা হয়েছে। হ্যাচ, ত্রিপল এবং কাঠের সাহায্যে ফল্কা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তবু মেজ মালোম সারেঙকে ডেকে গলুইতে চলে এলেন না, কিংবা ওয়ারপিন ড্রাম ঘুরিয়ে বললেন না—হাসিল-হাপিজ। বললেন না, তোমরা জাহাজীরা এসো, আমরা বন্দরের নোঙর তুলে সমুদ্রে পাল তুলি।

সমুদ্রের শান্ত নিবিড়তার ভিতর দ্বীপের পাহাড়, ঘর-বাড়ি, কারখানা এবং এই সব দ্বীপের পুরুষ-রমণীরা সকলে যেন রাজকন্যার মতো জেগে সারা রাত ধরে, মাস ধরে এমন কি বৎসর, যুগ যুগ ধরে কোন এক রাজপুত্রের প্রতীক্ষাতে মগ্ন। সুপারী গাছ, নারকেল গাছ এবং উষ্ণদেশীয় সকল শ্রেণীর গাছ দ্বীপে দৃশ্যমান। সুমিত্র, জাহাজী সুমিত্র, সেজন্য বিকেলে পথে ঘুরতে ঘুরতে কখনও এ অরণ্য অঞ্চলে ঢুকে কাগজী লেবু সংগ্রহ করত। দু'পা এগিয়ে গেলে ওপাশে সমুদ্র ধারে ধারে বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি। সুমিত্র প্রায়ই বালিয়াড়িতে চুপ হয়ে, বালুচরের সঙ্গে ঘন হয়ে এই দ্বীপের নিবিড়তায় মগ্ন থাকত।

প্রস্থে দৈর্ঘ্যে তিন গুণিত চার মাইল পরিমিত স্থানটুকু জুড়ে এই দ্বীপ। কিছু সমতল ভূমি, কিছু পাহাড়শ্রেণী। দ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চলে সাহেবদের বাংলো-সকল, পার্ক, বিদ্যালয় এবং ক্লাব-ঘর। পশ্চিমটুকু জুড়ে শ্রমিকদের নিবাস।

পাহাড়ের উপর যেখানে কৃত্রিম উইলো গাছের সংরক্ষিত অঞ্চল আছে, যেখানে মার্বেল পাথরের প্রাসাদ এবং দ্বীপসকলের প্রধান কর্তার অবস্থিতি—তার ঠিক নিচে সুপেয় জলের হ্রদ। পাথুরে সিঁড়ি নিচে বালিয়াড়িতে গিয়ে নেমেছে। ছোট নীল হ্রদ অতিক্রম করার স্পৃহাতে সুমিত্র কোন দিন সিঁড়ির নিচে বসে থাকত। এই সমুদ্রের বুকে মার্বেল পাথরের স্থাপত্যশিল্প সুমিত্রকে রূপকথার গল্প স্মরণ করিয়ে দিত। সেখানে একদা সুমিত্র এক যুবতীকে আবিষ্কার করল। যুবতী উইলো গাছের ছায়ায় হ্রদের তীরে বসে ভায়োলিন বাজাত।

সুমিত্র জাহাজ-রেলিঙে ভর করে গতকালের কিছু কিছু ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারছে। সে দীর্ঘ সময় সিঁড়িতে বসে ছিল এই ভেবে—যুবতী হয়তো এই পথ ধরে অপরাহ্ণ বেলায় অন্য অনেকের মতো সমুদ্রে নেমে আসবে। যুবতীর প্রিয়মুখ দর্শনে সে প্রীত হবে। কিন্তু দীর্ঘ উঁচু পাহাড়শ্রেণীর ফাঁক দিয়ে যুবতীর মুখ স্পষ্ট ছিল না। সুতরাং অন্য অনেক দিনের মতো ভায়োলিনের সুরে মুগ্ধ হওয়া ব্যতিরেকে কোন গত্যন্তর ছিল না। প্রতি দিনের প্রতীক্ষা তার কখনও সফল হল না। এবং সেই সব নিষিদ্ধ এলাকায় যেতে পারত না বলে সমুদ্রে যুবতীর প্রতিবিম্ব দেখে গল্পের ডালিমকুমার হয়ে বাঁচবার স্পৃহা জন্মাত। আহা, আমি ওর চোখে স্পষ্ট হলুম না গো! যখন জাহাজীরা শ্রমিকদের বস্তিতে পুরনো কাপড়ের বিনিময়ে যৌন-সংযোগটুকু রক্ষা করত, তখন সুমিত্র পাথরের আড়ালে বসে উদাস হবার ভঙ্গীতে আকাশ দেখত।

সূর্য এখন সমুদ্রে ডুবছে। নীল সমুদ্রের লাল রঙ এখন পাহাড় এবং পাহাড়-শ্রেণীর উপত্যকা সকলকে স্নিগ্ধ করছে। ছোট ছোট স্কীপগুলো ঘরে ফিরছে। ক্লাব-ঘরে ব্যাণ্ড বাজছে। জেটিতে অনেক মানুষের ভীড়। সুন্দরী রমণীরা, আর পাহাড়ের সব বাসিন্দারা যুবতীকে জাহাজে তুলে দিল। সকল জাহাজীরা গলুইতে ভীড় করে থাকল। সেই যুবতী, চঞ্চল দুটো চোখে, গ্যাঙওয়ে ধরে উঠে আসছে। সন্ধ্যার গাঢ় লাল রঙ যুবতীকে সুমিত্রর চোখে রহস্যময়ী করে তুলছে।

এবার সব ডেক-জাহাজীরা দু ভাগ হয়ে আগিল পিছিলে চলে গেল। উইনচ হাড়িয়া-হাপিজ করল হাসিল। ড্যারিক নামানো হল। যুবতীর বাপকে দেখা গেল কাপ্তানের ঘরে। কিছু কিছু জেটির লোক ডেকে উঠে এসেছিল। ওরা সিঁড়ি তোলার আগে নেমে গেল। যুবতীর বাবা নেমে গেলেন। তারপর জাহাজ ধীরে ধীরে তীর থেকে সরতে থাকল। রুমাল উড়ল অনেক জেটিতে, যুবতী কেবিনে ফিরে যাওয়ার আগে সন্ধ্যার গাঢ় রঙের গভীরতায় ওই দ্বীপের ছবি দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হয়ে গেল। এই তার দেশ, এত সুন্দর এবং রমণীয়।

কেবিনে ঢুকে যুবতী টুপাতি চেরী দেখল কাপ্তান-বয় সব কিছু সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে। চেরী আয়নায় মুখ দেখল, তারপর লকার খুলে রাতের পোশাক পরে বোট-ডেকে উঠে যাবার জন্য দরজা অতিক্রম করতেই মনে হল জাহাজটা দুলছে এবং মাথাটা কেমন গুলিয়ে উঠছে। চেরী আর উপরে উঠল না। সে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। নরম সাদা বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে পোর্টহোলের কাঁচ খুলে দিল। চেরী এখন সমুদ্র এবং আকাশ দেখছে।

দরজায় খুব ধীরে ধীরে কড়া-নাড়ার শব্দে চেরী প্রশ্ন করল, কে?

আমি কাপ্তান বয়।

এসো।

আপনার খাবার—বলে সযত্নে টেবিল সাজাল।

চেরি বলল, এক পেয়ালা দুধ, দুটো আপেল।

আর কিছু?

না।

আপনার কষ্ট হচ্ছে মাদাম?

না।

উপরে উঠবেন না? বেশ জ্যোৎস্না রাত। বোট-ডেকে আপনার জন্য আসন ঠিক করা আছে।

না, উপরে উঠব না।

বয় চলে যাচ্ছিল, চেরী ডেকে বলল, শোন!

কাপ্তান-বয় কাছে এলো। বলল, তুমি কাপ্তানকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।

জী, আচ্ছা। কাপ্তান-বয় দরজা টেনে চলে গেল।

তখন ফোকসালে ফোকসালে সকল জাহাজীরা চেরীকে কেন্দ্র করে মশগুল হচ্ছিল। সকলে ওর চোখমুখ দর্শনে সজীব। এবং চেরী যেন এই নিষ্ঠুর জাহাজে সকল জাহাজীদের নিঃসঙ্গ মনে সমুদ্রযাত্রাকে সুখী ঘরণীর ঘরকন্নার মতো করে রাখছে। আর এমন সময় ডেক-সারেঙ এলেন, এনজিন-সারেঙ এলেন। তাঁরা দরজায় দরজায় উঁকি দিয়ে বললেন, তোমরা উপরে যাও, বোট-ডেকে মাস্তার দাও।

জাহাজীরা সিঁড়ি ধরে উপরে উঠল সকলে। ওরা বোট-ডেকে পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়াল। ডেক-সারেঙ ওদের পাশ দিয়ে গেলেন এবং বললেন, তেমরা, বাপুরা, ওঁর সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে যাবে না। কাপ্তানের বারণ আছে। জেনানা মানুষ, কাঁচা বয়েস—তার উপর আবার শুনছি রাজার মেয়ে এবং তিনি নাকি আমাদের কোম্পানির একজন কর্তাব্যক্তি।

সুমিত্র হাসল। —কী যে বলেন চাচা! উনি তো কার্কাতিয়া দ্বীপের প্রেসিডেণ্টের মেয়ে।

সারেঙ বললেন, ওই হল। যে রাজা, সে-ই প্রেসিডেণ্ট।

এখন রাতের প্রথম প্রহর। অল্প জ্যোৎস্না সমুদ্রে এবং জাহাজ-ডেকে। জাহাজীরা গরম বলে সকলে ফোকসালে গিয়ে বসল না। ওরা ফল্কার উপর বসে ভিন্ন রকমের সব কথাবার্তা বলল। দু-একজন জাহাজী অভদ্র রকমের ইঙ্গিত করতেও ছাড়ছে না। এ ধরণের কথাবার্তা শুনে অভ্যস্ত বলে সুমিত্র রাগ করল না। বরং হাসল। দীর্ঘ দিনের সমুদ্রযাত্রা সুমিত্রকে বিরক্ত করছে।

সুমিত্র ভাবল—সেই মেয়ে—হ্রদের তীরে বসে বেহালা বাজাত, পাথরের আড়ালে বসে হ্রদে প্রতিবিম্ব দেখে যার রহস্য আবিষ্কারে সে মত্ত থাকত, যার প্রতিবিম্ব সমুদ্রের কোন রাজপুত্রের ইচ্ছাকে সকরুণ করে রাখত, অথবা সেই প্রাসাদের ছায়া, ঘন বন, সমুদ্রের পাঁচিল এবং উঁচু পাথরের সব দৃশ্য সুমিত্রকে ঠাকুমার গল্প মনে পড়িয়ে দিত...যেন রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে...যাচ্ছে...শুধু পাতালপুরীতে ভোজ্যদ্রব্য, যেন প্রাসাদের পর প্রাসাদ, কোন জন-মনিষ্যির গন্ধ নেই, ফুলেরা, গাছেরা, পাখিরা এবং পতঙ্গসকল পাথর হয়ে আছে। হ্রদের তীরে খুব নীচু উপত্যকা থেকে সুমিত্র যত দিন চেরীকে দেখেছে, তত দিন পাতালপুরীর দৃশ্যসকল কার্কাতিয়া দ্বীপের সকল দৃশ্যমান বস্তুসকলের উপর এক ক্লান্ত ইচ্ছার ঘর তৈরি

করে চলে গেছে।

এখন জাহাজীরা সকলে বাংকে শুয়ে পড়েছে। সুমিত্রও দরজা বন্ধ করে কম্বল টেনে শুয়ে পড়ল। সুমিত্র এই বাংকে শুয়ে পর্যন্ত চেরীর কথা ভাবছে—চেরী হয়তো শুয়ে পড়েছে। সিঁড়ি ধরে গ্যাঙওয়েতে যখন উঠে আসছিল চেরী, সুমিত্র তাকে কাছ থেকে দেখেছিল। বড় বড় চোখ মেয়েটির—বাদামী রঙ শরীরে, চোখের রঙ ঘন গভীর এবং সমস্ত শরীরে প্রজাপতির মতন হাল্কা গড়ন যেন ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছার ঘর সবটুকু যত্ন দিয়ে তৈরি করেছেন।

জাহাজ এখন সমুদ্রে। তীর দেখা যাচ্ছে না, কোন দ্বীপ অথবা প্রবালবলয়। ভোরের সূর্য উঠছে সমুদ্রে। সমুদ্রটাকে দু-ফাঁক করে সহসা যেন সূর্যটা আকাশে উঠে গেল। ডেক-জাহাজীরা এ সময় জাহাজে জল মারছে। এবং অন্য অনেক জাহাজী ইতস্তত রঙের টব নিয়ে মাস্টে, ড্যারিকে রঙ দেবার জন্য ফল্কায় ফল্কায় হাঁটছে। সুমিত্র ভোরে উঠে ওয়াচে যাবার আগে গ্যাঙওয়েতে চোখ তুলে দিল। চেরী সেখানে নেই। বোট-ডেক খালি। ব্রীজে ছোট মালোম দূরবীন চোখে লাগিয়ে দূরের আকাশ দেখছে।

সুমিত্র এনজিন-রুমে নেমে যাবার আগে দুখানা ভাঙা চাঁদের মতো রুটি খেল, জল খেল। চা খেল। অন্যান্য অনেক জাহাজীর মতো প্রশ্ন করে জানতে চাইল, গত রাতে চেরী কেবিনে শুয়ে সারারাত ঘুমিয়েছিল না, গরমে কেবিনের দরজা খুলে গভীর রাতে ডেকে বসে সমুদ্র এবং আকাশের নিরাময় ভাবটুকু লক্ষ্য করে শরীর নিরাময় করছিল।

সুমিত্র এনজিন-রুমে নেমে যাওয়ার সময় দেখল ডেক-অ্যাপ্রেণ্টিস চুরি করে টুপাতি চেরীর পোর্টহোলে উঁকি দিচ্ছে। সুমিত্ররও এমন একটা ইচ্ছ যে না হচ্ছে, তা নয়। তারও না-দেখি না-দেখি করে পোর্টহোলের কাঁচ অতিক্রম করে চেরীর অবয়ব দর্শনে খুশি হবার ইচ্ছা। কিন্তু পোর্টহোলের মুখোমুখি হতে কেমন যেন বিব্রত বোধ করল। সে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ধরে এনজিন-রুমে নেমে কসপের ঘর থেকে তেল মেপে এনজিনের পিস্টনগুলোতে তেল ঢালতে থাকল। ওয়াচ শেষে যখন উপরে উঠবে তখন নিশ্চয়ই চেরী কেবিনে পড়ে থাকবে না, সমুদ্র এবং আকাশ দেখার জন্য নিশ্চয়ই বোট-ডেকে উঠে পায়চারী করবে—সে এমত চিন্তাও করল।

ওয়াচ শেষে অন্য পরীদারদের ডেকে দিল সুমিত্র। এনজিন-রুম থেকে সোজা না উঠে, স্টোকহোলড দিয়ে ফানেলের গুঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল, প্রত্যাশা—চেরী এখন ব্রীজের ছায়ায় বোট-ডেকে হয়তো বসে আছে। সে ওর পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে এই ইচ্ছায় যথার্থই বোট-ডেকে উঠে গেল। যখন দেখল ব্রীজের ছায়ায় চেরী অথবা ওর প্রতিবিম্ব কেউ বসে নেই, তখন সুমিত্র কেমন বিচিত্র এক অপমানবোধে পীড়িত হতে থাকল।

সুমিত্র স্নান করার সময় ভাণ্ডারীকে বলল, মানুষের কত রকমের যে শখ জাগে চাচা!

বাতিজার হ্যান মনের দশা ক্যান?

এই কিছু না। সুমিত্র মনে করতে পারল, এনজিন-রুমে সে যতক্ষণ ছিল, সব সময়টা উপরে ওঠার জন্য মনটা ছটফট করেছে। যেন চেরীর সঙ্গে কি এক আত্মীয় সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ। সে মনে মনে এই বোধের জন্য না হেসে পারল না।

এ-ছাড়া সুমিত্র পর পর দু-দিনের জন্য একবারও চেরীকে বোট-ডেকে অথবা গ্যাঙওয়েতে এমন কি ডাইনিং-হলেও দেখল না। যুবতী এই জাহাজে উঠেই নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। দশদিন সমুদ্র-যাত্রা। দু-দিনের নিঃসঙ্গতাকে এই অদৃশ্য যুবতী তীব্র তীক্ষ্ন করে তুলছে—সকল জাহাজীরাই মনে মনে এমত ভাবছে। এ-দুদিন চেরী জাহাজ-ডেকে একবারও বের হল না। সুতরাং সুমিত্র যতবার এনজিন-রুমে নেমেছে, ততবার চেরীর কেবিনের পাশে এসে একবার থেমেছে। সে পোর্টহোলের কাঁচ অতিক্রম করে চেরীর কেবিন প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা করত। কিন্তু পোর্টহোলের ঘন কাঁচের ভিতর দিয়ে চেরীর কেবিন সব সময় অস্পষ্ট থাকছে। কেবিনের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। মেস-রুম মেট অথবা মেস-রুম বয় এদিকে আসছে না। বুড়ো কাপ্তান-বয় চেরীকে দেখাশোনা করছে। অফিসাররা পর্যন্ত জাহাজে চুপ মেরে গেছেন। যত জাহাজটা চলছে তত যেন নাবিকরা সব ঝিমিয়ে পড়ছে। চেরী দরজা খুলল না, ডেকে বের হল না, পায়চারি করল না। অফিসারসকল প্রতি দিন ডেক-সাজগোজ করে বসে থাকলেন, অবসর সময় একটু আলাপ অথবা উদ্বিগ্ন হবার ভঙ্গীতে কৃত্রিম ইচ্ছা প্রকাশের জন্য। কখনও কখনও ছোট মালোম দরজা পর্যন্ত হেঁটে আসতেন। তারপর সমুদ্রের নির্জনতা ভোগ করে এক সময় কেবিনে ঢুকে সস্তা সব ক্যালেণ্ডারের ছবি দেখে ভয়ানক অশ্লীল আবেগে ভুগতেন।

সমুদ্রে নীল নোনা জল, আকাশে ইতস্তত নক্ষত্র জ্বলছে। খুব গরম পড়েছে—উষ্ণমণ্ডলের এই আবহাওয়া জাহাজীদের ফোকসালে বসতে দিচ্ছে না। ওরা শুতে পারছে না গরমে। ওরা উপরে উঠে ফল্কাতে মাদুর বিছিয়ে সেজন্য অধিক রাত পর্যন্ত তাস খেলছে। কেউ জাল বুনছে মাস্টের আলোতে। জাহাজটা চলছে, জ্যোৎস্না রাত। সমুদ্রে অকিঞ্চিৎকর তরঙ্গ এবং সহসা সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে এসে জাহাজীদের সুখ দিচ্ছে। এবং প্রপেলারটা অনবরত ঝিঁঝিঁ পোকার করুণ আর্তনাদের মতো যেন কাঁদছে। একটা বিশেষ গতিতে জাহাজটা চলছে, দৃশ্যমান বস্তু বলতে এই নক্ষত্রের আকাশ এবং সমুদ্র। গরমে কাপ্তান ব্রীজে পায়চারি করছেন। দুটো একটা আলো দেখা যাচ্ছে সমুদ্রে। দ্বীপপুঞ্জের জেলেরা এখন হয়তো গভীর সমুদ্রে মাছ ধরছে।

সুমিত্র জাহাজীদের বলল, আচ্ছা ব্যাপার তো! দু-দিনের ভেতর একবারও যুবতীকে ডেকে দেখা গেল না! এ যে দেখি চাচারা তোমাদের বিবিদেরও হার মানাছে!

ডেকের বড় ট্যাণ্ডল বলল, তোমাদের ভয়েই বার হচ্ছে না।

আমরা খেয়ে ফেলব নাকি?

বড় বাকি রাখবে না।

সুমিত্র দেখল তখন বুড়ো কাপ্তান-বয় এদিকেই আসছে। সে এসে ওদের পাশেই তাস খেলা দেখতে বসে গেল।

সুমিত্র বলল, রাজকন্যার খবর কি চাচা,

আর বলবেন না দাদা। রাজকন্যাকে দেওয়ানীতে ধরছে। রাত থেকে মাথা তুলতেই পারছে না। শুধু বিছানায় পড়ে থাকছে।

রাজকন্যা কিছু বলছে না তোমাকে?

আমি বুড়োমানুষ, আমাকে কি বলবে দাদা!

অন্য জাহাজী প্রশ্ন করল, মাথা একেবারেই তুলছে পারছে না?

কাপ্তান-বয় বলল, পারছে। বিকেলে দেখেছি কেবিনেই পায়চারি করছে। মনে হয়, কালতক ডেকে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

জাহাজটা তখন তেমন দুলছে না। ওরা ফল্কার উপর বসে গল্প করছে। জ্যোৎস্নার আলোতে ওদের মুখ বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। গ্যালীতে মাংস সিদ্ধ করছে ভাণ্ডারী। উইণ্ডস্‌হোল ধরে নীচ থেকে জাহাজীদের কথা ভেসে আসছে। এবং সেখানেও চেরী-সংক্রান্ত কথাবার্তাতে ওরা নিজেদের কঠিন মেহনতের দুঃখকে ভুলতে চাইছে।

সুমিত্র সকল জাহাজীদের খবরটা দিল—কাল টুপাতি চেরী ডেকে বের হবে। পরদিন আটটা-বারোটার ওয়াচে সুমিত্র এনজিন-রুমে নেমে কসপের ঘর থেকে তেল মেপে নিল। ক্যানে ভর্তি তেল সে এনজিনের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দিচ্ছে। একটু নুয়ে মেসিনের ভিতর ঝুঁকে পড়ল। তারপর ক্যানের তেল উঠাল, নামল এবং সে ঘুরে ঘুরে একই কাজের পুনরাবৃত্তি করছে...সে ক্যান উঠাল, নামাল। অন্য কোন দিকে তাকাতে পারছে না। সে যেন বুঝতে পারছে উপর থেকে সিঁড়ি ধরে কারা নামছে। সে চিফ-ইনজিনিয়ার এবং কাপ্তানের গলা শুনতে পাচ্ছে। সুতরাং এ সময়ে কোন অন্যমনস্কতা রাখতে নেই। এ সময়ে সে তেলয়ালা সুমিত্র। তাকে ক্রমশ উপরে উঠতে হবে। তাকে ছোট ট্যাণ্ডল থেকে বড় ট্যাণ্ডল হতে হবে। বড় মিস্ত্রীর চোখে যেন কোন অন্যমনস্কতা ধরা না পড়ে এবং সে যেন জীবনের ঋণ অনাদায়ে পরিশ্রমী তেলয়ালা সুমিত্র। সুতরাং সে ভীষণভাবে রড ধরে মেশিনের ভিতর ঝুঁকে কাজ করতে থাকল। থামের মতো সব মোটা পিস্টন রডগুলো উঠছে নামছে, ক্রাঙ্কওয়েভগুলো ঘুরছে অনবরত এবং এই সব ভয়ানক শব্দে উপরের কণ্ঠসকল ঢেকে যাচ্ছে। তবু সে এ-সময়ে কোন রমণীর কণ্ঠ শুনতে পেল এবং চোখ না তুলেই বুঝল বড় মিস্ত্রী আর কাপ্তান চেরীকে নিয়ে এনজিন-রুমে নেমে আসছে। সিলিণ্ডারের পাশে দাঁড়িয়ে রেসিপ্রকেটিং এনজিনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বড় মিস্ত্রী তাকে বিস্তারিত বলছেন।

সুমিত্র যেখানে কাজ করছে, সেটা এনজিনের তৃতীয় স্তর। দ্বিতীয় স্তরে চেরী এবং কাপ্তান। চেরী এনজিনটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুমিত্র একবার চেরীকে সহসা দেখে ফেলল। চেরী সিলিণ্ডার পরিদর্শন করে সিঁড়ি ধরে ক্রমশ নিচে নামছে। ওরা সুমিত্রর পাশ দিয়ে যথাক্রমে নিচে নেমে যাচ্ছে। সুমিত্র নিজের পোশাকের দিকে তাকাল—নীল কোর্তা ওকে মোল্লা মৌলভী বানিয়ে রেখেছে। চেরী নিচে নেমে যাচ্ছে। মেশিনের হাওয়ায় ওর চুল-গুলো উড়ছে। গায়ে সাদা সিল্কের ফ্রককোট। পরনে নেভি ব্লু স্কার্ট। সুমিত্র নিজেকে আড়াল করতে গিয়ে দেখল, বড় মিস্ত্রী এবং কাপ্তান চেরীকে এনজিনের মতো দ্রষ্টব্য বস্তু হিসাবে সুমিত্রর দিকে হাত তুলে দেখাচ্ছে—এরা ইণ্ডিয়ান। কোম্পানি ওদের কলকাতা অথবা বোম্বাই বন্দর থেকে তুলে নেয়। খুব কম পয়সায় ওরা বেশি কাজ দেয়।

বড় মিস্ত্রী অনেকটা পাদ্রীসুলভ ভঙ্গীতে বললেন, বেচারা!

সুমিত্র লজ্জায় মেশিনের ভিতর আরও ঝুঁকে পড়ল। চেরী ওর মুখ না দেখে ফেলে এমত ইচ্ছা এখন সুমিত্রর।

সুমিত্রর এখন যেন কত কাজ। সে ঘুরে ঘুরে এনজিনের সকল স্থানে তেল দিল। চেরী হেঁটে যাচ্ছে, চেরী ফিরেও তাকাচ্ছে না, চেরী পোর্ট-সাইডের বয়লার

ককের সামনে দাঁড়াল। বড় মিস্ত্রী বলল, এটা কনডেনসার। সার্কুলেটিং পাম্পের সাহায্যে জল ফের বয়লারে চলে যায়। ফের চেরী এবং বড় মিস্ত্রী ওর পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। ওরা গল্প করছে। সে তাকাল না। লজ্জায় সংকোচে সে টানেলের ভিতর ঢুকে গেল। কিন্তু চেরীর চোখ দুটো বড় গভীর এবং ঘন। সুমিত্র টানেলের মুখে এসে প্রপেলার শ্যাফটের একপাশে দাঁড়িয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে চেরীকে আড়াল থেকে দেখতে থাকল। চেরী ওকে দেখতে পাচ্ছে না, ওর শরীরের বাদামী রঙ, হাল্কা পোশাক-প্রজাপতির মতো যেন এনজিনে ও উড়ে বেড়াচ্ছে।

চেরী ইভাপোরেটারের পাশ দিয়ে যেতেই সেই গোপনীয় চোখ দুটোকে আবিষ্কার করে ফেলল। চেরী দেখল দুটো ডাগর চোখ (ঠিক যেন ঠাকুমার গল্পের রাজপুত্রের মতো) রাক্ষসের দেশে চেরীকে দেখে দুঃখিত হচ্ছে। এই সব ভেবে একটু অন্যমনস্কতায় ভুগে যখন আবার চোখ তুলল চেরী, তখন দেখতে পেল চোখ দুটো সেখানে নেই, অন্যত্র কোথাও সরে গেছে।

ভয়ে সুমিত্র এক পাশে সরে দাঁড়াল। সে তেল দিল ইতস্তত এবং কাপ্তানকে টুপাতি নালিশ দিলেও যেন বলতে পারে, না মাস্টার, আমি শুধু এনজিনেই তেল দিচ্ছি। টুপাতি এ সময়ে সামনে এসে দাঁড়াল। লজ্জায়, সংকোচে সুমিত্র চোখ তুলতে পারছে না। সে প্লেটের সঙ্গে অথবা এই সব যন্ত্রের সঙ্গে যেন মিশে যাচ্ছে। চেরী এখন সুমিত্রর কোঁকড়ানো চুল, শরীরের বাদামী রঙ দেখছে। তারপর সিঁড়ি ধরে স্টিয়ারিং-এনজিনে তেল দিতে যাবার সময় সুমিত্র শুনল টুপাতি যেন ওর সম্বন্ধে কি বলছে।

সুমিত্র ফোকসালে এসে কাপড় ছাড়ল—কিন্তু কারো সঙ্গে কথা বলল না। উপরে উঠে স্নান করল, কোন কথা বলল না। খেতে বসে চুপচাপ খেয়ে উঠল। অন্য তেলয়ালা বলল, কি হয়েছে রে? মুখটা খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

সুমিত্র উত্তর করল না।

অনেকে এমত প্রশ্ন করলেও সুমিত্র জবাব দিচ্ছে না। সে বাংকে বসে অযথা সিগারেট খেল, অযথা কতগুলি ইংরেজী পত্রিকার সস্তা অশ্লীল ছবি দেখল এবং কোন দুঃসহ ভয়ে সে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। এনজিনের ভিতর থেকে সেই চোখ দুটো যেন এখনও ওকে তাড়া করছে। বার বার মনে হচ্ছে চেরীর প্রতি চোখের এই স্পর্শকাতরতা সুখকর নয়। পোর্টহোলে সুমিত্রকে উঁকি দিতে দেখেছে এবং সেজন্য নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছে চেরী। কাপ্তানকে নালিশ দিয়েছে হয়তো।

আর বিকাল বেলাতেই বুড়ো কাপ্তান-বয় এলো পিছিলে। প্রায় ছুটতে ছুটতে এলো। সুমিত্র বাংকে শুয়ে ছিল, ঘুম আসছে না। সেই চোখ কেবল ওকে অনুসরণ করছে। কাপ্তান-বয় সারেঙের ঘরে উঁকি দিয়ে বলল, সারেঙসাব, বাড়িয়ালার ঘরে সুমিত্রর ডাক পড়েছে।

সুমিত্র শুনল, কাপ্তান-বয় এই সব কথা বলে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে। সে শুনল, সারেঙ সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে আসছে এবং ওর ঘরের ভিতরও সেই শব্দ। সুমিত্র ভয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকল।

সারেঙ ডাকল, এই সুমিত্র ওঠ। বাড়িয়ালা তোকে ডাকছে।

সুমিত্র উঠে বসল, আমাকে যেতে হবে সারেঙসাব?

কি করি বল? বাড়িয়ালা যে যেতেই বলল।

আমি কিছুই করি নি সারেঙসাব। সুমিত্র অপরাধবোধে পীড়িত হতে থাকল। বার বার নামতে উঠতে পোর্টহোলে সহসা কখন ও চোখ রেখেছে এবং এক তীব্র কৌতূহল ওকে বার বার এই বৃত্তিতে প্রলুব্ধ করেছে।

সুমিত্র লকার খুলে সাদা জিনের প্যাণ্ট পরল, জ্যাকেট গায়ে দিল, তারপর পায়ে জুতো গলিয়ে সারেঙসাবকে বলল, চলুন। সে সিঁড়ি ধরে উঠবার সময় দৃঢ় হবার চেষ্টা করল। কেউ প্রশ্ন করলে না। কারণ, বাড়িয়ালা একমাত্র জাহাজীদের অপরাধের জন্য তাঁর ঘরে অথবা ডাইনিং-হলে ডেকে থাকেন। সুতরাং সকল জাহাজীরা সুমিত্রকে দেখল সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে। সুমিত্র যেন ওর অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন, সে সেজন্য চোখ তুলল না। সে এখন অন্য কেন জাহাজীকেই দেখছে না। জাহাজটা যে চলছে এ-বোধও এখন সুমিত্রর নেই। উষ্ণমণ্ডলের গরম কমে যাচ্ছে, বিকেল হতেই ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব ডেকে, সুমিত্র ডেক ধরে যাবার সময় তাও অনুভব করতে পারল না। সে সারেঙের সঙ্গে বোট-ডেক পার হয়ে ব্রীজে উঠে যাবার সিঁড়ি ধরে কাপ্তানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

ওরা এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল। বুড়ো কাপ্তানের সংক্ষিপ্ত ছোট ছোট শব্দ। সারেঙ ঘরে ঢুকতে ইতস্তত করছে এবং কোন রকমে গলা সাফ করতেই কাপ্তান দরজা খুলে বের হলেন। তিনি ওদের দেখে বললেন, সারেঙ, তুমি কেন? তোমাকে তো ডাকি নি!

হুজুর, কাপ্তান-বয় যে বলল—

আরে না না, সুমিত্র হলেই চলবে। আমাদের সম্মানীয়া যে যাত্রীটি যাচ্ছেন, তিনি একবার ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

এতক্ষণ সুমিত্র শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু বাড়িয়ালার এই সব কথায় সে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করতে পারছে। সে বলল, মাস্টার, আমি যাব?

তুমি একবার পাঁচ নম্বর কেবিনে যাবে। যখন ডেকে পাঠিয়েছেন, তখন যেতেই হবে।

সুমিত্র ইচ্ছা করলে বোট-ডেক অতিক্রম করে টুইন-ডেকে নেমে অফিসার গ্যালী ডাইনে ফেললে পাঁচ নম্বর কেবিনের দরজায় হাজির হতে পারে, অথবা একোমোডেসান ল্যাডারেরই একটা অংশ ডাইনিং হলে নেমে গেছে—সেই সিঁড়ি ধরে নামলেও চেরীর দরজা। একটু ঘোরা পথ অথবা খুব কাছের পথ—কোন্‌টা ধরে যাবে ভাবছিল, ভাবছিল চেরীর সহসা এই ইচ্ছা কেন? পাথরের আড়াল থেকে চেরী ওকে নিশ্চয়ই দেখে নি, কারণ সেখানে সুমিত্রর অবয়ব স্পষ্ট ছিল না। সে অন্যমনস্কভাবেই হাঁটছিল। সে সিঁড়ি ধরে টুইন-ডেকে নেমে দেখল কমলা রঙের রোদ ডেকে, কিছু নীল তরঙ্গ জাহাজের চারপাশটায়। পিছিলে জাহাজীরা অনেকে নমাজ পড়ছে। সে নেমে আসার সময় তাদেরও দেখল।

ডেক-কসপ বলল, কি রে সুমিত্র, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কাপ্তান তোকে কিছু বলেছে?

সুমিত্র কোন উত্তর না করে অ্যালওয়েতে ঢুকে দেখল কেবিনের দরজা বন্ধ। সে ধীরে ধীরে কড়া নাড়তে থাকল।

ভিতর থেকে কাপ্তান-বয় বলল, কে?

আমি চাচা, সুমিত্র।

ভিতরে এসো। ভিতরে এসো।

সে পা টিপে টিপে কেবিনে ঢুকল। সে দেখল, কাপ্তান-বয় লকার, টিপয় এবং অন্য সব বাংকের বিছানা ঝেড়ে দিচ্ছে। চেরীর বাদামী রঙের ঘাড় আঙুর-ফলের মতো রঙ ধরছে। চেরী ঘাড় গোঁজ করে বাক্সের ভিতর কি যেন খুঁজছে।

কাপ্তান-বয় বলল, সুমিত্র এসেছে মাদাম।

সুমিত্র দেখল সেই আঙুরফলের মতো ঘাড় খুব সন্তর্পণে যেন নড়ছে। যেন বেশি চঞ্চল হতে নেই, উচ্ছল হতে নেই। সে দেখল সুমিত্রকে ঘাড় ঘুরিয়ে এবং যত ধীরে ঘাড় ঘুরিয়েছিল তার চেয়েও ধীরে ঘাড় ফেরাল।—ওকে বসতে বল।

সুমিত্র পাশের ছোট্ট ডেক-চেয়ারে বসল।

চেরী তখনও বাক্সের ভিতর কি যেন খুঁজছে। সে বলল, বয়, তুমি যেতে পারো।

সুমিত্র বাংলায় বলল, চাচা আপনি চলে যাচ্ছেন!

মেয়েমানুষকে এত ভয় দাদা, ফোকসালে তো খুব হৈ-চৈ করতে।

সুমিত্র জবাব দিতে পারল না। সে চুপ করে বসে থাকল। কাপ্তান-বয় দরজা বন্ধ করে চলে গেল। সুমিত্র এ সময় উঠল এবং দরজা কিঞ্চিৎ খুলে দিল। সে নীচে এনজিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে অথবা সুমিত্রর মুখে উষ্ণবলয়ের শেষ উত্তাপ-চিহ্ন...সে চুপ করে বসে পড়ল ফের। পোর্টহোলের কাঁচ খোলা, উপরে পাখা ঘুরছে এবং দরজা দিয়েও কিছু হাওয়া প্রবেশ করতে পারছে, তবু সুমিত্র ঘেমে নেয়ে উঠল। যত সে দৃঢ় হবার চেষ্টা করছে, তত যেন ওর মুখে আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণতার ছোপ লাগছে। তত সে অসহায় বোধ করল নিজেকে।

এতক্ষণ পরে চেরী মুখ ফেরাল। শরীরে হাল্কা গাউন, ব্রেসীয়ার স্পষ্ট। চেরী দু-হাঁটু ভাঁজ করে বাংকে বসল। সুমিত্রর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল, পোর্টহোলে রোজ উঁকি মারতে কেন?

আর উঁকি মারব না মাদাম।

কেন উঁকি দিতে তাই বল।

দীর্ঘ দিন সফর করছি। দেশে জাহাজ ফিরছে না, কেবল জল আর জল।

একটু বৈচিত্র্য চাইছ?

আজ্ঞে...। সুমিত্র আর কিছু প্রকাশ করতে পারল না। ভয়ে এবং বিষণ্ণতায় আড়ষ্ট বোধ করতে থাকল। ওর পায়ে সুন্দর জুতো, নেলপালিশ নখে, সুগোল হাঁটু পর্যন্ত পা...সে নীচু করে রেখেছে মুখ, তবু ওর সব যেন দেখতে পাচ্ছে সুমিত্র। গাউনের শেষ প্রান্তে লতার গুচ্ছ, পায়ের কোমল ত্বকে কেবিনের আলো... সে আর পারছে না, সে বলল, মাদাম, আর হবে না। আমাকে ক্ষমা করুন।

তুমি তো ভারতবর্ষের লোক সুমিত্র?

সুমিত্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, এবং চোখ তুলে এই প্রথম চেরীর চোখ দুটো খুব কাছে থেকে দেখল—এত উজ্জ্বল, এত প্রাণবন্ত চোখ সে যেন এই প্রথম দেখল। শালীনতার তীব্র তীক্ষ্ম ভাব চেরীকে, চেরীর চোখ দুটোকে কঠিন করে তুলেছে। সুমিত্র চেরীকে সহ্য করতে পারছে না। সে বলল, আমি উঠি।

চেরী এবার অদ্ভুত রকমে হেসে উঠল— তুমি ভয়ানক ভীতু সুমিত্র। শুনেছি সম্রাট অশোক দিগ্‌বিজয়ে বের হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ছেলে এবং মেয়েকে এই সব দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেই ভারতবর্ষের ছেলে তুমি!

সুমিত্র এবার একটু হাল্কা বোধ করল এবং ভালো করে কেবিনের চারপাশটা

দেখে নিল। এতক্ষণ পরে সে ধরতে পারছে এই কেবিনে ফুলেল তেলের গন্ধ, বিদেশী দামী সেন্টে অথবা কোথাও ধূপ দীপ অনবরত জ্বলে জ্বলে চেরীকে, ওর পোশাককে রূপময় করেছে। বাংকের উপর ভায়োলিন। দেয়ালে সুন্দর ক্যালেন্ডার। সমুদ্রে ঢেউ। বাইরে ঢেউ ভাঙার শব্দ। নীচে এনজিনঘরের আওয়াজ এবং চেরীর চোখ দুটোতে দ্বীপপুঞ্জের কমলালেবুর গন্ধ। চোখ দুটো কমলালেবুর মতোই সজল।

চেরী কাপ্তান-বয়কে দিয়ে দু-কাপ কফি আনাল। চেরী ইচ্ছা করেই দূরত্ব ভেঙে দেবার চেষ্টাতে এক কাপ কফি খেতে অনুরোধ করল। সুমিত্র এরপর ভারতবর্ষের কোন রাজপুত্রের মতোই দৃঢ় হল এবং বলল, আপনি আমায় কেন ডেকেছেন মাদাম?

সুমিত্রর দৃঢ়তাটুকু কেন জানি চেরীর ভালো লাগল না। যে মানুষটা কিছুক্ষণ আগেও এনজিনে ঘাড় গুঁজে কাজ করছিল, যার চোখ দুটো তাকে দেখে ভয়ে বিব্রত ছিল—সে সহসা এমত দৃঢ় ইচ্ছায় প্রকট হবে, অথচ চোখে কোন করুণার চিহ্ন থাকবে না, অবাধ্য যুবকের মুখভঙ্গীতে বসে থাকবে চেরী এতটা সহ্য করতে পারছে না। সে ফের প্রশ্ন করল, পোর্টহোলে উঁকি দিয়ে কি দেখার চেষ্টা করতে বল?

মাদাম, আমার সম্বন্ধে আপনি খুব বেশি ভাবছেন।

একবার নয়, দুবার নয়, অনেকবার পোর্টহোলে উঁকি দিয়েছ তুমি। ভেবেছ, পোর্টহোলের কাঁচ মোটা বলে আমি কিছু দেখতে পাই নি? সি-সিকনেসে ভুগছিলাম, নতুবা কাপ্তানকে দিয়ে তক্ষুণি ডেকে পাঠাতাম।

সুমিত্র মাথা নিচু করে আগের মতো করে বসে থাকল।

পরে জেনেছি তুমি ইন্ডিয়ান সুমিত্র। টুপাতি একটা বালিশ টেনে কোলের উপর চেপে বলল, কফি ঠান্ডা হচ্ছে খেয়ে নাও।

সুমিত্র ভয়ে ভয়ে কফিতে চুমুক দিল। খুব আদর-যত্নে এই মেয়েটি প্রতিপালিত—সে তাও ধরতে পারছে। সে একবার ভাবল, কাপ্তানকে বলে দেয়নি তো অসভ্যের মতো চুরি করে সে চেরিকে দেখত! সুমিত্র কেমন শুকনো মুখে কফি গিলতে থাকল। বলল, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এই পথ ধরেই আর এনজিনরুমে আসব না। আপনি দয়া করে কাপ্তানকে শুধু কিছু বলবেন না। আমি সব করব। আপনি যা বলবেন সব করব। সে কেমন আড়ষ্ট গলায় এই সব বলে দরজা খুলে বের হয়ে গেল। কারো দিকে তাকাল না। সোজা ফোকসালে গিয়ে বাংকে শুয়ে ভয়ঙ্কর অপমানবোধে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকল।

চেরী বাংকেই চুপ করে বসে থাকল। সুমিত্রর পায়ের শব্দও এক সময় মিলিয়ে গেছে। পোর্টহোলের কাঁচে এখন আর কোন প্রতিবিম্ব ভাসছে না। এতক্ষণ এই কেবিনে সুমিত্রর চোখ মৃত এবং সাদা ছিল, এতক্ষণ চোখ দুটোতে যেন নিঃসঙ্গ ভূতের আতঙ্ক—এই সব ভেবে চেরী নিজের উপরই বিরূপ হতে থাকল। সে সুমিত্রকে কোন কৌশলেই যেন আয়ত্তে আনতে পারছে না। অথচ দু-দিনের দেওয়ানী চেরীকে যখন এই কেবিনে মৃত্যুর মতো শক্ত করে রেখেছিল, তখন পোর্টহোলের কাঁচে কোন এক যুবকের চঞ্চল চোখ—জীবনের প্রতীক যেন...যেন দর্পণ—তাকে নিয়ত রাজপুত্রের মতো করে রেখেছে। ঠাকুমার গল্পের স্মৃতি এই কেবিনে কোন এক যুবকের শরীরে রূপ পাচ্ছিল—রাজপুত্র, কোটালপুত্র ঘোড়ায়

চড়ে যাচ্ছে, এক রাজ্য আক্রমণ করে অন্য রাজ্যে, কত গাছ, কত পাখ-প্যাখালী, কত বন-বাদাড় অতিক্রম করে যাচ্ছে—আহা, ভারতবর্ষের রাজপুত্রেরা ঘোড়ায় চড়ে একদা রাজকন্যা খুঁজতে বের হত, গল্পে রাজপুত্রের চোখ যেমত এই বয়স পর্যন্ত অনুসরণ করেছে চেরীকে—এই কেবিনে সেই চোখ, সেই মন এতক্ষণ ক্লান্ত ঘোড়ার মতো পা ঠুকে ঠুকে নিঃশেষ হয়ে গেল। চেরী উচ্চারণ করল—বেচারী!

বস্তুত উপাতি চেরী শৈশবের রূপকথার রাজপুত্রের চোখকেই যেন পোর্ট-হোলে প্রত্যক্ষ করেছিল। দেওয়ানীতে মাথা তুলতে পারছে না, শরীরে ভয়ানক যন্ত্রণা এবং সারাদিন বাংকে পড়ে থাকা, সারাদিনের ভিতর পোর্টহেলের ঘন কাঁচে সুমিত্রর চোখ দুটোই এক অসামান্য রূপকথার রাজত্ব, সুখ এবং আনন্দ এই দেয়ালে পৌঁছে দিয়ে গেছে। ঠাকুমার কোলে শুয়ে রাজপুত্রের গল্প শুনতে শুনতে চেরী ঘুমিয়ে পড়ত, যে রাজপুত্রর চোখ দুটো জীবনের এতদিন পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করে আসছে, পোর্টহোলে সহসা সেই চোখ দুটোকে যেন আবিষ্কার করেছে চেরী এবং প্রত্যক্ষ করেছে।

রাত্রিবেলায় সুমিত্র ওয়াচে নামার সময় অন্য পথ ধরে গেল।

ওয়াচ থেকে উঠে আসবাব সময় কসপ বলল, কাল রাজকন্যা তোমাকে কি বলল সুমিত্র?

সুমিত্র জবাব দিল, আমার দেশ কোথায়, কি নাম—এই সব নানা রকমের কথা। সব মনে নেই।

সাহেবদের ফেলে তোমার দিকে এমন নজর!

কি করি! রাজকন্যার মর্জি বোঝা দায়।

বিকাল বেলায় সুমিত্র দেখল চেরী ডেকে বসে আছে। উল বুনছে। পাশে ছোট মালোম বসে—নিশ্চয়ই গল্প করছেন। ডেক-অ্যাপ্রেণ্টিসরাও সেখানে আছে। বেশ গুলজার বলতে হবে। সে পিছিলের ছাদের নিচ থেকে সব দেখল। রঙিন কাগজের মতো মখমলের পোশাক চেরীর সমস্ত শরীরে জড়ানো। পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত গাউনের শেষ প্রান্ত ঝুলছে। চুলের গুচ্ছ খোপার মতো জড়ানো। ঘাড়ের মসৃণ ত্বক, কমলা রঙের রোদ, চুলের সোনালীগুচ্ছ এই সমুদ্রের নীল নির্জনতাকে ভেঙে দিচ্ছে। সুমিত্র গ্যালীতে ঢুকে, গ্যালীর জানালা দিয়ে প্রায় আড়াল থেকেই চেরীকে দেখতে থাকল। অন্যান্য জাহাজীরাও সেখানে এসে ভীড় করছে। ওর এই ভীড় ভালো লাগছে না। ওর মনে হল ফের জাহাজী নিঃসঙ্গতা ওকে জড়িয়ে ধরছে। এই মনোরোম বিকেল, কমলা রঙের বোদ এবং ছোট মালোমের উপস্থিতি কেন জানি তাকে কেবল পীড়া দিচ্ছে। সে গ্যালী থেকে বের হয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে ফোকসালে ঢুকে বাংকে শুয়ে পড়ল। এক অহেতুক ঈর্ষার জন্ম হচ্ছে মনে। সে বাংকে শুয়ে চেরীর অসামান্য রূপে দগ্ধ হতে থাকল।

কাপ্তান-বয় ছুটতে ছুটতে এসে বলল, সুমিত্র, আবার যে ডাক পড়েছে পাঁচ নম্বর কেবিনে।

সুমিত্র বলল, কেন, চেরী তো বোট-ডেকে বসে আছে দেখে এলাম।

এখন আর নেই। কেবিনে ঢুকেই বলছে, সুমিত্রকে আসতে বল।

কি ফ্যাসাদে পড়া গেল চাচা!

কোন ফ্যাসাদ নেই। আল্লাতায়লা ঠিক করবে। খুশি হয়ে চলে যাও।

কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে সুমিত্র প্রথমে অনুমতি নিল, পরে ঘরে ঢুকে ডান-

দিকের বাংকে বসল। চেরী সুমিত্রর জন্য প্রতীক্ষা করছিল এমন ভাব চোখে-মুখে। সে-ও সুমিত্রর পাশে বসে পড়ল এবং বলল, জাহাজে কত দিন ধরে কাজ করছ?

এই নিয়ে দু'সফর।

যাত্রী-জাহাজে কোন দিন চড় নি?

না-মাদাম।

তাই তুমি জানতে না অন্যের কেবিনে কখনও উঁকি দিতে নেই।

পোর্টহোল দিয়ে কেবিন অস্পষ্ট বলে আমিও আপনার কাছে অস্পষ্ট—এই ভেবেছি। আপনি ঘরের অন্ধকারে পড়ে থাকতেন, আমি বাইরের আলোতে থাকতাম। সে কথাটা তখন আমার কিন্তু একবারও মনে হয় নি।

তবে বল আমাকে দেখার জন্য চুরি করে উঁকি দিতে?

সুমিত্র মাথা নিচু করে রাখল আগের মতো।

হুঁ এ তো ভালো কথা নয়, সুমিত্র।

সুমিত্র মাথা তুলছে না। সুমিত্রর চোখে-মুখে ফের অপরাধবোধ জেগে উঠছে।

এই সব জাহাজে তোমার কাজ করতে ভালো লাগে?

না মাদাম। কাজ করতে ভালো লাগে না।

তোমার দেশ ভারতবর্ষ, কত বিরাট আর কত অসামান্য দেশ!

আজ্ঞে, মাদাম।

ঠাকুমার কাছে তোমার দেশের রাজপুত্রদের গল্প শুনেছি। সমুদ্রের ধারে ঠাকুমা আমাদের তোমার দেশের রূপকথার গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াতেন। এই সব কথা বলে চেরী উত্তেজিত হল অথবা কেমন উত্তেজিত দেখাল চেরীকে। চেরী বলল, চিফ-এনজিনিয়ারের কথায় তোমার কিন্তু প্রতিবাদ করা উচিত ছিল।

কোন্ কথায় মাদাম?

তোমাদের সস্তায় নেওয়া হয়। যেন অনেকটা গরু-ভেড়ার মতো ভাব।

ওঁরা তো ঠিকই বলেছেন মাদাম। আমরা তাঁদের কাছে—

এই সব লোকদের আমি ঘৃণা করি।

সুমিত্র এবার কথা বলল না। সব কিছুই রহস্যময় মনে হচ্ছে। চেরীর সকল কথাই কেমন অসংলগ্ন। সুমিত্র বুঝল না চেরী যথার্থ কাকে ঘৃণা করছে। সুতরাং সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল এবং চেরীর অসামান্য রূপে বিহ্বল হতে থাকল।

আমি কাপ্তানকে ধমক দিতে পারতাম। কিন্তু দিই নি। এতে তোমাদের আরও বেশি অপমান করা হবে। একটু থেমে চেরী ফের বলতে থাকল, কাপ্তান এবং চিফ-এনজিনিয়ার আমাকে এনজিন-রুমের সব কিছু দেখালেন। তোমাদের দেখালেন, যেন তোমাদের বাদ দিলে এনজিন-রুমের একটা এনজিনকেই বাদ দেওয়া হল।

মাদাম, আমরা নাবিক। এর চেয়ে বড় অস্তিত্বের কথা ভেবে আপনি অযথা কষ্ট পাবেন না।

তার চেয়ে বড় কথা তুমি ভারতবর্ষের ছেলে। বুদ্ধদেব, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ তোমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনি দেখছি ভারতবর্ষের প্রতি খুব অনুরক্ত।

আমি একটি মহান জাতির প্রতি অনুরক্ত। এখন চেরীকে দেখে মনে হচ্ছে সে

এই মুহূর্তে জাহাজে বিপ্লব শুরু করে দিতে পারে।

আমি উঠি মাদাম। ওয়াচের সময় হতে বেশি দেরি নেই।

যেন চেরী শুনতে পেল না, যেন খুব অন্যমনস্ক। চেরী আবেগের সঙ্গে বলতে থাকল, সুমিত্র, আমিও ভারতবাসী। আমার পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষ থেকে বাণিজ্য করতে এসে এই সকল দ্বীপে থেকে গেল। আর ফিরল না। তোমাকে দেখে আমি তবে খুশি হব না, তোমার অপমানে আমি আমার অপমান ভাবব না ?

সুমিত্র ফের স্মরণ করিয়ে দিল তার ওয়াচের সময় হয়ে গেছে। অথচ চেরী এতটুকু কর্ণপাত করছে না কথায়। এবং সেজন্য সুমিত্র চেরীর সকল কথার ভিতর নষ্ট-চরিত্রের লক্ষণ খুঁজে পাচ্ছে। এই বিষণ্ণ আলাপ সুমিত্রকে চেরী সম্বন্ধে আদৌ কোন কৌতূহলী করছে না। সুমিত্র মৃত চোখ নিয়ে বসে থেকে সকল কিছুকে বিরক্তিকর ভেবে পোর্টহোলের কাঁচে ঠাণ্ডা হাওয়ার গন্ধ নিতে সহসা উঠে দাঁড়াল।

সুমিত্র চলে যাচ্ছে। দরজায় এক পা রেখে দেখল চেরী কথাবার্তায় এখন নরম এবং সহজ হয়ে উঠেছে। চেরীর মুখ প্রসন্নতায় ভরা। যেন প্রগাঢ় স্নেহ এই জাহাজী মানুষটির জন্য সে লালন করছে। সুমিত্র নির্ভয়ে দরজা টেনে দিতে শুনল, চেরী ভিতর থেকে বলছে, ঠাকুমা আমাদের সকলকে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। ভারতবর্ষের রাজপুত্রদের গল্প করতেন। ভয় অথবা বিষণ্ণতা এ-ক'দিন ধরে সুমিত্রকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, চেরীর শেষ আলাপ, প্রগাঢ় স্নেহবোধ সুমিত্রকে নূতন জীবন দান করছে। সে ডেকের উপর দিয়ে প্রায় ছুটে এলো। হুইল্‌কে শিস্‌ দিল ফোকসালে নামার সময়।

চেরী বাংকে বসে থাকল। ভয়ানক নিঃশব্দ এই সমুদ্রযাত্রা—চেরী ঠাকুমার স্মৃতি মনে করল। সেই সব রাজপুত্রদের ঘোড়াসকলকে মনে করল। অথবা রাক্ষসের প্রাণ রুপোর কৌটায় সোনার ভ্রমরে...যেন পা ছিঁড়ছে হাত ছিঁড়ছে—রাক্ষসটা গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে...চেরী এই কেবিনে উঠে দাঁড়াল। অথবা নির্জন দ্বীপে রাজকন্যা নিদ্রিত, রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে, ছুটছে চেরী ঠাকুমাকে স্মরণ করতে পেরে এই সব ভাবল। সেই সব মনোরম বিকেলের কথা তার মনে হল। যেন সুমিত্রকে দেখেই সে তার কৈশোর-জীবনের কথা মনে করতে পারছে। বিকালের সমুদ্র পাহাড়ের ধারে, ছোট ছোট মাছেরা খেলছে। সমুদ্রের ধারে ওরা ছুটোছুটি করছে। নারকেল গাছের ছায়ায় ঠাকুমা ভারতবর্ষের দিকে মুখ করে বসে আছেন, যেন যথার্থই তিনি ভারতবর্ষকে, তাঁর পিতৃপুরুষের দেশকে, দেখছেন। তখন অ্যাণ্টনী নারকেল গাছ থেকে ডাব কেটে দিচ্ছে সকলকে। ওরা বালিয়াড়িতে ছুটে ছুটে ক্লান্ত। ওরা ডাবের জল খেতে খেতে ঠাকুমার পাশে বালুর উপর শুয়ে পড়ল। তখন সমুদ্রে সূর্য ডুবছে। নির্জন পাহাড়ী দ্বীপে কচ্ছপেরা ডিম পেড়ে গেল এবং ঠাকুমা তাঁর ঠাকুমার-মতো-রূপকথার গল্প আরম্ভ করে চেরীর মুখ টিপে বলতেন, তোর জন্য ভারতবর্ষ থেকে এক টুকটুকে রাজপুত্র ধরে আনব। চেরীর সেই কৈশোর মন ঠাকুমার কথা যথার্থই বিশ্বাস করে এক রঙীন স্বপ্নে ঠাকুমার কোলেই ঘুমিয়ে পড়ত।

চেরী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। পোর্টহোলের কাঁচ খুলে দিল। পর্দা তুলে দিল, অথচ সেই চোখ দুটোকে আর খুঁজে পেল না। যতক্ষণ সুমিত্র এই বাংকে বসে ছিল, যতক্ষণ গল্প হল পোর্টহোলের চঞ্চল চোখ দুটোর গোপনীয় ভাব সুমিত্রর চোখে-মুখে ফিরে এলো না। কেমন নিষ্প্রভ, কেমন পাথরের মতো চোখ নিয়ে এতক্ষণ ওর কেবিনে বসে থাকল সুমিত্র। সুতরাং সকল দুঃখকে ভুলে থাকবার জন্য পোর্ট-

হোলের পাশে দাঁড়িয়ে ভায়োলিনটা বাজাতে থাকল চেরী। উপরে নীচে, সামনে পিছনে শুধু নিরবচ্ছিন্ন আকাশ, শুধু নীল সমুদ্র এবং মনে হল সমুদ্রে রূপকথার রাজপুত্রেরা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। এবং সেই সব দ্বীপপুঞ্জের অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকদের চেরী পোর্টহোলে দাঁড়িয়ে দেখল ঘোড়ায় চড়ে সমুদ্রে সুমিত্রর সামনে সমানে ছুটতে পারছে না। জীবনের প্রথম লগ্নে ভারতবর্ষের এক সুপুরুষ যুবাকে, যুবার কোমল চোখ দুটোকে পরম অপার্থিব বস্তু ভেবে চেরী কেমন প্রীত হতে থাকল। চেরী, সেই দীঘির (ঠাকুমার বর্ণিত রূপকথা) সিঁড়িতে সুমিত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। যেন রাজপুত্র কোটালপুত্র নামছে, নামছে। মানিকের আলোয় দীঘির সিঁড়ি ধরে রাজকন্যার দেশে নামছে। নিঝুম পুরী, কোন শব্দ নেই লোক নেই, প্রাণী নেই, পাখি নেই, নিঃশব্দ ভাব। সোনার গাছ। গাছে হীরা-পান্নার ফল। সোনার ঝরণা, সোনার পাখি। একই গাছের ডালে নাচ এবং গান। রাজপুত্র গান শুনতে শুনতে নাচ দেখতে দেখতে সদর দেউড়ি পার হয়ে সাত দরজা ডাইনে ফেলে অন্দরের চাবিকাঠিতে হাত বুলাল। এখানে ছোট নদী বইছে—সুবর্ণরেখা নদী। নদী ধরে পদ্ম ভাসছে—কখনও হীরা, কখনও মানিক্যের। এবং রাজপুত্র চন্দনকাঠের পালঙ্কে রাজকন্যাকে দেখল। এই সব গল্প শুনে টুপাতি চেরী বলত, আমরা কোন দিন ইণ্ডিয়ায় যাব না ঠাকুমা?

ঠাকুমা বলতেন, বড় হলে যাবে। দেখবে তখন কত রাজপুত্র তোমাদের খুঁজতে বের হয়েছে।

চেরী যেন এই বয়স পর্যন্ত কোন রাজপুত্রকে অনুসন্ধান করে সহসা পোর্ট-হোলের কাঁচে তাকে আবিষ্কার করেছে।

ছোট বড় ঢেউ উঠছে সমুদ্রে। দূরে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডলফিনরা, ফ্লাইং-ফিশের ঝাঁক বর্শার মতো ছুটে আসছে জাহাজের দিকে। দুটো-একটা দ্বীপ, দুটো একটা আগ্নেয়গিরি আকাশ লাল করছে। দ্বীপে ছোট ছোট পাখিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। জলে, লাল নীল হলুদ রঙের মাছ। তখন সূর্য উঠছে।

আবার বিকাল। সূর্য পাটে বসেছে। পোর্টহোলের ঘন কাঁচে কোন চোখ ধরা দিচ্ছে না। টুপাতি দেখল, সুমিত্র আর অ্যালওয়ে ধরে এনজিনে নামছে না। অথবা এনজিন-রুম থেকে উঠে আসছে না। অভিমানে টুপাতির চোখে জল আসতে চাইল।

সেই বিকালে ছোট মালোম এসে বললেন, আসুন, আমরা একসঙ্গে চা খাই।

চেরী বলল, ক্ষমা করবেন মিস্টার। আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

পরদিন ডিনার-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলেন কাপ্তান। বললেন, আজ আপনি আমাদের গেস্ট। আমরা সকলে একসঙ্গে ডাইনিং-হলে খাব।

চেরী বলল, বেশ হবে।

বুড়ো কাপ্তান উঠলেন। চেরী প্রশ্ন করল, আর ক'দিন বাদে বন্দর ধরবে ক্যাপ্টেন?

তিনি কি হিসাব করে একটি তারিখের উল্লেখ করলেন এবং কাপ্তান কি ভেবে ফের বললেন, সন্ধ্যায় ডাইনিং-হলে একটু নাচ-গান হোক—এই আমার ইচ্ছা।

বেশ হবে।

আপনি অংশগ্রহণ করলে বাধিত থাকব।

অংশগ্রহণ করব।

ভারতীয় জাহাজটি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করছে? কাপ্তান কথাপ্রসঙ্গে যেন এই কথাগুলো বললেন।

কোথায় করছে! চেরী এই বলে বড় বড় হাই তুলল।

ছোঁড়া ভারী বেয়াদপ দেখছি!

ভয়ানক। আবার হাই তুলল চেরী।

দাঁড়ান, ঠিক ব্যবস্থা করছি।

তা করুন। সে কেবল হাই তুলতে থাকল।

এবার আমি আসি।

আচ্ছা।

তখন ঘড়িতে সাতটা বাজল। আটটা-বারোটা ওয়াচের জাহাজীরা বোট-ডেকে উঠে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ওরা ফানেলের পাশ দিয়ে স্টোকহোলডে নেমে যাবে এমন সময়ে কাপ্তান-বয় ছুটে এলো। বলল, সুমিত্রকে বাড়িয়ালা তাঁর কেবিনে ডাকছে।

সুমিত্র এই ডাকে ভীত অথবা সন্ত্রস্ত নয়। চেরীর চোখে যে স্নেহ দেখেছিল, নিশ্চয়ই তা বেইমানী করতে পারে না। অন্য কোন কারণে অথবা সারেঙের কান-ভারী কথা—এমন সব ভেবে সে অ্যাকোমোডেশান ল্যাডার ধরে ব্রীজ অতিক্রম করে কাপ্তানের ঘরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা খোলা ছিল বলে কাপ্তান তাকে দেখতে পাচ্ছে। কাপ্তান যেন চার্ট-রুমে কোন মানচিত্র দেখছে এমন চোখে সুমিত্রকে দেখে এক সময় বলল, তুমি এই জাহাজে কোল-বয়ের চাকরি করতে?

ইয়েস মাস্টার।

আমি তোমাকে ফায়ারম্যান করেছি?

ইয়েস স্যার।

তারপর ইফাতুলা কার্ডিফে নেমে গেল বলে তুমি গ্রীজার হলে?

ইয়েস স্যার।

ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার! বেয়াদপ পাজি, ন্যাস্টি হেল্! কাপ্তান চিৎকার করতে থাকলেন।

সুমিত্র নীচের দিকে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। সুমিত্র বুঝতে পারছে না। ওর বেয়াদপি কোথায় এবং কখন ঘটেছে। তবু স্বীকার করাই ভালো। নতুবা কাপ্তান এখনই লগ-বুক এনে খচ খচ করে হয়তো লিখবেন-সুমিত্র, অ্যান ইণ্ডিয়ান সেলর ডাজ নট ক্যারী আউট হিজ জব। সে বলল, ইয়েস মাস্টার, আর কোন দিন বেয়াদপি হবে না।

তাহলে কোন দিন বেয়াদপি করবে না বলছ?

না মাস্টার, কোন দিন করব না।

ফের কোল-বয় হবার যদি ইচ্ছা না থাকে, চেরীকে যথাযথ সম্মান দেখাবে।

সুমিত্র ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর কাপ্তানের কথামতো যখন ব্রীজ পার হয়ে সিঁড়ি ধরে বোট-ডেকে নেমে এলো, যখন দেখল সকল জাহাজীরা নেমে যাচ্ছে স্টোকহোলডে, তখন উত্তেজনায় অধীর হতে হতে সে বাংলায় অশ্লীল সব কথাবার্তা বলল চেরীকে উদ্দেশ্য করে এবং এ সময় তার একটু মদ খাবার শখ জাগল।

বিকেল বেলা চেরীর ঘরে ডাক পড়তেই সুমিত্র তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। এক

মুহূর্ত দেরী করল না, অথবা সাজগোজের জন্য আয়নার সামনে দাঁড়াল না। সে অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখল—চেরী ভয়ানক ভাবে সাজগোজ করে বসে আছে। কোলের উপর ভায়োলিন। প্রসাধনের তীব্র তীক্ষ্ণভাব সুমিত্রকে যেন সুচতুর যৌনবিলাসী হতে বলছে। চেরীকে সে দেখল। মখমলের পোশাক দেখল এবং নগ্ন ভঙ্গীতে বসে ঠোঁটে বিদ্যুৎ খেলতে দেখল। চিবুকে ভাঁজ পড়েছে—পায়ের ভাঁজে ভাঁজে কেমন আড়ষ্ট ভঙ্গী।

সুমিত্র চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, কোন কথা বলল না।

এভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোস।

সুমিত্র কোথায় বসবে ঠিক করতে পারল না।

ডেক-চেয়ারটাতে বোস সুমিত্র।

সুমিত্র খুব আড়ষ্ট ভঙ্গীতে বসল।

অমন পুতুল-পুতুল ভাব কেন? কোন সজীবতা নেই চলাফেরাতে। কেবিনে ঢোকবার আগে পোর্টহোলের চোখ দুটো কোথায় রেখে আসো?

আমাকে ক্ষমা করবেন মাদাম। সেই চোখ দুটো কিছুতেই আর সংগ্রহ করতে পারছি না।

কেন, কেন পারছ না?

আজ্ঞে, কাপ্তান অযথা ধমকালেন।

চেরী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অযথা হো হো করে হেসে উঠল, আচ্ছা কাপ্তানের পাল্লায় পড়েছ।

ইয়েস মাদাম। আপনি কিন্তু ও-কথা আবার কাপ্তানকে বলবেন না।

কাপ্তানকে তুমিও কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারলে না?

সুমিত্র জিব কাটল।—তা হয় না মাদাম। আমাদের কাপ্তান খুব ভালো লোক। অন্য জাহাজের কাপ্তান ভারতীয় জাহাজীদের সঙ্গে সাধারণত কোন কথাই বলেন না। সব সারেঙের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। অথচ আমাদের প্রিয় কাপ্তান সকল জাহাজীদের নাম জানেন। তাছাড়া নাম ধরে ডেকে ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করেন। আমি কিছু ইংরেজী জানি বলে তিনি খুব খুশি আমার উপর। এই জাহাজে কোল-বয় হয়ে উঠেছি, তাঁর দয়ায় এখন আমি গ্রীজার। জাহাজীদের এর চেয়ে বড় উন্নতি এত অল্প সময়ে নেই।

তবে বলতে হয় কাপ্তান তোমাকে খুব ভালোবাসেন?

হ্যাঁ মাদাম।

আমি ভায়োলিন বাজাই, কই, কোন দিন তো বললে না আপনার বাজনা শুনতে ইচ্ছা হয়, ভালো লাগে?

কথার আকস্মিক পরিবর্তনে সুমিত্র ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, সাহসে কুলায় না মাদাম।

সাহসে কুলায় না, না ইচ্ছা হয় না?

সুমিত্র এবারও জিব কাটল। চোখে পোর্টহোলের প্রতিবিম্ব ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠেই ফের মিলিয়ে গেল। —যদি অভয় দেন তো বলি।

সুমিত্র আবার ভাবল কোন বেয়াদপি করে ফেলছে না তো! সে বলল, না থাক মাদাম।

কেন থাকবে? তুমি বল। অভয় দিচ্ছি।

সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় আপনার বাজনা শুনেছি। দীঘির পারে উইলোগাছের ছায়ায় বসে রোজ বিকেলে ভায়োলিন বাজাতেন।

তুমি লুকিয়ে এত সব করতে?

কিছু মনে করবেন না মাদাম। আমরা সেলার। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর বন্দরে এলেই একটু বৈচিত্র খুঁজি। কেউ মদ খায়...কেউ...। চুপ করে গেল সহসা।

—না থাক।

চেরী খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, ডাইনিং-হলে নাচ-গান হবে। তুমি এসো।

সুমিত্র জবাব দিল, সে হয় না মাদাম। জাহাজীদের অত দূরে যাবার সাধ্য নেই।

চেরী বলল, আমি যদি ক্যাপ্তানকে অনুরোধ করি?

মাদাম, আপনি জাহাজে আর চার-পাঁচ দিন আছেন। আপনি নেমে গেলে জাহাজীরা, অফিসাররা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে।

চেরী চুপ করে থাকল। অন্যমনস্ক ভাবেই ছড় চালাল ভায়োলিনের তারে। এই সুর সুমিত্রর সেই পরম অপার্থিব চোখ দুটিকে যেন খুঁজছে।

ছোট মালোম এলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সেই শব্দে সুমিত্র উঠে দাঁড়াল। —আমি তবে আসি মাদাম

বোস। ছোট মালোমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি যাচ্ছি। একটু দেরি হবে। চেরী এবার সুমিত্রকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি রোজ এই পথ ধরে নামবে সুমিত্র, কথা দাও।

আপনি দুঃখ পাবেন মাদাম। আমার চোখ দুটো ফের বেইমানী করতে পারে।

না, কথা দাও।

এই পথ ধরেই নামব। কথা দিলাম।

চেরী বসে ছিল চুপচাপ। সুমিত্র চলে গেছে। ছোট মালোমও চলে গেছেন। সে ঘড়ি দেখল। ছ'টা বাজার দেরি নেই। সে বাংক থেকে নেমে জামা-কাপড় বদলাল। সে তার দামী ইভনিং-পোশাক পরে আয়নার প্রতিবিম্ব ফেলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। এ-সময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দ। চেরী প্রশ্ন করল, কে?

আমি, ক্যাপ্টেন স্মিথ।

হয়ে গেছে আমার। আমি যাচ্ছি। বলে চেরী ভায়োলিন হাতে বের হল। কাপ্তানের সঙ্গে চলতে থাকল। ওরা ডাইনিং-হলের দিকে যাচ্ছে। যে সব অফিসারদের, এনজিনিয়ারদের ওয়াচ নেই তারা পূর্বেই নির্দিষ্ট স্থানে বসে আছে। চেরী ঢুকলে সকলে উঠে সম্মান দেখাল চেরীকে। মালবাহী জাহাজের ছোট ডাইনিং-হল, অল্প পরিসরে কয়েকজন মাত্র পুরুষ। ঘরে নীল আলো। বাটলার, কাপ্তানের আদেশমতো এই ছোট্ট ঘরটিকে বিচিত্র সব রঙীন কাগজে এবং ভিন্ন ভিন্ন রকমের চেয়ার-টেবিলের জেল্লায় জলুস বাড়াবার চেষ্টা করেছে। চেরী কেমন খুঁতখুঁত করতে থাকল।

কাপ্তান একটু ইতস্তত করে বলল, সমুদ্রের দিনগুলোতে কোন আনন্দ নেই মাদাম। সুতরাং স্বল্প আয়োজন থেকেই যতটা আনন্দ নিতে পারি।

আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি কাপ্তান। সেটা আপনাকেও ভেবে দেখতে

বলি।

বলুন।

এই ছোট্ট ঘরে না হয়ে খোলা ডেকে হলে ভালো হয় না?

কাপ্তান এবারও একটু ইতস্তত করল। —আপনি জাহাজীদের এ আনন্দে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন?

মন্দ কি! আমার কিন্তু মনে হয় সেই ভালো হবে। ডেকে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। সমুদ্রে ঢেউ নেই। এমন সুন্দর দিনে...।

তাই হবে।

সুতরাং চার নম্বর এনজিনিয়ার দৌড়ে গেল ডেকে। ডেকের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়, ড্যারিকে, মাস্টে সবুজ-লাল-নীল আলো জেলে দিল। সতরঞ্চ পেতে সকল জাহাজীদের বসতে বলা হল। তারপর কাপ্তান নিজেই বলতে থাকলেন, আমাদের মাননীয়া অতিথি মিস টুপাতি চেরীর সম্মানার্থে এই আনন্দের আয়োজন। আমাদের সমুদ্রের দিনগুলো ভয়ানক নিঃসঙ্গ। সুতরাং সকলেই আজ খোলা মনে আনন্দ করব। এবং এই সম্মানীয়া অতিথির প্রতি নিশ্চয়ই অশালীন হব না।

অফিসারদের জন্য কিছু চেয়ার, কাপ্তান একপাশে এবং তার ডাইনে রেলিঙের ধারে চেরী বসল। সমুদ্রে ঢেউ নেই বলে জাহাজ বিশেষ দুলছে না। একটু একটু শীত লাগছে। জাহাজীরা চারপাশে বসে আছে। চেরী সহজ হয়ে দাঁড়াল, প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলল, আমবা আজ সকলে পরস্পরের বন্ধু। আসুন, আমরা আজ সকলে একসঙ্গে ঈশ্বরের প্রার্থনা করি। এই কথায় সকলে উঠে দাঁড়াল। ওরা প্রার্থনার ভঙ্গীতে আকাশ দেখতে থাকল।

তারপর ছোট মালোম চেরীব অনুমতি নিয়ে গান গাইলেন, লেট্‌স লভ মাই গার্লফ্রেন্ড অ্যান্ড কিস্‌ হার...।

মেজ মিস্ত্রী তাঁর ছোট্ট ক্যানারী পাখিটা খাঁচা সহ টেবিলের উপব রাখলেন। শিষ দিয়ে পাখিটাকে নানা রকমেব অঙ্গভঙ্গীতে নাচালেন। সকলে হেসে গড়াগড়ি দিল।

কাপ্তান কীট্‌সের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন সকলকে।

একটু বাদে এলেন জাহাজের মার্কিন সাব। মুখোশ পরে চার্লি ধাবে বিজ্ঞ ব্যক্তির মতো ঘুরে বেড়ালেন কিছুক্ষণ। হাতের লাঠিটা মাঝে মাঝে ঘোরাচ্ছেন, তিনি যেন কি খুঁজছেন, অথবা কি যেন তাঁর হারিয়ে গেছে। শেষে কাপ্তানের কাছে এসে বললেন, দিস্‌ ম্যান, মাই ফ্রেন্ড, দিস্‌ ম্যান ইজ দি রুট অফ অল ইভ্‌ল্‌স্‌। সুতরাং আসুন, ওকে খতম করে জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে দেশে ফিরে যাই। বলে তিনি তাঁর লাঠিটা কাপ্তানের মাথায় তুলে ফের নামিয়ে আনলেন, না, মারব না। তিনি বড় রকমের দুটো হ্যাঁচ্চো দিলেন। লাঠিটা আপনারা নিয়ে নিন, বলে ক্লাউনের কায়দায় লাঠিটা উপরে ছুঁড়ে ফের ধরে ফেললেন। এবারও সকলে না হেসে পারল না।

এনজিন-রুমে যাদের ওয়াচ ছিল, তারা উপরে উঠে মাঝে মাঝে উঁকি মেরে যাচ্ছে। সুমিত্র সকলের পিছনে বসে আছে। ব্রীজে ঘণ্টা বাজল। এখন সাতটা বাজে। সুতরাং আর আধঘণ্টা এখানে বসে থাকা যাবে। সুমিত্র উঠি-উঠি করছিল, এ সময় চেরী বলল, এবার সুমিত্র আমাদের একটু আনন্দ দিক।

কাপ্তান বললেন, সুমিত্র গান গাইবে।

স্যার, আমাদের গান আপনাদের ভালো লাগবে না।

না সুমিত্র, ঠিক কথা বলছ না। আমরা এখানে কেউ সঙ্গীতজ্ঞ নই। শুধু একটু আনন্দ—সে যেমন করে হোক। একটু আনন্দ, আনন্দ কর।

সুমিত্র একটি সাধারণ রকমের বাংলা গান গেয়ে শোনাল।

এ সময় ডেক-অ্যাপ্রেণ্টিস এলো পায়ে খড়খড়ি লাগিয়ে। সে লাফিয়ে লাফিয়ে অথবা শুয়ে বসে নাচল। এবং সব শেষে চেরী ওর দীর্ঘ দিনের অভ্যাসকে ভায়োলিনের তারে মূর্ত করে তুলে সকলকে আনন্দ দিল।

তারপর রাত নামছে, ডাইনিং-হলে কাঁটা-চামচের শব্দ। সেখানে বাটলার এবং অন্যান্য বয়সকল ছুটোছুটি করে পরিবেশন করল। সকলে মদ খেল অল্পবিস্তর। চেরী মদ খেয়ে মাতাল হল আজ।

রাত দশটা বেজে গেছে। চেরী নেশাগ্রস্ত শরীরে কেবিনের ভিতর ডেকচেয়ারে বসে আছে। সুমিত্র সকলের পিছনে চুপচাপ বসে ছিল। উইংস থেকে একটি আলোর তির্যক রেখা এসে ওর চোখে পড়েছে। চেরী ক্ষণে ক্ষণে সুমিত্রকে দেখছিল। দুটি পরস্পর গোপনীয় দৃষ্টি ঘনিষ্ঠ হতে হতে এক সময় লজ্জায় আনত হল। চেয়ারে বসে চেরী সেই চোখ দুটোর কথা ভেবে পোর্টহোলের কাঁচ খুলে দিল। পর্দা সরিয়ে দিল। ঘুম আসছে না। এ সময় সুমিত্রকে ডেকে পাঠালে হত।

বয়, বয়! দরজায় পায়ের শব্দে চেরী উঠে গেল এবং দরজা খুলে দিল! শরীর টলছে।—বয়, আজ সুন্দর রাত। বয়, তোমার বাড়িতে কে কে আছে?

মাদাম, অনেক রাত হয়েছে। শুয়ে পড়ুন। গ্লাসে জল রেখে গেছি।

বয়, তুমি জানো আমি ভারতীয়?

জী, না।

জেনে রাখ আমি ভারতীয়। বড় দুঃখ বয় আমরা আর সে দেশে যেতে পারব না। বয়, একটা কথা বলব তোমাকে। কিন্তু সাবধান, কাউকে বলবে না।

মাদাম, আপনার শরীর ভালো নেই। শুয়ে পড়ুন।

বয়, সুমিত্র কিন্তু রাজপুত্র হতে পারত। ওর চোখ, মুখ, শরীর সব সুন্দর।

মাদাম, সুমিত্র যে রাজার ঘরেরই ছেলে। ভাগ্য দোষে—

চেরী এবার কিছু বলল না। সে ধীরে ধীরে উঠে পোর্টহোলে মুখ রাখল।—তুমি যাও, বয়।

মাদাম, দরজাটা বন্ধ করে দিন। কাপ্তান-বয় বের হয়ে যাবার সময় এ কথাগুলো বলল।

চেরী পোর্টহোল থেকে যখন দেখল কাপ্তান-বয় ঘরে নেই—ওর পায়ের শব্দ অ্যালওয়েতে মিশে গেছে এবং যখন মনের উপর শুধু সুমিত্রই একমাত্র দৃশ্যমান-তখন দরজা বন্ধ না করে নীচে এনজিন-রুমে নেমে সুমিত্রর পাশে গিয়ে দাঁড়ানোই ভালো। চেরী দরজা খুলে বাইরে বের হল। এনজিন-রুমে নামার মুখেই দেখল সুমিত্র তেলের ক্যান নিয়ে উপরে উঠে আসছে।

এই যে, মাদাম!

সুমিত্র, তোমার ওয়াচ শেষ?

না মাদাম, পিছিলে যাচ্ছি, স্টিয়ারিং-এনজিনে তেল দিতে।

রাত এখন কত?

এগারোটা বেজে গেছে, মাদাম।

জাহাজে আর কারা এখন জেগে থাকে সুমিত্র?

অনেকে মাদাম। অনেকে। ব্রীজে ছোট মালোম, এনজিন-রুমে তিন নম্বর মিস্ত্রি, স্টোকহোলডে চারজন ফায়ারম্যান, তিনজন কোল-বয়, কম্পাস ঘরে কোয়ার্টার-মাস্টার, ফরোয়ার্ড পিকে কোন ডেক-জাহাজী।

তুমি এত কষ্ট করতে পারো সুমিত্র!

এখন তো কোন কষ্টই নেই মাদাম। যখন কোল-বয় অথবা ফায়ারম্যান ছিলাম সে কি কষ্ট!

তুমি আমার ঘরে আসবে সুমিত্র?

আপনার শরীর ভালো নেই মাদাম। আমি আপনাকে ঘরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছি। কারণ চেরীর এই উচ্ছৃংখল ভাবটুকু ভালো লাগছে না সুমিত্রর। সে চেরীর অন্য কোন অনুরোধ রাখল না। সে চেরীকে ধরে বলল, আসুন।

কোথায় সুমিত্র?

কেবিনে।

আমার ভালো লাগছে না।

ভালো না লাগলে তো চলবে না মাদাম।

তুমি কেবিনে বসবে, বল?

বসব।

তোমার ফের ওয়াচ ক'টায়?

ভোর আটটায়।

চেরী কেবিনের দিকে না গিয়ে ডেকের দিকে পা বাড়ালে সুমিত্র বলল, এ তো আচ্ছা বিপদে পড়া গেল দেখছি। রাত দুপুরে জাহাজীরা দেখলে বলবে কি?

কি বলবে সুমিত্র?

কি আবার বলবে! আসুন। ধমকের সুরে কথাগুলো বলল সুমিত্র। তারপর জোর করে চেরীকে কেবিনে ঠেলে দিতেই সুমিত্র শুনতে পেল—চেরী বলছে—ভালো হচ্ছে না সুমিত্র। আমি মাতাল বলে কিছুই বুঝতে পারছি না ভাবছ। কাল ঠিক কাপ্তানকে নালিশ দেব দেখ। আমার উপর জোর খাটালে ঈশ্বর সহ্য করবেন না।

ফের সুমিত্র নিজের অবস্থা বুঝে খানিক বিব্রত বোধ করছে। এমত ঘটনার কথা কাপ্তানকে বললে—তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন না। অথবা মনে হল বুড়ো কাপ্তানকে খবর দেওয়া যায়—চেরী ডেকের অলিগলিতে ঘুরতে চাইছে। চেরী মদ খেয়ে মাতাল এবং চেরীর এই সময় যৌনেচ্ছার বড় ভয়ানক সখ। কিন্তু দেখল যে রাত গভীর। ফরোয়ার্ড পিক থেকে ওয়াচ করে ডেক-জাহাজী হামিদুল ফিরছে। ওয়াচের ঘণ্টা বাজছে ব্রীজে। সুতরাং বুড়ো কাপ্তানকে এ সময় ডেকে তোলা নিশ্চয়ই সুখকর হবে না। বরং কাপ্তান-বয়ের খোঁজে গেলে হয়, যথার্থ উপকার এ সময় তবে হতে পারে। সে আরও কিছু ভাবছিল তখন চেরী ওর হাতটা পিছন থেকে খপ করে ধরে ফেলল। বলল. দোহাই সুমিত্র, আমাকে একা ফেলে যেও না। ভয়ানক ভয় করছে।

সুমিত্র ছোট মালোমের কথা মনে করতে পারল। প্রতি দিন ওয়াচের শেষে অথবা রাতের নিঃসঙ্গতায় ভুগে ভুগে এই দরজার ফাঁকে চোখ রাখার জন্য উপস্থিত ছোট মালোম এই দরজায় হাত রেখে বলত, বোট ডেকে বড় সুন্দর রাত।

চেরী বলত, আমার শরীরটা যে ভালো যাচ্ছে না থার্ড।

আমরা এখন একটা নির্জন দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, মাদাম।

সেটা আমার দ্বীপের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী সুন্দর হবে না থার্ড।

চেরী কত দিন এমন সব কথা বলে প্রাণ খুলে হাসত।—তোমাদের থার্ড আচ্ছা বেহায়া, সুমিত্র। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় কেবিনে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দি। বেচারা! চেরী ভয়ানক টলছিল। সে এখন এক হাত বাংকে রেখে অন্য হাতে সুমিত্রের কলার চেপে বলছে, মাই প্রিন্স।

মাদাম, আপনি কি সব বলছেন!

আমি ঠিক বলছি সুমিত্র। আমি ঠিক বলছি। তুমি দরজা বন্ধ করে দাও সুমিত্র, নতুবা আমি জোরে জোরে চিৎকার করব। বলব, প্রিন্স প্রিন্স। একশবার বলব। সকলকে শুনিয়ে বলব। তুমি কি করবে? কি করতে পারছ?

ভয়ে সুমিত্র কাঠ হয়ে থাকল। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে বলল, চুপ করুন মাদাম, চুপ করুন। আপনার ঈশ্বরের দোহাই।

সুমিত্র দেখল কেবিনের পোর্টহোল খোলা। ফরোয়ার্ড পিকে কোন জাহাজী যদি এখন এই সময় ওয়াচে যায়, চোখ তুলে দেখলে ওদের দুজনকে স্পষ্ট দেখতে পাবে। সে তাড়াতাড়ি পোর্টহোলের কাঁচ বন্ধ করতে গিয়ে দেখল—ক্যালেণ্ডারটা উড়ছে। সে সন্তর্পণে পোর্টহোল দিয়ে কিঞ্চিৎ মুখ বার করে যখন দেখল কেউ এ-পথে আসছে না, বারোটা-চারটের পরীদাররা সব এনজিন রুমে নেমে গেছে এবং শেষ ওয়াচের পরীদারদের চিৎকার স্টেকহোল্ড থেকে উঠে আসছে তখন দ্রুত পোর্ট-হোলের কাঁচ এবং লোহার প্লেট উভয়ই বন্ধ করে দিয়ে চেরীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল এবং বাংলায় বলল, বেশ্যা! তারপরের খিস্তী উচ্চারণ না করে মনে মনে হজম করে ফেলল। তবে অভ্যস্ত ইংরেজীতে উচ্চারণ করল, মাদাম, আমাকে বিপদে ফেলবেন না।

বোস সুমিত্র।

সুমিত্র পূর্বে এ-কেবিনে যে সংকোচ নিয়ে যে ভয় এবং মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে বসত আজও তেমন দু'হাতের তালুতে মাথাটা রেখে কেমন অসহায় ভংগীতে বসে থাকল। সে এ-মুহূর্তে কিছুই ভাবতে পারছে না। চার ঘণ্টা ওয়াচের পর ক্লান্ত শরীরটাকে যখন ফোকসালে নিয়ে যাবে ভাবছিল, যখন স্নান সেরে শরীরের সকল ক্লান্তি উত্তাপ দূর করবে ভাবছিল তখন চেরীর এই মাতাল ইচ্ছা ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের মতো ক্রমশ ওকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

চেরী বলল, তুমি ইচ্ছা করলে স্নান সেরে নিতে পারো সুমিত্র।

সুমিত্র যেহেতু একদা এই সব কেবিনের দেয়াল সাবান-জল দিয়ে পরিষ্কার করেছে, যেহেতু ওর সব জানা.. সুমিত্র সুতরাং উত্তর করছে না।

চেরী বাংক থেকে উঠে ওর পাশে বসল। বলল, মাই প্রিন্স। বলে সুমিত্রর কপালে চুমু দেবার জন্য ঝুঁকে পড়ল।

সুমিত্র উঠে দাঁড়াল এবং বলল, মাদাম, আপনি পাগল।

চেরীর পা দুটো টলছে এবং চোখ দুটো তেমনি মায়াময়।

সুমিত্রর এই অপমানসূচক কথায় চোখ দুটো কেমন সজল হয়ে উঠল। নীচে এনজিনের শব্দ। আরও নীচে সমুদ্র অতল থেকে যেন ফুঁসছে। চেরী বলল, আমি ভারতবর্ষে যাব সুমিত্র। তুমি নিয়ে চল। তুমি আমাকে ঘোড়ার পিছনে নিয়ে কেবল ছুটবে, ছুটবে—কোথাও পালিয়ে যাবে।

চেরীর সেই রাজপুত্রের কথা মনে হল। সেই রাজকন্যার কথা মনে হল। রাজকন্যা স্বয়ম্বর সভা অতিক্রম করে দূরে দূরে চলে যাচ্ছে। ঝাড়লণ্ঠন পরিত্যাগ করে আঁধারের আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে। মুক্তোর ঝালর—, শ্বাস্রীরা হাঁকছে অথচ নিকটবর্তী কোন জলাশয়ে প্রতিবিম্ব রাজপুত্রের। সকলের অলক্ষ্যে রাজপুত্র রাজকন্যার জন্য প্রতীক্ষা করছে। চেরীর এই সব কথা মনে হলে বলল, তুমি পারো না সুমিত্র, তুমি আমাকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে পারো না!

সুমিত্রকে উদাস দেখে ফের বলল, পারো না তুমি? আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না ভারতবর্ষে?

মাতাল রমণীকে খুশি করার জন্য সুমিত্র বলল, নিয়ে যাব।

তোমার দেশের গ্রাম মাঠ দেখব সুমিত্র!

সুমিত্র সহজ ভাবে কথা বলতে চাইল। —ফুল দেখবে না? পাখি দেখবে না?

ফুল দেখব, পাখি দেখব।

আমার দেশের আকাশ দেখবে না? আকাশ?

আকাশ দেখব, নক্ষত্র দেখব।

সাপ বাঘ দেখবে না? সাপ বাঘ? বিধবা বৌ, যুবতী নারী? এই সব বলতে বলতে সুমিত্র কেমন উত্তেজিত বোধ করছিল। সে মরিয়া হয়ে যেন বলে ফেলল, আমি সব দেখাতে পারি। কিন্তু দেখাব না। তুমি নেশায় টলছ। নিজের সম্বন্ধে তুমি সচেতন নও, সুতরাং সব দেখালে অন্যায় হবে।

প্রথমটায় চেরী ধরতে না পেরে বলল, কি বললে? চেরীর চোখ দুটো তারপর সকল ঘটনার কথা বুঝতে পেরে ছোট হয়ে এলো। —কাপুরুষ! চেরী সুমিত্রর মুখের কাছে এসে কেমন একটা থু শব্দ করে দরজার পাট সহসা খুলে দিল। গেট আউট, ইউ গেট আউট! এমন চিৎকার শুরু করল চেরী যে সুমিত্র পালাতে পারলে বাঁচে। সুতরাং সুমিত্র ছুটতে থাকল। সে ডেক ধরে ছুটে এসে পিছিলে উঠে দেখল পরীদারেরা সকলে যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। সে এই সব কথা গোপনে লালন করে দীর্ঘ সময় ধরে মেয়েটির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দুঃখবোধ করল।

তখন চেরী পোর্টহোলের প্লেট খুলে দিল। কাঁচ খুলে দিল। সে শরীরটাকে বাংকে এলিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—এমন সময় দরজায় শব্দ, কড়া নাড়ছে কে যেন। ধীরে ধীরে এবং সন্তর্পণে। অথবা চোরের মতো। সে বুঝতে পারছে—কারণ চট্ করে শরীরের মাতাল ভাবটা কেটে গেছে পোর্টহোলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় এবং নিজের বেলেল্লাপনার রেশটুকু ধরতে পেরে লজ্জিত, কুণ্ঠিত। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দরজার সামনে। বলল, কে?

আমি মাদাম।

আপনি কে?

আমি থার্ড।

আজ তো আকাশে নক্ষত্র নেই। আকাশে মেঘ দেখতে পাচ্ছি। এই সব কথার ভিতর চেরীর মাতাল মন ধীরে ধীরে যেন সুস্থ হচ্ছে। এতক্ষণ প্রায় সে সকল বস্তুকে দুটো অস্তিত্বে দেখছিল—দুটো ক্যালেণ্ডার, দুটো লকার, চারটে বাংক এবং এমন কি সুমিত্র পর্যন্ত দুটো অস্তিত্ব ওর পাশে বসে ছিল। পোর্টহোলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সবকিছুই মিলে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে। যেন সবই এখন এক অখণ্ড বস্তু। তবু থার্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, চলুন কাপ্তানের ঘরে। রাত দুপুরে কেমন

জ্বালাতন করছেন টেরটি পাবেন।

এতক্ষণ মাদাম, দয়া করে আপনার কেবিনে কে ছিলেন?

চেরী বিদ্রূপ করে বলল, কেন, আপনি নিজে। তারপর দরজাটা মুখের উপর ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিয়ে বলল, লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন।

কিন্তু সুমিত্র নিজের বাংকে বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারল না। সুমিত্রর মনে পড়ল মাতাল রমণী যদি দরজা খুলে শুয়ে থাকে, যদি থার্ড সেই ফাঁকে বেড়ালের মতো সন্তর্পণে ঢুকে পড়ে এবং চুরি করে চেটে চেটে মাংসের স্বাদ নিতে নিতে যদি...ভালো নয়, ভালো নয় সব—এমত ভেবে সে ডেকের উপর উঠে এলো। কাপ্তান-বয়ের দরজায় কড়া নেড়ে ডাকল, চাচা, অ চাচা, একটু উঠুন।

বৃদ্ধ কাপ্তান-বয়ের সারাদিন পরিশ্রমের পর এই বিশ্রামটুকু একান্ত নিজস্ব। সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সুতরাং দু-এক ডাকে সাড়া পেল না সুমিত্র। সুমিত্র বার বার ধীরে ধীরে ডাকল, চাচা, অ চাচা! সে জোরে ডাকতে পারছে না, কারণ পিছনে মেসরুম মেট্ এবং মেসরুম বয় থাকে। তারপর এনজিনের স্কাইলাইট পার হলে ফানেল। ফানেল অতিক্রম করে অ্যাকোমোডেশান ল্যাডার, যা ধরে কাপ্তানের ঘরে উঠে যাওয়া যায়। জোরে ডাকাডাকি করলে বৃদ্ধ কাপ্তানের ঘুম পর্যন্ত ভেঙে যেতে পারে। সুতরাং ধীরে ধীরে সে কড়া নাড়তে থাকল।

বৃদ্ধ কাপ্তান-বয় এক সময় দরজা খুললে বলল, চেরীর দরজা বন্ধ করে আসুন চাচা। মদ খেয়ে ভয়ানক মাতলামি করছে।

তাড়াতাড়ি কাপ্তান-বয় গায়ে উর্দি চাপিয়ে নীচে ছুটল। গিয়ে দেখল দরজা বন্ধ। কাজেই সে ধীরে ধীরে ঠেলে ঠেলে দেখল—দরজা খোলা এবং খুলে যাচ্ছে। চেরী বাংকের উপর বসে ক্যালেন্ডারটা দেখছে নিবিষ্ট মনে। কাপ্তান-বয়ের কোন আওয়াজই চেরী যখন শুনতে পাচ্ছে না তখন দরজাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভালো। কিন্তু কি ভেবে ঘরের ভিতর ঢুকল কাপ্তান-বয়। টিপয়ে খাবার জল রাখল, তারপর পিতৃত্বের ভঙ্গীতে বলে উঠল, মাদাম, শুয়ে পড়ুন। অনেক রাত হয়েছে। এখন প্রায় একটা বাজে।

চেরী বড় বড় হাই তুলছে। সে কম্বলটা নীচে ঠেলে দিয়ে শুয়ে পড়ল। কাপ্তান-বয় দাঁড়িয়ে ছিল—চেরী কাত হয়ে শুয়ে ক্যালেন্ডারটা দেখছে। ওর পোশাকের গাঢ় রঙের ভাঁজ এখন আর নেই। চোখে অবসাদের চিহ্ন। কেমন এক তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব ওর সমস্ত অবয়বে। কাপ্তান-বয় কম্বলটা ওর শরীরের উপর বিছিয়ে দিয়ে বাইরে এলো। দরজা টেনে সন্তর্পণে তালা মেরে দিল। ডেকে বের হয়ে দেখল ঠান্ডায় সুমিত্র তখনও পায়চারী করছে।

কাপ্তান-বয় কাছে এসে বলল, দরজা বন্ধ করে তালা মেরে দিলাম।

যাক, বাঁচা গেল। এইটুকু বলে সুমিত্র পিছিলের দিকে উঠে যেতে থাকল।

•

ভোরবেলায় জাহাজীরা সাবানজল নিয়ে কেবিনের দেয়াল ধুতে অথবা ফলকা বেঁধে নীচে নেমে অদৃশ্য হতে চাইছে। তখন চেরী বিছানায় উঠে বসল। দরজা বন্ধ দেখল। সে গত রাতের কিছু কিছু ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারছে। সুমিত্র, জাহাজী সুমিত্রর প্রতি চেরীর বলতে ইচ্ছা হল, গত রাতের ঘটনার জন্য আমাকে ক্ষমা কর সুমিত্র। এই জাহাজ, সমুদ্রের নিঃসঙ্গতা এবং তোমার পাথরের মতো শরীরের

স্থির অথবা অচঞ্চল উপস্থিতি আমাকে নিয়ত তীব্র তীক্ষ্ণ করছে। আমাকে অস্থির, চঞ্চল করছে। অথচ তুমি কখনও পুতুলের মতো শরীর নিয়ে, কখনও একান্ত বংশবদের চিহ্ন শরীরে এঁকে আমার কেবিনে সময়, কাল অতিক্রম করার হেতু আমি ক্রমশ এক অস্থির নিয়তির ইচ্ছায় কালক্ষয়ের বাসনায় মগ্ন। কৈশোরের স্বপ্ন তোমার অবয়বে কেবল রূপ পাচ্ছে। আমার প্রিয়তম দ্বীপে এমত ঘটনা ঘটলে কি হত জানি না, আমার বাবা বর্তমান—তিনি আমাকে কি বলতেন জানি না এবং তোমার উপস্থিতি আমাকে অন্ধকারে নিদারুণ চঞ্চলতার জন্মদানে আমার সম্মানিত জীবনকে বিব্রত করে কেন জানি না, তবু তুমি কখনও এই কেবিনে এসে দাঁড়ালে আমি অধো-বদনে লজ্জিত থাকব। তারপর চেরী উচ্চারণ করল—গত রাতের ঘটনার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো সুমিত্র।

রাতের বিড়ম্বনার জন্যই হোক অথবা অন্য কোন কারণে সুমিত্র ভোর রাতের দিকে শরীরে ভীষণ ব্যথা অনুভব করতে থাকল। পাশের বাংকে অনাদি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওর যেহেতু চারটে আটটা পরী, যেহেতু এক্ষুণি তেলয়ালা হাফিজদ্দি ওকে এসে ডেকে তুলবে সুতরাং জল তেষ্টাতে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে ওকে ডাকা ভালো।

সুমিত্র ডাকল, অনাদি ও অনাদি। একটু উঠে জল দে ভাই।

এই রাতে জল চাওয়ায় অনাদি আশ্চর্য হল। সে বলল, উঠে খেতে পারিস না।

শরীরে ভয়ানক কষ্ট।

কেন, কি হল!

মনে হয় জ্বর এসেছে।

অনাদি তাড়াতাড়ি উঠে কপালে হাত রেখে দেখল জ্বরে সুমিত্রর শরীর পুড়ে যাচ্ছে। সে জল দিল সুমিত্রকে। তারপর বলল, রাত একটা পর্যন্ত তুই কোথায় ছিলি রে?

সুমিত্র উপরের দিকে হাত তুলে দেখাল।

কি করছিলি,

চেরীকে পাহারা দিচ্ছিলাম।

চেরী তোকে কিছু বলেছে?

না।

জাহাজে তোর ভালোই কাটছে।

সুমিত্র জবাব দিল না। সুমিত্র কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

ভোরের দিকে সারেঙ ঘরে ঢুকে বলল, কি রে বা, অসুখ বাধাইছ!

না, তেমন কিছু নয় চাচা। মনে হয় ফ্লু গোছের কিছু। মেজ মালোমের কাছ থেকে একটু ওষুধ এনে দেন চাচা।

সারেঙকে চিন্তিত দেখাল। ওর পরী কে দেবে এখন এমতই কোন চিন্তা যেন সারেঙের মনে। সুতরাং সে একজন ফালতু আগওয়ালাক ডেকে সুমিত্রর পরী দিতে বলে গেল এবং যাবার সময় বলে গেল—পরীতে সুমিত্রর আজ যেতে হবে না এবং এখুনি কোন কয়লায়ালাকে দিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে। এমন কথাও জানাতে পেরে সারেঙ যেন খুশি। তবে সুমিত্র যেন ডেকে উঠে ফের ঠাণ্ডা না লাগায়, বেশী হাঁটাহাঁটি না হয় সেজন্য সারেঙ শাসনের ভঙ্গীতেও কিছু কথা বলে গেল। বিশেষত, ভাতের জন্য ভাণ্ডারীকে পীড়াপীড়ি করলে নির্ঘাত পরী দিতে হবে এই সব

কথার দ্বারা সারেঙ সকলের উপরে, সে-ই জাহাজের সব খালাসীদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা এমন এক ধারণার ভিত্তিতে সারেঙ মেজ মিস্ত্রির মতো ডেকের উপর দিয়ে হেঁটে গেল—যেন এনজিনিয়ার হাঁটছে।

সুমিত্র শুয়ে ছিল, সে পরীদারদের ওঠানামার সঙ্গে ধরতে পারছে, এখন ক'টা বাজে। পোর্টহোল খোলা ছিল, কিন্তু সে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছে না। উপরের ঘরে ট্যাণ্ডেলের তামাক কাটার শব্দ ভেসে আসছে। পাশের ফোকসালে কোন জাহাজী এখন নমাজ পড়ছে। তা ছাড়া সমুদ্রে ঢেউ একটু বেশী আজ। জাহাজটা কিঞ্চিৎ বেশী দুলছে যেন।

মুখটা ওর বিস্বাদ লাগল। সে এক মগ চায়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে এখন। ভাণ্ডারী এক মগ চা এনে দিলে ঢক ঢক করে সবটা খেয়ে সমস্ত শরীরে কম্বল ঢেকে পড়ে থাকবে—তারপর যদি ভীষণ ভাবে ঘাম হয় শরীরে তবে নিশ্চয়ই শরীরটা ঠাণ্ডা হবে এবং অসহনীয় যন্ত্রণা বোধ থেকে সে মুক্তি পাবে।

চেরী কেবিনে বসে চা-এর সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ, কিছু ফল এবং মাখনের স্বাদ এতবার চেখেও যখন তৃপ্তি পেল না, যখন আটটা বারোটার পরীদাররা সকলে নেমে গেছে ধীরে ধীরে অথচ সুমিত্র নামছে না—দূরে সমুদ্রের বুকে সূর্যের ম্লান আলো তেমনি ছড়িয়ে পড়ছে এবং তরঙ্গসকলকে আলোকিত করছে ; কিছু উড়ুক্কু মাছ তেমনি ঝাঁক বেঁধে সাঁতার কাটছে, ছোট মালোম দূরবীনে আকাশ এবং সূর্যের অবস্থান প্রত্যক্ষ করছেন তখন চেরীর মনে হল ডেকছাদের ছায়া ধরে একটু হেঁটে এই জাহাজের রেলিঙে ভর করে সুখ এবং শান্তিকে খুঁজলে হয়। সমুদ্রের উপর জাহাজের প্রপেলার জল কেটে যাচ্ছে, জলে ফসফরাস জ্বলছিল—সূর্যের ম্লান আলোর জন্য সে কিছুই দেখতে পারছে না। অন্ধকার থাকলে এখন যেন ভালো হত। ফসফরাস জ্বলছে, এই সব দেখে গত রাতের মতো ঘোর উত্তেজনায় ভুগতে পারত। রাতের নিঃসঙ্গতায় এখানে চেরী কতবার এসে ভর করে দাঁড়িয়েছে। রেলিঙে ঝুঁকে ফসফরাস জ্বলতে দেখেছে। কখনও সুমিত্র থাকত, কখনও থাকত না। একদিন সে সুমিত্রকে খুশি করার জন্য বলেছিল—নেমে সোজা আমাদের প্রাসাদে গেলে না কেন? সুমিত্র তুমি...। সুমিত্র এই সময় কোথায়! ডেক সারেঙ এক নম্বর ফল্কার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। জাহাজীরা সাবানজল নিয়ে মাস্তের উপর উঠে হাসি ঠাট্টায় মসগুল। চেরী তখন ডাকল, সারেঙ, সারেঙ!

ডেক সারেঙ দৌড়ে এলে চেরী বলল, সুমিত্র কোথায়? সে তো এখনও নীচে নামে নি। ওর তো আটটা-বারোটা ওয়াচ।

সারেঙ জবাব দিল, মাদাম, ওর অসুখ হয়েছে।

চেরী অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বলল, যাঃ!

জী মাদাম। আপনাকে আমি মিথ্যা বলতে পারি?

ওকে কে দেখাশুনা করছে?

কে করবে মাদাম? সময় তো কারো হাতে নেই। সকলেই কাজ করছে। ও জ্বরে কাতরাচ্ছে।

তোমরা ওকে দেখতে পারো না! জ্বর হয়েছে...একলা ফেলে...

তা দেখি, মাদাম। সারেঙ নিজের দোষ কাটাবার জন্য বলে গেল, সব ব্যবস্থা করা হয়েছে মাদাম। এনজিন-সারেঙ মেজ মালোমের কাছ থেকে ওষুধ এনেছে।

তারপর চেরীর মনে পড়ল এই মালবাহী জাহাজে সেবা শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা নেই। জাহাজীদের জন্য ভালো ওষুধ নেই। কোন ডাক্তার নেই। সাধারণ রকমের অসুখে মেজ মালোই ওষুধ দেন। সাধারণ রকমের অসুখে প্রয়োগ করার মতো কিছু ওষুধপত্র এই জাহাজের কোন এক প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত আছে। কাপ্তানের উপর, কোম্পানির উপর চেরীর রাগ ক্রমশ বাড়তে থাকল। অথচ চেরী ফোকসালের দিকে হেঁটে যেতে পারছে না। গত রাতের ঘটনাসকল চেরীকে সঙ্কুচিত করছে। যেন এই মুখ সুমিত্রকে দেখানো চলে না। যেন সুমিত্রর ফোকসালে ঢুকলে সে দুঃখবোধ করতে পারে। গত রাতের দুঃসহ অপমানের কথা নিশ্চয়ই সে ভুলে যায় নি। সুতরাং কি ভেবে চেরী নিজের কেবিনে ঢুকে, ফল তুলে নিল হাতে এবং কাপ্তান-বয়কে ডেকে বলল, যাও, সুমিত্রর কেবিনে এই ফলগুলি রেখে এসো। কিছু বললে বলবে, বাটলার দিয়েছে। অন্য কোন কথা বলবে না।

কাপ্তান-বয় দরজার চৌকাঠ পার হলে চেরী বলল, জ্বর কত এবং কেমন আছে দেখে আসবে।

কাপ্তান-বয় অ্যালওয়েতে হাঁটছিল এবং শুনতে পাচ্ছে, ওকে বেশী নড়াচড়া করতে বারণ করবে। মনে থাকে যেন, অন্য কোন কথা বলবে না।

কাপ্তান-বয় খুব ধীরে ধীরে হাঁটছে। কারণ তখনও চেরী নানা রকমের নির্দেশ দিচ্ছে। —কম্বল গায়ে না থাকলে দিয়ে দেবে। কাপ্তান-বয় সব শুনে হাসল। বস্তুত চেরী আভিজাত্য বেধে ফোকসালের দিকে হেঁটে যেতে পারছে না। কাপ্তান-বয় বুঝল, চেরীর ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। ডেকছাদের নীচে দাঁড়িয়ে একবার পিছন ফিরে তাকাতেই দেখল—দূরে কেবিনের দরজাতে ভর করে চেরী অপলক চোখে কাপ্তান-বয়ের মুখে কোন খবরের প্রতীক্ষাতে মগ্ন। কাপ্তান-বয় এবার সত্বর ছুটে গেল। কারণ ওরও চেরীর দুঃখবোধে মনের কোণে এক স্নেহসুলভ ইচ্ছার রঙ করুণ হয়ে উঠছে।

সিঁড়ি ধরে নামছিল কাপ্তান-বয়। নীচের ফোকসালগুলি সবই প্রায় খালি। কিছু কিছু জাহাজী ডেকে হল্লা করছে। ওরা দেশের গল্পে, বিবিদের গল্পে মসগুল। প্রতি দিনের মতো ফলগুা বেঁধে কেউ কেউ জাহাজে রঙ করছে। কাপ্তান-বয় প্রতি দিনের এই সব একঘেয়েমি দৃশ্য দেখতে দেখতে নীচে নেমে গেল। সুমিত্রর শিয়রে দাঁড়িয়ে কপালে হাত রাখল। ডাকল, সুমিত্র, ওঠ বাবা।

এই সময় ঠাণ্ডা হাত উত্তপ্ত কপালে—সুমিত্রর মনে হল বড় প্রীতিময় এই জাহাজীদের সংসার। দীর্ঘ দিনের সফরে কাপ্তান-বয়কে আপনজনের মতো করে দেখতে গিয়ে চোখে জল এলো। সে ডাকল, চাচা!

কেমন আছ?

শরীরটা বড় ব্যথা করছে।

একটু নুনজল এনে দেব? গরম জল?

গরম জল ভাণ্ডারী দিয়েছে।

কি খেলে?

কিছু না। ভাবছি ভাত খাব না। শরীরটা খুব ঘামছে। মনে হয় ভালো করে ঘাম হলে শরীরটা খুব ঝরঝরে হবে।

যখন কাপ্তান-বয় দেখল শরীরে কোন উত্তাপ নেই এবং যখন বুঝল ফ্লু গোছের কিছু হয়েছে তখন আর বেশি দেরি করল না। পকেট থেকে আপেলগুলো বের করে দিয়ে বলল, নাও খাও। খাবে। কি খেতে ভালো লাগে বলবে। বিকেলে

এনে দেব। তারপর সুমিত্রকে একটু বিস্মিত হতে দেখে বলল, বাটলার দিয়েছে। বড় বড় চোখে তাকাবার মতো কিছু হয় নি।

সুমিত্রর শরীরে কম্বল টেনে দিয়ে কাপ্তান-বয় বাইরে বের হয়ে গেল। সিঁড়ি ধরে উঠছে। সুমিত্র শুয়ে শুয়ে উপরে কাপ্তান-বয়ের জুতোর শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে শুনতে পেল। ওর পোর্টহোলটা খোলা নেই। থাকলেও সে আকাশ দেখতে পেতো না। মাল বোঝাই জাহাজ। সমুদ্রের জলো মাঝে মাঝে পোর্টহোলটাকে ঢেকে ফেলছে। সমুদ্রের এই জল দেখে গত রাতের কিছু কিছু ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারছে সুমিত্র। চেরীর যৌন ইচ্ছা এবং প্রগল্‌ভতা ওর মনে এখনও কামনার জন্ম দিচ্ছে। অথচ সে পারছে না। বার বার এই আত্মঘাতী ইচ্ছা ওকে নিদারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ করছে, রাতে চেরীর কেবিন থেকে ফিরে এসে এই ফোকসালে দীর্ঘ সময় পায়চারী করেছে এবং সকল দগ্ধ যৌন ইচ্ছার প্রতি উষ্মা প্রকাশের জন্য বার বার জাহাজীসুলভ খিস্তি করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চেয়েছে।

বিকালে সুমিত্রর জ্বরটা থাকল না। বাংকে বসে সে—শরীর তার এখন নিরাময়, নিরন্তর এই বোধে খুশি। সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে একটি বেঞ্চিতে বসল। সমুদ্রের হাওয়ায় ওর শরীর প্রাণ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। সে এবার ধীরে ধীরে চার নম্বর ফল্কা অতিক্রম করে ডেক-ছাদের নীচ দিয়ে এলওয়ে পথটাকে দেখল—সেখানে কোন পরিচিত মুখ ভেসে উঠছে না। সেই মুখ, নরম ঘাড় আর তার কোমল মন সুমিত্রর নিঃসঙ্গ এবং পীড়িত শরীরের জন্য বড় প্রয়োজন। এবং গত রাতের 'বেশ্যা' এই শব্দটি গ্লানিকর সুতরাং উচ্চারণে কিঞ্চিৎ সংযত হওয়া প্রয়োজন। তারপর এই মুহূর্তে নিজেকে ছোটলোক ভেবে ক্ষোভ থেকে কিঞ্চিৎ প্রশমিত হওয়া গেলে মন্দ কি? সে ভাবল, সুতরাং আজ রাতে চেরীর দরজার পাশ দিয়ে একবার হেঁটে যাবে। এবং গৃহপ্রবেশের দিনে গিন্নিমার মতো একবার যৌনসংযোগ ঘটাবে—এই নিরন্তর ইচ্ছার জন্য সে এবাব ডাকল—ভাণ্ডারী-চাচা, আমাকে একমগ চা দিন।

ভাণ্ডারী উঁকি দিল গ্যালী থেকে। জাহাজীরা ঘরে ফেরার মতো একে একে সকলে পিছিলে জমছে। ওদের হাতে রঙের টব ছিল। ওরা হাতের রঙ কেরোসিন তেলে মুছে নিচ্ছে। ওরা এবার স্নান করবে। নামাজ পড়বে এবং আহার করবে। তারপর সমুদয় কাজ সেরে ওরা গিয়ে বেঞ্চিতে বসে ন্যক্কারজনক কথাবার্তায় ডুবে ডুবে জল খাবে। সুমিত্র ওদের সকলকে দেখল। ওরা সকলে ওকে এক প্রশ্ন করল, তোমার শরীরটা ক্যামন আছেরে বা? এই সব বলে ওরা ফোকসালে নেমে গেলে ভাণ্ডারী বলল, চা কড়া করে দেব?

তাই দাও।

সুমিত্রর এখন আর কিছু করণীয় নেই। সুতরাং পা ঝুলিয়ে বসে থাকল। শরীরে সমস্ত দিনের সঞ্চিত গ্লানি এই সমুদ্র এবং এক কাপ চা দূর করে দিল। সে এবার জাহাজের অলিগলি না খুঁজলে সোজা দিগন্তে নিজের দৃষ্টিকে নিযুক্ত করে তার দেশ বাড়ির চিন্তা—সেখানে কি মাস, কি ফুল ফুটছে অথবা কোন্‌ ঋতু হতে পারে, দুর্গাপূজার সময় হতে কত দেরী, শেফালী ফুল ছড়ানো উঠোন অথবা বৃষ্টি বৃষ্টি...এবং জাহাজে থেকে থেকে বাংলা দেশের মাস কালের হিসাব ভুলে গেল সুমিত্র। অথবা এই সব চিন্তার দ্বারা দেশের আকাশকে উপলব্ধি করার জন্য আঁকু-পাঁকু করতে থাকল সুমিত্র।

ডেক সারেঙ বলল, তবিয়ত কেমন?

ভালো চাচা। জ্বরটা মনে হয় সেরে গেছে।

কি খেয়েছিলে?

চপাটি খেলাম চাচা।

ভালো করেছ।

রাত্রে দেখি বাটলারকে বলে একটা পাঁউরুটি সংগ্রহ করতে পারি কি না।

অনাদি উঠে এলো। সে বলল, এখানে বসে শরীরে ঠাণ্ডা লাগানো হচ্ছে?

এক্ষুনি নেমে পড়ব। বলে, সুমিত্র অনাদিকে অনুসরণ করে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল। সারেঙের ঘরটা অতিক্রম করে স্টোর রুমের পাশের নির্জন জায়গাটুকুতে দাঁড়িয়ে সুমিত্র ডাকল, অনাদি!

কিছু বলবি?

তুই তো সারাদিন পাঁচ নম্বরের সঙ্গে ডেকে কাজ করছিলি?

হ্যাঁ, তা করছিলাম।

চেরীকে ডেকে বের হতে দেখলি না?

না। তবে এলওয়ে ধরে আসবার সময় দেখলাম চেরী বিছানায় শুয়ে আছে।

কিছু করছে না?

ঘরটা অন্ধকার। দরজা জানলা সব বন্ধ করে রেখেছে।

সুতরাং ভালো মতো দেখিস নি।

না।

সুমিত্রকে দেখে মনে হচ্ছে খুব আশাহত। অনাদি নিজের ফোকসালে চলে গেল এবং পিছনে এসে এ সময় কাপ্তান-বয় ডাকল, সুমিত্র, এই নও তোমার বিকেল এবং রাতের খাবার। বাটলার দিয়েছে।

চাচা, বাটলার এত সদয় কেন আমার প্রতি?

তা আমাকে বললে কি হবে! বরং বাটলারকে জিজ্ঞেস কর। একটু থেমে বলল, তোমার শরীর এখন কেমন?

ভালো চাচা।

বেশী নড়বে না। এ-জ্বর কিন্তু খুব খারাপ। আবার ফিরলে অনেক ভোগান্তি হবে। বলে চলে যাবার জন্য উদ্যোগ করতেই সুমিত্র কেমন যেন সঙ্কোচের সঙ্গে ডাকল, চাচা।

কাপ্তান-বয় মুখ ফিরিয়ে বলল, কি!

আমার যে শরীরটা খারাপ করেছিল, চেরী জানে?

তা আমি কি করে জানব বাপু।

তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে নি?

না। আমি কতক্ষণ থাকি ওর কাছে? কাপ্তান-বয় আর দাঁড়াল না। সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুমিত্র ফোকসালে ঢুকে ফের বাংকে শুয়ে পড়ল। শরীরটা বেশ দুর্বল মনে হচ্ছে। গত রাতের ঘটনাগুলো ওকে এখনও যেন যন্ত্রণা দিচ্ছে। অথচ একবার চেরীর কেবিনে যেতে পারলে সব অস্বস্তির যেন অবসান হত। তবু সে নিজের শরীরে কম্বল টেনে পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। নির্জনতায় ভুগে কেমন বিস্বাদ বিস্বাদ সব। অনাদি পাশের বাংকে শুয়ে বকবক করছে ছোট ট্যান্ডেলের সঙ্গে।

এই সব কথা এবং যৌন আলাপ শুনতে ভালো লাগছে না। ফোকসালের সর্বত্র একই জৈব ঘটনার পুনরাবৃত্তি। মুসলমান বৃদ্ধ পুরুষসকল অযথা বদনা নিয়ে বারবার এই ঠাণ্ডা দিনেও গোসলখানায় ঢুকে স্নান করছে এবং আল্লা আল্লা করছে।

ফোকসালে ফোকসালে এখন অন্ধকার। এবং সন্ধ্যা অতিক্রম করছে বলে সকলে আলো জেলে দিল। কিন্তু সুমিত্রর এই আলো ভালো লাগছে না। আলোটা ওর চোখে লাগছে। সে অনাদিকে আলোটা নিভিয়ে দিতে বলল। এবং এই অন্ধকার এখন ওকে গ্রাস করছে। রাত বাড়ছে। ফোকসালে ফোকসালে জাহাজীরা ভীড় করে আছে। ওরা এবার উপরে উঠবে। ওরা রাতের আহার শেষ করে আবার নীচে নেমে আসবে। তারপর শুয়ে অযথা একটার পর একটা বিড়ি টেনে কখনও সুখটান, কখনও বাড়িতে বিবির মুখ শরীর এখন এই রাতে কোন্ ভঙ্গীতে অবস্থান করছে এবং ঘরে ফিরে বিবির শরীরটা কত প্রকার যৌনসুখের আধার হতে পারে সেটা যেন পরখ করে দেখার বাসনা।

সুতরাং সুমিত্র দীর্ঘ সময় এই বাংকে পড়ে থাকতে পারছে না। রাত যত বাড়ছিল, ঘন হচ্ছিল, তত শরীরের দুর্বলতা যৌনক্ষুধাকে আবেগমথিত করছে। এবং যখন দেখল ফোকসালে ফোকসালে ডেক জাহাজীরা ঘুমিয়ে পড়েছে, এনজিন অথবা ডেক সারেঙের ঘরে আলো জ্বলছে না তখন ধীরে ধীরে সে সিঁড়ি ধরে চোরের মতো পা টিপে টিপে উপরে উঠতে থাকল।

ডেকে উঠতেই শীত শীত অনুভব করল সুমিত্র। অস্ট্রেলীয় উপকূলের যত নিকটবর্তী হচ্ছে তত শীতটা যেন বাড়ছে। তত সমুদ্র যেন শান্ত হয়ে আসছে। আজও সে ডেকে এসে দেখল কেউ কোথাও নেই। মাস্টের আলোগুলি ভূতের মতো রাতের আঁধারে দুলে দুলে ভয় দেখাচ্ছে। ব্রীজে ছোট মালোম পায়চারী করছেন ; ওঁর এখন ওয়াচ নিশ্চয়ই। সুমিত্র আড়াল থেকে দেখল সব এবং খুশি হল। ছোট মালোম পাশের কেবিনে থাকেন। সুতরাং চেরীর কেবিনে কোন শব্দ হলে পোর্টহোল দিয়ে উঁকি মারতে পারেন। সে উত্তেজনায় দাঁড়াতে পারছিল না, চুলোয় যাক ছোট মালোম—সে ছুটে এলওয়ে পথে ঢুকে গেল। এবং চেরীর দরজার উপর ভর করে ছোট ছোট আওয়াজে ডাকতে থাকল, মাদাম, মাদাম! আমি এসেছি। দরজা খুলুন! যেন বলার ইচ্ছা, আমি যথার্থই কাপুরুষ নই। আপনাকে বেশ্যা বলে নিরন্তর আমি দগ্ধ। আমরা সকলেই উনুনের তাপ চুরি করে শরীর গরম করছি। আপনি দরজা খুলুন মাদাম।

চোরের মতো সুমিত্র কড়া নাড়তে থাকল। রাত বলে এনজিনের আওয়াজ প্রকট। সুতরাং এখন কেউ সুমিত্রর কড়া নড়ার শব্দ শুনতে পাবে না। কেউ এদিকে এলে সে এনজিন রুমে নেমে যাবার মতো ভান করে দাঁড়িয়ে থাকবে। বড় মালোমের ঘর পর্যন্ত খোলা নেই। সে আবার কড়া নাড়তে থাকল এবং এ-সময়েই দেখল ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। চেরীর পায়ের শব্দ ভিতরে। চেরী দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। ভিতর থেকে প্রশ্ন এলো, কে! কে?

আমি সুমিত্র, মাদাম। সে আর কিছু প্রকাশ করতে পারছে না। সে উত্তেজনায় অধীর। শরীরের প্রতি লোমকূপে সমস্ত দিন ধরে উত্তাপ সঞ্চিত এবং যেন ভোরের ক্লান্তি সকল উত্তাপকে এখন ফের অবসন্ন করতে চাইছে। সে শরীরে শক্তি পাচ্ছে না। সমস্ত গা পুড়ে যাচ্ছে। গলা ভয়ে শুকনো কাঠ। সে কোন রকমে গলা

ক্ষেড়ে আবার ডেকে উঠল, মাদাম, আমি সুমিত্র।

দরজা খুললে চেরী দেখতে পেল সুমিত্র দরজায় দাঁড়িয়ে ঘামছে। কেবিনের আলোয় মুখের বিন্দুসকল ঝলমল করছে। সুমিত্রর চোখের নীচে কালি পড়েছে; বিশেষ করে গত রাতের সেই যুবকটিকে যেন আর চেনাই যাচ্ছে না। চেরী এবার সুমিত্রর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এলো। পাখা খুলে দিয়ে বলল, বোস। ইজিচেয়ার ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল চেরী। তারপর ধীরে সুস্থে বাংকে বসে বলল, এত রাতে!

সুমিত্র চেরীর কণ্ঠে গত রাতের কোন ইসারাকেই খুঁজে পেল না। এত রাতে! এই শব্দ দ্বারা চেরীর আভিজাত্য বোধ অথবা প্রথম বারের অভিযোগের মতো.. তুমি কেন এই কেবিনে, কি ইচ্ছা শরীরে মনে কাজ করছে, তুমি আমায় মাতাল রমণী ভেবে থাকলে...অসহ্য। এবং আতঙ্কে সুমিত্র চোখ তুলে তাকাতেই দেখল—দুই ঠোঁটে চেরীর ফুল ঝরছে। এই সব দেখে সুমিত্রর বলতে ইচ্ছা হল, মাদাম, আপনি প্রসন্ন হোন। আমাকে আতঙ্কগ্রস্ত করবেন না। ঘুম গভীর হওয়ার জন্য চোখ আপনার ভারি ভারি। মুখটা বেশ ভরে উঠেছে।

চেরী বিছানা থেকে উঠে প্রসাধন করে নি বলে মুখে কোন কৃত্রিমতার চিহ্ন নেই। বিশেষ করে পোর্টহোলের কাঁচ খুলে দিলে চেরীর চুল উড়তে থাকল। সমুদ্রের হাওয়াতে তাজা আপেলের মতো চুলে গন্ধ ছড়াতে থাকল। আর তখনই চেরী সুমিত্রর একটা হাত নিজের হাতে স্থাপন করে কি হচ্ছে মাদাম, আমি যে আর পারছি না। আপনি স্পষ্ট হোন গত রাতের মতো, আমি কাঁপছি, জ্বরে নয় আবেগে। চেরী ওর হাতের নাড়ী দেখল এবং হাতটা পূর্বের মতো যথাস্থানে স্থাপন করে বলল, জ্বর নেই। সুমিত্রর মুখ চোখ নৈরাশ্যবোধে পীড়িত হতে থাকল। যেন বলার ইচ্ছা ছিল, এই দেহ নিয়ে আজ আপনি ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারেন অথবা শরীরে সংস্থাপন করে কোলাহল পূর্ণ জীবনের কোন কালকে অমৃতময় করে রাখতে পারেন—আমার কোন আদর্শ নেই, আমি জাহাজী...তখন চেরী সহসা ওর পায়ের কাছে নেমে হাঁটুগেড়ে বসল। বলল, গত কালের ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত সুমিত্র। মদ খেয়ে আমি বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। তারপর চেরী কিছুক্ষণ ঘনিষ্ঠভাবে প্রার্থনার ভংগীতে বসে থাকল। অথচ তখন সমুদ্রে কোন তরঙ্গ উঠছে না। স্থির। কোন আবেগ চেরীকে মথিত করছে না। চেরী পাশের বাংকে উঠে যাচ্ছে এবং সমজবন্ধ জীবের মতো ব্যবহারে কিঞ্চিৎ সমীহ। সে বলল, রাত জেগে থাকলে শরীর খারাপ করবে। বরং শুয়ে ঘুমোও।

আমার শুতে ইচ্ছা হচ্ছে না মাদাম। ঘুম আসছে না।

শরীরে কোন যন্ত্রণা হচ্ছে না তো?

মাদাম!

কিছু বলবে?

চেরী দেখল সুমিত্রর চোখ দুটো জ্বলছে। সমস্ত শরীর থেকে কামনার আবেগ গলে গলে পড়ছে। স্থিরভাবে তাকাতে পারছে না—যেন অবসন্ন সৈনিক কুয়াশার অন্ধকার থেকে পথ খুঁজে খুঁজে অবিরাম হেঁটে হেঁটে কোন আশ্রমে উপস্থিত। পানীয় জলের মতো যুবতীর চোখ এবং উদগ্র বাসনা নিরন্তর ভোগাচ্ছে সে ফের ডাকল, মাদাম, আপনার শরীর ভালো তো? সুমিত্রর নিজের উপরে এবার যত রাগ —কথা যথাযথভাবে বলতে পারছে না, রাতে এ-ঘরে শয়ন করার বাসনা মাদাম,

এবার একনাগাড়ে কত দিন? দশ মাসের উপর হবে। হোম থেকে কবে বের হয়েছেন—কত কাল আগের যেন সেই সব দিন, সেই সব বন্দর এবং স্ত্রীর কালো দুটো চোখ এখন পোর্টহোলের কাঁচে দৃশ্যমান। শরীরে তার যৌবন নিঃশেষ অথচ প্রেমটুকু আলোক-উজ্জ্বল দিনের মতো। সবই তিনি স্মরণ করতে পারছেন অথচ ডেসী এলো না—ডেক ছাদে কার পায়ের শব্দ। তিনি এবার কম্বল টেনে শুয়ে পড়লেন। কারণ বাইরে তখনও তুষারঝড় হচ্ছে।

বিজন তুষারঝড়ের জন্য চীফ স্টুয়ার্ডের কেবিন এবং অ্যালওয়ের ফাঁকটাতে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকল। এই ফাঁকটুকু থেকে গ্যাঙওয়ে স্পষ্ট। ওর শরীরে এখন ঠান্ডা হাওয়া লাগছে না। জাহাজ কত দিন পর বন্দর পেল অথচ দুর্যোগের জন্য জাহাজীরা কিনারায় নামতে পারছে না। কাল সকালে এবং অপরাহ্ন বেলায় যখন জাহাজীরা একে একে জাহাজ খালি করে বন্দরে রমণী সন্দর্শনের জন্য নেমে যাবে, যখন ওরা কিংস পার্কে অথবা সান্তাক্রুজের চূড়ায় উঠে শহর দেখবে তখন...তখন বিজনের বড় ইচ্ছা এই ঠান্ডায় কোন যুবতীর উত্তাপ, তখন বিজন পাশের কেবিনে বড় পরিচিত শব্দ শুনল। শব্দটা মধুর। শব্দটা ভীষণ উত্তেজনাময়—সে স্থির থাকতে পারছে না। সে ধীরে ধীরে দরজায় কান পেতে শুনতে চাইল—কিছুই শোনা যাচ্ছে না, অস্পষ্ট। সে এ সময় অধীর যুবকের মতো দেয়ালে হাত রাখল।

বিজন এই ফাঁকটুকুতে দাঁড়িয়ে শান্তি পাচ্ছে না। পোর্টহোলের কাঁচে মুখ রাখা যাচ্ছে না। লোহার প্লেটে বন্ধ কাঁচ সর্বত্র এক গোপনীয়তা রক্ষা করছে। সে এই কেবিনের একটা রন্ধ্রপথ খোঁজার জন্য খুব সন্তর্পণে দেয়াল হাতড়ে বেড়াতে লাগল। দরজার পাল্লা ধীরে ধীরে একটু ফাঁক করতে গিয়ে বুঝল দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ভিতরে এবং বাইরে আলো বলে বিজন বুঝতে পারছে না, বিজন এবার বাইরের আলো নিভিয়ে এক ঘন অন্ধকার সৃষ্টি করতেই দেখল পোর্টহোলের উপরে যেখানে স্টীম পাইপ আছে তার পাশে গোলাকার ছিদ্রপথ। সে তাড়াতাড়ি টুলটা গ্যাঙওয়ে থেকে নিয়ে এসে মই বেয়ে ওঠার মতো উঠল। মুখটা কিঞ্চিৎ ভিতরে ঢুকিয়ে দেখল ওরা দুজনই পাশাপাশি শুয়ে আছে। ওরা উভয় রাতের প্রথম প্রহরে বোধ হয় যৌন যন্ত্রণায় মুখর ছিল। এখন শান্ত। এখন ঋজু এবং ঘরণীর মতো ওদের মুখচ্ছবি। কোন অপরাধবোধের চিহ্ন নেই মুখে। যেন কত দীর্ঘ দিনের আলাপ, যেন কত দীর্ঘ দিনের প্রেম এবং সহিষ্ণুতা ওদের গভীর শান্তিতে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বিজন, কম্বলের নীচে ওদের নগ্ন এমন এক ছবির কথা চিন্তা করে টুল থেকে নেমে পড়ল। ওর ওয়াচ শেষ হবে এখন। সুতরাং এই নগ্নতা দর্শনে তৃপ্তি নেই, এতে শুধু উত্তেজনা বাড়ে। মেয়েটির রুক্ষ চুলে সুমিত্রর মোটা শক্ত হাত। অন্য হাতটি কম্বলের নীচে নড়ছিল...কম্বলের নীচে মেয়েটির তলপেটের কাছাকাছি কোথাও ইঁদুরের মতো ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে অথবা যেন শরীরের সকল কুশল চিন্তার কথা ভুলে সারারাত যৌন সংযোগে মগ্ন থাকলে সকল সুখের আকর...বিজন আর ভাবতে পারল না, সে তাড়াতাড়ি টুলটা হাতে নিয়ে কেবিনের পাশ থেকে সরে গিয়ে কিঞ্চিৎ ছুট দিল। সে ছুটতে ছুটতে বড় মিস্ত্রীর কেবিনের পাশে এসে দাঁড়াল এবং বলতে চাইল, স্যার আমি...আমি যথার্থ কথা বলি নি।

এখন বড় মিস্ত্রী দরজা খুললে বলতে হবে স্টুয়ার্ডের ঘরে চটুল রমণী স্টুয়ার্ডকে পতিব্রতা ভার্যার মতো প্রেম এবং সুখ বিতরণ করছে। সুতরাং কাল ভোরে

আপনার দরজার পাশ দিয়ে একজন চটুল রমণী উঁচু হিলের জুতো পরে এবং নিতম্বে রস সঞ্চার করতে করতে জেটিতে নেমে যাবে তারপর আমি অভিযোগের কারণে বিষোদ্গারে জর্জরিত হব—সে ঠিক নয় স্যার। সুতরাং সকল ঘটনার কথা খুলে বলাই ভালো।

সে ডাকল, সাব।

কে বাইরে? কম্বলের ভিতর থেকেই বড় মিস্ত্রী চোখ পিট পিট করে তাকাতে থাকলেন।

আমি স্যার, সুখানী।

ঘরে এসো। শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্ছে।

বিজন দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল এবং বলল, স্যার, আমি যথার্থ কথা বলি নি।

যথার্থ কথা বল নি! তবে আস্তে বল। দরজাটা ভেজিয়ে দাও। বড় ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। বাইরের তুষারঝড়টা মনট্রিলের দিকে যাচ্ছে না তো, অথবা ভ্যান্কুবার থেকে জাহাজ আসার কথা ছিল—ওরা কিছু মেয়ে আমদানী করতে পারে হয়তো।

না স্যার। সে সব কথা আমি বলছি না। আমাদের জাহাজে এই ঝড়ের মধ্যেও একজন মেয়ে উঠে গেছে। মেয়েটা চীফ স্টুয়ার্ডের কেবিনে আছে।

এমত কথায় বড় মিস্ত্রী অবনীভূষণের চোখ গোল হয়ে উঠল। ওঁর বাসি দাড়িগুলি লম্বা হয়ে গেল যেন। তিনি বললেন, এই ঝড়ের রাতে!

আজ্ঞে স্যার।

ভালো কথা নয়।

নয় স্যার।

তুমি দেখলে?

আজ্ঞে দেখলাম স্যার। টুলের উপর উঠে উঁকি দিয়ে দেখতে হল ঘুলঘুলিতে।

ওরা কি করছে? অবনীভূষণ ঢোক গেলার মতো মুখ করে থাকলেন।

বিজনকে কিঞ্চিৎ লজ্জিত দেখাচ্ছে। সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বলল। আমি যাই স্যার।

তুমি তো খুব স্বার্থপর লোক হে। আমি একটু দেখতে যাব ভাবছি আর তুমি কিনা বলছ আমাকে একা ফেলে চলে যাবে!

আমার ওয়াচ শেষ হতে দেরী নেই স্যার।

আরে চল। বলে তিনি কম্বল ছেড়ে উঠে পড়লেন। ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে বললেন, দেখা যাক না ঘটনাটা কেমনভাবে ঘটছে। বুঝলে সুখানী, ডেসী নামে একটি মেয়ে আমার কেবিনে আসার কথা ছিল। সে-জন্য আমার ঘুম আসছে না। আর ডেসী মেয়ের মতো মেয়ে বটে। ডেসী বেশ্যামেয়েদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর। সে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেতে পারে। এক এক রাতে পাঁচটা সাতটা লোককে সে হজম করতে পারে।

তাই বুঝি স্যার! সুখানীকে এ সময় ভয়ানক বোকা বোকা লাগছিল।

একে, দেখে কেমন মনে হল?

স্যার, ওরা এখন শুয়ে আছে। তবে ঘুমোয় নি। ঘুমোলে, কম্বলের নীচে স্যার ইঁদুর নাচত না।

রাত গভীর এবং ঝড়ের গতি বাড়ছে। অ্যালওয়ের দরজা বন্ধ। ঝড়টা ভিতরে ঢুকতে পারছে না। অথচ বাইরে ভয়ঙ্কর শব্দে যেন আকাশ ফেটে পড়ছে। যেন জাহাজের মাস্তুল এবার ভেঙে পড়বে। ওরা দুজনে সন্তর্পণে এনজিন রুমের পাশ দিয়ে হেঁটে চলল, উভয়ে হেঁটে যেতে থাকল। পাশের কেবিনগুলোর দরজা বন্ধ। অবনীভূষণ খুব মদ টেনেছিলেন বলে গতিতে শ্লথ ভাব। অথবা বয়সের ভারে ঠিক মতো যেন হেঁটে যেতে পারছেন না। অবনীভূষণ বালকেড ধরে ধরে হাঁটছিলেন। শরীরের ওজন ভয়ানক, হাত পা শক্ত এবং নিবিড় এক মদিরতা ওঁকে এই গতির ভিতর আচ্ছন্ন করে রাখতে চাইছে।

বড় মিস্ত্রী চলতে চলতে খুব আস্তে এবং জড়ানো গলায় বললেন, আমার শরীরটা কিঞ্চিৎ মোটা হয়ে গেছে। এতবার এনজিন রুমে নামা-ওঠা করি তবু পেটটা নীচু হচ্ছে না। আপদ!

হ্যাঁ স্যর, আপদ!

পেট মোটা থাকলে এই সব ঘটনায় আনন্দ পাওয়া যায় না। তৃপ্তি নেই।

বিজন ভাবল, লোকটা মদ খেয়েছে বলে এত কথা বলছে। কারণ সুখানী জানত দিনের বেলাতে বড় মিস্ত্রী অবনীভূষণ গোমড়া মুখো। কোন কথা নেই—তিনি চুপচাপ এনজিনে নেমে যান অথবা বাংকে শুয়ে শুয়ে অশ্লীল সব বই পড়েন। অথবা ব্রীজের নীচে ছোট একটা ডেকচেয়ারে বসে পাইপ টানতে টানতে দূরের বন্দর, পাইন গাছ এবং সমুদ্র দেখেন। কোন কথা বলেন না, কোন হাসি-ঠাট্টা করেন না জাহাজীদের সঙ্গে। তখন তিনি যথার্থই বড় মিস্ত্রী জাহাজের।

বিজন একটু থেমে বলল, স্যার, টুলটা নিয়ে আসি। টুলটা না নিলে ঘুলঘুলিতে মুখ রাখা যাবে না।

কেবিনের আলো এবং একটি ক্যালেন্ডারের পাতায় সুন্দর এক হ্রদের দৃশ্য অথবা অ্যালওয়ে পার হয়ে অন্য অফিসারদের কেবিন, স্টোর রুম এবং ডাইনিং হল অতিক্রম করে চীফ স্টুয়ার্ডের ঘর—বাংকে বেশ্যা রমণীর সুন্দর চোখ, সবই কৌতূহলোদ্দীপক। সে আগে আগে চলতে থাকল। কোন কথা বলল না। অন্য কেবিনে যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাল না।

বিজন ফিস ফিস করে বলল, এসে গেছি।

সে টুলটা বালকেডের পাশে সন্তর্পণে রাখল। বলল, এবারে উঠুন স্যার। সে আঙুল দিয়ে ঘুলঘুলি নির্দেশ করে দিল।

আমাকে উঠতে সাহায্য কর। বড় মিস্ত্রী অবনীভূষণের শরীর ভয়ানক রকমের মাতাল। তিনি কুকুরের মতো উত্তেজনাতে হাঁসফাঁস করছেন।

বিজন অ্যালওয়ের আলোটা নিভিয়ে দিল। বাইরে ঝড় এবং ঝড়ের গতি বাড়ছে। সুতরাং ওদের কথাবার্তার শব্দ বড়ো হাওয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বড় মিস্ত্রী ফস্ করে লাইটার জ্বালিয়ে একটা চুরুট ধরালেন। ওদের মুখ এখন বীভৎস রকম দেখাচ্ছে।

বিজন বলল, স্যার, এক কাজ করবেন?

এখন কোন কাজের কথা নয়, সুখানী তুমি বড় বেশী কথা বল।

বিজন কোন জবাব ছিল না অথচ মনে মনে গাল দিল।

দেখ সুখানী, আমার ভাড়া করা স্ত্রী যদি কাল জাহাজে আসে, তুমি আবার এ সব ঘটনার কথা বলে দিও না। মেয়েটি খুব সুন্দর। বছর পাঁচেক আগে নাইট-

ক্লাবে ওর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বুঝলে সুখানী, তুমি তো মদ খাও না অথচ মেয়েমানুষের শরীর পেলে পেটুকের মতো কথাবার্তা বল।

বিজন বলল, স্যার, আপনি আমার ওপরওয়ালার ওপরওয়ালা। আপনার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে ভয় হয়।

সুখানী, আবার তোমার সেই বেশি কথা।

সুতরাং ভয়ে ভয়ে বিজন টুলটা ধরে রাখল। অ্যালওয়ে অন্ধকার বলে ওরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে না।

আমাকে টুলে উঠতে সাহায্য কর। ফের ধমক দিলেন বড় মিস্ত্রী।

চীফ টুলের উপর উঠে সেই ঘুলঘুলিতে চোখ রাখতে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে তিনি এই হাল্কা টুলে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবেন না। শরীর টলছিল। তিনি একটি শক্ত টুল অন্বেষণ করলেন। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, শক্ত টুল নেই সুখানী?

আছে স্যার। কসপের ঘরে একটা শক্ত টুল আছে। কসপকে ডেকে তুলব?

না, দরকার নেই। বেশী হৈ চৈ করো না, সকলে কুকুরের মতো এখানে এসে ভিড় করবে। এবং কাপ্তান জানলে রাগ করবেন।

বড় মিস্ত্রী এবার টুল থেকে নেমে পড়লেন। ফিস ফিস করে বললেন, বরং তুমি দেখ ওরা কি করছে। যা দেখবে, সব বলবে। কিছু লুকোলে আমি ধরতে পারব।

বিজন টুলের উপর উঠে ঘুলঘুলিতে চোখ রাখল। গরম হাওয়া ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে। স্টুয়ার্ড এবং মেয়েটি সন্তর্পণে এখন কি যেন লক্ষ্য করছে। খরগোসের মতো ভীত চোখ নিয়ে কি যেন দেখছে। ওরা তাড়াতাড়ি উঠে বসল। ওদের শরীরে কোন আবরণ নেই। ওরা পরস্পর কি বলছে ধরতে পারছে না বিজন।

বিজনকে কিছু বলতে না দেখে বড় মিস্ত্রী ক্ষেপে গেলেন। —সুখানী, তুমি নেমকহারাম, পাজি। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বলছেন। —তুমি নিজে সব দেখছ অথচ আমাকে কিছু বলছ না।

স্যার, ওরা এখন উঠে বসল।

তারপর সুখানী?

ওরা বোধ হয় টের পেয়েছে।

মেয়েটি দেখতে কেমন সুখানী?

রোগা স্যার। মেয়েটি এখন আবার কম্বল টেনে শুয়ে পড়ল।

চীফ স্টুয়ার্ড তখন ভিতরে মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বলছিল, মর্লিন, কারা যেন বাইরে কথা বলছে। যদি টের পায় তবে নিশ্চয় হামলা করবে।

মর্লিন উঠতে চাইল না। বলল, শরীরে ভয়ানক কষ্ট। বাইরে ঝড়, নতুবা চলে যেতাম, সুমিত্র।

সুমিত্র খুব দুঃখের সঙ্গে একটা হাত ওর স্তনের নীচে রাখল এবং কাছে টানল। বলল, অ্যালওয়েতে এখনও যেন কারা চলাফেরা করছে। কথা বলছে। অনেকক্ষণ থেকে এটা হচ্ছে। দরজা খুলে দেখব?

এই সুখানী, হারামজাদা! তুমি আমাকে বাগে পেয়ে খুব কলা দেখাচ্ছ হে।

স্যার, ওরা কিছু করছে না।

নিশ্চয় করছে। তুমি আমায় মিথ্যা কথা বলছ।

ভেতরে মেয়েটি বলল, না, আমার শরীর ভালো নেই সুমিত্র। ঠাণ্ডায় জমে গেছিলাম। এই ঘর আমাকে উত্তাপ দিচ্ছে। আমি আজ আর একটি লোককেও সামলাতে পারব না। সে অন্য পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করল। চীফ স্টুয়ার্ড সুমিত্র হাঁটু ভাঁজ করে রাখা মেয়েটার নিতম্বের নীচে এবং বুকে হাত রেখে ঘন হয়ে শুতে চাইল। অথচ শান্তি পাচ্ছিল না। সে ফের উঠে বসল। পোর্টহোল খুলে সমুদ্রের গর্জন শুনতে চাইল। ওর শরীর নগ্ন। ঠাণ্ডা হাওয়া ওকে কাঁপিয়ে তুলছে। স্টুয়ার্ড তাড়াতাড়ি রাতের পোশাক পরে বেসিনে হাত ধুতে গিয়ে শুনল, বাইরে চেঁচামেচি, সুতরাং সে একটা হাই তোলার চেষ্টা করল।

স্যার, আমি মিথ্যা বলছি না।

তুমি আলবৎ বলছ। খুব আস্তে অথচ ক্ষুণ্ণ গলায় বললেন বড় মিস্ত্রী।

বিজন মরিয়া হয়ে বলল, বলেছি তো বেশ করেছি।

বেশ করেছ! তুমি বেশ করেছ! আচ্ছা...এইটুকু বলে বড় মিস্ত্রী কড়া নাড়লেন, স্টুয়ার্ড, দরজা খোল। আমি বড় মিস্ত্রী। কিন্তু ভিতর থেকে কোন শব্দ হল না বলে তিনি ফের বললেন—আমি। স্টুয়ার্ড আমি কোন হামলা করব না। তুমি বললে আমি তিন সত্যি করতে পারি।

তুষরঝড় সকলকেই নিঃসঙ্গ করে রেখেছে। দীর্ঘ দিনের সমুদ্রযাত্রা অতিক্রম করার পর এই বন্দর, বন্দরে আলো অথবা কোন রাস্তার নীচে বেশ্যা রমণীর আপ্যায়ন ওদের জন্য প্রতীক্ষা করল না। বড় সাহেবের ডেসী আসে নি, সুখানী বাইরে গিয়ে একটু মদ গিলতে পারে নি অথবা রমণীর মুখ দর্শন যেন কত কাল পর, কত দীর্ঘ সময় ধরে ওদের নোনা জলের চিহ্ন মুখে—রমণীর নরম নরম মুখ এবং চাপ চাপ অস্বাদন সবই কেন অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত।

এই দিকের কেবিনগুলি ফাঁকা! স্টুয়ার্ডের একমাত্র কেবিন, পরে ডাইনিং হল, সামনে ছোট ঘর অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য ডেকের নীচে মাংসের ঘর তারপর সোজা সব ফাঁকা কেবিন, কারণ এই শীতের অঞ্চলে কোন যাত্রী আসে নি। বারোটি যাত্রী কেবিনে সুতরাং কোন মানুষের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। স্টুয়ার্ড এ সব জেনেই মেয়েটিকে অন্ধকার জেটির উপর থেকে তুলে সিঁড়ি ধরে জাহাজে নিয়ে এসেছিল—কারণ সে জেটি থেকে তখন দেখেছে গ্যাঙওয়েতে কোয়ার্টার মাস্টার নেই, সুতরাং এটাই উপযুক্ত সময়। সে সময়ের সদ্ব্যবহার করেও কোন ফল লাভ করতে পারল না, এত সতর্কতা তবু সব কেমন ফাঁস হয়ে গেল! চিৎকার এবং হামলা আরও বেশী হতে পারে ভেবে সে দরজা খুলে দিল। ভয়ানক শীত এই অ্যালওয়ের অন্ধকারে। কেবিনের আলোতে সে বড় মিস্ত্রীর পাথরের মতো চোখ দুটো দেখল। এই সময় চিফ স্টুয়ার্ডকে অদ্ভুত রকমের তোতলামিতে পেয়ে বসল।

বড় মিস্ত্রী কেবিনের ভিতর ঢুকে গেলেন। বললেন, আমি তিন সত্য করছি, স্টুয়ার্ড, আমি কোন হামলা করব না। আমাকে একটু সুখ দাও। আমি তবেই চলে যাব। কেমন বেহায়া এবং নির্লজ্জ ভঙ্গীতে কথাগুলো বললেন বড় মিস্ত্রী। তিনি ধমকের সুরে বিজনকে ডাকলেন এসো। নচ্ছার সব জাহাজী। এটা তোমার বাড়ি নয় সুখানী! এখানে মা বাবা ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে আসবে না, এসো।

সুখানী ভালো ছেলের মতো বড় মিস্ত্রীকে অনুসরণ করল। সে কেবিনের ভিতর ঢুকল না। সে দরজার একটা পাল্লা ধরে উঁকি দিল মাত্র। স্টুয়ার্ড সব কিছু দেখছে। ভয়ে ওর তোতলামি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। বড় মিস্ত্রীর চোখ

দুটো চক চক করছে এবং হননের ইচ্ছাতে একাগ্র। জানোয়ারের মতো উদগ্র লালসা মুখে, অবয়বে। সে দেখল, বড় মিস্ত্রী চেয়ার টেনে বসেছেন, দেয়ালে বিচিত্র সব নগ্ন ছবি এবং এই বাংকের অন্য পাশে মর্লিন—ওর কোমল ত্বকের গন্ধ অথবা মৃগনাভির মতো নরম কল্জের উত্তাপ বড় মিস্ত্রীকে এতটুকু অন্যমনস্ক করছে না। সে ঘরের ভিতর নিমন্ত্রিত অতিথির মতো বসে থাকল।

মর্লিন কম্বলের ভিতর থেকে উঁকি দিল। ওর সোনালী চুল বালিশের উপর। ওর নীল চোখ শান্ত। বড় মিস্ত্রীর বিদঘুটে শরীর ক্রমশ পাশবিকতায় আচ্ছন্ন হচ্ছে। মর্লিন কম্বলের ভিতর এ সব দেখে ভয়ে গুটিয়ে যাচ্ছে। সে অন্য একটি মুখ দেখল দরজার পাশে। সে মনে মনে বড় মিস্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাইল, ম্যান, আমি জানি তোমাকে নিয়ে কোন্ কোন্ ভঙ্গীতে ক্রীড়াচাতুর্য প্রদর্শন করলে তুমি দুবার তিনবার অত্যধিক চারবার...কিন্তু শরীর ভালো নেই, বড়-কষ্ট এই শরীরে, শরীর মুখ বিবর্ণ এবং ভিতরে ভয়ানক যন্ত্রণায় ভুগছি। তুমি আজকের মতো রেহাই দাও। এই দুর্যোগ যাক, বসন্ত আসুক—তখন তোমার কত টাকা আমার কত গত্তর সব দেখাব। অথচ মর্লিন কিছু বলতে পারছে না। ভয়ে ওর শরীর কেবল গুটিয়ে আসতে থাকল।

সুখানী দেখল, বড় মিস্ত্রী কেমন পাগলের মতো করছেন। পোশাক আল্গা করার সময় তিনি দরজা খোলা কি বন্ধ পর্যন্ত দেখছেন না। সুতরাং সুখানী নিজেই দরজাটা টেনে দিল।

বড় মিস্ত্রী দুটো শক্ত হাত সোনালী চুলের ভিতর ঠেসে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়লেন। তিনি মর্লিনের চুলের ভিতর মুখ গুঁজে দিলেন। মর্লিন মৃতপ্রায় পড়েছিল। বড় মিস্ত্রী কম্বলটা শরীর থেকে বাঁ হাতে ঠেলে দিলেন। ঠোঁট দুটো নীল, বিবর্ণ। ঠোঁট দুটো কামড়ে দেবার সময় দেখলেন, মর্লিন কেমন সাপের মতো পিছলে যাচ্ছে। অত্যন্ত ক্ষীণ গলায় বলছে, ম্যান, আমাকে মেরে ফেলো না। আমি আর পারছি না।

মর্লিনের মুখ থেকে তখন থুথু উঠছিল। বাইরে ঝড়, মাস্টের আলোকগুলো দুলছে। মেসরুমে বাতি জ্বলছিল। মনসুর আসবে এ সময়। ওর এখন ওয়াচ। মনসুরকে ডাকতে হবে। যতক্ষণ না ডাকবে ততক্ষণ মনসুর শুয়ে থাকবে। সুতরাং সুখানী বিরক্ত হচ্ছে। বড় বেশী সময় নিচ্ছে বড় মিস্ত্রী। সুখানী দরজা ঠেলে উঁকি দিতেই দেখল বড় মিস্ত্রী বড় বেশী বেহুঁস। সে ভিতরে ঢুকে পড়ল। মর্লিনের শরীর থেকে সুখানী বড় মিস্ত্রীকে শক্ত হাতে ঠেলে ফেলে দিল। তারপর টানতে টানতে দরজার বাইরে এনে বলল, আপনি দাঁড়ান। বেশী ইতরামি করলে ভালো হবে না। বলে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

বড় মিস্ত্রী অবনীভূষণ অসহায় পুরুষের মতো স্টুয়ার্ডকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখলে কাণ্ডটা, কাল আমি ওকে দেখব।

স্টুয়ার্ড বলল, বড় দুর্বল স্যার। শীতে কষ্ট পাচ্ছিল। আমি জাহাজে তুলে এনেছি। টাকা তো মুফতে দেওয়া যায় না। তাই রয়ে সয়ে একটু সুখ নিচ্ছিলাম।

ওরা দুজনই চুপচাপ বাল্কেডে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল।

স্টুয়ার্ড অত্যন্ত বিচলিত ভাবে কথা বলতে থাকল, স্যার, এটা অত্যাচার হচ্ছে ওর উপর। একটা রুগ্ন মেয়েকে দীর্ঘ সময় ধরে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

তার জন্য আমি কি করতে পারি। বলে, তিনি অ্যালওয়েতে পায়চারী করতে থাকলেন। অন্ধকার অ্যালওয়েতে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সেই থেকে থেকে আগের মতো সমুদ্রগর্জন ভেসে আসছে। তুষারঝড়ের গতি কমছে কি বাড়ছে অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে বড় মিস্ত্রী টের করতে পারলেন না। তিনি দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিরক্ত গলায় বললেন, সুখানী বড় দেরী করছে। স্টুয়ার্ডের দিকে এখন নজর বড় মিস্ত্রীর। স্টুয়ার্ড এখনও কিছু বলছে না।

তোমার নিশ্চয়ই যেতে ইচ্ছা করছে ভিতরে?

স্যার, আপনার কথার উপর আমার কথা বলা সাজে না।

বড় মিস্ত্রী ভাবলেন, এবার কড়া নাড়বেন দরজার। কিন্তু সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল। বিজনকে খুব বিব্রত দেখাচ্ছে। চোখ মুখ উদ্বিগ্ন। বলল, স্যার, ঘরে মদ আছে? মেয়েটা কেমন করছে স্যার! বড় নিস্তেজ, একটু মদ দিলে হত।

সুমিত্র বলল, স্যার, আমি আগেই বলেছি এত ধকল সে সহ্য করতে পারবে না।

বড় মিস্ত্রী চিৎকার করে বলতে চাইলেন, তুমি একটা অমানুষ, সুখানী। অথচ বলতে পারলেন না। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, তুমি একটা পশু, তুমি পশু সুখানী।

স্যার বিশ্বাস করুন, আমি কিছু করি নি।

কিছু কর নি!

না স্যার, শুধু আদর করছিলাম। কিন্তু কেবল দেখছি মুখ থেকে ওর থুথু উঠছে সাদা সাদা ফেনার মতো। আমি বার বার আলোতে মুখ দেখলাম। জল দিলাম খেতে। খেল। ফের ও রকম হতেই দরজা খুলে দিয়েছি। আপনারা আসুন।

স্টুয়ার্ড কথা বলতে পারছিল না। বড় মিস্ত্রী বিমূঢ়। নেশা কেটে যাচ্ছে। এবং তিনি এই সময় সারিবন্ধ উট দেখলেন, ওরা মরুভূমির উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। সারিবন্ধ উটের দলটা একটা নগ্ন মানুষকে উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শুধু। মানুষটার হাত পা বাঁধা। তিনি প্রায় চিৎকার দেবার ভঙ্গীতে বললেন, ওদিকের দরজা বন্ধ করে দাও। আলো নেভাও বাইরের। স্টোর থেকে মদ নিয়ে এসো।

ওরা ভিতরে ঢুকে বাংকের পাশে দাঁড়াল। সবুজ গাউনটা পাশ থেকে তুলে মার্লিনের কোমর পর্যন্ত টেনে দেওয়া হল। সুখানী পায়ের দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে। মার্লিনের বড় বড় চোখ দুটো স্থির। বিবর্ণ। হাত দুটো বুকের উপর। মুখের রঙ জলের সঙ্গে গলে গেছে। সাদা এবং অদ্ভুত এক অবয়বের মুখ যা দেখলে ভয় ভীতি ক্রমশ মানুষকে গ্রাস করে।

বড় মিস্ত্রী বললেন, মার্লিন মরে যাচ্ছে সুখানী।

স্টুয়ার্ড বলল, যথার্থই মরে যাচ্ছে মার্লিন?

বড় মিস্ত্রী পুনরাবৃত্তি করলেন, মার্লিন ম'রে যাচ্ছে সুখানী।

সুখানী বলল, কোন ডাক্তার...?

ও বাঁচবে না। ডাক্তার ডাকলে সকলে ধরা পড়ে যাব।

স্টুয়ার্ড অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাল, স্যার, আমরা ওকে মেরে ফেললাম।

বড় মিস্ত্রী ধমক দিলেন, আস্তে কথা বল। এত বেশী বিহ্বল হবে না। পোর্ট-হোল খুলে দেখ ঝড়ের গতি কি রকম? এবং বড় মিস্ত্রী এই নিশ্চিত মৃত্যু জেনে যেন বলতে চাইলেন, এতটুকু পাশবিকতা যে সহ্য করতে পারে না তার মরাই উচিত।

সুখানী পোর্টহোলের কাঁচ সন্তর্পণে খুলে মুখ গলাবার চেষ্টা করল। বাইরে ঝড়। এবং জলের উপর অন্ধকার। দূরে সমুদ্রের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। একটা জাহাজ দেখল সে বাইরে। জাহাজটা লকগেট দিয়ে বন্দরে ঢুকছে। সে সমুদ্রের বুকে পাহাড়টা দেখল, আলো, ঘর বাড়ি দেখল। জাহাজটা এখন এখানেই নোঙর ফেলবে। সে জাহাজীদের হাড়িয়া-হাপিজের শব্দ এবং যাত্রীদের কোলাহল এই পোর্টহোল থেকেই শুনতে পেল। সে বলল, ঝড় কমে যাচ্ছে স্যার। তারপর বলল, পাশে একটা জাহাজ নোঙর ফেলছে।

বড় মিস্ত্রী হাঁটু গেড়ে বসলেন মার্লিনের পাশে। ওর কপালে মুখে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন। বড় মিস্ত্রী ভিতরে খুব কষ্ট অনুভব করছিলেন। ভয়ানক কষ্ট-বোধে তিনি সুখানীর কোন কথা শুনতে পাচ্ছেন না। স্টুয়ার্ড স্টোর রুমে গেছে মদ আনতে; তিনি ভালো করে মার্লিনের শরীর ঢেকে বসে আছেন। একটু মদ খেলে যদি উত্তেজনা আসে। অথবা বাঁচবার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁর ইচ্ছা হল মেজ মালোমকে ডেকে এই ঘটনার কথা, ওষুধের কথা অথবা কোন বুদ্ধির জন্য...তিনি আর ভাবতে পারছিলেন না। স্টুয়ার্ড এ সময় মদ এনে ওর মুখে ঢেলে দিল, মদটুকু ঠোঁটের কস বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

স্টুয়ার্ড বলল, কি হবে স্যার!

বড় মিস্ত্রী বললেন, জানতে পারলে ফাঁসি হবে।

এই ধরণের কথায় চোখ গোল হয়ে উঠল স্টুয়ার্ডের। সে দ্রুত বলে চলল, আসুন, তবে ওকে পোর্টহোল দিয়ে জলে ফেলে দিই স্যার। কেউ টের পাবে না।

ওকে ভালো করে মরতে দাও। তা ছাড়া বাইরে যাত্রী জাহাজ এসে থেমেছে।

এখন অনেক রাত স্যার। আসুন একে জেটিতে ফেলে আসি।

গ্যাঙওয়েতে সুখানী মনসুর আছে। এই সব ঘটনা কাক-পক্ষীতে টের পেলে পর্যন্ত কপালে দুঃখ থাকে।

কি হবে স্যার? আগে এমন ঘটবে জানলে মার্লিনকে তুলে আনতাম না স্যার। কি কুক্ষণে এই বন্দরে এসেছি। ঝড়, ঝড় শুধু ঝড়।

ওদের ভিতর নানা ধরনের কথা হচ্ছিল। এবং এই সব বিচিত্র-সংলাপ ওদের তিনজনকেই সাময়িকভাবে এই মৃত্যু সম্পর্কে নির্বিকার করে রাখছে। এ সময় ওরা তিনজনই ওর পাশে বসল। বড় মিস্ত্রী বললেন এসো, আমরা তিনজনই ওকে কোলে নিয়ে বসে থাকি। ওর মৃত্যু আমাদের জানুর উপর সংঘটিত হোক—এমত এক আবেগদীপ্ত কথায় অবনীভূষণ চোখ বুজলেন। তাঁর মনেই হল না শরীর থেকে যে সব জাহাজী যন্ত্রণা নেমে এই মেয়েটির দুর্বল শরীরে গরল ঢেলেছে তারা এখনও একই শরীরে বিদ্যমান। তিনি যেন কোন এক উপাসনা গৃহে বসে আছেন এমনই এক গভীর প্রত্যয়ের চোখ। তিনি বললেন, এসো ওকে আমরা শান্তিতে মরতে দিই। কারণ আমরা জানি না ওর নিকট আত্মীয় কেউ আছেন কি না, আমরা কোন পুরোহিতকেও ডাকতে পারছি না, সুতরাং ঈশ্বরের নাম আমরাই স্মরণ করব।

আর এই গৃহই আমাদের উপাসনাগৃহ।

কেবিনের নীল দেয়ালে একটা মাকড়সা অনবরত নীচ থেকে উপরে উঠে যাচ্ছে। ওদের তিনজনের কোলের উপর মার্লিনের মুখ, শরীর। দেয়ালে পা ঠেকে আছে। মার্লিনের শরীর কম্বলে আবৃত। র‍্যাকে ওর ওভারকোট। হাতের দস্তানা নীল রঙের। চোখ দুটো মার্লিনের ক্রমশ সাদা হয়ে আসছে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। ওরা তিনজনই এই মৃত্যুর দ্বারা অভিভূত হচ্ছিল এবং মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে ভাবছিল। ওরা দেখল-চোখ দুটো সাদা হতে হতে একেবারে স্থির হয়ে গেল। একটা ঢেকুরের মতো শব্দ, তারপর মৃত্যু।

ওরা মার্লিনের মৃত শরীর ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বড় মিস্ত্রী পায়চারী করলেন কেবিনে। দেয়ালে শরীর রেখে মার্লিনের মুখ দেখছিল সুখানী। সে একটু হেঁটে গিয়ে কম্বল দিয়ে মার্লিনের মুখটা ঢেকে দিল। স্টুয়ার্ড দেয়ালে টাঙানো নগ্ন চিত্রের ক্যালেন্ডার থেকে—আজ কত তারিখ, কি মাস, কি বছর এবং বন্দরের নামটা পর্যন্ত তুলে আনল। স্টুয়ার্ড, বড় মিস্ত্রী এবং সুখানীর নির্বিকার ভঙ্গী দেখে দুঃখিত হল। সে বলল, স্যার, সারা রাত আমরা মড়া আগলে পড়ে থাকব।

বড় মিস্ত্রী কি ভেবে যেন দরজা খুললেন, এবং বাইরে যাবার উপক্রম করতে সুখানী হাত চেপে ধরল, স্যার, আপনি আমাদের ফেলে চলে যাচ্ছেন।

তোমাদের ফেলে যাচ্ছি না সুখানী। মার্লিনের জন্য বাইরে একটু জায়গা খুঁজতে যাচ্ছি।

সুখানী বলল, দরজা বন্ধ করে দেব স্যার?

দাও। বড় মিস্ত্রী অ্যালওয়ে ধরে হাঁটতে থাকলেন। গ্যাঙওয়েতে মনসুর বসে আছে। তিনি গ্যাঙওয়েতে নেমে যেতেই মনসুর উঠে দাঁড়াল এবং আদাব দিল। তিনি লক্ষ্য করলেন না ও সব। তিনি জাহাজময় ঘুরে জেটিতে, জেটির জলে মার্লিনকে ফেলে রাখবার জন্য জায়গা খুঁজতে লাগলেন। তিনি কোথাও জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি দেখলেন সর্বত্র এক নিদারুণ নিরাপত্তার অভাব। তিনি দেখলেন, সর্বত্রই যেন কে জেগে আছে, ওঁদের এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। এ সময়ে ওঁর ফের মদ খেতে ইচ্ছা হল। কিন্তু এ সময় মদ খাওয়া অনুচিত কারণ মার্লিনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাই এখন একমাত্র কর্তব্য। তিনি তারপর দেখলেন ডেকের উপর থেকে একটা শুকনো পাতা উড়ে উড়ে সমুদ্রের দিকে চলে যেতে থাকল। তিনি ভাবলেন, মার্লিনের শরীরে কোন কোন আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান...মার্লিন একবার ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছিল অথবা পাশবিকতার চিহ্ন এখনও ওর শরীরে বিদ্যমান কি না অথবা সুখানী এবং স্টুয়ার্ড ওর শরীরে মাংস ভক্ষণের মতো কোন উদ্‌গার নিক্ষেপ করেছে কি না, যা ওদের তিনজনকেই গ্রাস করবে তিনি ছুটতে থাকলেন, তিনি তাড়াতাড়ি কেবিনের কাছে এসে ফিস ফিস করে বললেন, স্টুয়ার্ড, দরজা খোল—স্টুয়ার্ড! স্টুয়ার্ড!

কেবিনের দরজা খুললে তিনি ঝড়ের মতো ঢুকে মার্লিনের শরীর থেকে কম্বল তুলে নিলেন। ওর শরীরের শেষ আবরণটুকু খুলে ঝুঁকে পড়লেন শরীরের উপরে। সুখানী এলো, স্টুয়ার্ড এলো। বড় মিস্ত্রী চিবুকের নীচে হাত রেখে বললেন, এই দাঁতের চিহ্ন কার?

সুখানী অত্যন্ত সঙ্কুচিত চিত্তে বলল, স্যার আমার। মার্লিনের সামনে মিথ্যা বলে পাপ আর বাড়াতে চাই না।

বড় মিস্ত্রী তীক্ষ্ম চোখে মার্লিনকে দেখতে লাগলেন। সুখানীর কথার সঙ্গে নিজেও বিড়বিড় করে বললেন, শরীরের এ সব চিহ্ন দেখে পুলিশ ধরে ফেলবে।

স্টুয়ার্ড বলল, স্যার, পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে যাবে!

আমাকেও নেবে। বড় মিস্ত্রী একবার সুখানীর দিকে তাকালেন।

সুখানী বলল, বড় অমানুষিক!

স্টুয়ার্ড বলল, এই তুষারঝড় এ-জন্য দায়ী।

বড় মিস্ত্রী বললেন, পুলিশের ঘরে আমাদের বিচার হওয়াই উচিত। সুতরাং এসো, ওকে এখন আর কোথাও নিক্ষেপ না করে এখানেই ফেলে রাখি।

এই সব কথা বলার পর সকলে দাঁড়িয়ে থাকল। সকলে পরস্পরকে চোখ তুলে দেখল।

স্টুয়ার্ড বলল, স্যার, যা হয় তাড়াতাড়ি করুন।

সুখানীর সঙ্গে তোমার এখানেই ফারাক। এ সব কাজ তাড়াতাড়ি হয় না।

তাড়াতাড়ি হয় না?

না, হয় না।

স্যার আপনি ঠিক কথা বলেছেন।

আমাদের এখন ভাবতে হবে কোন অপরাধই আমরা করি নি। এখন শুয়ে পড়লে ঘুমোতে পারব এমন একটু মনের অবস্থা সৃষ্টি করতে পারলেই এই হত্যা-কাণ্ড থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। যদিও আমরা জানি মনের এমন অবস্থা সৃষ্টি করা অসম্ভব। সুতরাং বেস।

বড় মিস্ত্রী ফের বললেন, একটু কফি হলে ভালো হত। সুখানী কি বলছ।

তা মন্দ নয় স্যার।

স্টুয়ার্ড কিন্তু বের হতে চাইল না। কারণ ওর ভয় কফি আনতে গেলেই ওরা এই কেবিন ছেড়ে চলে যাবে এবং ভোরবেলায় যখন সব জাহাজীরা,—তখনও অন্ধকার থাকবে ডেকে, তখনও সূর্য ভলো করে আকাশের গায়ে ঝুলবে না,—সকল জাহাজীরা ডেক-ছাদ অথবা এনজিনে নেমে যেতে যেতে শুনবে স্টুয়ার্ডের ঘরে একটি তরুণীর মৃতদেহ—কম্বলের নীচে স্টুয়ার্ড মৃতদেহটিকে আগলে রেখেছিল।

স্টুয়ার্ড বলল, স্যার, আমার মাথার ভিতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। তারপর ওদের উত্তর করতে না দেখে বলল, স্যার, আসুন মার্লিনকে পোর্টহোল দিয়ে জেটির জলে ফেলে দি।

যখন লাশ ফুলে ফেঁপে জলের উপর ভেসে উঠবে, যখন দাঁতের কামড় দেখে তোমার দাঁতের চিহ্ন নেবে, তখন..?

কোথাও কোন উপায় নেই।

আপাতত দেখতে পাচ্ছি না।

সুখানী বলল, বড় বিপজ্জনক পরিস্থিতি।

বড় মিস্ত্রী অন্যমনস্কভাবে মার্লিনের দস্তানা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন।

স্টুয়ার্ড যেন ক্ষেপে গেল।—স্যার, আমার কেবিনে এ সব হচ্ছে। আপনারা আমাকে জপাতে চাইছেন। আপনারা যদি আমাকে এ কাজে সাহায্য না করেন আমি একাই ওকে বয়ে নিয়ে যাব। স্টুয়ার্ড তাড়াতাড়ি কম্বলের ভিতর থেকে মার্লিনকে তুলে কাঁধে ফেলল তারপর দরজা দিয়ে বের হতেই বড় মিস্ত্রী ওর হাত চেপে বলল, তুমি কি ক্ষেপে গেলে?

স্টুয়ার্ড এবার কেঁদে ফেলল, স্যার, আপনারা এ ঘটনাকে আমলই দিচ্ছেন না! আমাকে আপনারা ধরিয়ে দিতে চাইছেন। ঘরে আমার স্ত্রী আছে, সন্তান-সন্ততি আছে।

এই সব কথায় তিনি যথার্থই অভিভূত হলেন। তিনি ধীরে ধীরে ওর কাছে এগিয়ে গেলেন। চোখ মুখ উদ্বিগ্ন। এবং অবিবাহিত জীবনের কিছু সুখ দুঃখের কথা স্মরণ করতে পেরে যেন বলতে চাইলেন, স্টুয়ার্ড তুমি, আমি সকলে এক সরল পাশবিকতার মোহে আচ্ছন্ন। কখনও ঘরে, কখনও উঠোনে এবং দূরের যব গম ক্ষেতের ভিতর নগ্ন শরীর আমাদের শুধু কামুক করে তোলে। অথবা এই জাহাজ আমাদের কত দীর্ঘ সময় সমুদ্র এবং আকাশের ভিতর আবদ্ধ করে রেখেছে —শুধু নোনা জল, কখনও প্রবাল দ্বীপ এবং নির্জনতা, জাহাজের অস্থির এনজিনের শব্দ, দেয়ালের উলঙ্গ সব ছবি আমাদের নিরন্তর নিষ্ঠুর করে রাখছে। সুতরাং দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার পর বন্দর এবং রমণীর দেহ স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। মার্লিন মরে গেছে। এসো, ওর শরীর আমরা সযত্নে রক্ষা করি। বন্দরে ঝড়। এ অঞ্চলে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত। দেশটাতে এখন শীতের শেষ-কুয়াশা লেগেই থাকবে। ডেসী এমন দিনে আসবে না।

এতক্ষণ সকলকে চুপচাপ থাকতে দেখে সুখানী মার্লিনের চুল মুঠোর ভিতর তুলে বলল, স্যার দেখুন, এই সোনালী চুল কী অপূর্ব! সুখানী ভাবল, কি ভাবে আর কথা আরম্ভ করা যায়। স্টুয়ার্ড ভয়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদছে। সুখানী দুঃখিতভাবে বলল, এই সোনালী চুলে মার্লিন স্যার সুগন্ধ তেল মাখত। গন্ধটা কিন্তু এখনও জীবিত মেয়েদের মতো। তারপর সে একটা ঢোক গিলে বলল, স্যার, আপনি পর্যন্ত ভয়ে টেসে গেলেন! কথা বলছেন না! চুপচাপ বসে মার্লিনের হাতের দস্তানা আপনার শক্ত হাতে গলাবার চেষ্টা করছেন। স্টুয়ার্ডকে উদ্দেশ্য করে বলল, এসো, তোমাকে লাশটা নামিয়ে রাখতে সাহায্য করছি।

বড় মিস্ত্রী বাংক থেকে নেমে পোর্টহোলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাঁচের ভিতর থেকে পাশের জাহাজ স্পষ্ট। কাঁচ খুলে দিলে জাহাজীদের শব্দ পেলেন। যাত্রীজাহাজ বলেই সেখানে মানুষের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি পোর্টহোলে মুখ রেখে ভাবলেন, এই পোর্টহোল দিয়ে লাশটাকে হাড়িগুঁড়ি করে দেওয়া যাক। স্টুয়ার্ডের ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ কান্না আর ভালো লাগছে না। বস্তুত বড় মিস্ত্রী নিজেও এই মৃতদেহ নিয়ে কি করা যাবে ভেবে উঠতে পারছেন না। তাঁর মাথার ভিতরও শূন্যতা এসে আশ্রয় করেছে। তিনি পোর্টহোলে মুখ রেখেই বললেন, স্টুয়ার্ড, সুখানী, মার্লিনকে কাঁধে নাও। তাড়াতাড়ি পোর্টহোল দিয়ে গলাবার চেষ্টা কর বলে, তিনি পাগলের মতো পোর্টহোলটাকে টেনে টেনে ফাঁক করবার চেষ্টা করতে থাকলেন।

সুখানি বলল, স্যার, আপনারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!

বড় মিস্ত্রী গোল গোল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তবে আমরা কি করতে পারি সুখানী? সমস্ত জাহাজ ঘুরে দেখলাম মার্লিনকে কোথাও রাখা যাচ্ছে না। যেখানেই রাখতে যাব—সেখানেই ধরা পড়ে যাচ্ছি। তারপর তিনি থেমে থেমে বললেন, আহা, ওকে যদি সমুদ্রে নিয়ে যেতে পারতাম! সমুদ্রে ফেলে দিলে কোন চিহ্নই পাওয়া যেত না।

সুখানী বলল, স্যার, তবে আসুন, ওকে বরফ ঘরে রেখে দি। ভেড়া গরুর

সঙ্গে পড়ে থাকবে। কেউ টের করতে পারবে না। জাহাজ সমুদ্রে গেলে ওকে ফেলে দেওয়া যাবে।

বড় মিস্ত্রীর কপাল কুঁচকে উঠল। তিনি আড়চোখে সুখানীর দিকে চাইলেন। যেন, সুখানী এখানে একমাত্র বুদ্ধিমান এবং স্থিরচিত্ত পুরুষ। সুতরাং তিনি ওর উপরই নির্ভর করতে পারেন এমত এক নিশ্চিন্ত মত পোষণ করছেন মনে মনে। তিনি বললেন, স্টুয়ার্ড কি বলে?

স্টুয়ার্ড কোন কথা বলছে না। সুখানী ওদের দুজনকে অনুশাসনের ভঙ্গীতে বলল, তবে আর দেরী করে লাভ নেই। ওকে কাঁধে তুলে নেওয়া যাক।

মর্লিনের হাত পোর্টহোলে গলানো ছিল এবং মাথাটাও। পোর্টহোল থেকে ওর শরীর ঝুলে পড়ছিল। স্টুয়ার্ড ওর কোমর একটু উপরে তুলে রেখেছে। বড় মিস্ত্রী ডানদিকে দাঁড়িয়ে মর্লিনের তলপেটের নীচে হাত রেখে স্টুয়ার্ডকে ধরে রাখতে সাহায্য করছিলেন।

ওরা তিনজনে মিলে মর্লিনকে বাংকে শুইয়ে দিল। ওরা প্রথমেই দরজা খুলে দিল না। সুখানী এখন মঠে দাঁড়িয়ে কোন সেনাবাহিনীকে যেন নির্দেশ দিচ্ছে। সে বলল, স্যার, দরজা খোলার আগে আমাদের কান পেতে শুনতে হবে, বাইরে কোন শব্দ হচ্ছে কিনা। তারপর দরজা খুলে একজনকে ডাইনিং হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অন্য কেউ যদি আসে তবে শিস অথবা হাতের ইসারা। ইতিমধ্যে মর্লিনকে রসদঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর ফের দরজা বন্ধ করে ছাদের ঢাকনা খুলে মর্লিনের লাশ নীচে হাড়িয়া করে দিলেই ভয় থেকে নিষ্কৃতি। সে রাজ্যটা চীফ স্টুয়ার্ডের একান্ত নিজস্ব। এবং আশা করব জাহাজ যত দিন না বন্দর ছেড়ে সমুদ্রে যায় তত দিন স্টুয়ার্ড মর্লিনকে আগলে রাখতে পারবে। তাই বলে সুখানী স্টুয়ার্ডের কাঁধে চাপ দিল।

এনজিন রুমে নেমে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ। অ্যাকোমডেশান ল্যাডার ধরে ডেকছাদে উঠে যাওয়ার পথটাতে বড় মিস্ত্রী কড়া নজর রাখছেন। তাছাড়া ডাইনিং হলের পথটা স্পষ্ট দৃশ্যমান। বড় মিস্ত্রী অ্যালওয়ের আলো নিভিয়ে পাহারাদারদের মতো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এখন বাইরে ঝড় নেই বললেই হয়। এনজিন রুমে কোন ফায়ারম্যান হয়তো ওয়াচ দিতে নেমে যাচ্ছে, বুটের ঠক ঠক শব্দ সিঁড়ি ধরে ক্রমশ নীচে নীচে—তিনি সন্তর্পণে অন্ধকার থেকেই বললেন, এবার তোমরা রসদঘরে ঢুকে যাও। কেউ নেই।

সুখানী মর্লিনের মাথার দিকটা ধরেছিল। স্টুয়ার্ড পায়ের দিকটা ধরে বাইরে নিয়ে এলো। তারপর রসদঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করার আগে ডাকল, স্যার, তাড়াতাড়ি চলে আসুন। অ্যালওয়ের আলো জেলে দিন।

ওরা ধীরে ধীরে মর্লিনকে একটা টেবিলের উপর শুইয়ে দিল। টেবিল থেকে কাঁচের ডিস এবং অন্যান্য সব পানীয়ের পাত্র তুলে অন্য স্থানে রেখে দিল। এই ঘরে অন্যান্য দরজা খুললে জাহাজীদের রসদ, নীচে রসদ ঘর—ভিন্ন ভিন্ন রকমের সব সবজি এবং সবজির গন্ধ আসছে এই ঘরে। ওরা এ সময় মর্লিনের শরীরের উপর ঝুঁকে পড়ল।

স্টুয়ার্ড বলল, কম্বল দিয়ে ঢেকে দি

বরং ওর গাউনটা নিয়ে এসো।

মর্লিনের নগ্ন শরীর ভয়ানক কুৎসিৎ দেখাচ্ছে। বড় টেবিলের উপর ওর শরীর

মৃত ব্যাঙের মতো—হাত পা দুটো শীর্ণ এবং চুলের সেই গন্ধটা তেমনি ফুর ফুরে করে উড়ছে। চোখ দুটো এখনও শুধু স্থির। ওর বুকের পাঁজর স্পষ্ট। স্তনের সর্বত্র মাতৃত্বের চিহ্ন ধরা পড়ছে। স্টুয়ার্ড এবার কেমন শিউরে উঠল। এই শুকনো স্তনের আশে পাশে সহসা সে দেখল জঠরে নিমগ্ন কোন যুবক যেন হাত বাড়াচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি কম্বল এনে ওর শরীর ঢেকে দিল।

ওরা এখন সকলেই কথা কম বলছে। বড় মিস্ত্রী ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, নীচে হাড়িয়া করে দেওয়া যাক তবে। তাড়াতাড়ি বরফ-ঘরে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

স্যার। স্টুয়ার্ড ডাকল।

বল।

আপনি স্যার আমাদের ওপরওয়ালা। আপনি আমাদের সাহস দিন।

যেন এই পশুবৎ আচরণ অথবা নিষ্ঠুর ইচ্ছার দ্বারা প্রহৃত এই যুবতীর সকল অস্তিত্বের করুণা ক্রমশ জাহাজের ঘুলঘুলিতে মুখ রাখছে। দেয়ালে ওদের ছায়া পড়ছিল। সুখানী কেমন বিকৃতভাবে একটা ঢোক গিলে বলল, আমি নীচে নেমে যাচ্ছি। আপনারা উপর থেকে ওকে জলদি হাড়িয়া করুন। এই বিসদৃশ ঘটনা চোখে আর দেখা যাচ্ছে না।

বড় মিস্ত্রী নীচের ঢাকনা খুলে দিল। নীচের ঘরগুলো অন্ধকার। সুখানী সিঁড়ি ধরে নেমে যাবার আগে নীচের আলো জেবলে নিল। স্টুয়ার্ড হাঁটু গেড়ে বসল। নীচের ঘরগুলোতে ভয়ানক ঠাণ্ডা। আলু, পেঁয়াজ এবং শাক-সব্জি এখান থেকে কিছু কিছু চোখে পড়ছে। বরফের ঠাণ্ডা স্রোত সুখানীকে ভয়ঙ্কর কষ্ট দিচ্ছে। সব কিছু ক্লান্তিকর। সে এবার উপরের দিকে তাকাল। বড় মিস্ত্রী হাতের ইশারায় তাকে ডাকছেন।

ওরা তিনজন বড় টেবিলটার সামনে দাঁড়াল। ওরা তিনজন মাথায়, কোমরে এবং পায়ে হাত রাখছে। বড় বড় চিনেমাটির বাসন টেবিলের নীচে, কাবার্ডে টি-সেট সাজানো। মাদক দ্রব্য পানের নিমিত্ত সব পাতলা কাঁচের পাত্র ইতস্তত সজ্জিত। বড় মিস্ত্রী অন্যমনস্ক ছিলেন। পা সরিয়ে আনার সময় কিছু কাঁচের পাত্র ভেঙে নীচে গড়িয়ে পড়ল। কাঁচ ভাঙার শব্দ, টেবিলের উপর বড় দর্পণে তিনজনের প্রতিবিম্ব, মর্লিনের শক্ত শরীর-সবই ভীতিপ্রদ। মর্লিন ওদের দিকে যেন শক্ত চোখ নিয়ে চেয়ে আছে। সুতবাং নিরন্তর এক পাপবোধ ওদের তীব্র তীক্ষ্ণ করছিল।

ওরা এবার মর্লিনকে কোলের কাছে নিয়ে শব-বাহকের মতো সিঁড়ি ধরে নেমে যাবার সময় সন্তর্পণে ছাদের ঢাকনা টেনে খুব ধীরে ধীরে—যেন এতটুকু আওয়াজ না হয় অথবা মর্লিনের গায়ে আঁচড় না লাগে—ওরা মর্লিনকে এ সময় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করছিল। অথচ মর্লিনের শরীর মুরগীর মৃত ঠ্যাং-এর মতো কদর্য এবং কঠিন।* এই আলিঙ্গনের উষ্ণতা ওদের তিনজনকেই ভাবপ্রবণ করে তুলছিল।

মর্লিনের মুখ থেকে সব রঙ মুছে গেছে। চোখে টানা কাজলের চিহ্ন তখন চোখের নীচে এবং ভ্রূর আশেপাশে লেগে আছে। পুতুলনাচের নায়িকার মতো চোখ-মুখ। ওরা মর্লিনকে দরজার সামনে শুইয়ে দিল। বরফ ঘরের তালা খুলে দিল স্টুয়ার্ড—বড় বড় সব মাংস, গরু ভেড়া শুকর এবং গোটা গোটা ধড় হুকের মধ্যে ঝুলছে। অথবা বড় বড় সব টার্কির মাংস—সোঁদা গন্ধ সর্বত্র, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

এই বরফ ঘরে। ওরা তিনজনই ভিতরে ঢুকে তাড়াতাড়ি মার্লিনকে একপাশে রেখে একটা ত্রিপলে ঢেকে বের হয়ে পড়ল। দরজা টেনে সিঁড়িতে ওঠার মুখে প্রথম কথা বলল স্টুয়ার্ড—স্যার, কাল ভোরে যখন চীফ কুক রসদ নিতে আসবে, কি বলব?

রসদ দেবে।

ওরা ঠিক এখানে দাঁড়িয়েই রসদের ওজন দেখে। দরজাটা খোলা থাকলে দেখে ফেলার ভয় আছে।

দরজা বন্ধ রাখবে।

দরজা সব সময় বন্ধ রাখলে সন্দেহ করতে পারে। কারণ মেস-রুম মেট গোস্ত কেটে এনে ওজন করে দেয়।

মেস-রুম মেটকে ভোরবেলায় অন্য কাজ দেব। রসদ ভালো দেবে, ওজন বেশী দেবে। সবাই খুশি থাকবে তবে। কেউ সন্দেহ করবে না।

স্টুয়ার্ড তবু সিঁড়ি ধরে উঠল না। সে বরফঘরের দিকে পিছন ফিরে তাকাল।

সে নড়ছিল না। সে বিড়বিড় করে কি সব বকছিল। সে দরজাটার সামনে হেঁটে গেল। দরজা খুলতেই দেখল পা-টা মার্লিনের খালি। সে ত্রিপল দিয়ে পা-টা ঢেকে দরজা বন্ধ করে তালাটা লাগাল। তালাটা টেনে দেখল ক-বার। যখন দেখল তালাটা ঠিকমত লেগেছে—কোথাও কোন গোপন বিশ্বসভঙ্গ উঁকি দিয়ে নেই অথবা যখন সবই অতি সন্তর্পণে সংরক্ষিত হল ..আর কি হতে পারে, স্টুয়ার্ড এই সব ভেবে সন্দেহের ভঙ্গীতে বলল, স্যার, এটা আমার ভালো লাগছে না। অর্থাৎ এখন মনে হচ্ছে যেন স্টুয়ার্ড নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ছে।

এতক্ষণ পর মনে হল, বড় মিস্ত্রীর, গলাটা শুকনো ঠেকছে। এতক্ষণ পর একটা চুরুটের কথা মনে হল। তিনি চুরুটে আগুন দিয়ে বললেন, কেন, কি হতে পারে?

সুখানী মুখ বিকৃত করে বলল, ওর কথা বাদ দিন স্যার।

সুখানী যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না।

বেশ চুপ করে থাকলাম।

স্টুয়ার্ড বলল, আর একবার নামলে হয় স্যার।

কেন? আবার কেন?

দেখতাম কোথাও কিছু পড়ে থাকল কি না। স্টুয়ার্ডকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। যেন এই হত্যার জন্য ওকে সকলে দায়ী করে সরে পড়ছে। সে বলল, স্যার, ধরা পড়লে আমি সকলের নাম বলে দেব। কাউকে ছাড়ব না। আপনারা সকলেই ওকে কামড়েছেন।

বড় মিস্ত্রী ধমক দিলেন, স্টুয়ার্ড, তোমার মন অত্যন্ত ছোট।

স্যার, আমার অবস্থা বুঝতে পারছেন না। আপনারা কাল থেকে যদি এমুখো না হন তবে কি করতে পারি! স্টুয়ার্ডের গলায় কান্না ভেসে উঠল।

সুখানী পায়ের নখে ডেকের কাঠে আঁচড় কাটবার চেষ্টা করছিল। বড় মিস্ত্রী স্টুয়ার্ডের মুখ দেখছেন। সে মুখ বিবর্ণ। তিনি এবার স্টুয়ার্ডের হাত ধরে বললেন, রাতে আমরা কোথাও যাব না স্টুয়ার্ড। ছাদের নীচে বরফ ঘরে মার্লিনের পাশে বসে থাকব। কোন ভয় নেই তোমার।

ওরা তিনজনই এবার যার যার কেবিনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। স্টুয়ার্ড

নিজের কেবিনের দরজা খুলে দিল। দরজার পাল্লাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। সে দরজা বন্ধ করতে যেন সাহস করছে না। ওর ভয় করছে। এতদিনের জাহাজী জীবন অথচ কখনও এমন নিষ্ঠুর ঘটনার সে সাক্ষী থাকেনি।

বড় মিস্ত্রী কিছু বলতে পারছেন না। তিনি খুব ধীরে ধীরে হেঁটে চলে যাচ্ছেন।

সুখানী বলল, শুয়ে পড় স্টুয়ার্ড। রাত আর বেশী নেই।

সুখানীর ঘর ডেক পার হলে। সে ফোকসালে থাকে। জাহাজের শেষ দিকটাতে জাহাজীদের জন্য অনেকগুলো ঘর। সুখানী এবং ডেক-কসপ সেখানে থাকে—পাশাপাশি বাংকে।

সুতরাং সুখানী বাইরে এসে দেখল, রাত শেষ হয়ে আসছে। সুখানী হাতের দস্তানা খুলে ফেলল। রাত শেষ হচ্ছে। বরফ পড়ছে না। ঝড় নেই। এক শান্ত নীল রঙ জাহাজের শরীরে যেন লেপ্টে আছে। কুয়াশা নেই। সুতরাং শহরের আলো স্পষ্ট। আকাশে ইতস্তত নক্ষত্র জ্বলছে। যে সব জাহাজ উষ্ণ স্রোতে সমুদ্রে মাছ ধরতে বের হয়েছিল ওরা একে একে ফিরে আসছে। সে এই শীতের ভিতর রেলিঙে ভর করে দাঁড়াল। রাতের সব ঘটনা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। দেশ বাড়ির কথা মনে হল। স্ত্রীর কথা মনে হল—সন্তান সন্ততি অর্থাৎ এক সুনিপুণ সাংসারিক জীবনের কথা ভেবে এই জাহাজী জীবনকে ধিক্কার দিতে থাকল। প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, হৃদয়ের ঘরে সব মরে গেছে, কারণ এই মৃত্যুজনিত বেদনা সুখানীকে আড়ষ্ট করছে না, মর্লিন মরে গেছে—জাহাজের অন্যান্য জাহাজীরা ঘুমে মগ্ন, শুধু ওয়াচের জাহাজীরা জেগে ওয়াচ দিচ্ছে। যদি পুলিশ খোঁজ করতে আসে, যদি এই হত্যাজনিত দায়ে একটা লম্বা দড়ি ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে...সুখানী ভয়ে নিজের গলাটা চেপে ধরল এবার। তারপর আরও সব ভয়ঙ্কর দৃশ্যের কথা ভেবে সে চুপি চুপি স্টুয়ার্ডের কেবিনে ফিরে যাবার জন্য পা চালাল। এক দুরারোগ্য ভয় সুখানীকে নিঃসঙ্গ পেয়ে জড়িয়ে ধরছে।

সে স্টুয়ার্ডের কেবিনে এসে দেখল, দরজা খোলা। পাল্লা ধরে স্টুয়ার্ড আগের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সে ডাকল, এই! এই! হচ্ছে কি। এবং মনে হচ্ছে বজ্রজনিত মৃত্যু। সুখানী ওকে নাড়া দিল বারবার। এবং স্টুয়ার্ডকে টেনে নিল বাংকের কাছে ; তারপর ধমক দিয়ে বলল, কি হচ্ছে এটা! এমন ভীতু লোকের জাহাজী হওয়া চলে না। চুপচাপ শুয়ে থাক। এমন করবে তো খুন করব।

সুখানী ঘুরে গিয়ে বড় মিস্ত্রীর কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল। কেবিনের দরজা খোলা। বড় মিস্ত্রী একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে আছেন। শরীরে কোন জীবনের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না।

সুখানী ডাকল, স্যার, দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন।

বড় মিস্ত্রী টেবিল থেকে নড়লেন না।—দরজাটা টেনে দাও সুখানী। বড় মিস্ত্রী টেবিল থেকে মাথা তুললেন না। মর্লিনের সাদা চোখ ওঁকে তখনও অনুসরণ করছে যেন। তিনি কেবিনে পায়চারী করতে থাকলেন। রাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পায়চারী করার ইচ্ছা। ভোরের বাতাসে পাখিরা যখন উড়বে, যখন কোথাও কোন হত্যা অথবা রাতের দুর্ঘটনজনিত দুঃখ মাস্তুলের গায়ে লেগে থাকবে না, তখন বড় মিস্ত্রী বাংকে শুয়ে ঘুম যাবার চেষ্টা করবেন।

কিন্তু অধিক সময় তিনি পায়চারী করতে পারলেন না। তিনি বাংকে শুয়ে

পড়লেন।

সুখানী ডেক ধরে হেঁটে চলে গেল। সে নিজের ফোকসালে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকল। আলো জ্বালল না। দরজা বন্ধ করে পোর্টহোল খুলে সামনে মুখ রেখে বসে থাকল। রাতের সব পাখিদের দেখে ইতস্তত ছড়ানো নাবিকদের সব ছবি দেখে এবং দূরের জেটিতে একটি শিশুর কান্না শুনে ওরও মর্লিনের জন্য কষ্ট হতে থাকল!

ওরা তিনজন জাহাজের তিনটি ঘরে পোষা পাখিদের মতো ঘুমোচ্ছিল। বরফ ঘরে মর্লিন। ত্রিপলে শরীর ঢাকা পড়ে আছে। অন্যান্য কেবিনে দীর্ঘ দিন পর রাতের এই প্রহরটুকুকে জাহাজীরা আস্বাদন করছে। ঠাণ্ডার জন্য সকলেই কেমন কুঁকড়ে ছিল। কোয়ার্টার মাস্টার গ্যাঙওয়েয়ের ওয়াচ শেষ করে ফোকসালে ফিরে আসছে। ভোরের আলো ফুটে উঠলে সকলে রেলিঙে ভর করছে—জেটি অতিক্রম করে শহরের বাস ট্রাম এবং রমণীদের প্রিয়মুখ...তারপর মাটির স্পর্শের জন্য উদ্বিগ্ন এক জীবন...আহা এই দেশ, মাটি, পাব, নাইট ক্লাব—সুখ শুধু সুখ, উলঙ্গ এক চিন্তা সব সময়ের জন্য—জাহাজীরা দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার পর সুখ নামক উলঙ্গ এক নগরে হাঁটছে যেন।

ওরা তিনজন পোষা পাখির মতো স্বপ্ন দেখল।

বড় মিস্ত্রী স্বপ্নের কোলাহলে এক অপার্থিব দৃশ্য দেখে অনেক দূর চলে যেতে থাকলেন। তিনি দূরে সব চীনার গাছ দেখলেন, আকাশ দেখলেন অথবা দেখলেন পাইন আপেলের নীচে সুন্দরী রমণীগণ নগ্ন হয়ে বসে আছে। তিনি বড় বড় চীনার গাছ ফাঁক করে চলে যাচ্ছেন। ডেইজী ফুলের গন্ধ কোথাও এবং সামনে সেই উলঙ্গ নগর। তিনি পোশাক পরিত্যাগ করে সেই নগরে প্রবেশ করে কেবল হ্যাঁচ্চো দিতে থাকলেন।

বড় মিস্ত্রী স্বপ্নের ভিতব বিগত জীবনের কিছু মহত্তম ঘটনা দেখতে পেলেন।

সুখানী স্বপ্ন দেখল—একটা উট মরুভূমি থেকে নেমে আসছে। ওর সঙ্গে দড়ি দিয়ে এক উলঙ্গ নারীকে বেঁধে রাখা হয়েছে। বরফঘরে ছাল তুলে নেওয়া গরু অথবা শুকরের মতো দেখাচ্ছে রমণীকে। উট দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এক মরূদ্যানে প্রবেশ করল। সামনে নীল হ্রদ। হ্রদের জলে উট নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যুবতী প্রাণ পাচ্ছিল। যখন খেজুর গাছের পাতাগুলো সবুজ গন্ধ ছড়াচ্ছিল তখন সুখানী দেখল যুবতী সেই উটের পিঠে বসে এবং হাজার হাজার পুরুষ সেই যুবতীর জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত হচ্ছে। যুবতী বসে বসে প্রেমের আধার থেকে কণা মাত্র বিতরণ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুখানী ফের যখন উটটিকে দেখল তখন স্বপ্নের ভিতর উটটি চলাফেরা করছিল—উটের পায়ে দড়ি এবং দড়িতে রমণীর শরীর আবদ্ধ। সেই এক ঘটনা বার বার চোখের উপর পুনরাবৃত্তি হতে থাকল।

সুখানী স্বপ্নের ভিতর শেষ পর্যন্ত এলবিকে দেখল। এলবির সকরুণ চোখ এবং কান্না স্বপ্নের অলি গলি থেকে বের হয়ে আসছে।

আর স্টুয়ার্ড একটা মৃত কৃমি হয়ে বাংকে পড়েছিল। নড়ছিল না। সাদা ক্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। অথচ ওর স্বপ্নে একটা তাজা গোলাপ ফুল ফুটে ছিল সব সময়। চেরী নামক এক যুবতীর মুখ সেই ফুলের ভিতর থেকে বার বার উঁকি দিচ্ছে। সে শুয়ে শুয়ে ঢোক গিলল। ওর স্বপ্নের শেষটুকুতে ছিল একটি

পুরুষ-অশ্বের নীচে শুয়ে একটি নগ্ন যুবতী বার বার সহবাসের চেষ্টায় ব্যর্থ হচ্ছে।

তারপর জাহাজে ভোর হল। সকলেই উঠে পড়ল একে একে। এখনও জাহাজ-ডেকে অন্ধকার আছে। সারেঙ সকলকে বলল, টান্টু। ওরা উপরে উঠে এলো। ওরা জল মারতে আরম্ভ করল ডেকে। এনজিনের জাহাজীরা এনজিন সারেঙের সঙ্গে নীচে নেমে গেল। বয়লারের স্মোকবক্স পরিষ্কার করার জন্য কয়েকজন কোলবয় তরতর করে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। মেজ মিস্ত্রী একবার নীচে নেমে ব্যালেস্ট পাম্পের আশে পাশে টর্চ মেরে কি যেন অনুসন্ধান করে গেছেন—উপরে এখন ডেক-জাহাজীরা ডেকে জল মারছে। রাতে যে তুষারঝড় হয়েছিল জল মেরে তার শেষটুকু যেন পরিষ্কার করে দিচ্ছে। একটু বাদে আলো ফুটবে। এবং রোদ উঠবে।

ডেক-জাহাজীরা গাম্-বুট পরে জল মারছিল। হিমেল হাওয়া সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। জেটি অতিক্রম করলে বালিয়াড়ী। এ দেশে এবার বসন্ত আসছে। বালির চরে নতুন ঘর উঠছে। কার্নিভেল বসবে। গাছের পাতাসকল কুঁড়ি মেলেছে। ডেক-জাহাজীরা এই শীতের ভিতর রোদের উষ্ণতার জন্য প্রতীক্ষা করছিল এবং তীরের দৃশ্যসকল দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার গ্লানি মুছে দিচ্ছিল।

ঠিক এ সময়েই স্টুয়ার্ড দরজা খুলে দেখল ভোর হয়ে গেছে। ওর স্বপ্নের কথা মনে হল এবং মনে হল ভাণ্ডারী, চীফ কুক আসবে রসদ নিতে। তারপর গত রাতের মার্লিন, মৃত্যু এবং হত্যাজনিত দায়—সবকিছু ওকে ফের গ্রাস করতে থাকল। সে বাথরুমে গেল না, চোখ মুখ ধুল না—রসদ ঘরের ঢাকনা খুলে তরতর করে নীচে নেমে গেল। বরফ ঘরের দরজা খোলার আগে ভাবল, বড় বড় ভালো গোস্ত বাইরে বের করে দরজা বন্ধ করে দেবে। সে মেনুর কথা ভাবল। কি মেনু হবে এমত একটা আন্দাজ করে দরজা খুলতেই সে ভয়ে এবং বিস্ময়ে হতবাক! দেখল, মার্লিনের মুখ খোলা। মার্লিনের মৃত সাদা চোখ ওকে দেখছে। সে সেই ছোট ত্রিপলে মুখ ঢাকতে গিয়ে দেখল পা বের হয়ে থাকছে। সে টানাটানি করল অনেকক্ষণ। কিন্তু পা মাথা একসঙ্গে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিতে পারল না।

স্টুয়ার্ড একা বলে হুক থেকে গোস্ত নামাতে দেরী হচ্ছিল। ওর কষ্ট হচ্ছিল খুব। কি করবে কি না করবে ভেবে উঠতে পারছে না। এ'টা অস্পষ্ট আশংকা ওকে সব সময় বিব্রত করছে। ওর গলা শুকিয়ে উঠছে। ছাদে পায়ের শব্দ। ভাণ্ডারী চীফ কুক নেমে আসছে। ওদের শব্দ পেয়ে সে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গীতে বসে পড়ল। মার্লিনকে টেনে টেনে বরফ ঘরের বাল্কেডের পাশে নিয়ে গেল। স্টুয়ার্ড দেখল, ওর অনাবৃত দেহের রঙ এবং এই বাসি গোস্তের রঙ হুবহু এক। সে ঝুলানো ষাঁড় গরুর ভেতর থেকে দেখল ওরা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। সে কেমন মাথার ভিতর যন্ত্রণা বোধে অবসন্ন হয়ে পড়ছে। সে দুবার খৃষ্টের নাম স্মরণ করে ভূতের মতো নতুন এক বুদ্ধির আশ্রয়ে চলে গেল—কপিকলটাকে এগিয়ে এনে মার্লিনকে পায়ে গেঁথে হুকে ঝুলিয়ে দিল। সে নীচে বসে সব দেখতে দেখতে ভাবল—এই অনাবৃত শরীরের রঙ নিয়ে মার্লিন এখন গরু ঘোড়া হয়ে গেল। দরজা থেকে মার্লিনের অস্পষ্ট শরীরের রঙ এবং আকার আধপোড়া শূকরের মতো দেখাচ্ছিল। স্টুয়ার্ড বুঝল, এই ঘরের দেয়াল, ছাদ এবং হুকের সর্বত্র একই দুঃখময় নৈরাশ্যে নিমজ্জিত। সে দরজার ভিতর দিয়ে ঝোলানো গোস্তের সঙ্গে মার্লিনের এতটুকু প্রভেদ খুঁজে পাচ্ছে না। সে এবার কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত মনে কাজ

করতে পারল। রসদ বের করে অন্যান্য দিনের মতো কম বেশী করার স্পৃহাতে মেসরুম-মেটকে ডেকে আলু কপির ঘরে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গীতে ঢুকে গেল।

অন্যান্য দিনের মতো চীফ কুকের সঙ্গে স্টুয়ার্ডের বচসা হল না রসদ নিয়ে। চীফ কুক উল্টেপাল্টে গোস্ত দেখল। ওরা রসদ নিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। ডেক ভাণ্ডারী এবং এনজিন ভাণ্ডারীও রসদ নিয়ে উপরে উঠে গেল। স্টুয়ার্ড সকলকে দুটো করে আলাদা ডিম দিয়েছে। চীফ কুককে আলাদা অক্সটেল দিয়েছে। সকলেই মোটামুটি খুশি। ওরা সকলে রসদ নিয়ে উপরে উঠে গেলে স্টুয়ার্ড ফের বরফ ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। অনেকগুলো ঝুলানো মাংসের লাশ অতিক্রম করে মর্লিনের পিঠ এবং মাথার ডান দিকের অংশটা অস্পষ্ট এক শুকরের মাংসের মতো। টার্কির পেটের দিকটার মতো নিতম্বের ভাঁজ। এই ঘরে মর্লিন শুকর ভেড়া অথবা গরুর মতো শরীর নিয়ে এখন হুকে ঝুলছে। শুকনো স্তন এবং অন্য কিছু দেখার জন্যই সে এবার ভিতরে ঢুকে মুখোমুখি দাঁড়াল। মর্লিনের তলপেট সংলগ্ন মুখ, সোনালী চুলে এখনও তাজা গন্ধ, অথচ মর্লিনকে মরা মাংস ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। সে পেটের নীচে হাত বুলাতে থাকল অন্যমনস্কভাবে।

যে ভয়টা নিরন্তর কাজ করছিল স্টুয়ার্ডের মনে এ সময় সেই ভয়টা কেটে যাচ্ছে। সে বলল, মর্লিন, আমরা তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করব। সে প্রদক্ষিণ করার মতো মর্লিনের শরীরটা একবার ঘুরে ঘুরে দেখল। সে বলল, এই নিষ্ঠুরতার জন্য গতকালের তুষারঝড় দায়ী। অথচ মনে হল—নিরন্তব সে তার অপরাধবোধকে দূরে রাখার স্পৃহাতে এমন সব কথা বলছিল। সে নিজের মনেই হেসে বলল, শুধু মাংস ভক্ষণে তৃপ্তি থাকে না মর্লিন।

তারপর সে দরজা বন্ধ করে উপরে উঠে যাচ্ছে।

জাহাজে দৈনিক কাজ জাহাজীরা করে নিচ্ছে। সারাদিন কাজ। দিন ছোট বলে রাতের কিছু অংশও ওদের কাজের ভিতর ঢুকে গেল। সারাদিন কাজের পর এক সময়ে বড় মিস্ত্রী, স্টুয়ার্ড এবং সুখানী একত্রে বসে ছিল। ওরা কেন কথা বলে নি। কারণ রাতে একই দুঃস্বপ্ন এসে এদের জড়িয়ে ধরবে ওরা জানত।

ওরা প্রতি রাতে জাহাজের কেবিনে দুঃখী জাহাজীর মতো বসে থাকত।

একদিন ওদের পোর্টহোলের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ায় সুখানী বলল, বড় সাব, বাইরে রোদ উঠেছে।

বড় মিস্ত্রী বললেন, সুখানী, চল, মর্লিনকে দেখে আসি।

স্যার, ও-ভাবে মর্লিনকে আমি দেখতে পারব না। স্যার, বরং আমাদের পুলিশের কাছে ধরা দেওয়া ভালো। এ ভাবে মৃতদেহের উপর কুৎসিৎ আচরণ করে জাহাজে আমি বাঁচতে পারব না। রাতে স্যার ঘুম হচ্ছে না। যেখানে যখন থাকছি মর্লিন মৃত পাথরের চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকছে।

স্টুয়ার্ড বলল, স্যার, আমার সামনে শুধু ঈশ্বরের থাবা। যেখানে থাকছি সেখানেই গলা টিপে ধরতে চাইছে।

বড় মিস্ত্রী দেখছেন ধীরে ধীরে ওরা তিনজনই ভয়ংকর হয়ে উঠছে। বড় মিস্ত্রী বললেন, রাতে আজকাল একই স্বপ্ন দেখছি—আমার স্ত্রী সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছেন। মৃত। চোখ মুখ পচে গেছে।

সুখানীর চোখ মুখ লাল। ওর শরীর বাংকের উপর হিংস্র থাবা নিয়ে বসে আছে।

বড় মিস্ত্রী স্টুয়ার্ডকে বললেন, স্টুয়ার্ড, মর্লিনকে সন্ধ্যার পর শুইয়ে রাখবে। আমি আর সুখানী শহর থেকে ফুল নিয়ে আসব। ওর পোশাক যেন পরনো থাকে। আমরা মর্লিনকে ভালোবাসার চেষ্টা করব।—সুখানী, তিনি সুখানীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, আমার মনে হয় যদি যথার্থই আমরা মর্লিনকে ভালোবাসতে পারি, যদি মনে হয় মর্লিনের শরীর প্রীতিময়—তখন আমাদের পাপবোধ নিশ্চয়ই কিছুটা লাঘব হবে। কারণ আমরা সকলেই একদিন এ রকম ছিলাম না। আমরা ঘুমোতে পারব। সারারাত কঠিন দুঃস্বপ্ন আমাদের আগলে থাকবে না।

সুখানী বলল, বরং আমাদের জীবনেও কিছু কিছু মহত্তর ঘটনা আছে যা মর্লিনকে ফুল দেবার সময় বলতে পারি।

পাঁচটা না বাজতেই জাহাজ ডেকে রাত নেমে এলো। বাইরে ঠান্ডা। শীত যাবার আগে যেন বন্দরটাকে প্রচন্ডভাবে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ভোরের রোদটুকু এবং আকাশের পরিচ্ছন্নতা এই শীতকে তীব্র তীক্ষ্ণ করেছে। ওরা তিনজন গ্যাঙওয়ে ধরে নেমে গেল। ওরা ওভারকোট পরেছিল, মাথায় ফেল্ট ক্যাপ ছিল ওদের। বড় মিস্ত্রী হাতে একটা স্টিক রেখেছে।

সুখানী সহসা বলল, স্যার, স্টুয়ার্ডের ফিরে যাওয়া উচিত। মর্লিনকে জাহাজে একা ফেলে রাখা উচিত হয় নি। অন্য কেউ যদি ওকে আবিষ্কার করে ফেলে?

বড় মিস্ত্রী বললেন, আরে না! তুমিও যেমন—স্টুয়ার্ড ফাঁক পেলেই ওখানে ঘুর ঘুর করবে এবং ধরা পড়ার সুযোগ করে দেবে।

এ সময় ওরা সমুদ্রের ধারে ধারে কিছু পুরুষ এবং রমণী দেখতে পেল। জেটির জাহাজগুলো অতিক্রম করে ছোট এক মাঠ, কিছু টিউলিপ ফুলের গাছ। বার্চ জাতীয় গাছের ছায়ায় ছায়ায় ওরা হেঁটে যাচ্ছে। সমুদ্রের ধারে সব লাল নীল রঙের বাড়ি। সমুদ্রের জল বাতাসের সঙ্গে উঠে আসছে। ইতঃস্তত ভিন্ন ভিন্ন পাব এবং নাইট ক্লাবের লাল বিজ্ঞাপন। অন্য দিন হলে স্টুয়ার্ড এই সব নাইট ক্লাবে ঢুকে যেত, ওদের উলঙ্গ নাচ দেখে সারারাত কামুক হাওয়ায় ভেসে বেড়াত। সুখানী, পাবের ধারে অথবা রাস্তার মোড়ে পালকের টুপি পরে সং দেখানোর মতো যারা দাঁড়িয়ে থাকত তাদের একজনকে বগলে চেপে বালিয়াড়িতে নেমে যেত—কিন্তু আজ ওরা তিনজনই শুধু দেখছে, ওরা ভালো ফুল কেনার জন্য পথ ধরে হাঁটছে।

বড় মিস্ত্রী স্টুয়ার্ডকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মর্লিনকে জেটির কোন্ জায়গা থেকে তুলে নিয়েছিলে?

জেটির তিন নম্বর ক্রেনের নীচ থেকে।

সুখানী স্টুয়ার্ডকে পুলিশের মতো জেরা করে বলল, সে তখন কি করছিল?

একজন জাহাজীকে সুখ দিচ্ছিল।

কতক্ষণ ধরে?

খুব শীত। সময় আমি হিসাব করি নি।

তুমি ওকে কি বললে?

আমি একটু সুখ চাইলাম।

উত্তরে সে কি বলল?

ওরা উঁচু নীচু পথ ধরে হাঁটছিল। ওরা শহরের বাজার দেখার জন্য এবং ফুল

কেনার জন্য উঠে যাচ্ছে। বড় মিস্ত্রী চলতে চলতে লাঠি ঘুরাচ্ছিলেন, যেন তিনি কুকুরের দৌড় দেখতে যাচ্ছেন। হত্যাজনিত কোন ভয়ই ওদের এখন নেই, এমত চোখ-মুখ ওদের সকলের।

সে বলল, একটু গরম দাও আমাকে, নইলে শীতে মরে যাব।

বড় মিস্ত্রী ধমকের সুরে বললেন, সুখানী, আমরা এই বন্দর-পথ ধরে কোথায় যাচ্ছি?

স্যার, ফুল কিনতে।

কিন্তু গোটা পথটা ধরে তুমি একটা পেটি দারোগার মতো কথা বলছ!

বড় মিস্ত্রীকে খুশি করার জন্য সে বললে, আজ ভোরেও স্যার কাগজ দেখলাম। শহরের কর্তৃপক্ষ মার্লন সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। শহর থেকে একটি মেয়ে গায়েব হয়ে গেল অথচ...

স্টুয়ার্ড নাকের মধ্যে রুমাল ঢুকিয়ে ভিতরটা পরিষ্কার করল। এবং বলল, নিরুদ্দিষ্ট কলামটা দেখেছিলে?

হ্যাঁ, দেখেছিলাম বৈকি। ওতে আছে, এক ভদ্রমহিলার একটি কুকুর নিখোঁজ। কুকুরের যে খোঁজ দিতে পারবে তাকে দশহাজার পাউন্ড পুরস্কৃত করা হবে। স্যার, চলুন, একটা কুকুর ধরে নিয়ে ভদ্রমহিলার কাছে যাই।

ওরা একটা পথের মোড় ঘুরল। এই পথটা একটু অন্ধকার। ওরা ক্রমশ সমুদ্র থেকে দূরে সরে আসছে। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে না আর। বাতাসের সঙ্গে তেমন জলীয় কণাও নেই। আগন্তুক তিনজনকে শহরের পুরুষ ও রমণীগণ দেখছিল। নীল আলো, হিমেল হাওয়া এবং পথের বাস ট্রামের শব্দ, নাইট ক্লাবের সঙ্গীত, কাফে, বার মিলে একটা রহস্যের অন্ধকার যেন এই পথটার ভিতর ঢুকে স্তব্ধ হয়ে আছে। ওরা এখানে থামল। একটা বাড়ির ভিতর থেকে কিছু কুকুরের চিৎকার ভেসে আসছে। ওরা দেখল, উপরে লেখা আছে 'কুকুর ভাড়া পাওয়া যায়।'

ওরা এক সময় একটা সরু লেগুনের পাড় ধরে হাঁটতে থাকল। উঁচু নীচু পথ। সমুদ্র বড় সন্তর্পণে খুব সরু পথ করে শহরের ভিতর ঢুকে গেছে। গতবার ডেসী এবং বড় মিস্ত্রী এখানে নৌকা বাইচ দেখতে এসেছিলেন। ডেসীকে নিয়ে বড় মিস্ত্রী কোন কোন ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন—নৌকা বাইচ দেখার পর লেগুন অতিক্রম করে এক নির্জন স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় একটি বার্চগাছের নীচে অথবা দূরের সব পাহাড়শ্রেণী পার হলে ছোট্ট কিশোরী মেয়ের গ্রাম্য এক পাবে সারাদিন মাতলামি এবং অন্য অনেক সব ছোট ঘটনার স্মৃতি ভিতর থেকে বেয়ে বেয়ে উঠে আসছিল।

বড় মিস্ত্রী, সুখানী এবং স্টুয়ার্ডের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বললেন কারণ যে সেতুটা এই লেগুনকে সংযুক্ত করছে সেখানে হরেক রকম যুবক যুবতী লেগুনের জলে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করছে এবং প্রেম নিবেদন করছে। দূরে পাহাড়শ্রেণী, মাথায় লাল নীল অজস্র আলো। লেগুনের নীল জলে সরু সরু স্কীপ বাঁধা। ছই আছে এবং অনেকটা ঘরের মতো—যেখানে ইচ্ছা করলেই কোন বেশ্যা রমণীকে নিয়ে রাত কাটানো যায়। ডেসী এবং বড় মিস্ত্রী অনেকবার এই সব স্কীপে রাত কাটিয়েছেন —ওদের দুজনকে আজ তিনি এ কথা জানালেন। জাহাজে রোজ রোজ ডেসী যাচ্ছে আর রোজ রোজ তিনি তাড়িয়ে দিচ্ছেন—এ কথাও জানালেন। নির্মল এই আকাশ,

মাথার উপর পাহাড়-শ্রেণীর অজস্র আলো এবং দূরের কোন গ্রাম্য পাবের কিশোরী এক বালিকার মুখচ্ছবি—বড় মিস্ত্রীকে প্রাণ খুলে কথা বলবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিল।

বড় মিস্ত্রী বললেন, কি ফুল কিনবে?

ওরা তখন সেতু অতিক্রম করে নীচে বাজারের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

সুখানী বলল, রজনীগন্ধা দিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু এখানে তা পাওয়া যাবে না।

সুখানী একটা ফুলের নাম মনে আনার চেষ্টা করছিল। অথচ কিছুতেই সে নামটা স্মরণ করতে পারল না। ফুলগুলি এ অঞ্চলে পাওয়া যায়, ঠিক রজনীগন্ধারই মতো। ফুলগুলির গায়ে মোমের রঙ অথবা যেন কাঁচ আঙুরের স্তবক এবং সুগন্ধময়। সে ভাবল, সেই সব ফুলের ষ্টিক কিনে নেওয়া যাবে।

ওরা বাজারে ফুলের গলিতে ঢুকে গেল।

স্টুয়ার্ড বলল, স্যার, আমরা ব্যবহারে যথার্থই মানুষের মতো হবার চেষ্টা করব। আমরা মদ খাব না এই ক-দিন।

এটা ভালো প্রস্তাব বটে। বড় মিস্ত্রী মাথা নাড়লেন।

ওরা ফুল নিয়ে জাহাজে উঠে গেল এক সময় এবং ভালোবাসার অভিনয় করার জন্য নাটকের প্রথম অঙ্কের গর্ভে ঢুকে গেল।

কেবিনে ওরা আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল। দেয়ালের সাদা রঙ কেবল এই কেবিনে শূন্যতা সৃষ্টি করছে। ওরা পরস্পর কিছুক্ষণের জন্য অপরিচিতের মতো মুখ করে বসে থাকল। ওয়াচের ঘণ্টা পড়ছে। সারাদিন জেটিতে যে চঞ্চলতা ছিল, রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নিভে আসছে। দূরে সমুদ্র গর্জন করছে। আকাশ তেমনি পরিষ্কার। এই জাহাজের বুকে নক্ষত্রের আলো এসে নামছে। তিনজন নাবিক বসে থাকল। রাতের নিঃসঙ্গতার জন্য বসে থাকল। ওরা মর্লিনের জন্য মর্লিনের পাশে দুঃখ লাঘবের জন্য বসে থাকল। ওরা আগের মতোই চুপচাপ। দূর থেকে আগত সমুদ্র গর্জন শোনার জন্যই হোক অথবা এই জাহাজের কোন কক্ষে রমণীর মৃত শরীর হুকে ঝুলছে, রমণীর ঘর সংসার, ওদের দুঃস্বপ্ন সকল...মানুষ এক নির্লজ্জ ইচ্ছার তাড়নাতে ভুগছে এই সব চিন্তা, তারপর সমুদ্র অতিক্রম করে সেই প্রিয় সংসার এবং মাঝে মাঝে পুলিশ নামক এক জন্তুর ডাক...ওরা ভয়ে পরস্পর এখন তাকাতে পারছে না।

স্টুয়ার্ড বলল, আসুন স্যার, একসঙ্গে নামি। একা নামতে ভয় করছে। স্টুয়ার্ড হাতের দস্তানা বের করল বালিশের ভেতর থেকে। ওভারকোট নিল এবং জুতো জোড়া বের করার সময় সুখানী চিৎকার করে উঠল, স্টুয়ার্ড একটা রাস্কেল। স্যার, সে মর্লিনকে হুক থেকে নামায় নি। আমি যাব না স্যার। আমার বীভৎস দৃশ্য সহ্য হবে না।

বড় মিস্ত্রী প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতো হাসলেন। বললেন, ওটা বীভৎস বললে চলবে কেন সুখানী?

স্টুয়ার্ড বলল, আপনিই বলুন স্যার।

বড় মিস্ত্রী ফের বললেন, আমরা এই মানুষেরা বীভৎস স্থানটুকুর জন্যই লড়াই করছি। সংগ্রাম বলতে পারে অথবা লোভ লালসা, চরম কুৎসিত বস্তুটির জন্য আমাদের কামুক করে রাখে। এবার বড় মিস্ত্রী সুখানীকে দু-হাতে ঠেলে রসদ ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে বললেন, তুমি যদি পা দুটো উপরের দিকে ঠেলে

দিয়ে দেখ, কি দেখবে সুখানী? একটা মুখের মতো অবয়ব দেখবে, নাক দেখবে, গহ্বর দেখবে। শুধু চোখ নেই। কবন্ধের মতো অথবা অন্ধ বলতে পারো। আর অন্ধ বলেই সকল অত্যাচার সহ্য করছে। অন্ধ বলেই এত কুৎসিত, এত ভয়ানক এবং আমাদের এত ভালোবাসা।

রসদ ঘরে আলু পেঁয়াজের গন্ধ। ডিমের শুকনো গন্ধ। বাসি বাঁধাকপির গন্ধ মলমূত্রের মতো। সুখানী ফুলগুলি এবার বুকে চেপে ধরল। স্টুয়ার্ড বরফঘরের দরজা খুলে বড় মিস্ত্রীকে দেখাল—কিছু কি দেখতে পাচ্ছেন স্যার?

বড় মিস্ত্রী যথার্থই কিছু দেখতে পেলেন না। সারি সারি হুকে বড় বড় ষাঁড়ের শরীর ঝুলছে। ভেড়া এবং শুকর। টার্কির শরীর পর্যন্ত। সব এক রঙ। এক মাংস এবং শুধু ভক্ষণের নিমিত্তই তৈরি। তিনি নিজেই এবার ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, মার্লিন, মার্লিন কোথায় স্টুয়ার্ড!

ওরা একটি টেবিল সংগ্রহ করে মার্লিনকে সযত্নে তার উপর রেখে দিল। পোশাক পরানো হল। পায়ে জুতো এবং ফুলগুলি ওর মাথার কাছে রেখে ওরা বসে থাকল নির্বোধের মতো। বড় মিস্ত্রী পায়ের দিকটায় বসে আছেন। দু পাশে সুখানী এবং স্টুয়ার্ড। ওরা মার্লিনের মুখ দেখছিল। যত ওরা মৃত মুখ দেখছিল তত ওদের এক ধরণের আবেগ গলা বেয়ে উঠে আসছে। ওর প্রতি আচরণে এতটা নির্বোধ না হলেও চলত এমত এক চিন্তার দ্বারা ওরা প্রহৃত হচ্ছে। বড় মিস্ত্রীই বললেন, এই মৃত রমণীর কাছে আমাদের জীবনের এমন কি মহত্তর ঘটনা আছে যা বলতে পারি—তিনি এইটুকু বলে উঠে দাঁড়ালেন—এমন কি ঘটনা আছে জাহাজী জীবনে যা বলে এই তীক্ষ্ম বিষণ্ণতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি?

সুখানী বলল, ভয়ংকর কষ্ট হচ্ছে। এইটুকু বলে চিবুকে হাত রাখল সুখানী। কিছুক্ষণ কি যেন দেখল সমস্ত ঘরটার ভিতর। পাশে একটা ষাঁড়ের শরীর ঝুলছে। এবং মাঝে মাঝে ওর শরীরে এসে ধাক্কা দিচ্ছে যেন। সে বলল, আমরা সকলেই জীবনের কোন না কোন মহত্তম ঘটনা বলব। চিরদিন আমরা এমন ছিলাম না।

স্টুয়ার্ড বলল, মহত্তম ঘটনা বলতে পারলে ফের আমরা ঘুমোতে পারব।

বড় মিস্ত্রী পায়ের কাছটায় বসলেন আবার।

স্টুয়ার্ড দেখল ওদের সকলের চোখ ধীরে ধীরে কোটরাগত হচ্ছে। চোখের নীচে এক ধরনের অপবাধবোধের চিহ্ন ধরা পড়েছে। সে সুখানীকে বলল, আচ্ছা সুখানী, আমার চোখের নীচে কালি পড়েছে?

আয়নায় দেখ। আমার তো মনে হয় তোমারই সবচেয়ে বেশী!

সুমিত্র, বড় মিস্ত্রী অবনীভূষণকে উদ্দেশ্য করে বলল, স্যার, কাপ্তান আমাকে বলেছেন, তোমার কি কোন অসুখ করেছে স্টুয়ার্ড? তোমাকে খুব পীড়িত দেখাছে!

অবনীভূষণ বললেন, তুমি আবার বল নি তো, রাতে স্যার ঘুম হচ্ছে না। কেমন এক অশরীরী পাপবোধ চারধারে ঘোরাফেরা করছে। বল নি তো?

আমি পাগল নাকি স্যার! আমি এমন কথা বলতে পারি?

সুখানী এবার কঠিন গলায় বলল, তুমি পাগল। আলবত পাগল। পাগল না হলে একটা রুগ্ন বেশ্যা মেয়েকে কেবিনে কেউ তুলে আনতে পারে?

স্যার, আপনি শুনুন। নালিশের ভঙ্গীতে বলল সুমিত্র।

সুখানী, তুমি বেশ্যা বলবে না। মর্লিন বেশ্যা হলে তোমার মা-ও বেশ্যা।

বড় মিস্ত্রী তার মাকে বেশ্যা বলেছে—বিজন ভাবল। সে সুখানী জাহাজের আর অবনীভূষণ বড় মিস্ত্রী জাহাজের। সুতরাং বড় মিস্ত্রীর বিজনের মাকে বেশ্যা বলার এক্তিয়ার আছে। সুতরাং বিজন চুপচাপ বসে থাকল। কোন জবাব দিল না। নির্বোধের মতো তাকাতে থাকল ফের ঘরের চারিদিকে।

সুমিত্র আর দেরী করতে চাইল না। সে বলল, স্যার আমার জীবনে একটা মধুর ঘটনা আছে। অনুমতি দিলে বলতে পারি।

বলবে? অবনীভূষণ অদ্ভুতভাবে ঠোঁট চেপে কথাটা বললেন।

হ্যাঁ স্যার, আগেই বলে ফেলি। আগে আগে যদি একটু ঘুমোতে পারি।

বল।

সুমিত্র গল্প আরম্ভ করার আগে মর্লিনের মুখের খুব কাছে ঝুঁকে পড়ল। বলল, এই মুখ দেখলে, স্যার আমার শুধু চেরীর কথা মনে হয়। তখন জাহাজে স্যার তেলয়ালার কাজ করতাম।

বিজন এবার উঠে দাঁড়াল। আমি সুখানী জাহাজের, তাছাড় আমি স্যার এই তিনজনের ভিতর সকলের ছোট। আমাকে সকলের আগে বলতে দেওয়া হোক। বলে সেও মর্লিনের মুখের কাছে ঠিক স্টুয়ার্ডের মতো ঝুঁকে পড়ল। সে বলল, এই মুখ দেখলে শুধু এলবির কথা মনে হয়। তখন স্যার আমাদের জাহাজ অস্ট্রেলিয়াতে।

সুমিত্র চিৎকার করে উঠল, বেয়াদপ!

বড় মিস্ত্রী দেখলেন ওরা ঝগড়া আরম্ভ করছে—তিনি বললেন, বরং গল্পটা আমিই বলি। বলে তিনি আরম্ভ করলেন—শেষ রাতের দিকে ভীষণ ঝড়ের ভিতর জাহাজ বন্দর ধরেছে। আমি তখন জাহাজের পাঁচ নম্বর সাব। আমাদের জাহাজ সেই কবে পূর্ব আফ্রিকার উপকূল থেকে নোঙর তুলে সমুদ্রে ভেসেছিল, কবে কোন্ এক দীর্ঘ অতীতে যেন। আমরা বন্দর ফেলে শুধু সমুদ্র এবং সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপ—বালির অথবা পাথরের জনমানবহীন দ্বীপ দেখছি। সুতরাং দীর্ঘ দিন পর বন্দর পেয়ে তুষার রাতেও আমাদের প্রাণে উল্লাসের অন্ত ছিল না। আমাদের মেজ মালোম উত্তেজনায় রা রা করে গান গাইছিলেন...।

অবনীভূষণ কিছুক্ষণ থেমে সহসা বলে ফেললেন, এ কি স্টুয়ার্ড, তুমি বাসি বাঁধাকপির মতো মুখ করে বসে আছ কেন? শুনছ তো গল্পটা।

কি যে বলেন স্যার।

বুঝলে, তোমাদের অবনীভূষণও বিকেলের দিকে সাজগোজ করে তুষারঝড়ের ভিতরই বের হয়ে পড়ল। সেই লম্বা ওভারকোট গায়ে অবনীভূষণ, লম্বা তামাকের পাইপ মুখে এবং ভয়ংকর বড বেঢপ জুতো পরে অবনীভূষণ গ্যাঙওয়ে ধরে নেমে গেল। আর নেমে যাবার মুখেই দেখল মেজো মালোম বন্দর থেকে ফিরছে। মেজ মালোম বেশ সুন্দরী এক যুবতীকে নিয়ে এসেছেন। যুবতীর পাতলা গড়ন, ছিমছাম চেহারা আর কালো গাউন, সোনালী ব্লাউজের উপর ফারের মতো লম্বা কোট গায়ে।

তুষারঝড়, সুতরাং গাছের পাতা সব ঝরে গেছে। আর পাতা ঝরে গেছে বলে কোন গাছই চেনা যাচ্ছে না। ওরা বৃদ্ধ পপলার হতে পারে, পাইন হতে পারে এমন

কি বার্চ গাছও হতে পারে। আমার সঙ্গে আমার প্রিয় বন্ধু ডেক এপ্রেন্টিস উড ছিল। শীতে পথের দু-পাশে কাঠের বাড়ি এবং লাল নীল রঙের শার্সির জানালা এবং বড় বড় জানালার ভিতর পরিবারের যুবক যুবতীদের মুখ, একর্ডিয়ানের সুর, গ্রাম্য লোকসঙ্গীত তোমাদের অবনীভূষণকে ক্রমশ উত্তেজিত করছে।

বড় মিস্ত্রী এবার সুখানীকে উদ্দেশ্য করে বললেন· আমার সব হুবহু মনে পড়ছে। নাচঘরে অবনীভূষণ দুজন যুবতীকে একলা দেখতে পেল।

তখন ব্যান্ড বাজছে, হরদম বাজছে। মদের কাউণ্টারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাবিক এসে ভিড় করছিল। ওরা কেউ কেউ মাথার টুপি খুলে তিমি শিকারের গল্প আরম্ভ করল। উত্তর সাগরে ওরা গর্ভিণী তিমি শিকার করতে গিয়ে দুজন নাবিককে হারিয়েছে এমন গল্পও করল। ভিড় সেই কাঁচঘরে ক্রমশ বাড়ছিল। মিশনের ডানদিকে মসৃণ ঘাসের চত্বর আর মৃত বৃক্ষের মতো কিছু পাইন গাছ— তার নীচে বড় বড় টেবিল আর ফাঁকা মাঠে হেই উঁচু এক হারপুনার হেঁটে হেঁটে এদিকে আসছে। হারপুনার কাঁচঘর অতিক্রম করে কাউণ্টারের সামনে লোকটির সঙ্গে ফিস ফিস করে কি বলছে। অবনীভূষণ সব লক্ষ্য করছিল। হারপুনার সেই যুবতী দুজনকে উদ্দেশ্য করে হাঁটছে। অথবা তোমাদের অবনীভূষণের মনে হচ্ছিল যেন কে বা কারা সেই যুবতী দুটিকে উদ্দেশ্য করে লম্বা গলায় বড় রাস্তায় হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে...ট্যানি টরেণ্টো...ট্যানি টরেণ্টো...

রাত ক্রমশ বাড়ছিল। গল্প ক্রমশ জমে উঠছে। মর্লিনের সাদা মুখ এবং পায়ের নীচে বসে বড় মিস্ত্রী সব দেখতে পাচ্ছিল। এখন যেন আর সেই মুখ দেখে অবনীভূষণের এতটুকু ভয় করছে না। তিনি এবার প্রিয় মর্লিনকে উদ্দেশ্য করেই যেন গল্পটা শেষ করলেন—অবনীভূষণের মনে হল দীর্ঘ দিন পর তিনি এক অসামান্য কাজ করে ফেলেছেন। বুঝলে মর্লিন, তোমার এই বড় মিস্ত্রী সেই জাহাজে আবদ্ধ যুবতীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, আপনি নির্ভয়ে ঘুমোন, আমি বাইরে তুষারঝড়ের ভিতর বসে আপনার পাহারায় থাকছি। বলে তোমার বড় মিস্ত্রী দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়েছিল এবং ঠিক দরজার সামনে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডার ভিতর পা মুড়ে বসেছিল এবং জেগে জেগে এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দ্বীপের স্বপ্ন.. বড় এক বাতিঘর দ্বীপ, সব বড় বড় জাহাজ সমুদ্রগামী—জাহাজের মাস্তুলে তোমাদের অবনীভূষণ 'মানুষের ধর্ম' বড় বড় হরফে এই শব্দ ঝুলতে দেখল। অবনীভূষণ নিঃশব্দে হাঁটু মুড়ে মাথা গুঁজে বসে থাকল—তার এতটুকু নড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না, যেন জীবনের সাত রাজার ধন এক মাণিক খুবই হাতের কাছে রয়েছে। তাকে গলা টিপে মারতে নেই।

বড় মিস্ত্রী জীবনেব সেই মহৎ গল্পটুকু বলে সকলকে দুঃখিত করে রাখলেন। মর্লিনের মৃত শরীরে এবার ওরা ফুল রাখল। এবং ওরা যথার্থই এখন এই মাংসের ঘরে সেই যুবতীকে প্রত্যক্ষ করল।

সুখানী, বড় মিস্ত্রী ফুল রেখে উপরে উঠে যাচ্ছে। পিছনে স্টুয়ার্ড দরজা বন্ধ করে ফিরছে। ওরা সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। খোলা ডেকে দাঁড়াল। এই উদার আকাশ এবং শহরের নীল লাল আলো এবং সাগর দ্বীপের পাখিরা কেবল ডাকছে। ওরা এখন সমুদ্রের সিঁড়ি ভেঙে আকাশের তারা গুণতে থাকল যেন এবং এ সময়েই ওরা ঘরে ফেরার জন্য সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ওরা নির্জন ডেক ধরে যে যার আশ্রয়ে চলে গেল। পরস্পর কোন কথা বলল না। বলতে

পারল না।

এরা বন্দরে নেমে সোজা মার্কেটে চলে গেল । পথের কোন দৃশ্যই ওদের আজ চোখে পড়ছে না। ভালো ফুলের জন্য ওরা সন্ধ্যা না হতেই দোকানে ভীড় করল। ওরা আজও তিনগুচ্ছ ফুল নিয়ে জাহাজে ফেরার সময় কোন পাব-এ ঢুকে একটু মদ খাবার জন্য আকুল হল না। মার্লিন এক তীব্র পাপবোধের দ্বারা ওদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

স্টুয়ার্ড নিজের কেবিনে চোখ টেনে আর্শিতে দেখল। চোখের নীচটা টেনে টেনে দেখল। রুগ্ন পীড়িত ভাবটা কমেছে কি না দেখল। বড় মিস্ত্রীর চোখ দেখল। বড় মিস্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সতেজ মনে হচ্ছে।

সে বড় মিস্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, স্যার, আমাকে আগের চাইতে সুস্থ মনে হচ্ছে না?

সুখানী বলল, মোটেই না।

বড় মিস্ত্রী বললেন, আমাদের তিনজনকেই গত রাতের চেয়ে বেশী সুস্থ মনে হচ্ছে।

ওরা সিঁড়ি ধরে নীচে নামবার সময় শুনল, দূরে কোথাও একদল পাখি উড়ে যাচ্ছে ওদের মুখে খড়কুটো। ওরা আসন্ন ঝড়ের আগে ডিম পাড়ার জন্য পাহাড়ের খাঁজ অন্বেষণে রত। সুখানী সিঁড়ি ধরে নামবার সময় পাখিদের মুখে খড়কুটো দেখল। স্টুয়ার্ডের চোখে, সেই পাখিদের ডিম পাড়ার জন্য পাহাড়ের খাঁজ অন্বেষণ। কেবল বড় মিস্ত্রী শুনলেন পাখিরা পাখায় রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে বিষ সুরে কাঁদছে।

স্টুয়ার্ড একধারে ফুলগুলি রেখে মার্লিনের মুখটা ঠিক করে দিল। তারপর গাউনটা টেনে পায়ের নীচটা পর্যন্ত ঢেকে দিল। তারপর বাসি ফুলগুলো যত্ন করে সরিয়ে দেবার সময় বলল, মনে হয় আমরা আমাদের প্রিয়জনের পরিচর্যা করছি। আমাদের এত যত্ন মার্লিন বেঁচে থাকলে পেত!

সুখানী বলল, আচ্ছা স্যার, এ সব করার হেতু কি? কি দরকার এই ফুল সাজানোর। কি দরকার প্রতি রাতে এ-ভাবে...আমাদের বৈজ্ঞানিক মন?

বড় মিস্ত্রী বাধা দিয়ে বললেন, মৃতের প্রতি সম্মান জানাতে হয় সুখানী। মার্লিনকে এখন যত সুন্দর মনে হচ্ছে, যত স্বচ্ছ মনে হচ্ছে, ওকে আমরা এখন যত ভালো ভাবে দেখতে পারছি...

স্টুয়ার্ড মাঝপথেই বলে ফেলল, মার্লিন যে সত্যের জোরে বেঁচে ছিল এত দিন মরে গিয়ে সেই সত্যকে সে আবিষ্কার করল, কি বলেন স্যার? আর সেজন্যই বোধ হয় ওকে আমরা এত ভালোবেসে ফেলেছি।

সুখানী বলল, কি সব বলছ পাগলের মতো। বলে সে মার্লিনের শক্ত হাত পাগুলিকে ঠিক করে দিল। চুলগুলি যত্ন করে গুছিয়ে দিল। তারপর টেবিল-টা প্রদক্ষিণ করার সময় ষাঁড় গরু অথবা শুকরের মাংস ঝুলতে দেখে জীবন সম্পর্কে কেমন উদাসীন হয়ে পড়ল। সে চেয়ারে বসে মার্লিনের পায়ের কাছে মাথা রেখে ঘুম যাবার ভঙ্গীতে হাত পা টানা দিতে গিয়ে বুঝল এই শরীর এক মল-মূত্রের আধার। অথচ মার্লিনের চোখ পাথরের মতো। বড় মিস্ত্রী মার্লিনকে নিবিষ্ট হয়ে দেখছেন, স্টুয়ার্ড গল্প আরম্ভ করেছে।

সে বলল, তখন আমি জাহাজের তেলয়ালা সুমিত্র। সে বক্তৃতার কায়দায়

বলল, স্যার আপনি আছেন, নচ্ছার সুখানী আছে আর এই সম্মানীয়া মাতাথ— আমাদের এই মহত্তর ঘটনার স্মৃতিমন্থনই আশা করি আমাদের সুস্থ করে তুলবে।

সুখানী বলল, তা হলে বুঝতে পারছ মাথাটা আর ঠিক নেই।

চুপ রও বেয়াদপ! তুমিই সব নষ্টের গোড়া। বলে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। সে কিছু বলতে পারছিল না ; ওর কষ্ট হচ্ছে বলতে। সে আবেগে কাঁপছিল। সে ধীরে ধীরে বিগত জীবনে চেরী নামক এক রাজকন্যার গল্প শোনাল। ওর আর চেরীর গল্প। জাহাজী জীবনের অপূর্ব এক প্রেম ভালোবাসার গল্প।

স্টুয়ার্ড গল্প শেষ করে মর্লিনের মাথার কাছে দাঁড়াল এবং ওর চোখ দুটোতে চুমু খেল। বলল, আমাদের ছোট এবং স্বার্থপর ভেব না, মর্লিন।

সারা ঘরময় সুখানী এখন কোন মাংসের শরীর দেখতে পাচ্ছে না। দূর থেকে আগত কোন সংগীতের ধ্বনি যেন এই ঘরে বিলম্বিত লয়ে বেজে চলেছে। সে থেকে থেকে কবিতার লাইন দুটো বার বার আবৃত্তি করল। এবং এই আবৃত্তির ভিতরেই সে এলবিকে স্মরণ করতে পারে।

ওরা তিনজন আজও ফুল রাখল মর্লিনের শরীরে। ওরা উঠে যাবার সময় কোন বচসা করল না। ওরা কোন সমাধি ক্ষেত্র থেকে ফিরে আসছে যেন এমন এ চোখ-মুখ সকলের।

বন্দরে এটাই ওদের শেষ রাত ছিল। ভোরের দিকে জাহাজ নোঙর তুলবে। ও তিনজন প্রতিদিনের মতো বসল। প্রতিদিনের মতো বাসি ফুলগুলি মর্লিনের শরীর থেকে তুলে ভিন্ন জায়গায় রাখল।

বড় মিস্ত্রী দু-হাত প্রসারিত করে দিলেন টেবিলে। সুখানী দীর্ঘ সময় ধরে উপাসনার ভংগীতে বসে থাকল। সে তখন চোখ বুজে একটি বিশেষ দৃশ্যোকে স্মরণ করে গল্পটা আরম্ভ করতে চাইছে।

সুখানী বড় মিস্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলল, তখন স্যার আমার নাম ছিল কি। তখন আমি সুখানী হই নি। বলে, গল্পটার ভূমিকা করল।

তারপর আস্তে আস্তে বিজন এক অব্যক্ত বেদনার গল্প শোনাল। জাহাজের বাতাস পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে শুনল বিজনের গল্প। এক সময় বিজন গল্প শেষ করে অবসন্ন ভংগীতে উঠে দাঁড়াল। সে এখন মর্লিনের কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিল। সে যেন এই কপালের কোথাও কিছু অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে।

বড় মিস্ত্রী এত অভিভূত যে গল্প শেষ হবার পরও তিনি কিছু সময় বিজনের মুখ দেখলেন। তিনি বিজনকে মর্লিনের কপালে নুয়ে পড়তে বললেন, কি দেখছ সুখানী?

সুখানী বড় মিস্ত্রীর কাছে এলো এবং বলল, Peace is on her foreh Peaceকে অন্বেষণ করছি স্যার। মর্লিন সারাজীবন ঝড়ের নৌকা বেয়ে গভীর সমুদ্রে বৈতরণী পার হচ্ছে। এইটুকু বলে বিজন পুনরায় এলবির কবিতাটি একটু অন্যভাবে আবৃত্তি করল—

> She had dropped the sword and
> dropped the bow and the arrow ; peace
> was on her forehead, and she had
> left the fruits of her life behind herself